ডঃ রামেশ্বর শ'

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ

ডঃ রামেশ্বর শ'

অনুবাদে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত।

প্রাক্তন প্রফেসর ও প্রাক্তন ডীন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,

প্রাক্তন গেস্ট লেকচারার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন ভিজিটিং প্রফেসর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

সঙ্কলন ও সম্পাদনা

হেনা শ'

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯

Ādhunik Bāṅlā Upanyāser Paṭabhūmi O Bibidha Prasaṅga
(Background of Modern Bengali Novel and Miscellany)
by Prof Rameswar Shaw
Edited by Hena Shaw
Published by Prof Rameswar Shaw
B2/41, PO KALYANI, Dist-Nadia, Pin 741235 (INDIA)
Available at
PUSTAK BIPANI, 27, Beniatola Lane, Kolkata 700009 (India)
Price Rs 300/- only

অন্যতম প্রাপ্তিস্থান :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কোলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
এস. সেন

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্ট ম্যাক্স
ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগণা

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ
কোলকাতা ৭০০ ০০৪

৩০০ টাকা

উৎসর্গ

অশেষ প্রীতিভাজন

পরম বিদ্যোৎসাহী

শ্রীযুক্ত মনোজ দাশগুপ্তের

করকমলে

---নিত্য-শুভার্থী রামেশ্বর দা'

লেখকের কথা

আমার ঠিকানা

"ঠিকানা আমাব চেয়েছ বন্ধু--
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাও নি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি।
. . . . .
বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে,
আমাব ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্যোদযেব পথে।" —'ঠিকানা'

আমাব বাল্য যৌবনেব প্রিয় কবি সুকান্তেব কবিতা দিয়ে শুরু করছি। কারণ এই কবিতাটিতে শুধু আমাব দুঃখ বেদনাই প্রতিধ্বনিত হয়নি, গভীবতব অর্থে সাধারণ মানুষের চিবজীবনের সর্বজনীন অভিজ্ঞতাই ছায়া ফেলেছে। আবার শুধু মানুষেব কেন, বিশ্বরহস্যেরই তাৎপর্য ধ্বনিত হয়েছে যার কথা আমাদের বিশ্বকবি আরো প্রজ্ঞাব সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন —

"হায ওবে মানবহৃদয়,
বাব বার
কাবো পানে ফিবে চাহিবাব
নাই যে সময
নাই নাই।
জীবনেব খবস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে-
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।" —'শা-জাহান'।

বিশ্বের ঘাটে-ঘাটে আমরা জন্ম জন্মান্তরে জীবনতরীব নোঙব ফেলি, আবাব নোঙর তুলে চলি অন্য ঘাটের উদ্দেশে, ক্রমে অন্য বন্দরের উদ্দেশে, শেষে নদীব মোহনা পেবিয়ে অসীম সাগবের বুকে ভাসিয়ে দিই ব্যক্তিজীবনের ছোট্ট নৌকোটিকে।

"আমি বেশ মনে কবতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যের বন্দনা কবছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।"

সুদীর্ঘ প্রায় তিবিশ বছব। স্থিতিশীল জীবনেব স্থায়ী আশ্রয় গডলাম তাই কল্যাণীতেই— 'এতটুকু বাসা'। কিন্তু 'সুখেব লাগিযা এ ঘব বাঁধিনু, অনলে পুডিয়া গেল'। একেবাবে গৃহহীন হলাম আমি। আমাব সেই দুঃখেব দিনে আমাব প্রিয় জনদেব মধ্যে আমাব যেসব স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী আমাকে শ্রদ্ধা-সান্ত্বনা মনোবল দিযেছে তাদেব কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। সেদিন আব একটা দিক থেকে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। বাজনীতিব জগতে যাঁদেব খাঁটি মানুষ বলে আমি শ্রদ্ধা কবি, এবং যাঁদেব জীবন থেকে আমি আমাব দুঃখেব দিনে সান্ত্বনা লাভ কবেছি তাঁবা হলেন দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু লাল বাহাদুব শাস্ত্রী এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায। এঁদেব মধ্যে কাবো বাজনৈতিক মতবাদেব সঙ্গে আমাব কোনো সম্পর্ক নেই (এঁদেব প্রত্যেকেব বাজনৈতিক মতবাদও অল্প-বিস্তব পৃথক পৃথক), কিন্তু এদেব মৃত্যু ব্যক্তিগতভাবে আমাব হৃদয স্পর্শ কবে এইজন্যে যে, যদিও আমি এঁদেব সমতুল্য নই, তবু এঁদেব জীবনেব সঙ্গে আমাব জীবনেব যেন একটা বিন্দুতে দুব সাদৃশ্য বযেছে মনে হয। তাছাডা সম্প্রতি ক'টি বই ও প্রবন্ধ পড়ে মনটা আবো ভাবাক্রান্ত হযে গেলো--সাহিত্যিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায সম্পাদিত 'শ্যামাপ্রসাদেব ডাযেবী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ' এবং একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি-লিখিত নেতাজীব মৃত্যুকাহিনী সম্পর্কিত একাধিক গ্রন্থ। বইগুলি অধিকাংশই নাম কবা প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত। কোনো লেখা তা যে কোনো লেখকেবই হোক না কেন, তা যদি আমাকে আমাব শ্রদ্ধেয় নেতাব ব্যাপাবে ভাবিত কবে তাতে আমাব অনুভূতি প্রবণতা প্রমাণিত হয ঠিকই, কিন্তু সেই লেখকেব তথ্য সমাবেশ এবং কলমেব জোবও সিদ্ধ হয। কিন্তু আমি কোনো ধর্মীয বা বাজনৈতিক সাম্প্রদাযিকতা সমর্থন কবি না, আমি শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতায বিশ্বাসী। যাইহোক, বাজনীতিব জগতে খাঁটি মানুষ আবো অনেকে আছেন - তাদেব আমি অশ্রদ্ধা কবি না। কিন্তু আমাব বিষণ্ণতাব মুহূর্তে পূর্বোক্ত চাবজনেব কর্মময জীবনেব মধ্যপথে আকস্মিক অবসানেব কথা আমি যখনি ভাবি, তখনি মনে হয তাব সঙ্গে আমাব নিজেব জীবনে নিযতিব অপ্রত্যাশিত বিডম্বনাব একটা যেন মিল আছে-- তাদেব মৃত্যু যেমন বেদনাদাযক, বেঁচে থেকে আমাব মৃতবৎ জীবনও তেমনি বেদনাদাযক, তবু আমাব পক্ষে সান্ত্বনাব কথা এই যে, মহৎ ব্যক্তিত্বেব ক্ষেত্রে নির্মম ভাগ্য বিপযয যদি অপ্রতিবোধ্য হয, তবে আমাব মতো সামান্য মানুষেব ক্ষেত্রে তো সেটা অপবিহার্য হতেই পাবে।—এই সান্ত্বনাই সম্বল কবে গৃহহীন আমি তখন আশ্রয নিলাম ব্যাবাকপুবে 'স্বামী মহাদেবানন্দ গিবি বৃদ্ধাশ্রমে' মাত্র স্বল্পকালেব অবস্থানে ব্যক্তিগতভাবে আমি বুঝেছিলাম— এটা বৃদ্ধাশ্রমেব নামে বাজকীয অট্টালিকায বাজকীয মেস্ নয। মেস ও বৃদ্ধাশ্রম যে এক জিনিস নয, এখানকাব কর্তৃপক্ষেব সেই ধাবণা আছে, এঁবা বৃদ্ধদেব বিশেষ বিশেষ প্রযোজন বোঝেন, সেবাও কবেন এদেব সীমাবদ্ধ সামর্থ্যেব মধ্যে। কিন্তু সেটিও আমায ছেডে আসতে হলো 'আপন জন'দেব ভালোবাসাব দৌবাত্ম্যে। এখন ভাবি ভুল কবেছিলাম ছেডে এসে। তাবপব থেকেই আমাব আবো উষব যাযাবব জীবনেব সূত্রপাত। আজ আমি এতই বিপর্যস্ত যে, এ বছব এশিযাটিক সোসাইটি থেকে 'অধ্যাপক সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায স্মাবক বক্তৃতা' দানেব জন্যে আমন্ত্রণ পেয়েও তা গ্রহণ কবতে পাবি নি। তাই আমাব অনিশ্চিত জীবনে কবিব কথাটি আজ যেন আমাবই কথা হয়ে বাজছে—

"বন্ধু আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে,
আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।"

হয়তো কোনোদিন এ জন্মে বা জন্মান্তরে মহামানবের সাগরতীরে আমার জীবন-তরী ভিড়বে, আমার জীবনে আবার সূর্যোদয় হবে "Where the Wings of Glory brood" 'Savitri', Book-I, Canto-V

বি ২/৯১, 'পরবাসী', **রামেশ্বর শ'**
কল্যাণী ৭৪১২৩৫,
জেলা নদীয়া (ভারত)।
মোবাইল নং ৯৮৩১৬২৬৩৭০
ফোন নং ০৩৩ ২৫০২৫১৪
নীরবতা মধ্যাহ্ন ১টা থেকে ৩টা
রাত্রি ১০টা থেকে ৫টা

উত্তরকা:

১ শ্রীযুক্ত গৌরীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাব্রতী সাংবাদিক লেখক
২ শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাময় রায় শিক্ষাব্রতী বিজ্ঞানের সাহিত্য রসিক ও লেখক
৩ শ্রীযুক্ত দিলীপ চক্রবর্তী কেমব্রিজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
৪ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তুলনামূলক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ।
৫ শ্রীযুক্ত তপনকুমার চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সাহিত্যানুরাগী
৬ শ্রীযুক্ত হিতেন নাগ দীনহাটা কলেজের অধ্যাপক, লেখক
৭ শ্রীযুক্ত প্রলয়কুমার দেব কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আর্টস ও কমার্স ফ্যাকাল্টীর ডীন।
৮ শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণজ্ঞাপন কেন্দ্রের (সেন্টার ফর মাস কমিউনিকেশনের) অধ্যাপক পরিচালক, বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যবিশেষজ্ঞ।
৯ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাথ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আর্টস ও কমার্স ফ্যাকাল্টীর ডীন।

অথাতো জীবনজিজ্ঞাসা :

....."মানুষের অন্তরে যখন ভোরের আলো ফোটে, তখন তার বাইরে রাত্রির অন্ধকারও কেটে যায়; তার অন্তরে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাইরের জগতের সমস্ত ঝড়ও শান্ত হয়ে আসে, আর প্রকৃতির যেসব শক্তি পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে রত, সেগুলিও তখন একটা স্থায়ী সমতার মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে।"......

—শিলার
'মানুষের নান্দনিক শিক্ষা-বিষয়ক পত্রাবলী'
পঞ্চবিংশ পত্র (অনুবাদ)

,,.......Sobald es Licht wird in dem Menschen, ist auch ausser ihm keine Nacht mehr; sobald es stille wird in ihm, legt sich auch der Sturm in dem Weltall, und die streitenden Kräfte der Natur finden Ruhe zwischen bleibenden Grenzen "......

—Johann Christoph Friedrich von Schiller : 'Briefe über die Ästhetische Erziehung des Menschen', Fünfundzwanzigster Brief, Oxford University Press.

"To live within, in constant aspiration towards the Divine—that renders us capable of regarding life with a smile and remaining in peace whatever the external circumstances."

—The Mother : Message given earlier by the Mother and distributed by Sri Aurobindo Ashram among the devotees

---

গ্রন্থ প্রসঙ্গে এবং......

'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ মাত্র দু' বছরে নিঃশেষিত হওয়ায় এর চাহিদায় উৎসাহিত হয়ে পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রথম সংস্করণের নাম ছিল 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস' (প্রথম খণ্ড) । তখন এইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিলো। তারই দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম পর্ব রূপে প্রকাশ করা হলো। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বটি পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। এই পর্বটি—'বিবিধ প্রসঙ্গ'—বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনার সঙ্কলন; এ ছাড়া এতে আছে কিছু পূর্বে অপ্রকাশিত রচনা। প্রথম পর্বে কোনো ঔপন্যাসিক বা কোনো উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা আমার অন্বিষ্ট নয়—সে-কথা গ্রন্থ-নাম থেকেই বোঝা যায়, এখানে যুগগত সামাজিক পটভূমিকা সম্মুখে রেখে ভবিষ্যৎ গবেষকগণের আলোচনার সুবিধার জন্যে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের শুধু সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকা (Socio-economic background) এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; এছাড়া বিশ্ব-উপন্যাসের আধুনিক প্রবণতাগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে; কারণ এই প্রবণতাগুলিও বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার সূত্রপাতের কারণ ও পটভূমি রূপে কাজ করেছিলো। এসব সম্পর্কেও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের পাঠক উপলব্ধি করবেন তথ্যাবলী যথাসাধ্য মূল উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আলোচনা সুবিন্যস্ত ও সূত্রবদ্ধ হওয়াতে এই সময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকার মূল রূপরেখা ধরে অগ্রসর হতে ভবিষ্যৎ গবেষকের সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে দুটি বিতর্কিত প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। বর্তমানে সামাজিক পটভূমিকায় শিল্প-সাহিত্যের মূল্যায়নের যে নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার আসল তাৎপর্য কী? শিল্প-সাহিত্যে সামাজিক পটভূমিকার রূপায়ণ কীভাবে হয়,কতখানি হয়? দ্বিতীয়ত 'আধুনিক' কথাটির তাৎপর্যও আপেক্ষিক, তাহলে আধুনিক উপন্যাস বলতে আমরা কী বুঝবো? এই দুই প্রশ্নে নানা পরস্পর-বিরোধী মতের আলোচনা করে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার দিক থেকে একটি সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের আলোকেই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের মূল্যায়নের চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হয়।

স্বনামধন্য আধুনিক কবি অধ্যাপক ডঃ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। সে-কথা আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আমার দুঃখের দিনে সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিয়ে আমার অধ্যয়ন- অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিত্য উৎসাহিত করেছেন আমার দুই প্রবীণ বন্ধু অধ্যাপক ড. দর্শন চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ অবসরপ্রাপ্ত জীবন-সায়াহ্নে এই দুই বহুকালের সহমর্মী সহকর্মীর কথা বারবার মনে পড়ে।

প্রথম পর্বের প্রথম সংস্করণ (''আধুনিক বাংলা উপন্যাস''- প্রথম খণ্ড) প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ড. অসীমকুমার বন্দোপাধ্যায় যে সাহায্য

ও সহযোগিতা করেছিলেন তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এঁরা ছাড়া বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পর্বটির প্রথম সংস্করণ রচনা ও প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব আনন্দ-বেদনার নিত্য অংশীদার সহধর্মিণী শ্রীমতী হেনা শ' অক্লান্ত নীরব পরিশ্রমে প্রতি পদে উৎসাহিত করেছিলেন এবং কন্যা সুমঙ্গলা শিশুসুলভ দৌড়াত্ম্যে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধিত রূপটি রচনার জন্যে কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন অধ্যাপক নারায়ণ হালদার, অধ্যাপক ডঃ সঞ্জয় প্রামাণিক, ড. ভূদেবচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক নির্মাল্য সেনশর্মা ও শ্রীমান সুব্রত পাল। দ্বিতীয় সংস্করণের নির্ঘণ্ট করে দিয়েছেন বিদ্যোৎসাহী গবেষক শ্রী কেশব আড়ু। তাঁর সঙ্গে আমার দিক থেকে যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক এবং তাঁর দিক থেকে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সম্পর্ক, তাতে তাঁকে আমি শুধু কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বর্তমান গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হয়েছে কল্যাণীতে শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আমাদের অবস্থান-কালে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আচরণ সাধারণত যেমন যান্ত্রিক ও বৈষয়িক হয়ে থাকে, সেরকম আচরণ তো তাঁরা কোনোদিন আমাদের প্রতি করেনই নি, বরং শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁদের কন্যা গোপার আত্মীয়-সুলভ অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি এবং তাঁদের বাড়ীর স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ আমার সারস্বত সাধনাকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে আমার প্রাক্তন সহপাঠী ও বর্তমান বন্ধু শ্রী সুধীর দেওয়ান কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ককে ছোটো করবো না। কল্যাণী ছেড়ে চলে যাবার সময় একটি অতি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সেখানে রেখে এসেছিলাম—সে আমার আড়াই বছরের ছোট্ট সদা-হাস্যোজ্জ্বল আত্মভোলা আদরের নাতি 'শুভ' ('সমর্পণ')। তার নির্মল হাসিটি আমাকে বৃদ্ধ বয়সেও নিত্য সঞ্জীবিত করেছে।

পরিশেষে সবিনয়ে বলি—প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত। আমার ভাষাচিন্তা ও বানানে বিবর্তন ও পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে বারেবারে—যেমন বাংলার কোনো-কোনো বড়ো কবি-সাহিত্যিকেরও হয়েছে। ফলে আমার এই সমগ্র গ্রন্থটিতে বানান ও ভাষারীতিতে সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। তাছাড়া মুদ্রণ-প্রমাদ তো আছেই। পারিবারিক বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে গ্রন্থটি প্রকাশ-কালেও আমি বানান ও ভাষারীতিতে শুদ্ধি ও সঙ্গতি বিধান করতে পারি নি। প্রুফও সর্বত্র নিজে দেখে উঠতে পারি নি। আমার ত্রুটির জন্যে আমি পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

রামেশ্বর শ'

লেখকের কথা : আমার ঠিকানা ৭
গ্রন্থ প্রসঙ্গে এবং ....। ১৩

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি*

পৃষ্ঠা

১ সৃষ্টিচৈতন্য ও যুগ-পরিবেশ : আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় ২১

এক : সমস্যার স্বরূপ ২১

বর্তমান আলোচনার অন্বিষ্ট ও বর্তমান প্রসঙ্গের উপযোগিতা, শিল্পসৃষ্টি, ব্যক্তিচৈতন্য, সমাজ-পরিবেশ, শিল্পের প্রত্যক্ষ জন্মভূমি ব্যক্তিচৈতন্য, সমস্যার মূল-স্বরূপ : ভাবজগৎ বনাম জড়জগৎ, চিৎ (mind) বনাম জড় (matter)

দুই : সম্পর্কহীন দুই সত্তা? দেকার্তের (Descrates) দ্বৈতবাদ ও অন্যমত ২৫

তিন : চরম ভাববাদ ও বস্তুগত বা তন্ময় ভাববাদ ২৬

তন্ময় ভাববাদ (Objective Idealism) : হেগেল, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দের মত, সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা

চার : চরম জড়বাদ ও দ্বান্দ্বিক জড়বাদ ৩০

লোকায়ত জড়বাদ (Naive Materialism) বা যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanical Materialism), Holdback ও Calvinism-এর নিয়তিবাদ, ঐতিহাসিক/দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (Historical/Dialectical Materialism), সৃষ্টিচৈতন্যের সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তির সৃজনী-শক্তির মুক্তি ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা : এঙ্গেলস্ ও লেনিন্, কড্ওয়েল্ এবং সাহিত্য-সৃষ্টির স্বীকৃতি, বিভিন্ন মতবাদের উপযোগিতা, পরিবেশের প্রভাব : সৃষ্টিচৈতন্যের ক্রমিক মুক্তি : ম্যাক্ডগল্, এলিয়ট্, ম্যাকাইভার ও পেজ্, রবীন্দ্রনাথ ও রুথ্ বেনেডিক্ট্

পাঁচ : সিদ্ধান্তেব দিকে ৪০

২. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক : ৪৬

আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় ৪৬

ব্রিটিশ শোষণ ও ভারতীয় সমাজ ৫১

শিল্পায়নের সূচনা ও যন্ত্রীকরণ ৫৪

বিশ্বযুদ্ধ ৫৬

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৫৭

---

* স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণে এই অংশের নাম ছিলো 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস (প্রথম খণ্ড)'

বেকার-সমস্যা ৫৮
দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ৫৯
অস্বাস্থ্য ৬৩
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ৬৫
সামাজিক ভাঙন ও মানবীয় মূল্যবোধের বিপর্যয় ৭১
জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রাম ৭৯
নব-নব চিন্তাধারা ও আশাবাদী জীবনদর্শন : শ্রীঅরবিন্দ, কার্ল্ মার্ক্স ইত্যাদি ৮৯
শিক্ষাক্ষেত্রে নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংস্কার ৯৭
নারী-প্রগতি ৯৯
অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণ, মার্ক্স্বাদ ও গণচেতনা ১০২
৩. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১০৫
'কল্লোলে' প্রকাশিত বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ও
বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা ১০৫
'কালি-কলমে' প্রকাশিত বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ও
বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা ১০৮
পুরাতনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ১০৯
সমাজচেতনা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ১১৪
বাস্তবতা ও নেচার‍্যালিজ্ম্ ১১৯
পটভূমির অভিনবত্ব ও বিষয়বৈচিত্র্য-সাধন ১২৫
উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা ও দার্শনিকতা ১২৬
যৌনচিত্র ও ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা ১২৮
উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ ও অন্তর্মুখীনতা ১৩৪
প্রতীকবাদ ১৩৫
সুর্‌রিয়েলিজ্ম্ ১৩৯
অস্তিত্ববাদ ১৪০
মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব ও বৈপ্লবিক সাম্যবাদী চিন্তাধারা ১৪২
আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক ১৪৩
৪. উপসংহার ১৪৫
প্রথম পর্বের নির্ঘণ্ট ১৪৭
একটি উদ্ধৃতি : 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'—বঙ্কিমচন্দ্র ১৬৮

দ্বিতীয় পর্ব

বিবিধ প্রসঙ্গ

(ক) প্রসঙ্গ : বাংলা সাহিত্য **১৭১**

(১) বাংলার নবজাগরণে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৩

(২) বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি ১৮০

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর ১৯১

(৪) পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ১৯৭

(৫) রবীন্দ্র-ঋতুচিত্র : বর্ষা প্রসঙ্গ ২০৩

(৬) দেশবন্ধুর কবিতা ২০৬

(৭) আধুনিক বাংলা কবিতা : একটি প্রশ্ন ২১০

(৮) নলিনীকান্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিত্যিক ২১৪

(৯) সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ২৩৮

(খ) প্রসঙ্গ : ভাষা **২৪৩**

(১) উইলিয়াম কেরির সাধুগদ্য : ভাষাতাত্ত্বিক বিচার ২৪৫

(২) বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাবনা ২৫২

(৩) পদ্মানদীর মাঝি : ভাষা ও শৈলীবিচার ২৫৮

(৪) সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক ২৭২

(৫) ভাষা-সমস্যা প্রসঙ্গে ২৭৯

(৬) স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের মূল স্বরূপ ২৮৭

(৭) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচন ২৯০

(গ) প্রসঙ্গ : ভারতীয় প্রাদেশিক ও বিদেশী সাহিত্য **২৯৭**

(১) কবি মৈথিলীশরণ ২৯৯

(২) মধুসূদন ও মৈথিলীশরণ : সম্পর্ক নির্ণয় ৩০২

(৩) শেক্‌স্‌পীয়র : জীবনচেতনার ত্রয়ী উপাদান ৩০৬

(৪) শেক্‌স্‌পীয়রীয় ও গ্রীক ট্র্যাজিডি ৩১১

(৫) সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিয়ট ৩১৪

(৬) জার্মান কথাসাহিত্যিক ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফকা ৩২১

(৭) জার্মান কবি রিল্‌কে ৩২৫

(ঘ) প্রসঙ্গ : নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা **৩৪৭**

(১) নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা ৩৪৯

(২) শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ৩৬৬

(৩) ক্রোচে ও তাঁর নন্দনতত্ত্ব ৩৮৭

(৪) নন্দলাল বসুব শিল্পদর্শন ৩৯৬

(৫) প্রমথ চৌধুরীব সাহিত্যতত্ত্ব ৪০৫

(৬) জার্মান নন্দনতত্ত্ববিদ শিলার ৪১২

(ঙ) প্রসঙ্গ : সমাজ ৪২৩

(১) চৈতন্যধর্ম · বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ৪২৫

(২) বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদেশের কৃষক ও ভূমি-আইন ৪২৮

(৩) বাংলা প্রবন্ধ ও জাতীয় সংহতি ৪৩৭

(৪) ধর্ম ও জাতীয় সংহতি ৪৪৪

(৫) এ যুগের সমস্যা : একটি আত্যন্তিক সমাধান ৪৪৮

(৬) যুদ্ধের সমস্যা · চূড়ান্ত সমাধান কোন্ পথে? ৪৫৫

(৭) নারী-স্বাধীনতা, নারীবাদ এবং তারপর ৪৬৪

(৮) যুক্তিবাদের সীমা ৪৭১

(৯) শক্তিসাধনা : সেকাল ও একাল ৪৭৬

(চ) প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী, শেকস্‌পীয়র ৪৮৫

(১) ববীন্দ্রনাথ : শ্রীঅববিন্দের দৃষ্টিতে ৪৮৭

(২) শ্রীঅরবিন্দ : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ৪৯৪

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী ৫০১

(৪) শেক্‌স্‌পীয়ব : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ৫০৫

(ছ) প্রসঙ্গ : গ্রন্থসমালোচনা ৫১১

(১) ভাষাবিজ্ঞানে পূর্ণায়াত দৃষ্টিভঙ্গি ৫১৩

(২) বাংলা বানান-সংস্কার ৫১৯

(৩) ভাষাপ্রসঙ্গ : একটি প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক আলোচনা ৫২২

(৪) বাংলা ছোটগল্পে সমাজচেতনা ৫২৯

(৫) মেঘ স্নিগ্ধ, নদী স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ হৃদয়ের ছায়া ৫৩৬

(জ) প্রসঙ্গ : পত্র/পত্রোত্তর ৫৩৯

স্বপ্ন থেকে সত্যে : নীরবতার দিকে ৫৪১

(ঝ) পরিশিষ্ট—১ : মতামত ৫৫৩

(১) 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' সম্পর্কে

(২) 'ভবিষ্যতের কবিতা', (শ্রীঅরবিন্দের 'The Future Poetry'-র বান্মেশ্বর শ' কৃত অনুবাদ : 'অনুবাদে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার' প্রাপ্ত) সম্পর্কে

(ঞ) পরিশিষ্ট—২ : কয়েকটি উদ্ধৃতি : ৬০১

'কোরআন শরীফ', 'পবিত্র বাইবেল', 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ', বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ এবং দ্য মাদার-এর রচনা থেকে।

প্রথম পর্ব

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি

১. সৃষ্টিচৈতন্য ও যুগ-পরিবেশ : আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়

এক

সমস্যার স্বরূপ

সৃষ্টিচৈতন্য (Creative Consciousness) সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে বহু-বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, সে-সব আলোচনায় কিছু-কিছু মতপার্থক্য থাকলেও এখন এ সম্পর্কে একটি মোটামুটি সুসিদ্ধ ধারণা গড়ে উঠেছে। এই ধারণার মূল কথাটি এই যে, সৃষ্টিচৈতন্য হল নব-নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি যার সাহায্যে মনোলোকে গৃহীত উপাদান নিত্য নবরূপে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। আপাতত সৃষ্টিচৈতন্য সম্পর্কে এই মূল ধারণাটি নিয়েই আমরা অগ্রসর হব। কারণ সৃষ্টিচৈতন্যের সামগ্রিক সংজ্ঞা রচনা করা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অন্বিষ্ট নয়। যুগ-পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপটিই এখানে অনুসন্ধেয়। তা ছাড়া সৃজনী চেতনার স্বরূপ জিজ্ঞাসায় যুগ-পরিবেশের সঙ্গে সৃষ্টিচৈতন্যের সম্পর্কটি একটি মূলীভূত সমস্যা বলে এই সমস্যার সমাধানের প্রান্তবিন্দুতে পৌঁছাবার আগে সৃষ্টিচৈতন্যের স্বরূপ নির্ধারণ করা বা তার সংজ্ঞা রচনা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্যার সমাধানে যখন আমরা পৌঁছাব তখন সৃষ্টিচৈতন্যের মূল স্বরূপ স্বতঃই উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে। তবু স্মরণীয় এই যে, আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্যবিন্দুটি কিছুটা স্বতন্ত্র। সেখানে যে সমাধানের ইঙ্গিত পাব, তার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের সমগ্র আলোচনার পথ-নির্দেশ।

প্রতিভার মৌলিকতা সমাজ-বিবিক্ত নিঃসঙ্গতার নামান্তর নয়। সৃজনী-প্রতিভার সঙ্গে সমাজ পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক আজ প্রায় সব পক্ষ থেকেই সমর্থিত হয়েছে। তবু সমাজ-পরিবেশ ও সৃষ্টিচৈতন্যের এই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পারস্পরিক প্রভাবের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই কারণটি ছাড়া আরো কয়েকটি কারণে বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভে আমাদের এই সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হল। এই কারণগুলি হল : প্রথমত, উপন্যাস সর্বাপেক্ষা নমনীয় ও পরিবর্তনশীল শিল্পকলা হলেও একথা আজ প্রায় সর্ববাদিসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় বিশেষভাবে উপন্যাসের সঙ্গেই সমাজের সম্পর্ক নিবিড়তর, উপন্যাসে বাস্তবতার পরিমাণ অধিকতর। তাই সমাজ-পরিবেশ ও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতন্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি ও পারস্পরিক প্রভাবের স্বরূপটি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত; আধুনিক উপন্যাসে এই সামাজিক উপাদান তথা বাস্তবতা পূর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ দাবিরূপে ঘোষিত হচ্ছে। এমন কি, এই অতিমাত্র সমাজচেতনা ও বাস্তবতা কোনো-কোনো মহলে আধুনিকতার সঙ্গে একার্থকরূপে গৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে। কোথাও-কোথাও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতন্যকে পরিবেশের প্রতিলিপি বলেও দাবি করা হচ্ছে। তাই এসব কথার আসল তাৎপর্য কী এবং যাথার্থ্য কতটুকু তা আধুনিক উপন্যাসের আলোচনার প্রারম্ভেই উদ্‌ঘাটন করা একান্ত প্রয়োজন মনে হয়।

তৃতীয়ত, আধুনিক সাহিত্যালোচনায় সমাজ-পরিবেশকে কোনো-কোনো মহলে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমসাময়িক যুগ-পরিবেশের বাস্তব পটভূমিকায় সাহিত্যের মূল্যায়ন-রীতি ব্যাপকতর হচ্ছে। এই জাতীয় সাহিত্যালোচনার কারণ হল মনোবিজ্ঞানেও সাম্প্রতিক কালে ব্যক্তিমানসের গঠনে পরিবেশের গুরুত্বকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।[১]

এই সমস্ত কারণে কোনো বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে সমাজের, এবং বিশেষ করে—একটি যুগের সমাজ-পরিবেশের—যোগাযোগের প্রকৃতি ও স্বরূপ উদ্ঘাটন আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সৃষ্টিচৈতন্য ও যুগ-পরিবেশের সম্পর্ক কিরূপ—এদের পারস্পরিক প্রভাবই বা কতটা এবং তার আত্যন্তিক ফলশ্রুতি কি—প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসা কাম্য মনে হয়।

ব্যক্তিমানসের গঠনে সমাজের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আজকের দিনে মোটামুটি স্বীকৃত হলেও শিল্পের প্রত্যক্ষ জন্মভূমি ব্যক্তি-চৈতন্যই। সৃষ্টিচৈতন্যকে আপাতত আমরা ব্যক্তিরই মানস-লীলার একটি দিক বা অংশ রূপে গ্রহণ করছি। সাহিত্যপুষ্পের বিকাশ ব্যক্তির মনোবৃক্ষেই হয়ে থাকে। এই বৃক্ষটি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে রস আহরণ করে বটে, কিন্তু এই বৃক্ষটি যে একটি ব্যক্তি-সত্তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি ব্যক্তি-সত্তা বলেই ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিল্পসৃষ্টির রাজ্যে রূপ-রস-গন্ধের বৈচিত্র্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ থেকে লোকসাহিত্য বা প্রাচীনকালের অন্য কোনো-কোনো শ্রেণীর তথাকথিত 'সমবায় সাহিত্য' সাধনার কথা উপস্থাপিত হতে পারে। তার উত্তরে বলা যায়—প্রথমত, সে-জাতীয় সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনা সংগ্রথিত হতো মাত্র, একই রচনায় একই কালে একাধিক স্রষ্টা হাত মেলাতেন না। কারণ যন্ত্র-সৃষ্টির সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির পার্থক্য আছে। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত হওয়ার পর সেগুলিকে মিলিয়ে পরিপূর্ণ যন্ত্রটি খাড়া করা যায়। কিন্তু কাব্য রচনায় এমনটি কখনো হয় না যে, একজন ভাব কল্পনা করেন, অন্যজন ভাষাদান করেন, আবার আর একজন ছন্দ রচনা করেন। শিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ব্যক্তি-মনেরই নিটোল সৃষ্টিতে সম্ভব। লোক-সাহিত্য, আদিম মহাকাব্য ইত্যাদি যে সমস্ত সাহিত্যকে আমরা 'সমবায় সাহিত্য-সৃষ্টি' বলি সেগুলিরও মূল জন্মস্থান ব্যক্তিচৈতন্যই। এই জাতীয় সাহিত্য বস্তুত একাধিক

১। একজন বিখ্যাত সমাজ-মনোবিজ্ঞানী এই নতুন প্রবণতা সম্পর্কে বলেছেন

"A second very important advance of psychology towards usefulness is due to the increasing recognition of the extent to which the adult human mind is the product of the moulding influence exerted by the social environment, and of the fact that the strictly human mind, with which alone the older introspective and descriptive psychology concerned itself, is an abstraction merely and has no real existence" -Mc Dougall, William, 'An Introduction to Social Psychology', Methuen & Co., 1950, 30th ed, p 14 (অবশ্য এই উদ্ধৃতি চরমপন্থী জড়বাদের সমর্থক নয়, একথাও মনে রাখতে হবে।)

ব্যক্তিরই সৃষ্টি-সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিতীয়ত, যে শ্রেণীর সাহিত্যে একাধিক ব্যক্তির রচনা সংগ্রথিত হত, সেই শ্রেণীর সাহিত্য রচনা থেকে আজ আমরা বহু দূরে চলে এসেছি। একাধিক কবির রচনা সমন্বয়ে যে আদিম মহাকাব্যের জন্ম হয়েছিল, আধুনিক কালে তার বদলে এক কবির রচনা সাহিত্যিক মহাকাব্যের জন্মই তার প্রমাণ। আবো আধুনিক কালে গীতিকাব্যের আধিক্য সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি-চৈতন্যেরই প্রাধান্য সূচিত করে। সভ্যতার অগ্রগতির এইটাই হয়ত অপরিহার্য নিয়তি। শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টিতে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগের কথা স্বীকার করে নিয়েও ব্যক্তিচৈতন্যকেই শিল্প-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ জন্মভূমি বলে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমালোচক প্রামাণিক সিদ্ধান্ত করেছেন :

"The work of art has its immediate origin in the consciousness of an individual, it only requires its full significance, however, to the extent that it has integrated with the general culture of a people of period "[২]

সুতরাং সৃষ্টি চৈতন্যকে ব্যক্তি-চৈতন্য বলেই গ্রহণ করছি। কারণ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে ব্যক্তি-চৈতন্যেরই। আর সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির সম্পর্ক অপরিহার্য হলেও অনেকটা পরোক্ষ, ব্যক্তি চৈতন্যের মাধ্যমে। তাই শিল্পের সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণয়ের অর্থই হল ব্যক্তি-চৈতন্যের সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণয় করা।

এই যে ব্যক্তি মানস শিল্পসৃষ্টি করছে, তার চারপাশে বিরাজ করছে একটি জগৎ, মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় যাকে বলা হয়েছে পরিবেশ (environment)। এই পরিবেশে আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগৎ রয়েছে, প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ আছে। এর মধ্যে আছে যে মানুষ, তাকে আশ্রয় করে আছে বহু কালাগত শিক্ষা ও সংস্কারের রেশ, ভাব ও ভাবনার ঐতিহ্য। এছাড়া আছে সমসাময়িক বা নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াবলী ও চিন্তাগত আন্দোলন। এইভাবে স্থূলে সূক্ষ্মে মিশ্রিত এই পরিবেশ ব্যক্তিকে ঘিরে রয়েছে প্রতিক্ষণ। একটি বিশেষ যুগে সৃজনশীল প্রতিভাকে, সৃষ্টিচৈতন্যকে, ঘিরে রয়েছে এই যে সমাজ পরিবেশ তারই একটি পর্বকে বলছি যুগ-পরিবেশ। একটি বিশেষ কালসীমায় চিহ্নিত পরিবেশই যুগ-পরিবেশ।

সুতরাং সৃষ্টিচৈতন্য যেমন ব্যক্তিচৈতন্যের একাংশ, যুগ পরিবেশও তেমনি সমাজ-পরিবেশেরই একটি বিশেষ পর্ব। তাই সৃষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে যুগ পরিবেশের সম্পর্কের যে সমস্যা তা মূলত ব্যক্তি চৈতন্যের সঙ্গে সমাজ পরিবেশেরই সম্পর্কের সমস্যা। আবার ব্যক্তিচৈতন্য মানেই ব্যক্তিমন (mind)। এবং পরিবেশ মানেই ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বস্থ বহির্জগৎ। সুতরাং ব্যক্তিচৈতন্যের সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্কের মূলে পাচ্ছি মনের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক অর্থাৎ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমস্যা, চিদ্‌জগৎ ও জড়জগতের সমস্যা (Individual and Society) এবং তারও মূলে হল ভাবজগতের সঙ্গে জড়জগতের সমস্যা (Mind and Matter)। ব্যক্তিমন বা ব্যক্তিচৈতন্যের উপরে পরিবেশ বা বহির্জগৎ

২। Read, Herbert Art and Society', London Faber & Faber, Memxlvi

কতখানি ছায়া ফেলে, মানবমন কতখানি বস্তুজগতের প্রভাবের অধীন, এবং বহির্জগৎই বা কতখানি আমাদের মনোরাজ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—এসবই হল আমাদের বিবেচ্য।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণীয় এই যে, চিৎ ও জড়ের যে দ্বন্দ্ব অনাদি কাল থেকে দার্শনিক চিত্তকে আন্দোলিত করে আসছে তার সমাধান দেবার বাসনা আমাদের নেই, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তা কাম্যও নয়। বস্তুত দার্শনিক আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। যে কোনো সমস্যার স্বরূপ তলিয়ে দেখতে গেলে সেই অনুসন্ধানে যতটুকু বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সত্যের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, ততটুকুই আমরা এখানে গ্রহণ করব। তাছাড়া কোনো সাহিত্য-সমালোচনাই জীবন-বিবিক্ত কোনো দুর্ঘটনা নয়। যে-কোনো সত্যকার অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন সুসঙ্গত (consistent) সমালোচনা-পদ্ধতিই জীবন সম্পর্কে একটা সুসমন্বিত (co-herent) জীবন-দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। লেখায় তারই যখন আমরা বিধিবদ্ধভাবে আলোচনা করি, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা দার্শনিক আলোচনার রূপ পরিগ্রহণ করে। বিশ্লেষণের পক্ষে এই বিধিবদ্ধ আলোচনা অপরিহার্য মনে হয়। আরো বক্তব্য এই যে, চিৎ ও জড়ের মধ্যে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে সেটাই দার্শনিকের প্রধান সমস্যা। আমরা কিন্তু সে সমস্যার সমাধানে বিশেষ অগ্রসর হব না। এই সমস্যার দার্শনিক মহলের মত-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও চিৎ ও জড়ের পারস্পরিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদগুলির উপরে ভিত্তি করে আমরা একটি সামান্য সত্যের আবিষ্কারে ব্রতী হব। এবং তার ওপরেই নির্ভর করে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সৃষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে যুগ-পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত। আর এই সিদ্ধান্তের ওপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী পরিচ্ছেদে উপন্যাসে আধুনিকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির মূল্যায়ন করা হবে এবং আধুনিকতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে।

যে সমস্যাটি আমরা এখানে উত্থাপিত করছি, বলা বাহুল্য সেটি আজকের কোনো নতুন সমস্যা নয়। যুগ-যুগান্তরের কবি, চিন্তানায়ক ও দার্শনিককে এই সমস্যা বিচলিত করেছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে এর সমাধান দেবার চেষ্টাও করেছেন। সমস্যা বহু প্রাচীন বলেই এক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত হওয়াই স্বাভাবিক। এ থেকে কোনো সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার আগে এদের পরিচয় গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ স্থলে যে সব বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছে তাদের ছোট-ছোট বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি (differentia) বাদ দিলে মূলত, আমরা দেখতে পাব, এদের মতের যে মৌলিক পার্থক্য সেই অনুসারে এ সমস্ত মতবাদকে আমরা দুটি জোটে ভাগ করে ফেলতে পারি—জড়বাদী সম্প্রদায় ও ভাববাদী সম্প্রদায়।

এখানে প্রথমেই বলে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, এই দুই সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র বিবৃতি দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। সেই প্রচেষ্টা এখানে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন। মতবাদগুলির ব্যাখ্যা করে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে একটি সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। মতবাদগুলি সম্পর্কে ব্যাপক ও দৃঢ়মূল ভ্রান্ত ধারণাগুলির

নিরসনই শুধু আমাদেব উদ্দেশ্য এবং সেইজন্য মতবাদগুলির বিধিবদ্ধ পরিচিতি এখানে প্রয়োজন। সাহিত্যসৃষ্টিব স্বধর্ম রক্ষা করতে হলে এই ভ্রান্তিগুলি দূর করা বিশেষ দরকার। এই আলোচনায় আমরা ক্রমেই দেখতে পাব যে এই মতবাদগুলি নিজেদের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের ভ্রান্তি সংশোধন করে এসেছে এবং সেই thesis ও antithesis-এর পরে যেন একটা synthesis-এব দিকে এগিয়ে আসছে। এই synthesis-এর উপরেই আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা।

দুই

সম্পর্কহীন দুই সত্তা?

পরিবেশ ও সৃষ্টিচৈতনা, বাহ্যজগৎ ও ভাবজগৎ—এদেব পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধান কবতে গিয়ে অনেকে সিদ্ধান্ত কবেছেন যে, বাহ্যজগৎ ও ভাবজগৎ, জড় ও চিৎ, দেহ ও মন এরা সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা অথচ এরা পরস্পরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দার্শনিক দেকার্তে (Descrates) এই জাতীয় দ্বৈতবাদের পুরোধা। বলা বাহুল্য এই জাতীয় মতবাদ অধুনা গৃহীত হতে পাবে না। কাবণ, দেহ ও মনের, বাহ্যজগৎ ও ভাবজগতের, জড় ও চিৎ-এর যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নিত্য লেন দেন ও নির্ভরতা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার কাবণ সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই মতবাদে আমরা পাই না। দৈহিক সংবেদন বা সুখ-দুঃখানুভূতি কেন অনুরূপ মানসিক বোধের সৃষ্টি করে বা মানসিক সংকল্প বা পরিকল্পনা কেন দৈহিক কার্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয় তার উত্তর এই মতবাদে নেই। কারণ চিৎ ও জড়কে, ভাবজগৎ ও বাহ্যজগৎকে যদি দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তারূপে ঘোষণা কবা হয়, তবে একটির প্রভাব অন্যটিতে কোন্ সূত্রে কেন পড়ে তা ব্যাখ্যাত হয় না। আধুনিক কালে তাই এই দ্বৈতবাদ অবৈজ্ঞানিক ও স্ববিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছে। কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি যে কার্যকারণ সম্বন্ধে (law of cause and effect) বিশ্বাস তা এই মতবাদে আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত।

এখন বাহ্যপরিবেশ ও সৃষ্টিশীল মন, জড় ও চিৎ, দেহ ও মন—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে হলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে এরা দু'টি পৃথক সত্তা নয়, একই মূল সত্তার দু'টি রূপ, দু'টি অংশ বা দুটি কোটি। এখন এই মূল ভিত্তি-স্থানীয় সত্তাটি কি? উত্তরে একদল বলেছেন মূল সত্তাটি হল জড় (matter) বা বাহ্য জগৎ। আমরা যাকে চিৎসত্তা বা ভাবজগৎ বলি বা 'মন' নামে অভিহিত করি, সেটা স্বরূপত জড়েরই একটা বিশেষ বিকাশ বা বিশেষ ক্রিয়া মাত্র। এঁদের মতবাদকে জড়বাদী অদ্বৈতবাদ (materialistic monism) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অধুনা বহুল প্রচলিত মার্কস্‌বাদ এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত।

জড়বাদী অদ্বৈতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদটি হল ভাববাদী অদ্বৈতবাদ (idealistic monism)। এই মতবাদ অনুসারে যে মূল সত্তার দু'টি প্রকাশ হল দেহ ও মন, জড় ও

চিৎ, সেই মূল সত্তাটি হল একটি ভাব, মন, আত্মা বা চেতনা। আমরা যাকে জড় বলছি সেটি হয় আমাদের ভ্রান্তদর্শন বা মায়া, নয় ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ, আত্মার মূর্তরূপ, চেতনার স্থূল প্রকাশ।

অতঃপর আমবা ভাববাদী ও জড়বাদী এই দুই মতবাদের পরিচয় গ্রহণ করে দেখব সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোনো সমন্বয়ী সিদ্ধান্তের বীজ এদের আধুনিকতম রূপের মধ্যে রয়েছে কিনা।

তিন

চরম ভাববাদ ও বস্তুগত বা তন্ময় ভাববাদ

ভাববাদের চরম রূপ হল Subjectivism (মন্ময়তা) বা Selipcism। এই মতবাদ অনুসারে চৈতন্যই একমাত্র সত্তা। চৈতন্য ছাড়া আমরা যে বস্তুজগৎ দেখি, তা আমাদের ভ্রান্তদর্শন বা illusion মাত্র। সুতরাং জগৎ হল আমাদের চৈতন্যেব রচনা বা কল্পনা। তাই চৈতন্যের বাইরে জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই। পাশ্চাত্যে এই জাতীয় মতবাদের ধারক হলেন বার্কলি (George Bishop Barkeley)। জগতের অস্তিত্ব বলিষ্ঠ কণ্ঠে অস্বীকার করে তিনি বলেছেন,—বস্তুজগৎ বলে বাইরে কিছু নেই, বস্তুজগৎ বলে আমরা যাকে জানি, তা হল আসলে আমাদের মনেব কতকগুলি ধারণার সমষ্টি (collection of ideas)। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুজগৎ রূপে আমরা যার অনুভব পাচ্ছি বলে মনে করি, তা বস্তুর অনুভব নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিরই ক্রিয়ার অনুভব মাত্র।

"... What are the afore-mentioned objects but the things we perceive by sense? and what do we perceive besides our own ideas or sensations?"[৩]

সুতরাং এই মত অনুসারে ব্যক্তির চারপাশে যে পরিবেশ আমরা দেখছি, তা ব্যক্তিব বাইরে কোথাও নেই, তা ব্যক্তির চৈতন্যের মধ্যেই রয়েছে। অর্থাৎ যুগ-পরিবেশ বা সমাজ-পরিবেশের বাস্তব কোনো অস্তিত্বই নেই, এ হল ব্যক্তিচৈতন্যের কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র। প্রকারান্তরে এখানে তা হলে জগৎকে অস্বীকার করা হচ্ছে। দার্শনিক পদ্ধতিতে এই মতবাদকে বহুভাবে খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এখানে সেই সব পুরানো যুক্তির পুনরুক্তি না কবে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, যেখানে জগৎ ও জীবনের স্বীকৃতি নেই, লীলার স্থান নেই, সেখানে শিল্প-সাহিত্যও গড়ে উঠতে পারে না। এই চরমপন্থী ভাববাদের উপরে ভিত্তি করে সাহিত্য-সমালোচনার কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিও তাই গড়ে উঠে নি।

ভাববাদী সাহিত্য-সমালোচনা আমরা যাকে বলি তা আসলে ভাববাদের এক নরম (moderate) পন্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই নরম পন্থার দার্শনিক অভিধা হল তন্ময় ভাববাদ বা বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealism)। এই মতবাদই বহু প্রচলিত এবং

৩। Barkeley 'Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge,' 1710, §4.

সর্বাধিক স্বীকৃত। চরমপন্থী ভাববাদের চেয়ে এই মতবাদ আধুনিক। বহু শিল্প-স্রষ্টার সমর্থন রয়েছে এর পেছনে এবং অধিকাংশ শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবনদর্শন এর সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। ফলে সাহিত্য-সমালোচনার বস্তুতর পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এর ওপর ভিত্তি করে। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, বহু সাহিত্য-সমালোচকের মতবাদ সূত্রবদ্ধ করলে মূলে আমরা এই তন্ময় ভাববাদই পাব। পাশ্চাত্যে হেগেল এই মতবাদের বলিষ্ঠতম প্রবর্তক। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের দর্শন এই গোষ্ঠীতে পড়ে। এবং উপনিষদের দর্শন থেকে যদিও প্রায় সব রকম দার্শনিক মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়, তবু মোটামুটিভাবে উপনিষদের দর্শন বলতে সাধারণত এখন যা বোঝায়, তা-ও এই বস্তুগত বা তন্ময় ভাববাদই (Objective Idealism)।

এই তন্ময় ভাববাদে বস্তুজগতের নিজস্ব অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ব্যক্তিমানস সৃষ্টিশীল বটে, কিন্তু বস্তুজগতের সব কিছুই ব্যক্তিমানসের রচনা নয়। পরম সত্য ব্যক্তি-চৈতন্যের বাইরেও রয়েছে। ব্যক্তির চারিদিকে যে বহির্জগৎ রয়েছে, যে সমাজ ও পরিবেশ রয়েছে, তা শুধুই ব্যক্তির ভ্রান্তদর্শন নয়। ব্যক্তিচৈতন্য (subject) ও দৃশ্যমান জগৎ (object)- -এদের কোনোটিকেই মিথ্যা বলা যায় না। পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কে এসেই ব্যক্তিচৈতন্যের আত্মোপলব্ধি। এই দুটিকে নিয়েই আত্মিক সত্যের পরিপূর্ণতা। যেখানে এদের একটি নেই, সেখানেই অন্যের অস্তিত্ব তাৎপর্যহীন :

"The human spirit in general will be regarded by our philosopher (Hegel) as essentially a subject in relation to its object Where there is less than a unity of these two factors there is nothing that can legitimately be called spirit "[৪]

প্রত্যেক কবি বা স্রষ্টা তিনি ে ড ভাববাদীই হোন না কেন, এই জগৎ ও জীবনকে, সমাজ ও পরিবেশকে অনুরূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি না দিলে যে লীলাই, এবং ফলতঃ সাহিত্যসৃষ্টিই, অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোমাণ্টিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তো সকলেই ভাববাদী ছিলেন, কিন্তু কেউ চরম ভাববাদীর মতো সমাজ ও পরিবেশের নিজস্ব অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। বরং জীবন ও সমাজের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বলেই তো তার রূপান্তরের জন্যে, তার সংস্কারের জন্যে, তাঁদের অন্তরে ছিল দুর্দমনীয় প্রেরণা। এই জন্যেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ নিজে এক সময় রাজনৈতিক প্রচার-পত্র লিখতেন, ব্লেক টম পেন (Tom Paine) এর সঙ্গে যোগ দিয়ে সমাজ-সংস্কারমূলক চিন্তাধারার জন্যে তথাকথিত দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন, কোল্‌রিজ্ রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ও সমাজদর্শন রচনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শেলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের হাতে প্রচারপত্র বিলি করেছেন, সাউদি (Southey) রাজনৈতিক নিবন্ধাবলী লিখেছেন, বায়রন (Byron) নিজে যুদ্ধে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরূপে জীবন দান করেছেন।[৫]

৪। Mure, G R G 'An Introduction to Hegel', Oxford University Press, 1948, p 62

৫। Raymond Williams 'Culture and Society 1780 1950, Pelican Book 1963, p 48

তবে এই নরমপন্থী ভাববাদীদের মতে এই বহির্জগৎ, এই সমাজ ও পরিবেশ, এ ব্যক্তিমানসের কল্পনা বা মিথ্যা মায়া না হলেও এও একটি বিশ্বব্যাপক ভাবসত্য বা আত্মিক সত্তারই (Spiritual Reality) বহিঃপ্রকাশ। এবং তার অস্তিত্ব ব্যক্তিমানসের কল্পনানির্ভর না হলেও, তা ব্যক্তিমানস থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পর্কহীন কোনো সত্তা নয়। কারণ ব্যক্তি, ব্যক্তিমানস, বহির্জগৎ, পরিবেশ সবই সেই এক বিশ্বব্যাপক পরাসত্তারই প্রকাশ বা মূর্তরূপ। এই যে বিশ্বব্যাপক পরাসত্তা বা ভাবসত্য, আমাদের উপনিষদে যার নাম ব্রহ্ম, হেগেল তার নাম দিয়েছেন 'Absolute Idea'। তাঁর মতেও এই বস্তুজগৎ (matter) ভাবসত্যেরই (Idea) অভিব্যক্তি। এই ভাবসত্য বা পরাসত্তাকে কার্তেজীয় (Cartesian) দর্শনে বা শঙ্করের মায়াবাদে যেমন নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে, হেগেল কিন্তু তাকে তেমন নিষ্ক্রিয় বলেন নি। কারণ তাঁর মতে এই ভাবসত্যটি হল চৈতন্য (Consciousness), এবং চৈতন্যের একটি ধর্মই হল সক্রিয়তা। এই সক্রিয়তার জন্যেই পরাসত্তাটির নিত্য নবমূর্তিতে আবির্ভাব ঘটছে। জড়জগৎ হেগেলের মতে এই পরাসত্তারই আত্মপ্রকাশ :

"The Idea is the true primacy and things are what they are because of the activity of the concepts intrinsic to them and disclosed in them."[৬]

অতএব এই মতবাদ অনুসারে জড় ও চিৎ-এ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, পরিবেশ ও ব্যক্তিচেতনা—সব একই নিত্যপ্রকাশশীল মহাসত্যের দুই দিক—দুই কোটি। তা না হয়ে চিৎ-জগৎ যদি জড়-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতো তবে ব্যক্তি-চৈতন্যের পক্ষে জড়ের কোনো জ্ঞান সম্ভব হতো না, ব্যক্তিচৈতন্যের সঙ্গে পরিবেশের কোনো যোগই সাধিত হতো না। কিন্তু এই দুটি পৃথক নয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ; তাই একের সঙ্গে অন্যের কার্যকারণ সম্পর্ক সম্ভব। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এদের মধ্যে যে-কোনো একটি সম্পূর্ণরূপে অন্যটির প্রভাবের অধীন। যে মহাচৈতন্য জড়দেহের আধারে ব্যক্তিচৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং করছে, তা ক্রমে ক্রমে জড়ের উপরে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করেছে। এই যে মহাচৈতনা বা চিৎসত্তা নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে মেলে ধরেছে ও ধরছে, নিজেকে প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে ক্রমশ প্রকাশ করছে, সে আবার প্রকৃতির উপরে ক্রমবর্ধমান অধিকার ফিরে পাচ্ছে—একথার বীজ হেগেলের দর্শনেই রয়েছে :

"Spirit is thus a subject which from phase to phase reconstitutes, or comes to the fuller possession of its own nature."[৭]

স্তরের পর স্তর পেরিয়ে প্রকৃতির উপরে চৈতন্যের এই যে ক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি, এখানেই রয়েছে বিবর্তনবাদের বীজ। হেগেলের মধ্যে এই তত্ত্ব বীজাকারে থেকে গেছে, পরবর্তীকালের ভাববাদী দার্শনিক বের্গসঁ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে পূর্ণ

৬। Hegel 'Werke,' Sechster Band, Berlin, 1840, S323, (translated from German)

৭। Mure, G R G 'An Introduction to Hegel', Oxford University Press, 1948, p 65.

বিকশিত রূপ লাভ করেছে। এঁদের মধ্যে পারস্পরিক মত-পার্থক্য যথেষ্ট থাকলেও জড়ের উপরে চৈতন্যের ক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এঁরা সকলেই বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ জগৎসৃষ্টিকে হেগেলের মতোই এক মহাচৈতন্যের ক্রমিক আত্ম-অভিব্যক্তি মনে করেন। এই আত্ম-অভিব্যক্তির প্রথম দৃশ্যমান স্তর হল—জড় (matter)। বিভিন্ন স্তর-পরম্পরায় এই জড়ের আধারে সেই মহাচৈতন্য বিভিন্ন ব্যক্তিচৈতন্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। চৈতন্যের এই যে ক্রমিক আত্মপ্রকাশ, এরই একটি স্তরের নাম হল মন—(mind)। বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে এসে পৃথিবীতে যখন মনের বিকাশ হল, তখন মন নামক চেতনা-স্তরের ধারক মানুষ নামক জীবটির আবির্ভাব হল। এই মনের সাহায্যে মানুষ জড়ের ওপরে, প্রকৃতির ওপরে ধীরে-ধীরে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

"At a higher stage of the evolution of personality of the being, mind may rule, there is then created the mental man who lives predominantly in the mind."[৮]

কেমন করে ব্যক্তিচৈতন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে পারে, তার উত্তরে হেগেল বলেছিলেন—বিশ্বের বিধানকে জেনেই বিশ্বের বিধান থেকে মুক্তি সম্ভব। মানুষ মননশীল বলেই তার মনের দ্বারা এই প্রকৃতির নিয়মকে সে জানছে এবং তার দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ আবিষ্কার করছে। তার জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করার কৌশল খুঁজে বের করছে। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কথাই বলেছেন :

"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না।"[৯]

উপরে ভাববাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করা গেল তা থেকে আমরা, তা হলে, সূত্রাকারে এই সিদ্ধান্ত খাড়া করতে পারি :

১। ভাববাদী চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (বস্তুত ভাববাদীর কাছে ভাব বা চৈতন্যের অস্তিত্বই প্রধান। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করার প্রশ্নই উঠে না।)

২। তন্ময় ভাববাদী Objective Idealist পরিবেশের তথা জড় জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (চরমপন্থী ভাববাদ অধুনা খণ্ডিত হয়েছে, অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে তার স্বীকৃতি নেই, সুতরাং নরমপন্থী তন্ময় ভাববাদই গ্রহণীয়। এবং সেই জন্য পরিবেশ সম্পর্কে এখানে নব্যপন্থী তন্ময় ভাববাদের মতই এখানেই উল্লিখিত হল।)

৩। এই ভাববাদ অনুসারে ব্যক্তি-চৈতন্য পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে,

---

৮। Sri Aurobindo 'The Life Divine', New York, 1951, p.800

৯। রবীন্দ্রনাথ, "শিক্ষার মিলন" (শিক্ষা)

শুধু তাই নয়, পরিবেশের উপরে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করতে পারে। সুতরাং সৃষ্টিচৈতন্য যুগপরিবেশের দাসমাত্র হয়ে থাকতে বাধ্য নয়, সমাজ-পরিবেশের শুধু প্রতিবিম্বই সে নয়, সময়ে-সময়ে পরিবেশকে বদলাবার ক্ষমতাও তার আছে।

এখন দেখতে হবে জড়বাদে অনুরূপ কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় কিনা।

চার

চরম জড়বাদ ও দ্বান্দ্বিক জড়বাদ

স্রষ্টার চারিপাশে যে পরিবেশ বিরাজ করছে, যে বাহ্যজগৎ ও সমাজ রয়েছে, জড়বাদী তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই পরিবেশকে, এই বাহ্যজগৎকে তিনি স্রষ্টার বা ব্যক্তির কল্পনা বা মনের সৃষ্টিমাত্র মনে করেন না। তাঁর মতে বস্তুজগৎ মনের সৃষ্টি নয়। এমন কি বাস্তব জগতের অস্তিত্ব ব্যক্তির চেতনা-সাপেক্ষও নয়। এ হল স্বয়ংনির্ভর সত্তা (thing-in-itself)। বস্তুজগতের অস্তিত্ব মানবমনের উপর নির্ভর করে না। কারণ জড়বাদের মতে মন বা ব্যক্তিচেতনার বিকাশ হওয়ার আগেই এই প্রকৃতি-জগৎ ছিল। বস্তুজগতের সৃষ্টির অনেক পরে প্রকৃতির বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তরে এসে মনেব আবির্ভাব হয়েছে। আর এই মন তো কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়, এ হল জড়েরই একটা বিশেষ বিকাশ স্নায়ু ও মস্তিষ্কের (cerebral cortex) ক্রিয়ামাত্র। এবিষয়ে জড়বাদীর মতবাদ লেনিনের ভাষায় উদ্ধৃত করা যাক্ :

"The existence of matter does not depend on sensation Matter is primary Sensation, thought, consciousness are supreme product of matter organised in a particular way Such are the views of materialism."[১০]

জড়বাদীর মতে এই বস্তুজগৎ, এই পরিবেশ ও প্রকৃতি, যদিও স্বয়ংনির্ভর সত্তা— অর্থাৎ আমাদের চিন্তা-চেতনার উপরে এব অস্তিত্ব নির্ভর করে না,-তথাপি তার অর্থ এ নয় যে, জড় ও চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি সত্তা এবং মনের সঙ্গে বস্তুজগতের কোনো যোগ সাধিত হতে পারে না। বরং এ কথাই জড়বাদের প্রতিপাদ্য যে, যেহেতু মন বা চেতনা দেহ বা জড়েরই একটি বিশেষ রূপ, সেহেতু দেহের সঙ্গে যার যোগ আছে সেই প্রকৃতি বা বস্তুজগতের সঙ্গে মনেরও যোগাযোগ থাকতে বাধ্য। বাহ্যজগৎ সম্পর্কে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ানুভব (sensation) সেইটাই হল বাহ্যজগতেব সঙ্গে আমাদের মনের যোগসূত্র।

প্রথম যুগে এক শ্রেণীর লোকায়ত জড়বাদে (Naive Realism) মনে করা হতো যে, ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে যে খবর আমাদের মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়, তাই হল আমাদের জ্ঞান। আমাদের মন হল যথার্থ আর্‌শির মতো। সেই আর্‌শিতে বাহ্যজগৎ ও পরিবেশের হুবহু ছবি পড়ে, আমাদের জ্ঞান সেই হুবহু ছবি ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাহ্যজগৎ থেকে

১০। Lenin V I 'Materialism and Empirio-Criticism,' Moscow, Foreign Language Publishing House, 1952 p 48

আহৃত এই জ্ঞানই আমাদের মনের সৃষ্টিতে প্রকাশ লাভ করে। সুতরাং আমাদের যুগ-পরিবেশ যেমন হবে, আমাদের চারিপাশের জগৎ যে রূপ ধারণ করবে, আমাদের সৃষ্টি, আমাদের শিল্প-সাহিত্যেও তার হুবহু প্রতিফলন হবে। আমাদের সমাজে, আমাদের যুগে যদি রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, অর্থনৈতিক অনটন আসে, জীবন যদি কুৎসিত হয়ে উঠে, তবে আমাদের সাহিত্য তার ফটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং এই জড়বাদে মনের কোনো সৃজনী ক্ষমতা স্বীকার করা হয় না; মন এখানে জড়ের সঙ্গে যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা। এই মতবাদকে চরম বা যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanical Materialism) বলা হয়।

এই যান্ত্রিক জড়বাদকে স্বীকার কবে নিলে মননশীল মানুষের পুরুষকারেব ভূমিকা অস্বীকৃত হযে পড়ে। কারণ বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ ছাড়া কোনো সৃজনী শক্তি মানুষেব মনের যদি না থাকে তা হলে সে হবে শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমানেব নিষ্ক্রিয় ধারক, বর্তমান পরিবেশেব অতিবিক্ত কোনো আদর্শ ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনায় অক্ষম, সে হবে বর্তমানের দাস, আগামীর নির্মিতিতে তার কোনো সচেতন ভূমিকা থাকবে না। জীবনেব তথা সমাজের অগ্রগতি হয় তো তখনো হবে, কিন্তু তা হবে একান্তই প্রকৃতির অন্ধ নিযমে চালিত নিতান্তই ধীব মন্থর। পৃথিবীতে মানুষেব আবির্ভাবের আগে যেমন জড়জগৎ ও প্রাণীজগৎ বিবর্তিত হয়েছে ধীর গতিতে প্রকৃতির আপন নিয়মে, তেমনি চলবে পুরুষকারহীন মানব-সমাজের অগ্রগতি। জড়ের বিধানে বাঁধা এও এক অভিনব নিযতিবাদ। এখানে মানব-মনীষার কোনো নিয়ন্ত্রণ-শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হযনি। Holback প্রভৃতি দার্শনিকেরা এমনি এক জড় নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মতে মানুষ প্রকৃতির নিয়মের দাস, প্রকৃতিকে জয় করবার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। কেউ কেউ বলেন ঐশ্লামিক দর্শনে ও Calvinism-এ যে ঐশ্বরিক নিয়তিবাদের কথা বলা হয়েছে, এই জড় নিযতিবাদ তার চেয়ে কোনো অংশে কম নৈবাশ্যব্যঞ্জক নয়। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিব কাছে এই শ্রেণীর জড়বাদী নিয়তিবাদের সত্যতা বিপন্ন হযে পড়ে। সমগ্র মানব-সভ্যতার অগ্রগতি এই নিয়তিবাদেব প্রতিবাদ করে। আধুনিক বিজ্ঞানের দুঃসাহসিক জয়যাত্রাও একে বলিষ্ঠ অস্বীকৃতি জানায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদী দর্শনেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবং জড়বাদের আধুনিকতম যে রূপটির নাম দ্বান্দ্বিক বা দ্বন্দ্বাত্মক জড়বাদ (Dialectical Materialism), তা সেই পুরাতন যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanical Materialism) থেকে অনেকখানি দূরে সরে এসেছে। এই দ্বন্দ্বাত্মক জড়বাদকে মার্ক্সীয় বা ঐতিহাসিক জড়বাদও (Historical Materialism) বলা হয। কারণ এই মতবাদের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি মানব-ইতিহাসের বিবর্তনের স্তরগুলির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এবং এই সাধারণ সূত্রগুলি দিয়ে ইতিহাসের বিসর্পিল গতির রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়। এই মতবাদ একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করে যে, মানব-সভ্যতা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রমোন্নতি কতকগুলো ঐতিহাসিক বিধানের (Historical

Laws) অধীন। মানব সভ্যতার অগ্রগতি হয়ে চলেছে সমাজেরই অপরিহার্যতার (necessity) তাগিদে। অবশ্য, এই ক্রমবিকাশ যদিও ঐতিহাসিক নিয়মেই হতে বাধ্য, যদিও সমাজের অপরিহার্য বিধানেই তা অনিবার্য, তবুও এই বাধ্যতাকে, এই অপরিহার্যতাকে পূর্বোক্ত জড় নিয়তিবাদ বা ঐশ্বরিক নিয়তিবাদের সঙ্গে এক করে ফেলা যায় না। এ বিষয়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে :

"The Marxist thesis of history as a process governed by laws is directly opposed not only to the subjectivist's conceptions of history as an agglomeration of accidents, but also to fatalism, which denies the significance of conscious activity of men and their ability to influence the course of social development."[১১]

ইতিহাসের বিধানে সমাজের অপরিহার্যতায় এই ক্রম-পরিণতি হলেও ইতিহাসের গতিনিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির পুরুষকারের বিশেষ স্থান আছে। কারণ ব্যক্তির সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমেই এই ঐতিহাসিক বিধান দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত অন্ধ যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বাত্মক জড়বাদের পার্থক্য অনেক। কারণ এখানে ভবিষ্যৎ মানে অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়, বিবর্তন মানে অন্ধ নিয়তি নয়,—এখানে ভবিষ্যতের নবযুগ রচনায় ব্যক্তির সৃজনী-শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত। বিশ্বের অগ্রগতির বিধান মার্ক্সীয় বস্তুবাদে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে স্পষ্টতই ব্যক্তিচৈতন্যের সচেতন হস্তক্ষেপকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বস্তুজগতের অনেকগুলি রূপ (form) ও সত্তা (being) পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের স্থানে হয় নিত্য নতুনের আবির্ভাব। এইভাবে নতুনের দ্বারা পুরাতনের অপসারণের (negation) মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়ে চলেছে। আবার যে-কোনো রকমের উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তন পৃথিবীর নিয়ম নয়, নিম্নাবস্থা (lower) থেকে উচ্চাবস্থায় (higher) উত্তরণই এই পরিবর্তনের ধর্ম। কিন্তু বিশ্বের এই উর্ধ্বায়ন বাইরের কোনো শক্তির প্রয়োগে হচ্ছে না, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রেরণাতেই তা হচ্ছে। সুতরাং জগতের পরিবর্তন যদি যান্ত্রিক (mechanical) না হয়ে উদ্দেশ্যমূলক (teleological) হয়, যদি অর্থহীন না হয়ে সুপরিকল্পিত হয়, এবং তাতে যদি বাইরের কোনো শক্তির হস্তক্ষেপ না থাকে, তবে একথা স্বতঃই স্বীকৃত হয়ে যায় যে, প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে একটি পরিকল্পনাকারী উদ্দেশ্য-সচেতন চৈতন্য। একে চৈতন্য বা বস্তুধর্ম বা প্রাকৃতিক নিয়ম যা-ই নাম দিই না কেন, এর মুক্ত স্বরূপটি আমাদের কাছে ঠিকই ধরা পড়ে। মার্ক্স্‌বাদে একে অস্বীকার করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে— বিশ্বের বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এসে, প্রকৃতির মধ্যে যে ছিল এতদিন সুপ্ত-প্রচ্ছন্ন, তা-ই মস্তিষ্কের বিকাশের ফলে মানসিক ক্রিয়ারূপে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। যতদিন মস্তিষ্কের বিকাশ হয় নি, বিশ্বের বিবর্তন ততদিন হয়েছে প্রকৃতির সুপ্ত অস্পষ্ট প্রেরণা বশে; তাই বিবর্তন ছিল ততদিন ধীর মন্থর বিলম্বিত। মস্তিষ্কের বিকাশের

১১। 'Fundamentals of Marxism-Leninism', edited by Clemens Dutt, Foreign Language Publishing House, Moscow 2nd. rev ed. 1963, p 134.

ফলে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রেরণা আত্মসচেতন হল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার সচেতন দায়িত্ব তার ওপরে এসে পড়ল। প্রকৃতিকে পরিবেশকে দ্রুত পরিবর্তিত ঊর্ধ্বায়িত নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি মানুষের হাতে মানুষের সৃষ্টিচৈতন্যের হাতে— প্রকৃতিই তুলে দিল। এই চৈতন্যকে যদি মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য কিছু না-ও বলি, যদি তাকেও জড়দেহের একাংশ মাত্র বলি, তবু স্বীকার করতেই হবে যে এই বস্তুটি অন্য বস্তু বা তার পরিবেশ থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র, এই বস্তুটি বিশেষ-বিশেষ সময়ে পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে নিজেই পরিবেশের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রকৃতির এই ঊর্ধ্বায়ন ও নতুনের এই নির্মিতি যে করছে সেই ব্যক্তিচৈতন্য যে শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমানের প্রতিচ্ছবি নয়, সে যে একটি সৃজনশীল শক্তি তাও স্বয়ং লেনিনের উক্তি থেকেই সমর্থিত হয়েছে :

"Marxism differs from all other socialist theories in the remarkable way it combines complete scientific sobriety in the anylysis of the objective state of affairs and the objective course of evolution with the most definite recognition of the importance of the revolutionary energy. the revolutionary creative genius."[১২]

ব্যক্তিচৈতন্যকে মার্ক্‌স্‌বাদে পরিবেশের নিষ্ক্রিয় (passive) প্রতিফলন-যন্ত্র রূপে গ্রহণ করা হয় নি, মনকে যথার্থই সক্রিয় (active) বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মন এখানে শুধুই receptive নয়, creativeও। ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে যে খবর আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছায়, মন তাকে শুধু ধারণই করে না, তাকে নতুন করে সাজায়, তার ব্যাখ্যা দেয় ও তাৎপর্য আবিষ্কার করে। যাঁরা মনন-ক্রিয়ার শুধু ডাক্তারী বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরাও স্বীকার করেছেন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহ্য পরিবেশের যে খবর আমরা পাই, তার সঙ্গে আমাদের মনোরাজ্যের নিজস্ব সংযোজনাও থাকে। তা যদি না থাকত তবে সে খবরের কোনো অর্থ কোনো তাৎপর্যই আমাদের কাছে থাকত না। প্রত্যেক স্থানেই তাই তন্ময় ও মন্ময় উভয়বিধ উপাদানই আছে :

".. every perception includes both objective and subjective element; that is, it gives us information about the thing we perceive, but it can do this only if we ourselves contribute to the perception some of its sensory qualities."[১৩]

পরিবেশ থেকে আহৃত অভিজ্ঞতাকে উপাদানরূপে গ্রহণ করে ব্যক্তিচৈতন্য যে অভিনব সৃষ্টিসৌধ রচনা করতে পারে একথা অনস্বীকার্য। স্রষ্টার নতুন সৃষ্টির এই স্বাধীনতা যেমন স্বীকার্য, তেমনি মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক নতুন সৃষ্টির জন্যে উপাদান অপরিহার্য। শিল্পসৃষ্টির জন্যে এই উপাদান হল জীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা যেহেতু বিশেষ যুগের পরিবেশ থেকেই গৃহীত হয়, সেহেতু সেই সূত্রে সৃষ্টিতে যুগ-পরিবেশের অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বর্তমান ও অতীতের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে

১২। V. I Lenin 'Collected Works', Vol XII p 36.

১৩। Russel Brain 'Some Reflections on Genius and other Essays'. Pitman Medical Publishing Co, Ltd. London 1961, Chapter on 'Symbol and Image'

স্রষ্টার অন্তরের নতুনের অনুধ্যানের সার্থক পরিণয়-বন্ধনেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব—একথা আধুনিক মার্ক্‌স্‌পন্থী বস্তুবাদী সমালোচকও স্বীকার করেছেন।

স্রষ্টার অভিজ্ঞতার সূত্রে যে যুগ-পরিবেশ স্রষ্টার নবসৃষ্টিতে উপাদানরূপে গৃহীত হয় তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলে সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সূত্রেই উপাদানের প্রকৃতি শিল্প-স্বভাবকেও অনেকটা প্রভাবিত করে, শিল্পদৃষ্টিকেও অংশত নিয়ন্ত্রিত করে। মার্ক্‌স্‌বাদী শিল্পতত্ত্বের তাৎপর্য এইটুকুই, এর বেশি কিন্তু দাবি করা ঠিক নয়।

শিল্পের উপাদান যে সমাজজীবন, তার নিজস্ব বিকাশধারা সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌বাদে বলা হয়েছে, প্রত্যেক যুগের সমাজ-পরিবেশ তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপরে রচিত হয়। সমাজের এই অর্থনৈতিক কাঠামো সেই যুগের উৎপাদন-পদ্ধতি (means of production) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে। উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামোও বদলে যায়। এই পরিবর্তন অনুসারে প্রত্যেক যুগের সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে, সমাজ-পরিবেশ রচিত হয়। আমাদের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক রীতি-নীতি, স্নেহবন্ধন, মূল্যবোধ—সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বদলে যায় এই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে। মার্ক্‌স্‌বাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্বে সমাজ-পরিবেশের প্রভাব থেকে ব্যক্তিমানসের সৃষ্টিচৈতন্যের যে মুক্তির কথা আমরা বলেছি তা সমাজের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সহজলভ্য বা সহজাত নয়। আর অধিকাংশ মানুষের চেতনা যুগগত বাস্তব পরিবেশের অধীন বলে সমাজ-পরিবেশের এই পরিবর্তন তাদের চিন্তা-ভাবনাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাই তাদের সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যেমন হয়, তেমনি হয় তাদের সামাজিক মূল্যবোধ, রুচি-প্রকৃতি; তাদের শিল্পবোধও গড়ে উঠে সেই অনুসারে। এইভাবে তাদের চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমাজ-পরিবেশের দ্বারা। মার্ক্‌সের এই সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি :

"The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual process of life It is not the consciousness of men that determines their existence, but, on the contrary, their social existence, determines their consciousness."[১৪]

মার্ক্‌সের এই উদ্ধৃতিকে মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচনার ভাব-মূল বলা যায়। কিন্তু এই উদ্ধৃতির অর্থ ভুল বুঝে প্রথম যুগে একদল সমালোচক ফিরে গিয়েছিলেন সেই যান্ত্রিক জড়বাদে, অন্ধ নিয়তিবাদে।[১৫] তাঁরা মনে করেছিলেন, 'their social existence deter-

১৪। Karl Marx· 'Critique of Political Economy', Preface, Eng. trans., Stone, pp II ff. Or, Marx and Engels 'Literature and Arts,' Current Book House, Bombay, 1956, p I

১৫। ...that "the arts are passively dependent on social reality" is "a proposition which I take to be that of Mechanical Materialism, or a vulgar misinterpretation of Marx " ....Raymond Williams· 'Culture and Society 1780- -1950'. Pelican book, 1963, p. 266

mines their consciousness—একথার অর্থ এই যে, আমাদের চিদ্‌জগৎ, আমাদের মন, আমাদের সমাজপরিবেশের ফটোগ্রাফ মাত্র। আমাদের চেতনাসৃষ্ট শিল্পসাহিত্য যুগ-পরিবেশের হুবহু প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। যুগ-পরিবেশের অতিবিক্ত কোনো কল্পনার স্পর্শ সেখানে নেই। যাঁরা এই মানদণ্ডে শিল্পসাহিত্য বিচার করেন তাঁরা মনে করেন, যুগ পরিবেশেব নির্ভুল দলিল হওয়াতেই সাহিত্যের সার্থকতা।[১৬] সাহিত্যকে তাঁরা ইতিহাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনে তৃপ্তি লাভ করেন। সাহিত্য এবং ইতিহাস যে স্বরূপত আলাদা তা তাঁরা বিস্মৃত হন।[১৭] বলা বাহুল্য, এতে সাহিত্যকে স্বধর্মভ্রষ্ট করা হয় মাত্র।

স্পষ্টতই মার্ক্‌স্‌বাদের এই ব্যাখ্যায় একাধিক স্ববিরোধ দেখা যায়। প্রথমত, এই ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী তথাকথিত মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচক মনে করেন, সৃষ্টিচৈতন্য বাস্তব পরিবেশের আরশি ছাডা আর কিছু হতে পাবে না, বাস্তব সীমার অতিরিক্ত অভিনব কিছুর ধ্যান কল্পনা করার ক্ষমতা সৃষ্টিচৈতন্যের নেই। কিন্তু সেই ক্ষমতা যদি সৃষ্টিচৈতন্যের না-ই থাকে, তবে কোনো-কোনো সাহিত্যের বিরুদ্ধে তাঁবা যে অভিযোগ তোলেন—অমুক সাহিত্যে যুগের ছবি নেই, অমুক সাহিত্য অবাস্তব,—তাঁদের সেই অভিযোগ অর্থহীন। কারণ মন যদি বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে যেতেই না পারে, তবে তার সৃষ্টি অবাস্তব হবে কি করে? দ্বিতীয়ত, সাহিত্য যদি বর্তমান পবিবেশের ছবি ছাড়া আর কিছু হতেই না পারে, তবে কোনো-কোনো সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা নেই বলে এই দলের সমালোচকেরা যে অভিযোগ করেন, সেই অভিযোগও নিবর্থক।

বিশেষ-বিশেষ সাহিত্যেব সমালোচনায মার্ক্‌স্‌বাদীবা উপরে উল্লিখিত এই যে দুটি অভিযোগ তোলেন, সেই অভিযোগ দুটি কিন্তু অর্থহীন নয়। আসলে সৃষ্টিচৈতন্য যে পরিবেশের আরশি ছাড়া আর কিছুই নয়—এই সিদ্ধান্তেই রয়েছে তাঁদের ভূল বোঝা। উত্তরকালে মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচনায এই ভ্রান্তি দূর করে মার্ক্‌সের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেওযা হয়। এই নতুন ব্যাখ্যার বীজ এঙ্গেল্‌সের মধ্যেই নিহিত ছিল। তিনিই স্পষ্ট করে বলে গিযেছিলেন যে, যেহেতু সমাজেব অধিকাংশ মানুষের মন বাস্তব পরিবেশের অধীন, পার্থিব লাভক্ষতির মানদণ্ড তাদের বিচাবের মাপকাঠি, সেহেতু তাদের জীবনে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবই বেশি। আর এই অধিকাংশ লোক দিয়েই সমাজ গঠিত হয়। তাই সমাজেব কাঠামো তাদের অর্থনৈতিক বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সমাজের কাঠামো নিয়ন্ত্রণে অন্য কোনো শক্তির হাত নেই। সমাজে দু'একজন কবি ও নবীর জন্ম হয যাঁদের চিন্তা চেতনা বর্তমানকে অতিক্রম

১৬। "the great mistake of the scientific-historical scholarship is that it looks for a degree and kind of certainty that literature does not need and cannot allow" —Lionel Trilling 'The Liberal Imagination,' The Viking Press, New York, 1951, p 183

১৭। cf "From what we have said it will be seen that the poet's function is to prescribe not the thing that has happened but a kind of thing that might happen, i e what is possible as being probable or necessary"
Aristotle 'Poetics', Bywater's Translation, ch. 9

করে ভবিষ্যৎকে ধারণ করে। তাঁদের মন সমসাময়িক বাস্তব পরিবেশের আরশি মাত্র নয়। ভবিষ্যতের নবতর রূপ কল্পনায় সে সক্ষম। এঁদের ধ্যান-ধারণাই প্রত্যেক যুগের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের বীজ বোনে। ব্যক্তির এই সৃজনীশক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। এঙ্গেল্‌স্‌ তাই সাবধান করে দিয়ে বলেছেন :

"According to the materialist conception of history the determining element in history is ultimately the production and reproduction in real life More than this neither Marx nor I have ever asserted If therefore some body twists this into the statement that the economic element is the only determining one, he transforms it into a meaningless abstract and absurd phrase"[১৮]

লেনিনও বলেছেন যে তাঁরা একথা কখনও দাবি করেন না যে তাঁরা যা জেনেছেন তা-ই শেষ জানা। সত্যকার বাস্তববাদী কমিউনিস্টের উচিত হচ্ছে যা সে জানে না, তার সম্পর্কে নীরব থাকা, কোনো কিছু ভাল করে জানার আগেই তাকে অস্বীকার না করা, বরং নতুন জানার জন্যে মনের দুয়ার খোলা রাখা। লেনিনের নিজের ভাষায়—

"If I know that I know little, I shall strive to learn more, but if a man says that he is a communist and that he need not know anything thoroughly, he will never become anything like a communist "

বিশেষ-বিশেষ সমাজ-পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই স্রষ্টার মনে জন্ম লাভ করে বিশেষ-বিশেষ অভিনব কল্পনা। কারণ বৈজ্ঞানিক নিয়মে মানবমন পরিবেশের সঙ্গে কার্য-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত। সৃষ্টিচৈতন্য সমাজ-পরিবেশের ফটোগ্রাফ মাত্র নয়, কিন্তু মানবমনে সমাজ-পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি ও কল্পনার মূল। এই অর্থেই 'their social existence determines their consciousness' কথাটি সত্য। সৃষ্টিচৈতন্য সমাজপরিবেশের ফটোগ্রাফ নয়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। সমাজে যা আছে তার হুবহু ছবি হল ফটোগ্রাফ, কিন্তু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার উল্টোও হতে পারে। এইটিই মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচনার আসল বক্তব্য। কিন্তু এরই সঙ্গে আবার একথাও এখানে স্বীকৃত যে প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি সমাজের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। এইটিই আমরা মার্ক্‌স্‌বাদীর কাছে শুনতে চেয়েছিলাম; এবং তা আমরা এখানে শুনতে পেলাম। এইটাই এখানে আমাদের প্রতিপাদ্য।

তা হলে, সৃষ্টিচৈতন্যের নব-নব-উন্মেষশালিনী শক্তিকে মার্ক্‌স্‌বাদে স্বীকার করা হয়। বাস্তবে যা আছে, যুগ-পরিবেশে যা আছে, সৃজনী প্রতিভা তার ফটোগ্রাফ বা প্রতিফলন মাত্র নয়, শুধু পুরাতনের বা শুধু বর্তমানের পুনরাবৃত্তি নয়, বর্তমানের যুগ-পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখেও সৃষ্টিচৈতন্য নিত্য নবীনের, ভবিষ্যতের নবরূপের অনুধ্যান করে। মার্ক্‌সের দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদকে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যথার্থ

১৮। Engels 'Selected Correspondence', (Letter to G Block, 21 Sept, 1890), p 475

একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্ব যিনি প্রথম গড়ে তুলেছিলেন,[১৯] সেই কড্ওয়েল্ (Caudwell) নিজেই বলেছেন:

"The artist is continually besieged by new feelings as yet unformulated, he continually attempts to grasp beauties and emotions yet unknown; a tension between tradition and experience is constantly felt in his heart. Just as the scientist is the explorer of new realms of outer reality, the artist continually discovers new kingdoms of the heart. Both therefore are explorers, and necessarily therefore share a certain loneliness. But if they are individualists, it is not because they are non-social, but precisely because they are performing a social task. They are non-social only in this sense, that they are engaged in dragging into social world realms at present non-social and must therefore have foot in both worlds."[২০]

স্রষ্টা নতুনকে ধারণ করেন বলেই তাঁর হৃদয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব নিত্য চলতে থাকে। এক দিক দিয়ে তিনি সমাজ থেকে স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তি সত্তা, কারণ তিনি সমাজের দর্পণ মাত্র নন, সমাজে যা নেই, সমসাময়িক যুগ-পরিবেশে যা নেই, সেই নব-নবীনকে তিনি তাঁর হৃদয়লোকে ধারণ করে সমাজে তাকে প্রকাশ করেন, হৃদয়-কক্ষ থেকে বাইরে তাকে মুক্তি দেন। একদিকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যুগগত বাস্তব পরিবেশের অধীন, পুরাতনের অনুবর্তনকারী। অন্যদিকে সমাজের দু'একজন পুরোধা কবি ও নবীর মুক্ত-চৈতন্যে নতুনের আবির্ভাব। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলে। কবি ও নবীর ধ্যান-লব্ধ এই নবসত্যকে লাভ করে আমাদের সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলে। সুতরাং যুগ-পরিবেশ যেমন সৃষ্টিচৈতন্যে ছায়া ফেলে, সৃষ্টিচৈতন্যও তেমনি যুগ-পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে, পরিবর্তিত করে।[২১] সুতরাং মার্ক্সবাদের মতেও সভ্যতার অগ্রগতি মানে পরিবেশের উপরে সৃষ্টিচৈতন্যের ক্রমে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ। তা হলে মার্ক্সবাদে যদি একথা স্বীকার করা হয় যে, মানবসভ্যতা ক্রমোন্নতির দিকে যাচ্ছে, তা হলে পক্ষান্তরে একথাও স্বীকার করা হয় যে, পরিবেশের

১৯। মার্ক্সের রচনায় শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে মোটামুটি খসড়া পাওয়া গেলেও এবিষয়ে কার্ল্ মার্ক্স্ কোনো সুসংহত পূর্ণায়ত দর্শন (theory) রচনা করে যান নি। সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মতামত ও পত্রাবলী সম্বল করে তাঁর দর্শনানুযায়ী একটি সাহিত্যতত্ত্ব যাঁরা উত্তরকালে গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে এইজন্যে কিছু কিছু মতভেদও দেখা যায়। তবু কড্ওয়েল্কে এ বিষয়ে মোটামুটি প্রথম প্রামাণিক ভাষ্যকার বলে ধরা হয়।

২০। Caudwell, Christopher "Further Studies in a Dying Culture", London, 1949, p 109

২১। কড্ওয়েল্ নবীনের সৃষ্টিতে ও সমাজপরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সৃজনীপ্রতিভার যে এতখানি ক্ষমতা স্বীকার করেছেন তার সঙ্গে রোমান্টিক যুগের ভাববাদী সাহিত্য-সমালোচকদের অনেকখান সাদৃশ্য আছে। তাই একজন তথাকথিত মার্ক্সবাদী (বস্তুত যান্ত্রিক জড়বাদী) সমালোচক J. D Bergal ব্যঙ্গ করে বলেছেন—কড্ওয়েলের তত্ত্বগুলি are those of contemporary bourgeous scientific philosophy. ... and not those of Marxism 'Modern Quarterly', New Series, Vol 6 No. 4, Autumn, 1951, p. 346 কিন্তু বলা বাহুল্য এই ব্যঙ্গের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

উপরে, জড়ের উপরে, আমাদের সৃষ্টিচৈতন্য অধিকতর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করছে।

মানববুদ্ধি বা ব্যক্তিচৈতন্য কেমন করে জড়ের তথা পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তার ওপরে প্রভুত্ব স্থাপন করছে সেকথাও মার্ক্স্‌বাদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বিবর্তনের বিশেষ স্তরে এসে যখন মনের বিকাশ হল, তখন মনের মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে দেখা দিল। মনের এই বিশেষ ক্ষমতাই মানসিকতার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য (differentia)। এই জন্যেই মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে গেল জড় থেকে—অন্যান্য প্রাণী থেকে। মন নিজে জড়নির্মিতই হোক, বা চৈতন্যমাত্রই হোক, তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে আছে তা মার্ক্স্‌বাদীও স্বীকার করেছেন। সেই বিশেষ ক্ষমতাটি হল জ্ঞানলাভের ক্ষমতা, বিশ্ববিধানের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষমতা, ভবিষ্যতের অনুধ্যানের ক্ষমতা, এবং লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি ও পরিবেশকে জয় করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা। মনের সাহায্যে বিশ্বরাজ্যের জ্ঞান মানুষ যতই করায়ত্ত করতে পারল ততই চাইল প্রকৃতিকে বশীভূত করতে, প্রকৃতির ঘরের রহস্যভেদ করে তাকে নিজের অধীন করতে। বিশ্বের বিধান যখন সে আবিষ্কার করল, তখন তার সৃষ্টিচৈতন্য সেই বিশ্ববিধানেরই সহায়তায় আপন আদর্শানুযায়ী জগৎ সৃষ্টি করতে চাইল। যে সমস্ত কারণে মানবসত্তা জড় জগতের অধীন তা মানুষ যখন উদ্‌ঘাটন করল, তখন জড়ের বিধান থেকে, পরিবেশের দাসত্ব থেকে, আত্মমুক্তি সাধনের উপায় আবিষ্কার করল। ব্যাধির কারণ যখন সে জানল, ব্যাধিমুক্তির কৌশলও সে তখন লাভ করল। মার্ক্স্‌বাদ বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিজ্ঞানের নির্দেশে মার্ক্স্‌বাদকে স্বীকার করতে হল পরিবেশের প্রভাব এবং জড়ের দাসত্ব থেকে ব্যক্তি ও ব্যক্তিচৈতন্য মুক্তিলাভ করতে পারে, অবশ্য সে মুক্তি প্রাকৃতিক বিধানের জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত:

'Freedom therefore consists of the control over ourselves and over external nature which is founded on the knowledge of natural necessity".[২২]

সুতরাং পূর্বে যে বলা হয়েছে, বিশেষ-বিশেষ সামাজিক পরিবেশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিশেষ-বিশেষ নতুন কল্পনার জন্ম হয়, সেই সিদ্ধান্তের একটি গভীর তাৎপর্য আছে। উক্ত সিদ্ধান্তের আপাত অর্থটি যেন আমাদের বিভ্রান্ত না করে, এবং কোন্ সমাজ পরিবেশে মানব মন কি রকমের কল্পনার জন্ম দেবে তার যেন কোনো সুলভ যান্ত্রিক সূত্র আমরা রচনা না করি। কারণ, প্রথমত একই সমাজ-পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন মন ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিক্রিয়া করতে পারে—কেউ বিপর্যস্ত সমাজ-পরিবেশ দেখে তা থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিতে পারে, কেউ একটি সংগঠনশীল আদর্শ নিয়ে সেই পরিবেশকে সংশোধন করতে পারে, আবার কেউ যুগের বিপর্যয়ের হাতে বিহ্বলভাবে আত্মসমর্পণ করে সেই বিপর্যয়কে যথাযথ অনুসরণ করতে পারে। যুগ বিকৃত অসুন্দর হলেই যে প্রতিভার সৃষ্টিও তার হুবহু প্রতিফলন মাত্র হবে, এবং তাতে কোনো সংগঠনাত্মক আদর্শবাদী স্বপ্ন থাকবে না, এমন সিদ্ধান্ত মার্ক্স্‌বাদের নয়। এঙ্গেল্‌স্ নিজেই দেখিয়েছেন, বিপর্যস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেও অন্তত প্রথম যৌবনে গ্যেটে ও শিলার একটি

২২। Engels' 'Anti-Durhing', Part I, ch 2

আদর্শবাদী আশাবাদী স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তাঁদের সৃষ্টিতে, অর্থাৎ প্রতিভার স্রোত যুগস্রোতের উজানেও বইতে পারে।[২৩] এ থেকেই প্রমাণ হয় সাহিত্যিকের প্রতিভা যুগপ্রভাব তথা সমাজ-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে এবং সাহিত্যিকের মন মূলত ব্যক্তিমন। তাই বিশেষজ্ঞ সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন—"সাহিত্য মূলতঃ দলছুট ব্যাপার, দল বেঁধে ভালো মন্দ অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু রসসৃষ্টি যার মূল লক্ষ্য তা কোনো দিনই দল বেঁধে হয় নি।"[২৪] কারণ সাহিত্য সমষ্টিমনের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তিমনের সৃষ্টি। সাহিত্য ব্যক্তিমনের সৃষ্টি বলেই জার্মানীতে যখন সমষ্টি-মন অবক্ষয়ের কবলে তখন গ্যেটে ও শিলারের সৃষ্টিচৈতন্য অবক্ষয়ের প্রভাবে না পড়ে আশার আলো জ্বেলে রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির নিয়মাবলীর জ্ঞান আমাদের যতই সঠিক হবে, ততই তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে আমাদের আত্মমুক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ক্রমশ জড়দেহের ও জড়পরিবেশের প্রভাব থেকে আমাদের মনকে আমরা মুক্ত করছি, এবং জড়ের বা দেহের দাবীর উপরে মনের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করছি এই তো আমাদের মানব-প্রগতির তাৎপর্য'।[২৫]

এ পর্যন্ত জড়বাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল, তা থেকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত সূত্রগুলি রচনা করতে পারি :

১। জড়বাদী জড়জগতের, বাস্তব পরিবেশের, অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (বস্তুত জড়বাদীর কাছে বস্তু বা জড়ের অস্তিত্বই প্রধান। সুতরাং তার কাছ থেকে বাস্তব পরিবেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায়ের কোনো প্রশ্ন তোলাই অবান্তর।)

২। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বা বৈজ্ঞানিক জড়বাদ সৃষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়া-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে। (চরমপন্থী জড়বাদ অর্থাৎ যান্ত্রিক জড়বাদ এ যুগে অস্বীকৃত হয়েছে, অন্তত সৃজনমূলক সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই যান্ত্রিক জড়বাদের কোনো স্বীকৃতি নেই। সুতরাং এযুগে নব্যপন্থী দ্বান্দ্বিক জড়বাদই গৃহীত হয়েছে। তাই সৃষ্টিচৈতন্যের সম্পর্কে এখানে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের মতই আলোচিত হয়েছে।)

৩। এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদের মতে ব্যক্তির সৃষ্টিচৈতন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে, এবং পরিবেশের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে পারে। সুতরাং সৃষ্টিচৈতন্য শুধু জড়-পরিবেশের দাস বা প্রতিফলন মাত্র নয়, পরিবেশকে বদলাবার ক্ষমতাও তার আছে।

২৩। "সবকিছুই জরাজীর্ণ-ধ্বংসে হবে কি হচ্ছে; কল্যাণকর পরিবর্তনের এতটুকুও আশা নেই; তখন জার্মানীতে আশার আলোক জ্বালিয়ে রেখেছিল একমাত্র তার সাহিত্য।......কবি গ্যেটে এবং শিলার.....এঁদের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থেই অভিব্যক্তি পেয়েছিলো তৎকালীন জার্মান সমাজের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও বিদ্রোহ।"- শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন', কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ১৯-২০।

২৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার : সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ' (২য় খণ্ড) ১৯৮০, পৃঃ ১৫৯।

২৫। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে নির্ভর করেই বার্নার্ড শ' মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ পরিণতি অতিমানবতায় দেখেছিলেন : 'Show Suggests that a real conquest is the conquest of the self, which mean the triumph of the will over passions ..it is no wonder, therefore, that in his superman dramas we have portraits of heroes who have genius and self-control "- Sengupta, Dr. S C ; 'The Art of Bernard Shaw', Calcutta 4th, ed 1960, P.109'

পাঁচ

সিদ্ধান্তের দিকে

এতক্ষণ যে বিভিন্ন মতবাদের কথা আলোচনা করা হল তার কোনো তাৎপর্যই থাকত না যদি শুধু এদের বিবৃতি দেওয়া আমাদের লক্ষ্য হতো। মতবাদগুলির ব্যাখ্যার দ্বারা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলির নিরসন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সাহিত্য-সৃষ্টির স্বধর্ম রক্ষা করতে হলে যে ভ্রান্তি দূর করা দরকার, মতবাদগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা যতই করে এসেছি, ততই দেখেছি মতবাদগুলি ক্রমবিকাশের ফলে নিজেরাই নিজেদের ভুল ক্রমশ সংশোধন করে এসেছে। সর্বপ্রথমে আমরা যে চরমপন্থী ভাববাদেব (Subjective Idealism) কথা বলেছি, তাতে দেখেছি যে, এই মতবাদে যে ত্রুটি ছিল তা সংশোধন করলে বস্তুগত ভাববাদে (Objective Idealism) আপনিই চলে আসতে হয়। যেমন, চরম ভাববাদে বাস্তব পরিবেশকে মনের কল্পনা বা ভ্রান্ত মায়া বলা হয়েছে, বস্তুজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। স্পষ্টত বোঝা যায় এই মতবাদে জীবনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, অথচ জীবন লীলাকে অস্বীকার করলে সাহিত্য সৃষ্টিই অসম্ভব হযে যায়। জগৎ ও জীবনের এই স্বীকৃতি দিয়ে যে নতুন ভাববাদ খাড়া হল তারই নাম দেবো বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealism)। পক্ষান্তরে জড়বাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, যান্ত্রিক জড়বাদকে স্বীকাব করলে সৃষ্টিচৈতন্যকে অস্বীকার করা হয়। সাহিত্য থেকে সৃজনী-প্রতিভার সংযোজনটুকু বাদ দিলে সাহিত্য হবে জীবনের আরশি মাত্র। অর্থাৎ সাহিত্য স্বধর্মভ্রষ্ট হবে। সাহিত্যকে স্বধর্মে রাখতে হলে সৃজনীপ্রতিভাকে স্বীকার করতে হবে। এবং জড়বাদে মানব-মনের এই সৃজনীশক্তিকে স্বীকৃতি দিলে যে নতুন মতবাদের জন্ম হবে তাকে আমরা বলতে পারি দ্বান্দ্বিক জড়বাদ।

এইভাবে এই মতবাদগুলির নিজস্ব যাথার্থ্য বিচার কবা আমাদের লক্ষ্য নয়, সাহিত্য সৃষ্টিকে স্বীকৃতি জানাতে হলে কোন্ মতবাদ যুক্তিসিদ্ধ ও সমঞ্জস (consistent), সেইটিই আমাদের অনুসন্ধেয়। অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টির স্বধর্মকে স্বীকার করতে হলে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন, তাই আমরা বিচার করার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত দেখেছি বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealism) এবং দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (Dialectical Materialism)—দুইয়েই সাহিত্যকে স্বধর্মে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই দুই মতবাদে একটি মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এদের একাধিক সাদৃশ্যভূমি রয়েছে। দুইয়ের পার্থক্যটি হল জগৎ-সৃষ্টির উৎস নিয়ে। ভাববাদী বলবেন, জগতের সৃষ্টি একটি মহাভাব বা বিশ্বচৈতন্য থেকে। জড়বাদী বলবেন, জগতের সৃষ্টি জড় থেকে। এখন, এই দুইয়ের মধ্যে কার সিদ্ধান্ত সত্য তা আমাদের আলোচ্য নয়। কারণ সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য অনুধ্যানে ঐ সমস্যাটির সমাধান অনাবশ্যক। যেখানে এই দুই মতবাদের মিল আছে সেইখানেই আমাদের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর। সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে চাই একদিকে জগৎ ও জীবন, অন্যদিকে সৃষ্টিচৈতন্য সৃজনীপ্রতিভা। এই দুইয়ের স্বীকৃতি উপরি উক্ত এই দুই

মতবাদেই রয়েছে। এইখানেই এই দুই মতবাদের সাদৃশ্যবিন্দু। এবং এইটুকু স্বীকৃতি নিয়েই সাহিত্য-স্রষ্টা পরিতৃপ্ত। বাস্তব জগৎ ও সৃষ্টিচৈতন্য—এই দুইয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টির জন্ম আগে, কোন্‌টি থেকে কোন্‌টির জন্ম সেই আত্যন্তিক জিজ্ঞাসা সাহিত্য-তাত্ত্বিকের কাজ নয়।

এ ছাড়া দুই মতবাদেই বলা হচ্ছে যে, বিবর্তনের ফলে ব্যক্তিচৈতন্য ক্রমশ পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে। ব্যক্তি-চৈতন্যের মধ্যে যে নব-নবীনের ধ্যানরূপ ধরা পড়ে তা পরিবেশের মধ্যে ক্রমে আত্মপ্রকাশ সাধন করে পরিবেশকে প্রগতির পথে নিয়ে চলে। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, মুক্ত-চৈতন্য মাত্রেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। বিবর্তনের ফলে ব্যক্তি-চৈতন্য বিশেষ পরিবেশের ভিত্তির ওপরে থেকেই ক্রমিক মুক্তি লাভ করে এবং মুক্ত-চৈতন্যও তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনেব উপাদান হিসাবে পারবেশের চিত্র গ্রহণ করে। সেটা পরিবেশের কাছে সৃষ্টিচৈতন্যের দাসত্বেব ফল নয়, সেটা শিল্পসৃষ্টির জন্যেই স্রষ্টার স্বাধীন দায়িত্ব বরণ। শিল্পসৃষ্টির জন্যে স্রষ্টার মনের মুক্তি যেমন অপরিহার্য, তেমনি জীবন পরিবেশের কাছে তাঁব এই দায়িত্ববোধও অনস্বীকার্য।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে। ওপরে পরিবেশের প্রভাব থেকে ব্যক্তিচৈতন্যের মুক্তির যে সম্ভাব্যতাব কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, ব্যক্তিচৈতন্যমাত্রেই পবিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং প্রথমাবস্থাই মুক্ত। জাতি হিসাবে মানষের বিবর্তন যেমন অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে, তেমনি ব্যক্তি তার বিবর্তনে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে চেতনাব স্তরের পার্থক্য এনে দিয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তিব সত্তা বিবর্তনের ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে আছে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ সাধারণত যে স্তরে বিরাজ করে সেখানে চেতনার মুক্তি ও পরিবেশের উপরে সৃজনীচেতনার নিয়ন্ত্রণ সুলভ নয়। সেইজন্যে অধিকাংশ মানুষ অতীত ও বর্তমানকে ধারণ করে যুগ-পরিবেশের অধীন হয়ে থাকে এদের দ্বারা গঠিত যে সমাজ তাতেই যখন বলিষ্ঠ দুই-একটি প্রতিভার জন্ম হয় তখন সেই প্রতিভা যতদিন না আত্মসচেতন হচ্ছে, মুক্ত হচ্ছে, ততদিন তার যুগ-পরিবেশই তাকে গড়ে তোলে। এই অর্থে এবং এই বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রতিভার সৃষ্টির ভিত্তি যেন নির্মিত হয় যুগ-পরিবেশের দ্বারা। বিশেষ যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো এই অর্থে প্রতিভার ভিত্তি নির্মাণ করে। বিশেষ যুগের সমাজপরিবেশ এইভাবে প্রতিভাকে স্তন্য দান করে। সুতরাং এই যুগ-পরিবেশের উপরে প্রতিভার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য খানিকটা নির্ভর করে। কিন্তু প্রতিভা যখন সাবালকত্বে উপনীত হয়, তখন যুগ-পরিবেশের অনায়াসলভ্য স্তন্যধারা ত্যাগ করে আপন খাদ্য আপনার সচেতন প্রযাসের দ্বারা নির্বাচন করে এবং আপন লক্ষ্য অনুসারে আপনার গতিপ্রকৃতি গড়ে তোলে। অর্থাৎ ব্যক্তি ক্রমে যুগ-পরিবেশের ওপরে অচেতন নির্ভরতা ছেড়ে সচেতন হয়ে উঠে। এ হল মনোবিজ্ঞানেরই একটি স্বীকৃত সত্য। একজন সমাজ-মনোবিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

"It is important to note especially in view of the analogy to be drawn between the individual will and the. . .collective or general will, that the

development of self-consciousness and of the self-regarding sentiment renders the behaviour of the individual progressively less dependent upon his environment, that it involves a continuous advance from actions of the type of immediate response to the impressions made on the sense-organs and an appoximation towards complete self-determination, towards conduct that is the issue of conditions wholly organised within the constitution of the mind Like the evolution of mind in race, this advance involves also a progress from predominantly mechanical, to the predominantly teleological determination"[২৬]

একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত যুগের পরিবেশ ব্যক্তিচৈতন্যের ওপরে যথেচ্ছ প্রভাব ফেলে যায়, ব্যক্তি বিশেষ যুগের আচার-আচরণ, শিক্ষা সংস্কার, প্রচলিত মূল্যবোধ গ্রহণ করে অনুসরণ করে যায়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিত্বের এই নাবালকত্বে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় দু'একটি প্রতিভা একটা বিশেষ স্তরে এসে আত্মসচেতন হয়ে উঠে, সমাজেব গতানুগতিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতির যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। সমাজেব প্রচলিত ধারা বা যুগের বর্তমান পরিবেশেব সঙ্গে তার সংঘর্ষ উপস্থিত হয। তখন পরিবেশ আনুকূল্যের দ্বারা নয়, প্রতিকূলতার দ্বারাই তাব ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে। কখনো কখনো অনুকূল পরিবেশ যেমন ব্যক্তিত্বের গঠন সাধন করে, প্রতিকূল পরিবেশও ব্যক্তিত্বের গঠনে তেমনি ক্রিয়া করে। এবং সমাজেব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ব্যক্তিব অন্তর্নিহিত অনেক সুপ্ত গুপ্ত সম্ভাবনাব আত্মপ্রকাশ ঘটে। টি.এস.এলিয়ট্ আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই সত্যটি খুব ভাল কবে উপলব্ধি করেছিলেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

"It is not necessarily those lands which are the most fertile or most favoured in climate that seem to me the happiest, but those in which a long struggle of adaptation between man and his environment has brought out the best qualities of both, in which the landscape has been moulded by numerous generations of one race, in which the landscape in turn has modified the race to its own character"[২৭]

ব্যক্তির সঙ্গে শুধু ভূ-প্রকৃতির সম্পর্ক প্রসঙ্গেই একথা সত্য নয়, ব্যক্তির সঙ্গে যে কোনো রকমের পরিবেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গেও একথা সমান সত্য। পরিবেশ যেমন ব্যক্তিচৈতন্য গড়ে তোলে, ব্যক্তিচৈতন্য তেমনি পরিবেশকে গড়ে তোলে। এবং এই লেন-দেন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিচৈতন্য পরিবেশের উপরে ক্রমে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে। এই হল ব্যক্তিচৈতন্যের বিকাশেব ধারা। এভাবে প্রতিভাব ব্যক্তিত্ব যখন আত্মস্বাতন্ত্র্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখনই তার ভাবাদর্শে সমাজে বিপ্লব

২৬। William, McDoughall 'Social Psychology', London Methuen & Co 1950 30th, ed pp 225-226

২৭। T S Eliot

আসে, সমাজের আমূল রূপান্তর (metamorphosis) সাধিত হয়। এ মতবাদকে শুধু ভাববাদ বা জড়বাদ বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। এ হল সমাজ-বিবর্তনেরই একটি মূলমন্ত্র। ব্যক্তিই সে সমাজের রূপ বদলে দেয় অর্থাৎ ব্যক্তিচৈতন্যের স্পৃহা-এষণা, ধ্যান ধারণা অনুসারেই যে সামাজিক কাঠামো রচিত বা পরিবর্তিত হয়, সে কথা দুজন প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিজ্ঞানীর প্রামাণিক সিদ্ধান্ত থেকেও সমর্থিত হতে পারে। তাঁরা বলেছেন :

"a system of social relationship grows and changes in accordance with the changing attitudes and interests of its members, of some or all of the units or individuals who compose it Here the system derives its significance from its support of and contribution to the ends–the purpose–of individuals themselves."[২৮]

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি ভাববাদের তো কথাই নেই, মার্কসীয় জড়বাদেও সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। মার্কসবাদী স্বীকার করেছেন এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যেও আমরা পেয়েছি যে, দু'একটি ব্যক্তির ভাবাদর্শই যুগের পরিবেশে উজান বইয়ে দেয়, ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

এযাবৎ যে বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা আলোচনা করেছি তদনুযায়ী যুগ পরিবেশের ওপরে সৃষ্টিচৈতন্যের এই বৈপ্লবিক প্রভাবকে স্বীকার করা প্রাচীন বা অপ্রচলিত কোনো দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হবে না। বরং এতেই রয়েছে আধুনিকতার স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে যা বলেছিলেন তাতে এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। তিনি বলেছিলেন :

"All great human movements in the world are related to some great ideal Some of you may say that such a doctrine of spirit has been in its death-throes for over a century and is now moribund, that we have nothing to rely upon but external forces and material foundations But I say, on my part, that your doctrine was absolate long ago It was exploded in the spring-time of life, when mere size was swept off the face of the world, and was replaced by man brought naked into to the heart of creation, man with his helpless body, but with his indomitable mind and spirit."[২৯]

পরিবেশের উপরে ব্যক্তিচৈতন্যের নিয়ন্ত্রণ-শক্তির জয়-ঘোষণার অর্থ হল প্রকৃতির ওপরে পুরুষকারের জয়-ঘোষণা। এতে তো কোনো আদিম মানুষের অলৌকিকতা বা রহস্যপ্রিয়তা নেই। এতে রয়েছে মানুষেরই জয়-ঘোষণা, অতএব আধুনিকতম জীবনচেতনা। মানুষকে যে প্রকৃতি ও পরিবেশের দাস মনে করে, ব্যক্তিচৈতন্যকে শুধুমাত্র স্থূল অবয়বের অধীন মনে করে, বুঝতে হবে সে-ই আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত নয়, মানব-মনীষার

২৮। Maciver, R M and Page Charles H 'Society', London, MacMillan & Co Ltd, 1959, pp 49-50

২৯। Tagore, Rabindranath 'The Religion of an Artist'

তথা বিজ্ঞানের—জয়যাত্রার কথা সে জানে না, সে পড়ে আছে আদিম দিনের সৃষ্টির অন্ধকারে—যখন মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের পুতুল, জীবচৈতন্য ছিল বিপুলায়তন কলেবরের মধ্যে একটি ক্ষীণ আলোক-শিখা মাত্র। কিন্তু আজকের মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা যা লাভ করেছে, তা হল তার চৈতন্যেরই বিজয়-চিহ্ন, মননশীল মানুষের মনের এই বিজয়িনী শক্তির স্বীকৃতিতেই রয়েছে আধুনিকতার সার্থক পরিচয়।

সুতরাং ব্যক্তিচৈতন্য শুধুমাত্র পরিবেশের ফটোগ্রাফ গ্রহণের যন্ত্র এবং পরিবেশের দাস, কিংবা ব্যক্তিচৈতন্যই একচ্ছত্র সার্বভৌম শক্তি এবং সমাজ-পরিবেশ তার অধীন নিষ্ক্রিয় প্রকৃতি মাত্র—এই দুই চরম সিদ্ধান্তের কোনোটিই পূর্ণ সত্য নয়। ব্যক্তিচৈতন্যের ক্রমিক মুক্তি ও পূর্ণতা লাভের জন্যে তার বিবর্তনের লীলাক্ষেত্ররূপে সমাজ-পরিবেশের উপযোগিতা অপরিহার্য; আবার সমাজ-পরিবেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান অনস্বীকার্য। ব্যক্তিচৈতন্য ও সমাজ-পরিবেশ এই দুইয়ের প্রগতি ও পূর্ণতার জন্যে এদের উভয়েরই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। এটুকু ভাববাদ ও জড়বাদের নরমপন্থীরা স্বীকার করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে পার্থক্য শুধু ব্যক্তিচৈতন্য ও সমাজ-পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি আগে সেই প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু সে প্রশ্ন আমাদের পক্ষে অবান্তর। সাহিত্যিকের পক্ষে, সমালোচকের পক্ষে দুইয়ের অস্তিত্বের ও পারস্পরিক ক্রিয়ার স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং ডিম আগে না মুরগী আগে তা না জেনেও আমরা সমাজ-বিজ্ঞানীর সমর্থন নিয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারি :

"Society in its full sense. . . .is never an entity separable from the individuals who compose it. No individual can arrive at the threshold of his potentialities without a culture in which he participates. Conversely, no civilization has in it any element which in the last analysis is not the contribution of an individual."[৩০]

এবারে আমাদের সিদ্ধান্তকে আমরা সূত্রাকারে উপস্থাপিত করতে পারি। সূত্রবদ্ধ করলে আমাদের সমগ্র আলোচনার নিষ্কর্ষ দাঁড়ায় এই রকম :

(১) পরিবেশের নিজস্ব বাস্তব অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ পরিবেশ শুধুমাত্র আমাদের মনের কল্পনা বা মায়া নয়। (জড়বাদী তো একথা স্বীকার করেনই, নব্যপন্থী বস্তুগত ভাববাদীও একথা স্বীকার করেছেন।)

(২) সৃষ্টিচৈতন্যের নিজস্ব ক্রিয়া-স্বাতন্ত্র্য আছে অর্থাৎ তা পরিবেশের প্রতিচ্ছবিমাত্র নয়। পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মন নতুন সৃষ্টি করতে পারে। (ভাববাদী তো একথা স্বীকার করেনই, দ্বান্দ্বিক জড়বাদী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জড়বাদীও একথা স্বীকার করেছেন।)

(৩) জগতের বিবর্তনের বিশেষ এক স্তরে এসে মন বা ব্যক্তিচৈতন্য জড়ের বা দেহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হচ্ছে ও হয়েছে।

৩০। Benedict, Dr. Ruth : 'Patterns of Culture'. London, 1935. p. 253

(৪) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মনের মুক্তির তারতম্য আছে। সেজন্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সৃষ্টিচৈতন্যের ওপরে পরিবেশের প্রভাবেরও মাত্রাভেদ হতে পারে। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তি স্বীয় সত্তার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে আছে।

(৫) যে ব্যক্তিচৈতন্য পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত সেও তার নতুন সৃষ্টিতে পরিবেশের চিত্র তথা সমাজের উপাদান গ্রহণ করতে পারে, এবং শিল্পসৃষ্টির জন্যে তা অপরিহার্যও। এটা পরিবেশের কাছে মনের দাসত্ব নয়, দায়িত্বের পরিচয় বহন করে। কারণ মুক্ত মন যে শিল্প সাহিত্য রচনা করে তার উপজীব্য তো জীবনই, জীবনের ওপরে ভিত্তি করেই তো কল্পনার সৌধ রচিত হয়। স্রষ্টার মুক্তচৈতন্য যে নতুনের কল্পনা করে সেই নতুনও বর্তমানের জগতেই প্রবেশ করে তাকে রূপান্তরিত করে। লীলা মানেই যা হবে এবং যা আছে তাদের লেন দেন, সংঘর্ষ ও সম্মিলন। এক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, সমাজ পরিবেশের চিত্রের সঙ্গে নতুনের কল্পনার মিশ্রণের অনুপাত ব্যক্তির মানস বৈশিষ্ট্যের ওপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে এই মিশ্রণের মাত্রাভেদ হয়ে থাকে এবং এ সম্পর্কে কোনো সর্বজন প্রযোজ্য একটি মাত্র বিধান রচনা করা যায় না।

(৬) শিল্পস্রষ্টার সৃষ্টিতে যেটুকু লেখকের কল্পনা নয়, পরিবেশের প্রতিফলন, সেটুকুতে সমসাময়িক যুগের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হয়। সেইখানেই প্রত্যেক যুগে সেই যুগের লেখকের আধুনিকতার পরিচয়।

(৭) যেহেতু সৃষ্টিচৈতন্য পরিবেশের প্রভাব থেকে অংশত বা পূর্ণত মুক্ত হতে পারে, সেহেতু পরিবেশের যে ব্যাখ্যা সৃষ্টিচৈতন্য দেবে তা সব সময় যুগের সাধারণ চিন্তাধারার সঙ্গে সুর না ও মেলাতে পারে। তবু লেখককে যুগের বিশেষ চিন্তাধারার সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। এই সচেতনতাতেই লেখকের আধুনিকতা। লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন যুগের সাধারণ প্রবণতা থেকে স্বাতন্ত্র্য রাখতে পারে, এবং তা রাখে বলেই লেখকের জীবনদর্শন যুগপ্রবাহে অভিনব চিন্তা-স্রোত এনে বিপ্লব এনে দিতে পারে এবং দেয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যুগের ধর্মটি লেখকের চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার।

(৮) যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টিতে যুগ-সচেতনতা চাই এবং থাকে, সেহেতু কোনো যুগের সাহিত্য বুঝতে হলে সেই যুগের পরিবেশটি জানা প্রয়োজন। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই পরিবেশেই সৃষ্টি-রহস্যের সামগ্রিক ব্যাখ্যা নেই

২. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক

আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় :

Consciousness is what it is not, and consciousness is not what it is— চেতনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন অস্তিত্ববাদী বলেছেন এই রকম একটি কথা; এর অনুসরণে আমরা যদি 'আধুনিকতা'-র সংজ্ঞা রচনা করি—Modernism is what it is not, and modernism is not what it is—তা হলে সে কথাটার অর্থ আমরা এই করতে পারি যে, চেতনার মতো আধুনিকতা ব্যাপারটাও অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে; তার কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ আধুনিকতা কোনো একটি স্থির ধারণা নয়, আধুনিকতা একটি প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক পর্ব। শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, তারই আলোকে বরং বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক : শিল্পসৃষ্টির জন্যে কল্পনার সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। অবশ্য পরিবেশ সম্পর্কে স্রষ্টার সচেতনতাকে পরিবেশের কাছে তাঁর সৃষ্টিচেতনার দাসত্ব না বলে বলতে হবে মহৎ দায়িত্ববোধ। আবার যুগ-পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থেকেও সৃষ্টিচৈতন্য তার দাসত্ব থেকে অংশত বা পূর্ণত মুক্ত বলে একই পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন স্রষ্টার চৈত্তিক প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হতে পাবে। সমসাময়িক যুগের পরিবেশ সম্পর্কে সৃষ্টিচৈতন্যের এই প্রতিক্রিয়াকে মোটামুটি দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখি—যুগের চিন্তাধারার অনুকূলে ও প্রতিকূলে। সাধারণ ধারণা হল এই যে, কোনো যুগের চিন্তাধারার অনুকূলে লেখকের জীবনদর্শন ও কল্পনা যদি প্রবাহিত হয় তবেই আমরা সেই যুগে তাঁকে আধুনিক লেখক বলবো। কিন্তু কোনো যুগের সাধারণ চিন্তাধারার সঙ্গে শুধু সুর মেলালেই অর্থাৎ সেই যুগে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রবণতাগুলিকে সমর্থন করলেই কোনো প্রতিভাকে আধুনিক বলা যায় না। যুগ-স্রোতের উজানেও বিশেষ ব্যক্তির চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হতে পারে। লেখক যুগ-সমর্থক নন বলেই তাঁকে আধুনিক বলব না, এমন নয়। যুগ-সমর্থক না হয়ে যুগ-প্রবর্তকও হতে পারেন কোনো লেখক। বস্তুত প্রয়োজন যুগ-সচেতনতা। আর যুগ-সচেতনতা ও যুগ-সমর্থন এক জিনিস নয়। আধুনিকতা হলো আধুনিক জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, তার দাসত্ব নয়। আধুনিক যুগ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের সৃষ্টিচৈতন্যের প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক না কেন, তাঁর যুগের সমস্যা তাঁকে যদি স্পর্শ করে, তাঁর যুগের ধর্ম ও স্বরূপ সম্পর্কে তিনি যদি সচেতন থাকেন, তবেই তিনি তাঁর যুগে আধুনিক। একালে সাধারণ প্রবণতা যদি নাস্তিকতা হয়, নাস্তিকতাই যদি প্রবল হয়,

তবে লেখকের সৃষ্টিতে সেই নাস্তিকতা সম্পর্কে সচেতনতা চাই, তবেই তাঁকে আধুনিক বলব। কিন্তু সেই লেখককেও নাস্তিকতার সমর্থক হতে হবে, এমন নয়। সেই জন্যে তারাশঙ্কর ও টি. এস. এলিয়ট্ ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও আধুনিক, যদিও আধুনিক যুগে ধর্মে অবিশ্বাস মোটামুটি সাধারণ প্রবণতা। এঁরা আধুনিক, কারণ নিজেদের যুগের প্রবণতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন, যুগের জিজ্ঞাসা ও সংশয় এঁদেরও স্পর্শ করেছে। এইজন্যে যুগ-প্রবণতাকে এঁরা শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে সাধারণ যুগ-প্রবণতার প্রতিকূল একটি জীবন-প্রত্যয় লাভ করলেও এঁরা আধুনিক।

ঔপন্যাসিককে আধুনিক হতে হলে তাঁকে যে শুধু বর্তমানের যুগ-পরিবেশের ধারকই হতে হবে, তাঁর শিল্পী-চৈতন্য হবে শুধু বহির্জগতের প্রতিফলনের যন্ত্র, এমন নয়। তিনি ভবিষ্যতের স্রষ্টাও হতে পারেন, তাঁর অন্তর্লোক নতুনের জন্মদাতাও হতে পারে। বর্তমান যুগ পরিবেশের, অতিরিক্ত কিছুও তাঁর ধ্যানলোকে জন্মলাভ করতে পারে। এতে তাঁর আধুনিকতার বা বাস্তবতার ক্ষতি হয় না। কল্লোল-গোষ্ঠীও একথা স্বীকার করেছিলেন :

"গদ্যে বা পদ্যে যিনি যাহা লেখেন তাহাই কবির কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। তিনি শব্দে যাহা সৃষ্টি করিয়া যান, হয়ত শতাব্দীর পর তাহা মানুষের জীবন-ধারায় প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কবি, চিত্রকর ও শিল্পী মানবজাতিকে যে কোনও পথে চালিত করিতে পারেন। লেখকের সেজন্য যথেষ্ট দায়িত্ব অনুভব করা প্রয়োজন।"[১]

স্পষ্ট বোঝা যায়, যে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীকে সাধারণত আমরা উপন্যাসে ব্যাপকভাবে আধুনিকতার প্রবর্তক বলে ধরে থাকি সেই গোষ্ঠীর সকলে যুগ-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়াকেই আধুনিকতা মনে করেন নি। তাঁদের উপন্যাসে যুগগত যে বিকৃতি ও অবক্ষয়ের চিত্র আছে, সেটা যুগকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্যে, জীবনচিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সকলে যুগস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং সাহিত্যেও যুগগত বিকৃতিকেই চরম কাম্য পরম সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিছু সংখ্যক ঔপন্যাসিক তো এমন ছিলেন যে তাঁরা বিপর্যস্ত যুগকে উপস্থাপিত করেও একটি সংগঠনাত্মক জীবন-প্রত্যয় যুগ-প্রবাহের উজানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার জন্যে যে তাঁরা অনাধুনিক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তাও নয়।

এখন প্রশ্ন হল, সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে সচেতন হলেই ঔপন্যাসিককে যদি আধুনিক বলি, তবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এঁরা সকলেই নিজের যুগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, সুতরাং সকলেই নিজের যুগে আধুনিক। বস্তুত সব বড় লেখকই এই অর্থে নিজের কালে আধুনিক। অর্থাৎ আধুনিকতা একটি আপেক্ষিক তাৎপর্য বহন করে মাত্র। কিন্তু তা হলে বর্তমান আলোচনায় বিশেষ করে আধুনিক ঔপন্যাসিক বলতে কি বুঝব? এখানেও আমাদের যুগ সম্পর্কে যিনি সচেতন তাঁকেই আমরা আধুনিক বলব।

তা হলে আসল প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, আমাদের যুগ বলতে আমরা কি বুঝব? আমাদের যুগের স্বরূপ কি? মহাকাল তো একটা প্রবাহ মাত্র। তার কতটুকু অংশকে আমাদের যুগ

১। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩০, (আলোচনা), পৃ. ৯৮০।

বলব? কোথায়ই বা তার সূচনা আর কোথায়ই বা তার শেষ ধরব? আমাদের যুগ বা আমাদের পূর্ব পুরুষের যুগ, আধুনিক যুগ বা প্রাচীন যুগ প্রভৃতি নামে কালপ্রবাহকে যে বিভিন্ন এককে আমরা ভাগ করি, সেই বিভাগের মানদণ্ড কি? কালপ্রবাহের এক-একটি পর্বে এক-এক রকমের জীবনধারা, এক-এক রকমের ব্যক্তিক ও সামাজিক সমস্যা, এক-এক রকমের চিন্তাভাবনা বিদ্যমান থাকে। এইখানে একটি কাল-পর্ব অন্য একটি পর্বের থেকে স্বতন্ত্র। এই জীবনধারা ও ভাব-ভাবনার স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য বিচার করে আমরা তার ধারক এক-একটি কাল-পর্বকে এক-একটি যুগ বলে চিহ্নিত করি। বর্তমান আলোচনায় আমাদের আধুনিক যুগ বলতেও আমরা সেই পর্বটুকু বুঝব যেখান থেকে জীবনধারার মোড় পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্ন পথে ঘুরে গেছে, যেখানে আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র সমাজরূপ ও জীবন-সমস্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে আমাদের ভাব ভাবনা নিজস্ব রূপে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই মানদণ্ডে বিচার করে আমরা বলতে চাই—আমাদের এই যুগ, এই আধুনিক যুগ, সূচিত হয়েছে ১৯১৯-২০-র পর থেকে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। এখান থেকে আমাদের যুগের স্বতন্ত্র সমস্যা ও রূপ, নিজস্ব দর্শন ও প্রবণতা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অবশ্য একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ একটি যুগের জন্ম ব্যক্তিবিশেষের জন্মের মত বিশেষ কোনো তারিখে বা বিশেষ কোনো লগ্নে চিহ্নিত করা যায় না। কিছু আগে থেকেই প্রত্যেক যুগের পূর্বাভাস সূচিত হতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে তার পরিণতিও চলতে পারে। আমাদের আলোচ্য আধুনিক যুগটি জন্ম নিয়েছে ১৯১৯-২০ সালের কাছাকাছি সময়ে। এই যুগের কিছু কিছু পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে বিশ শতকের প্রায় গোড়া থেকেই। উপন্যাসে এই যুগ সম্পর্কে সচেতনতা অল্পবিস্তর সমসাময়িক কাল থেকেই। কিন্তু স্পষ্টভাবে, 'আনুষ্ঠানিক ভাবে', সাহিত্যে এই আধুনিকতা রূপ লাভ করল ইংরেজি ১৯২৩ সালে অর্থাৎ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। এই সময় আধুনিক লেখক-গোষ্ঠী 'কল্লোল' প্রকাশ করে আধুনিকতার বাণী-প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন।

আধুনিকতার প্রশ্ন আর এক কারণে খুবই জটিল। সাহিত্যের আধুনিকতা পুরোপুরি সন-তারিখের বিচারে নির্ণিত হতে পারে না, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার বিচারেই তা যথাযথ ভাবে নির্ণয় করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের কোনো-কোনো উপন্যাস আমাদের পূর্বকথিত আধুনিক কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু শুধু সেই কারণে তাঁদের আধুনিক ঔপন্যাসিক বলে ধরতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন আধুনিক উপন্যাসের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত। কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি আধুনিক ঔপন্যাসিক বলতে পারি না। যেমন ভিক্টর হিউগো ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত থেকেও আধুনিক লেখক বলে স্বীকৃত নন। কিন্তু বদলেয়র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে বেঁচে না থেকেও আধুনিক বলে ঘোষিত। আধুনিকতার পরিচয় নির্ভর করছে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে; তাঁর কালগত সীমার ওপরে পুরোপুরি নয়।

বাংলা উপন্যাসে সাধারণত বাংলা তেরো শ' তিরিশ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা

প্রকাশের পর থেকে এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা। এই তিরিশের যুগের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হল, অস্থিরতা ও জিজ্ঞাসা, এটি মূলত জিজ্ঞাসার যুগ, সিদ্ধান্তের যুগ নয়। তাই তিরিশের যুগে একটি কোনো যুগধর্ম সমস্ত লেখককে চালিত করেছে এমন দেখা যাবে না, বরং দেখা যাবে প্রত্যেকে জীবনের মূল্য সন্ধানী—এই সন্ধানের ব্যাকুলতাই এ যুগের সাধারণ ধর্ম, কোনো একটি প্রত্যয়ে স্থিরতা, কোনো যুগধর্মে নিশ্চয়তা তখন নেই। ইংরাজি সাহিত্যে উত্তর-ভিক্টোরীয় যুগে যখন লেখকেরা নতুনকে খুঁজছেন, জীবনের তাৎপর্য যাচাই করে নিচ্ছেন তখন অনেকটা এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল—বিশ শতকের প্রথম ১৪ বছরে কোনো একটি সাধারণ যুগ প্রত্যয় গড়ে ওঠেনি, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথের সন্ধানী এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের স্বতন্ত্র মত গড়ে উঠছে—

'The intelligentsia could not quite make up its mind Writers were unable to agree on essentials, so they played with sidelights In fact the first fourteen years of the twentieth century becomes a period not because its authors wrote alike but because the same causes made them write differently'[২] প্রশ্ন হতে পারে বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই আমাদের সমাজে যে নতুন যুগ ধীরে ধীরে আভাসিত হচ্ছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সাল থেকেই যা স্পষ্টভাবে সমাজ জীবনে ফুটে উঠল, সেই যুগের চিহ্ন উপন্যাসে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে বিলম্ব হল কেন? সমাজে যে আধুনিক যুগ ১৯১৯ সালে দেখা দিল উপন্যাসে পুরোপুরি তা ধরা দিতে ১৯২৩ সাল বা তার চেয়েও দেরি হল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, সংবাদপত্রের রিপোর্টারের মতো ঔপন্যাসিকের অতটা তৎপর না হলেও চলে। সমাজের মোড় ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বক্ষেত্রে সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয় না। কখনো কখনো সমাজের রূপান্তর সাহিত্যে গৃহীত হতে কিছুটা সময় লাগে।

এখন আধুনিক ঔপন্যাসিক যে আধুনিক যুগ সম্পর্কে সচেতন সেই যুগটির রূপ ও স্বরূপ কি, তার বাহ্য-ক্রিয়া ও আন্তর-ভাবনার ঐতিহাসিক পরিচিতি কি? আমাদের এই যে যুগ, যার চিহ্ন লেখকের সৃষ্টিতে দেখে তাকে আমরা আধুনিক বলি সেই যুগটির বৈশিষ্ট্য কি?

এই যুগের রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয় আমাদের পরিবারের শান্তি, সমাজের বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন করেছে, এক সর্বাত্মক মিথ্যাচার জীবনের মহৎ আদর্শ ও মূল্যবোধকে অন্তঃসারশূন্য প্রতিপাদিত করেছে। আবার এরই সঙ্গে এই চরম দুর্দিনেই বাংলার তথা ভারতের জাতীয় আত্মা যেন মরিয়া হয়ে জেগে উঠেছে। জীবনে যত নির্যাতন ভোগ করেছে, অন্তরে ততই বিপ্লবের কলধ্বনি অনুভব করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে অন্যান্য দেশের সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় এসেছে, আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে সেই অবক্ষয়েরই পাশাপাশি ছিল একটা জাগরণ-প্রয়াস। এইজন্যে, যদিও আধুনিক সাহিত্যের সাধারণ প্রবণতা ও আধুনিক

২। English Literature & Ideas in 20th Century', p 117

সমাজের সাধারণ সমস্যা সব দেশে মোটামুটি প্রায একই ভাবে দেখা দিয়েছে, তবু আমাদের দেশের এই কালের সামাজিক পটভূমিকা কিছুটা স্বতন্ত্র এবং তাই উপন্যাসে আধুনিকতার স্বরূপও আমাদের দেশে কতকটা পৃথক। জীবনে অবক্ষয় ও অন্তরে উত্থানেব একটা আন্তরিক প্রেরণা এই হল আমাদেব এই সময়কার জাতীয জীবনের বৈশিষ্ট্য। আমাদের জাতীয় জীবনেব এই দ্বৈত-রূপের প্রকাশ আমাদের উপন্যাসেও দেখা দিল— কোনো কোনো উপন্যাসে জীবনের অন্ধকার অবক্ষয় ও জটিল বিকৃতি মূর্ত হয়ে উঠল— যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি' ও 'সাড়া', অচিন্ত্য কুমারেব 'বেদে', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'চতুষ্কোণ' ইত্যাদিতে। অন্যদিকে কোনো কোনো উপন্যাসে প্রতিধ্বনিত হল জাতীয় বিপ্লবের পদধ্বনি সংগঠনের মন্ত্র, যেমন—তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' ও 'গণদেবতা' কিংবা জীবনেব একটি স্নিগ্ধ কমনীয় সুন্দরের রম্যস্বপ্ন, যেমন—বিভূতিভূযণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' ইত্যাদি। এসবই আমাদের জীবনের আধুনিক দ্বিধাবিভক্ত রূপেব এক একটি দিকের চিত্র বহন করে। এযুগের ঔপন্যাসিকেরা সমসাময়িক সমাজজীবনের দুঃখ-দুর্দশা, সমস্যা ও সঙ্কট সম্পর্কে সকলেই অল্পবিস্তর সচেতন ছিলেন। তবু সমাজেব এই দুই রূপ-ভাঙন ও সংগঠন বাস্তব বিকৃতি ও আন্তর স্বপ্ন— এই দুইয়ের মধ্যে এক একজন স্বীয় মানসিক প্রবণতা অনুসাবে প্রধান ভাবে এক-একটি দিককে নিজের উপন্যাসের উপজীব্য করে তুললেন। যেমন তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ যথাক্রমে জীবনের জাগরণ— সংগঠন ও সুন্দর স্বপ্নকে রূপায়িত করেছেন। আর মানিক, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি প্রধান ভাবে উপস্থাপিত করেছেন সমাজের বিকৃতি, অবক্ষয় ও ভাঙনকে। আবার কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের মধ্যে তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর মানসিক প্রবণতা ও উপন্যাসের উপজীব্য পরিবর্তিত হতেও দেখা গেছে। যেমন, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রথম জীবনে প্রধানভাবে ভাঙন-অবক্ষয় ও বিকৃতি তুলে ধরেছেন, উত্তরকালে তাঁরাই জীবনের রোমাণ্টিক বা সাংগঠনিক দিকটিও চিত্রিত করেছেন। এখানেই আমাদের পূর্বকথিত প্রতিভার মুক্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার্য। কারণ যুগের দ্বিধাবিভক্তির সঙ্গে ছিল ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়া-স্বাতন্ত্র্য। যুগের অবক্ষয়কে দেখে কেউ কখনো বিহ্বল ভাবে তাকে তুলে ধরেছেন, কেউ বা কখনো প্রস্থান করেছেন কল্পনার জগতে— সংগঠনের স্বপ্নে।

তা হলে, আবার বলি, দুটি সূত্র আমরা স্বীকার করছি। প্রথম, ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতন্য একই যুগ-পরিবেশ সম্পর্কে দুরকমের প্রতিক্রিয়া করেছে। কেউ যুগের অবক্ষয়কেই তুলে ধরেছেন, কেউ বা যুগের অবক্ষয়ের উজানে একটি সংগঠনের আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়, তিরিশের যুগ-পরিবেশও ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে বিদেশির শোষণ ও যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় জনিত অবক্ষয়, অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলন, অভিনব সাংস্কৃতিক সংগঠন, নব নব আদর্শবাদের জন্ম। এবারে আমাদের আধুনিক যুগ-পরিবেশের এই দ্বিধা বিভক্ত রূপের তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক পরিচিতি গ্রহণ করা যাক।

ব্রিটিশ শোষণ ও ভারতীয় সমাজ

এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা আমাদের আধুনিক যুগের বহুঘোষিত অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের বিশ্লেষণ করব। একাজে এগিয়ে আমরা দেখতে পাব, আমাদের আধুনিক যুগের বিপর্যয় অন্যান্য দেশের মতো শুধুমাত্র বিশ্বযুদ্ধের ফল নয়। এখানেই অন্যান্য দেশের আধুনিক যুগের সঙ্গে আমাদের দেশের আধুনিক যুগের পার্থক্য। আমাদের আধুনিক যুগের অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে একটি সুদূর প্রসারী কারণ—বিদেশি শাসকের দীর্ঘকালের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শোষণ। এই ক্রমিক শোষণের ফলে জাতীয় জীবন যখন প্রায় রক্তহীন হয়ে এসেছে তখনই আঘাত এসে লাগল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। ফলে ক্রমিক শোষণক্লিষ্ট জাতি একেবারে সামগ্রিক বিনষ্টির মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। বাংলা তথা ভারতের আধুনিক যুগের বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে এই প্রায়-প্রচ্ছন্ন সুদূরপ্রসারী কারণ। তার প্রমাণ এই যে, শুধু বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় যে-সব জাতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভেঙে পড়েছিল বিশ্বযুদ্ধের পরে তারা অল্পকালের মধ্যেই পুনঃসংগঠন করে নিল, কিন্তু ভারত পারল না। কারণ ভারতের দুর্দিনের মূলে শুধু বিশ্বযুদ্ধই ছিল না, ছিল দীর্ঘকালেব বিদেশির অত্যাচার ও স্বার্থান্বেষণ, এবং এই জন্যেই যুদ্ধোত্তর পর্বেও পুনর্গঠনের পূর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষ পেল না। তারপরে—বহুকাল পরে —যখন ভারত স্বাধীনতা পেল তখন অবশ্য তার বিপর্যয় আরো ব্যাপক দুরতিক্রম্য হয়েছে এবং দীর্ঘকালের সামাজিক বিপর্যযের ফলে জাতির নৈতিক বল ও মানসিক প্রেরণা বিনষ্ট প্রায়। এর পুনরুদ্ধার এখন আবো সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ।

ব্রিটিশ শাসকের যে ক্রমিক শোষণের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ আধুনিক যুগে চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন হল, তার ইতিহাসটি না জানতে পারলে বিশ শতকের আমাদের বিপর্যয়কে শুধুমাত্র যুদ্ধের ফল বলে ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

মধ্যযুগে ভারতের সমাজ ছিল মূলত গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর। উনবিংশ শতাব্দীতে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত গ্রামীণ সমাজকে ভেঙে ইংরেজ বের কবে এনেছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বেনে ইংরেজ গ্রামজীবনের দুটি মূল আশ্রয় কুটিব-শিল্প ও কৃষির মূলে আঘাত হেনেছিল তার চতুর শাসন কৌশলেব সাহায্যে। সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজ যখন তার কুটির শিল্পেব স্বল্প উৎপাদন নিয়ে গড়িয়ে চলেছে মন্থর গতিতে তখন হঠাৎ ইংরেজ বণিকের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ইউরোপের যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যেব প্লাবন বাঁধ ভেঙে বাংলার বাজার ভাসিয়ে দিল। ম্যাঞ্চেস্টার-বাকিংহামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হল ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, ধনেখালি, চন্দ্রকোণা। ভাবতের কুটির শিল্পজাত পণ্য ভারতের বাজারেই স্থান পেল না, বিদেশ থেকে টাকা আনা তো তার পক্ষে দূরের কথা। অন্য দিকে বিদেশি পণ্যের চাক্‌চিক্যে লুব্ধ বাঙালি ঘরের সঞ্চয় উজাড় করে দিল বিদেশি বণিকের পায়ে। বাংলার কুটির শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করতে এগিয়ে এলেন সরকার বাহাদুর। এতকাল এদেশের কুটির-শিল্পের পণ্যের মধ্যে যেগুলি ছিল উন্নতমানের, বিদেশের বাজারে যেগুলি সমাদরের কিছুমাত্র

সম্ভাবনা ছিল, সেগুলিও যাতে রপ্তানি না হয় তার জন্যে সরকারি ব্যবস্থার ত্রুটি হয়নি। ইউরোপের বাজারে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানিতে উচ্চ-কর ধার্য করা হল, অন্যদিকে ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য সরবরাহ উৎসাহিত করা হল নামমাত্র কর ধার্য করে।

কুটির শিল্পের বিলুপ্তিতে বাংলার প্রাণকেন্দ্র গ্রামের একমাত্র সম্বল রইল কৃষি। কিন্তু এই কৃষির উপরেও শাসকের শ্যেনদৃষ্টি পড়তে দেরি হয় নি। ঐতিহাসিকরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসনের ফলে একদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ সন্ধান অন্যদিকে প্রচুর করভার এই দুইয়ের চাপে এদেশের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে :

"In the earlier years of the British rule, the East India Company regarded India as a vast estate of plantation, and considered themselves entitled to all that the land could produce, leaving barely enough to the tillers and the landed classes to keep them alive in ordinary years. Lord Cornwallis permanently settled the Land Revenue in Bengal in 1793, demanding from landlords 90% of the rental The proportion taken by the Government was excessive beyond measure."[৩]

জমিদারের কাছ থেকে এই অতিরিক্ত কর আদায়ের ফলে জমিদারদের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়, তখন তারা জমির উন্নতি প্রজাস্বার্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে বাধ্য হয়ে উদাসীন হন, প্রজাদের কাছ থেকে যে কোনো অবস্থায় নির্মম ভাবে কর আদায় করেন। পরোক্ষে এইভাবে কৃষকের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে যে প্রচুর টাকা সরকারের খরচ হয়েছিল তা তারা তুলে নিতে চাইলেন এইভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করে।

এমনি করে যখন গ্রাম্য আশ্রয় কৃষি ও কুটির শিল্প বাঙালিকে ক্ষীণতম ভরসা থেকেও বঞ্চিত করল তখন বাঙালির সামনে একটা প্রলোভন ছিল কেরানির চাকরি। মেকলের পরিকল্পনায় প্রবর্তিত হয়েছিল একটি কেরানি নির্মাণকারী ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা। ইংরেজের বাণিজ্য ও শাসনতন্ত্রের পরিপুষ্টির জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় যুবক। চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় জমিদারেরা যখন জাঁকিয়ে বসলেন তখন তাঁদেরও দরকার হল বহু কেরানি ও হিসাবরক্ষকের। সেদিন যাদের কিছুমাত্র উপায় ছিল তারা কলকাতায় এসে ইংরেজি শিখল। যাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না তারাও জমিজমা বিক্রি করে ছেলেকে ইংরেজি শেখাল। কারণ তখন 'Expense on English education was a wonderful investment, it repaid itself a hundredfold,'[৪] ইংরেজি শিক্ষিতরা চাকরি করে যে নগদ টাকা রোজগার করতে লাগল তা হয়ে উঠল পরম লোভনীয়। গ্রাম থেকে নগরে এসে কৃষি ও কুটির-শিল্প ছেড়ে যারা ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে কেরানির চাকরিতে ঢুকল তারাই হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত। গত শতাব্দীতে এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই এনেছিল

৩। Dutt, Dr Ramesh Chandra The Economic History of India, 7th ed, pp VII X

৪। Limaye, P M 'The Problem of Unemployment' in Historical and Economic Studies', edited by Karve D G Poona 1941 p 111

জাতীয় জীবনে নবজাগরণ, আর বর্তমান শতাব্দীতে এরাই এসে দাঁড়াল মৃত্যুর সামনা-সামনি। কারণ উনিশ শতকে এদের এই সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই এদের ধ্বংসের বীজ উপ্ত ছিল, বিশ শতকে সেইটাই প্রকট হয়ে উঠল। চাকরির আশায় বাঙালি ইংরেজি শিখেছিল, চাকরির প্রলোভনে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে বিশ শতকে শিক্ষিতের তুলনায় চাকরির সংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগল। গ্রামীণ জীবনের কুটির-শিল্প ও কৃষি বাঙালি আগেই হারিয়েছে, কেরানিমুখী শিক্ষায় সে দৈহিক শ্রমের ক্ষমতা এবং মনোবৃত্তিও হারাল। ইংরেজের কেরানি-করা শিক্ষা-ব্যবস্থা মধ্যবিত্তকে তৈরি করল এইভাবে :

'British Indian educational system has fostered a sophisticated, over-literary mind, promoted drift from the manual to the soft occupations and blocked an adaptive social and economic transformation.'[৫]

এই শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ যখন বিশ শতকে কেরানির চাকরি থেকেও বঞ্চিত হল, তখন তার পায়ের তলা থেকে ধরিত্রী যেন সরে দাঁড়ালেন। সমাজের গলগ্রহ এরা ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছিল, মহাযুদ্ধের বোমার বিষে এরা হয়ে উঠল সমাজের দূষিত ক্ষত সর্বাবিধ হতাশা ও জটিল প্রচ্ছন্ন বিকৃতির এরাই হল প্রধান কেন্দ্র। এমনি করে দীর্ঘকালের বিদেশি শোষণ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে রচিত হল আধুনিক যুগের ছিন্নমূল ক্ষতবিক্ষত স্বদেশী সমাজ, যার পটভূমিকায় রচিত হয়েছে আমাদের আধুনিক উপন্যাস।

বাংলার মস্তিষ্ক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যুদ্ধোত্তর পর্বে বিলুপ্তির মুখে। মধ্যবিত্ত বলে আজ যারা পরিগণিত, বস্তুত তারা অনেকটা প্রচ্ছন্ন নিম্নবিত্ত। মধ্যবিত্তের এই অবক্ষয় ও বিপর্যয় স্পষ্টতর হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ সাল থেকেই। প্রায় সমসাময়িক কালের পত্রিকায় এর সাক্ষ্য রয়েছে। কল্লোলে লেখা হয়েছিল :

"মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক সাধারণকে লইয়া যে সকল গল্পের অবতারণা করা হয় তাহা আজকালকার দিনে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। আজকাল 'মধ্যবিত্ত' বলিয়া কোনও অবস্থার লোক আছে বলিয়া মনে হয় না। হয় খুব বড় লোক, নয় ত একেবারে সব মিলাইয়া একদল, যাহাদের একমাত্র নাম হইতে পারে 'শ্রমিক'।"[৬]

মধ্যবিত্তের এই ক্রমিক বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠছে উচ্চবিত্তের ক্রমিক স্ফীতি। আর উচ্চবিত্তের ক্রমিক স্ফীতিকে সহায়তা করছে আধুনিক যুগে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্য। যন্ত্রচালিত শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে উৎপাদন ক্রমশ স্বল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই শিল্পপতি ও বণিকেরা যত পুষ্ট হতে থাকে সমাজের অন্য অংশ ততই দরিদ্র হয়ে যায়। যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রসারের ফলে আধুনিক সমাজে শুধু দুটি শ্রেণীই স্পষ্টতর হয়ে আসছে—মালিক ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্র, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত।

৫। Mukherjee, Dr Radhakamal 'Foreward' to the 'Economic History of India.'
৬। কল্লোল, ২য় বর্ষ, ১৩৩১, পৃ ৬৯-৭০।

শিল্পায়নের সূচনা ও যন্ত্রীকরণ

আধুনিক বাংলার নতুন রূপগঠনে শিল্পবিস্তার ও যন্ত্রপ্রগতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলা তথা ভারতে কিছু কিছু শিল্প (industry) গড়ে উঠতে থাকলেও শিল্পে লক্ষণীয় প্রগতি হয় আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বেই অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ১৯১৯-২০-২১-২২ সাল থেকেই। বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তই করেছেন :

"From the beginning of this century, especially since the last World War (1st World War) spectacular progress in industrialisation has been made in the country."[৭]

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু শিল্পোদ্যোগ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও দেখা যায়, কিন্তু তা তখনো এতদূর বিস্তার লাভ করে নি যাতে সমাজজীবনে তার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়ে। আর যতদিন না শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রভাব সমাজজীবনে কোনো পরিবর্তন আনছে, ততদিন উপন্যাস-সৃষ্টিতে ও উপন্যাস-আলোচনায় তার সম্পর্কে আমাদের কোনো আগ্রহ থাকবার কারণ নেই। শিল্পের সেই রকম বিস্তার সূচিত হয় বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই। আবার, এদেশে যদিও পরিকল্পিত পূর্ণ-শিল্পায়ন (Planned industrialisation) শুরু হয়েছে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই, তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়েছে এবং তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল সমাজজীবনে পড়েছে।

১৯১৯-২০-র আগে এদেশে শিল্পের বিস্তার ইংরেজ সরকার চাননি, কারণ সেটা ছিল তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী। এদেশের কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে এদেশে ব্রিটিশের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করাই তাঁদের নীতি ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আপনা থেকেই এদেশে অনেক শিল্পেরই দ্রুত বিস্তার ঘটে। যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারেন, ভবিষ্যতে আবার কখনো যুদ্ধ লাগলে ভারতই হবে এশিয়ায় তাঁদের বড় ঘাঁটি এবং ভারতের উৎপাদিত দ্রব্য যোগাবে তাঁদের যুদ্ধের সরঞ্জাম। ফলে এদেশের শিল্প উন্নতির জন্যে যুদ্ধের পরে সরকার ১৯২২ সালে শিল্প সংরক্ষণের (Protection) ব্যবস্থা করেন, যদিও এই সংরক্ষণ ছিল অংশত নির্বাচনমূলক (discriminative)। এছাড়া তখনকার জাতীয় নেতৃবৃন্দের দাবিতেও সরকার এদেশের শিল্পের প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের বিদেশি বর্জন নীতির ফলে যে দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায় তাতেও দেশীয় শিল্পের প্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

যে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পকে অন্যান্য শিল্পের ভিত্তিস্থানীয় বলা হয় সেই শিল্পের প্রসার হয় বিশ শতকেই। যদিও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দেই বরাকরে বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড ষ্টীল

৭। Joshi, R. C 'Towards National Self-Sufficiency' in 'Historical and Economic Studies', edited by Karve, D G, Poona 1941, p 222

কোম্পানির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবু এই শিল্পের যথার্থ প্রগতি ধরা হয় ১৯০৭ সালের পব থেকেই। ১৯০৭ এ বিহারের সাক্‌চীতে (জামসেদপুর) জামসেদজী টাটার চেষ্টায় টাটা আয়বন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ১৯১৪ সালের পরই এই শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে। এর পরেই বরাকরে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা (১৯১৮) এবং ভদ্রাবতীতে মহীশূর সবকারেব উদ্যোগে লৌহ ও ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন (১৯২১) প্রভৃতি ঘটনা আমাদের আলোচ্য আধুনিক যুগে শিল্প প্রসারের সাক্ষ্য বহন করে। ক্রমেই শিল্প-প্রগতি হতে থাকে এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত শিল্পেরই এবং বিশেষভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেব দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। এই শিল্পেব সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে যে কয়লা-শিল্প তাও বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তব কালেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেই ভারতের প্রধান প্রধান কয়লাখনিগুলি আবিষ্কৃত হলেও ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ (Industry) হিসাবে এটি রূপ লাভ করে বিশ শতকেব লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেব প্রসারের কালে। কাবণ কয়লা-শিল্পে এই সময়েই যন্ত্রেব ব্যবহার কবা হয় এবং খনিগুলির গভীরতামুখী খননের দিকে মন দেওয়া হয়। অন্য সমস্ত শিল্পেব তুলনায় জুট শিল্পই (Jute industry) বাংলা দেশের গণজীবনকে ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত কবেছে সব চেয়ে বেশি। কাবণ এ শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রধানত বাংলাতেই --হুগলী নদীব দুই তীরে ৬০ মাইল স্থান ব্যাপ্ত করে। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই হুগলীব রিষড়ায় এই শিল্পের প্রথম সূত্রপাত হয়, তবু ঐ শতাব্দীর শেষ পাদের আগে তাব প্রসার হয় নি, এবং বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই তার দ্রুত বিস্তার ঘটে—এমন দ্রুত যে কারখানাগুলিতে শ্রমিক বিনিয়োগ দ্বিগুণ হয়ে যায়। অন্যান্য শিল্প যেমন, জুট শিল্পেও তেমনি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে একটা দ্রুত উন্নতি ঘটে। যুদ্ধের সময় বালির বস্তা হিসাবে জুটের চাহিদা বেড়েছে। আবাব যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় দেশগুলিতে খাদ্যশস্যের বিনিময়ের প্রযোজন বাড়ায় জুটের বস্তার উপযোগিতা বেড়েছে। পবে ক্রমশ আধুনিক পৃথিবীতে বিশ্ববাণিজ্য যত প্রসার লাভ করেছে জুটেব ততই প্রয়োজন হয়েছে প্যাকিং-এর জন্যে। মাঝে মাঝে মন্দা পড়লেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব সময় আবার এই শিল্পেব প্রসার বাড়ে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এই শিল্পের যখন দ্রুত বিস্তার ঘটে তখন কারখানার সংখ্যা খুব বেশি না বাড়িয়ে শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মন দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, গণস্বাস্থ্য এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

জুটের পরে উল্লেখযোগ্য শিল্প হল বস্ত্রশিল্প। ভারতে সূতী-বস্ত্রের উৎপাদন-শিল্প অন্যান্য শিল্পের তুলনায় প্রাচীনতর হলেও বাংলার জাতীয় জীবনে এই শিল্পোদ্যোগের প্রভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশেষ পড়েনি। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই শিল্প মুখ্যত বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই বাংলায় এর সত্যকার বিস্তাব হয়। বাংলায় সূতীবস্ত্রের কারখানা গড়ে ওঠে ২৪ পরগনা ও

হাওড়া জেলায়। ১৯৪১ সালে বাংলায় ১৩টি কারখানা ছিল, ১৯৪১ সালে হয় ৩৩টি। শিল্পপ্রসার এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই সাধিত হয়; সমাজজীবনেও তার প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে, এবং যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রসারের ফলে শিল্পপতির ক্রমিক স্ফীতি, শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা, জীবনে ও ভাবনায় যান্ত্রিকতার বৃদ্ধি, শিল্পাঞ্চলের অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি, cosmopolitan জীবনধারার প্রসার প্রভৃতি সুফল-কুফলগুলি এই সময়কার সমাজজীবনে দেখা দিতে আরম্ভ করে।

বিশ্বযুদ্ধ

আগেই বলেছি, আধুনিক যুগে জাতীয় দুরবস্থার আরো প্রত্যক্ষ ও তীব্র কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের জনবলের চেয়ে ধনবল অনেক বেশি টানল এই বিশ্বযুদ্ধ। ইউরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম-এশিয়ায় ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করে ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধ করেছিল। সে সব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নগণ্য ছিল না সত্যি, কিন্তু এইভাবে জনশক্তি দান করে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হয় নি। এমন কি প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র—৭০,০০০,০০০ রাউণ্ড যুদ্ধসামগ্রী—৬০,০০০ রাইফেল, ৫৫০-টিরও বেশি বন্দুক—দিয়েও ভারতের প্রচণ্ড বিপর্যয় সাধিত হয় নি। আসলে অস্ত্র শস্ত্র ছাড়াও অনাবিধ রসদ এবং প্রচুর শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য এখান থেকে যে চলে গেল মিত্রশক্তিদের জন্যে, তার প্রভাব হল আমাদের গণজীবনে গুরুতর। এবিষয়ে ঐতিহাসিকের তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত হল :

"Indian's contribution in material was important Apart from munitions, her cotton, jute, iron, steel, wolfram, manganese, mica, saltpetre, rubber, skin, petroleum, tea and wheat were of great help to the Allies India also made financial contributions to her utmost capacity Although her troops were employed outside her borders, she paid the normal expenditure for their maintenance, which varied between 20 and 30 million pounds sterling per annum She also paid the cost of an additional force 300,000 men and made her free gift of 10,000,000 pound sterling to the British Government These heavy payments involved India in currency difficulties of a serious nature for many years"[৮]

যে দেশ দীর্ঘকাল ধরে শোষিত হয়ে আসছিল, দেহে যার আর রক্ত ছিল না, তাকেই যেন যুদ্ধে রক্ত দিতে হল তার 'utmost capacity'-তে। যুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে উঠল। জনজীবনে এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা যতই গুরুতর হতে থাকে তার সামাজিক স্বাস্থ্যও ততই ভেঙে পড়ে, তার নৈতিক ভাঙনও ততই শোচনীয় হতে থাকে। এ সম্পর্কে আমরা পরে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত এসে লাগল। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে আবার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। কারণ ভারত ছিল ব্রিটিশের

৮। Mazumder, Dr R C, Ray Chaudhuri, Dr H C and Dutta, Dr K K 'An Advanced History of India,' London, 1956, p 930

অধীন। তাই ভারতের সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে শোষণ করে যুদ্ধে লাগিয়েছিল ব্রিটেন। পরে এই যুদ্ধ ভারত-সীমান্তের কাছাকাছি সরে আসায় ভারত থেকে রসদ সংগ্রহ আরো বেড়ে যায়। এই বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিদের মধ্যে ছিল নরওয়ে ও ডেনমার্ক বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স। ১৯৪০ এর গ্রীষ্মে এই শক্তিদের একে একে পতন হতে থাকে। ফলে ভারতের উপর টান পড়ে আরো বেশি। কারণ ব্রিটেন তখন সহায়হীন, শুধু ব্রিটেনের অধীনস্থ ভারত তার রসদ ও জনবল যোগান দিতে লাগল। এরই ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দ্বিগুণ হল। ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর সেনা ও যুদ্ধ সামগ্রী আফ্রিকায় যেতে লাগল। ভারতের এই সাহায্য পেয়েছিল বলেই আফ্রিকায় ও মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তি তার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পেরেছিল। আর আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধে সেনবল ও রসদ যোগান দেওয়া ছাড়াও ভারত প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। যদিও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সমর্থন করেন নি তবু শাসক ইংরেজ এদেশের বহু সৈন্য ও রসদ আপন ক্ষমতাবলে নিয়ে কাজে লাগিয়েছিল। ভারতকে শুধু তার শোচনীয় ফল ভোগ করতে হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার মূলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আর লক্ষ্য করবার বিষয় এই জনসংখ্যা বেশি বেড়েছে আমাদের আধুনিক যুগের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কল্লোলের সমসাময়িক কালে। ১৯২১ এর আগের দশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১২%। কিন্তু ১৯২১ এর পরের দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগের বেশি। এতে এ যুগের বেকার সমস্যা খাদ্য সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি।

The extension of cultivated area and rise in agricultural productivity have failed to keep pace with population grow Consequently per capita agricultural output as well as food supply have shown decline [১]

ভারতের খাদ্যাভাব ও দুঃখ দারিদ্র্যের মূলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বটে কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই যুগে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে সংখ্যা বৃদ্ধি এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত মূল কারণ হল উপযুক্ত পরিমাণে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অভাব ও এই পরে এদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় অত্যন্তই কম। বিশেষজ্ঞ যাঁরা, যাঁরা সমস্যাটি আরো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তাঁদের মতে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্ববিধ দুর্গতির কারণ নয়, বরং তার ফল। এদেশে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অকর্মণ্যতা রয়েছে বলেই জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। পণ্ডিত কার্বে যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন :

the population of India constitutes a problem neither in its num-

---

১। Singh Dr V B Economic History of India 1857-1956 Bombay Allied Publishers P Ltd 1st ed p XVII

bers, nor in its rate of increase, but in its conditions of ill-health and poverty. On a survey of the facts of Indian life during the first three decades of this century, and their comparison with movements in other parts of the world, it would appear to be clear that numbers, instead of being a cause of the unwelcome phenomenan of disease and poverty, are but a symptom and an effect of a much deeper evil, that of social and economic backwardness and cultural and psychological passivity."[১০]

বেকার সমস্যা

বাংলার কৃষি ও কুটির শিল্প ক্রমে অনিশ্চিত হয়ে আসছিল। আধুনিক যুগে কুটির-শিল্প প্রায় বিলুপ্তই হয়েছে, কৃষিও নির্ভরযোগ্য নয়। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দেশীয় কৃষি-ব্যবস্থা কৃষকদের খুব বেশি ভরসা দিতে পারল না। উপরন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপরে চাপ সৃষ্টি হল। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যে-সংখ্যক শ্রমিক দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি কৃষক আত্মনিয়োগ করল। এরা হল প্রচ্ছন্ন বেকার। এ ছাড়া বছরে যে সময়ে চাষ হয় না, সে সময়ে বসে থাকে কৃষকেরা, সাময়িক বেকারের জীবন যাপন করে। এছাড়া ঋণভারে জর্জরিত হয়ে বহু কৃষক জমিহীন হয়েছিল, তারা হল পূর্ণ বেকার। অথচ পূর্ণ, প্রচ্ছন্ন ও সাময়িক এই ত্রিবিধ বেকারের জৈবিক চাহিদা সবই রয়েছে কিন্তু তদনুপাতে তাদের আয় নেই, দেশের উৎপাদন নেই। আধুনিক যুগে শিল্প-প্রসারের ফলে এই শ্রমজীবীদের বেকার-সমস্যার খানিকটা সমাধান হলেও, নানা কারণে তার পূর্ণ সমাধান হয়নি। ফলে নিম্নবিত্ত বেকার সম্প্রদায় সমাজের ভার ও বিকৃতির আধার হতে থাকে।

সবচেয়ে বেশি বেকার-সমস্যা দেখা দেয় মধ্যবিত্ত সমাজে। ইংরেজি শিক্ষার লোভে কেমন করে মধ্যবিত্ত কেরানি বাঙালির সংখ্যা বেড়ে গেল, তার কথা আগেই বলেছি। এরা এই শিক্ষার ফলে বাবুব্রতধারী সুকুমার বৃত্তিধারী এমন একটি শ্রেণী হয়ে উঠল, যারা দৈহিক শ্রমের অনুপযুক্ত ও দৈহিক শ্রমে অনিচ্ছুক সমাজ গঠন করল। এদের বিনিয়োগ ক্ষেত্র এদের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে একান্তই সঙ্কুচিত। ফলে আমাদের আধুনিক যুগের গোড়া থেকেই বেকার সমস্যা নিয়ে বিব্রত হতে দেখি। 'কল্লোল' প্রকাশের সমসাময়িক কালে এই সমস্যা এতখানি প্রখর রূপ ধারণ করে যে ১৯২৪-এর ৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আর্যসমাজ গৃহে ক্যাপ্টেন জে ডব্লিউ. পেটাভিলের সভাপতিত্বে এক সভা আহ্বান করে বেকার-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বাংলা দেশে তখন শুধু মধ্যবিত্তের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ।[১১]

বেকার-সমস্যা যে তখন থেকেই যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল তার প্রমাণ, দিল্লিতে লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লির অধিবেশনে (জানুয়ারি, ১৯২৬) এই সমস্যার সমাধানের জন্যে গুরুতর চিন্তা করা হয়। A Rangaswami Iyenger এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব

১০। Karve, D.G 'Poverty and Population in India', Oxford University Press, 1936, p 7

১১। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩০, 'সমাচার' বিভাগ।

করেন যে, মধ্যবিত্তদের বেকারত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তার সমাধানের পথ-নির্দেশের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হোক। তিনি বুদ্ধিজীবী বেকারদের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেন এবং এজন্যে মূলত দায়ী করেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারকে। শিবস্বামী আয়ার প্রস্তাব করেন, এই সমস্যার সমাধানের জন্যে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রতি সরকারকে আরো সচেতন হতে হবে। সরকারের সহযোগিতায় শিল্পের আরো প্রসার হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। তিনি এদেশে এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো স্থাপনের কথাও বলেন।

এর পরে ১৯২৭-এর ১৭ই মার্চ All India Trade Union Congress-এর যে সপ্তম অধিবেশন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় তাতেও শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এবিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য একটি এনকোয়ারি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এমন কি ১৯২৮-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি Council of State-এও এ বিষয়টি উত্থাপিত করা হয়নি। উপস্থাপক মিষ্টার চরি বলেন শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের মধ্যেই বেকার সমস্যা প্রবল।[১২] সমস্যা এতই গুরুতর হয়ে ওঠে যে বেকারত্বের জ্বালায় আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় : "We sometimes hear of tragedies due of unemployment and consiquent indigence overwhelming educated families, witness the poisoning of his wife and children by a lawyer and later on his suicide "[১৩] এই সমস্যা তখনই এত জটিল রূপ ধারণ করে যে জনমতের চাপে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে সপ্রু কমিটি (Sapru Committee) গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি চাকরিগুলিতে ভারতীয়দের আবেদনের সুযোগ দেবার কথা এই কমিটি প্রস্তাব করে। দেশে টেকনিক্যাল্ শিক্ষার প্রসার ও তদুপযোগী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তারের জন্যেও এই কমিটি অনুরোধ করে। এইভাবে যে সমস্যার বীজ উনবিংশ শতাব্দীতে উপ্ত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে তা প্রবলতম রূপ ধারণ করে এবং আধুনিক জীবনকে অসুস্থ অশান্ত করে তোলে।

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর

জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে পল্লীর সীমাবদ্ধ জমির উপরে যতই চাপ বাড়তে লাগল, ততই জমি ক্রমশ ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত (fragmentation) হতে লাগল, মাথাপিছু উৎপাদন কমতে লাগল এবং প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এতে গ্রামের কৃষকদের দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার উপরে জমিদারদের পারস্পরিক বিবাদ ও ভোগ বিলাসিতায় যে প্রভূত অর্থব্যয় হতো তা প্রকারান্তরে তাঁরা কৃষক প্রজাদের কাছ থেকেই আদায় করে নিতেন। এর ফলেও গ্রামের কৃষিজীবীর আর্থিক বিপর্যয় হয়েছে। সর্বোপরি এদেশের অবৈজ্ঞানিক পুরাতন পদ্ধতির কৃষি-ব্যবস্থায় জনসংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে ফসলের উৎপাদন বাড়ে নি, আর যথাযথ পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা

১২। Indian Annual Register, 1928, Vol. I, p 257

১৩। Limaye, P M 'The Problem of Unemployment', in 'Historical and Economic Studies' edited by Karve, D G. Poona, 1941, p 110

না থাকায় কৃষি ছিল অনিশ্চিত, অনাবৃষ্টির সময় অজন্মা ছিল অপরিহার্য। ফলে গ্রামের কৃষক ক্রমেই দরিদ্র হতে থাকে। বিশ শতকে তাদের অবস্থা এত খারাপ হতে থাকে যে তারা ক্রমে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে ওঠে। তাদেরই পাশে যে মহাজনেরা ব্যবসা করে হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছিল, তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ যোগাত। এটা তাদের পক্ষে ছিল লোভনীয় ব্যবসা। প্রায়ই কৃষকেরা ঋণ শোধ দিতে পারত না, ফলে তাদের জমি-বাড়ি উত্তমর্ণের কবলিত হতো। গ্রামের এই ঋণ-বৃদ্ধির (rural indebtedness) বিষয়ে ১৯৩১ সালে যে পরিসংখ্যান নেওয়া হয়, তা থেকে জানা যায়, তখন সারা ব্রিটিশ-ভারতে গ্রাম্য-ঋণের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। আর অনেক ক্ষেত্রেই সুদের হার ছিল দুর্বহ। এ বিষয়ে কৃষকদের বাঁচাবার জন্যে সরকারি আইন, গ্রাম্য সংগঠন, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, কৃষকদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি।

গ্রামের এই চরম দারিদ্র্য সহ্য করতে না পেরে বহু গ্রামবাসী চলে এসেছিল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের কাজ নিয়ে। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থাও ভাল ছিল না। যুদ্ধোত্তর পর্বে দ্রব্যমূল্য যে রকম অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে রকম শ্রমজীবীদের মজুরি বাড়ে নি। যুদ্ধের পরে কোনো কোনো শিল্পে মন্দা পড়ার জন্যে প্রচুর শ্রমিক ছাঁটাই হয়, মাইনেও বহু ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হয়। দারিদ্র্য-দুঃখ শ্রমিকদের চরমে ওঠে। বস্ত্রাভাবে অন্নাভাবে আত্মহত্যার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের এই নিদারুণ দুঃখের প্রামাণিক বিবৃতি পাওয়া যায় ১৯২২-এর Indian Annual Register-এর পাতায় :

"In Bengal, Bihar and Assam, extensive industrial strikes characterised this period The old inadequate wages and the new quadrupled cost of living were working havoc amongst the people, and the big capitalists and profiteers of the previous years, facing a slump in business began to affect extensive reductions both in the number of employees and in their pay Large numbers were thrown out of work, the working-class could not support their families, people died from starvation, women committed suicide for nakedness and wretchedness stalked wide "[১৪]

পল্লীর ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবীর এই শোচনীয় অবস্থা যেমন আধুনিক যুগে দেখতে পাই, তেমনি দেখতে পাই, মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রসাধনা। চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের মাসিক আয় রইল সীমাবদ্ধ, যুদ্ধের পরে জিনিসের দাম বেড়ে গেল চতুর্গুণ। মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম কঠোরতম হল। এই সময়ের পত্রপত্রিকায় এদের দুঃখ-বেদনার কথা কম প্রতিফলিত হয় নি। 'কল্লোলে' লেখা হয়েছিল :

"মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির যে কি দুরবস্থা তাহা যাঁহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। এমন অবস্থা আসিয়াছে, একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জ্জনে আর

১৪। The Indian Annual Register, 1922, Vol I. 2nd ed. p. 71

একটি পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য ও বস্ত্র যোগাড় হইয়া ওঠে না।"[১৫]

'কল্লোলে' এই সময়ে বাংলার দারিদ্র্যের আরো একটি ভয়াবহ ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে :

"গত ৩রা জুলাই রাত্রে বহরমপুর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সত্যকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায় নামক ২১ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে। দারিদ্র্যবশতঃ উপযুক্ত পাত্রের সহিত তাহার গুণবতী পরমাসুন্দরী ভগ্নীর বিবাহ দিতে না পারিয়া যুবক দুঃখে ও ক্ষোভে আত্মহত্যার ব্যবস্থা করে।"[১৬]

সাময়িক পত্রের এসব সমাজ চিত্রে বাংলার দুঃখ-দারিদ্র্যের যে পরিচয় পাই তাতে বুঝতে পারি আমাদের বিপর্যস্ত আধুনিক যুগটি বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই তাঁর আপন রূপে দেখা দিয়েছিল।

১৯২৪- এর ১২ই জানুয়ারি বোম্বাইতে Seventh Indian Economic Conference অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে Sir George Lloyd এর বিবৃতির প্রতিবাদে Sir M Visveswarayya যে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন তা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস-রচয়িতাদের কাছে 'almost classic' - এর মর্যাদা পেয়েছে। এই ভাষণে তিনি অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে তখনকার ভারতের চরম দুরবস্থার আসল রূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন ভারতের মাথাপিছু গড় সম্পত্তি ১৮ টাকা, অথচ তখন কানাডায় মাথাপিছু গড় সম্পত্তি ৪৪০০ টাকা আর যুক্তরাজ্যে ৬০০০ টাকা। আর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ভারতে গড়ে ৬০ টাকার বেশি নয় কিন্তু কানাডায় ৫৫০ টাকা আর যুক্তরাজ্যে ৭২০ টাকা। অর্থাৎ ভারতে মাথাপিছু গড়ে মাসিক আয় মাত্র ৫ টাকা। জীবিকার এই নিম্নমান এবং জীবন ধারণের নিম্ন অবস্থার দরুন ভারতে মৃত্যুর হার খুব উচু, হাজারে প্রায় ৩০ জন, আর কানাডা ও যুক্তরাজ্যে হাজারে ১০ জনেরও কম। ভারতে সাধারণত গড় পরমায়ু ২৪ বছর, কিন্তু ইউরোপে প্রায় ৪৫ বছর। শিক্ষার হারও খুব কম, শতকরা মাত্র ৬ জনেরও কম। এই দৈন্য ও দুরবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই সূচিত হয়েছিল, তা হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেশের জনসাধারণের অবস্থা কি হয়েছিল তা কল্পনা করা যেতে পারে।[১৭]

বাংলা তথা ভারতের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল দুর্ভিক্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুর্ভিক্ষে সংবাদ পাওয়া যায় এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দেই এবিষয়ে অনুসন্ধান ও পথনির্দেশের জন্যে 'ফেমিন কমিশন' স্থাপিত হয়। কিন্তু বিশ শতকে দুর্ভিক্ষের জ্বালা আরো ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে, বলা যেতে পারে যে দুর্ভিক্ষের ভস্মতিলক মাথায় নিয়েই আমরা বিশ শতকে পদার্পণ করলাম। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৪৭৫০০০ বর্গ মাইল এলাকা কবলিত হয় এবং ৫৯৫০০০০০ লোক প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আবার

১৫। কল্লোল, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩৪ মাঘ, 'ডাকঘর' বিভাগ।

১৬। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩৩০ ভাদ্র, পৃঃ ৩৭৯।

১৭। Indian Quarterly Register, Jan-March, 1924, (Address of Sir M Visveswarayya), p 13

ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। একদিকে যুদ্ধজনিত অভাব ও বিপর্যয় তো ছিলই, অন্যদিকে তার উপরে ১৯১৮-১৯- এর অনাবৃষ্টি এদেশে অন্নাভাব প্রখর করে তুলল এবং ব্রিটিশ -ভারতের ১২টি জেলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হল। ভারত সরকারের কাউন্সিলের সদস্য এবং অর্থবিভাগের অধিকর্তা William Malcolm Hailey ১৯২০-২১ - এর অর্থনৈতিব বিবৃতিতে এই দুর্ভিক্ষেব কথা স্বীকাব কর্বেছিলেন :

"Scarcity conditions, resulting from the monsoon failure of 1918, persisted through the earlier months of 1919, and before June famine had been formally declared in twelve British districts and certain native states."[১৮]

এই দুর্ভিক্ষ বাংলাকেও কম বিপর্যস্ত করেনি। এতে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পল্লীর দরিদ্র কৃষক-সমাজ ও শিল্পাঞ্চলেব শ্রমজীবী মানুষ।

এর পরে ১৯২৮-এর কাছাকাছি সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হল, তাব ব্যাপ্তি ছিল আবো বেশি। ১৯২৮-এর জুলাই মাসে Bengal Legislative Council -এর যে বৈঠক কলকাতায় হয় তার আলোচনা থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই দুর্ভিক্ষের প্রসারেব একটি ভয়াবহ চিত্র পাই। বি, কে, চ্যাটার্জী এই বৈঠকে বলেন, বাঁকুড়ায় ৫০০০০ লোক দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়, কিন্তু সবকার তাতে সাহায্য দেন মাত্র ১২০০০ টাকা, অর্থাৎ মাথা পিছু চার আনা মাত্র। আর একজন বক্তা বলেন, জেলাশাসক নিজেই স্বীকাব করেছেন, খুলনায ৯০০০০ লোক দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়, তাদেব মধ্যে ১০০০ লোক সম্পূর্ণ অনাহাবে কাটায়, কিন্তু সরকার সাহায্য দেন মাত্র ৪০০০ টাকা। জে, সি, চক্রবর্তী বলেন, দিনাজপুর জেলাব বালুরঘাটে ১৫০০০ লোক দুর্ভিক্ষে পড়ে এবং বালুবঘাট মহকুমাব ২১৬৫টি গ্রামে বিপুল সংখ্যক লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে।[১৯]

এ সবই ছিল প্রধানত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ও অনাবৃষ্টির ফল। এব পরে দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব পালা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পবে সাধারণ মানুষের অবস্থা আবো শোচনীয় হয়ে উঠে। দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সেই অনুপাতে সাধারণেব আযবৃদ্ধি হয না। যুদ্ধের সময় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য বসদ যুদ্ধে যায বলে অসামরিক জনসাধারণের জীবনে ঘাটতি বাড়তে থাকে। যুদ্ধের পবে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির শ্রম-বিষয়ক উপকমিটি যে রিপোর্ট দেন, তাতে স্বীকার করা হয, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য-সংগ্রহের সরকাবি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কালো-বাজারি দ্রুত বেড়েছে এবং অনৈতিকতার কোনো সীমা থাকে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা আসে তারই শোচনীয় পরিণাম বাংলার কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩)। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মন্বন্তরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ ফল ('direct result') বলে অভিহিত করেছেন। এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার ১৫ লক্ষ মানুষ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার বহু

১৮। Indian Annual Register, 1921, p 250

১৯। Indian Quarterly Register, July-Dec, 1928, Vol II (Report on Bengal Legislative Council)

প্রাণহানি ছাড়াও বাংলার জাতীয় জীবনে একটি শোচনীয় সুদূর-প্রসারী ফল লক্ষ্য করা যায়। দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটির মুখ থেকেই এই শোচনীয় পরিণামের কথা শোনা অধিকতর প্রামাণিক হবে :

"A million and a half of the poor of Bengal fell victim to circumstances for which they themselves were not responsible Society, together with its organs, failed to protect its weaker members Indeed, there was a moral and social breakdown, as well as administrative breakdown "[২০]

বোধ হয়, এই moral ও social breakdown আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর ও দুরপনেয় প্রমাণিত হয়েছে।

এই দুর্ভিক্ষের জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে দায়ী করলেও আরো কতকগুলি ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তার মধ্যে, সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সুরাবর্দির শিথিল শাসন ব্যবস্থায় চোরা-কারবারের আধিক্য। তখন এদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত। এবং এই শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজের প্রশাসনিক কঠোরতা ছিল না। ফলে দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও চোরা-কারবারী দমনে সরকারি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, সরকারের নিজের মধ্যে অর্থলিপ্সা এত বেশি ছিল যে, ১৯৪৩ সালে পাঞ্জাব থেকে বাংলা সরকার যে প্রচুর গম কিনেছিলেন তা এই দুর্দিনে জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে বিতরণ না করে বরং গম-কারখানার মালিকদের কাছে তা অধিক মূল্যে বিক্রি করে সরকার প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা লাভ করেছিলেন। এ সমস্ত মূল কারণ ছাড়া আরো কতকগুলি গৌণ কারণ ছিল এই দুর্ভিক্ষের মূলে, যেমন—১৯৪২ ৪৩ সালে আমন ধান ও আউস ধানের উৎপাদনে ঘাটতি, চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে শস্যের ক্ষতি, বর্মা থেকে চাল আমদানির অবসান এবং যুদ্ধের ফলে আরাকান ও বর্মা থেকে উদ্বাস্তু আগমন।

এই সব কারণে পঞ্চাশের মন্বন্তর সংঘটিত হয় এবং তাতে বাংলার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বাঁধা মাইনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, চরম দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। অভাবে তার স্বভাব নষ্ট হয়, সামাজিক বন্ধন ও নীতি-নিয়ম ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আত্মিক সম্পদ সব খুইয়ে দেউলে হয়ে বাঙালি কোনো রকমে বেঁচে থাকে মাত্র।

অস্বাস্থ্য

দেশের যে অভাব-অনটন-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের রূপ আমরা আধুনিক যুগে দেখতে পেলাম, তাতে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এতে দিন দিন জাতীয় স্বাস্থ্য ক্রমিক অবনতির দিকে চলেছিল। একদিকে, পুষ্টিকর খাদ্যের কথা দূরে থাক, জীবন ধারণের জন্য সামান্যতম খাদ্য সংগ্রহও কষ্টকর হয়ে উঠল, অন্যদিকে পল্লী থেকে মানুষ যতই চাকরির জন্যে নগরে এসে ভিড় করতে থাকল ততই আলো বাতাসপূর্ণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব দেখা দিল। শিল্পাঞ্চলের দূষিত আবহাওয়া জাতীয় স্বাস্থ্যের শিরায় শিরায় বিষ ছড়িয়ে দিল। যারা বেকার ছিল তারা বিকৃত জীবন-যাপন করতে প্রলুব্ধ হল, আর চাকুরিতে

২০। Report of the Femine Enquiry Committee, May, 1945

যারা নিযুক্ত তারাও অতিরিক্ত উপার্জনের জন্যে জীবনের অবকাশকে সংক্ষিপ্ত করে শ্রমের সময় বর্ধিত করল। পল্লীতে চিরাগত ম্যালেরিয়া ও শিল্পাঞ্চলে ক্ষয় রোগ আমাদের আধুনিক জীবনের দুটি ব্যাপক ব্যাধিরূপে দেখা দিল। বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকের স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় "At least a hundred million people suffered from malaria every year, and either directly or indirectly two million annually died of it The number of active cases of tuberculosis was at any time in the neighbourhood of two millions and a half and approximately 500 000 people died annually due to this disease alone"

বাংলার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের বীভৎস দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম তাঁদের জীবনে স্বাস্থ্যের ক্ষীণ আলোক রশ্মি আগমনের পথটুকুও রোধ করে দিয়েছিল। বাংলায় জুট শিল্পই বেশি, আর এই জুট-শিল্পের অঞ্চলগুলি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ দারিদ্র্যে জর্জরিত। বাংলার জুট-শিল্পাঞ্চলগুলির শ্রমিকদের বেদনাদায়ক চিত্র জহরলাল নেহরুর আত্মজীবনীতে অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে।

১৯২৮ সালে বাংলায় যে শ্রমিক-আন্দোলন হয় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"The conditions in Bombay were bad enough, but perhaps even worse was the lot of the jute workers, within an hour's drive of the places of Calcutta, semi-naked women, wild and unkempt, working away for the barest pittance, so that a broad river of wealth should flow ceaselessly to Glasgow and Dundee, as well as to some pockets in India."[২১]

কলকাতার অদূরে জুটশিল্পের এই প্রসার গণজীবনের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। ঐ সব অঞ্চলের শ্রমিকদের দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম তাদের জীবনীশক্তিকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছিল। তার ওপরে তাদের বসবাসের ক্ষেত্রে বস্তি অঞ্চলগুলি রোগের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। শিল্পনগরীগুলিতে শ্রমিকদের এই অস্বাস্থ্যকর বসবাসক্ষেত্র এই বস্তি এলাকাগুলি শুধু শ্রমিক স্বাস্থ্যকেই নষ্ট করে নি, এখান থেকে রোগ, মহামারী এবং নানা রকমের সমাজ-বিরোধী জীবনধারা ও বিকৃতি আমাদের পার্শ্ববর্তী সমাজ জীবনেও ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তার আবহাওয়াকে দূষিত করেছে। আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বে শিল্পবিস্তারের কুফল স্বরূপ এই বস্তি অঞ্চলগুলি বিশেষ সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দেয় এবং তৎকালীন চিন্তা নায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২৬ সালের ৫ই জানুয়ারি কলকাতায় All India Economic Conference-এর যে দশম অধিবেশন হয় তার তৃতীয় দিনে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন :

"Mill towns and industrial centres are still allowed to be built and to grow in India without reference to any plan or the possibilities of industrial development and expansion of population Calcutta with her large number of single huts of 'bastees' compacted together and Bombay with

২১। Nehru, Jawaharlal 'An Autobiography' London 1949, p 188

her mmena back-to-back tenement houses represent two characteristic types of bad housing which are gradually spreading to every smaller town in India.'[২২]

ইংরেজ রাজত্বে এদেশে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারের ফলে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কিছুটা সহায়তা হয়েছিল, ভারত সরকার মহামারী প্রতিরোধের জন্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু শিল্পাঞ্চলগুলির এই অপরিকল্পিত বিন্যাস অস্বাস্থ্যকর বস্তির ক্রমিক প্রসার এসবের আমূল সমাধান না করায় এদেশের জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নি। যে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য ও অন্নাভাব এদেশের স্বাস্থ্যহানির কারণ তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সরকার শুধু গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে যাচ্ছিলেন। ১৯১৯ সালের 'ভারত সরকার আইন' অনুসারে স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি প্রাদেশিক সরকারের উপরে পড়ায় বাংলা সরকার বাংলার অস্বাস্থ্যের সঙ্গে একক সংগ্রাম চালাতে প্রায় অক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের 'ভারত সরকার আইন' আবার স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায় প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় ও উভয় (concerent)। এতে স্বাস্থ্য রক্ষার কাজও কিছু কিছু এগিয়ে আসছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় সরকার থেকে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। ফলে এদেশের স্বাস্থ্য নিয়ে দাবি তোলাবার একটি বড় শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেই কারণে এবং বিশ্বযুদ্ধের চাপে জনস্বাস্থ্যের প্রতি সরকারের অমনোযোগ বেড়ে যায়। দেশে বারবার কলেরা ও প্লেগ ভীষণ আকারে দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরগুলির সঙ্গে মহামারী হাত মেলাতে থাকে। বাংলা আধুনিক যুগে অস্বাস্থ্যকে জীবনের সঙ্গী করে নেয়।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

যে বাঙালি এইভাবে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও মহামারীতে বিপর্যস্ত হল তারই ভাগ্যে আধুনিক যুগে সংঘটিত হল আরো একটি অবাঞ্ছিত সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস হল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষজনিত। একাধিকবার বাংলার বুকে হিন্দু মুসলমানের রক্তাক্ত সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই বিরোধিতার বীজও উপ্ত হয়েছিল বিশ শতকের গোড়া থেকে—বঙ্গ ভঙ্গের (১৯০৫) কাল থেকে, আর এর বর্ধিষ্ণু রূপ দেখা দিল আমাদের আলোচ্য আধুনিক যুগে ১৯২৩ সাল থেকে অর্থাৎ 'কল্লোল' দশকের কাছাকাছি সময় থেকে। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায় যখন নিজেদের দূরে রাখতে চাইলেন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন, তখনই ইংরেজরা এই বিরোধিতার অঙ্কুরটিকে বাড়িয়ে তুলতে চাইলেন, তাদের Divide and Rule নীতিটি সক্রিয় হয়ে উঠল। ব্রিটিশ সরকার স্যার সইয়দ আহম্মদকে নিজের পক্ষে এনে তাঁর সহায়তায় মুসলমানদের কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করলেন। সইয়দ আহম্মদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করলেও (যেমন, ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা) তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই একটি হিন্দু বিদ্বেষ-প্রবণতা ছিল।

২২। Indian Quarterl Register Vol II July Dec 1926 p 422

এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষেব বীজ তিনিই রোপণ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কংগ্রেস ও হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে তিনি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে Educational Congress, United Patriotic Association, Mohommedan Anglo-Oriental Defence Association of Upper India, Aligarh Anglo-Oriental College প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুসলমানদের তিনি বুঝিয়েছিলেন, সাধারণভাবে ভোটগ্রহণের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হলে তাতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। যদিও আব্দুল রসুল, গজনবি, লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি দু-একজন প্রগতিশীল মুসলমান বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কোনো কোনো মুসলমান নেতা কংগ্রেসের অধিবেশনেও যোগদান করেছিলেন, তবু সাধারণভাবে সইয়দ আহম্মদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নির্লিপ্ত রইলেন। শুধু তাই নয়, ঢাকায় এক অধিবেশন করে তাঁরা বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অসমর্থনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আগা খাঁ মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের জন্যে (Separate Electorate) লর্ড মিণ্টোর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ঐ বছর ঢাকার নবাব সেলিম-উল্লাহের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হল এবং এইভাবে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় পৃথক হয়ে যাওয়ায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধিতার বীজ রোপণ করা হল। এই বীজ তার প্রথম বিষময় ফল প্রসব করল ১৯০৭ সালে, ভারতে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ দেখা দিল এবং মুসলমানদেব উৎসাহিত করল ১৯০৯ সালের মার্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার, মিণ্টোর প্রতিশ্রুত মুসলমানদের জন্যে পৃথক্ ভোট-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল।

এরপরে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ কিছুকাল বন্ধ থাকলেও চিরকালের জন্যে নির্মূল হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইসলাম ধর্মের আচার্য তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্যকে মিত্রপক্ষের শক্তিবর্গ যখন বিভক্ত করতে চাইলেন, তখন তার প্রতিবাদে সৌকত আলি ও মহম্মদ আলির নেতৃত্বে ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায় 'খিলাফৎ আন্দোলন' শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস এই আন্দোলনকে সমর্থন করায় মুসলমান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধ কিছুকাল থেমে ছিল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এই সৌভ্রাত্র ছিল একান্তই সাময়িক। ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ প্রবলরূপে দেখা দেয় এবং তার পর থেকে প্রায়ই এই সংঘর্ষ হতে থাকে। মোপলা নামক আরব-মুসলমানরা মালাবার উপকূলে হিন্দুদের উপরে নির্মম অত্যাচার করে। ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বরে কোহটে যে সংঘর্ষ হল, তার পর থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রবল রূপ ধারণ করে। এর পরে কলকাতায় তিন দফা দাঙ্গা হয় এবং বাঙালির জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে ওঠে। ১৯২৫-এর মাঝামাঝি বকর্ ইদ্ উপলক্ষে দিল্লি ও এলাহাবাদে যে দাঙ্গা হয় তারই সঙ্গে কলকাতায় প্রথম দফা সংঘর্ষ রূপ লাভ করে। গার্ডেন্ রীচে এই সংঘর্ষে বহু প্রাণহানি হয়। এরপর কলকাতায় ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে যে দ্বিতীয় দফা মারামারি হয় তা

ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। এই সংঘর্ষ এত ব্যাপক ছিল যে Calcutta Gazette-এ পুলিশ কমিশনারের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে এই সংঘর্ষকে বলা হয় 'unprecedented in the history of Calcutta'। হ্যারিসন রোডের উপর দিয়ে আর্যসমাজের একটি শোভাযাত্রা দিনু চামড়াওয়ালা মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের বাদ্যযন্ত্র বন্ধ করতে অনুরোধ করা হয়, এবং তা বন্ধ না করায় এই দাঙ্গা বেঁধে উঠে। এই আপাত এবং গৌণ কারণের পেছনে ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের বহুদিনের ক্ষোভ এবং এতে বেশির ভাগ অবাঙালিগণই যোগদান করেছিলেন। এতে সারা কলকাতায় সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ সারা বাংলা দেশে প্রবল রূপ নেয়। কলকাতা ছাড়া এই সময়ে রাওলপিণ্ডি, পুণা, এলাহাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শহরেও হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ দেখা দেয়। কলকাতায় তৃতীয় পর্যায়ের সংঘর্ষ হয় এ বছরের জুলাই মাসে---পাইকপাড়ায় রথযাত্রা, বড়বাজারে রাজ রাজেশ্বরী যাত্রা আর মহরমকে কেন্দ্র করে এই দাঙ্গা শুরু হয়। এই সব প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরে সাধারণ মানুষ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। ক্ষতবিক্ষত বাঙালির নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনি পাই এই সময়ের সাময়িক পত্রিকায়। কলকাতায় দ্বিতীয় দফা দাঙ্গার পরে 'কালি কলম' এ লেখা হয়

"কলিকাতায় মাসব্যাপী যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গেল তাহাতে নাকি হিন্দুরও চোখ ফুটিয়াছে মুসলমানেরও চোখ খুলিয়াছে। অর্থাৎ বাংলার হিন্দু রাজনীতিকরা আর মুসলমানদের দলে টানিয়া রাখিবার গরজে তোড়াতালির পথে পা বাড়াইবেন না; এদিকে মুসলমানরাও খাঁটি মুসলমান হইবেন, অর্থাৎ মুসলমানদের স্বার্থই আগে দেখিবেন স্বরাজের লোভে আর হিন্দুদের ভাই বলিয়া ডাকিবেন না।"[২৩]

এই সাম্প্রদায়িকতাকে গোড়া থেকেই ইংরেজ শাসকবর্গ উৎসাহিত করেছিলেন। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে রাজনৈতিক রূপ দেবার জন্যে সরকার যেমন তাঁদের জন্যে পৃথক্ ভোট ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেছিলেন, তেমনি এই চেতনাকে সাংস্কৃতিক পুষ্টিদানের জন্যে সাম্প্রদায়িক আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করাকেও স্বীকৃতি দান করেন। ১৯২০ সালে Mahomedan Anglo-Oriental College-কে Aligarh Muslim University-তে পরিণত করার জন্যে আইন পাশ হয় এবং এই আইনে স্পষ্ট করেই সাম্প্রদায়িক আদর্শকে সমর্থন করা হয় : 'to promote Oriental and Islamic Studies and give instruction in Muslim theology and religion and to impart moral and physical training'[২৪]—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হয়।

সাম্প্রদায়িক ফাটল ধরাবার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টা ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আংশিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই দুটি প্রতিষ্ঠান হল হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ। এদের মূল উদ্দেশ্য যা-ই থাক এবং এদের একাধিক প্রস্তাবে পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ও সহানুভূতির কথা যতই থাক, তবুও সাধারণ মানুষ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের

২৩। গুহ, নলিনী কিশোর, 'কালি-কলম' প্রথম বর্ষ' ৮ সংখ্যা, পৃঃ ১১৭।

২৪। Aligarh Muslim University Act, 1920

আদর্শকে ভুল বুঝে এদের কাছ থেকে ধর্মের বদলে সাম্প্রদায়িকতার প্রেরণাই বেশি পাবার চেষ্টা করেছে। ১৯২৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর গৌহাটিতে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন হয় তাতে অভ্যর্থনা-কমিটির চেয়ারম্যান হেমচন্দ্র গোস্বামী ধর্মের আদর্শে গোষ্ঠী গঠনের প্রেরণাকে উৎসাহিত করেন :

"It is high time that we should organise a solid religious association for the whole of India having its branches in different provinces to advance the causes of Hindus and Hindusm"[২৫]

ঐ বছরে ভারতে যে হিন্দু-মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়, তাতে যে ঘটনাটি উত্তর ভারতের হিন্দুদের সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত করেছিল তা হল মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রাণহানি। শ্রদ্ধানন্দ 'শুদ্ধি'-ক্রিয়া প্রবর্তিত করে অন্যধর্মের ইচ্ছুক ব্যক্তিকে হিন্দুধর্মে গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করে উত্তর ভারতের হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সেই শ্রদ্ধানন্দের প্রাণহানিতে পূর্বোক্ত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি মদন মোহন মালব্য বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে ১৯২৬ এর ডিসেম্বরেই দিল্লিতে All India Muslim League এর অষ্টাদশ অধিবেশন হয় এবং তাতেও সাম্প্রদায়িকতার সুর শোনা যায়। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান খান বাহাদুর পিরজাদা মুহম্মদ্ হোসেন বলেন :

"Each compact group with common interest bound by ties of common religion, language and culture should be parcelled out into separate provinces to determine its own future in harmony with the larger common interests of the entire continent"[২৬]

ধর্মের ভিত্তিতে এইভাবে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব সেদিন ভারতের ঐক্যের প্রতিকূল ফল প্রসব করেছিল। এই অধিবেশনের আরো একটি ভয়াবহ দাবি ছিল communal representation-এর জন্যে। এইভাবে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ এদেশের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরোক্ষভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধ যতই প্রখর হতে থাকে রাজনীতিক্ষেত্রে ততই এঁদের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। ১৯৩০ সালের সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার জন্যে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে এই অসহযোগিতা প্রখর রূপে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বারের অধিবেশনে (১৯৩১) গান্ধীজী যোগদান করেছিলেন, কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক দাবি উপস্থাপিত করে এই অধিবেশনে কোনো সমাধানের আশা সুদূর পরাহত করে তোলেন এবং গান্ধীজীর শত চেষ্টাতেও কোনো সুরাহা হয়ে ওঠেনি। আর ব্রিটিশ সরকার এই অনৈক্যে উস্কানি দেবার জন্যে মাঝে মাঝে যেমন চেষ্টা করে আসছিলেন, তেমনি এবারেও চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার

২৫। Indian Quarterly Register, Vol II July, Dec, 1926, p 354

২৬। Indian Quarterly Register, Vol II July Dec 1926, Report on 'All India Muslim League Conference

(Communal Award) কথা ঘোষণা করেন। সরকারের এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। এরপর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনৈক্য দ্বিতীয় বার দেখা দেয় বাংলার মাটিতেই। ১৯৩৫-এর 'ভারত সরকার আইন' অনুসারে ১৯৩৭-এ যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও বাংলা ও পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা কম ছিল। তখন মুসলিম লীগ বাংলাদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইলেন। কিন্তু সাময়িক রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে কংগ্রেস তার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে রাজি হল না—সাম্প্রদায়িক আদর্শে গঠিত মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলানো কংগ্রেসের পক্ষে সেদিন সম্ভব হল না। তখন মুসলিম লীগের নেতা জিন্না বিভিন্ন প্রদেশে গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মতবাদ গঠন করতে ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার (১৯৩৯) সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে, এবং তখন সেই শূন্যস্থান মুসলমান প্রতিনিধিরা অধিকার করেন। ১৯৪০ সালে লর্ড লিনলিথ্‌গাও ঘোষণা করেন যে ভারতে একাধিক দল ও সম্প্রদায় রয়েছে সুতরাং কোনো একটি দলের (কংগ্রেস) হাতে ভারতের শাসন-ভার তুলে দেওয়া হবে না, বড় জোর যুদ্ধের পরে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) গঠন করা হবে। এই সুযোগ পেয়ে ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগের নেতা জিন্না ঘোষণা করেন, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র জাতি (Two Nation Theory) এবং মুসলমানদের জন্যে 'পাকিস্তান' নামে পৃথক্ রাষ্ট্র চাই কিন্তু ১৯৪২ সালে ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাবে পৃথক্ পাকিস্তান গঠনের দাবি স্বীকৃত হয়নি। ভারত বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না বলে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী থেকে কংগ্রেসের কাছে দূত পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন ক্রিপ্‌স্ মিশনের প্রস্তাব মেনে নেবার জন্যে। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর অনুরোধে কর্ণপাত করেনি। অন্যদিকে মুসলিম লীগের আক্রোশ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক্ রাষ্ট্রের দাবি এত প্রবল হয়ে ওঠে যে পরবর্তীকালের ঐক্যসাধনের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। ১৯৪৪ সালে রাজা গোপালাচারী পরিকল্পনা করেছিলেন (C R Formula) যে, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে যদি পাকিস্তান গঠনের দাবি ভোটের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই ভারতবর্ষকে দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হবে. অবশ্য এই দুটি রাষ্ট্রই একটি প্রায়-যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের অধীন হবে, প্রতিরক্ষা, পরিবহণ, ডাক ও তার প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের কাজ-কর্ম যুগ্মভাবে পরিচালিত হবে। রাজা গোপালাচারীর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপরে ১৯৪৫ সালে লর্ড্ ওয়াভেল্ হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের সমান সমান প্রতিনিধি নিয়ে ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র নির্মাণের জন্যে যে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করেন, জিন্না সাহেব তাতেও রাজি হন নি এবং সে প্রচেষ্টাও বিফল হয়ে যায়। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কত প্রখর হয়ে উঠেছিল!

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে লেবার পার্টির জয় হয় এবং ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রি এট্‌লী ভারতের সমস্যার সমাধানে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি লর্ড পেথিক্ লরেন্স, এ. ডি. আলেক্‌জাণ্ডার ও স্ট্র্যাফোর্ড্ ক্রিপ্‌স্‌কে নিয়ে গঠিত একটি মিশন (Cabinet Mission) ভারতে পাঠান ১৯৪৬ সালে। এই মিশনের দুটি প্রস্তাবকে ভিত্তি করে পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ গড়ে ওঠে। এই মিশন ভারতে যে স্বাধীন জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের প্রস্তাব করেছিল, সেই যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার জন্যে একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) গঠন করতে চেয়েছিল—তাতে থাকবে বিভিন্ন প্রদেশের তথা দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ। আর এই স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত ভারতে এক অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার গঠন করা হবে এবং তা ভাইসরয়ের এক্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের পুনর্গঠন করে তার দ্বারা পরিচালিত হবে। এই দুটি প্রস্তাবের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবটি কংগ্রেস প্রথমে গ্রহণ করে নি। কিন্তু মুসলিম লীগ ভাইসরয়কে অনুরোধ করতে থাকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই শুধু লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার জন্যে। কিন্তু ভাইসরয় কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে রাজি হলেন না। কংগ্রেস কিন্তু অন্য প্রস্তাবটি অর্থাৎ সংবিধান-সভা গঠনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্যে মুসলিম লীগের দাবি অস্বীকৃত হওয়ায় লীগ ক্যাবিনেট মিশনের সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং ক্ষুব্ধ হয়ে সোজাসুজি আন্দোলন (Direct Action) করবার হুমকি দেয়। মুসলিম লীগ সরে দাঁড়ানোর ফলে ১৯৪৬ সালে ভাইসরয় মুসলমান প্রতিনিধিদের বাদ দিয়েই তাঁর এক্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিল পুনর্গঠিত করেন। এতে কংগ্রেসের একচেটিয়া বিজয় দেখে জিন্না বিদ্বেষে জ্বলে ওঠেন এবং ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ তার সোজাসুজি আন্দোলন শুরু করেন। এরই ফল হল ১৯৪৬ এর কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। সুরাবর্দির মন্ত্রিসভার ছায়াতলে মুসলমান সম্প্রদায় কলকাতায় এক ব্যাপক হিন্দুনিধন যজ্ঞে লিপ্ত হন। সরকারের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে হিন্দুরা সংঘর্ষের দ্বিতীয় দিন থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে নেমে পড়েন। চার দিন ধরে কলকাতায় যে বীভৎস হানাহানি ও দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পাঁচ হাজারের বেশি প্রাণহানি হয় ও পনেরো হাজার লোক আহত হয়। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ক্রমে কলকাতা ছেড়ে নোয়াখালি ও ত্রিপুরাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে-সব স্থানে হিন্দুদের জীবনহানি হয় সবচেয়ে বেশি। হিন্দুদের প্রাণনাশ ছাড়া হিন্দুদের ধর্মনাশ, হিন্দুনারীর সতীত্বহরণ প্রভৃতি ঘটনাও প্রচুর সংখ্যায় ঘটতে থাকে। ফলে ভারতের অন্য প্রদেশে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বিহারের হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরপরে ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী যখন ঘোষণা করলেন দায়িত্বশীল দলের নেতৃবর্গের হাতে ভারতের শাসন ভার দিয়ে দেওয়া হবে, তখন জিন্না বুঝেছিলেন দায়িত্বশীল দল বলতে কংগ্রেসকেই বোঝানো হয়েছে এবং তাঁর আক্রোশ আর এক দফা হিন্দু-নিধনে ফেটে পড়ে—এবারে এই নরবলি যজ্ঞের ক্ষেত্র হয় পশ্চিম পাঞ্জাব। এর পরে বাংলা ও

পাঞ্জাবের জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, এই দুই প্রদেশকে বিভক্ত না করলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অবসান হবে না। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ। যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বিশ শতকের জাতীয় জীবনকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল তার ফল বাংলা তথা ভারতের আধুনিক জীবনকে শোচনীয় ভাবে ভোগ করতে হল।

সামাজিক ভাঙন ও মানবীয় মূল্যবোধের বিপর্যয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাঙালির উপর দিয়ে যে একটার পর-একটা দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেছে তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা এপর্যন্ত করলাম। এই ঝড়ের বেগে বাঙালির সমাজ জীবনের চালা ঘরটিও ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। সমাজ-জীবনটি ভাঙল এবং তারই সঙ্গে বাঙালির মানবীয় সম্পদ বিপর্যয় দেখা দিল। একদিকে সামাজিক বাঁধন ছিঁড়ল, সমাজের রীতিনীতি ভাঙল, অন্যদিকে অন্তরের সম্পদ, জীবনের মহৎ মূল্যবোধ, শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ভাবনা থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হল। আদর্শের উচ্চ কোটি থেকে জীবনদৃষ্টির এই স্খলনই হল আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

বাঙালির সমাজ গঠনের দু'টি প্রধান সূত্র ছিল হিন্দুর বর্ণভেদ-প্রথা ও একান্নবর্তী পরিবার। এই দুইয়ের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার যত দোষই থাক এই প্রথা যে হিন্দুর সমাজ-জীবনে একটা সুদৃঢ় বন্ধনরূপে দীর্ঘকাল কাজ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বর্ণভেদ-প্রথা হিন্দু সমাজে আভ্যন্তরীণ বিভেদ যেমন সৃষ্টি করেছে, তেমনি এই প্রথা বাহ্য সংমিশ্রণ থেকে হিন্দু সমাজকে প্রাচীরের মতো রক্ষা করে এসেছে। মধ্য যুগে ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যখন হারিয়ে গেল তখন হিন্দু সমাজের বাহ্যবন্ধন ছিল এই জাতিভেদ প্রথাকে আশ্রয় করেই। আধুনিক যুগে এই জাতিভেদে যখন ভাঙন ধরল তখন তার চারিদিকের প্রতিরক্ষার প্রাচীরটিও ধসে পড়ল। জাতীয় চেতনায় ব্যাপ্তি এল, তেমনি পুরাতন বন্ধন শিথিল হওয়ায় বহিরাগত জলস্রোতের প্রথম ধাক্কায় সমাজ-জীবন ভেসে গেল। জাতিভেদ-প্রথাকে আশ্রয় করে হিন্দুর যে সমস্ত জরাজীর্ণ অন্তঃসারশূন্য মূল্যবোধ ঝুলছিল, সে সবই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

বৈদিক বর্ণভেদ প্রথার তুলনায় মধ্যযুগীয় বর্ণভেদ-প্রথা ছিল অনেক বেশি যান্ত্রিক ও জটিল। যুগে-যুগে আচার্য ও মনীষীরা এই প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন— বুদ্ধ, রামানন্দ, মাধব, জ্ঞানেশ্বর চৈতন্য, বল্লভাচার্য, কবীর, দাদু প্রমুখের আন্দোলনে জাতিভেদ-নিরপেক্ষ সাম্য ও মৈত্রীর বাণী বার-বার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাতে সাময়িকভাবে সমাজে জাতিভেদ কিছুটা শিথিল হলেও একেবারে ভেঙে যায় নি। ব্যাপক ভাঙন ধরল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। নবযুগের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ছাড়াও ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই প্রথার মূলে কঠোর আঘাত হানল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ সেবার প্রচেষ্টা এবং বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও হরিজন-সেবার আন্দোলন জাতিভেদ প্রথার ভাঙন ও রূপান্তরের কাজ করেছে। এছাড়া জাতিভেদ প্রথার

ভাঙনের মূলে তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ত্রুটিও কম দায়ী নয়। মধ্য যুগ থেকেই এই প্রথায় বংশগত ভাবে জাতিনির্ণয় এবং জাতিগত ভাবে বৃত্তিনির্ণয় করা হতো। কিন্তু ব্যক্তির প্রতিভার গতি সব সময়ে বংশগত উত্তরাধিকারকে অনুসরণ করে চলে না। যখন জাতিগত বংশগত পেশার সঙ্গে ব্যক্তিপ্রতিভার বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই সমাজবিধির বিরুদ্ধে একটা চাপা আক্রোশ দেখা দেয় এবং সমাজবিধানে আঘাত লাগে।

এই আভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বর্ণভেদ প্রথায় আঘাত লেগেছে। ব্রিটিশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালত সমাজের উচ্চবর্ণের হাত থেকে বিচারক্ষমতা ও শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে থাকে। ফলে সমাজে উচ্চবর্ণের কর্তাদের সম্পর্কে সাধারণের ভয় ও শ্রদ্ধা কমে আসতে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক বন্ধনও শিথিল হয়ে আসে। এই সময়ে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ আত্মোন্নতি-প্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা ঘোষণার জন্যে নানা সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, এতেও বর্ণভেদ প্রথায় খানিকটা আঘাত লাগে। কারণ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বর্ণের ভিত্তিতে উচ্চনীচ ভেদাভেদ তুলে দিয়ে নিম্নবর্ণের জন্যে সমানাধিকার দাবি করে। আধুনিক যুগে যন্ত্রসভ্যতা, শিল্পপ্রসার ও বাণিজ্য-বিস্তারের ফলেও ব্যক্তি তার জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে চাকরি ও ব্যবসার মাধ্যমে নতুন-নতুন ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করল। এতে জাতিগত ভিত্তিতে বৃত্তিবিভাগ অনেকটাই অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হল আর প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দিল। বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যখন নিম্নবর্ণের মানুষ চাকরি বা ব্যবসা করে ধনী হয়ে উঠলো, এবং সমাজে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পেশা লাভহীন হওয়ায় তাদের মধ্যে দারিদ্র্য দেখা দিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্ণের ধনী লোকেরা প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করল। অবশ্য এই সব কারণে জাতিভেদ প্রথা আধুনিক কালে যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তা নয়, তবে তার মূল ভিত্তি যে সম্পূর্ণ নড়ে গেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জাতিভেদ প্রথায় যখন ভাঙন ধরল তখন একান্নবর্তী পরিবার প্রথাও ভাঙতে আরম্ভ করল। যদিও আধুনিক কালে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙার আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, তবু জাতিভেদ প্রথায় ভাঙনও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়। আপাত দৃষ্টিতে জাতিভেদ ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথা পৃথক হলেও অন্তরে অন্তরে এই দুই প্রথার মধ্যে একটি দুর্লক্ষ্য যোগ ছিল এবং জাতিভেদ-প্রথা একান্নবর্তী পরিবারকে পরোক্ষে রক্ষা করে এসেছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক পাণিক্কর এবিষয়ে বলেছেন :

"Though in theory unconnected, these two institutions, the caste and the joint family, are in practice interlocked to an extent which makes them in effect a common institution."[২৭]

আগেই বলেছি, জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজে একটা প্রতিরক্ষার প্রাচীরের মতো কাজ

২৭। Panikkar, K. M. 'Hindu Society at Cross-Roads', 2nd ed., Bombay, 1956, p. 19

করেছে, ফলে বাইরের প্রভাব সমাজ-জীবনে সহজে নতুন চিন্তা বা জীবনধারা এনে দিতে পারে নি। বর্ণ বিভাগের যে নিরাপদ খোলসে হিন্দুসমাজ এতদিন স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বাস করে আসছিল, আধুনিক যুগে সেই খোলসটি যখন ভাঙল তখন বিদেশি বায়ুর প্রভঞ্জনে একান্নবর্তী পরিবার প্রথার ছোট ছোট মূল্যবোধ ও সমাজবিধিও ভাঙতে আরম্ভ করল। তা ছাড়া, যতদিন জাতিভেদ-প্রথা বেঁচে ছিল ততদিন বাংলার সমাজে প্রত্যেকের বৃত্তি ছিল জাতিগতভাবে সুনির্দিষ্ট। এই সমস্ত বৃত্তি বা পেশার প্রকৃতি আবার এমন ছিল যে সেগুলি পরিচালনার জন্যে ব্যক্তির পক্ষে তখনকার দিনে একান্নবর্তী পরিবারের বহুসদস্যবিশিষ্ট এককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত তখনকার দিনে কৃষি ও কুটির শিল্পগুলির কাজে পরিবারের সকলের প্রয়োজন হতো এবং পরিবারের সকলের ভূমিকা ছিল নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য। আধুনিক যুগে জাতিভেদ-প্রথা শিথিল হল, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি জাতি-নির্দিষ্ট পেশা ছেড়ে নতুন নতুন পেশা বেছে নিল; সেসব পেশায় পরিবারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার অপরিহার্যতা সর্বত্র রইল না, ফলে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যেতে আরম্ভ করল।

জাতিভেদ-প্রথায় শিথিলতা ছাড়া একান্নবর্তী পরিবার ভাঙার আর যে সমস্ত কারণ ছিল, এবারে সেগুলি স্মরণ করা যেতে পারে। সমাজের বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজটি প্রথম উপ্ত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্য প্রভাবে এদেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হল, তখনই। কিন্তু তখনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এত উগ্র ও ব্যাপক হয়নি যাতে একান্নবর্তী পরিবারের মূলে আঘাত লাগতে পারে। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙল বিশ শতকে। এই ভাঙনের মূলে সবচেয়ে বলিষ্ঠ দুটি কারণ হল – শিল্পায়ন আর নগরমুখিনতা (industrialisation and urbanisation)। আধুনিক যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সীমাবদ্ধ জমির উপরে অংশীদারের সংখ্যা বাড়তে থাকে ঋণের দায়ে বহু কৃষক জমিহীন হয়ে পড়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অবৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতির ফলে কৃষি অনিশ্চিত ও লাভহীন হতে থাকে, অন্যদিকে নগরে নানা শিল্পের প্রসার হয় এবং নতুন ধরনের চাকরির পথ খুলে যায়, ফলে লোকে চাকরির লোভে নগরে ধাবিত হয়। পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ায় পরিবারগুলি ভাঙতে আরম্ভ করে। কৃষিনির্ভর সমাজে পরিবারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, চাকরিজীবীর কাছে সে প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। উপরন্তু কৃষিনির্ভর ও কুটিরশিল্প-নির্ভর জীবনে সমগ্র পরিবারের আয়ের একটিমাত্র সাধারণ উৎস ছিল, কিন্তু চাকরি-নির্ভর জীবনধারায় প্রত্যেক সদস্যের আয় হল পৃথক্ পৃথক্। সেখানে একজনের আয় অন্যজনের চেয়ে বেশি হলে স্বার্থবোধ জাগা স্বাভাবিক এবং তাতে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরাও স্বাভাবিক। বিশ শতকে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থাও বেড়েছে এবং এর ফলে ব্যক্তির স্বার্থচেতনা প্রখর হয়েছে, পরিবারের অবান্তর সদস্যের দায়িত্ব বহন করতে ব্যক্তি অসমর্থ হচ্ছে এবং তাতে পরিবার ক্রমশ ছোট করার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। পল্লী থেকে লোকে যতই নগরে গিয়ে চাকরির জন্যে ভিড় করছে ততই নানাবিধ কারণে পরিবারকে ছোট করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। এই সব কারণে পরিবারগুলো ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট

পরিবারে ('Nuclear Family') পরিণত হচ্ছে। অনেকটা অপরিহার্য কারণেই—

"We are tempted to say that nuclearity is increasing and jointness decreasing."[২৮]

স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামাজিক সম্পর্ক থেকে পরিবারগুলো নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আনছে। সামাজিক আনন্দ-উৎসবগুলো এখন সমস্বার্থভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আসছে। সমাজ এখন বাধ্যতামূলক-প্রতিষ্ঠান (Compulsary institution) নয়, স্বেচ্ছামূলক সংগঠনে (voluntary association) পরিণত হয়েছে।

আগেকার দিনে যখন কৃষি ও কুটির শিল্প ছিল প্রধান উপজীবিকা তখন সন্তানের বৃত্তিশিক্ষা হতো পরিবারের মধ্যে আপনা থেকেই। তাতে পরিবারের সঙ্গে সন্তানের যোগ থাকত। কিন্তু আজকে বাণিজ্য ও শিক্ষা সভ্যতার দিনে জীবিকার জন্যে যে জাতীয় বিশেষীকৃত শিক্ষা দরকার সে শিক্ষা পরিবারে হবার নয়। সন্তানকে পরিবার থেকে বেরিয়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-ক্ষেত্রে যোগ দিতে হচ্ছে। কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু শিক্ষাই নয় অতি অল্প বয়স থেকে শিশুদের সর্ববিধ দায়িত্বও গ্রহণ করা হয়। সে ক্ষেত্রে পিতামাতা টাকা দিয়েই খালাস। এভাবে যে সব শিশু মানুষ হচ্ছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই পরিবারকে অপরিহার্য মনে করে না। ফলে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দুঃখ প্রকাশ সত্ত্বেও পিতামাতা সন্তানের উপরে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন! পরিবারের প্রতি সন্তানের মমতাবোধ কমে আসছে এবং পরিবারের বন্ধন শিথিল হচ্ছে।

সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনধারা (secularism) প্রবর্তিত হওয়ার ফলেও পারিবারিক মূল্যবোধগুলি গুরুত্ব হারাচ্ছে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের পবিত্রতা ও সনাতনত্ব প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আধুনিক যুগে ধর্ম প্রায় নির্বাসিত হওয়ায় এই সব সামাজিক পারিবারিক বোধও অন্তঃসারশূন্য প্রতিভাত হচ্ছে।

আধুনিক যুগে সন্তানের শিক্ষালাভ করে চাকরি পেয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে; কিন্তু ব্যক্তির দৈহিক স্তরে বৈবাহিক যোগ্যতা ও প্রাকৃতিক দাবি ততদিন অপেক্ষা করতে পারে না। ফলে অবিবাহিতদের মধ্যে প্রণয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কও গড়ে ওঠে।[২৯] এই জিনিসগুলি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনছে এবং পরিবারের পবিত্রতা নষ্ট করছে। পরিবারের সঙ্গে তার সদস্যদের সম্পর্ক যতই ক্ষীণ হয়ে আসছে, সামাজিক নীতিবোধ ও পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ যত কমে আসছে, চাকরি-নির্ভর জীবনে নিজের স্বতন্ত্র বেতন সম্পর্কে সচেতনতা যত বাড়ছে, নগরে বসবাসের স্থানাভাব যত তীব্র হচ্ছে,—ততই বড় বড় একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে কপোত-কপোতী যথা ছোট ছোট পরিবারে বসবাসের প্রবণতা

২৮। Desai, I P 'The Joint Family in India An Analysis' in "Sociological Bulletin" Vol V, No 2, Bombay, 1956, p 154

২৯। Dutt Gupta, Bela 'Contemporary Social Problems in India,' Calcutta, 1964, pp 64-65

ততই ব্যাপক হচ্ছে। এই সব ছোট ছোট পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনের পেছনে সমাজ প্রতিষ্ঠানের চাপ নেই, আছে পারস্পরিক প্রয়োজনবোধ, বোঝা-পড়া এবং মমত্ব; এই পরিবারে আভ্যন্তরীণ বন্ধনও স্বেচ্ছামূলক (voluntary)। এইভাবে আগেকার দিনের 'institutional family'র বদলে আধুনিক যুগে এল 'companionship family'.[৩৩]

এই সমস্ত অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া কতকগুলি আইন আমাদের পরিবার প্রথায় ভাঙন ধরাল।

এইগুলি হল :

১। The Hindu Law of Inheritance (Amendment) Act 1929

২। The Gains of Learning Act. 1930

৩। The Hindu Woman's Right to Property Act. 1937

৪। Hindu Married Woman's Right to Separate Residence and Maintenance Act 1946

৫। The Hindu Marriage Disabilities Removal Act. 1946

৬। Hindu Marriage Validating Act, 1949

এগুলির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থটি একান্নবর্তী পরিবার প্রথার মূলে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করেছিল। Gains of Learning Act অনুসারে ব্যক্তি যদি আপন বিদ্যার দ্বারা কোনো সম্পত্তি সঞ্চয় করে তবে তার একমাত্র একক অধিকারী সেই হবে, সমগ্র পরিবারের কোনো অধিকার সেই সম্পত্তির ওপরে থাকবে না। Hindu Woman's Right to Property Act অনুসারে হিন্দু বিধবা তার মৃত স্বামীর প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হতো এবং সম্পত্তির ওপরে সমগ্র পরিবারের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। চতুর্থ আইনটি ব্যবস্থা করল, বিবাহিত হিন্দু নারী স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্যে ইচ্ছে করলে স্বামীকে ছেড়ে পৃথক্ বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারে।

এইভাবে পুরানো সামাজিক কাঠামো ভেঙে যায় এবং সমাজের দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলি ভেঙে যেতে থাকে। যে সমস্ত বিধিবিধান সামাজিক ও পারিবারিক রূপবন্ধকে আগলে রাখে নবযুগের নতুন জীবনদৃষ্টিতে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন প্রতিভাত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ব্যবস্থায় অচল প্রতিপাদিত হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনে, দুঃখদৈন্য ঝড়ঝঞ্ঝায় সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠে এবং স্বদেশে বিদেশে নিত্যনতুন চিন্তাধারা ও মতবাদ জন্মলাভ করে পুরাতন ধ্যান-ধারণায় আঘাত দিতে থাকে। অথচ সব ভেঙে কোনো নবীন সুসঙ্গত পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শও তখন ব্যাপকভাবে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। ফলে সমাজ-জীবনে শিথিলতা ও অন্তর্জীবনে শূন্যতা এযুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এযুগে যে সব জাতীয় নেতা জাতীয়-জীবনে নতুন সংগঠন ও বিপ্লবের বাণী প্রচার

৩৩। Burgess. E W & Locke H J 'The Family', New York. 1953, pp 26-27

করেছেন, তাঁরাও এই মৃত্যুমুখী যুগ-প্রবণতা উপলব্ধি করেছিলেন। এই যুগপুরুষদের মুখেই এই যুগের যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি শোনা অধিকতর বিশ্বাসজনক হবে। ১৯২০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর নাগপুরে যে All India College Students' Conference হয়, তার সভাপতি সে যুগের উত্তর ভারতের প্রভাবশালী জাতীয় নেতা লাজপৎ রায় বলেন—

"We are living in a world which is throwing away every day new ideas Nobody knows and understands the evil influences, the slave tendencies and the immoral nature of a great many institutions of modern civilization I have said in my book that modern civilization is dying, and die it must, and it is clear that it is suffering from a disease from which it cannot be cured "[৩১]

আধুনিক যুগে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর আমাদের অন্তরের শুষ্কতা ও দৈন্য, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও আত্মার অপমৃত্যু ঘটাতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশীল প্রতিপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এযুগের শিল্পায়ন, যন্ত্রীকরণ বণিকবৃত্তির প্রসার ও অসমবণ্টন (industry, technology, commerce and unequal distribution)। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে আলোচ্য পর্বে আমাদের দেশে শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটেছে, উৎপাদনে যন্ত্রের ক্রমিক প্রভাব বেড়েছে। ফলে সমাজে নগরমুখিনতা বেড়েছে. জীবন হয়েছে যান্ত্রিক ও ব্যস্ত, অবসর ও অবকাশ কমে যাওয়ায় জীবনদৃষ্টিতে অন্তর্মুখিনতা ও ভাবমুখিনতা কমেছে, এবং ব্যবসায়ী বুদ্ধির বিস্তারে স্বার্থকেন্দ্রিকতা হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করেছে। এযুগে অর্থনৈতিক দৈন্যের চাপে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা চাকরির জন্য বেরিয়ে আসায় বাঙালির দীর্ঘকালের লালিত গৃহগত মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ে চাকরিজীবী হওয়ায় সন্তানেরা পারিবারিক স্নেহপ্রীতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অভিভাবকহীনতার ফলে তাদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির অভাব ও অপরাধপ্রবণতা দেখা দিচ্ছে। আলোচ্য পর্বে শিল্পায়ন ও যন্ত্রীকরণের এই বিষময় প্রভাব অনেক মনীষীই উপলব্ধি করেছেন এবং সমসাময়িক পত্রিকায় এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সময় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'উত্তরা'-র পৃষ্ঠায় এসম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেন তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"কৃষির পর ব্যবসা, বাণিজ্য, কলকারখানা হইল।........জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রীতিনীতি, আদব-কায়দা, নিয়মকানুন প্রবর্তিত হইতেছে। মানুষের সহিত প্রকৃতির নহে মানুষের সঙ্গে মানুষের বা শ্রেণী ও সংঘের দান-প্রতিদানই এখন জীবনে শ্রেষ্ঠ পরিচয়।......বিপদ হইল মানুষ ইহাতে কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। যখন প্রাথমিক বৃত্তিনিচয়ের সরল নির্দ্দেশে মানুষ চলিতে পারে না, তখন তাহার জীবন দুর্ব্বহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে জীবনীশক্তিও হারাইয়া বসে। প্রাথমিক বৃত্তিসমুদায়ের সহজ ও সরল স্ফুরণ চরিত্রগঠনের ভিত্তি। তাহা নূতন জীবনযাত্রায় একরূপ অসম্ভব। শ্রমিকের জীবন

৩১। Indian Annual Register, 1921, part III p 243

তাই এত নিরানন্দ, অস্বাভাবিক। যেখানে সর্বাঙ্গীণ জীবনের অধিকার মানুষ হারায় সেখানে সে দুর্দমনীয় আক্রোশে গুমরিতে থাকে, নিদারুণ ব্যথায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে শেষে পশু হইয়া দাঁড়ায়। তাহার দল বা সমাজ তাহার আত্মরক্ষার সহায় না হইয়া আত্মদ্রোহের ইন্ধন যোগায়। তাই দেখিতেছি, আমাদের দেশের বস্তিজীবন মানুষকে পশু বানাইতেছে, স্ত্রীকে অসতী করিতেছে, শিশুর লজ্জা ও পবিত্রতা হরণ করিতেছে। পল্লীজীবনের সহিত শ্রমিকের বস্তিজীবনের ভাব ও প্রণালীর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ......সহরের বস্তিতে শারীরিক অবনতি, জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার বৃদ্ধি, নির্য্যাতিত প্রাণশক্তি, সবই মানুষের পতনেরই পরিচায়ক। মানুষ নূতন আবেষ্টনের সঙ্গে যুঝিতে পারিতেছে না।.....তাই সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হইতেছে; স্বাস্থ্যহানি, দুর্নীতিপরায়ণতা ও সমাজদ্রোহিতা সবই তাহার অকৃতকার্যতার সাক্ষী।"[৩২]

নগরের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে আলো বাতাসপূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত প্রশস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসক্ষেত্র অনেক পরিবারেরই নেই। এতে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি, রোগবিস্তার, পরিবারের সুস্থ সম্পর্ক নষ্ট ও বিকৃত হয়। নগরে বাসগৃহ ঘনীভবন হলেও ব্যক্তির নিঃসঙ্গতার বোধ বেড়ে যায়। প্রতিবেশী সম্পর্কে ঔদাসীন্যের ফলে নগরে অনৈতিক কাজ ও অপরাধ-ক্রিয়ার সুযোগ বেশি থাকে। এই সময়ে আবার পরিবারবন্ধন শিথিল হওয়ায় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের সুযোগ বেড়ে যায়। একদিকে পারিবারিক প্রীতিবন্ধনের নিবিড় আলিঙ্গন ও আন্তরিক উত্তাপ থেকে স্খলিত হওয়ায় ব্যক্তিহৃদয়ের ক্ষুধা বেড়ে যায় এবং অন্যদিকে নগরে স্বেচ্ছাবিহারের সুযোগ বেশি থাকে, ফলে এই ক্ষুধা অবৈধ পথে বিকৃত পরিতৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করে। যুবসমাজের মধ্যে এই প্রবণতা আরো বেশি দেখা দেয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যে বিবাহের দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা তাদের থাকে না, অথচ জীবনের প্রাকৃতিক দাবিগুলি অতৃপ্ত রাখার উপায়ও তাদের থাকে না। ফলে যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রাক্‌বিবাহ প্রণয় ও অবৈধ সম্পর্ক, দরিদ্র শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রচ্ছন্ন পতিতাবৃত্তি তো প্রসারলাভ করছেই, আধুনিক যুগে অপ্রচ্ছন্ন পতিতাবৃত্তিও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। পতিতাবৃত্তি সবদেশে সবকালেই অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক কালে নারী-শিক্ষার বিস্তার ও চাকরির নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হওয়ায় নারীসমাজের এক বৃহৎ অংশ এখন গৃহের বাইরে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে। এতে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন যেমন এসেছে, তেমনি সমাজে নারীর স্বাধীন মেলামেশার সুযোগ ও প্রয়োজন বেড়েছে। ফলে তার জীবনে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। স্বামী নির্বাচনের স্বাধীন ইচ্ছা তো তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছেই, তা ছাড়া বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষের বা একাধিক পুরুষের সংসর্গে আসায় অথবা বিভিন্ন পুরুষের বিচিত্র

৩২। উত্তরা, ১৩৩৩, বৈশাখ (রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'সমাজের ভাবান্তর')।

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা বা মোহ দেখা দেওয়ায় নারীর জীবনে নতুনতর সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে সমাজ থেকে ধর্মীয় বোধ বিদায় গ্রহণ করায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের পবিত্রতা ও সনাতনত্ব কখনো কখনো অর্থহীন প্রতিভাত হচ্ছে। ফলে ব্যক্তির মূল্যবোধ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে এবং ব্যক্তির চিত্তে নানা বৃত্তির জটিলতা ও ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিচ্ছে।

শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির চাপে বিপন্ন হয়েছে তা নয়, আধুনিক পরিবারের অন্য সম্পর্ক এবং মানবীয় মূল্যবোধগুলোও অংশত সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে। আমাদের সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত সম্পর্ক হল সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহের সম্পর্ক। বিশেষত সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসাকে আমরা absolute মনে করে থাকি। কিন্তু আধুনিক যুগে এই পরম পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ভালবাসাও অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে কেমন স্বার্থকেন্দ্রিক ও পক্ষপাতপূর্ণ হয়ে আসছে তার চিত্র সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতেই পাওয়া যায়। 'কল্লোলে'র একটি সংখ্যায় লেখা হয়েছিল .

"ছেলেমেয়েদের উপর রোজগারের জন্য চাপ দেওয়া হয়। প্রতিদিন বা মাসের শেষে উপযুক্ত অর্থ-উপার্জন করিয়া ঘরে না আনিতে পারিলে বাপ মা তাহাদের পীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। এমন পরিবারও দেখা যায়— যেখানে যে পুত্র বেশি উপার্জন করে, মাতা-পিতার স্নেহ ও যত্ন তাহার প্রতি-ই বেশি প্রকাশ পায়।"[৩৩]

এমনি করে আমাদের সামাজিক কাঠামো এবং পারিবারিক বন্ধন ভাঙল এবং যে সমস্ত মানবীয় সম্পর্ক মানব-হৃদয়কে বৃহত্তর অনুভূতিতে পূর্ণ করে সেগুলি মিথ্যা, অনুভূতিহীন ও যান্ত্রিক হয়ে উঠল। ফলে মানবাত্মায় একটা বিরাট শুষ্কতা ও শূন্যতা দেখা দিল। মানবীয় অনুভূতির ক্ষেত্রে যেমন এই অবস্থা দেখা দিল তেমনি অতিমানবীয় বা লোকোত্তর অনুভূতি থেকেও আমাদের যুগ সাধারণভাবে বঞ্চিত হল। জীবন অতিমাত্রায় ব্যস্ত বিপর্যস্ত হওয়ায়, দৃষ্টিভঙ্গি অতিমাত্রায় বাস্তবধর্মী ও স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং শিক্ষা অনেকটা বস্তুবিজ্ঞান-ভিত্তিক অর্থকরী লক্ষ্যে নিবিষ্ট হওয়ায় জীবনের উচ্চতর কোটি থেকে আমাদের দৃষ্টি সরে এল, অধ্যাত্মের উপলব্ধি বা অমৃতের সাধনা সাধারণভাবে আমাদের কাছে আবেদন হারাল, আত্মায় বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস ব্যাপক যুগ প্রবণতা রূপে দেখা দিল। লৌকিক ও লোকোত্তর উভয় ক্ষেত্রে অনুভূতির অভাব মানবজীবনে যে শূন্যতা আনল তাতে জীবন হয়ে উঠল অনুর্বর পোড়ো জমি ('Waste Land')। সর্বব্যাপী নৈরাশ্যে কবি এযুগের মানবাত্মার ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত করলেন:

This is the way the world ends,
This is the way the world ends,
This is the way the world ends,
Not with a bang but a whimper!
—T S Eliot

৩৩। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩৩০, পৌষ ('আলোচনা')।

আগেই বলা হয়েছে আমাদের দেশের আধুনিক যুগের সঙ্গে ইউরোপের দেশগুলির আধুনিক যুগের কিছুটা পার্থক্য আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশে বিদেশি শাসকের শোষণ, শিল্পপ্রসার ও যন্ত্রপ্রগতি, বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাত, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, অস্বাস্থ্য, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কারণে সমাজে ও জীবনে ব্যাপক ভাঙন ও অবক্ষয় দেখা দিল, অন্তরের শূন্যতা ও শুষ্কতা বৃদ্ধি পেল, মানবীয় মূল্যবোধগুলি বিপর্যস্ত হল। সাধারণভাবে এসব দুরবস্থা যুদ্ধোত্তর পর্বে অনেক দেশেরই আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি ছিল একটি ব্যাপক জাতীয় জাগরণ ও আত্মিক অভ্যুত্থান। চরম দুর্গতির মধ্যেই যেন জাতীয় আত্মা মরিয়া হয়ে জেগে উঠতে চেয়েছিল। এই জাগরণের প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় আন্দোলনে, স্বাদেশিকতার সক্রিয় রূপের উদ্বোধনে নানা রকমের সামাজিক সংস্কার ও সংগঠন প্রয়াসে, অবহেলিত সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠায়, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারত আত্মার শাশ্বত বাণীর পুনর্ঘোষণায়, এবং শিক্ষা ও দর্শনে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আশাবাদী মতবাদের জন্ম ও প্রতিষ্ঠায়। এপর্যন্ত আমরা আধুনিক যুগের অবক্ষয় ও ভাঙনের রূপচিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছি। এবারে এই যুগের অন্য দিক – তার জাগরণ ও সংগঠনের বিভিন্ন দিকও—উদ্‌ঘাটিত ও বিশ্লেষিত করার চেষ্টা করব।

জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রাম

আধুনিক যুগে চরম অবক্ষয় ও জাতীয় অপমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতীয় আত্মা যে হঠাৎ নবজন্ম লাভের তীব্র আকাঙ্খায় জেগে উঠতে চেয়েছিল, তার সবচেয়ে বলিষ্ঠ পরিচয় হল বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন যদিও অনেক আগে থেকেই একটু একটু করে দানা বাঁধছিল[৩৮] এবং যদিও বিশ শতকের আগেই এর সাংগঠনিক রূপের প্রথম পরিচয় ধরা পড়েছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের (National Congress) প্রতিষ্ঠায়, তবু এর যথার্থ সংগ্রামী রূপের অগ্নিগর্ভ প্রকাশ হয় বিশ শতকেই— ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের কাছাকাছি সময় থেকেই। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫—এই পর্বটুকুতে কংগ্রেসের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত ব্রিটিশ সরকারের কর্মধারার সমালোচনা এবং স্বদেশের উন্নতির জন্যে নানারকমের শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত সংস্কার (reforms)-এর দাবিতে। সামনা-সামনি কোনো সংগঠিত আন্দোলন ও সংগ্রামে কংগ্রেস তখনো অবতীর্ণ হয় নি। সরকারের আর্মস্ অ্যাক্ট্ এবং আবগারি শুল্ক ও লবণ করের সমালোচনা করে কংগ্রেস জাতির স্বার্থ বিষয়ে সরকারের ন্যায় বিচার দাবি করেছিল। কংগ্রেসের আরো দাবি ছিল

---

৩৪ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হনুমন্তিয়া গিরি ও ভবানী পাঠকের চেষ্টায় রংপুরে সন্তান বিদ্রোহ, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ও হুগলীর গোঘাটে চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তরাংশে নায়েক বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবী বিদ্রোহ, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নীলকর আন্দোলন, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভায় নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় প্রার্থীদের আসন-লাভের সুযোগ দেওয়া, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করে দেশের সাধারণ ও অর্থকরী শিক্ষার প্রসার-সাধন, দেশে কার্যনির্বাহক (executive) ও বিচার-বিভাগের (judiciary) স্বতন্ত্রীকরণ, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা আই.সি. এস-এ ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ দান প্রভৃতি। এসব দাবি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অল্পস্বল্প পূর্ণ হলেও জাতীয় নেতৃবৃন্দের আশানুরূপ ফললাভ হয়নি। ফলে ক্রমে আবেদন নিবেদন, প্রস্তাব ও সমালোচনার নীতি সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে থাকে এবং বিশ শতকে এসেই জাতীয় সংগ্রামী রূপের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আবার, এই সংগ্রামীরূপের প্রকাশ বিশ শতকে ক্রমে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রধান দীক্ষাকেন্দ্র ছিল বঙ্গভূমি এবং বিশেষ করে কলকাতা এবং চন্দননগর। আমাদের আধুনিক বাংলা দেশের এই মহৎ অবদান তৎকালের সর্বভারতীয় নেতারা অনেকেই স্বীকার করেছিলেন। অনেক পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিরূপে লালা লাজপৎ রায় যা বলেছিলেন তাতে এই স্বীকৃতিরই পরিচয় পাই

> It was a Calcutta orator the greatest that the country has so far produced under British rule, who was the first standard-bearer of political agitation all over Northern India It was at Calcutta that the ideals of the new Nationalism that has since then grown into a mighty tree, were first expounded and explained by one of the purest minded and the most intellectual of Bengal's gifted sons I mean Sri Aurabindo Ghosh It was at Calcutta again that the grand old man of India, the revered and universally respected Dadabhai Naoroji, set the ideal of Swaraj before us in clear and unambiguous language, an ideal which has since guided us in all our political endeavour

এই কলকাতা, এই বঙ্গভূমি ও এই কাল আমাদের আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যদিও ১৯২৩-এর পর থেকেই প্রধানত আধুনিক উপন্যাসের যথার্থ সৃষ্টি-পর্ব সূচিত তবু ১৯০৫-৬-৭ থেকে বাংলার যে অগ্নিযুগের সূচনা তার উত্তপ্ত পরিমণ্ডলের রেশও তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারে নি। তা ছাড়া ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের নীতি-পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হলেও তার আত্মার মৌল প্রেরণা যে এক ও অবিচ্ছিন্ন ছিল তা অনস্বীকার্য। সুতরাং ১৯২০-২১-২২-এর পর থেকেই প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক উপন্যাসের পটভূমিকা রচিত হলেও তার পূর্ববর্তী জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসও জাতির অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস হিসাবে অবশ্যই স্মরণীয়।

আবেদন-নিবেদনের নীতি ব্যর্থ হওয়ায় ব্রিটিশের শুভবুদ্ধি সম্পর্কে ক্রমিক মোহভঙ্গের পরে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে ব্যাপক অসন্তোষ গড়ে উঠছিল, তা আন্দোলনের রূপে আত্মপ্রকাশ করল হঠাৎ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯০৫-এর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ

৩৫। Indian Annual Register, 1921, Part III, p 2

জাতীয় আত্মাকে যেন সংগ্রামী চেতনায় জাগিয়ে দিল। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা খ্যাত এবং কুখ্যাত ভাইসরয় তথা গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে বাংলাকে বিভক্ত করলেন। বাংলার কিছু অংশ নিয়ে তিনি 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করলেন, তার রাজধানী করলেন ঢাকা। বাংলা-বিভাগ করে বাঙালির জাতীয় ঐক্যকে নষ্ট করার এই দুরভিসন্ধি জাতির নেতৃবৃন্দকে সচেতন করে তুলল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠল। শুধু তাই নয়, বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের রূপ নিল। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ তো রদ হলই, তার চেয়েও বড় জাতীয় লাভ হল—জাতীয় চেতনার সংগ্রামী রূপের প্রকাশ।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগস্ট বাংলা দেশে ব্যাপক স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। স্কুল কলেজের ছাত্রদের যোগদানের ফলে এই সংগ্রামী স্বাদেশিকতা তীব্রতা লাভ করে। বিদেশি পণ্যের ব্যবহারের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলা হল, জায়গায়-জায়গায় বিদেশি জিনিস জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। বিলাতি বয়কটের সঙ্গে ছিল স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহ দান। স্বদেশী বস্ত্রশিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা, সাবান ও ঔষধ উৎপাদনের কারখানা গড়ে উঠল। বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল এই স্বদেশী প্রেরণারই প্রত্যক্ষ ফল। এই স্বাদেশিকতা পণ্য দ্রব্যের সীমা ছাড়িয়ে শিক্ষা সংস্কৃতিতেও ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় শিক্ষাদানের জন্যে 'নেশন্যাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন' বা 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' স্থাপিত হয়। একে কেন্দ্র করেই পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বরোদা সরকারের ৭০০ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে এসে শ্রী অরবিন্দ এখানে মাত্র ১৫০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে নেশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ, যাদবপুর কলেজ অফ টেকনোলজি এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেডারেশন হল প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, মুকুন্দদাসের দেশাত্মবোধক গানে এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে সেদিন জাতীয়তার উদ্বোধন হয়েছিল। বন্দেমাতরম্ সেদিন এতখানি উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল যে প্রকাশ্য স্থানে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, অশ্বিনীকুমার দত্তের সাংগঠনিক আদর্শ ও শিক্ষাব্রত, সুবোধ মল্লিকের অর্থ সাহায্য প্রভৃতি এই আন্দোলনকে নানাদিক থেকে শক্তিদান করতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য প্রফুল্ল রায়, আনন্দমোহন বসু, সুন্দরীমোহন দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির উৎসাহ ও উদ্দীপনা এই আন্দোলনকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্ করে তোলে। এমন কি, আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, গজনবি প্রভৃতি প্রগতিশীল মুসলমানেরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিলেন।

বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে এই যে স্বদেশ আত্মার জাগরণ হয়েছিল তারই যেন পরিণতি দেখতে পেলাম কংগ্রেসে চরমপন্থী দলের সৃষ্টিতে। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ অনুনয় বিনয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের জন্যে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে চাইলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তাঁদের সঙ্গে নরমপন্থী দলের বিরোধ দেখা দেয়। সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায় এই বিরোধ সাময়িকভাবে মিটে গেলেও পরের বছর ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্কর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে 'স্বরাজ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। চরমপন্থী দলের আদর্শের সঙ্গে মিল হওয়ায় তাঁরা এই শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ, তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীদের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থেই স্বরাজ দাবি করা। সুরাট কংগ্রেসে তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ এই আদর্শ থেকে এক চুল নড়তে রাজী হলেন না। কংগ্রেস স্বরাজ কথাটি সাধারণভাবে গ্রহণ করলেও নরমপন্থীদলের আদর্শ ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। ফলে চরম মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুরাট কংগ্রেসের পরিসমাপ্তি হয়। তখন চরমপন্থী দল দমে না গিয়ে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সংগ্রামী আদর্শের বাণীদূত হল বিপিন পাল প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত ইংরাজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'। বন্দেমাতরমের পাতায় শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ, জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রামের কর্মপ্রণালী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও স্বদেশী সংগঠনের বাণী প্রচার করতে থাকেন। ইতিমধ্যে 'যুগান্তরে' প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও গরিলা যুদ্ধের আদর্শ কিছু প্রচার করেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তরে'র মতো সেদিন চরমপন্থার আদর্শ তুলে ধরেছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা ও সখারাম গণেশ দেউস্করের বিখ্যাত বই 'দেশের কথা'। আর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও জাতীয়তার এই আদর্শ সমর্থন করেছিল 'বেঙ্গলী', 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা। এই সময় একদিকে যেমন বাংলার যুব-সমাজ আত্মমুখী সাংগঠনিক প্রয়াসে হয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ 'অনুশীলন সমিতি'র মাধ্যমে, অন্যদিকে তেমনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের চেষ্টায় বাংলায় 'গুপ্ত-সমিতি' স্থাপিত হয়েছিল বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে গুপ্ত সমিতি গঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তুলেছিলেন। এর কিছু আগে বুয়রযুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে বুয়রদের বীরত্ব ও রুশ-জাপানের যুদ্ধে (১৯০৪) জাপানীদের বীরত্ব পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পৃথিবীর এই বীর সংগ্রামীদের কাছ থেকে ভারতীয় যুবকেরা প্রেরণা লাভ করলেন। বিশেষত ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজদের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় আইরিশদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের যে অধ্যায়টি প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন, বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মধারা তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ও উৎসাহিত হয়েছিল। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' ও গীতার বাণী এই যুবসম্প্রদায়ের প্রাণে শক্তি ও প্রত্যয় সঞ্চারিত করেছিল।

শ্রীঅরবিন্দের চেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবককে লেফ্‌টেন্যাণ্ট মাধব রাও যাদব বরোদার সৈন্যবিভাগে ভর্তি করে নেন। সেখান থেকে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করে তিনি বাংলায় এসে গুপ্ত সমিতির গঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি

শরীরচর্চা, কুচকাওয়াজ, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি যুবকদের মধ্যে শিক্ষা দিতে থাকেন। এদিকে মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস কানুনগো কৌশলে ফ্রান্সে গিয়ে এক গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। সেখান থেকে বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির কৌশল শিখে বাংলা দেশে ফিরে আসেন এবং গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়ে ভাবতে তিনিই প্রথম বিস্ফোরক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি শিক্ষা দিতে থাকেন।

ব্রিটিশ সরকার যখন এই সশস্ত্র বিপ্লব দমন করার জন্যে কয়েকজন নেতাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, স্বাদেশিকতার আদর্শে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে দেন এবং চরমপন্থীদের বাণীবহ পত্রিকাগুলিকে বন্ধ করার নানা কৌশল করতে থাকেন, তখন চরমপন্থীরা সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও ইংরেজদের নিহত করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা তাঁদের কর্মপদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা করেন মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতি। নারায়ণ-গড়ের কাছে রেললাইনের তলায় ডিনামাইট পুঁতে রেখে বাংলার গভর্নর ফ্রেজার সাহেবের গাড়ি উল্টে দেবার চেষ্টা হয়। এযুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ক্ষুদিরাম বসুর কিংসফোর্ড নিধনের চেষ্টা। কিংসফোর্ড যখন কলকাতায় চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তাঁর ওপরে 'যুগান্তরে' রাজদ্রোহ-মূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রীঅরবিন্দের বিচারের ভার পড়ে। এই মামলায় বিপিন পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় কিংসফোর্ড তাঁকে শাস্তি দেন। তাঁর এই অন্যায় বিচারে সমবেত জনতা বন্দেমাতরম ধ্বনি করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। আদালতের এই উত্তেজিত জনতাকে বিক্ষিপ্ত করার জন্যে ব্রিটিশ ইন্সপেক্টর যখন বেত চালাতে থাকেন তখন সুশীল সেন নামে এক যুবক তাঁকে মুষ্ট্যাঘাত করে। বিচারক তখন সুশীল সেনকে ১৯ বার বেত্রাঘাত গ্রহণের শাস্তি দেন। এই সব কারণে কিংসফোর্ডের উপরে গুপ্ত সমিতির ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। এর পরেই তিনি মজফফরপুরে স্থানান্তরিত হলে সমিতির নির্দেশে প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু তাঁকে হত্যা করার দায়িত্ব নেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে নিহত করার জন্যে যে গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন তাতে ঘটনাক্রমে কিংসফোর্ড ছিলেন না। বোমায় অন্য দুজনের মৃত্যু হয় (১৯০৮-এর ৩০ এ এপ্রিল)। শাস্তি স্বরূপ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এরপরেই বিপ্লববাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সরকার ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান শুরু করেন। ২রা জুন, ১৯০৮ মানিকতলায় মুরারিপুকুর বাগানে বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কৃত হয়, সেখানে বোমা তৈরির সাজসরঞ্জাম ও পুস্তকাদি ছাড়া বিপ্লবাত্মক চিঠিপত্র, রাইফেল, রিভলবার ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখানে ধরা পড়েন শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ। এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ যে জবানবন্দী দেন তাতে স্পষ্ট করেই বলেন :

"স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইন-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী—একথা

স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহার জন্যই আমি জীবন ধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন।"

বস্তুত এই স্বীকারোক্তি শুধু শ্রীঅরবিন্দের নয়, এ হল সেই যুগের সমগ্র জাতিরই আত্মার নির্ভীক ঘোষণা। আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বে জাতীয় অবক্ষয় ও বিনষ্টির মধ্যেও যে একটি বীর্যদীপ্ত আত্মার বোধন হচ্ছিল, জাতি যে তার জাগরণে ও নিদ্রায় একটি বড় স্বপ্ন লালন করছিল, তার পরিচয় এখানে সুস্পষ্ট।

যা হোক, মানিকতলা বোমার এই মামলায় ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করায় শ্রীঅরবিন্দ খালাস পান। কিন্তু বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। নরেন্দ্র গোস্বামী বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশ পক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হওয়ায় কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলিপুর জেলেই তাঁকে গুলি করে মারেন। ফলে তাঁদের দুজনেরই ফাঁসি হয়। এই মামলার ব্যাপারে ব্রিটিশের তদন্তকারী সামসুল আলমকে হাইকোর্টেই গুলি করে মারেন বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত এবং তার ফলে ফাঁসি বরণ করেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। সরকার পক্ষের উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করার অপরাধে চারুচন্দ্র বসুর ফাঁসি হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

এরপর শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে যান, তিলকের মৃত্যু হয়, বিপিন পাল বিলাত চলে যান এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষের দ্বীপান্তর হয়, ফলে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কতকটা মন্দীভূত হয়; কিন্তু এই ধারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলন নতুন করে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

রাসবিহারী বসু বসন্তকুমার বিশ্বাসকে দিয়ে দিল্লিতে গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার জন্যে বোমা নিক্ষেপ করান ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। হার্ডিঞ্জ মারা না গেলেও এতে দুজনেরই ফাঁসির আদেশ হয়, কিন্তু রাসবিহারী বসু আত্মগোপন করেন। এরপরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে বিরাট বিপ্লবের আয়োজন করেন তা কোনো গুপ্তচরের চেষ্টায় ফাঁস হয়ে যায়। এর পরে তিনি ছদ্মনামে পাসপোর্ট করে জাপানে চলে যান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফেলে আসা সৈন্যদের নিয়ে জেনারেল মোহন সিংহের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনে সহযোগিতা করেন এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানী থেকে জাপানে আসায় তাঁর হাতে এই সৈন্যবাহিনী অর্পণ করেন।

এদিকে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। জার্মানী তাঁকে যে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিল তা জাহাজ থেকে নামাবার সময় পুলিশ তাঁকে ধরার চেষ্টা করে। তখন তিনি দলবলসহ বুড়িবালাম নদীর ধারে একটি জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করায় সেখানেই পুলিশের সঙ্গে তাঁর দলের সংঘর্ষ হয়। যতীন্দ্রনাথ গুলির দ্বারা আহত হন ও হাসপাতালে মারা যান।

এরপরেই বিপ্লবীদলের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০ এর ১৮ই এপ্রিল)। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন

করেন। তাঁরা কলকাতা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও মিলিটারী পোষাক সংগ্রহ করেন এবং ঐ পোষাকে চট্টগ্রামের সরকারি অস্ত্রাগার পরিদর্শন করার ছলনায় অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন এবং অতর্কিতে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। এই লুণ্ঠনের পরে জালালাবাদ পাহাড়ে তাঁরা আত্মগোপন করায় সেখানে সরকারি সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। তাতে অনেকেই নিহত হন। সূর্য সেন ধৃত হয়ে পরে ফাঁসি বরণ করেন। এরপরে মেদিনীপুরের বহুস্থানে, ঢাকায় হাওড়ায়, কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ এবং আলিপুরের বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, ইন্সপেক্টর প্রভৃতি হত্যা করার ঘটনা ১৯৩২-৩৩ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চলতে থাকে।

বাংলার বিপ্লব প্রয়াসে মেদিনীপুরের ভূমিকা বরাবরই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর সবচেয়ে গর্বিত নিদর্শন হল তাম্রলিপ্তে প্রথম স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা (১৯৪২)। মেদিনীপুরের বহু বীর শহীদের মধ্যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমল ও মাতঙ্গিনী হাজরার কথাই আজ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে সর্বভারতে যখন আগস্ট বিপ্লব শুরু হয় তখন মেদিনীপুরের বহু মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের নির্ভীক প্রচেষ্টায় তমলুকে ভারতের মধ্যে প্রথম স্বাধীন জাতীয় সরকার ঘোষিত হয়। প্রথমে থানা, পোষ্ট অফিস রেজিস্ট্রী অফিস, আদালত প্রভৃতি অধিকার করে সেগুলির উপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার শাসন-ক্ষমতা অধিকার করার চেষ্টা করা হয়। গোড়ার দিকে এই আন্দোলন ছিল অহিংস এবং পরে নিরস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়। মাহিষাদল, কাঁথি বেলবুনি, নন্দীগ্রাম বৃন্দাবনপুর, কেশপুর, পটাশপুর, পূর্বালক্ষ্যা, ভগবানপুর প্রভৃতি স্থানে বহু লোক পুলিশের আঘাতে নিহত হয় ও অনেকে ধৃত হয়ে কারাবরণ করে। পরে জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার গঠন হলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার উঠে যায়।

আধুনিক যুগের বাংলার বিপ্লববাদের একটি মোটামুটি নিজস্ব ধারা থাকলেও বাংলার জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সর্বভারতীয় আন্দোলনেরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত সূত্রও এই জন্যে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বাংলায় জাতীয় আন্দোলন বিশ শতকের প্রায় প্রথম থেকে শুরু হলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে ১৯১৮-এর পর থেকেই, এর দু বছর আগে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নেতৃত্ব লাভ করেন এবং তাঁর পূর্ণ স্বরাজের আদর্শে কংগ্রেসকে পরিচালিত করেন। এর পরে ১৯১৯-এ মহাত্মা গান্ধীর উপরে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পিত হয়। তার আগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে ভারতীয়দের দাবি পূরণ হয় নি। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এক সঙ্গে নতুন দাবি পেশ করে। যুদ্ধে ভারতীয়দের সহযোগিতা পাবার আশায় ইংরাজ সরকার কিছু আশার বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন নি।

১৯১৯-এর শাসন সংস্কার আইনে দেখা গেল কার্যত ভারতীয়দের দাবি কিছুই পূর্ণ হয় নি। এর ফলে ১৯১৯-এর পর থেকেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন বলিষ্ঠতর রূপ নেয়। এই সময় আবার এদেশের জাতীয় আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করেও ব্রিটিশ সরকার বহুনিন্দিত রাওলাট আইন পাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী তখন এই আইন অমান্য করার জন্যে যে ডাক দেন তাতে সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংস আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ (১৯১৯) আন্দোলনকেও দমন করার জন্যে সরকার সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এই সময় পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালা বাগে একটি সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার ওপরে নির্মমভাবে সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ করে, তাতে প্রায় চারশ লোক নিহত ও দেড় হাজার লোক আহত হয়। এই নৃশংসতা ভারতবাসীর মন থেকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত মুছে দিল। কবিগুরু 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। ভারতে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হল। এই আন্দোলনকে আরো শক্তিদান করল 'খিলাফৎ আন্দোলন'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্ক রাজ্যকে মিত্রপক্ষ বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুরস্কের খলিফাকে মুসলমান সম্প্রদায় অধিনায়কের মর্যাদা দেন। তাঁর রাজ্য বিভাগের প্রতিবাদে সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি ভারতে ইংরাজ-বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে তোলেন, কারণ ইংরেজ ছিল মিত্রশক্তিদের মধ্যে অন্যতম। গান্ধীজী এই খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করায় ভারতে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন মিলিতভাবে ইংরাজ বিরোধিতায় নিযুক্ত হয়। প্রথমে এদের যুগ্ম অসহযোগ-আন্দোলন অহিংস ছিল, কিন্তু গোরখপুরের চৌরীচৌরাতে অসহযোগীরা হঠাৎ পুলিশের থানা আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে দেয়। অসহযোগ-আন্দোলন অহিংসার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে দেখে গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ-আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

এদিকে ১৯১৯-এর শাসন সংস্কার আইন ১৯২১ থেকে প্রযুক্ত হল। তাতে নির্বাচনের মধ্যে ভারতীয়দের আইনসভায় আসনলাভের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু কর্তৃক গঠিত স্বরাজ্য পার্টির সদস্যরা বাংলা ও মধ্যপ্রদেশের আইন-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন এবং ব্রিটিশের বিরোধিতা করে আইন-সভার কর্মধারা বানচাল করে দেন। দেশবন্ধু এই আইনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেন। এতে যে দ্বৈত-শাসনের বীজ ছিল তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন।

অসহযোগ-আন্দোলনে ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর মনোভাব বুঝতেই পেরেছিলেন, তার উপর দেশবন্ধুর অব্যর্থ রাজনৈতিক কৌশলে বুঝতে বাধ্য হন ১৯১৯-এর আইন দিয়ে ভারত শাসন অসম্ভব। এই আইনের কার্যকারিতা অনুসন্ধানের জন্যে লর্ড আরউইন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশন নিয়োগ করেন।

এদিকে ১৯২৭ সালেই কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ এদেশের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের

ইচ্ছা ছিল ১৯২৯ এর আগে ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতবর্ষকে ডমিনিয়ান স্টেটাস্ দিয়ে দেন তা হলে তা-ই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জনমত এর অনুকূল না হওয়ায় ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেসে একেবারে ঘোষণাই করা হয় যে, ডমিনিয়ান স্টেটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের দাবি। পরের বছর মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান শুরু হয়। প্রথমে মাত্র ৭৮ জন অনুচর নিয়ে তিনি লবণ আইন অমান্য করা শুরু করেন। এই আইন অমান্য ক্রমে এত ব্যাপক হয় যে, ক্রমে প্রায় ষাট হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। বিদেশি বর্জন, ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ প্রভৃতিতে এবারে মহিলারাও যোগদান করেন।

এরপরেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সাইমন কমিশনের রিপোর্ট (১৯৩০) সম্পর্কে আলোচনার জন্যে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্যে আহ্বান। মহাত্মা গান্ধী এই সময় কারারুদ্ধ থাকায় কংগ্রেস প্রথম বারের অধিবেশনে যোগদান করে নি। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপরেই গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; তাতে সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় বারের অধিবেশনে যোগদান করেন। এতে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত হওয়ায় অধিবেশন ব্যর্থ হয়। গান্ধীজী আর তৃতীয় বারের অধিবেশনে (১৯৩২) যোগদান করেন নি। দ্বিতীয় বারের অধিবেশন ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজীকে আবার কারারুদ্ধ করা হয়। এদিকে কংগ্রেসের অনুপস্থিতি উপেক্ষা করেও ব্রিটিশ সরকার গোলটেবিল বৈঠকের উপরে ভিত্তি করে ভারতের শাসন সংস্কারের কাঠামো তৈরি করেন। তাতে মুসলমানদের জন্যে আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা (Communal Award 1932) এবং অনুন্নত হিন্দুদের জন্যেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়। এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী কারাগারেই আমরণ অনশন শুরু করেন। বাধ্য হয়ে সরকার তাঁকে আবার বিনা শর্তে মুক্তি দেন।

গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ওপরে ভিত্তি করে ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার আইন পাশ হয়। কিন্তু এই আইনে আইনসভা ও মন্ত্রীসভার কার্য নিয়ন্ত্রণ ও নাকচ করার ক্ষমতা গভর্নরগণ ও গভর্নর-জেনারেলের হাতে থাকায় কংগ্রেস এই আইন সমর্থন করে নি। পরে লর্ড লিনলিথগো যখন প্রতিশ্রুতি দেন তিনি আইনসভা ও মন্ত্রীসভার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না, তখন এই অনুসারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস যোগদান করে (১৯৩৭) এবং ৯টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; শুধু বাংলা ও পাঞ্জাবে মুস্লিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। ৯টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার দক্ষতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেসের অনুমতি ব্যতিরেকে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে মিত্রপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। যুদ্ধের পরে ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর সরকার দিলেন না। প্রতিবাদ-স্বরূপ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু এই সময় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন বামপন্থী দল গঠন করেন---ফরওয়ার্ড ব্লক (১৯৩৯)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান জার্মানীর পক্ষ নিয়ে যখন ভারতের প্রান্তে ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর দখল করে ফেলল তখন ভারতের নিরাপত্তা ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তিত করে তুলল। ভারতের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্রিটিশের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ল। ক্রিপস্ মিশন (১৯৪২) এল, ভারতীয়দের দাবি মেটাবার জন্যে নতুন শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব করল। কিন্তু এ প্রস্তাবে ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি বলে কংগ্রেস ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এর পরেই ভারতে আবার অগ্নিস্ফুরণ নতুন রূপ নিল ১৯৪২-এর বিখ্যাত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে। 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন ভারতের নিরাপত্তার জন্যে ব্রিটিশের দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই; জার্মানীর বিরোধী পক্ষ ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলেই জার্মানী আর ভারত আক্রমণ করবে না। ১৯৪২ এর ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হল। পরের দিনই সরকার মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করেন। কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। এতে আন্দোলন প্রচণ্ড সংঘর্ষে ফেটে পড়ে। স্থানে স্থানে সরকারী অফিস আক্রমণ করা হয়, সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করা হয় এবং সরকারের শাসন অচল করে তোলার জন্যে বিবিধ প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়। অবশেষে এই সহিংস আন্দোলনের প্রতিবাদে স্বয়ং গান্ধীজী অনশন করাতেই এই আন্দোলন শান্ত হয়।

পরের বছর ভারতের অগ্নিগর্ভ রূপের আরেক প্রকাশ দেখা গেল পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের (১৯৪৩) গঠনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেসব ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিল তাদের সঙ্গে মালয় ও ব্রহ্মদেশের ভারতীয়দের নিয়ে এই সৈন্য বাহিনীর গঠন ভারতের প্রান্তদেশে হলেও এটি ভারতের বীর্যবত্তারই এক প্রকাশ, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে নেতাজী সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারত সরকার (আজাদ হিন্দ সরকার) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আসামের কোহিমা ও বিষেণপুর পর্যন্ত ইংরেজের অধিকার থেকে কেড়ে নিতে পেরেছিলেন। শেষে অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে এই বীর-বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়

এর পরে ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীর ভারতীয় কর্মচারীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমনি করে একটার পর একটা বিদ্রোহ ও সংগ্রামে এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে ইংরেজ সরকার ক্রমে উপলব্ধি করলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন চালানো আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক মতামতও এ ব্যাপারে ভারতীয়দের ন্যায্য দাবি স্বীকার করেছিল। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সালে ইংল্যাণ্ডে রক্ষণশীল দলের চার্চিলকে পরাজিত করে প্রগতিশীল লেবার পার্টির এট্‌লী প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি ভারতে যে ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬) পাঠিয়েছিলেন, তার পর ভারতে সংবিধান সভা ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ইত্যাদির ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দ্বন্দ্বে ও নানা গোলযোগে আরো প্রায় দু'টি

বছব কেটে গেল। অবশেষে ১৯৪৭ সালেব জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভাবতেব স্বাধীনতা আইন পাস হয এবং তদনুযাযী ঐ বছব ১৫ই আগস্ট ভাবতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত অবস্থায স্বাধীনতা লাভ কবে।

ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব এই সুদীর্ঘ অধ্যায এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হল। এই আলোচনায খুঁটিনাটি অনেক কথাই আমাদেব বাদ দিতে হযেছে, কাবণ ইতিহাসেব বিবৃতি আমাদেব লক্ষ্য নয। আধুনিক পর্বে জাতিব এক জাগ্রত রূপ তাব বীর্যবত্তা ও অভিনব সাংগঠনিক প্রয়াস, জাতীয অবক্ষযেব মধ্যেও যে বিকাশ লাভ কবেছিল তাব পবিচয দানই আমাদেব উদ্দেশ্য। এই পবিচিতি-দানেব জন্যেই ইতিহাসেব শুধু মূল সূত্রগুলি আমবা অনুসবণ কবেছি।

নব-নব চিন্তাধাবা ও আশাবাদী জীবনদর্শন শ্রীঅববিন্দ, কার্ল মার্কস্ ইত্যাদি

এযুগে জাতীয আন্দোলনে যেমন আমাদেব প্রাণশক্তিব প্রকাশ দেখা গেল তেমনি এই সময়ে নব নব আশাবাদী দর্শনেব প্রবর্তনায ও বিশ্বেব চিত্তলোকেব সঙ্গে যোগস্থাপনায দেশেব মনীষাব এক আত্মিক অভিনিবেশেব পবিচয পাওয়া গেল। জাতিব জীবনে উপর্যুপবি যতই বিপর্যযেব বিভিন্ন বজ্রাঘাত এসে জীবনকে ভেঙে চুবমাব কবতে চাইল ততই যেন ভাবতআত্মাব অন্তর্দৃষ্টি গভীবতব লোকে ডুব দিযে চবম সত্যেব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হল, চবম দুঃখেব মুখোমুখি দাঁড়িয়েই যেন জানতে চাইল জীবন-ট্র্যাজেডিব পবম সমাধান কোথায? ভাবতীয মনীষাব এই জিজ্ঞাসা থেকেই একদিকে জন্ম নিল নতুন নতুন আশাবাদী জীবনদর্শন—বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র, পবাবিদ্যায শ্রীঅববিন্দ, বাজনৈতিক দর্শনে মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র যে মতবাদ তুলে ধবলেন তাতে সমস্ত বিনষ্টি ও সর্বনাশেব অন্ধকাবেব মধ্যে চিত্তেব ব্যাপ্তি, সাংগঠনিক আশাবাদ এবং নবজীবনেব আলোকবশ্মি দেখা গেল। অন্যদিকে এই সময ভাবতীয চিত্তেব সঙ্গে বহির্বিশ্বেব নতুন নতুন চিন্তাধাবাব যোগ স্থাপিত হল। আধুনিক যুগে আমাদেব চিত্তেব এই ব্যাপ্তি বিস্ময়কব। উনবিংশ শতাব্দীব চিত্তনাযকগণেব সেই মহিমময সমুন্নতি (**Sub-limity**) এযুগে হয তো নেই, কিন্তু এযুগে বিশ্বেব বিভিন্ন দেশেব সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে যত সচেতনতা বেড়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে সেটা ততটা পাই না। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদেব প্রধান মিত্রতা ছিল ইংল্যাণ্ডেব সাহিত্য ও দর্শনেব সঙ্গে, বিশ শতকে ইংল্যাণ্ড ছাড়া আন্তর্জাতিক দর্শন ও সাহিত্যেব সঙ্গে আমাদেব নিবিড় যোগ সাধিত হল।

আধুনিক যুগে যখন বাস্তবেব বিচিত্র সমস্যায আমবা অতিমাত্র বিপর্যস্ত এবং কোনো বকমে দিন যাপনেব প্রাণ-ধাবণেব গ্লানি বহন ছাড়া আব কিছুই চিন্তা কবতে পাবিনি, তখনই জাতিব তীক্ষ্ণ মেধা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির যেন এক বিস্ময়কব প্রকাশ দেখা গেল আচার্য জগদীশচন্দ্রেব আবিষ্কাবে। এই অন্তর্দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও দূবপ্রসারী যে প্রাণী-জগতের গণ্ডি ভেদ কবে বৃক্ষলতাব মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছে। এই সুমহান্ মনীষার অন্তস্তলে একটি যে প্রচ্ছন্ন আশাবাদী সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল তা তৎকালীন নৈরাশ্যের মধ্যেও

ধ্বনিত হয়েছে। অবক্ষয়ের যুগে একদিকে সমস্ত মহৎ মূল্যবোধ থেকে মানবচিত্ত ভ্রষ্ট হচ্ছে, দুঃখ ও অশান্তির মধ্যে মনে হচ্ছে বিশ্বরাজ্যে সুষমা ও ছন্দের কল্পনা মিথ্যা, দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে পৃথিবী ক্ষত বিক্ষত, অন্যদিকে বিশিষ্ট মনীষীরা নতুন প্রত্যয়ের বাণী উচ্চারণ করছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (কল্লোল প্রকাশের তিন বছর পরে) লণ্ডন থেকে ফিরে এসে লাহোরে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের সভাপতি রূপে একটি অভিভাষণে এই নতুন প্রত্যয়ের বাণী উচ্চারণ করেন :

"মানুষের সমস্ত চেষ্টার মধ্যেও একটা ঐক্য নিশ্চয়ই আছে— মনোরাজ্যে কোথাও সীমারেখা নাই, কোথাও পার্থক্য নাই। সংঘর্ষকে অভিব্যক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া- প্রাকৃতিক নিয়মকে ভুল বুঝা। সংঘর্ষের ফলে নহে বরং পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতির ফলেই প্রাণী প্রাণধারণ করিয়া থাকে।"[৩৬]

—লক্ষ্য করার বিষয় এই প্রত্যয়ের বাণী আধুনিকতার মুখপত্র কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এই যুগে একটি ধারণা কেউ কেউ পোষণ করতেন যে, যুগগত অবক্ষয় ও বিকৃতি থেকে মানুষের চিত্ত মুক্ত হতে পারে না। উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যেও কেউ কেউ এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। উপন্যাসে যুগকে হুবহু উপস্থাপিত করা ছাড়া ঔপন্যাসিকের গত্যন্তর নেই। কিন্তু এই ধারণা কারো কারো মধ্যে থাকলেও সকলের মধ্যে তা ছিল না। কারণ এই যুগের চিন্তারাজ্যেও এই ধারণার প্রতিকূল একটি স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নিশ্চয়ই অবাস্তব অলৌকিকতার সমর্থক ছিলেন না। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই প্রমাণ করেন, মনুষ্যের মন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে, কিন্তু সে শুধুই পরিবেশের অধীন নয়। মন শুধুই পারিপার্শ্বিকের প্রতিফলন যন্ত্র নয়, পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে সৃষ্টিপ্রতিভা যুগ-পরিবেশের উজানেও একটি চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করে দিতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি, আধুনিক যুগের ভাবমণ্ডলে আমরা তাকে একটি চিন্তাস্রোত রূপে প্রবাহিত হতে দেখি। আচার্য জগদীশচন্দ্র পূর্বোক্ত সম্মেলনে যে ভাষণ দেন তাতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাই; তিনি বলেন :

"বাহিরের আঘাতে তারতম্যে যেমন অনুভূতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের তারতম্যেও অনুরূপ ফল হওয়া সম্ভব। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি সহায়ে স্নায়ুমণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া আঘাতের অনুভূতির হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বাহ্যজগৎই সর্বত্র জয়ী নহে এবং মানব আর অদৃষ্টের দাস নহে।..উদ্ভিদ হইতে প্রাণীতে আমরা জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি দেখিতে পাই এবং আরো দেখিতে পাই যে, জীবনের ধারা এই অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে বিকাশ লাভ করিয়া এমন এক স্তরে পৌঁছায় যেখানে সে অদৃষ্টের বা অবস্থার দাস নহে, সে তথায় নিজেই অদৃষ্ট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে।"[৩৭]

৩৬। কল্লোল, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৬২৮

৩৭। কল্লোল, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৩৫

এক দিকে তিরিশের যুগের অবক্ষয় ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাতে সাধারণ মানুষ বিহ্বলের মতো নিজেকে ছেড়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমন মনীষীদের কণ্ঠ থেকে এই রকমের মুক্তি ও আশার বাণীও উচ্চারিত হচ্ছে। যুগের মধ্যে এই দ্বিবিধ প্রবণতা ছিল, তাই এযুগের ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর চিন্তা ও চেতনাতেও এই দ্বিধাবিভক্তি দেখা যায়। কেউ কেউ যুগকে বিহ্বলভাবে মেনে নিয়েছেন, যুগের বিকৃতি ও বিপর্যয়কেই চিত্রিত করেছেন, কেউ বা আপন সৃজনী-চেতনাকে অংশত বা পূর্ণত মুক্ত রেখে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুগসমস্যা সম্পর্কে সচেতন থেকে, নতুন সাংগঠনিক আদর্শ বা আশার বাণী তুলে ধরেছেন অথবা অরণ্য প্রকৃতির বুকে সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন

এ যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাছে যেমন মুক্তির বাণী শোনা গেল তেমন এযুগের ভারতীয় দার্শনিকও তুলে ধরলেন মানুষের সামনে উচ্চতম বিকাশের আদর্শ। দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ শোনালেন মানুষের আমূল রূপান্তর এবং পৃথিবীতে দিব্যজীবন ও অতিমানবতার মন্ত্র। পৃথিবীর আকাশে বাতাসে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী গর্জন শোনা যাচ্ছে তখনই তিনি ঘোষণা করেন এক নবজীবনের আদর্শ, আর্যপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তার বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'The Life Divine'। এই গ্রন্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, বিবর্তনের ধারায় যেমন পৃথিবীতে ক্রমান্বয়ে জড়ের পরে প্রাণ এবং প্রাণের পরে মনের বিকাশ হয়েছে, তেমনি বিবর্তনের নিয়মেই মনের পরে অতিমানসের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। মনের আবির্ভাবের ফলে প্রাণীর জগতে মনোময় মানুষ অনেকখানি অগ্রগতি সূচিত করেছে, প্রকৃতির উপরে অনেকখানি কর্তৃত্ব অর্জন করেছে এবং জীবনের সম্ভারকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পেরেছে, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামেও অনেকখানি এগিয়ে চলেছে, তেমনি অতিমানসের আবির্ভাবের ফলে আরো নবতর উন্নততর শক্তির বিকাশ হবে, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ জয়ী হবে, জীবন হবে অমৃতময় আনন্দময়। সেই জীবনই হবে 'দিব্যজীবন' (Divine Life) এবং সেই জীবনের অধিকারী যারা হবে তারা বর্তমান মানব-সমাজের চেয়ে উন্নততর সত্তা, তাদের বলা যেতে পারে অতিমানব (Superman)। যুগ-যুগান্তরের মানুষ যে জীবনের কামনা করে এসেছে, দেশ বিদেশের ভাবুক কবি যার স্বপ্ন দেখে এসেছেন, সেই জীবনকে বিবর্তনবাদের অপরিহার্য পরিণাম রূপে যুক্তিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীঅরবিন্দ, এই জীবনের দ্রুত রূপায়ণের জন্যে যে সাধনা দরকার তারই নাম 'যোগ'। এবং যেহেতু আমরা সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই নানা পতন-উত্থানের মধ্যে দিয়ে মহত্তর জীবনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি সেহেতু ব্যাপক অর্থে আমাদের সমগ্র জীবনই যোগ ('All life is Yoga')।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে মানবজাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে চরম আশাবাদী উক্তি করেছেন :

"The ascent of man from the physical to the supramental must open out the possibility of corresponding ascent in the grades of substance to that ideal or causal body which is proper to our supramental being and

the conquest of the lower principles by supermind and its liberation of them into a divine life and a divine mentality must also render possible a conquest of our physical limitations by the power and principle of supramental substance And this means the evolution not only of an untrammelled consciousness, a mind and sense not shut up in the walls of the physical ego or limited to the poor basis of knowledge given by the physical organs of sense, but a life-power liberated more and more from its mortal limitations, a physical life fit for a divine inhabitant and,—in the sense not of attachment or of restriction to our present corporeal frame but exceeding of the law of the physical body—the conquest of death an earthly immortality [৩৮]

বাংলাদেশে শ্রীঅরবিন্দের বাণী প্রচারের কেন্দ্র ছিল কলকাতার আর্য পাবলিশিং হাউস ও চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ। যুগের এই আশাবাদী চিন্তা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। যুগ সচেতনতা কল্লোল কালিকলমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কালিকলমে প্রথম বর্ষে শ্রীঅরবিন্দের চারটি রচনার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'কর্মযোগীর আদর্শ', 'কর্মযোগ' 'উভয়ত', 'ভারতের অন্তরপুরুষের জাগরণ'। এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর অনুবাদ করেন সেকালের প্রতিষ্ঠিত সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্ত। কালিকলমের দ্বিতীয় বর্ষেও শ্রীঅরবিন্দের তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—'ত্যাগধর্ম' 'ক্রমবিকাশের ধারা' ও 'কৃষ্টির মহত্ত্ব'। এইভাবে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিকেরা সকলে শ্রীঅরবিন্দের যোগের সাধক ছিলেন একথা বলছি না কিন্তু সকলে তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন একথাও বলা নিরাপদ নয়। স্বয়ং বিভূতিভূষণ শ্রীঅরবিন্দের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত একটি ইংরেজি পুস্তকের বাংলা অনুবাদও করেছিলেন, সেটি প্রকাশ করেছিলেন দেব ও ঘোষ

দার্শনিক ভাবনায় যেমন শ্রীঅরবিন্দ তেমনি রাজনীতির ও সামাজিক সংগঠনে ও সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী নতুন প্রত্যয় দৃষ্টির সামনে এনে দিলেন। সফল হোন বা না হোন, রাজনীতিকে তিনি ধর্মনীতি ও সত্যনীতির স্পর্শে শুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নরনারায়ণের সেবার যে আদর্শ বিবেকানন্দ আগের শতাব্দীতে প্রচার করে গিয়েছিলেন, তাকে হরিজন আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপকতর কার্যকরী রূপ দিলেন এ যুগে মহাত্মা গান্ধী। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূরীকরণের কর্মসূচী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত করে দিয়েছিলেন বলেই এযুগে এই প্রচেষ্টা খানিকটা অন্তত সফলতা লাভ করেছিল। বস্তুত রাজনীতি তাঁর কর্মক্ষেত্র হলেও অন্তরে অন্তরে তিনি মূলত ধর্মীয় ও নৈতিক সাধনার পথিক এবং সমাজের রূপ কল্পনায় ভাবুক আদর্শবাদী। এ যুগের চিন্তানায়ক ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর আদর্শবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে বর্তমান সূত্রে তাঁর আদর্শবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। টলস্টয়, রাস্কিন, থুরো এবং

৩৮। Sri Aurobindo, The Life Divine New York, 1951 Bk 1, Ch XXVI, pp 239-40

'গীতা'র দ্বারা প্রভাবিত গান্ধীজীর জীবন দর্শনে কর্মই ছিল সাধনা। গান্ধীজীর কর্ম গণদেবতার সেবায় নিযুক্ত, কারণ এখানেই তিনি তাঁর উপাস্য দেবতার সন্ধান পেয়েছিলেন। আধুনিক যুগে সাম্যবাদী চিন্তাধারা ছাড়া যদি আর কোনো মনীষী গণদেবতার চেতনাটি ব্যাপকভাবে তুলে ধরে থাকেন তবে তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন— গণদেবতার বাইরে আর কোনো দেবতাকে আমি মানি না।

I recognise no God except the God that is to be found in the hearts of the dumb million. They do not recognise His presence. I do. And I worship the God that is Truth or Truth which in God through service of these millions.[৩৯]

মহাত্মা গান্ধী টলস্টয়ের মত অনাড়ম্বর জীবন চর্যায় বিশ্বাসী। গ্রামীণ জীবনের সহজ ধারাই তাঁর কাম্য আদর্শ। প্রাচীন কুটির শিল্প ও কৃষি নির্ভর জীবনই তাঁর মতে শান্তি ও সাম্যের পথ। তিনি এই জন্যে যন্ত্রীকরণ ও শিল্পায়নের বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যন্ত্রের প্রয়োগে মানুষ শ্রমবঞ্চিত হবে, বেকারের সংখ্যা বাড়বে এবং মুষ্টিমেয়ের হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হবে। যন্ত্রীকরণ ও শিল্পায়নের ফলে দেশের আবহাওয়া দূষিত হবে ও অনৈতিকতা বাড়বে।[৪০] তাঁর মতে জাতীয়করণ বা পুরোপুরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ মানুষের মনে যে লোভ সহজাতভাবে এসেছে তা একভাবে না একভাবে ক্ষমতা আত্মসাৎ করে অন্যের উপরে প্রভুত্ব করবার চেষ্টা করবেই। এই এর বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রাম।

Today machinery helps a few to ride on the backs of millions. The impetus behind it all is not the philanthropy to save labour but greed. It is against this constitution of things that I am fighting with all my might.[৪১]

আধুনিক অর্থনীতির যুক্তিতে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত টিকবে কি না জানি না, কিন্তু এই ছিল গান্ধীজীর বক্তব্য। গান্ধীজী বাইরে থেকে চেয়েছিলেন গ্রামীণ জীবন, সকলেরই কিছু কায়িক শ্রম, এবং অন্তর থেকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনা। চরকা তাঁর কায়িক শ্রমের প্রতীক এবং অহিংসা তাঁর অন্তর্মুখী সাধনার মন্ত্র। অহিংসা তাঁর কাছে শুধু নেতিবাচক নির্দেশ নয় ইতিবাচক উপদেশ। অপরের অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত হওয়াই অহিংসা নয়, অপরের প্রতি শুভবুদ্ধি ও প্রেমের দ্বারা চালিত হওয়া অহিংসার অঙ্গীভূত। এবং তিনি একথাও স্পষ্ট করেই বলেছিলেন অহিংসা যেন দুর্বলের আত্মগোপনের আশ্রয় না হয়। নির্ভয়ে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অপরের ক্ষতি না করে ও ন্যায্য অধিকারটুকু আদায় করে নেবার যে ইচ্ছা তারই উপরে তাঁর সত্যাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনি করে নিজের লোভকে নির্মূল করে, অথচ ন্যায্য

৩৯। Harijan 11 3 1939

৪০। Gandhi M K Indian Home Rule Ahmedabad 1944 p ৭১

৪১। Young India 13 11 1924

অধিকারকে অর্জন করে প্রেম অহিংসা ও শুভবুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্বমানবের যে সামগ্রিক কল্যাণ তারই নাম সর্বোদয়। সেখানে "... nobody is any body's enemy, every body contributes his or her due quota to the common goal, all can read and write and their knowledge keeps growing from day to day. Sickness and disease are reduced to the minimum. No one is pauper and labour can find employment. There is no place under such a government for gambling, drinking and immorality or for class hatred."[৪২]

ভাবুক গান্ধী এই যে স্বর্ণরাজ্যের চিত্র সেদিনের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তার কার্যকারিতা বিচারে আমরা যাব না। সেকালের জনচিত্তে এর প্রভাব কতটা ছিল জানি না, কিন্তু সেকালে বুদ্ধিজীবী মানুষ, কবি সাহিত্যিক এবং দেশ-নেতাদের অনেকের চিত্তে এই আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই এই যুগচিত্রকে জানবার জন্যেই এই ভাবস্রোতটির পরিচয় গ্রহণ করা হল।

এই সব দেশীয় ভাবাদর্শ ছাড়া আন্তর্জাতিক চিন্তা ক্ষেত্র থেকে যে সব দর্শন ভারতে তখন প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল তাদের মধ্যে মার্কসীয় দর্শনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পরে সেখানে মার্কসীয় আদর্শ অনুযায়ী যে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই সারা পৃথিবীর দৃষ্টিকে মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে। ভারতেও যে এর স্পর্শ এসে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশে এই আদর্শের সমর্থনে ও অসমর্থনে নানা মত গড়ে ওঠা থেকে। 'কল্লোল' প্রকাশের প্রায় আট বছর পরে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে এর নিদর্শন তো রয়েছেই কিন্তু আরও অনেক আগে যাঁরা চরম জাতীয়তাবাদী ছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ রাশিয়ার আদর্শের সমাজ-ব্যবস্থার প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। কল্লোলের আবির্ভাবের প্রায় তিন বছর আগে ১৯২০ সালের ৭ই নভেম্বর বোম্বাইতে যে All India Trade Union Congress-এর প্রথম অধিবেশন হয় তার সভাপতিরূপে লালা লাজপৎ রায় বলেন:

"My own experience of Europe and America leads me to think that socialistic, even Bolshevic truth is any day better, more reliable and more humane than the capitalistic and emperialistic truth."[৪৩]

মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা বা তর্কবিতর্ক এদেশে তখনো হয় নি। এই মতবাদটি তখন সবে ভারতে আমদানি হয়েছে। এর জটিল দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ জনচিত্তের উপলব্ধিতে এসেছিল বলে মনে হয় না, তবে এর মধ্যে যে সহজ মানবীয় দিকটি ছিল সেইটি তখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সহজ ভাবে মানুষ বুঝে নিয়েছিল মার্কসীয় দর্শনের কয়েকটি মূল কথা। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ করে মার্কস্ দেখিয়েছেন উৎপাদনের পদ্ধতি অনুসারে সমাজের কাঠামো যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সমাজ

৪২। Harijan, 25.3.1939

৪৩। Indian Annual Register, 1921, part III, p.258

এইভাবে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে — Primitive Communal System Slave System Feudal System Capitalist System এবং Socialist System। রাষ্ট্র এই সামাজিক বিবর্তনের বিশেষ স্তরে আবির্ভূত হয়েছে। সমাজের শ্রেণীসংঘর্ষের উপরে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যতে সমাজে শ্রেণীবিভাগ যখন উঠে যাবে তখন রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন থাকবে না ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চরম বিকাশে এসে আমরা এমন স্তরে পৌঁচেছি সেখানে ধনী ও দারিদ্র মালিক ও শ্রমিক পরশ্রমজীবী ও সর্বহারার মধ্যে শ্রেণীগত ব্যবধান চরমে পৌঁচেছে এখন দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করবে এবং রাষ্ট্র সমাজের যাবতীয় উৎপাদন ও সমবন্টনের ব্যবস্থা করবে। এই হবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো। এর পরে [illegible] এই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সাম্যনীতিতে বর্ধিত হয়ে মানুষের মধ্যে [illegible] শ্রেণী পার্থক্যের বোধটি মুছে যাবে তখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই [illegible] মৈত্রীতে পূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন করবে। তখন আর রাষ্ট্রযন্ত্রের [illegible] পুরানো দিনের অপ্রচলিত জিনিসরূপে সংগ্রহশালায় [illegible]

We are now rapidly approaching a stage in the development of production at which the existence of these classes has not only ceased to be a necessity but is becoming a positive hindrance to production They will fall as inevitably as they arose out of an earlier stage Along with them the state will inevitably fall The society that organises production on the basis of free and equal association of the producers will put the whole state machine where it will then belong in the museum of the antiquities[৪৪]

মার্কসীয় দর্শনের এই ধারণার কথা [illegible] মনে ক্রমে অল্পে অল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল। এর প্রমাণ পাওয়া [illegible] এই এর সাংগঠনিক রূপ দেখা দিল। ১৯২৫ এর ২৬শে ডিসেম্বর প্রথম Indian Communists Conference কানপুরে অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি শ্রীসিঙ্গারবেলু (Singaravelu) বলেন ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এখানে Workers State বা শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের উদ্দেশ্য। তখনো এদেশে মার্কসীয় চিন্তাধারার সুস্পষ্ট দলগত রূপ গড়ে ওঠেনি। আদর্শগত দিক থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর রামমোহন লাইব্রেরী হলে যে All India Socialist Youth Congress এর প্রথম অধিবেশন হয় তাতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সভাপতি ছিলেন এই সম্মেলন থেকে বোঝা যায় মার্কসীয় চিন্তাধারা তখন এদেশের যুবসমাজকে আকৃষ্ট করছে। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেছিলেন

It is the duty of the youth with Marxistic views to give a socio-economic analysis of the situation to uplift the masses and to make them class-conscious, to unite different communities with an economic pro-

---

৪৪। Engels Frederick Origin of the Family Trans E Untermann Chicago 1902, p 212

gramme and to preach gospel of social and economic equality, and to have international outlook and to take part in world-currents of thought and to work for an all round freedom of India [৪৫]

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরাও মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই সময় মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে কতকগুলি ইংরেজি বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। রাসেলের 'বলশেভিকবাদ' বইটির বাংলা অনুবাদ করেন শৈলেন্দ্রনাথ বিশী। কল্লোলে এই বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল :

" যে সকল দেশে গণতন্ত্র বলিয়া জিনিষটী আজকাল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা বাস্তবিক জনসাধারণের স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।......সম্পদ ও ঐশ্বর্যের বাহ্যিক অন্তরালে গণতন্ত্র আপন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শাসন-যন্ত্র ধনী সম্প্রদায়ের হাতে। জনসাধারণ বলিয়া যে বহুসংখ্যক মানুষকে বুঝায়, তাহাদের চিরকালই সেই সোনার রথের দড়ি টানিয়া মরিতে হয়। .. ."[৪৬]

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় মার্কসীয় চেতনা এদেশের আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল। চার্লস্ এইচ্ ওলিন্ কৃত 'সমাজতন্ত্রবাদ' বইটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন গোপাল সান্যাল। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আত্মশক্তি' কার্যালয় থেকে। কল্লোলে এ বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গেও মার্কস্‌বাদের প্রতি সমর্থনের সুর শোনা যায়।[৪৭] এবিষয়ে আরো একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা স্মরণীয়। সেটি হল 'Manifesto of the Communist Party' নামক বিখ্যাত বইয়ের বাংলা অনুবাদ 'সাধারণ তন্ত্রবাদীর ইস্তাহার'। অনুবাদ করেছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি ভারতের Workers and Peasants' Party প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটিরও সমর্থন জানান হয় কল্লোলে। এবং 'এরূপ একখানি পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রচারিত হওয়ার একান্ত' প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হয়।[৪৮] এই ভাবে দেখা যায়, এদেশে এসে আধুনিক সাহিত্যিকগোষ্ঠী মার্কসবাদী জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন। এই নতুন মতবাদ, ভাল হোক মন্দ হোক, এ দেশে আধুনিক যুগের যুবসমাজ ও সাহিত্যিকদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এদের কোনো মহলের বিরুদ্ধে সমালোচনার সূত্রপাত থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে লিখেছিলেন

...'ভাববার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল নবীন মানুষ রাশিয়ার দিকে মন দিতে সুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা রাশিয়ার বুলি পাকড়াচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন।

'য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম কম্যুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতি নানা প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু

৪৫। Indian Quarterly Register July-Dec 1928 Vol II p 45
৪৬। কল্লোল, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ ৬১
৪৭। কল্লোল, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ ৪৩০।
৪৮। কল্লোল, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

আমরা যখন বলি রায়তের ভাল করব তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলচে পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো, অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্।"[৪৯]

শিক্ষাক্ষেত্রে নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংস্কার

আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বে এই যে স্বদেশী এবং বিদেশি মনীষীদের আশার বাণী ও নবজীবনের মন্ত্র, এ শুধু বুদ্ধিগত মতবাদে বা বিশুদ্ধ দার্শনিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমাজ জীবনে এসবের সক্রিয় অভিব্যক্তিও দেখা যায়। নতুন জীবনদর্শনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে নব নব প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে, ধর্ম ও সমাজ-জীবনে সংস্কার প্রবর্তন, নারী জীবনের আত্মসচেতনতা ও জাগরণ, অবহেলিত ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও সংগ্রামে এই সব মতবাদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে পাই। জাতীয় জীবনে যে কোনো মহৎ আদর্শ ও মতবাদকে স্থায়ী রূপ দেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল শিক্ষার ধারায় তা প্রবর্তিত করা। আমাদের আধুনিক যুগে জাতীয়তার যে জাগরণ হয়েছিল তার-ও রূপায়ণের জন্যে তাই দেখতে পাই জাতীয় আদর্শে নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সূচনা। এদিক থেকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বাঙালিই। বঙ্গভঙ্গের পরেই বাংলায় যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় তারই অঙ্গস্বরূপ স্বদেশী শিক্ষার জন্যেও উদ্যোগ দেখা যায়। এই শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল স্বদেশী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, দেশপ্রীতির শিক্ষা, ইংলন্ডের অন্ধ অনুকরণ বর্জন ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য হ্রাস ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে গুরুত্ব আরোপ। এই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ব্যাখ্যা করে অ্যানি বেসান্ত লিখেছিলেন

National education must meet the national temperament at every point, and develop the national character India is not to become a lesser—or even a greater—England, but to evolve into a mighter India [৫০]

এই আদর্শে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে Society for the Promotion of National Education in Bengal প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরে ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সমর্থিত হওয়ায় এই আন্দোলন ব্যাপকতর হয়। এই সোসাইটি পশ্চিম বাংলায় ১১টি ও পূর্ব বাংলায় ৪০টি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে। স্বদেশী প্রচেষ্টার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই সময়ে নেশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের প্রতিষ্ঠা। এই সঙ্গে নেশন্যাল মেডিকেল কলেজ, যাদবপুর কলেজ অফ্ টেক্‌নোলজি এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফেডারেশন হলও প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষার এই সব আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এরপরে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় একেবারে 'কল্লোলের' সমসাময়িক

৪৯। ভারতী ১৩৩৩, বৈশাখ, 'রায়তের কথা'। (প্রবন্ধটি 'ক্লাসিকলম'-এ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়।)

৫০। Vide Nurullah Syed and Naik, J P 'History of Education in India', MacMillan & Co, 1955, p 262

কালে—১৯২০-২২ সালে। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তদনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী সরকারি উদ্যোগে চালিত স্কুল-কলেজ বর্জনের আহ্বান জানান। সরকারের শিক্ষায়তন ত্যাগ করার পর ছাত্রদের জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে আলিগড়ে Jamia Millia Islamia (National Muslim University) প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতাতেও দেশবন্ধুর ডাকে ছাত্রেরা বিপুল সংখ্যায় স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে। গান্ধীজী কলকাতায় এসে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এ National College উদ্বোধন করেন। অল্পদিনের মধ্যে পাটনা জাতীয় কলেজ, বিহার বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, বেঙ্গল নেশন্যাল ইউনির্ভাসিটি, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ এবং বহু সংখ্যক জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫১]

এই সময়ে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় (৬ই মে, ১৯২২)। প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শের সঙ্গে বিশ্বমানবতার শিক্ষা, রুশোর প্রকৃতির পরিবেশে লালিত শিক্ষা এবং প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সমন্বিত করে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অভিনব সাংগঠনিক প্রয়াস শুরু করলেন। বিশ্বভারতীর কলা-বিভাগের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালে যখন রাজকোটের দরবারে বক্তৃতা দেন তখন 'কল্লোলে' তাঁর অভিনব প্রচেষ্টাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানান হয়।[৫২] এদিকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই গোখেল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে আন্দোলন করছিলেন। ১৯১৯-২০ সালে বাংলা, পাঞ্জাব, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে আইন প্রণীত হয়।

আমাদের এই আধুনিক যুগটি বড় বিচিত্র এবং জটিল। এযুগে যেমন আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য বেড়েছে, সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়েছে, বড় আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট হয়েছি, তেমনি এযুগেই দেখা দিয়েছে জাতীয়তার জাগরণ, মুক্তির কামনা, নব নব জীবনদর্শনের প্রকাশ, আশাবাদী মতবাদের প্রচার, শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা। এদিক থেকে দেখলে মনে হয় উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক জাগরণ যেন বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যাপক পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ভারত ইতিহাসের এই পর্বটি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন :

"The cultural renaissance which marked the advent of a new age in India was in full vigour during the first half of the nineteenth century."[৫৩]

এই সাংস্কৃতিক জাগরণের পাশে পাশে চলেছে ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক সংস্কারের প্রগতিশীল প্রচেষ্টা। ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, আর্য-সমাজ, দক্ষিণ ভারতীয় শিক্ষা-সংস্থা (Deccan Education Society), থিওজফিক্যাল সোসাইটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন

৫১। Sitaramayya, Dr Pattabhi 'History of the Indian National Congress', Vol I, p. 211
৫২। কল্লোল ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
৫৩। Mazumder Dr Ramesh Ch. and others, 'An Advanced History of India', 1956, p 955

ইতিপূর্বেই ধর্মীয় সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে এদের অনেকেরই কর্মধারা ব্যাপকতর হয়। সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব অনেকখানি কমে এলেও এদের প্রচেষ্টায় ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির সংশোধন হয়, জাতীয় আত্মমর্যাদা-বোধ জাগরণে সহায়তা হয় এবং বিশেষ করে সেবামূলক কাজ ও অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণের কাজ অনেকখানি এগিয়ে যায়।

নারী-প্রগতি

সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে এযুগে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নারী-প্রগতি, নারীর জাগরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নারীজাগরণ হয় তার সঙ্গে আমাদের বিশ শতকের তিরিশের যুগের নারী-জাগরণের পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথমত উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে নারী-জাগরণের কথা বলা হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এদেশের পুরুষেরাই। নারী স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, শিশুবিবাহ রোধ, নারী শিক্ষাপ্রসার প্রভৃতির জন্যে জীবনপণ করেছেন—রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পুরুষ-নেতারাই। যেখানে নারী নিজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে সেখানেও তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে পুরুষ। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে নারী নিজেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেতন সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে। তার এই সংগ্রামের প্রেরণা এসেছে খানিকটা দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাপে এবং খানিকটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে। এবং নারী-শিক্ষার ক্রমিক প্রসার এতে শক্তিসঞ্চার করেছে। দ্বিতীয়ত উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নারী-জাগরণ সাধারণত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক জাগরণ ছিল। সাহিত্য সাধনায় যেসব মহিলা এগিয়ে এসেছেন কিংবা নবযুগের নবীন জাতীয় বেশভূষা পরে যেসব মহিলা কলকাতার রাজপথে ঘোড়া চড়েছেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ সম্প্রদায়ের রমণী। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক পর্বের নারী-জাগরণ শুধু সাংস্কৃতিক নয়, এখানে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার দাবি আছে। এবং এই সংগ্রাম আর উচ্চশ্রেণীর রমণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, খুব ব্যাপক না হলেও এই আন্দোলন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নারীজীবনকেও স্পর্শ করেছে। তৃতীয়ত উনবিংশ শতাব্দীতে মহিলারা গৃহাঙ্গনের বাইরে পা বাড়িয়েছেন শুধু অঙ্গনের সীমালঙ্ঘনের জন্যেই এবং শুধু সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত প্রেরণার বশেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নারী-জাগরণে প্রধানত আছে অর্থনৈতিক তাগিদ। এ সময়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েরা জীবিকার জন্যে গৃহাঙ্গনের বাইরে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীজাগরণের প্রচেষ্টা এই সময় দেখা যায়। 'কল্লোলে'র সমসাময়িক কালে মিশরের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেখানকার মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। পৃথিবীর অনেক অর্ধোন্নত দেশেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কল্লোল যে বছর প্রকাশিত হয় সেই বছর ইতালিতে 'নিখিল বিশ্ব মহিলা

সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। চীনেও এই সময় নারী-অভ্যুত্থানের সংবাদ পাওয়া যায়। চীনের মহিলারা এই সময় সরকারের কাছে যে দাবি পেশ করেন তা হল, নারীর জন্যে সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার খোলা রাখা দরকার, নারীর ভোটাধিকার ও অন্য সর্ববিধ সাংবিধানিক অধিকার চাই, সমাজে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার চাই, বিবাহে নারীর পাত্রনির্বাচনের স্বাধীনতা চাই, বেশ্যাপ্রথার অবৈধকরণ চাই, পুরুষেরা পরস্ত্রী গমন করলে তাঁদের বহুবিবাহের অপরাধে দণ্ডিত করতে হবে এবং নারী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

বিদেশের এই সব ঘটনার ঢেউ এসে ভারতীয় চিত্তজগৎকেও স্পর্শ করেছে। এই সব ঘটনার খবর কল্লোলে পরিবেশন করা হতো। সে সময় সমাজ-সংস্কারমূলক যে সব সভাসমিতি হতো তাতে বিদেশের নারী-জাগরণের কথা আলোচিত হতো। ১৯২৪ সালে যে 'অল ইণ্ডিয়া সোস্যাল কন্‌ফারেন্স' হয় তাতে সভাপতি স্যার শঙ্করম্ নায়ের চীনের নারীপ্রকৃতির কথা আলোচনা করে ভারতেও অনুরূপ দাবি উপস্থাপনার প্রস্তাব করেন। অন্যান্য দেশের নারী জাগরণ সম্পর্কে এই সচেতনতার সঙ্গে ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। এই উভয়বিধ কারণের জন্যেই নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অধিকার চেতনা এযুগে আত্মপ্রতিষ্ঠা দাবি করে। এযুগের নারীশিক্ষা এতখানি গুরুত্বলাভ করে যে ১৯১৬ সালে পুণাতে একটি স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালের কাছাকাছি সময়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এলাহাবাদেও একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়েছিল। এযুগে মহিলারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কল্লোলে প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায়, 'গত ৫ই জুলাই বুধবার অপরাহ্নে বেথুন কলেজের মহিলা অধ্যাপক শ্রীমতী বাক্তকুমারী দাশের নেতৃত্বে একটি মহিলা ডেপুটেশন মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা বলেন মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হউক এবং এজন্য একটি 'সেস' ধার্য করা হউক। ১০ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদিগকে একত্রে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। মেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করা হউক।'[৫৪] এসময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতিরও দুই-একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দেই উড়িষ্যার কুমারী নির্মলাবালা নায়ক অক্‌সফোর্ড থেকে এডুকেশনে ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফেরেন এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকাল্টী অফ এডুকেশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৪ পরগনা জেলার ছোট জাগুলিয়ার সুজাতা বসু লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার অফ এডুকেশন ডিগ্রিলাভ করেন। "বাঙ্গালী মহিলার বিলাতে এরূপ সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্তি বোধ হয় এই প্রথম।"[৫৫] এছাড়া মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারেরও কিছু কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায়। ১৯২২-২৩ সালে সক্রিয় দুই একটি প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত বিধবা

৫৪। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৬৯

৫৫। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৭৭৮

শিল্পাশ্রম, সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি, দীপালি সংঘ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি সেদিন নারী মঙ্গল কাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নারীস্বার্থ সংরক্ষণ ও নারী-কল্যাণের জন্যে দু-একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। অল্প-শিক্ষিত মেয়েদের নার্সের শিক্ষা দেবার জন্যেও নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

এযুগে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যে ও শিক্ষা বিস্তারের ফলে মেয়েদের জীবিকা অর্জনের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তনের চিহ্ন বহন করে। এর ফলে আমাদের পূর্ব প্রচলিত পারিবারিক জীবনেব নিটোল রূপটি যেমন ভেঙে গেল, তেমনি মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন লাভ করাতে নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশে নতুন পদক্ষেপ দেখা গেল। এ সময়কার পত্র-পত্রিকায় মহিলারা জীবিকার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন কামনা করে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। এই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও জীবিকার জন্যে সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণে ছিল না। বিভিন্ন পত্রিকায় এ সমস্ত মহিলাবা যে দাবি ঘোষণা করেন তাব উত্তরে 'কল্লোলে'ব প্রথম বর্ষের ৫ম সংখ্যায় তাদের জীবিকার জন্যে কতকগুলি পথনির্দেশ দেওয়া হয়। টেলিফোন একসচেঞ্জে মহিলাদের চাকরিব জন্যে দাবি জানান হয়। সমবায় পদ্ধতিতে কাপড়ের দোকান খুলে মহিলাদের নিয়োগের প্রস্তাবও করা হয়।

এযুগের নারীর এই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের সঙ্গে আছে রাজনৈতিক অধিকাব-চেতনাও। পূর্বে অধ্যাপিকা রাজকুমারী দাশেব নেতৃত্বে যে মহিলা ডেপুটেশনের কথা উল্লেখ করেছি, সেই ডেপুটেশন মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথেব কাছে বলেন যে ম্যুনিসিপ্যালিটিতে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হোক। উত্তরে মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, নতুন মিউনিসিপাল বিলে নারীর ভোটাধিকার দেবার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯১৭ সাল থেকেই নারীর ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯১৯ সালে 'Govt of India Bill' সম্পর্কে আলোচনার জন্যে 'Joint Select Committee' গঠিত হয়। অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু এবং হীরাবাঈ টাটা তাতে ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার বিষয়ে দাবি জানান। এরপর লণ্ডনে যে বিখ্যাত গোল টেবিল বৈঠক হয় তাতেও ভারতীয় নারী প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। আর লক্ষ্য করার বিষয় ভারতীয় নারীর অধিকারের সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। ১৯৩৫ সালে যখন 'ভারত সরকার আইন' পাশ হল, তখন দেখা গেল তাতে নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। Federal Council of State, Federal Assembly ও প্রাদেশিক বিধান-সভায় নারী প্রতিনিধির জন্যে স্থান সংরক্ষিত হল। নারীর ভোটদানের নিম্নতম যোগ্যতা কমিয়ে অধিক সংখ্যক নারীকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হল।

এই সময়ে নারী জাগরণের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল নারীরা নিজেরাই নিজেদের সামাজিক অধিকার ও সামাজিক সম্মান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৯২৭ সালে ৫ই জানুয়ারি পুণাতে প্রথম All India Woman's Conference অনুষ্ঠিত হয়। এই

অধিবেশনে সভানেত্রী বরোদার মহারানী বলেন, এখন সময় এসেছে যখন মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সম্পত্তির অধিকার, বিবাহের স্বাধীনতা ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে বিচার করে দেখবে। একটি গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে ১৬ বছরের নীচে মেয়েদের বিবাহকে সরকার যেন অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

এদেশের মহিলারা শুধু যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কেই সচেতন হযে উঠেছিলেন তা নয়, নিজেদের রাজনৈতিক কর্তব্য ও জাতীয় দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় রমণীর ভূমিকা ব্যাপক ছিল না। ১৯২৩ সালে নাগপুরে জাতীয় পতাকা সংগ্রামে সুভদ্রা কুমারী একক সত্যাগ্রহ করেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৪ সালে বেলগ্রামে যে ভারতীয় জাতীয় অধিবেশন হয় তাতে ৬০০০ সদস্যের মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ১০০০। ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে বার্ষিক সভা হয় তাতে একজন ভারতীয় রমণী—সরোজিনী নাইডু—সভানেত্রীব আসন লাভ করেন। বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবে নারীর ভূমিকা অবশ্য বেশি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার গভর্নর এণ্ডারসন্‌কে গুলি করার চেষ্টা করেন বীণা দাস। সুনীতি চৌধুবী ও শান্তি ঘোষ ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স্‌কে গুলি কবেন। ১৯৩২-এ প্রীতিলতা ওয়াদেদার চট্টগ্রামের ইউবোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর মেদিনীপুরে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের সময় মাতঙ্গিনী হাজবার ভূমিকা। ৭৩ বছর বয়স্কা এই বৃদ্ধা একটি নাবীবাহিনী পরিচালনা করে সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এযুগে শিক্ষা, অধিকার, দায়িত্ব ও জীবিকার ক্ষেত্রে নারীব্যক্তিত্বের এই যে নতুন প্রকাশ দেখা গেল, তার ফলে নারীজীবনে নতুনতব সমস্যা দেখা দিল এবং এর ফলে একালের সাহিত্যে উপস্থাপিত নারীচরিত্রেও স্বাতন্ত্র্য দেখা দিল। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণ, মার্ক্‌স্‌বাদ ও গণচেতনা

অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণচেতনার প্রসার আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে দুই দিক থেকে অবহেলিত দুটি প্রধান শ্রেণী হল—বিত্তের দিক থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী এবং জাতিভেদের দিক থেকে লাঞ্ছিত নিম্নবর্ণ শ্রেণী। এ যুগে এই দুই শ্রেণীর অভ্যুত্থান দেখা যায়। মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সংগ্রাম এবং হরিজন-প্রীতি নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়ের জাগরণে অনেকখানি প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। ক্রমে ক্রমে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আত্মবোধ ও ঐক্যচেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায়, ১৯২৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর বেলগামে (Belgaum) All India Non-Brahmin Conference থেকে। সভাপতি ছিলেন এ. রামস্বামী মুদালিয়ার।

সামাজিক অসাম্য দূর করার জন্যে এই সময়ে একাধিক প্রচেষ্টা দেখা যায়। ১৯২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় Republican Congress। এই কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ইংরেজের শাসন অস্বীকার করে তার সমান্তরাল একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক

শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে বলা হয়—This Congress is strongly of opinion that all social inequalities must be at once done away with as a principal step for the establishment of the Republic of India.[৫৬] এর পরে ১৯২৮-এর ২৬শে জানুয়ারি দিল্লিতে All India Depressed Classes Conference হয়। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় নিম্নবর্ণের অবহেলিত সমাজ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে।

এছাড়া বিত্তের দিক থেকে যারা বঞ্চিত তাদের মধ্যে শ্রমিক-সমাজের জাগরণ ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কৃষকেরা গ্রামীণ জীবনের তথাকথিত শান্তি ভঙ্গ করে সংগ্রামের পথে তখনো এগিয়ে আসেনি, কিন্তু যারা নাগরিক জীবনে ও শিল্পাঞ্চলের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় থেকেছে সেই শ্রমিকদের জাগরণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এদের এই জাগরণের মূলে আন্তর্জাতিক চিন্তার সঙ্গে যোগ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দুই-ই ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী শান্তিচুক্তির অন্তর্গত একটি বিধান অনুসারে যে International Labour Bureau স্থাপিত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিকদের জন্যে যথাসম্ভব একরকম আইন প্রণয়ন ও শ্রমিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে চেষ্টা করা। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে এর যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাতে ভারতেরও একজন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ২রা জুন জেনেভাতে অষ্টম International Labour Conference হয় তাতে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায় ও লালা লাজপৎ রায়। এই অধিবেশনের মাধ্যমে ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা লালা লাজপৎ রায় বিশ্বের সমক্ষে প্রকাশ করেন। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক চিন্তা ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বার্থ একটি বড় প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে এবং এসব ঘটনার সঙ্গে ভারতের যোগ রয়েছে। এই সময়ে ভারতেও জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি শ্রমজীবী জনসাধারণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বোম্বাইতে All India Trade Union Congress-এর যে প্রথম অধিবেশন হয় (১৯২০ সালে ৭ই নভেম্বর) তাতে লালা লাজপৎ রায় সভাপতিত্ব করেন। একাধিক ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বার্থকে সমর্থন জানিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। বিশ শতকের গোড়ায় কোথাও কোথাও শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলেও সত্যকার শ্রমিক জাগরণ ও শ্রমিক-আন্দোলন দেখা দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই। এদেশে এই সময় শিল্পায়নের প্রবণতা দেখা দেয়, ফলে অধিক সংখ্যক লোক শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকা গ্রহণ করে। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই অনুপাতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাড়ে না। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্রতর হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শ্রমিক-চেতনার যেন নবজাগরণ হয়। বিশেষত ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সোস্যালিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত

৫৬। Indian Quarterly Register, July -Dec, 1927, vol II, p. 349.

হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর মর্যাদাবোধ ও আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়। এই সব ঘটনার ফলে ভারতে ১৯১৯ থেকে ব্যাপক শ্রমিক-সংগ্রাম দেখা দিতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন শিল্প-অঞ্চলে এই সময় যে শ্রমিক ধর্মঘট হয় তা বিস্ময়কর এবং ভারতে তা একটি নতুন চেতনার জাগরণের পরিচয় বহন করে।[৫৭] ১৯২০ সালে শ্রমিক-সংঘও গড়ে ওঠে, এন. এম. যোশীর উদ্যোগে ও লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (A.I.T.U.C) রূপ লাভ করে। এর সঙ্গে বাংলার যোগ ছিল নিবিড়। ১৯২৪ সালে স্বয়ং দেশবন্ধু এর সভাপতি ছিলেন। ১৯২৬-২৭ সালে যে Workers' and Peasants' Party গঠিত হয় তাতেও বাংলা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯২৬ সালে আইন করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শ্রমিকের এই জাগরণ ও সংগ্রামের ফলে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ক্রমে ক্রমে Workmen's Compensation Act 1923, Indian Mines Act 1923, Amendment of Workmen's Compensation Act 1938, Indian Factories Act 1934, Payment of Wages Act 1936 প্রভৃতি আইন প্রণীত হয়। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ভাবে গণজাগরণ দেখা দিয়েছিল। তারই ফলে এই সময়কার সাহিত্যে যে গণচেতনা দেখা দিল তা এই সামাজিক পটভূমিকাতেই বিচার্য।

৫৭। এই সময়ের শ্রমিক ধর্মঘটের বিস্ময়কর প্রসারের কয়েকটি স্থান-কাল-পাত্র স্মরণ করা যেতে পারে : ২৪শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৯, কানপুরে পশমের কারখানায় ১৭০০০ শ্রমিক; ৭ই ডিসেম্বর ১৯১৯ থেকে ৯ই জানুয়ারি, ১৯২০, জামালপুরে ১৬০০০ রেল শ্রমিক; ৯ই জানুয়ারি থেকে ১৮ই জানুয়ারি, ১৯২০, বাংলায় ৩৫০০০ জুটশ্রমিক; ২রা ও ৩রা জানুয়ারি বোম্বাইতে সাধারণ ধর্মঘটে ২০০০০০ জন; ২০শে জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারি রেঙ্গুনে ২০০০০ কারখানা-শ্রমিক; ৩১শে জানুয়ারি বোম্বাইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নেভিগেশন কোম্পানীর ১০০০০ শ্রমিক; ২৬শে জানুয়ারি থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি সোলাপুরে ১৬০০০ শ্রমিক; ২রা থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইণ্ডিয়ান মেরিন ডক শ্রমিক ২০০০ জন; ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯শে মার্চ টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ৪০০০০ শ্রমিক; ৯ই মার্চ বোম্বাইতে ৬০০০০ কারখানা শ্রমিক; ২০শে থেকে ২৬শে মার্চ মাদ্রাজে ১৭০০০ জন কারখানা শ্রমিক, মে মাসে আমেদাবাদে ২৫০০০ কারখানা শ্রমিক। এ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ ও আত্মচেতনার ব্যাপ্তি অবশ্যই অনুমান করা যাবে।

৩. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা

তিরিশের যুগ-পরিবেশ উপস্থাপিত করার জন্যে আমরা এ পর্যন্ত স্বদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলাম। যদিও এই যুগ-পরিবেশের ক্ষেত্রে এই স্বদেশী পরিস্থিতিই প্রধান আলোচ্য বিষয়, তবু এ যুগে বিদেশি চিন্তাধারা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির আলো-বাতাসও এদেশের চিত্তকে স্পর্শ করেছে কম নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই সময় নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আমাদের আধুনিক যুগের সাহিত্যিকেরা এই বিদেশি সাহিত্যের নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন খুব বেশি মাত্রায়। আর যুগ-পরিবেশ বলতে যদি শুধু স্থূল পরিবেশ না বুঝি, তবে অন্যভাবে বলা যায় এ দেশের সেই যুগ-পরিবেশে পাশ্চাত্যের চিন্তাস্রোতও মিশ্রিত ছিল। ফলে আমাদের দেশে আধুনিক উপন্যাসের জন্মের মূলে স্বদেশের আধুনিক কালের সমাজ-পরিবেশ যেমন প্রেরণা দিয়েছিল তেমনি পাশ্চাত্যের উপন্যাসে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বাংলার আধুনিক ঔপন্যাসিকদের পথ দেখিয়েছিল। এজন্যে এই পরিচ্ছেদে এযুগের পাশ্চাত্যের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ এই সময় বিদেশি সাহিত্যের আবহাওয়া আমাদের যুগ-পরিবেশের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'কল্লোলে'র লেখকেরা ব্যাপকভাবে বিদেশি সাহিত্য পাঠ ও অনুবাদ করেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শুধু ইংরেজি নয়, কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের রস পরিবেশন শুরু করেন 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখকেরা।[৫৮]

কল্লোলেও এই ধারার ব্যাপক অনুসৃতি চলে। এ দেশের যুগ পরিবেশের সঙ্গে বিদেশি সাহিত্য-ভাবনা কতখানি যুক্ত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'কল্লোল' ও 'কালি কলমে' প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে :

কল্লোলে প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা

বর্ষ ও সংখ্যা

১/১ Emila Zola-র 'বিড়ালের স্বর্গ' নামক গল্পের প্রথম কিস্তি। অনুবাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটি যৌন বিষয়-সংক্রান্ত নয়। তবে গল্পটিতে জীবনের সহজ মসৃণ পথ থেকে সরে বক্র পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণের সমর্থন আছে।

১/২ ঐ গল্পের দ্বিতীয় তথা শেষ কিস্তি।

৫৮। "ইউরোপীয় (কন্টিনেন্টাল) উপন্যাস-কাহিনী—অবশ্য ইংরেজির অনুবাদ হইতে—বাঙ্গালায় প্রকাশ করা ভারতী গোষ্ঠীর একটা উদ্দেশ্য ছিল।"—সেন, ডঃ সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড), বর্ধমান, ১৯৫৮, পৃঃ ১৫৫—৫৬।

১/৩ J.M. Barrie-এর 'দি টুয়েল্‌ভ্ পাউণ্ড লুক্' নামে একটি একাঙ্কিকার অনুবাদের প্রথম কিস্তি। অনুবাদক—মণীন্দ্রলাল বসু।

১/৪ J.M. Barrie-এর 'দি টুয়েল্‌ভ্ পাউণ্ড লুক্' -এর দ্বিতীয় তথা শেষ কিস্তি।

২/১ 'পিয়াসী' (ম্যাক্সিম্ গোর্কির গল্প অবলম্বনে)—সুকুমার ভাদুড়ী।

২/৮ এইচ, জি, ওয়েল্‌সের একটি গল্পের অনুবাদ 'আশার বাণী'।

২/৮ আনাতোল ফ্রাঁস (প্রবন্ধ)—কালিদাস নাগ।

২/১০ 'রোম্যাঁ রলাঁ' (প্রবন্ধ)—কালিদাস নাগ।

২/১১ 'জাঁ ক্রিস্‌তফ্ : উষসী' রোম্যাঁ রলাঁর উপন্যাসের ধারাবাহিক অনুবাদ; অনুবাদক—কালিদাস নাগ ও গোকুল নাগ।

২/১১ 'ন্যুট হাম্‌সুন' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

২/১১ 'অভিনেত্রী' : (অস্কার ওয়াইল্ডের রচনা অবলম্বনে)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২/১২ জাঁ ক্রিস্‌তফ্—(পূর্বানুবৃত্তি); অনুবাদক—কালিদাস নাগ ও গোকুল নাগ।

২/১২ 'ম্যাক্সিম্ গোর্কী' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

২/৭ 'মরুতৃষ্ণা' মোপাসাঁর গল্পের ভাবানুবাদ; অনুবাদক—ভূপতি চৌধুরী।

২/৯ 'ত্যাগ'; একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ, অনুবাদক— রেবতীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২/১১ 'ন্যুট হামসুন' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

২/১১ 'অভিনেত্রী' অস্কার ওয়াইল্ডের গল্পের ভাবানুবাদ—অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২/১২ 'ম্যাক্সিম গোর্কী' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৩/১ 'জাঁ ক্রিস্‌তফ' (রোম্যাঁ রলাঁ); অনুবাদক—কালিদাস নাগ ও গোকুল নাগ।

৩/১ 'গমের দানা ডিমের মত বড়' : লিও এন. টলষ্টয়ের গল্প, অনুবাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনুবাদকের মৃত্যুর পরে এখানে প্রকাশিত)।

৩/২ 'দীর্ঘনিশ্বাস ক্লাব' : মোপাসাঁর গল্পের ভাবানুবাদ; অনুবাদক—সুবোধ দাশগুপ্ত।

৩/৮ 'প্রেতপুরী' : মার্কিন কবি George Sylvester Viereck-এর কবিতার ভাবানুবাদ; অনুবাদক— মোহিতলাল মজুমদার।

৩/৯ 'রলাঁ ও তরুণ বাংলা' (প্রবন্ধ)—কালিদাস নাগ।

৩/৯ 'পোষাকের দাম' (হাঙ্গেরীয় লেখক Koloman Mikszath-এর গল্পের ভাব অবলম্বনে)—বিজয় সেনগুপ্ত।

৩/১০ 'জাসিন্তো বেনাভান্তে' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

৩/১০ 'জাঁ ক্রিসতফ' (রোম্যাঁ রলাঁর উপন্যাসের অনুবাদ) এ সংখ্যা থেকে এই অনুবাদে অনুবাদক হিসাবে কালিদাস নাগের নামের সঙ্গে গোকুল নাগের নামের বদলে শান্তা দেবীর নাম থাকে। কারণ ইতিমধ্যে গোকুল নাগের মৃত্যু হয়েছে।

৩/১১ 'উৎসব রাতে' (ইতালিয়ান লেখক Masuccio of Salerno-এর Friends

in Love গল্প অবলম্বনে)—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়।

৩/১২ জাঁ ক্রিসতফের 'উষশী' অংশ শেষ হল।

৪/১ 'মানবতা' (তুর্গেনিভের রচনার ছায়া অবলম্বনে)—শামসুন নাহার।

৪/১ 'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙ্গালী' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৪/৩ 'কবি ওমর খৈয়াম' (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম অনুল্লিখিত।

৪/৪ 'বনস্পতির মৃত্যু' : (ব্লাডিশলাশ রেমণ্টের লেখার ভাবানুবাদ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৪/১০ 'টলষ্টয়ের স্মৃতি' : 'লণ্ডন মার্করি'তে প্রকাশিত গোর্কীর একটি প্রবন্ধের অনুবাদ, অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৪/১০ 'লিওনিদ আনদ্রিভ' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৪/১১ 'ওমর-গুরু আবু আলি সিনা (প্রবন্ধ)—সুরেশ নন্দী।

৫/১ 'স্বামী' : Mercel Prevost-এর গল্পের অনুবাদ; অনুবাদক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫/১ 'মীনকেতন' : ন্যুট্ হামসুন-এর উপন্যাসের অনুবাদের প্রথম কিস্তি; অনুবাদক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৫/২ 'বৃদ্ধ পরীক্ষক' : জাপানী কবি আজুমী বিয়োসাইয়ের কবিতার অনুবাদ; অনুবাদক—বুদ্ধদেব বসু।

৫/২ 'কবি ফেরদৌসী' (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম অনুল্লিখিত।

৫/২ জাঁ ক্রিসতফ' : তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদের প্রথম কিস্তি; অনুবাদক ও অনুবাদিকা—কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী।

৫/৩ 'প্রভাকর' ইংরাজি গল্পের অনুবাদ; অনুবাদক—জগদীশ গুপ্ত।

৫/৪ 'গ্যাব্রিয়েল দ্য আনুনৎ সিয়ো' (প্রবন্ধ)—গিরিজা মুখোপাধ্যায়।

৫/৫ 'এইচ.জি. ওয়েল্‌স্' (প্রবন্ধ)—হুমায়ুন কবির।

৫/৫ 'পারস্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী' (প্রবন্ধ)—মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ।

৫/৬ 'সন্ন্যাসী' : চেকভের 'The Blank Monk'-এর ভাবানুবাদ; অনুবাদক—তারানাথ রায়।

৫/৭ 'আরবী গল্প' (প্রবন্ধ)—আবুল ফজল।

৫/৮ 'জাঁ ক্রিসতফের কৈশোর' অংশ সমাপ্ত হল।

৫/৯ 'মাৎসুয়ামার আর্শি' জাপানী গল্পের অনুবাদ; অনুবাদক—চিত্তরঞ্জন আচার্য।

৫/৯ 'কেমন করে লিখতে শিখি' : সেল্‌মা ল্যাগরলফের প্রবন্ধের অনুবাদ; অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৫/৯ 'সেল্‌মা ল্যাগরলফ্' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

৫/১০ টমাস হার্ডি (পরিচিতি)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৫/১১ 'ফেরদৌসীর অগ্রদূত কবি দকিকী' (প্রবন্ধ)—মহম্মদ মনসুরউদ্দীন

৫/১১ 'তেপান্তরের মাঠে' : ম্যাক্সিম গোর্কীর 'In the steppes'-এর ভাবানুবাদ; অনুবাদক— সুবোধ দাশগুপ্ত।

৬/৩ শেলির জীবনী (ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৭/৮ 'টমাস মান' ('প্রবাহ' বিভাগে বিস্তৃত আলোচনা)—সত্যেন্দ্র দাস।

'কালি-কলমে' প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা

১ম বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা —

'আন্তন শেহভ' (গোর্কীর স্মৃতিকথা)—অনুবাদক—মুরলীধর বসু

'লিও টলষ্টয়' (গোর্কীর স্মৃতিকথা)—অনুবাদক—মুরলীধর বসু

'মানুষ যখন একা থাকে' (গোর্কীর স্মৃতিকথা)—অনুবাদক—মুরলীধর বসু

'বারাঙ্গনা' (গোর্কীর স্মৃতিকথা)—অনুবাদক—মুরলীধর বসু

১ম বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা —

'বন্ধুর উদ্দেশে' (হাফেজ হইতে)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'প্রার্থনা' (হাফেজ হইতে)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'সর্ব্বনাশ' (হাফেজ হইতে)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'মনের আগুন' (হাফেজ হইতে)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'পিয়াসী' (হাফেজ হইতে)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'মৃত্যুঞ্জয়ী' (হাফেজ হইতে)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'বিচিত্রা' (বার্ণার্ড শ প্রসঙ্গে আলোচনা)—শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়।

'আধুনিক ফরাসী সাহিত্য' (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

'ডষ্টয়ভস্কি' (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

'ন্যুট হামসুন' (প্রবন্ধ)—সুবোধ রায়।

'নোগুচি' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

'লিওনিদ্ আন্দ্রিভ' (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১ম বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা —

মোহিতলালের অনেকগুলি কবিতাই মার্কিন কবি George Sylvester Viereck-এর অনুসরণে।

'নারী বন্দনা' (বদলেয়ারের কবিতা অবলম্বনে)— মোহিতলাল মজুমদার।

২য় বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা —

'কাঁচি'—আনাতোল ফ্রাঁস।

'ম্যাকসিম গোর্কি'—ক্রমর্টকিন

'বদ্রেজিন'—ম্যাক্সিম গোর্কী

'সংগ্রহ' ঃ হিরণ্ময় ঘোষালের সঙ্গে গোর্কির সাক্ষাৎকার।

'বদ্রেজিন' ঃ গোর্কির গল্পের অনুবাদ।
'শ্যালটবাসিনী' ঃ টেনিসনের 'লেডি অফ্ শ্যালট্'-এর
অনুবাদ, অনুবাদক— মোহিতলাল মজুমদার।
'দেয়ালভাঙ্গা' : ইংরেজি গল্পের অনুবাদ,
অনুবাদক— মোহিতলাল মজুমদার।

উপরের এই তালিকা থেকে এ ধারণা করা ভুল হবে যে, এই তালিকার বাইরে অন্য বিদেশি লেখকদের রচনা আধুনিক বাঙালি ঔপন্যাসিকরা পড়েন নি, অথবা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সব লেখকের রচনার দ্বারাই তারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ থেকে আমরা শুধু এইটুকুই বোঝাতে চাই যে বাংলার আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা ছিল। সুতরাং এই সচেতনতা তাঁদের নব সৃষ্টির ক্ষেত্রে খানিকটা পথ নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারে।

তাই স্বদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়াও আধুনিক বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবও বাংলা উপন্যাসে আধুনিক যুগ সূচনার অন্যতম কারণ। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে এখানে আধুনিক বিদেশি লেখক বলতে শুধু তাদের কথাই বোঝানো হচ্ছে না যাঁরা কালগত বিচারে আধুনিক অর্থাৎ যাঁরা বিংশ শতাব্দীর বা বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী লেখক। কিছু কিছু বিদেশি লেখক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাদের আধুনিক জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বেশি মেলে। বাংলা উপন্যাসে এঁরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। Horatio Smith সম্পাদিত Columbia Dictionary of Modern European Literature-এ আধুনিকতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতাই আধুনিক সাহিত্যের প্রধান পরিচয়। এইজন্য কালের বিচারে ফরাসি নেচারালিস্টরা উনবিংশ শতাব্দীর লেখক হলেও তাঁদের বলা হয় আধুনিকতার অগ্রদূত। এবং তাঁদের দ্বারাই কল্লোল যুগের বাংলা উপন্যাস সমধিক প্রভাবিত। একথা মনে রেখেই এবারে আমরা আধুনিক বিশ্ব-উপন্যাসের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলি নির্ণয় করব।

পুরাতনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

উপন্যাসে আধুনিক যুগের সূচনা হবার আগে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই জড় বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, উৎপাদন ও বিলাসের ক্ষেত্রে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবধর্মী নির্মোহ ও বিশ্লেষণ-প্রবণ করে তুলেছিল। অলৌকিক থেকে পুরুষকারের উপরে আস্থা ফিরিয়ে এনেছিল। বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে এল বিজ্ঞানের দেওয়া প্রখর বাস্তবতা, বিশ্লেষণ-ধর্মিতা, নিরপেক্ষ নিরাসক্তি, জীবন সম্পর্কে বিস্বাদ উপলব্ধি। এই কারণে পুরাতন ভাববাদী মূল্যবোধ কল্পনা-প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আধুনিক যুগে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

পুরাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আধুনিক যুগে

বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা হানিতে সারা পৃথিবীর জীবনধারার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে যেমন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে তেমনি যুদ্ধের ফলে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙেছে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছে। নানা দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, সামাজিক·অনাচার বেড়েছে। এই পরিবর্তিত জীবনধারায় পুরাতন মূল্যবোধগুলি অচল ও অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। অথচ জীবন ও মূল্যবোধ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ পুরাতন মূল্যবোধগুলি আশ্রয় করেই সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় প্রতিভা ও অকৃত্রিম অনুভূতির অধিকারী তাঁদের সৃষ্টি সার্থকতা মণ্ডিত হলেও নতুন কালের শিল্পী নতুন জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এঁদের তরফ থেকে পুরাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে জনজীবনে যে প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়েছে তাতে চিত্রণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পুরাতনের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়া আধুনিকতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য না হলেও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াই আধুনিকতার জন্মদাতা। ইংরাজি সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় ভিক্টোরীয় যুগের আত্মতৃপ্ত জীবনবোধ ও মূল্যবোধের গতানুগতিক অনুসৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াতেই। বাংলাতেও রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের সুমহান্ জীবন-দর্শনের যে গতানুগতিক অনুসরণ চলছিল, যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণু সমাজে তা ভুয়ো বুলি রূপে প্রতিভাত হল। এই বিপর্যস্ত সমাজে অনুভূতিহীন ভাবে এই জীবনদর্শনের অনুসরণ আত্মপ্রতারণায় পর্যবসিত হল। এই আত্মপ্রতারণার প্রতিক্রিয়াতেই বাংলায়ও আধুনিকতার সূত্রপাত হয়।

অবশ্য এই আধুনিকতার জন্মের তৃতীয় একটি কারণও আছে। ইংরাজীতে ভিক্টোরীয় যুগের রচনারীতি এবং বাংলায় বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের রচনারীতির বহুব্যবহার, অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে তার উদ্দীপন শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। H.V.Routh ইংরাজি সাহিত্যে আধুনিকতার জন্ম প্রসঙ্গে বলছেন—

"There was another deeper reason. Their idiom, their manner of presentment, the play of their imagination, ...seemed gradually to be losing the old magic. There was no obvious imperfection in either the manner or the matter; the word simply failed to invoke the spirit of. Thus first the rift was felt to be change at in literary taste."[৫৯]

বাংলাতেও রবীন্দ্ররীতির অনুসরণ ক্রমশ একঘেয়ে ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়ছিল। সৃষ্টিতে যে নূতনের চমক প্রতিভার সৃজনী শক্তির সাক্ষ্য দেয়, তা ছিল না। এই জন্যে রবীন্দ্র-অনুসৃতিব একঘেয়েমি ছেড়ে আধুনিকেরা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। ভাবনায় এবং ভঙ্গিতে আধুনিকেরা নতুনত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন যে, নতুন কিছু করে চমক লাগিয়ে দেওয়াই আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য। অবশ্য যদি কোনো রকমে চমক লাগিয়ে দেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে

৫৯। 'English Literature and the ideas in the Twentieth Century', New York, 1950, p 2.

নিশ্চয়ই সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে চমক লাগালেই সাহিত্য দোষের হয় না। বস্তুত প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিতেই পাঠকের গতানুগতিক দৃষ্টিতে চমক লেগে থাকে। দেখতে হবে এই নতুন সৃষ্টি ও এই চমক লেখকের গভীরতর প্রেরণা থেকে আসছে কিনা এবং এটা তাঁর অকৃত্রিম জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত কিনা। যদি সত্যকার জীবনোপলব্ধি থেকে নতুন সৃষ্টির জন্ম হয় এবং তাতে পাঠকচিত্ত চমকিত হয়ে ওঠে তবে সে তো শিল্পের ক্ষেত্রে একান্তই কাম্য। ভিক্টোরীয় যুগের পরে ইংরেজি সাহিত্যে এমনি নূতনত্বের চমক একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছিল, প্রচলিত জীবন বোধ ও শিল্পরীতি তার আকর্ষণের যাদু হারিয়ে ফেলেছিল, তাই গতানুগতিকের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল :

"Of course a reaction in any case was due, because art must always be renewed Its creative influence depends on surprise. When once the freshness of the presentment has faded, the reader relapses into his daily habits He looks for a vision and sees only phenomena So a great book must always come with a shock of novelty, convincing the enquirer that he is only at the beginning of things, and that experiences are merely materials to play with and reconstruct into a deeper or wider perception."[৬০]

একথা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজি সাহিত্যে যে মূল্যবোধগুলির প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রানুসারী সাহিত্যিকদের যুগের মূল্যবোধগুলির সাদৃশ্য আছে। এই মূল্যবোধগুলিতে ভাঙন ধরে আধুনিক যুগে। এইচ. ভি. রুথেরই অনুসরণে বলা যায়। এই মূল্যবোধগুলি প্রধানত হল :

১) প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা,

২) পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির তুলনায় আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক সত্যকে অধিক মর্যাদা দেওয়া,

৩) নীতি ও সদাচারের প্রতি নিষ্ঠা,

৪) গার্হস্থ্য জীবনের মাধুর্যের প্রতি আকর্ষণ।

—এই সব মূল্যবোধ ক্রমশ নতুন সমাজে আধুনিক যুগের সমস্যাকণ্টকিত জীবনে অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে। ভিক্টোরীয় যুগেই এসব মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

এসব মূল্যবোধের স্থানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হতে থাকে—

১) প্রাচীন ঐতিহ্য বর্তমানের সমস্যার ক্ষুব্ধ মানুষকে সুখ দিতে পারে না,

২) অর্থ ব্যতীত বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া তো দূরের কথা, জীবনধারণও

৬০। Routh H V English Literature and the Ideas in the Twentieth Century, 1950, p 2

অসম্ভব। এবং জীবনধারণ করতে না পারলে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসাও অসম্ভব।

৩) পুরাতন আন্তরিকতাপূর্ণ নীতি ও আচার আচরণের বদলে বর্তমান যুগে যান্ত্রিক অন্তঃসারশূন্য অনুভূতিহীন আচরণ মানুষকে অন্তরে অন্তরে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। পুরাতন নীতি-নিয়ম বর্তমানের বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারছে না।

৪) কৃষি নির্ভরতা থেকে চাকুরি নির্ভরতার দিকে এগিয়ে আসার ফলে উপার্জনশীল ব্যক্তি ক্রমে যতই উপলব্ধি করতে থাকে যে পরিবারের উপার্জনহীন সদস্য বোঝাস্বরূপ ততই পরিবার ভেঙে যেতে থাকে। এমন কি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরিজীবী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য জীবনের মাধুর্যও হ্রাস পাচ্ছে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে জীবনদৃষ্টি হল বাস্তবধর্মী, জিজ্ঞাসু এবং সর্বশেষে সংশয়ী (sceptical)। এযুগের শিক্ষায় শিক্ষিত মন একথা স্বীকার করতে পারল না যে বিশ্বের একজন দিব্য স্রষ্টা আছেন, দেহাতীত শাশ্বত প্রেম বলে একটি সত্য আছে, সৌন্দর্যবোধ একটি আত্মিক উপলব্ধি এবং সৃজনী-চেতনা হল কোনো দিব্যপ্রেরণার ফল। অন্যদিকে মানুষের মন একথাও অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করতে পারল না যে, সৃষ্টিটা শুধুই জড়ের খেলা, স্নেহপ্রীতি ভালবাসা সৌন্দর্যবোধ সৃজনী-প্রতিভা—এ সবই সম্পূর্ণরূপে মানবদেহের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থির রস-ক্ষরণের ফলমাত্র। বিজ্ঞান যতই একথা শেখাতে লাগল মানবচিত্ত ততই অজানা অপরিতৃপ্তি নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল—ততঃ কিম্! বস্তুত বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক কোনো মূল্যবোধই জীবনে সুদৃঢ় প্রত্যয় আনতে পারল না। প্রত্যয়হীন দ্বন্দ্ববিক্ষত সংশয়ী চিত্তই আধুনিক মানুষের একমাত্র সম্বল। কারণ বিজ্ঞান মানুষের জিজ্ঞাসার কোনো আত্যন্তিক সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না, মানুষকে শুধু সংশয়ী করে তুলল। একালের এই সংশয় যন্ত্রণার কারণ এযুগের একজন দার্শনিক গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন :

"We do not see or know, but it is expounded to us as a cogent account of Nature process, that a play of electrons or atoms and their resultant molecules of cells, glands, chemical secretions and physiological processes manages by their activity on the nerves and brain of a Shakespeare or a Plato to produce or could be perhaps the dynamic occasion for the production of a 'Hamlet' or a 'Symposium' or a 'Republic', but we fail to discover or appreciate how such material movements could have composed or necessitated the composition of these highest points of thought and literature · the divergence here of the determinants and the determination becomes so wide that we are no longer able to follow the process, much less understand or utilise. These formulae of Science may be to pragmatically correct and infallible, they may govern the practical how of Nature's process, but they do not disclose the intrinsic how or why... ..."[৬১]

৬১। Sri Aurobindo 'The Life Divine', New York, 1951, pp.272-73.

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন—

ধর্মে ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস বলেই যেমন ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিক বলা যাবে না, তেমনি ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস হলেই তাকে অনাধুনিক বলবো, একথাও ঠিক নয়। বস্তুত দেখতে হবে লেখক যুগ-সমস্যা সম্পর্কে সচেতন কিনা যুগের উত্তাপ তাঁকে স্পর্শ করছে কিনা। এই যুগচেতনা থাকলেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিক বলব। এই কারণে ঈশ্বরে ও ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও টি.এস. এলিয়ট গ্রাহাম গ্রীন, ফাঁসোয়া মারিযাক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আধুনিক লেখক। গ্রাহাম গ্রীন, ফ্রাসোয়া মরিয়াক ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের মতে, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পাপ রয়েছে এবং এই পাপ ঈশ্বরের পরম করুণাতেই দূর হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ফরাসী ঔপন্যাসিক মারিয়াককে অনাধুনিক বলে মনে হতে পারে। কারণ তিনি এমন ধর্মে বিশ্বাসী যাতে মানুষের পুরুষকারের কোনো মহিমা স্বীকৃত হয়নি, যাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের স্থান নেই। ক্যাথলিক জানসেনিস্ট ধর্মমত অনুসারে মানুষ জন্মসূত্রেই পাপের উত্তরাধিকারী, এই পাপ থেকে সে নিজের চেষ্টায় মুক্ত হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের করুণাই এই পাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। এইভাবে ঈশ্বরের করুণার মধ্যেই শান্তি ও মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হতে পারে। তাই তিনি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আধুনিক ঔপন্যাসিক নন, তবু তাকে আধুনিকই বলা হয়। কারণ জীবন সমস্যার সমাধানে প্রত্যেক লেখকের জীবনদর্শনে স্বাতন্ত্র্য-এর মূল্য দিতেই হবে। তবে তার আধুনিকতার পরিচয় কোথায়? এ পরিচয় তার যুগ সচেতনতায়। আর যুগ-সচেতনতা ও যুগানুগত্য এক জিনিস নয়। জীবনসমস্যার সমাধান মারিয়াক যা-ই দিন না কেন, আধুনিক যুগের সমস্যা ও রূপ তার উপন্যাসে প্রতিফলিত। তার সময়ে ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজে যে ভুয়ো আদর্শবাদ, অন্তঃসারশূন্য মূল্যবোধ ছিল সেগুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন ও সেগুলি সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ তীব্র। তার উপন্যাস The Desert of Love, A Kiss for the Leper, The Enemy তে তার নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুগস্বরূপ সার্থকভাবে উদ্‌ঘাটিত। আধুনিক যুগের অবক্ষয়ের মধ্যেও অনেক ঔপন্যাসিক বলিষ্ঠ মানবিকতা ও আদর্শবাদী জীবনদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ফরাসী ঔপন্যাসিকেরা যেমনি জীবনের ব্যাপক অবক্ষয় ও বিকৃতির চিত্র দিয়েছেন তেমনি এই ব্যাপক অপমৃত্যুর ও বিকৃতির মধ্যেও সুস্থ জীবনের মহৎ আদর্শ তুলে ধরেছেন। রোমাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসের নায়কও আদর্শবাদী যুবক। সুতরাং তীব্র যুগসচেতনতাই আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই যুগকে চিত্রিত করতে গিয়েই পাশ্চাত্য লেখক এযুগের সংশয়, অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, কিন্তু যুগের এই অবস্থা চিত্রিত করার জন্যে লেখক নিজেও সংশয়ী বা নৈরাশ্যবাদী হবেনই এমন কোনো কথা নেই। তাঁর নিজের মধ্যে বিশ্বাস ও আদর্শের বীজ থাকতেও পারে এবং তদনুযায়ী তিনি যুগসমস্যার সমাধান দিতে পারেন। এইজন্যে মারিয়াক বা এলিয়টের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মে যে বিশ্বাস পাই সেটা তাঁদের অনাধুনিকতার পরিচয় নয়। তেমনি তাঁদের আধুনিকতার পরিচয় যুগের

সংশয়-অবিশ্বাস-অবক্ষয় উদ্‌ঘাটনে। ভিক্টোরীয় যুগের পরে অন্তঃসারশূন্য মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এই সংশয়-অবিশ্বাস উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু হয় স্যামুয়েল বাট্‌লার প্রভৃতির উপন্যাসে। দাম্পত্য মাধুর্য, পাবিবারিক মূল্যবোধ, ধর্মের অন্ধ অনুসরণ প্রভৃতি ভিক্টোরীয় যুগের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন তোলেন স্যামুয়েল্ বাট্‌লার। তাঁর The Way of All Flesh উপন্যাসে অর্থহীন কল্পনা-বিলাসের (Pseudo-Romanticism) বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শোনা যায়।

তেমনি কল্লোলের যুগে উদ্‌ঘাটিত হল রবীন্দ্র-দর্শনের অন্ধ আনুগত্য, গতানুগতিক অনুসৃতি ও ঘুণধরা সমাজ-জীবনের মিথ্যাচার।

সমাজচেতনা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

উপন্যাস এমনিতেই একটা সমাজচেতনা শিল্পকলা তার উপরে আধুনিক কালে বিশ্ব-উপন্যাসে সমাজচেতনা আরো প্রখর ভাবে দেখা দেয় এবং আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

আধুনিক সমাজে, বিশেষত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ে সামাজিক বন্ধন ও নৈতিক আদর্শ শিথিল হয়ে গেছে। এর উদ্‌ঘাটন ও উপস্থাপনা আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'দি ফরসাইট সাগা' উপন্যাসের শেষ ভাগ-এ ('টু লেট্') আছে সোয়ামেসের সঙ্গে তার প্রথমা পত্নী আইরিনের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। তারপরে সোয়ামেস দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা ফ্লু। এদিকে প্রথমা পত্নী আইরিন আর একজনকে বিবাহ করেছে। এই বিবাহের পর তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে—জন্। সোয়ামেস তার মেয়ে ফ্লুর সঙ্গে জনের বিবাহ দিতে চায়। যেখানে ফ্লু ও জন্ পুরাতন দৃষ্টিতে প্রায় ভাই-বোন, সেখানে আধুনিক সমাজে তাদের মধ্যে বিবাহ প্রস্তাবও চলে। এর কারণই হল পুরাতন সমাজবিধি এখন শিথিল হয়েছে। জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান্‌ও এই সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন তাঁর 'বুডেন ব্রুক্‌স্' (১৯০১) উপন্যাসে। আধুনিক যুগের সামাজিক বন্ধন ও নীতিবোধের শৈথিল্যটি ধরা পড়েছে জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস্' উপন্যাসেও। উপন্যাসটি প্রতীকধর্মী। এতে মানব-মনের অন্তর্লোকের চেতনা-প্রবাহের উদ্‌ঘাটন মুখ্য উপজীব্য হলেও এই উপন্যাসের কাহিনীতে যুগগত অবক্ষয়ও ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসে গ্রীক কাহিনীর পাশে এযুগের কাহিনীকে ব্যঞ্জনাধর্মী করে এযুগের আন্তরিক দৈন্যকে তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'ইউলিসিসে'র যে গ্রীককাহিনী তাতে রাজা অডিসিউস একজন আদর্শ বীর, একটি ঋজু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। একটি স্থির লক্ষ্যের জন্যে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে পারেন, সর্বশেষে জয়লাভ করে ঘরে ফিরে এসেছেন। তাঁর যিনি পত্নী তিনিও সতী সাধ্বী আদর্শ রমণী। বহু পাণিপ্রার্থীর প্রণয়-নিবেদন উপেক্ষা করে এই একটি নারী স্বামীর জন্যে দীর্ঘকাল পথ চেয়ে থাকেন। পরিণামে স্বামী-স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে মিলন হয় এবং জীবনের সহজ সুস্থ সুখময় রূপটি ফুটে ওঠে। এই কাহিনীর পাশে জয়েসের কাহিনীতে ফুটে উঠেছে এযুগের মানবমনের জটিলতা, আদর্শহীনতা ও যৌনবিকৃতি। জয়েসের নায়ক বীর যোদ্ধা নয়,

একজন সাধারণ সেলসম্যান, নাম তার ব্লুম। সে কোনো একটি লক্ষ্যের জন্যে সুদীর্ঘ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ নয়। প্রাত্যহিকতার প্রয়োজনে সে ঘুরে বেড়ায় যেখানে-সেখানে—হাটে-বাজারে, সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়। তার পত্নী মারিয়ান তেমনি এযুগের নারী। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতার আদর্শ তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। সে অন্য একজন প্রণয়ীর চিঠি পেয়ে উল্লসিত হয়, স্বামী যখন বাড়ি থাকে না তখন অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সুখ উপভোগ করে। আবার এযুগের স্বামীব মধ্যেও আদর্শানুভূতিটুকু নিশ্চিহ্ন। তাই স্ত্রীর ব্যভিচারের কথা জেনেও সেই স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতে তার বাধে না। উপন্যাসের পরিণতিতে এই স্বামী ব্লুমের অবচেতন মনের অবিচ্ছিন্ন চেতনা-প্রবাহ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে মনে করে নতান্ত্রিক সমাজের সমৃদ্ধির অপবিহার্য পরিণাম যে বিকৃতি, তা-ই এই উপন্যাসে চিত্রিত। ব্যক্তির আত্যন্তিক আত্মিক শূন্যতাই ইউলিসিস উপন্যাসে উপস্থাপিত। বস্তুত একথা শুধু ইউলিসিস সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, এ হল আধুনিক যুগের অধিকাংশ উপন্যাসেরই কথা। কল্লোল যুগেও ব্যক্তির এই আত্মিক দৈন্য ও ব্যক্তি আত্মার দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কথা অনেক উপন্যাসেই চিত্রিত হয়েছে।

এযুগে বিজ্ঞানের প্রগতি, যন্ত্রের বিকাশ প্রভৃতির ফলে মানুষের বাহ্য সমৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে; কিন্তু মানুষেব অন্তরেব দৈন্য তো দূর হচ্ছে না। সাম্যবাদ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করার চেষ্টা কবছে। কিন্তু এতে মানুষেব অন্তরের অভাব দূর হবে না। অন্তরের শূন্যতা বেড়েই যাচ্ছে। যন্ত্রসভ্যতা ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধেও মানুষের মধ্যে কোথাও কোথাও অসন্তোষ দেখা যায়। যুগের এই অবিশ্বাস ও অসন্তোষ ফুটে উঠেছে অল্ডাস্ হাক্স্লি-র 'Brave New Wo ld' উপন্যাসে। হাক্স্লি মনে করেন অন্তরের সম্পদ হল প্রেম. মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব হারিয়ে শুধু বিজ্ঞান ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির উপরে নির্ভর করার ফলে পশ্চিমী সভ্যতা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সমসাময়িক সমাজ-জীবন সম্পর্কে চেতনা আধুনিক কালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রখর হয়েছে। এমন কি যাঁরা নেহাৎই অন্তর্জীবনের চিত্র রচনায় আগ্রহী সেই ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমসাময়িক জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। জেমস্ জয়েসের মধ্যে যেমন আমরা দেখেছি এযুগের বিকৃতি ও অবক্ষয়ের রূপ ধরা পড়েছে, তেমনি মার্সেল প্রুস্তেও দেখা যায় তাঁর সময়কা সামাজিক রূপান্তর অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছে। ফরাসী দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত জমিদার, অভিজাত সম্প্রদায় এবং উঠ্তি ধনী সম্প্রদায়ের যে রূপান্তর হয়েছে তার জীবন্ত চিত্র 'Remembrance of the Things Past' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

আধুনিক জীবনে অতিনাগরিক বৈদগ্ধ্যের ফলে মানুষের জীবন থেকে সারল্য ও আন্তরিকতা বিদায় গ্রহণ করেছে, আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে বিরাট ব্যবধান। আমাদের শিক্ষায় দীক্ষায়, আমাদের সামাজিক আচার-আচরণে, এমন কি আমাদের প্রেম-ভালোবাসায় যে মিথ্যাচার আত্মগোপন করে আছে তার আবরণ উন্মোচন করার প্রবণতা আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দেখা যায়। জিদের বিখ্যাত উপন্যাস 'The

Counter-feiters' (১৯২৫)-এ এই প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক স্বার্থ ও পদাকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন দেশে প্রায়ই নেতাদের অমানুষ করে তুলেছে। এই স্বার্থের জন্যে তারা যে কোনো রকম গর্হিত কাজ করতে কুণ্ঠিত হন না। অথচ এঁরাই হন দেশের ভাগ্যবিধাতা। এই স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রনেতাদের রূপ ফুটে উঠেছে জিদের 'থিসিউস' (১৯৪৬) উপন্যাসের নায়ক থিসিউসের মাধ্যমে। আধুনিক ধনী সমাজের যে অন্তঃসারশূন্যতা একটা ব্যর্থতাবোধের জন্ম দিচ্ছে, যার ফলে মৃত্যু ও আত্মহত্যা, খুন ও জালিয়াতি অপরিহার্য হয়ে উঠছে, তার স্বরূপ ধরা পড়েছে জিদের উপন্যাসে।

আধুনিক ঔপন্যাসিকরা যেমন কেউ কেউ যুগের অবক্ষয় ও বিকৃতির চিত্র এঁকেছেন, তেমনি কেউ কেউ এই সর্বাত্মক বিকৃতির যুগে জন্মেও মানবজাতির সামনে নবজীবনের আদর্শ তুলে ধরেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিকৃতির চিত্র এঁকেছেন তারাই আধুনিক এবং যাঁরা মানুষের বাঁচার পথ দেখিয়েছেন বা নবতর প্রভাতের স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা অনাধুনিক তা নয়। দেখতে হবে তাঁরা এই যুগ সম্পর্কে সচেতন কিনা। তাঁদের সকলের পথ নির্দেশ সকলের কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পারে, কারণ প্রত্যেকের পথ-নির্দেশ তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন অনুসারে হয়, কিন্তু যুগগত মানুষের সমস্যা সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। রোমাঁ রঁল্যা তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসে একটি শিল্পী সত্যনিষ্ঠ নায়কের চরিত্র রচনা করেছেন। তাঁর আদর্শবাদ ভবিষ্যতের নবপ্রভাতের স্বপ্নে বিভোর। আর একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক জ্যুল রোঁমা আবার আর একটি সংগঠনাত্মক আদর্শ দিয়েছেন। তার বিশ্বাস সমাজবাদে। ২৭ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'The Man of Good Will' (শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ)-এ আশা ও আদর্শবোধ-ই প্রধান। তবু যুগচিত্রকে তিনি বাদ দেননি, বা যুগ সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকেন নি। বিশ শতকের ফ্রান্সের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের সমাজ ও সমস্যা এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত। আধুনিক ফরাসী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যুগচিত্র উপস্থাপনা চরমে বেড়ে তথ্যনিষ্ঠ উপন্যাসের (Chronicle novel) জন্ম দেয়। দ্যুহামেলের 'Salavin' উপন্যাসটি এই শ্রেণীর। এতে বিগত শতাব্দীর শেষ থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন দিক চিত্রিত হয়েছে।

তাত্ত্বিক উপন্যাস যাঁরা লিখেছেন তাঁদেরও অনেকের মধ্যে তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনা রয়েছে। সার্ত্র-এর Roads to Freedom' উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক সামাজিক বিবর্তনের চিত্র এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগের মানুষের অন্তরের চরম দেউলিয়া অবস্থা কাম্যুর 'The Outsider' উপন্যাসে চিত্রিত। মূল্যবোধের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধাহীনতা, যৌনবিকৃতি, খুন প্রভৃতি এযুগের অসুস্থ চিত্তের সামগ্রিক পরিচয় এই উপন্যাসে রয়েছে। কিন্তু এই চরম নৈরাশ্যবাদী দর্শন নৈতিমূলক অস্তিত্ববাদ ক্রমে কাম্যু উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। তাঁর 'The Plague' উপন্যাসে আশাবাদের সুর শোনা যায়। এই উপন্যাসের কাহিনী যাঁর জবানীতে বিবৃত

হয়েছে সেই Dr Rieux বলেছেন — what interests me is to live and die because of what one loves এবং There is more to admire than despise in man। এই প্রচ্ছন্ন আশাবাদ যেন রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় — মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারানো পাপ।

ফরাসী উপন্যাসিক দ্যুহামেল (Duhamel) এর 'Salavin' এর মধ্যে নাগরিক সভ্যতার দুঃখ ক্ষত উদঘাটিত। তাঁর 'Chronique des Pasquier' (১৯৩৩-৭১) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন দিক চিত্রিত। তাঁর সমসাময়িক ফরাসী উপন্যাসিক Jules Romains এর বৃহৎ উপন্যাস Les Hommes de bonne volonte (১৯৩২-৭১) এ বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের ইউরোপ ও বিশেষ করে ফ্রান্সের সমাজচিত্র রয়েছে। তার উপন্যাসে সামাজিক বিকার ও আদিরসের চিত্র আছে, কিন্তু সবার উপরে মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। Andre Maurois এর উপন্যাসেও নীতি ও আদর্শবাদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত উপন্যাসিক Francois Mauriac-এর মধ্যে গভীর ধর্মীয় চেতনা রয়েছে। তাঁর এই চেতনা বুদ্ধিগত কোনো সূত্র নয়, অন্তরের স্বতঃউৎসারিত উপলব্ধি থেকে জাত। অথচ তিনি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে পাপীর মনস্তত্ত্ব সার্থক ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

রুশ উপন্যাসিকরা বরাবরই সমাজ সচেতন, সমাজের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনায় সিদ্ধহস্ত। উনিশ শতক রুশ উপন্যাসের স্বর্ণযুগ। এ শতকের উপন্যাসিক পুশকিন, তুর্গেনিভ, গোগোল দস্তয়েভস্কি, টলস্টয় সকলের মধ্যেই সমাজ বাস্তবতা ও ইতিহাস-চেতনা প্রখর। এর পরে বিশ শতকের উপন্যাসিক আইভান বুনিন, কুপ্রিন, মিখাইল শোলোকভ, আলেকসাই টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী অস্ত্রোভস্কি, গোনবাটভ ইলিয়া ইরেনবুর্গ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর এই বাস্তবতা ও সমাজচেতনা উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। অন্যান্য দেশে আধুনিক উপন্যাসে যেখানে যৌনচিত্র উপস্থাপনা ও অতিমাত্র মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য দেখা যায়, রুশ উপন্যাসে সেখানে আধুনিক যুগে সমাজচেতনা ও ততোধিক সামাজিক দায়িত্ববোধ এসেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অল্পবিস্তর রাজনৈতিক চেতনা ও উদ্দেশ্য-বোধ দেখা যায়। ম্যাক্সিম্ গোর্কীর উপন্যাস তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। অথচ এই সাংগঠনিক আদর্শবাদ বা বিপ্লববাদ তাঁর শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঝাপসা করে দেয়নি। গোর্কীর 'মাদার' উপন্যাসে যেমন একটি বিপ্লবের বলিষ্ঠ সাংগঠনিক রূপ গড়ে তোলা হয়েছে তেমনি বিপ্লবের পূর্ববর্তী রাশিয়ার দুরবস্থা নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক ভাঙনের ছবিও ফুটে উঠেছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ, দরিদ্র, কৃষক ও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষের নৈতিক বিকৃতি, নিষ্করুণ দারিদ্র্য ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র সবচেয়ে যাথার্থ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন আইভ্যান বুনিন। বুনিনের 'দি ভিলেজ' (১৯১০) উপন্যাসটি এদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃষ্টি। বুনিন এযুগের রুশ উপন্যাসের সাধারণ প্রবণতা যে রাজনৈতিক চেতনা ও বিপ্লববাদ, অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের

সামাজিক যে দায়িত্ববোধ, তা অস্বীকার করেছেন। ১৯১৭-র বিপ্লব তিনি সমর্থন করতে পারেন নি বলে এই বিপ্লব শুরু হওয়ার পরেই দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যান। কোনো নৈতিক আদর্শ বা দায়িত্ববোধ নয়, তিনি বরাবর 'নেচারালিজমে'র সমর্থক ছিলেন। এই জন্যে সমাজের একাংশের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের চিত্র তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত যথাযথ ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। রুশ উপন্যাসের সাধারণ ধারা থেকে বুনিন খানিকটা বিচ্ছিন্ন।

ফরাসী বা মার্কিন ঔপন্যাসিকরা যেভাবে যৌনচিত্র উপস্থাপিত করেছেন, রুশীয় ঔপন্যাসিকরা সেভাবে যৌনচিত্র খুব বেশি উপস্থাপিত করেন নি। শুধু সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্যে সামাজিক বাস্তবতার দায়িত্বে তাঁরা উপন্যাসে কোথাও কোথাও যৌনজীবনের বিকৃতির রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন রুশ ঔপন্যাসিক কুপ্রিনের 'Yama the Pit' (১৯০৯-১৫) উপন্যাসে ৎসাবের শাসনকালের রাশিয়ার ঘুণধরা সভ্যতার চিত্র উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে তার সঙ্গে গণিকালয়ের জীবন্ত চিত্র খুব সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যৌনচিত্র ও বিকৃতি ব্যতিরেকে সুস্থ সমাজচেতনাব পরিচয় পাওয়া যায় অধিকাংশ রুশ ঔপন্যাসিকের মধ্যে। বস্তুত আধুনিক উপন্যাসের পটভূমি আমেরিকা বা ফ্রান্সে যে রকম ছিল, রাশিয়ায় পুরোপুরি সেরকম ছিল না। সেখানে বিপ্লবের আগেকার ৎসার-শাসিত সমাজে যেমন বিকৃতি ছিল তেমনি বিপ্লবেব জন্যে জাগরণ ও সাংগঠনিক প্রয়াস ছিল। আর বিপ্লবের পরে দেশ যেমন সুস্থ সংগঠনে লেগেছে, উপন্যাসেও তেমনি অনুরূপ সুস্থ সমাজচেতনার পরিচয় রয়েছে।

আলেক্‌সাই টলস্টয়ের তিন খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ উপন্যাস Ordeal-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু হয়ে রুশ বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কাল পর্যন্ত রাশিয়ার সমাজ-জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায়। রুশীয় লেখক বোরিস গারবোটভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের রুশজীবন অবলম্বনে লেখেন 'The Unvanquished'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় অনেকগুলি উপন্যাস রচিত হয়। প্যানোভার 'The Train'. ইরেনবুর্গের 'The Fall of Paris' (১৯৪১) এবং তাঁরই 'The Storm' (১৯৪৮) বিশেষভাবে মনে আসে। 'The Fall of Paris' উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনী বিধৃত।

প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ বা যুদ্ধের ফল নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে অনেকগুলি উপন্যাস লিখিত হয়, বিশেষত রাশিয়ায়। এই যুদ্ধ-সচেতনতা বস্তুত আধুনিক উপন্যাসের সমাজচেতনারই একটি দিক। জর্জ দ্যুহামেল (George Duhamel) নিজে প্রথম যুদ্ধে সার্জেন (surgeon) ছিলেন। তাঁর 'Vie des martyrs' (১৯১৭) উপন্যাসে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দুঃখ-কাহিনী বর্ণিত। ফরাসী ঔপন্যাসিক Jules Romains-র বৃহৎ উপন্যাস 'Les Hommes de bonne Volonte-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল ইউরোপ ও বিশেষ করে ফ্রান্সের জীবনধারায় কি তা বিশ্লেষিত হয়েছে। Andre Maurois-এর 'Les Silences du Colonel Bramble (১৯১৮) উপন্যাসে ব্রিটিশ সৈনিকদের মনস্তত্ত্ব আলোচিত।

বাস্তবতা ও নেচারালিজম্

সমাজ-চেতনার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত বাস্তবতাব চেতনা। এই চেতনারই একটা চরম রূপ হল নেচার‍্যালিজম্ (Naturalism)। এক্ষেত্রে অগ্রণী ফরাসী সাহিত্য। সেখানে বাস্তবতার সূত্রপাত হল ১৮৫০ সালে। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে বাস্তবতার যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে যে-পর্বটি সেটি হল ১৮৫০-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠিক রোমাণ্টিক যুগের (১৮২০-৫০ খ্রীঃ) পরেই বাস্তবতার যুগের সূচনা। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই দেখা যাচ্ছে যে সাধারণত রোমাণ্টিক যুগের সমৃদ্ধির পর তার একটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি ও অন্ধ অনুকরণের সময় আসে। এই সময় রোমাণ্টিক একঘেয়েমি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে এবং তার অন্তর্নিহিত প্রাণোত্তাপ হারিয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং বাস্তবতার যুগ আসে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথে রোমাণ্টিক যুগের চরম বিকাশ হয়েছিল। তারপরে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মধ্যে তার অনুকবণ ও ব্যর্থ অনুসরণ বিরক্তিকর পর্যাযে আসে এবং তাব পরেই রোমাণ্টিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং বাস্তবতার যুগ আসে। বাংলায় এই যুগটি ব্যাপক ভাবে দেখা দিল ১৯২৩ থেকে—'কল্লোল' প্রকাশেব কাল থেকে। এবং এই বাস্তবতাই আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রোমাণ্টিক যুগের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কল্পনা-প্রাধান্য ও আবেগ-প্রবণতা। এর প্রতিক্রিয়ায় আধুনিক যুগে এল বাস্তবতা ও যুক্তি-প্রাধান্য অর্থাৎ কল্পনার বদলে বাস্তব এবং আবেগের বদলে যুক্তি। বাস্তবতাব চরম রূপ জন্ম দিল 'নেচার‍্যালজম্' ও যুক্তি প্রাধান্যের ফলে এল তাত্ত্বিকতা ও বিশ্লেষণধর্মিতা। আধুনিক উপন্যাসে দেখা দিল নেচার‍্যালিজম্, তত্ত্বপ্রাধান্য ও বিশ্লেষণধর্মিতা। রোমাণ্টিকতা উপস্থাপিত করে সাহিত্যিকের স্বপ্ন অনুসারে জগৎ যেমন হওয়া উচিত, তাকে। আর বাস্তবতা উপস্থাপিত করে জগৎ যেমন রয়েছে, তাকে। কখনো কখনো 'কবির স্বপ্নলালিত জগৎ'-এর সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু তার অতিরেক এবং সর্বশেষে দীর্ঘায়িত অন্তরানুভূতিহীন একঘেয়েমি বিরক্তির কারণ হয়। বিশেষত বস্তুজগৎ যখন খুব বেশি কুৎসিত, খুব বেশি বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে—যুদ্ধ, মহামারী, শোষণ, অসাম্য, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে জীবন যখন বিষাক্ত হয়ে ওঠে তখন স্বপ্নদৃষ্ট জগতের সৌন্দর্যের সঙ্গে জীবনের বাস্তব রূপের ব্যবধান নিতান্ত দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে এবং মানুষ বার বার চেষ্টা করেও জীবনে নিজের স্বপ্নকে কিছুতেই রূপ দিতে পারে না, তখন সাহিত্যের রোমাণ্টিক ছবি তার কাছে অর্থহীন হয়ে ওঠে। এবং সে তখন তার কুৎসিত বাস্তবকেই সাহিত্যে রূপ দেয়। এইভাবে বাংলা উপন্যাসেও আধুনিকতার জন্ম। এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা আধুনিক কালে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সামাজিক-পরিস্থিতির যে চিত্র দিয়েছি, তাতে বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার জন্মের কারণ বেশ বোঝা যাবে।

ফরাসী উপন্যাসে বাস্তবতার যুগ সূচিত হয়েছে ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময় থেকেই। এই বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টির মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার কাজ করেছিল। ১৮৫৭ সালে ডারউইনের 'Origin of Species' বইটি ফরাসীতে অনূদিত হয়। জগৎ

সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে ফরাসী সাহিত্যে এই বইটির প্রভাব খুব বেশি। এই সময়ে আবার Auguste Comte-এ ঐহিকতাবাদের (Positivism)-এর প্রসার ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশেরও কোনো কোনো লেখক এই সব চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তখন জাতীয় জাগরণের নবোন্মাদনায় বাংলার জাতীয় দৃষ্টি ভবিষ্যতের আদর্শ রূপ-কল্পনায় স্বপ্নাতুর। এই জন্যে এই সব বাস্তববাদী রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এদেশে তখন ব্যাপক বাস্তবতার জন্ম হয় নি। তাছাড়া সাহিত্যের ইতিহাসে বাস্তবতার আবির্ভাবের কতকগুলি স্তর পরম্পরা আছে। রোমাণ্টিকতার মোহ না কাটলে ঠিক বাস্তবতার জন্ম হয় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তখনো বাংলায় রোমাণ্টিকতার পূর্ণ বিকাশই হয় নি। এই পূর্ণ বিকাশ হল রবীন্দ্রনাথে এসে। তাই রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলায় বাস্তবতার জন্ম হল। ফরাসী সাহিত্যেও বাস্তবতার জন্মের আগে একটি সমৃদ্ধ রোমাণ্টিক যুগ চলে গেছে।

ফরাসী সাহিত্যে এই বাস্তবতার চরম পরিণতি হল 'নেচারালিজম'। এই মতবাদ সাহিত্যে জীবন ও জগতের তথ্যাবলীর হুবহু পরিবেশনে উদ্যোগী। এই মত অনুসারে মানুষ নিয়তির বন্ধনে বাঁধা। এই নিয়তি হল জড়জগতের নিয়ম, দেহের দাবি। এ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। পঞ্চ-ভূতের ফাঁদে মানব মন চির শৃঙ্খলিত। রক্তমাংসের দেহে কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও তার জড়বিধান মানুষের জীবনে একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি।

যদিও ফ্লবেয়ার পুরোপুরি নেচারালিস্ট ছিলেন না, তবু এ যুগের (১৮৫০-৮০) বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই যুগ ফরাসী উপন্যাসে সমৃদ্ধতম।

'রিয়েলিজম'ই হল উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইজন্যে ফরাসী সাহিত্যে বাস্তবতার যুগ আসার পরেই উপন্যাসেরও সমৃদ্ধতম যুগ সূচিত হল। জীবনের বাস্তব রূপের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে উপন্যাসের সামনে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটিত হল। ১৮৫৭ সালে ফরাসী ঔপন্যাসিক Champfleury (১৮২০-৮৯)-র প্রবন্ধ Realisme প্রকাশিত হয়। এতে বাস্তবতার পক্ষ সমর্থন করা হয়। তারপরে বাস্তবতার বলিষ্ঠতম শিল্পী ফ্লবেয়ারের (Gustave Flaubert, ১৮২১-১৮৮০) আবির্ভাব। এই যুগের ফরাসী উপন্যাসের সঙ্গেই কল্লোলের যুগের উপন্যাসের সাদৃশ্য বেশি। ফ্লবেয়ারের উপন্যাসে বাস্তবতা এসেছে অনেকটা সচেতন ও কষ্টকৃত প্রয়াসের ফলে, এটা ঠিক জীবনানুভূতি থেকে স্বতঃউৎসারিত ফলশ্রুতি নয়। 'কল্লোল'-যুগের আধুনিকতার মধ্যেও বাস্তবতার মূলে একটা চেষ্টাকৃত অত্যুৎসাহ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। খুব সাম্প্রতিক উপন্যাসে অন্তর্মুখীনতার ফলে উপন্যাসের বাহ্য গঠন অনেকটা আমাদের এলোমেলো মনোলোকের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাসে বাহ্যরূপের এই এলোমেলো ভাব দেখা দিল। কিন্তু ফ্লবেয়ারের যুগে উপন্যাসে সেই রকম অন্তর্মুখীনতা প্রবল হয়নি। বাইরের বাস্তবতার প্রতিই নিষ্ঠা ছিল। এই জন্যে উপন্যাসের বহিরঙ্গের পারিপাট্য উপেক্ষিত হয়নি। বরং ফ্লবেয়ার একদিকে যেমন উপন্যাসে বাস্তবতার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসের শিল্পরূপকেও নিখুঁত করতে চেয়েছিলেন। কল্লোল-যুগের

ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তাঁরাও উপন্যাসের প্রধানমাণ, চরিত্র-চিত্রণ ভাষা শিল্প প্রভৃতি প্রচলিত অঙ্গ শিল্পের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। চেতনা প্রবাহধর্মী উপন্যাসে পরবর্তীকালে উপন্যাসের আঙ্গিকের যে আমূল পরিবর্তন হল, কল্লোল যুগে তার সূচনা দেখি না। অর্থাৎ জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে কল্লোলের ঔপন্যাসিকেরা যেমন আভ্যন্তর আনতে চেয়েছিলেন শিল্পরূপের ক্ষেত্রে তেমন কোনো আমূল রূপান্তর সাধন করতে পারেন নি। ফ্লোবেয়ারের Madame Bovary ([illegible]) বাস্তবতা সঞ্চারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ [illegible] এর অশ্লীলতার [illegible] মামলা হয়েছিল, যদিও লেখক নির্দোষ বলে বিবেচিত হন। [illegible] একটি প্রচ্ছন্ন রোমান্টিকতার সুর [illegible] যায়, [illegible] পারিপাট্য রয়েছে। এই [illegible] Madame Bovary সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক লেগুই কাজামিয়া (L Cazamian) বলেছেন "The novel has harsh features but in the light of present-day tolerance it is for better or worse unexceptionable A romantic ardour still glows at the core melting and fusing the elements of a drama that shows texture coherence and composition The language has fine imagery rhythm and rises at time to subdued eloquence while moments of poetry relieve the sadness and squalor of the painful story"

কল্লোলের অনেক ঔপন্যাসিক বিশেষত বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এরা চেষ্টা করে উপন্যাসে [illegible] সৃষ্টি করলেন [illegible] এদের মধ্যে কারবর্জিত, কল্পনা ও শিল্পনিষ্ঠা রয়েই গেছে। ফ্লোবেয়ারের পরবর্তী দুটি উপন্যাস L Education Sentimentale (১৮৬৯) এবং Bouvard et Pécuchet (১৮৮১) তে শুদ্ধ বাস্তবতার চিত্র পাওয়া যায়। ফ্লোবেয়ারের সমসাময়িক আরো দুজন ঔপন্যাসিক Edmond ও Jules নামে দুই ভাই ফরাসী উপন্যাসে বাস্তবতার সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমসাময়িক সমস্যাকে উপজীব্য করেই এঁরা প্রধানত উপন্যাস রচনা করেছেন। জীবনের বাহ্যরূপের বাস্তব চিত্র, বিশেষত নেচারালিস্টদের যেটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেই জীবনজীবনের বাস্তব স্থূলরূপের উপস্থাপনা, তাকে [illegible] স্থাপিত করেই এই ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষান্ত হন নি। এঁরা মনোজীবনের উপস্থাপনায়ও মনোযোগী ছিলেন। এযুগের ঔপন্যাসিক Jules Valles-এর মধ্যে যদিও কবিমন ছিল তবু তাঁর উপন্যাসে যুগের জ্বালা বিশেষত ব্যক্তিজীবনের দুঃখ দারিদ্র্য চিত্রিত হয়েছে। এদিক থেকে স্মরণীয় হল তাঁর Jacques Vingtras উপন্যাস। Daudet এর উপন্যাসে দক্ষিণ ফ্রান্সের জীবনচিত্র তীক্ষ্ণ বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সঙ্গে উপস্থাপিত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হল Lettres de mon moulin।

ফরাসী উপন্যাসে বাস্তববাদী যুগের পরিণতি হল নেচারালিজমে (naturalism)। এই নেচারালিজমের সূচনা হল জোলা থেকে (Emile Zola : ১৮৪০-১৯০২)। জোলার উপন্যাসে যৌন জীবনের রূঢ় বাস্তব ছবি থাকলেও জোলার মধ্যে শিল্পগুণও ছিল। দার্শনিক মনোবিজ্ঞানী Hippolyte Taine (১৮২০-১৮৯৩) তাঁর বিখ্যাত বই De

l'intelligence-তে তিনি প্রমাণ করেন যে, মন শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবের উপরে নির্ভরশীল এবং মনের একটি বিস্তৃত জগৎ ও অনেক উচ্চতর ক্ষমতা রয়েছে। মনকে শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরে নির্ভরশীল বলায় মন সম্পর্কে রহস্যবাদী মত উপেক্ষিত হয় এবং মন সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। ফলে মনোজগতের ক্রিয়াকে বিশ্লেষণী ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সূচনা হয়। Taine-এর এই মতবাদের দ্বারা জোলা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে তিনি মনকে আধ্যাত্মিক কোনো রহস্যময় ব্যাপার বলে গ্রহণ না করে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ ও মনের উপরে ইন্দ্রিয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হন। এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করেন। মনোবিজ্ঞানী Taine ছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানী Lucasও জোলাকে খুব বেশি প্রভাবিত করেন। Lucas প্রমাণ করেন যে মানব-চরিত্র বংশগতির (heredity) জৈবিক বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জোলা এই মতবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং মানব-মনের উপরে ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে তার পরিবেশ (environment) যে প্রভাব বিস্তার করছে এবং মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে যে জৈবিক প্রবণতা অর্জন করছে, তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানব-চরিত্র গড়ে ওঠে এবং বিবর্তিত হয়। জোলার মতে চরিত্র জৈবিক প্রবণতা ও বংশগতির মিলিত উৎপাদন ফল। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যে জোলা 'Rougon Macqurt' শিরোনামে ২০টি খণ্ডে সমাপ্য উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন। অর্থাৎ মানব-মনের আধ্যাত্মিক কোনো সত্তা নেই বা মানুষের মধ্যে জৈবিক সত্তা ছাড়া আধ্যাত্মিক কোনো উপাদান নেই যা এসবের প্রভাব কাটিয়ে ক্রমিক মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। জোলার উপন্যাসে তাই পঞ্চভূতের ফাঁদে রক্তমাংসের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি, ব্যর্থতা ও কান্না চিত্রিত হয়েছে। 'কল্লোল'-যুগের উপন্যাসের প্রথম দিকে (বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) অনেকটা এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন বলে তাঁদের উপন্যাসে যৌন কামনা, রক্তমাংসের মানুষের ইন্দ্রিয়নির্ভর জীবন এমন নিরাভরণ ভাবে চিত্রিত। জোলার উপন্যাসে তত্ত্বের সঙ্গে শিল্পগুণ মিলিত হয়েছে। তিনি তাঁর যুগের শিল্পায়িত ফ্রান্সের যুগচিত্রও উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের তথ্যনির্ভর রীতি (documentary method) কল্লোল-যুগের বাংলা উপন্যাসকেও প্রভাবিত করেছে। কয়লাখনির জীবন নিয়ে জোলা তাঁর Germinal উপন্যাসটি রচনা করেন। 'কল্লোল'-যুগে শৈলজানন্দ কয়লাখনির জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেন। জোলা বাস্তববাদী ও যৌনজীবন সম্পর্কে স্পষ্টবাদী হওয়ার দাবি করলেও তাঁর প্রথম বয়সের রোমাণ্টিকতা একেবারে মুছে যায় নি। ফলে কল্পনার মৃদুস্পর্শে তাঁর বাস্তব চিত্র রসোত্তীর্ণ সৃজন-ব্যাপার হতে পেরেছে। তাঁর যুগে জোলা ছিলেন নেতৃস্থানীয়। জোলার পথানুসারী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত হলেন মোপাসাঁ (Guy de Maupassant ১৮৫০-১৮৯৩)। মোপাসাঁও নেচারালিষ্ট। তাঁকে লিখতে উৎসাহিত করেন ফ্লবেয়ার। মোপাসাঁর উপন্যাস হল Une Vie, (১৮৮৩), Bel-Ami (১৮৮৫), Pierre-et Jean (১৮৮৮), Fort comme la mort (১৮৮৯) ইত্যাদি। সংযত ও আবেগহীন যথাযথ বর্ণনা মোপাসাঁর

মধ্যে বাস্তবতাকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। জীবনের সামগ্রিক সত্যকে রূঢ়ভাবে উদ্‌ঘাটনই তাঁর নেচার‍্যালিজমের বৈশিষ্ট্য। তিনি এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন যা মিথ্যা আদর্শবাদকে ধূলিসাৎ করে দেয়। তাঁর মধ্যে আবেগ ও কল্পনার স্পর্শ নেই। ফরাসী সাহিত্যে নেচাব্যালিজ্‌মের যুগেই আবির্ভূত হন Huysman (Joris-karl Huysman, ১৮৪৮-১৯০৭) এবং প্রথমে এই যুগের প্রবণতা অনুযায়ী বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনা করেন Les Soeurs Vatard (১৮৭৯) ইত্যাদি। কিন্তু পরে তিনি সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও অধ্যাত্মের মধ্যে সত্যের সন্ধান করতে থাকেন। ক্যাথলিক মরমিয়া সাধনার দিকে ঘুরে দাঁড়ান। এই পবিবর্তনের পরিচয় রযেছে তাঁব শেষেব দিকেব উপন্যাস A rebours (১৮৮৪), La-bas (১৮৯১), এবং সবচেযে বেশি En route (১৮৯৫) ও La cathedrale (১৮৯৮) উপন্যাসে। শুধুই রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে যে মানবচিত্ত পরিতৃপ্ত হতে পারে না, তা নেচার‍্যালিজ্‌মের যুগের শেষেব দিকেব এই প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়। এযুগের আরো একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক Eugene Fromentin (১৮২০-৭৬) এব Dominique উপন্যাসে নেচার‍্যালিজ্‌মেব বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

কল্লোলের কথাসাহিত্যে বাস্তবতা ও নেচার‍্যালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে বাস্তবতা ও নেচাব্যালিজমের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হযেছিল। ফবাসী সাহিত্যে বাস্তবতা ও নেচার‍্যালিজমের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জার্মান সাহিত্যেও বাস্তবতা ও নেচার‍্যালিজমেব প্রতিষ্ঠা প্রায় একই সময়ে (১৮৩০-১৯০০ খ্রীঃ)। ইমারমান (Karl Lebrecht Immermann) জার্মান উপন্যাসে বাস্তবতার সূচনা কবলেন—Die Epigonen উপন্যাসে। পুবানো অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে উদীযমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে দ্বন্দ্ব চিত্রিত করলেন সে দ্বন্দ্ব বাংলা কথাসাহিত্যে স্থান কবতে পেরেছে অনেক পরে—বিংশ শতাব্দীব কোনো উপন্যাসে। আর উচ্চবিত্ত সমাজেব ভণ্ডামি ও অন্তঃসারশূন্যতাকে যেভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন Muenchhausen উপন্যাসে (১৯৩৮-৩৯), সে রকমভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া তো বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় আবো পরে প্রায় সাম্প্রতিককালে। গুস্তাফ ফ্রিটাক্‌-এর Sollund Haben (১৮৫৫) উপন্যাসে উদীয়মান বণিক সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক গটফ্রিড কেলার (Gottfried Keller) সুইজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবনের বস্তুবচিত্র উপস্থাপিত করেন Martin Salander (১৮৮৬) উপন্যাসে। মেয়েব (Meyer) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে ত্রিশ বছরের যুদ্ধকে পটভূমিকায় রেখে তৎকালীন সমাজজীবন উপস্থাপিত করেন। লক্ষণীয় এই যে ফরাসী বাস্তববাদী উপন্যাসে যেখানে মূলত যৌনজীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, জার্মান বাস্তববাদী উপন্যাসে সেখানে বৈচিত্র্য লক্ষ্য কবা যায় উচ্চবিত্ত সমাজ, মধ্যবিত্ত সমাজ, বণিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক দলমতের চিত্র—সব দিকে জার্মান ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি ছিল। অথচ কল্লোল-যুগের উপন্যাসে প্রধানত ফরাসী উপন্যাসেরই অনুসৃতি দেখা যায়। এর পরে বিংশ শতাব্দীর জার্মানির সমাজ-জীবন নাটকীয় সংঘর্ষ

ও উত্থান-পতনে বিপর্যস্ত। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির জীবনযাত্রা ক্ষতবিক্ষত হয় এবং নব উত্থানের প্রচণ্ড প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। পূর্ববর্তী শতাব্দীর বাস্তবতা ও নেচারালিজমের অনুসৃতি চলতে থাকে এবং যুদ্ধোত্তর জীবনের অবক্ষয় চিত্রিত হতে থাকে। অন্য দিকে সমাজের যে নব উত্থানের প্রেরণা দেখা যায়, তার উত্তাপে নব্য রোমান্টিকতারও সূচনা হয়। যুদ্ধের অভিঘাতে জাতি ও ব্যক্তি যে অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তাতে অস্তিত্বের অর্থজিজ্ঞাসা উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠে। গভীর জিজ্ঞাসার ফলে প্রকাশবাদী (Expressionist) এবং পরাবাস্তবতাবাদী (Surrealist) প্রবণতাও উপন্যাসে দেখা দেয়। এ যুগের প্রভাবশালী ঔপন্যাসিক হেরমান হেসে, ফ্রান্ৎস কাফকা, য়্যাকব ভাসেরমান, টমাস মান্ ও ফ্রান্ৎস্ ভেরফেল।

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে জার্মানির যে বিরাট বিপর্যয় হয়েছিল তার ফলে তাকে গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই অবক্ষয়ের পটভূমিকায় ব্যক্তির ও জাতির জীবনে অস্তিত্বের যে অর্থ জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ঔপন্যাসিক টমাস মান (Thomas Mann)। হিটলারের স্বৈরতন্ত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা যখন নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল তখন অনেক সাহিত্যিকের মতোই টমাস মানকেও অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। বর্তমানের রূঢ় বাস্তবে ব্যক্তির শিল্পচেতনার উপযোগিতা কি? এই যুগের বাস্তব সচেতন শিল্পী ছিলেন বলেই টমাস মান বার বার এই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন। তার পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী ও মা ছিলেন শিল্পরসিকা। বাস্তব বনাম শিল্প যুগের এই মূল দ্বন্দ্বটির বীজ তিনি তাঁর পারিবারিক জীবনেই দেখেছিলেন এবং পরে হিটলার শাসিত জার্মানিতে তার প্রকট রূপটি প্রত্যক্ষ করেন। মানের উপন্যাস ত্রয়ীতে (Tristan Tonio Kroeger ও Der Tod in Venedig) বর্তমানের রূঢ় সমাজে শিল্পীর এই দ্বন্দ্ব-উপলব্ধিই প্রবল হয়ে উঠেছে। Tonio Kroeger উপন্যাসে টোনিওর মুখে এই সমস্যা মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে : No problem, none in the world, is more tormenting than that of artistry and its effect on humanity[৬২] টমাস মান স্বপ্নবিলাসী শিল্পী নন, তাই শিল্পীর দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেও সমাজের দাবিকেও মেনে নিয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত টোনিওর সমস্যার সমাধান হয়েছে যখন সে বুঝেছে শিল্পীর দায়িত্ব শুধু অবাস্তব সৌন্দর্যের সন্ধানই নয়, দৈনন্দিন জীবনের সুখ ও সৌন্দর্যের সন্ধানও। এইখানেই টমাস মানে যুগচেতনা ও বাস্তবতার পরিচয়। মানের সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস Magic Mountain (Der Zauberberg ১৯২৪)-এর নায়ক Hans Castorp-ও দীর্ঘ ৭ বছর নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতীক আল্পস্ পর্বতের স্বাস্থ্যনিবাসে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সমাজের দাবিকেই মেনে নিয়েছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকের কাজ নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছে এবং সেই আত্মত্যাগে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে :

"Der Mensch soll umder Gute und Liebe willen dem Tode Keine Herrsohaft einraeumen ueber seine Gedanken "

৬২। Trans, by Bayard & Morgan

আধুনিক জার্মানির এই বাস্তব সচেতন প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী ১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল টলস্টয়ের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবতা আর বর্ণনা-রীতিতে ছিল ফরাসী নেচারাল্যালিস্টদের অনুসৃতি। আধুনিক জার্মানির প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিক টমাস মান। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিশ্ব উপন্যাসে তাঁর স্থান প্রাউস্ত (Proust) ও জয়েসের (Joyce) সঙ্গে।

পটভূমির অভিনবত্ব ও বিষয়বৈচিত্র্য-সাধন

গতানুগতিকতার ভাব ত্যাগ করে উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য সাধন করা, নিত্য নতুন নতুন পটভূমিতে জীবনকে প্রত্যক্ষ করে স্বাদের বৈচিত্র্য আনা আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মনে হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের বাঁধা পরিধির মধ্যে বৈচিত্র্যহীন জীবনের যা কিছু মাধুর্য ও আকর্ষণ ছিল তা বহু সাহিত্যিকের উপস্থাপনার ফলে গতানুগতিক হয়ে এসেছিল। এজন্যে, নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখা এবং অজ্ঞাত উপেক্ষিত জনসমষ্টির জীবনকে নিয়ে উপন্যাস লেখার প্রবণতা আধুনিক যুগে দেখা যায়। বাংলায় তারাশঙ্কর যেমন বেদে বেদেনীদের জীবনকে নিয়ে উপন্যাস লেখেন বিভূতিভূষণ যেমন অরণ্যের পটভূমিকায় জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন ইংরেজিতে তেমনি সামুদ্রিক পটভূমিকায় জীবনকে উপস্থাপিত করেন কনরাড্। ইংরেজি সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে প্রচলিত জীবনধারার একঘেয়েমি ধরা পড়তে থাকে। এই সময় কনরাডের আবির্ভাব। সাধারণ জীবনযাত্রা ছেড়ে তিনি সমুদ্রচারী নাবিকদের বিচিত্র জীবনকাহিনী তার উপন্যাসে রূপ দেন। এদিক থেকে 'টাইফুন' উপন্যাসের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। রাশিয়ার ঔপন্যাসিক কুপ্রিনও এই রকম বিষয়বৈচিত্র্য সাধন করেছিলেন। তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী, কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ী মানুষের পরিচিত জীবনক্ষেত্র থেকে উপন্যাসকে ভিন্ন পটভূমিতে স্থাপিত করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'The Duel'-এর মধ্যে তিনি সৈনিক জীবনের কাহিনী পরিবেশন করেন। কুপ্রিন নিজে এক সময় সৈনিক ছিলেন। সেই জন্যে দূর থেকে দেখা সৈনিক জীবনের আদর্শায়িত চিত্র তিনি উপস্থাপিত করেন নি। নিজের চোখে দেখা সৈনিক জীবনের ভেতরের বিকৃতি ও বাস্তব রূপ উদঘাটিত করেছেন।

আঞ্চলিকতা আধুনিক বিশ্ব উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফরাসী ঔপন্যাসিক Jean Giono-র উপন্যাস Colline (১৯২৮), Henri Bosco-র উপন্যাস Le Mas Theotime (১৯৪৬) এ ফ্রান্সের প্রভেন্স (Provence) অঞ্চলের জীবন চিত্র পাই। সেখানকার ধর্ম ও সংস্কার, সেখানকার রহস্যপূর্ণ অলৌকিক ঘটনাবলীর চিত্র আমাদের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। Andre Chamson-এর Roux le bandit (১৯২৫) উপন্যাসে ফ্রান্সের Cevennes অথবা Henre Pourrat-এর L' Homme a lu beche (১৯২৯ ৩১) উপন্যাসে Auvergne অঞ্চলের চিত্র পাই। এসব লেখকেরা শিল্পাঞ্চল ও শহরের পরিচিত জীবনের বাইরে উপন্যাসের পটভূমির সন্ধান করেছেন। কন্টিনেন্টের সাহিত্যে ফরাসী ও জার্মান উপন্যাস যেমন সমৃদ্ধ, ইতালীয় উপন্যাস তেমন নয়। তবে

ইতালীয় উপন্যাসেও বিভিন্ন প্রবণতার পালাবদল অনেকটা বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য উপন্যাসধারার মতোই হয়েছে। রোমাণ্টিকতার পরে সেখানেও বাস্তবতার জন্ম হয়েছে এবং ক্রমে এসেছে ফরাসী-সাহিত্যের মতোই নেচার্যালিজ্‌ম্‌। ইতালীয় উপন্যাসে বাস্তবতা আবার কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রধানত আঞ্চলিক উপন্যাসে। ইতালীয় উপন্যাসের জন্মদাতা Cecilia Boehl von Faber (Fernan Caballero) নিজেই মূলত আঞ্চলিক উপন্যাস রচয়িতা ছিলেন। পরবর্তী বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিক Juan Valeray Alcala Galiano-ও আন্দালুসীর আঞ্চলিক জীবনকে অবলম্বন করেই উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইতালীয় উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপকার Jose Maria de Pereda-ও মোস্তানা অঞ্চলের জীবনধারা অবলম্বন করেই উপন্যাস রচনা করেছিলেন। আরো পরে যাঁর মধ্যে ফরাসী নেচার্যালিজ্‌মের উত্তরাধিকার বর্তেছে এবং যাঁকে ইতালীয় উপন্যাসে আধুনিকতার স্রষ্টা বলা যায় সেই La Condesa Emilio Pardo Bazan (১৮৫২-১৯২১) আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Armando Palacio Valdes অষ্ট্রিয়ার জীবনচিত্র ও Vicente Blasco Ibanez ভ্যালেন্সিয়ার জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেন। বিশ শতকের ইতালীয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও আঞ্চলিকতার রেশ কাটেনি। তবে Ramon Maria Del Valle Inclan আধুনিক যৌনচিত্র এবং Pio Baroja রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থাপিত করেছেন। বাঙালির প্রকৃতির সঙ্গে ইতালীয় প্রকৃতির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ইতালির বর্ষায় ভেজা নরম মাটি ও শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির যেমন মিল আছে, তেমনি সেখানকার অলস আরামপ্রিয় ভাবপ্রবণ শিল্পরসিক জাতীয় স্বভাবের সঙ্গে বাঙালির স্বভাবের মিল আছে। অথচ লক্ষণীয় এই যে, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যেমন ইংরেজি-ফরাসী-জার্মান উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে, ইতালীয় উপন্যাসের প্রভাব তেমন পড়ে নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাঙালির সঙ্গে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসীদের সঙ্গে বাঙালির যেমন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, ইতালীয়দের সঙ্গে সেরকম যোগাযোগের উপলক্ষ ঘটেনি।

উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা ও দার্শনিকতা

আধুনিক সাহিত্যে তাত্ত্বিকতা একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কাব্যে তাত্ত্বিকতা তো আধুনিক কালে খুবই বেশি। নাটকেও তর্ক এবং তাত্ত্বিকতা শুরু করেন বার্নার্ড শ'। উপন্যাসেও আধুনিক কালে শুধু গল্পরস বা চরিত্র-চিত্রণ প্রধান নয়, এখন তাত্ত্বিকতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ইংরাজ ঔপন্যাসিক মেরিডিথ, ওয়েল্‌স্‌ প্রভৃতির রচনায় তত্ত্ব ও দর্শনের প্রাধান্য দেখা যায়। অল্‌ডাস্‌ হাক্সলিও উপন্যাসকে করেছেন তাত্ত্বিকতার বাহন। সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে নানা রকমের তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করেছেন তিনি তাঁর উপন্যাসে। Brave New World, Point Counter Point প্রভৃতি হল এদিক থেকে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। তাত্ত্বিকতা ও দার্শনিকতা ফরাসী উপন্যাসেও এযুগে খুব বেশি। জিদ, মারিয়াক, কাম্যু, সার্ত্র প্রভৃতি যেন বিশিষ্ট দর্শনকে রূপ দেবার জন্যেই উপন্যাস রচনা করেছেন। আগের যুগের ঔপন্যাসিক বাল্‌জাক্‌, জোলা, ফ্লবেয়ার

প্রভৃতির মধ্যে যেমন বিচিত্র জীবন-রসই যথার্থ ভাবে রূপায়িত, আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তেমনি যেন গূঢ় জীবন-জিজ্ঞাসাই প্রধান। আধুনিক যুগের সংশয়ী জীবনদৃষ্টিই এর মূল কারণ। এযুগে জীবন-সম্ভোগের চেয়ে জীবন সম্পর্কে দুশ্চিন্তাই বেশি। তবে এই তাত্ত্বিকতা সব আধুনিক ঔপন্যাসিকেই পাওয়া যায় তা নয় এবং এই তাত্ত্বিকতা না থাকলেই ঔপন্যাসিক অনাধুনিক হয়ে যাবেন, এমনও নয়। শুধু মনে রাখতে হবে এই তাত্ত্বিকতা আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনেকেরই বৈশিষ্ট্য। অন্য পক্ষে আছেন রোঁমা রঁল্যা, দ্যুহামেল, জ্যুল রোঁলা প্রভৃতি যাঁরা তত্ত্বের চেয়ে জীবনরস ও সামাজিক জীবনকেই সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। কল্লোল যুগের বাংলা ঔপন্যাসিকেরা আধুনিক যুগের এই ধারার বিদেশি ঔপন্যাসিকদেরই বেশি অনুসরণ করেছেন। কল্লোলে রোঁল্যার 'জাঁ ক্রিস্তাফ' ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা এসেছে আরো পরে, অনেকটা সাম্প্রতিক কালে।

তাত্ত্বিকতা আধুনিক উপন্যাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। কাম্যুও তাঁর অনেক উপন্যাসে গল্পের আশ্রয়ে বস্তুত তাঁর নিজস্ব দর্শনই প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'The Fall' উপন্যাসটি এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মানুষেব মধ্যে পাপ-পুণ্য দুইই আছে। যারা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে জোর করে অতিমাত্র নিষ্পাপ হতে যায় তাদেরই পতন হয়। তারা নিজের কোনো ছোট ভুল-ত্রুটি হঠাৎ আবিষ্কার করলে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হাবিযে ফেলে এবং তখন থেকেই তাদের পতন শুরু হয়। যেমন এই উপন্যাসের নায়ক আজীবন কর্তব্যনিষ্ঠ Jean Baptise Clamence হঠাৎ আবিষ্কার করল যে তিন বছর আগে সে একজন ডুবন্ত নারীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় নি। এইখানে তার কর্তব্যচ্যুতি হযেছে। এই অনুশোচনা থেকে তার পতন শুরু হল। এই উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা এত বেশি যে অনেকে একে উপন্যাস বলতেই নারাজ।

জার্মানি উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা কাফ্‌কা (Franz Kafka), ভাসেরমান (Jakob Wassermann) ও ভেরফেল (Franz Werfell) আমদানি করেন। আধুনিক জীবনে ব্যক্তি-আত্মার নিঃসঙ্গতা মানুষকে অন্তর্মুখী করে ঘটনার চেয়ে যে তাত্ত্বিকতার দিকে নিয়ে চলেছে তার পরিচয় রয়েছে কাফকার উপন্যাসে। ভাসেরমান এই নিঃসঙ্গতার কাছে পরাজয় স্বীকাব করেন নি। বরং সমাজের কাছে ব্যষ্টির যে দায়িত্ব তার তত্ত্বটি তাঁর উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে। জীবনের দুঃখবেদনা মানবাত্মাকে যে মহিমা দান করে তাঁর তত্ত্বটি তিনি তাঁর 'Caspar Hauser' (১৯০৮) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। টমাস মানের 'The Magic Mountain' (১৯২৪) উপন্যাসটিও নানাবিধ দার্শনিক আলোচনায় পূর্ণ। ভেরফেল-এর উপন্যাসে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর উপন্যাস 'Star of the Unborn' (Stern der Ungeborenen, ১৯৪৫)-এ মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যৌন চিত্র ও ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা

আধুনিক উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি যে তত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল ফ্রয়েডের অবচেতন মনের তত্ত্ব ও মনোবিকলন প্রক্রিয়া।

ফ্রয়েড-এর প্রভাব ছাড়াও যৌন প্রবণতার বিশ্লেষণ উপন্যাসের মধ্যে হতে পারে। কারণ যৌন প্রবণতার কথা ঔপন্যাসিক তো শুধু ফ্রয়েডের কাছে জানতে পারেন না, তিনি এটা জীবনের কাছ থেকেও জানতে পারেন। এই জন্যে দেখা যায় ফ্রয়েড যাঁরা পড়েন নি তাঁরাও কোথাও কোথাও অবচেতন মনের কথা প্রকাশ করেছেন, ফ্রয়েডের আবির্ভাবের আগেও মাতৃকাম মনোবৃত্তি (Oedipus Complex)-এর কথা প্রকাশিত হয়েছে। সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকে এবং শেকস্‌পীয়রের 'হ্যাম্‌লেট' নাটকে এর পূর্বসূচনা দেখা যায়। এমন কি লরেন্সের 'সন্স্ এণ্ড লাভার্স' (১৯১৩) রচিত হয় তাঁর ফ্রয়েড পড়ার আগেই, সেটা লরেন্সের নিজের কথা থেকেই জানতে পারা যায়। লরেন্সের অন্য উপন্যাস 'Lady Chatterley's Lover' (১৯২৯)-এ লরেন্স যৌন প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর যে নিজস্ব জীবনদর্শন প্রকাশ করলেন, তা আধুনিক অনেক ঔপন্যাসিককে সচেতন বা অচেতনভাবে প্রভাবিত করে থাকবে। এই উপন্যাসে তিনি যে জীবনদর্শন প্রকাশ করেছেন, তা সংক্ষেপে এই রকম : যৌন প্রবৃত্তি হল মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে ধর্ম বা নীতির বন্ধনে বেঁধে রাখা মানে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক প্রবণতাকে প্রতিহত করা—নীতির শাসন উপেক্ষা করে জীবনের এই কামনার বলিষ্ঠ পরিতৃপ্তির মধ্যেই রয়েছে আমাদের আত্মার মুক্তি। তাই 'লেডি চ্যাটার্লির লাভার' উপন্যাসে দেখা যায় লেডি চ্যাটার্লি তার অক্ষম পঙ্গু স্বামী স্যার ক্লিফোর্ডকে ত্যাগ করে আরণ্য প্রকৃতির বুকে নিজের আদিম বৃত্তির চরিতার্থতার পথে এগিয়ে গেছে। তার স্বামীর 'গেম কিপার' মেলরস নিম্নশ্রেণীর লোক হলেও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী। তাই তার সঙ্গে অসঙ্কোচ যৌন সম্ভোগেই লেডি চ্যাটার্লি বন্ধনমুক্তির সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও তার বলিষ্ঠ জীবনবাদের পরিচয় রয়েছে। ভোগের মাধ্যমে আত্মবিলুপ্তি সাধনের পক্ষপাতী লরেন্স ছিলেন না।

যৌন জীবনের চিত্র অসঙ্কোচে তুলে ধরার দিকে প্রবণতা ফরাসী উপন্যাসেও প্রবল। ফরাসী ঔপন্যাসিক জিদ প্রোটেস্টান্ট বংশে জন্মালেও খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ উপেক্ষা করে যৌন জীবনের বিকৃত রূপ উদ্‌ঘাটনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। তার স্ত্রী মার্দেলিন ধর্মীয় নীতিবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর জীবনাদর্শের মিল হয়নি। অনেকে মনে করেন এই অমিল ও অসন্তোষে জিদ যৌন বিকারগ্রস্ত হয়ে যান। ব্যক্তিজীবনের নীতিবিরোধিতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি তাঁর 'The Immoralist' (১৯০২) উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্বের চিন্তা-ক্ষেত্রে ফ্রয়েড সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে। ফ্রয়েডের জন্ম হয় ১৮৫৬ খ্রীঃ, মৃত্যু হয় ১৯৩৯ খ্রীঃ। তাঁর জন্ম অস্ট্রিয়ায় হলেও তাঁর কর্মজীবন ও গবেষণা মূলত হয় ভিয়েনায়।

যৌবনে দুজন বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারার দ্বারা ফ্রয়েড বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ডারউইন এবং গুস্টাভ ফেক্‌নার। ডারউইন জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এবং ফেক্‌নার মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্মদান করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডারউইনের 'Origin of the Species' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি জগতে জীবসৃষ্টির প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফেক্‌নার মানুষের চেতনার ক্রিয়া পরিমাপের উপায় আবিষ্কার করে প্রতিপন্ন করেন যে, মনের ক্রিয়া অলৌকিক ব্যাপার কিছু নয়, মনকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এই দুজন বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্রয়েডও মনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণে উদ্যোগী হন। ফ্রয়েড আর একজনের কাছে কতকটা ঋণী। জ্যাঁ শারকো (Jean Charcot) সম্মোহিত করে (hypnotise) অভিভাবনের (suggestion) মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি (willforce) প্রযোগ করে মানসিক ব্যাধি সারাবার পদ্ধতি চর্চা করতেন। ফ্রয়েড তাঁর কাছে কিছু দিন (১৮৮৫-৮৬) এই পদ্ধতি শিক্ষা করেন। শারকো একদিন তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন হিষ্টিরিয়া রোগিণীদের রোগের মূল কারণ যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। শারকোর এই কথা ফ্রয়েডকে তাঁর দর্শনের পথ দেখিয়ে দেয়। ভিয়েনার একজন ডাক্তার ব্রুয়ার (Breuer) রোগীকে আরাম কেদারায় শুইয়ে যা-ইচ্ছা তাই বলে যেতে দিতেন। এতে মনের রেচক (Cathersis) হয়ে রোগ সেরে যায় বলে তাঁর ধারণা ছিল। ফ্রয়েড এই পদ্ধতিকে পরিমার্জিত করেই তাঁর মুক্ত অনুষঙ্গ প্রক্রিয়া (free association method) বা মনোবিকলন (psychoanalysis) প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন।

প্রায় ২০ বছর গবেষণার পর ফ্রয়েড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Interpretation of Dream' প্রকাশ করেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে ক্রমে ক্রমে তাঁর 'The Psychopathology of Everyday Life', 'Wit and its relation to the Unconscious', 'A Case of Hysteria এবং 'Three Essays on Sexuality' নামক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্-এর অন্তর্গত ওস্টারে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হয়ে যে বক্তৃতা দেন, তার পর থেকে আমেরিকায় তাঁর মতবাদের ব্যাপক স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে তাঁর খ্যাতি ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে শিল্পসাহিত্যে পর্যন্ত ফ্রয়েডের ব্যাপক প্রভাব পড়তে থাকে। এসম্পর্কে ক্যাল্‌ভিন্ এস্ হল্ (C.S. Hall) যথার্থই লিখেছেন —"এসময় মনোবিকলন তত্ত্ব ফ্যাশান্ হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সামাজিক আচার, নীতি, শিক্ষা, সমাজ-বিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রে এ তত্ত্বের প্রবল প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। মনোবিকলন-পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হওয়াটা ফ্যাশানেবল্ বলে বিবেচিত হতে থাকে এবং কথায় বার্তায় যত্রতত্র 'অবচেতন মন', 'অবদমিত আকাঙ্ক্ষা', 'অবচেতন মানসের বাধা', 'জটিল গ্রন্থি', 'অবরুদ্ধতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে।" (C.S. Hall—'A Primer of Freudian Psychology'?)

ফ্রয়েডের মতের মূল কথা হল, মন বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি তা মনের সচেতন অংশ। এটা মনের খণ্ডিত পরিচয়মাত্র। তিনি বলেছেন আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে

অজ্ঞাত মনের এক গহন রাজ্য রয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যক্তিমনের যে সমগ্র সত্তা তার তিনটি স্তর আছে Id, Ego ও Super Ego—এদের বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে অদস্, অহং এবং অধিশাস্তা। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সুস্থভাবে আদান-প্রদান করে তার মৌলিক কামনাগুলো তৃপ্ত করতে পারে ততক্ষণ তার মনের এই তিন স্তরের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। কিন্তু যখন ব্যক্তি তা পারে না তখন তার তিন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ উপস্থিত হয় এবং এই বিরোধের গ্রন্থি জটিল হযে গেলে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

মনের তিন স্তরের মধ্যে অদস্ হল মানুষের মূল শক্তি-কেন্দ্র, আদিম জৈব বৃত্তি। অদসের রাজ্য অত্যন্ত গহন ও দুর্জ্ঞেয়। তার স্বভাব হল সুখ আকাঙক্ষা করা। জীবনের মৌলিক বৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধন করে সে সুখ লাভ করতে চায়। এই জন্যে একে pleasure principle বলে। অদসের কামনা কোনো যুক্তি বা নীতির বিধান মানতে চায় না। অদসের এক-একটি কামনা বস্তুজগতের এক-একটি জিনিসের দ্বারা তৃপ্ত হয় এবং সেই কামনার সঙ্গে সেই বস্তুর একটি নিত্যসম্বন্ধ আমাদের মনে গড়ে উঠতে থাকে। যখন আমরা আমাদের কামনার খোরাকটি বস্তুজগতে পাই না তখন তার কল্পরূপ (image) দিয়ে স্বপ্নে নিজেকে তৃপ্ত করি। এই প্রক্রিয়াকে ফ্রয়েড বলেছেন Primary process। তাই যে শিশু মিষ্টি খেতে চায় অথচ পায় না, সে স্বপ্নে দেখে রাশি রাশি সন্দেশ তার সামনে পড়ে আছে।

ব্যক্তিমনের দ্বিতীয় স্তর হল অহং (ego)। যখন ব্যক্তির মূল জৈব কামনা সহজে তৃপ্ত হয় না এবং যখন ব্যক্তি দেখে যে স্বপ্নেও কামনার সত্যিকারের তৃপ্তি হয় না তখন ব্যক্তিমন বাস্তব জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চায়। বস্তুজগৎকে জয় করে বা তার সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টা থেকে ব্যক্তিমানসের মধ্যে অহং বোধের (ego) জন্ম হয়। এই অহং বস্তুজগতের সীমা সম্পর্কে সচেতন এবং তার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চায় বলে একে বলে reality principle। অদস্ (Id) হল অন্ধ বৃত্তি, অহং তার চেয়ে খানিক উন্নত, কেন না সে বস্তু-সচেতন। অহং চায় ব্যক্তির কামনার সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্য বিধান করে সুখ লাভের পথ তৈরি করতে। যেখানে এই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব সেখানে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। যেখানে তা সম্ভব হয় না সেখানে নানা রকমের বিকৃতি দেখা দেয়। অহংকে ফ্রয়েড বলেছেন সেকেণ্ডারি প্রসেস। কারণ এটি প্রাইমারি প্রসেসের মতো স্বপ্নে কামনাতৃপ্তির পথ খোঁজে না, এটি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া বা বুদ্ধির প্রয়োগ করে যথাযথ পথে কামনা পরিতৃপ্ত করতে চায়। অহংও মাঝে মাঝে কল্পনার জগৎ রচনা করে তৃপ্তি খোঁজে, কিন্তু কল্পনার জগৎকে কল্পনা বলেই জানে, বাস্তব বলে ভুল করে না। এইখানে যে কল্পনার বিকাশ হয় তাই থেকে কাব্য ও শিল্পের জন্ম হয়। স্বপ্ন হল প্রাইমারি প্রসেস্, এবং কল্পনা হল সেকেণ্ডারি প্রসেসের কাজ। এই হল ফ্রয়েডীয় শিল্পতত্ত্বের মূল কথা।

শৈশব থেকে ব্যক্তির মনের উপরে সমাজের নীতিবোধ, শালীনতা আদর্শবাদের

প্রভাব পড়তে থাকে। এর ফলে ব্যক্তিমনে একটা নীতিবোধ ও বিবেক গড়ে উঠে। মনের এই অংশকে ফ্রয়েড অধিশাস্তা (Super-ego) বলেছেন। এই 'সুপার ইগো' মানুষের অন্ধ কামনাকে শাসনে রাখতে চায়। এই অধিশাস্তার (Super-ego) দুই অংশ—গঠনমূলক ('উচিত') ও নিষেধমূলক ('উচিত নয়')। গঠনমূলক অংশটিকে বলে ego idell এবং নিষেধমূলক অংশটিকে বলে conscience বা বিবেক। ফ্রয়েডের মতে মানুষের সমস্ত ক্রিয়ার মূল শক্তি-উৎস হল মনঃশক্তি (Paychic energy), এ শক্তি জড়শক্তি থেকে আসে না। এই মূল শক্তি (Fros) মূলত যৌনকেন্দ্রিক বলে এর নাম দিয়েছেন আদিম কাম বা Libido। এই শক্তিকে যৌনকেন্দ্রিক বলার কারণ হল এই শক্তি প্রধানত কামনা-বাসনার মাধ্যমে তৃপ্তি চায়। কামবাসনাকে তিনি পরে যৌনক্রিয়া ছাড়াও স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যেও দেখেছেন। অবশ্য তার মূল প্রবণতা যৌনকেন্দ্রিকই : "The term 'sexual' is employed both in a broader and a narrower sense than in popular speech . Freud wrote that it includes everything ordinarily understood by the term 'love' including self-love, love of parents, and love of mankind. In spite of this broad meaning, libido is also narrowly sexual, its aim being sexual union "৬২

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মূল গুরুত্ব হল মনের অবচেতন-লোকের আবিষ্কারে এবং তার প্রকৃতি নির্ণয়ে। মন বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি তা মনের উপরিতলের একটা আংশিক পরিচয় মাত্র। মনের যতটুকু আমরা জানি তা মনের অতি সামান্য অংশ, এছাড়াও রয়েছে একটা বিরাট গোপন অংশ, এবং সেই অজ্ঞাত গোপন অংশের উপরেই আমাদের জ্ঞাত মনের প্রতিষ্ঠা। ফ্রয়েডের এই তত্ত্বটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বুঝিয়েছেন একজন ফ্রয়েড তত্ত্ববিদ্ ডক্টর ষ্ট্যানলি হল—"The whole field of mental content may be likened to an iceberg of which only a small portion is visible above the surface of water In the same way only a small portion of the mental content is above the threshold of consciousness"—Dr. Stanly Hall. সমগ্র মন জিনসটাকে একটা বরফের চাঙড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে চাঙড়ের অধিকাংশটিই জলে ডুবে আছে এবং অতি অল্প অংশই আমাদের চোখের সামনে জলের উপরে দৃশ্যমান থাকে। সমগ্র মানসিক সত্তাকে ফ্রয়েড তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন—(১) সংজ্ঞান বা সচেতন (conscious), (২) অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন (sub-conscious) এবং (৩) নির্জ্ঞান বা অচেতন বা মগ্নচৈতনা (unconscious)।

(১) সংজ্ঞান বা সচেতন (Conscious) : জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মনের যে অংশটি দিয়ে আমরা রাগ, দুঃখ, সুখ অনুভব করি, চিন্তা করি বা কোনো বিষয়ে মনঃসংযোগ করি, তাই হল আমাদের মনের সচেতন বা সংজ্ঞান অংশ। এ অংশটি আমাদের কাছে পূর্ণালোকিত ক্ষেত্র, এর কোনো কিছুই আমাদের কাছে অস্পষ্ট বা অজানা নয়।

৬৩। Shaffer and Shoben · The Psychology of Adjustment' pp. 449-50

(২) অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন (Sub-conscious) : এ হল আমাদের মনোযোগের সীমার ঠিক প্রান্তদেশে অবস্থিত অস্পষ্ট চেতনার জগৎ। আমাদের চেতন মনের অনেক ক্রিয়া, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি কিছুদিন পরে বিস্মৃতির জগতে চলে যায়। কিন্তু সেটা স্মৃতির লোক পেরিয়ে সবে বিস্মৃতির জগতে যদি প্রবেশ করে থাকে এবং একেবারে বিস্মৃতির জগতে যদি তলিয়ে না গিয়ে থাকে তবে ব্যক্তি তাকে চেষ্টা করে আবার স্মৃতির লোকে ফিরিয়ে আনতে পারে। মনের যেটুকু অংশ থেকে তলিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার ব্যক্তি একটু চেষ্টাতেই করতে পারে তাকে subconscious-এরই উর্ধ্বাংশ বলা হয়—এর নাম হল Foreconscious বা আসংজ্ঞান। Foreconscious হল subconscious-এরই একটা উপস্তর। foreconscious-কে কেউ কেউ Pre-conscious-ও বলেছেন।

(৩) নির্জ্ঞান বা অচেতন (Unconscious) : অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের চেতন মনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা কখনো কখনো এমন বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যায় যে ব্যক্তি সাধারণভাবে চেষ্টা করেও তাকে মনে করতে পারে না। তখন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অভিভাবণ প্রক্রিয়া (hypnotic suggestion) বা মনোবিকলন প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের গহন থেকে তলিয়ে যাওয়া জিনিসকে তুলে আনেন। মনের এই যে গহন স্তর যেখান থেকে ব্যক্তি সহজে নিজের চেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, শুধু বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, সেই গহন স্তরকে বলে অচেতন বা নির্জ্ঞান (unconscious) স্তর। আমাদের চেতনায় প্রায়ই যে সব অসামাজিক অবৈধ যৌন আকাঙ্ক্ষা আবির্ভূত হয়, সেগুলি আমাদের অধিশাস্তার শাসনের ভয়ে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না, আমরা তাদের দমন করে ফেলি, তখন তারা চেতনার সংজ্ঞান স্তর থেকে নির্জ্ঞানে তলিয়ে যায়। নিদ্রার সময় যখন অধিশাস্তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তারা তখন চেতনায় ভেসে উঠে স্বপ্নের মাধ্যমে তৃপ্তি খোঁজে। মনের এই নির্জ্ঞান অংশ সংজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি; এবং এই নির্জ্ঞান অংশের প্রকৃতি পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। নানা রকমের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা স্মৃতি ও চিন্তায় ভরা এই নির্জ্ঞান স্তরকে জয় করা যায় বিশেষ পদ্ধতিতে, তা না হলে এই নির্জ্ঞান স্তরই অলক্ষ্যে থেকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে :

"The unconscious is the "real self" whose inner nature is unknown to us and is only imperfectly revealed to us in consciousness. It is made up of memories, thoughts, desires etc. which have been 'repressed" because they are for one reason or another painful to consciousness or contrary to the higher moral nature; the result being that certain "resistance" is set up against their recall into consciousness which can be overcome only by special methods."[৬৪]

ফ্রয়েডপন্থী ইংরাজ সমালোচক Ernest Jones, এঁর রচনা Hamlet and Oedipus (1949)। ফ্রয়েডপন্থী দুজন মনোবিকলনবিদ্ হলেন—Adler ও Jung। অ্যাড্লার ফ্রয়েডের

৬৪। Freud: 'The Interpretation of Dreams, pp. 429, 488.

অয়েডিপাস কমপ্লেক্সের বদলে Inferiority or Superiority complex-এর উপরে জোর দিয়ে সাহিত্যের চরিত্র বিশ্লেষণের পথ দেখান। য়ুং বলেন সাহিত্যের চরিত্ররা ব্যক্তির অবচেতন মনের নয়, সমষ্টিব সমষ্টিগত অবচেতন মনের প্রতিনিধি। ভিয়েনার Phychoanalytic clinic-এর Director Dr. Edmund Bergler-এর মতবাদ আধুনিক ফ্রয়েডপন্থী সমালোচনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। লেখকরা তাঁদের রচনায় নিজেদেরই অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেন—ফ্রয়েডের এই মতবাদ তিনি অস্বীকার করেন। Bergler-পন্থী সমালোচক Arthur Wormhoudt তাঁর 'The Demon Lover' (1949) গ্রন্থে ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ফ্রয়েডপন্থী অন্য সমালোচকরা হলেন—Basler, R. P (Sex, Symbolism and Phychology in Literature), Bergler, Edmund (The Writer and Phychoanalysis) Halfman, F. J (Freudianism and the Literary Mind)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রায় সমস্ত দেশের সাহিত্যে ব্যাপক পরিবর্তন এলো। ফরাসী সাহিত্যে ১৯১৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সময়কে পরিবর্তনের কাল (transitional period) বলে অনেকে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়টুকুতে প্রায় সব দেশেই দু'টি বিশ্বযুদ্ধের কুফল গভীরভাবে অনুভূত হয়। অবক্ষয়, বিকৃতি, অস্থিরতা এই সময়কার জীবন ও চেতনার বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে ফ্রয়েড কর্তৃক অবচেতন মনের আবিষ্কার সাহিত্যিক দৃষ্টিকে নতুন পথে পরিচালিত করল। এর সঙ্গে তিনি মানুষের সমস্ত প্রেরণার মূলে যে যৌন চেতনাকে খুঁজে বের করলেন, তাও মানুষের অন্তর্নিহিত বিকৃতিকে বিশেষ করে তুলে ধরলো। ১৯১৪ সালের মধ্যে ফরাসী সাহিত্যে প্রতীকবাদের যুগ শেষ হয়ে গেল। তারপরেও প্রতীকধর্মী সাহিত্য কেউ কেউ রচনা করেছেন বটে কিন্তু ঠিক যুগ-প্রবণতা বললে যা বোঝায়, সেই প্রবণতা রূপে প্রতীকবাদ আর টিকে থাকে নি। ১৯১৪ সালের পরে ফরাসী সাহিত্যে কোনো একটি মাত্র প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করে নি। এবং পূর্ববর্তীকালের সাহিত্যকে যেমন রোমাণ্টিক যুগ, বাস্তবতার যুগ, প্রতীকবাদের যুগ প্রভৃতি পর্বে ভাগ করে প্রবণতা অনুসারে চিহ্নিত করতে পারি, ১৯১৪-এর পরবর্তী ফরাসী সাহিত্যকে সেভাবে কোনো একটি প্রবণতা অনুসারে চিহ্নিত করতে পারি না। কারণ সে সময়ে নানা ভাবের আবির্ভাব হয়েছে, বিচিত্র ভাব-প্রবণতায় দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—এ সময়টিই পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়, অস্থিরতার মুহূর্ত। বাংলা প্রথম যুদ্ধ পরবর্তী সাহিত্যের সঙ্গে এর মিল আছে। যুদ্ধ পরবর্তী কল্লোল-যুগের সাহিত্যে নানা সামাজিক পরিবর্তন জীবনের স্থিরতাকে নড়িয়ে দিয়েছে আর বিদেশি সাহিত্যের সমসাময়িক ও ঈষৎ পূর্ববর্তী যুগের নানা আন্দোলনেব প্রভাব বাংলার সাহিত্যকে বিচিত্রমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহিত করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কি ভারতে, কি ইউরোপে, কোথাও সাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নি। কারণ তখনো পর্যন্ত ফ্রয়েডের মতবাদ সীমাবদ্ধ ছিল চিকিৎসকদের মহলেই। ইউরোপীয় সাহিত্যেও ফ্রয়েডের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে কল্লোলের সমসাময়িক কালেই। ১৯২২ সালে ফ্রয়েডের রচনার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপরেই সাধারণের

তাঁর সম্পর্কে ব্যাপক কৌতূহল দেখা দেয়। ফরাসী সাহিত্যে ফ্রয়েডের ব্যাপক প্রভাব পড়ার আগেও অবশ্য অবচেতন মনের উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা দেখা যায়। প্রুস্তের উপন্যাসে এই প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। অথচ তাঁর উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব পড়ে, এবং তিনি মূলত বের্গসঁর দ্বারা প্রভাবিত লেখক। মার্সেল প্রুস্ত (Marcel Proust ১৮৭১-১৯৫২)—তাঁর ১৬টি খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ উপন্যাস ছিল A la recherche du temps perdu (১৯২২ থেকে খণ্ডগুলি প্রকাশিত হতে থাকে)। এ উপন্যাসটি অনেকটা লেখকেব আত্মকথা, এতে সমসাময়িক (১৮৭০-১৯১০) কালের যুগচিত্রও বিশেষ প্রত্যক্ষ। এতে একটা যুগের অবক্ষয় ও বিকৃতির চিত্র প্রত্যক্ষ। আর এতে লেখকের অন্তর্জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষিত। প্রুস্তের মতে বিভিন্ন অনুষঙ্গের (association) উদ্দীপনায় আমাদের অতীত জীবনের স্মৃতি আকস্মিকভাবে আমাদের অবচেতন মন থেকে চেতন মনে ভেসে ওঠে। এই স্মৃতিগুলি আমাদের জীবনে অমূল্য সম্পদ। তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাসের অন্তর্বর্তী ছোট ছোট উপকাহিনীগুলি পৃথক পৃথক 'প্রতীকধর্মী শীর্ষ' নামের দ্বাবা চিহ্নিত। অবচেতন মনের গভীরতম রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মানব-আচবণ ও মনের প্রবণতাগুলিব উৎস অবচেতনের মধ্যে সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। অনুভূতির মধ্যে বিশেষ করে প্রেমানুভূতিব স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি বেশি আগ্রহী এবং প্রেম সম্পর্কে তিনি অনেকটা নৈরাশ্যবাদী ও ব্যথাহত যুগপ্রবণতারই প্রতিনিধি।

উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ (Stream of Conciousness) ও অন্তর্মুখীনতা (Subjectivism)

কল্লোল যুগের ঔপন্যাসিকরা অনেকটা বেনেট্, ওয়েল্‌স্, গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও লরেন্সের মতো বাস্তবতার উপাসক ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ সমাজে দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্মুখী হযে চলেছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, শেষ পর্যন্ত সমাজে অন্তর্মুখীনতাই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাবের ফলে সমাজের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনা আব ঔপন্যাসিকেব কাছে আদর্শ হয়ে রইল না। ঔপন্যাসিক সামাজিক বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে ব্যক্তিক মনোজীবনে দৃষ্টি নিবিষ্ট করলেন। ইংরেজি উপন্যাসে গভীর অন্তর্মুখীনতার ও চৈতন্যমুখীনতার আবির্ভাব হল ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনায়। তিনি শুধু বাইরের জগৎ উপস্থাপনাকেই বাস্তবতা বলে মনে করলেন না, তিনি অন্তর্লোকের রহস্য উদ্‌ঘাটনও বাস্তবতার অঙ্গ বলে গ্রহণ করলেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হল। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মতো জেম্‌স্ জয়েস্ ও ডরোথি রিচার্ড্‌সন্‌ও চেতনার জগৎকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করতে চাইলেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, জেম্‌স্ জয়েস্ প্রভৃতি লেখকেরা মানুযের অন্তর্লোকের চেতনা প্রবাহ (stream of consciousness) উপস্থাপিত করলেন। বাংলায় এ জিনিস এলো কল্লোলের অনেক পরে, প্রায় সাম্প্রতিক কালে।

১৮৯০ সালে মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম্ জেম্‌সের 'Principles of Psychology' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন, মানুযের বাহ্যমনের তলে তলে একটি অবিচ্ছিন্ন চেতনা ও চিন্তাস্রোত প্রবাহিত। একে তিনি stream of thought, stream of consciousness, subjective life প্রভৃতি নাম দেন। এইখান থেকে সাহিত্যে stream

of consciousness কথাটি গৃহীত হয়। ডরোথি রিচার্ডসনের বিখ্যাত রচনা Pointed Roofs (১৯১৫)-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে মে সিনক্লেয়ার সাহিত্যে এই নামটি প্রথম প্রয়োগ করেন ১৯১৮ সালে। অবশ্য সমালোচনা সাহিত্যে এই বিশেষ অভিধাটি প্রযুক্ত হবার আগেই এই চেতনা-প্রবাহের তত্ত্ব ঔপন্যাসিকদের প্রভাবিত করেছিল। ফরাসী উপন্যাসকার প্রুস্তের Swann's Way হল তাঁর বৃহৎ উপন্যাস Remembrance of the Things Past এর প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডটি বেরোয় ১৯১৩ সালে। এতেই কালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন একটি চৈতন্য প্রবাহেব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ইংরাজিতে জেম্‌স্ জয়েস্, ডরোথি বিচার্ডসন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনায় এই তত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায়। ডরোথি রিচার্ডসনের Pilgrimage (১৯২৫-৩৫) এদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অনেকগুলি খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিরিয়াম্ হেণ্ডার্সনের অন্তশ্চৈতন্যের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন জটিল প্রবাহ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসগুলির মধ্যে জেম্‌স জয়েসের 'ইউলিসিস্' (১৯১৪-১৮) সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও বিখ্যাত। জয়েস যখন এই উপন্যাসটি রচনা করেন তখন জুরিখে বসবাস করতেন। সেখানকার উত্তর ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং-এর মতবাদের সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর পরিচয় ঘটে থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন জয়েসের চেতনাপ্রবাহ তত্ত্বে মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমসের যেমন প্রভাব ছিল তেমনি অল্পবিস্তর ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞানেরও প্রভাব থাকতে পারে। অবশ্য এ দুজন মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা প্রভাবিত হবার আগে জয়েস্ দুজার্দিনের (Dujardin) একটি বইয়ে (Les Laurieras sont coups) মানব মনের অবিচ্ছিন্ন আত্মভাষণের তত্ত্ব পেয়েছিলেন, একথা জয়েস্ নিজেই স্বীকার করেছেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'মিসেস্ ডল্‌ওয়ে' (Mrs Dolloway, ১৯২৫) 'দি ওয়েভস্' (The Waves, ১৯৩১) দুইটি উপন্যাসেই বাইরের ঘটনার চেয়ে অন্তশ্চৈতন্যের প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যে ফরাসী উপন্যাসই সব সময় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে এগিয়ে থেকেছে। জোলার (১৮৪০-১৯০২) সময় থেকে ফরাসী সাহিত্যে যে নেচার্যালিজমের জন্ম হল বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যে তা অনুসৃত হয়েছে অনেক পরে। বাংলায় তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্লোল যুগে আধুনিকতা বলতে নেচার্যালিজ্‌মই বুঝিয়েছে। কিন্তু ফরাসী উপন্যাস বিশ শতকে নেচার্যালিজ্‌মকেও ছাড়িয়ে এসেছে। বিশ শতকের ফরাসী ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত চেতনা-প্রবাহের ঔপন্যাসিক। তাঁর উপরে বের্গসঁর দর্শনের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Remembrance of the Things Past এর প্রথম খণ্ড The Swann's Way (১৯১৩)-এর নায়ক কালের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ধরে অন্তশ্চেতনায় তার পূর্বপুরুষদের জগতে প্রবেশ করেছে। এবং তার সঙ্গে আত্মজীবনে অবিচ্ছিন্ন যোগ অনুসরণ করেছে।

প্রতীকবাদ (Symbolism)

ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিকতার প্রতিক্রিয়ায় যেমন বাস্তবতা ও নেচার্যালিজমের

যুগ (১৮৫০-১৮৮৫) এসেছিল, তেমনি বাস্তবতার প্রতিক্রিয়ায় এল প্রতীকতার (Symbolism) যুগ (১৮৮৫-১৯১৪)। যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বদলে আবার ফিরে এল অনুভূতি ও কল্পনা। তবে কল্পনা ফিরে এলেও রোমাণ্টিক যুগের সঙ্গে প্রতীকবাদী যুগের পার্থক্য এই যে এ যুগে কল্পনার সঙ্গে মিলিত হল অধ্যাত্মের স্পর্শ, মূল্যবোধের আকাঙক্ষা এবং প্রতীকের ব্যবহার। এই বোধ এল যে, সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ইঙ্গিতে ধরিয়ে দিতে হয়।[৬৫] এই শেষের জিনিসটিই রোম্যাণ্টিক যুগে ছিল না। নেচার‍্যালিজমের স্থূল রূঢ় জীবনবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে প্রতীকবাদের সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবোধের জন্ম। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন তরুণ ফরাসী কবি Jean Moreas প্রথম Symbolism কথাটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। এবং ক্রমে তা গৃহীত হয়। ফরাসী সাহিত্যে প্রতীকবাদী আন্দোলন শুরু করেন ফরাসী কবি মালার্মে।

কাব্যে প্রতীকবাদ যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, উপন্যাসে ততটা করতে পারে নি। জীবনের স্থূল এবং বাস্তব রূপই উপন্যাসের প্রধান আশ্রয়, সেজন্য এখানে প্রত্যক্ষ ভাষণই কাম্য। কিন্তু কাব্যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম এবং কল্পনার সত্যই বেশি স্থান পেয়ে থাকে, সে জন্যে কাব্যেই ব্যঞ্জনাধর্মী ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি ও প্রতীকের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে উপন্যাস হল সবচেয়ে নমনীয় শিল্পকলা। সেইজন্যে উপন্যাসেও অল্পস্বল্প প্রতীকবাদের প্রভাব পড়ল। এবং সাহিত্যে প্রতীকবাদের আন্দোলন শুরু হবার আগেও সব দেশেই উপন্যাসে অল্প-স্বল্প প্রতীকের ব্যবহার দেখা গেছে। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৪—এই সময়টা ফরাসী উপন্যাসের স্বর্ণযুগ, আর এ যুগের উপন্যাসের প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে প্রতীকের প্রভাবও দেখা যায়। Loti এবং Alain Fournier প্রতীক-উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। Paul-Bourget মূলত পূর্ববর্তী যুগের বাস্তববাদী ধারার অনুসরণ করলেও তিনি বাস্তব ঘটনার যথাযথ বর্ণনার প্রতি ততটা উৎসাহী ছিলেন না, যতটা সেই ঘটনার মানসিক কারণ আবিষ্কারে মনোযোগী ছিলেন। এইভাবে তাঁর হাতেই উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্মুখী হতে আরম্ভ করে এবং প্রতীক-ঔপন্যাসিকদের হাতে একেবারে অন্তর্মুখী হয়ে যায়।

প্রতীকবাদের আন্দোলনের উপরে বের্গসঁ ও নব-ভাববাদী দর্শনের (Neo-Idealism) প্রভাব ছিল। ফরাসী উপন্যাসে প্রতীক-যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন Elémir Bourges। প্রতীকধর্মী উপন্যাসের ধারায় দু'জন ফরাসী ঔপন্যাসিক Jérome ও Jean নামে দুই ভাই বিদগ্ধ রুচি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিদগ্ধ ও সংস্কৃতি সম্পন্ন সূক্ষ্ম রুচিবোধের সঙ্গে প্রতীকচেতনার সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-নাটকে যে জিনিসটি পাই, অনেকটা তাই পাই এই দুই ভাইয়ের উপন্যাসে। কখনো কখনো তাঁরা ঐতিহাসিক পটভূমিকে গ্রহণ করে প্রতীক উপন্যাস রচনা করেন (যেমন, La Trage die de Ravaillac, 1913, Quand Israel est roi, 1921) এবং অনেক সময়

৬৫। cf. "to name is to destroy and to suggest is to create"—Mallarme.

সামাজিক বিষয় ও সমস্যাও তাঁদের প্রতীক-উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে (La Fete arabe, 1912, L' Ombre de la croix, 1917, Rabat on les heures morocaines, 1918, Marakech on les seigneurs de l Atlas, 1920, La Rose de Saron, 1927)।

প্রতীক-উপন্যাসে আধ্যাত্মিক বোধিদৃষ্টি (intuition) অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফরাসী উপন্যাসে এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেল মহিলা ঔপন্যাসিক Colette-এর মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে মুক্তি কল্পনার মিশ্রণে তিনি রচনা করেন—Sept dialogues de betes, 1905, Les Vrilles de la vigne, 1908, La Vagavonde, 1910, L' Envers du music-hall, 1913, L' Entrave, 1913, Mitsou, 1917, ইত্যাদি। জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোমল উপলব্ধি মিশিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে শিশু ও ফুল (তুঃ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন) কোমল সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। তাঁর উপন্যাসে প্রেমের আবেগ ও মাদকতার মধ্যে প্রেমের পরিবর্তনশীলতার জন্য প্রচ্ছন্ন নৈরাজ্য ও বেদনাবোধ রয়েছে এবং সর্বশেষে প্রকৃতির মধ্যে আনন্দলাভের ইঙ্গিত আছে। জীবনের নশ্বরতা তাঁর অনেকগুলি প্রতীক উপন্যাসে ব্যঞ্জিত।

প্রতীক-উপন্যাসের ধারায় খুব বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন Pierre Loti (আসল নাম Julien Viaud)। Breton জাতির অন্তরের তপস্যা ও অধ্যাত্ম-সম্পদ, নাবিক, মৎস্যজীবী ও কৃষকের জীবনের রূপ ও রস তাঁর উপন্যাসে বিধৃত। তাঁর দু'টি অমর উপন্যাস Mon frere Yves, 1883 ও Pecheur d' Island, 1886। Brittany অঞ্চলের নোংরা পরিবেশ, তার বিষাদ ও অবক্ষয় তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত।

১৯১৪ সালের পর থেকে ফরাসী সাহিত্যে যদিও প্রতীকবাদের যুগ শেষ হয়ে যায় তবু কেউ কেউ এব পরেও প্রতীক-ঐতিহ্যের ধারাই বহন করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে Jean Giraudoux-এর নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি উপন্যাসের প্লট রচনা, চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি বাঁধা আঙ্গিক অনুসরণ না করে একেবারে একটি নিজস্ব ব্যঙ্গমূলক রীতিতে উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর 'Bella' (১৯২৬) উপন্যাসে একটি প্রেমের কাহিনী-কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা তাঁর উপন্যাসের একান্তই গৌণ একটি অবলম্বন, ভেতরে ভেতরে এ উপন্যাসে ফ্রান্সের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাঁর আরো একটি উপন্যাস 'Suzanne et le Pacifique' (১৯২০)-তে এপ্রসঙ্গে কাহিনী নিতান্ত গৌণ; অবাস্তব কল্পনা ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গই প্রধান। আঁদ্রে জিদের (André Gide) কথাও স্মরণীয়। তাঁর উপন্যাস L' Immoraliste (১৯০২), La Porte étrotie (১৯০৯), Les Caves du Vatican (১৯১৪), La Symphonie pastorale (১৯১৯), Les Faux-monnayeurs (১৯২৫)। জিদের 'La Porte étroite' উপন্যাসে স্থূল জীবন ছেড়ে একটি আধ্যাত্মিক জীবনের তপস্যা চিত্রিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে সত্য ও সততার শিক্ষাই প্রধান। জিদ যুগ সচেতন শিল্পী ছিলেন। তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ হল স্টাইল। তাঁর রচনায় ক্লাসিক শিল্পগত ঐশ্বর্যের সঙ্গে নিখুঁত পারিপাট্যের সমন্বয় হয়েছে।

প্রতীকবাদের যুগে এই সব ঔপন্যাসিক অল্পস্বল্প প্রতীকধর্মী উপন্যাস লিখলেও কেউই

পুরোপুরি প্রতীক উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি। উপন্যাস মূলত বাস্তবধর্মী রচনা। সেইজন্যে উপন্যাসে অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ও প্রতীকের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠেনি।

জার্মান ঔপন্যাসিক ফ্রান্ৎস্ কাফ্কা (Franz Kafka) মূলত নব্য রোমান্টিক ও প্রকাশবাদী (expressionist) হলেও সুররিয়েলিজমের (Surrealism) কিছু প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বন্ধু ম্যাক্সব্রেড তাঁর প্রধান রচনাগুলি সম্পাদন করে প্রকাশ করলে বিশ্বসাহিত্যে তাঁর উপন্যাসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অসুখী ও অসুস্থ ছিলেন। প্রথম জীবনে একজনকে ভালবেসেছিলেন কিন্তু বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব বহন করতে ভয় পান। পরবর্তীকালে আর একজনকে যখন ভালবেসে বিবাহ করতে চান, তখন তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সেই বিবাহও হয় নি। কৈশোরে পিতার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য, যৌবনে বিবাহে ব্যর্থতা ও শেষ জীবনে যক্ষ্মারোগের আক্রমণ তাঁর সমগ্র জীবনকে নিঃসঙ্গতা ও ব্যর্থতায় ভরে দিয়েছিল। এই নিঃসঙ্গতা ও ব্যর্থতার অভিশাপ আধুনিকতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই দিক থেকে কাফ্কা হলেন আধুনিক মানবাত্মারই প্রতীক। এই নিঃসঙ্গতার জন্যে তিনি অতিমাত্র অন্তর্মুখী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন। তাঁর তিনটি উপন্যাস The Trial (Der Prozess, 1925), The Castle (Das Schloss, 1926), এবং America (Amerika, 1927)—সবগুলিই অসমাপ্ত। আধুনিক জীবনের অভিশাপ যে আত্যন্তিক নিঃসঙ্গতা এবং তার ফলে অন্তর্মুখীনতা ও আত্মজিজ্ঞাসা, তারই শিল্পরূপ হল কাফ্কার এই উপন্যাসত্রয়ী। কাফ্কার অন্তর্জিজ্ঞাসা এবং জীবন যুদ্ধে পরাজয় ও নিঃসঙ্গতা শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই বিশ্বাসে উপনীত করেছিল যে, বিশ্ববিধাতার বিধান মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়, এই বিধান মানুষ মানতে বাধ্য। মানুষের অন্তর্জীবন ও অবচেতন মনের গভীর সত্তায় বিশ্বাসী কাফ্কা সুর্রিয়েলিজমেরই অন্যতম শিল্পী।

জার্মান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে য়াকপ্ ভাসেরমান্ (Jakob Wassermann) যদিও, সুর্রিয়েলিষ্ট ছিলেন না তবু মানবাত্মার অন্তর্নিহিত রহস্য প্রকাশে অনেকটা সুর্রিয়েলিষ্টদের মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

আপাত বাস্তবের অন্তরালে যে গভীর অন্তশ্চেতন ও অবচেতন স্তর আছে তাকে প্রকাশ করার জন্যে কাফ্কা নানা প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতীকও তিনি নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত করে ব্যবহার করেছেন। অদ্ভুত (grotesque), উদ্ভট (fantastic) এবং স্বপ্নদৃষ্ট বীভৎস দৃশ্যকে তিনি যুগের জ্বালা ও জিজ্ঞাসার প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন। কাফ্কার The Trial উপন্যাসটি আধুনিক জীবনানুভূতির সামগ্রিক প্রতীক। আধুনিক মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে যে গভীর অপরাধবোধ আছে তা তাকে কেবলি আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করে এবং তার মূলীভূত অপরাধের 'বিচার' (Trial) জীবন ও সমাজের বিচারালয়ে হতে বাধ্য। কাফ্কার Metamorphosis গল্পটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতীকধর্মী গল্প। জার্মান কথাসাহিত্যে ঠিক ঘোষিত কোনো প্রতীকবাদী ধারা ছিল না। সেখানে প্রায় অনুরূপ যে প্রবণতা ছিল তার নাম expressionism। জার্মান কথাসাহিত্যের

একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী টমাস মান্ এই ধারায় প্রতীকধর্মী উপন্যাস রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাঁর Magic Mountain (Der Zauberberg, 1924) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রই এক-একটি আদর্শের প্রতীক। আল্পস্ পর্বতের স্বাস্থ্য-নিবাসে হান্স্ গেছেন তাঁর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। আল্পস্ পর্বতকে ঔপন্যাসিক উপস্থাপিত করেছেন নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে। এইখানে হান্স মানবতাবাদের প্রতীক সেতেমব্রিনি, স্থূল পাশবিক বৃত্তির প্রতীক পিপারকর্ণ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নানা দার্শনিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। শেষে হান্স বুঝেছেন আল্পসের বিশুদ্ধ নান্দনিক সৌন্দর্যের যাদু মানুষকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু শুধু বিশুদ্ধ নান্দনিক সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, অতএব এই যাদু পাহাড়ের মোহপাশ কাটিয়ে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে নান্দনিক সৌন্দর্যচেতনার সমন্বয় সাধন করা দরকার।

সুর্‌রিয়েলিজ্‌ম্ (Surrealism)

১৯১৪ সালের কাছাকাছি সময়ে ফরাসী সাহিত্যে সুর্‌রিয়েলিজ্‌মের আন্দোলন সূচিত হয়। এবং যদিও এখনো বিশ্বের সাহিত্যে এর প্রভাব রয়েছে তবু ১৯৩৯ সালের কাছাকাছি সময় থেকে ফরাসী সাহিত্যে এই আন্দোলনে মন্দা পড়তে থাকে। সুর্‌রিয়েলিজ্‌মের পরে ফরাসী সাহিত্যে আর কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয় নি। যুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে যখন সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তখন ব্যথাহত একদল যুবক উপলব্ধি করলেন যে পুরানো নীতি ও আদর্শ অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে। এগুলোও একেবারে ভেঙে না গেলে নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে না। অতএব চরম ভাঙন ও নীতিবন্ধনমুক্ত চরম নৈরাজ্যই আপাতত কাম্য। এই নৈরাজ্যের সময় মানুষের কোনো নীতি-আদর্শ যদি না থাকে তবে মানুষের জীবন কিসের দ্বারা পরিচালিত হবে। তাঁরা বলেন—মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম শক্তি ও প্রবণতার দ্বারা। অতএব সাহিত্য শিল্পের প্রেরণাও খুঁজতে হবে কোনো নীতি বা আদর্শে নয়, খুঁজতে হবে মানুষের অন্তর্লোকে যে সব আদিম শক্তি ও প্রবণতা রয়েছে তাদের মধ্যে। এই সব প্রবণতাকে আমরা সামাজিক ভাবে চেপে রাখি। তাদেরই প্রকাশ করতে হবে। অতএব আদিম প্রবণতা ও শক্তির অবাধ শাসনমুক্ত উন্মোচনই সুর্‌রিয়েলিষ্ট সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

এই ভাঙনের ও নৈরাজ্যের আন্দোলন প্রথম রূপ নিল ডাডাইজ্‌মে। এ সম্পর্কে L. Cazamian তাঁর A History of French Literature গ্রন্থে বলেছেন—"Dadaism' was the initial form of the crusade. A group of refugees in Zurich, when Switzerland received the waifs of the warring world, sought for a symbol of their disdain and hatred of the normal attempts of intelligence A dictionary was opened at random and the word changed upon, 'Dada', was hailed as the fit name for programme of which the spirit was arbitrariness and irrationality, and the paramount aim destruction. The pretence of thinking logically and writing grammatically had clogged literature with common places and steriotyped phrases. The free play of haphazard inspiration would purify language and renovate poetry. At the

peace the 'Dadaists' transferred their activities to France under their leader Tristan Tzara, born in 1896. a Rumanian ('Sept manifestes Dada', 1924). Their incoherent utterances failed to win much credit, Dadaism became merged in Surrealism" প্রথমে Guillanme Apollinaire নতুন 'surrealiste' কথাটি ব্যবহার করেন। এর পরে ফ্রয়েডের ব্যাপক প্রভাবে সুর্‌রিয়েলিজ্‌মে অবচেতন মনের প্রকাশের প্রেরণাই প্রধান হয়ে ওঠে। আমাদের অবচেতন মন এলোমেলো এবং আমাদের আদিম বৃত্তিগুলি সেখানেই চাপা পড়ে আছে। ফ্রয়েডের এই মতের সঙ্গে সুর্‌রিয়েলিজ্‌মের সুর অনেকটা মিলে যাওয়ায় ফ্রয়েডই সুর্‌রিয়েলিজম-এর গুরু বলে স্বীকৃত হন। সুর্‌রিয়েলিজ্‌ম যা করতে চাইল চিত্রে কিউবিষ্ট শিল্পীরা (Picasso Braque, Derain প্রভৃতি) তাই করতে চাইলেন। সুর্‌রিয়েলিজ্‌মের দার্শনিক ব্যাখ্যাতা André Breton দুটি বই লেখেন—Manifesto du surréalisme (১৯২৪) ও Second Manifeste du surréalisme (১৯৩০)।

প্রত্যক্ষভাবে সুর্‌রিয়েলিষ্ট ঔপন্যাসিক কেউ ছিলেন না, তবে অনেকের রচনায় এই মতবাদের ভাব ও আঙ্গিকের প্রভাব পড়েছিল। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় কাব্য ও ছোটগল্পেই।

অস্তিত্ববাদ (Existentialism)

অস্তিত্ববাদের প্রভাব অতি আধুনিক উপন্যাসেই দেখা যায়। কল্লোল যুগের বাংলা উপন্যাসে অস্তিত্ববাদের কোনো আভাস নেই। অথচ দর্শনশাস্ত্রে অস্তিত্ববাদের পূর্বাভাস অনেক আগেই হয়েছিল। এক অর্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি অশুভ পরিণাম হল অস্তিত্ববাদ, যার মূল কথা হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসাবে সমাজের উপযোগিতা রয়েছে, এছাড়া সমাজের জন্যে সমাজের নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নেই। ব্যক্তির অস্তিত্বের আলোকেই সবকিছুর উপযোগিতা। আধুনিক সমাজে ব্যক্তি যে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার শিকার হয়েছে তারই পরিণাম হল এই অস্তিত্ববাদ। ড্যানিশ ধর্মতত্ত্ববিদ Soeren Kierkegaard-এর 'Concept of Dread' এবং 'Fear and Trembling' গ্রন্থে অস্তিত্ববাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপটি ব্যাখ্যাত হয়। তার পরে রুশীয় দার্শনিক Shestov ও Berdyayev ফরাসী মনীষী G... ..er, Fondane, Grenier, Senne-এর রচনায় অস্তিত্ববাদের বিকাশ হয়। Nietzsche ও Husserl এর দর্শনেও অস্তিত্ববাদেরই একটি রূপ ফুটে উঠেছে। উপন্যাস সাহিত্যে প্রথমে ডস্টয়ভস্কি ও কাফ্‌কার রচনায় এই মতবাদের সঙ্গে সুর মেলে। কিন্তু এর ব্যাপক প্রচার ও প্রভাব দেখা গেল একেবারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে। যাঁদের সম্পর্কে L. Cazamian বলেছেন :

"What they chiefly demanded of man was the courage to see things as they are, and to build life upon the freedom of a being who exists for a while, he knows not how and why, but who can atleast stamp his existence with the choice of his will Thus existentialism is modern and

realistic. The lesson it teaches is one of complete independence from the authority of formulas of intellectual, social, and political doctrines, a 'liberty' that each individual is to enjoy and to leave other men to enjoy, whatever their nation or class" [৬৬] এই মতবাদ হল বিশ শতকের অসহায় মানুষের চরম রূপের প্রকাশক। এ মতানুযায়ী লেখক হলেন Jean Paul Sartre (জন্ম ১৯০৫), Albert Camus (জন্ম ১৯১৩)।

অস্তিত্ববাদের দুই রূপ : নাস্তিক ও আস্তিক। মুখ্যত নাস্তিক অস্তিত্ববাদের প্রধান সমর্থক হলেন সার্ত্র (Sartre) ও বেকেট (Beckett), আর আস্তিক অস্তিত্ববাদীদের নেতা হলেন গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (Gabriel Marcel)। ভারতীয় দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ অনেকটা দ্বিতীয় গোত্রে পড়েন। অস্তিত্ববাদের মূল কথা হল : মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই বিবর্তিত হয়ে ওঠাই ('becoming') হল মানুষের জীবনের মূল অর্থ। শ্রীঅরবিন্দও অনেকটা এই কথাই বলেছেন : The ultimate value of a man is not to be measured by what he says, not even by what he does, but by what he becomes. ব্যক্তির এই হয়ে ওঠার পটভূমিকা রচনা করে বলেই আমাদের চারিপাশের সমাজ ও পরিবেশের উপযোগিতা রয়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মতবাদেব পার্থক্যও অনেক।

অস্তিত্ববাদী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন সার্ত্র (J P Sartre) ও আল্‌বেয়ার্ কাম্যু (Albert Camus)। সার্ত্র-এর সৃষ্ট চরিত্রেরা জীবনের অভিজ্ঞতা আহরণ করে যাচ্ছে, কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দই নেই—সামনে যা আসছে তাই গ্রহণ করছে আর অন্ধকারে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এই 'কি যেন' হাতড়ে বেড়ানোই হচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আত্মস্বরূপে বিবর্তন সাধন —আত্মস্বরূপের 'হয়ে উঠা' (becoming)। চারিপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতির হাতে আমরা অক্ষম অসহায়। অভিজ্ঞতা আহরণের পর নিজের ইচ্ছাশক্তি (engagement) দিয়ে চারিপাশের বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাওয়াতেই জীবনের সত্য নিহিত। Les mouches-এর Orestes এবং La mort dans l'ame এমনি করে বেরিয়ে এসেছে বন্ধন কাটিযে। এই পলায়নী মনোবৃত্তির জন্যেই মার্ক্‌স্‌বাদীরা অস্তিত্ববাদকে সহ্য করতে পারেন না। শ্রীঅরবিন্দের অস্তিত্ববাদে এই পলায়নী প্রবণতা নেই। জীবন ও জগৎকে গ্রহণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের পরিপূর্ণতা সাধন করা এবং জগতের দিব্য রূপান্তর সাধন করাই তাঁর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। Gabrieb Marcel যে ভাববাদী অস্তিত্ববাদ প্রবর্তন করেন তার ব্যাখ্যাতা হলেন Kierkegaard। তাঁদের মতে জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা ক্রমশ ঈশ্বরের উপলব্ধির দিকে এগিয়ে চলেছি। জীবনের ভোগ সমাপন করে আমরা মুক্তির দিকে বা ভগবৎ-উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাই—ভারতীয় দর্শনের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অস্তিত্ববাদের আংশিক

৬৬। L. Cazamian, A Hist. of French Lit, p. 449.

সাদৃশ্য আছে। এইজন্যেই জীবনে ভোগের প্রয়োজন আছে। তাই ভোগকে বর্জন না করে অন্তরে অন্তরে নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে—'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ' এইভাবে ভোগের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত আমরা অমৃতরূপের সন্ধান পাই—'অবিদ্যয়ামৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'। Marcel ও Kierkegaard-এর অস্তিত্ববাদ উপন্যাস সাহিত্যে ব্যাপক রূপ লাভ করে Jean Cayrol, Luo Estang প্রভৃতি ফরাসি ঔপন্যাসিকদের রচনায়। Cayrol-এর বৃহৎ উপন্যাস Jevivrai l'amour des autres (১৯৪৭-৫০)-এ সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা এই ভাববাদী অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক কাম্যুর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস The Outsider (১৯৪২) এবং The Plague (১৯৪৮)-এ জীবনের অসঙ্গতি চরম নিরাবেগ নিরাসক্তির সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত। অবশ্য কাম্যুও প্রথম জীবনের নৈরাশ্য ও নাস্তিবাদ (inihilism) কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাই জীবনের অসঙ্গতি উদ্‌ঘাটিত করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব ও বৈপ্লবিক সাম্যবাদী চিন্তাধাবা

মনের তত্ত্বে যেমন ফ্রয়েড, সামাজিক অর্থনীতির তত্ত্বে তেমনি মার্ক্সের প্রভাব সমধিক। মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব ও সাম্যবাদী চিন্তাধারা আধুনিক ঔপন্যাসিকদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। জীবনকে দেখা এবং সমাজের কাঠামো ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব একটি দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেই আধুনিক ঔপন্যাসিকদের অনেকের উপরে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। এই চিন্তাধারা এ যুগে একটি যুগপ্রবণতার রূপ নিয়েছে। ফলে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মার্কসীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নন বা নিজেরা মার্কসীয় দর্শন চর্চা করেন নি, তাঁদের মধ্যেও এই যুগপ্রবণতা কখনো কখনো দেখা যায়। ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে ইংরেজ ঔপন্যাসিক কনরাড্ তাঁর 'নোস্‌ট্রোমো' (১৯০৪) উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদের শোষণ উদ্‌ঘাটিত করেন। শ্রমিক বিপ্লবের কাহিনী রচনা করেন জ্যাক্ লিণ্ডসে, তাঁর উপন্যাস হল Betrayed Spring ও The Rising Tide।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্সে মার্ক্সবাদী দর্শন শিক্ষিত যুবসমাজে বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে। এই সময় ফরাসী ঔপন্যাসিকরা কেউ কেউ এই দর্শনে বিশ্বাসী হন। মাল্‌রো তো নিজে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯২৬) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উপন্যাসেও এই দর্শনের প্রভাব রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'The Conquerors' (১৯২৮)-এর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিবৃত্তই গৃহীত হয়েছে। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা ফরাসী ঔপন্যাসিক আরাগঁকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইতিহাসচেতনা ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত তাঁর The Communists উপন্যাসে। তাঁর The Century was Young উপন্যাসটিতে (১৯৪২) প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ এবং বিপ্লবী মনোভাব বিশ

শতকের রুশ উপন্যাসে খুব বেশি। উনবিংশ শতাব্দীর রুশ উপন্যাসেও বাস্তবতা দেখা যায়, যেমন বিশ শতকের উপন্যাসে পাই। কিন্তু উনিশ শতকের বাস্তবতায় ছিল সাধারণ ব্যাপক মানবপ্রীতি, আর বিশ শতকের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রাজনীতি-সচেতন সংগ্রামী মনোভাব। এদিক থেকে সকলের আগে যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হলেন ম্যাক্সিম গোর্কী। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের জন্যে গণচেতনার প্রস্তুতিতে ব্যাপক ভাবে কাজ করেছে তাঁর 'মাদার' (১৯০৭) উপন্যাসটি। উপন্যাস-জগতে এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ব্যাপক প্রসারে গোর্কীর ভূমিকা অতুলনীয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের যে বিষস্রাবী প্রতিক্রিয়া তা ফরাসী ও ইংরাজি উপন্যাসে নৈরাশ্য ও বিকৃতির চিত্র এনে দিয়েছে। যুদ্ধের পরে সমাজ-জীবনের বন্ধন ও শাসন শিথিল হওয়ায় অভাবে ও অবক্ষয়ে মানুষের জৈবিক বীভৎসতা প্রকট হয়ে উঠল। এর ফলে দেখা দিল ব্যাপক যৌনচিত্র। যাঁরা এই বিকৃতি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলেন, তাঁরা কেউ ধর্মে, কেউ মনস্তত্ত্বে, কেউ প্রকৃতিতে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তখন বিপ্লবের প্রস্তুতিতে নিবিষ্ট। সেখানকার এই সাংগঠনিক আয়োজন ঔপন্যাসিকদেরও প্রভাবিত করেছে। মার্ক্সীয় বিপ্লববাদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব, তীব্র সমাজচেতনা এ যুগের রুশ উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিখাইল শোলোকভের And Quiet Flows the Don (১৯২৮) উপন্যাসে ডন নদীর তীরবর্তী বিপ্লব যুগের কসাকদের জীবনকাহিনীর মহাভাষ্য। বিপ্লবোত্তর রুশ দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনকে নিয়েও উপন্যাস লিখিত হয়েছে—শোলোকভেরই Virgin Soil Upturned (১৯৩২) উপন্যাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়ার সংগঠনের কাহিনী বিবৃত। এই ধরনের আরো একটি উপন্যাস হল অস্ত্রোভস্কির 'How the Steel was Tempered'। এর নায়ক প্যাভেলের জীবনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুফল চিত্রিত হয়েছে।

আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক

আগের উপন্যাসে যে সুপরিকল্পিত গঠন, নিটোল প্লট, আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত সুবলয়িত কাহিনী পাওয়া যেত, আধুনিক উপন্যাসে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বস্তুতঃ আধুনিক জীবনই এলোমেলো হয়ে গেল। ফলে আধুনিক উপন্যাসের শিল্পরূপও এলোমেলো হয়ে এল। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ উপলব্ধি করলেন জীবন তো বাস্তবে কোনো সাজানো প্লট নয়, তা ছকে বাঁধা ট্র্যাজিডি বা কমিডিও নয়, জীবন হল একটি জটিল বিমিশ্র প্রক্রিয়া। সেই জীবনকে যদি সাহিত্যে প্রকাশ করতে যাই তা হলে—'there would be no plot, no comedy no tragedy no love interest of catastrophe in the accepted sense'[৬৭]

প্রুস্ত, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ প্রভৃতির রচনায় উপন্যাসের প্রচলিত রূপ বদলে গেল। চেতনাপ্রবাহকে রূপ দেবার জন্যে গদ্যের প্রচলিত বিরাম-চিহ্নের ব্যবহারও বর্জিত হল। আর অন্তশ্চেতনাকে রূপ দেবার জন্যে উপন্যাসের রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রতীকের

৬৭। Virginia Wolf Modern Fiction

ব্যবহার হতে থাকে। এই সূত্রে উপন্যাসে প্রচলিত সমাজ-বাস্তবতার বদলে খানিকটা কবিকর্মও দেখা দেয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাসে এই কাব্যধর্মিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর 'টু দি লাইট হাউস' উপন্যাসে একাধারে কাব্যধর্মিতা ও প্রতীকের সার্থক ব্যবহারে একটি অভিনব ঔপন্যাসিক আঙ্গিকের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'দি ওয়েভস' (The Waves) উপন্যাসেও প্রতীকের সার্থক ব্যবহার দেখা যায়।

উপন্যাসের প্রচলিত রীতিতে অল্‌ডাস্ হাক্‌স্লিও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করলেন। প্লট-গঠন, এমন কি চরিত্র-চিত্রণ পর্যন্ত তিনি গৌণ মনে করতেন। তাঁর উপন্যাসের রীতি বিবৃতিধর্মী (narration) ততটা নয়, যতটা তর্ক বিতর্কধর্মী। তাঁর কাছে প্লট গৌণ, চরিত্রও গৌণ, আসল বিষয় হল কোনো বিষয় বা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। এর জন্যে বিতর্কধর্মী রচনা রীতিই প্রকৃষ্ট। তাঁর বুদ্ধিনিষ্ঠ উপন্যাসে (intellectual novel) তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আছে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।

উপন্যাসের প্লট ও চরিত্র-চিত্রণকে গৌণ করে অন্তশ্চেতনার উপস্থাপনায় ভার্জিনিযা উল্‌ফ্, জেম্‌স্ জয়েস্ প্রভৃতি উপন্যাসের আঙ্গিকেরও যে পরিবর্তন সাধন করলেন, তাই আধুনিক উপন্যাসের একমাত্র পরিচয় চিহ্ন তা বলা যায় না। তাকে আধুনিকতার একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বলা যায়, কিন্তু এর মধ্যেই আধুনিকতা সীমাবদ্ধ নয়। সামারসেট্ মম্ প্রভৃতি অনেকেই আবার প্রচলিত নিটোল প্লট রচনা ও চমৎকারিত্বপূর্ণ গল্পের উপরে জোর দিয়েছেন। মম্ নিজেই বলেছেন—The story the author has to tell should be coherent and persuasive; it should have a beginning, a middle and an end, and the end should be the natural consequence of the beginning.

ফরাসী ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত কিন্তু উপন্যাসের এই প্রচলিত আঙ্গিক ত্যাগ করেন। তিনি বর্ণনাত্মক রীতির সঙ্গে স্মৃতিচিত্রণ, আত্মকথার রীতি মিশ্রিত করেন, এবং কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে তত্ত্বদর্শনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

আগেই বলেছি, প্রতীকধর্মিতা আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাম্যুর The Plague উপন্যাসটিতে প্লেগে আক্রান্ত ফ্রান্সের বর্ণনা পাই। এই প্লেগ এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিষ্টদের কর্তৃক ফ্রান্স অবরোধের প্রতীকমাত্র।

৪. উপসংহার

কবি এলিয়টের সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিলে বিশ্বসাহিত্যে এতদিনে উপন্যাসের মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। উপযুক্ত সমাজ-পরিবেশের অভাবে মহাকাব্য নাকি আমাদের সাহিত্য জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। এবং উপন্যাসের ভবিষ্যৎ নিয়তিও নাকি একই রকম!

সমাজে যুক্তিধর্মিতার বৃদ্ধির ফলে গদ্যের জন্ম হয়েছিল। আবেগের বদলে যুক্তির আলোকে জীবনের মূল্যবোধকে যাচাই করার জন্যে গদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই যুক্তিই সমাজকে ক্রমশ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখার প্রেরণা দিল। সেই সঙ্গে বাস্তব সমাজ তার সমস্ত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আমাদের চোখে প্রখর হয়ে উঠল। বাস্তব-সচেতনতা যুক্তিবাদের সঙ্গে যখন মিলিত হয়ে রস-সাহিত্যে জীবন-বীক্ষার নতুন পথ খুলে দিল তখনই উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল। বাস্তবের আধারে নিবদ্ধ রহস্যময় হৃদয়রাজ্য ও জটিল মানবচিত্ত বিশ্লেষণই উপন্যাসের প্রাণবস্তু।

উপন্যাস সৃষ্টিতে তা হলে সৃষ্টিচৈতন্য ও সমাজ-পরিবেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য। সৃষ্টি চৈতন্য হবে বাস্তব-সচেতন ও বিশ্লেষণ-পন্থী। সমাজ-পরিবেশ হবে বাস্তব সমস্যায় জটিল —অনেক ক্ষেত্রে অন্তরে-বাহিরে দ্বিধা বিভক্ত। অনেকে মনে করেন এর জন্যে শিল্প সভ্যতা-ই উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্মাণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়ে থাকে, পাশ্চাত্যে তাই Industrial Revolution এর ফলেই উপন্যাস সৃষ্টিতে প্রাচুর্য এল। মধ্যযুগীয় জীবনে যে সারল্য ও ঋজুতা ছিল তাতে হৃদয়বৃত্তি প্রচণ্ড হলেও তা ছিল একমুখী ও অবিমিশ্র। আধুনিক জীবন এই হৃদয়বৃত্তিকে করেছে বহু-খণ্ডিত, জটিল, সূক্ষ্ম ও বিমিশ্র। এরই বিশ্লেষণে উপন্যাসের আবির্ভাব অনেকটা নিয়তি-নির্দিষ্ট।

উপন্যাসের মৃত্যু চিন্তা করতে এসে তাই দুটো প্রশ্নই বিচার্য—উপন্যাসের জন্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব সমস্যা-জটিল সমাজ-পরিবেশ এখন আছে কিনা এবং আমাদের বাস্তবসচেতন বিশ্লেষণী জীবন-নিরীক্ষা অব্যাহত কিনা। বলা বাহুল্য—এই দুই-ই পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, তবে এই দুইয়ের যে যুগোচিত রূপ এখন দাঁড়িয়েছে তাই উপন্যাসে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এনেছে।

দুটি বিশ্ব যুদ্ধের ফলে আমাদের বাস্তব জীবনের সর্ববিধ সমস্যা জটিলতম ও তীক্ষ্ণতম হয়েছে। জীবনের এই কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি এখন শুধু বাস্তব জীবনের সমস্যাই বিশ্লেষণ করছে না বা গল্প-রস-সিক্ত করে তার পরিবেশন মাত্র করছে না। গভীরতম সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ফলে তার মধ্যে অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন জেগেছে। এই অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার শেষ বিন্দুতে এসে দৃষ্টি অন্তর্মুখী ও অধ্যাত্মমুখী হতে বাধ্য। বহির্জীবনের আখ্যান-সমৃদ্ধ কাহিনীসার উপন্যাসের বদলে তাই—অন্তর্জীবনের, মনোজীবনের সমস্যা-প্রধান উপন্যাসের জন্ম হচ্ছে। কাম্যু-সার্ত্র-প্রুস্ত-কাফকা প্রভৃতি পশ্চিমী ঔপন্যাসিকের কথা এখানে স্মর্তব্য। আজকে এই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে অতিমাত্র বাস্তব সমস্যাই অতিমাত্র অন্তর্মুখীনতার জন্ম দিল, যুক্তির সঙ্গে মিলিত হল বোধি (intuition), বিশ্লেষণের

সঙ্গে দেখা গেল নিত্য নব-উদ্‌ঘাটন। আমি আধুনিক বাংলার কোনো কোনো মেদবহুল অসুস্থ পাঠক-ভোলানো উপন্যাসের কথা বলছি না। পশ্চিমের উপন্যাসের নিষ্ঠাশীল চিন্তাশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাই বলছি। বাংলায় যদি স্মরণ করতে হয় তো বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ এবং অতি আধুনিক দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলবো। বিত্তমোহ ত্যাগ করে যথার্থ অখণ্ড জীবনবীক্ষায় এঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উপন্যাসের অবশ্যম্ভাবী ভাবান্তর ও রূপান্তর হয়েছে। উপন্যাস থেকে কাহিনীর আকর্ষণ বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে সমস্যাকে তুলে ধরা হচ্ছে। গল্পহীন উপন্যাসে কিন্তু বোধিদৃষ্টির অন্তর্মুখীনতার জন্যে কিছু কাব্যধর্মিতা এসেছে। কবিতার মত ব্যঞ্জনা ও প্রতীকের বহুল ব্যবহার উপন্যাসের নব দিগন্ত সূচিত করছে। ফরাসীতে যেমন বাস্তবধর্মী নাটকের প্রতিক্রিয়ায় প্রতীক নাটকের জন্ম হয়েছিল, আধুনিক উপন্যাসে তেমনি বহির্মুখীনতার বদলে অন্তর্মুখীনতা প্রতীকধর্মী উপন্যাসের জন্ম দিচ্ছে। গল্প-খোর চোদ্দ-আনা পাঠক এতে নিশ্চয়ই খুশি হচ্ছে না। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনায় অবিশ্বাসী নিষ্ঠাশীল ঔপন্যাসিক পাঠকের পাঁচ-মিশেলি রুচির তোষামোদ করে খুশি হতে পারে না। উপন্যাসে সাধারণ পাঠক তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য না পেয়ে যদি হাহাকার করে 'উপন্যাসের মৃত্যু হয়েছে', তবে ঔপন্যাসিক যেন তাঁর মৌল প্রেরণা থেকে ভ্রষ্ট না হন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় যেন তাঁকে প্রতি ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয়—এটা উপন্যাসের মৃত্যু নয়, উপন্যাসের ভাবান্তর ও রূপান্তর মাত্র।

বস্তুত উপন্যাস হল সবচেয়ে নমনীয় ও সবচেয়ে প্রগতিশীল শিল্পকলা। তাই কোনো যুগেই উপন্যাসের কোনো একটি মাত্র বাঁধা রূপ দেখা যায়নি। একই যুগে বহুল বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন যুগে বহুল রূপান্তর উপন্যাসের মহাজীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার প্রাণশক্তির যে ব্যাপ্তি ও গতি, তাতে কোনো রক্ষণশীলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রগতিশীল জীবনের নানা বাঁক, নানা ওঠা-নামা, নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সমতালে চলবার এমন জীবনসঙ্গিনী শিল্পক্ষেত্রে বিরল। উপন্যাসের মৃত্যু অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত কল্পনা!

প্রথম পর্বের নির্ঘণ্ট

অক্স্ফোর্ড্ ১০০
অগ্নিযুগ ৮০
অচিন্ত্যকুমার ৫০, ১২১
অচেতন ১৩২
অডিসিউস্ ১১৪
অতিমানব ৯১
অদস্ ১৩০
অধিশাস্তা ১৩০
অনুশীলন সমিতি ৮২
অন্তর্জ্ঞান ১৩১
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৭০
অন্তর্মুখীনতা ১৩২ ১৪০ ১৪৬
অন্তশ্চেতনা ১৪৩, ১৪৪
অন্তশ্চেতন্য ১৩৫
অন্ধ নিয়তিবাদ ৩৪
'অপরাজিত' ৫০
অবচেতন ১৩১
'অভিনেত্রী' ১০৬
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৮২
অয়েডিপাস কম্প্লেক্স্ ১২৮, ১৩২
অরবিন্দ (শ্রী) ২৭, ২৮, ২৯, ৬৯, ৮১, ৮২, ৮৩ ৮৪, ৮৯, ৯১, ১৩৪
অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১০৪,
অল ইন্ডিয়া সোস্যাল কনফারেন্স্ ১০০
অস্ট্রিয়া ১২৬, ১২৮
অসহযোগ আন্দোলন ৮৬
অস্কার ওয়াইল্ড্ ১০৬
অস্তিত্ববাদ ১৪০-১৪২
অস্ত্রোভস্কি ১১৭, ১৪৩
অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন ৭১
অহং ১৩০
আইরিন ১১৪
আইরিশ ৮২
আচার্য, চিত্তরঞ্জন ১০৭
আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ৮৪, ৮৮
আজাদ হিন্দ্ সরকার ৮৮
আঞ্চলিক উপন্যাস ১২৫, ১২৬
আত্মশক্তি ৯৬
আদিম কাম ১৩১
আঁদ্রে জিদ ১৩৭
আধুনিক ৪৬ ৪৭
'আধুনিক ফরাসি সাহিত্য' ১০৮
আধ্যাত্মিক বোধিদৃষ্টি
'আনন্দমঠ' ৮২
আনাতোল ফ্রাঁস ১০৬, ১০৮
আন্তন শেকভ ১০৮
আন্দালুসী ১২৬
আফ্রিকা ৫৬, ৫৭
আবগারি শুল্ক ৭৯
আবুল ফজল ১০৭
আমেদাবাদ ৫৫, ১০৪
আমেরিকা ১১৮, ১২৯
আর্মস্ অ্যাক্ট্ ৭৯
'আর্য' পত্রিকা ৯১
আর্য পাবলিশিং হাউস ৯২
আর্য সমাজ ৯৮
আয়ার, শিবস্বামী ৫৯
আরউইন লর্ড ৮৬
'আরবী গল্প' ১০৭
আরাকান ৬৩
আরাগঁ ১৪২
আলম, সামসুল ৮৪

আলিগড় ৯৮
আলিপুর ৮৪, ৮৫
আলি, মহম্মদ ৬৬, ৮৬
আলি, সৌকৎ ৬৬, ৮৬
আল্পস্ পর্বত ১৩৯
আলেকজাণ্ডার, এ. ডি. ৭০
'আশার বাণী' ১০৬
আসাম ৮৮
আস্তিক অস্তিত্ববাদী ১৪১
আহম্মদ, সইয়দ্ ৬৫, ৬৬

ইউরোপ ৫৬, ১১৭, ১৩৩
'ইউলিসিস' ১১৪, ১৩৫
ইংল্যাণ্ড ৭০, ৮০, ৮২, ৮৭, ৮৮, ৮৯
'ইডিপস'২৮
ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১০৩
ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানি ৫৫
ইণ্ডিয়া সোস্যাল কন্ফারেন্স ১০০
ইতালি ৯৯, ১০৬, ১২৬
ইয়ারমান ১২৩
ইয়ুং ১৩৫
ইরেনবুর্গ, ইলিয়া ১১৭, ১১৮
ইলবার্ট বিল ৬৫
ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ৫২

উড়িষ্যা ৯৮, ১০০
'উত্তরা' ৭৬, ৭৭
'উৎসব রাতে' ১০৬
উপনিষদ ২৭, ২৮
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ৮২
'উভয়ত' ৯২
উল্ফ, ভার্জিনিয়া ১২০, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৪

উল্লাহ, সেলিম ৬৬
'উষসী' ১০৬, ১০৭

এইচ. জি. ওয়েল্স্ ১০৬, ১০৭
এইচ. ভি. রুথ ১১১
এঙ্গেলস্ ৩৫, ৩৬, ৩৮
এট্লী ৭০, ৮৮
এণ্ডারসন ১০২
এম্প্লয়মেন্ট্ ব্যুরো ৫৯
এলাহাবাদ ৬৬, ৬৭
এলিয়ট, টি. এস. ৪২, ৪৭, ১১৩, ১৪৫

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ৯৪
ঐতিহাসিক জড়বাদ ৩১
ঐতিহাসিক বিধান ৩১
ঐশ্বরিক নিয়তিবাদ ৩১, ৩২
ঐশ্লামিক দর্শন ৩১

ওমর খৈয়াম ১০০, ১০৭
'ওমর-গুরু আবু আলি সিনা' ১০৭
ওযাইল্ড, অস্কার ১০৬
ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ্ ২৭
ওয়াদেদার, প্রীতিলতা ১০২
ওয়াভেল্ লর্ড ৬৯
ওয়াশিংটন ১০৩
ওয়াহবী বিদ্রোহ ৭৯
ওয়েল্স্, এইচ. জি. ১২৬, ১৩৪
ওলিন্, চার্লস্ এইচ. ৯৬
ওস্টারে ১২৯

কংগ্রেস ৫৭, ৬৯, ৭০, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯৬,
কড্ওয়েল্ ৩৭
কনরাড্ ১২৫, ১৪২

কবি ফেরদৌসী ১০৭
কবির, হুমায়ুন ১০৭
কবীর ৭১
কর, বিমল ১৪৬
কর্মযোগ ৯২
'কর্মযোগীর আদর্শ' ৯২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০২
'কল্লোল' ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৫, ৭৮, ৯০, ৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৯, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
'কাঁচি' ১০৮
কাঁথি ৮৫
কানপুর ৯৫, ১০৪
কনাগ্রা ৬১
কানুনগো, হেমচন্দ্র দাস ৮৩
কাফ্‌কা, ফ্রানৎস ১২৪, ১২৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪৫
কাম্যু ১১৬, ১২৬, ১২৭, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫
কার্জন, লর্ড ৮১
কার্তজ ২৮
কার্নে ৫৭
'কালি-কলম' ৫৭, ৯২, ১০৫, ১০৮
কাশী বিদ্যাপীঠ ৯৮
কিউবিষ্ট ১৪০
কিংস্‌ফোর্ড্ ৮৩
কুপ্রিন, আলেকজাণ্ডার ১১৭, ১১৮, ১২৫
কেবিনেট মিশন ৭০, ৮৮
'কেমন করে লিখতে শিখি' ১০৭
কেলার, গডফ্রিট ১২৩
কেশপুর ৮৫
কোলরিজ্ ৮৬
কোহট ৬৬
কোহিমা ৮৮
ক্যাজামিয়া, লেগুই ১২১
ক্যাথলিক জ্যানসেনিষ্ট ১১৩
ক্যাথলিক ধর্ম ১১৩
ক্রপটকিন ১০৮
'ক্রমবিকাশের ধারা' ৯২
ক্রিপ্‌স্ মিশন ৬৯, ৮৮
ক্রিপ্‌স্, স্ট্যাফোর্ড ৭০
ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ১২৯

খাঁ, আগা ৬৬
খিলাফৎ আন্দোলন ৬৬, ৮৬
খুলনা ৬২

গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র ১০৫, ১০৬, ১০৭
গঙ্গোপাধ্যায়, রেবতীভূষণ ১০৬
গজনবি ৬৬, ৮১
গণদেবতা ৫০
'গমের দানা ডিমের মত বড়' ১০৬
গল্‌স্‌ওয়ার্দি ১০৪, ১৩৪
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ৮৭
গান্ধীজী ৬৬, ৬৮, ৭১, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১০২, ১০৩
গার্ডেন রীচ ৬৬
গারবোটভ, বোরিস ১১৮
গিরি, হনুমন্তিয়া ৭৯
'গীতা' ৮২, ৯২
গুজরাট বিদ্যাপীঠ ৯৮
গুপ্ত, জগদীশ ১০৭
গুপ্ত, নলিনীকান্ত ৮৩, ৯২
গুপ্ত সমিতি ৮২, ৮৩

গুহ, নলিনী কিশোর ৬৭
গুহঠাকুরতা, মনোরঞ্জন ৮২
গোখেল ৯৮
গোগোল ১১৭
গোঘাট ৭৯
গোপালাচারী, রাজা ৬৯
গোরখপুর ৮৬
গোরবাটভ ১১৭
গোর্কী, ম্যাক্‌সিম্ ১০৬, ১০৭, ১০৭, ১১৭
'গোর্কীর স্মৃতিকথা' ১০৮
গোল টেবিল বৈঠক ৬৮, ৮৭, ১০১
গোস্বামী, নরেন্দ্র ৮৪
গোস্বামী, হেমচন্দ্র ৬৮
গৌহাটি ৬৮
'গ্যাব্রিয়েল দা আনুন্‌ৎ সিয়ো' ১০৭
গ্যেটে ৩৮, ৩৯
গ্রীন, গ্রাহাম ১১৩

ঘোষ, বারীন্দ্রকুমাব ৮২. ৮৩ ৩৮৪
ঘোষ, শান্তি ১০২
ঘোষ, সুবোধ ১৪৮
ঘোষাল, হিরণ্ময় ১০৮

চক্রবর্তী, জে. সি. ৬২
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ৮৪, ৮৭
চট্টগ্রামের ইউরোপীযান ক্লাব ১০২
চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুত ১০৬
চট্টোপাধ্যায়, অতুল ১০৩
চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ১০৬, ১০৭, ১০৮
'চতুষ্কোণ' ৫০
চন্দননগর ৯২
চন্দ্রকোণা ৫১, ৭৯,
২৪ পরগনা ৫৫, ৬৩, ১০০
চরম জড়বাদ ৩০, ৩১
চরমপন্থী দল ৮১, ৮৩, ৮৫
চরমপন্থী ভাববাদ ২৬, ২৯, ৪০
চরি মিষ্টার ৫৯
চাকি, প্রফুল্ল ৮৩
চার্চিল ৮৮
চিৎ ২৪, ২৫, ২৬, ২৮
চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ১০০
চীন ৯৯, ১৪২
চুয়াড় বিদ্রোহ ৭৯
চেকভ ১০৭
চেতনা-প্রবাহ ১৩৪, ১৩৫, ১৪৩
চৈতন্য ৭১
ছোট জাগুলিয়া ১০০
চৌধুরী, ভূপতি ১০৬
চৌধুরী, সুনীতি ১০২
চৌরীচৌরা ৮৬
চ্যাটার্জি, বি কে. ৬২

জড় ২৪, ২৫, ২৮
জড়-নিয়তিবাদ ৩১, ৩২
জড়বাদ ২৪, ২৬, ৩৯, ৪৪
জড়বাদী অদ্বৈতবাদ ২৫
জড়বাদী সম্প্রদায় ২৪
জন্ ১১৪
জয়েস্ জেমস্ ১১৪, ১১৫, ১২৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৪,
'জাঁ ক্রিসতফ' ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১১৬
জাতীয় আন্দোলন ৮২
'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' ৮১
জাপান ৮৪, ৮৮
জাপানী ৫৭

জামালপুর ১০৪
জামসেদপুর ৫৫
জার্মানি ৫৬, ৮৪, ৮৮, ১১৪, ১২৪, ১২৫, ১৩৮
জালালাবাদ ৮৫
জালিয়ানওয়ালা বাগ ৮৬
'জাসিন্তো বেনাভান্তে' ১০৬
জিদ ১১৫, ১২৬, ১২৮, ১৩৭
জিন্নাহ, মহম্মদ আলি ৬৯, ৭০
জুরিখ ১৩৫
জেনেভা ১৩০
জেমস্, উইলিয়াম্ ১৩৪
জোলা ১২১, ১২২, ১২৬, ১৩৫
জ্ঞান ৩০
জ্ঞানেশ্বর ৭১

টমাস মান ১০৮, ১১৪, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩৮
টমাস হার্ডি ১০৭
টলস্টয়, আলেক্সাই ১১৮
'টলস্টয়েব স্মৃতি' ১০৭
টলস্টয়, লিও. এন. ৯২, ৯৩, ১০৬, ১০৮, ১১৭, ১২৫
টাইফুন ১২৫
টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানি ৫৫. ১০৪
টাটা, জামসেদজী ৫৫
টাটা, হীরাবাঈ ১০১
'টু দি লাইট হাউস' ১৪৪
'টু-লেট' ১১৪
টেনিসন ১০৯
টেলিফোন এক্স্চেঞ্জ ১০১
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০৬, ১০৭
ঠাকুর, সৌমোন্দ্রনাথ ৯৬

ডন নদী ১৪৩
ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ ৮৭
'ডষ্টয়ভস্কি' ১০৮, ১৪০
ডাণ্ডি অভিযান ৮৭
ডারউইন ১১৯, ১২৯
ড্যানিশ ধর্মতত্ত্ববিদ ১৪০

ঢাকা ৫১, ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮৪

তন্ময় ভাববাদ ২৬, ২৭, ২৯
তাম্রলিপ্ত ৮৬, ১০২
তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ৮৫, ১০২
'ত্যাগ' ১০৬
'ত্যাগধর্ম' ৯২
'তিথিডোব' ৫০
তিলক, বালগঙ্গাধর ৮১, ৮২ ৮৪
তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ ৯৮
তরঙ্গ ৬৬, ৮৬
তুর্গেনিভ ১০৭, ১১৭
'তেপান্তরের মাঠ' ১০৮
ত্রিপুরা ৭০, ১০২
ত্সার ১১৮

থিওজফিক্যাল সোসাইটি ৯৮
'থিসিউস' ১১৬
থুরো ৯২

দক্ষিণ-ভারতীয় শিক্ষা-সংস্থা ৯৮
দত্ত, অশ্বিনীকুমার ৮১
দত্ত, উল্লাসকর ৮৩, ৮৪

দত্ত, কানাইলাল ৮৩, ৮৪
দত্তগুপ্ত বীরেন্দ্র ৮৪
দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ ৮২, ৯৫
দস্তয়েভস্কি ১১৭
দাদু ৭১
দাশগুপ্ত, সুবোধ ১০৬, ১০৮
দাশ, চিত্তরঞ্জন ৮৪, ৮৫, ৮৬, ১০৩
দাশ, শ্রীমতী রাজকুমারী ১০০, ১০১
দাশ, সুন্দরীমোহন ৮১
দাস, বীণা ১০২
দাস, সত্যেন্দ্র ১০৮
দি ওয়েভ্‌স্‌ ১৩৫, ১৪৪
দি টুয়েলভ পাউণ্ড লুক ১০৬
দি ভিজেল ১১৭
দি ফরসাইট সাগা ১১৪
দিনাজপুর ৬২
দিনু চামড়াওয়ালা মসজিদ ৬৭
দিল্লি ৫৮, ৫৯, ৬৬, ৬৮, ১০৩
দীপালি সংঘ ১০০
'দীর্ঘনিশ্বাস ক্লাব' ১০৬
দুজার্দিন ১৩৫
দ্যুহামেল ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৭
দেউস্কর, সখারাম গণেশ ৮২
'দেওয়াল ভাঙ্গা' ১০৯
দেকার্তে ২৫
দেনমার্ক ৫৭
দেশবন্ধু ৯৮
'দেশের কথা' ৮২
দ্বন্দ্বাত্মক জড়বাদ ৩১, ৩২
দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ ৩৬, ৯৪
দ্বান্দ্বিক জড়বাদ ৩০, ৩৯, ৪০, ৪৪
দ্বৈতবাদ ২৫

ধনেখালি ৫১
'ধাত্রীদেবতা' ৫০

নন্দীগ্রাম ৮৫
নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র ১৪৬
নন্দী, সুরেশ ১০৭
নব ভাববাদী দর্শন ১৩৬
নবশক্তি ৮২
নব্য-রোমাণ্টিক ১২৪
নরওয়ে ৫৭
নর-নারায়ণ সেবা ৭১
নরমপন্থী তন্ময় ভাববাদ ২৮, ২৯
নরমপন্থীদল ৮১
'নাইট' উপাধি ৮৬
নাইডু, সরোজিনী ১০১, ১০২
নাগ, কালিদাস ১০৬, ১০৭
নাগ, গোকুল ১০৬
নাগপুর ৭৬, ৯৭, ১০২
নায়ক, কুমারী নির্মলাবালা ১০০
নায়েক বিদ্রোহ ৭৯
নায়ের, স্যার শঙ্করম্‌ ১০০
নারায়ণ গড় ৮৩
নারী-প্রগতি ৯৯
'নারী বন্দনা' ১০৮
নাস্তিক অস্তিত্ববাদ ১৪১
নাস্তিবাদ ১৪২
নাহার, শামসুন ১০৭
'নিখিল বিশ্ব মহিলা সম্মেলন' ৯৯
'নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা' ৬৮
নিয়তিবাদ ৩১
নির্জ্ঞান ১৩২
নীলকর আন্দোলন ৭৯
'নেচার্যালিজম্‌' ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৬৫

নেচার‍্যালিষ্ট ১০৯, ১২১
নৈতিমূলক অস্তিত্ববাদ ১১৬
নেশন্যাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন ৮১, ৯৭
নেশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ ৮১, ৯৭
নেহরু, জহরলাল ৬৪, ৮৫, ৯৫, ১০৩
নেহরু, মতিলাল ৮৬
'নোগুচি' ১০৮
নোয়াখালি ৭০
নোবেল পুরস্কার ১২৫
'নোস্‌ট্রোমো' ১৪২
নৌরজী, দাদাভাই ৮২
'ন্যূট্ হামসুন' ১০৬, ১০৭, ১০৮

পঞ্চাশের মন্বন্তর ৬২
পটাশপুর ৮৫
পণ্ডিচেরী ৬৯, ৮৫
'পথের পাঁচালী' ৫০
পরাবাস্তববাদী ১২৭
পরাবিদ্যা ৮৯
পশ্চিম এশিয়া ৫৬
পাইক পাড়ায় রথযাত্রা ৬৭
'পাঁক' ৫০
পাঞ্জাব ৬৩, ৭০, ৮১, ৮৬, ৯৮
পাটনা জাতীয় কলেজ ৯৮
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০
পাঠক, ভবানী ৭৯
পাণিক্কর, কে. এম. ৭২
'পারস্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী' ১০৭
পাল, বিপিনচন্দ্র ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪
প্যানোভার ১১৮
প্যাভেল ১৪৩
পিপারকর্ণ ১৩৯
'পিয়াসী' ১০৬, ১০৮
পুণা ৬৭, ১০০, ১০১
'পুতুল নাচের ইতিকথা' ৫০
পুশকিন ১১৭
পূর্বালক্ষ্যা ৮৫
পেটাভিল জে. ডব্‌লিউ. ৫৮
'পোষাকের দাম' ১০৬
প্রকাশবাদী ১২৪, ১৩৮
প্রগতিশীল লেবার পার্টি ৮৮
প্রতীকবাদ ১৩৩, ১৩৫-১৩৯, ১৪৪, ১৪৬
প্রবর্তক সংস্থা ৯২
'প্রভাকর' ১০৭
প্রভেন্স ১২৫
প্রাউস্ত ১২৫
'প্রার্থনা' ১০৮
প্রার্থনা সমাজ ৯৮
প্রুস্ত, মার্সেল ১১৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫
'প্রেতপুরী' ১০৬

ফরওয়ার্ড ব্লক ৮৮
ফরাসডাঙা ৫১
ফরাসি ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬,
ফেকনার, গুস্টাভ ১২৯
ফেডারেশন হল ৮০, ৯৭
ফেমিন কমিশন ৬১
'ফেরদৌসীর অগ্রদূত কবি দকিকী' ১০৭
ফাসিষ্ট ১৪৪
ফ্রয়েড ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৪০, ১৪২
ফ্রান্স ৫৭, ৮৩, ১১৭, ১১৮, ১২৫, ১৩৭, ১৪৪

ফ্রিটাক্, গুস্তাফ ১২৩
ফ্রেজার সাহেব ৮৩
ফ্লবেয়ার ১২০, ১২৬
ফ্লু ১১৪

বকর্-ইদ্ ৬৬
বঙ্কিমচন্দ্র ৪৭, ৮১, ৮২, ১১০
'বঙ্গবাসী' ৮২
বঙ্গভঙ্গ ৬৫, ৬৬, ৮১
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৭৯
বঙ্গলক্ষ্মী ১০১
বদলেয়র ৪৮
'বনস্পতির মৃত্যু' ১০৭
বন্দেমাতরম্ ৮১, ৮২
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ৩৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ৮২, ৮৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস ৯৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ৪৭, ৫০, ১১৩, ১২৫
বন্দ্যোপাধ্যায় দীপেন্দ্র ১৪৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ৫০, ৯২, ১১৩, ১২৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ৫০
বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ ৮২
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ১০৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর ৬১
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ৮১
'বন্ধুর উদ্দেশে' ১০৮
বদ্রেজিন ১০৮, ১০৯
বয়কট ৮১
বরকতুল্লাহ্, মোহাম্মদ ১০৭
বরাকর ৫৪, ৫৫
বরোদা ৮১, ৮২, ১০১
বর্ধমান ৭৯
বর্মা ৬৩
বলশেভিকবাদ ৯৬
বল্লভাচার্য ৭১
বসু, আনন্দমোহন ৮১
বসু, ক্ষুদিরাম ৮৩
বসু, চারুচন্দ্র ৮৪
বসু, জগদীশচন্দ্র ৮৯, ৯০
বসু, বুদ্ধদেব ৫০, ১০৭, ১২১, ১২২
বসু, মনীন্দ্রলাল ১০৬
বসু, মুরলীধর ১০৮
বসু, রাসবিহারী ৮৪
বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ৮৪
বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ১০৮
বসু, সুজাতা ১০০
বসু, সুভাষচন্দ্র ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯
বস্তুগত ভাববাদ ২৬, ৪০, ৪৪
বস্তুবিজ্ঞান ৮৯
বহুবিবাহ ৯৯
বহরমপুর কলেজ ৬১
বাঁদুড়া ৭৯
বাকিংহাম ৫১
বাঁকুড়া ৬২
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১০৫
বাটলার, স্যামুয়েল ১১৪
বার্কলি ২৬
বায়রন ২৭
'বারাঙ্গনা' ১০৮
বার্নার্ড শ ১২৬
বালুরঘাট ৬২
বাল্জাক্ ১২৬
বাস্তবতা ১১৯
'বিচিত্রা' ১০৮

'বিড়ালের স্বর্গ' ১০৫
বিদ্যাসাগর ৯৯
বিধবা বিবাহ ৯৯
বিধবা-শিল্পাশ্রম ১০০
বিবর্তনবাদ ২৮
বিবেকানন্দ ৭১, ৯২, ১২৭
বিশী, শৈলেন্দ্রনাথ ৯৬
বিশ্বভারতী ৯৮
বিশ্বাস, আশুতোষ ৮৪
বিশ্বাস, বসন্তকুমার ৮৪
বিষেণপুর ৮৮
বিহার ৫৪, ৯৮
বিহার বিদ্যাপীঠ ৯৮
বীরভূম ৭৯
'বুডেন ব্রুক্স' ১১৪
বুড়ি বালাম ৮৪
বুদ্ধ ৭১
বুদ্ধিনিষ্ঠ উপন্যাস ১৪৪
বুনিন, আইভ্যান ১১৭, ১১৮
বুয়র যুদ্ধ ৮২
'বৃদ্ধ পরীক্ষক' ১০৭
বৃন্দাবনপুর ৮৫
বেকেট ১৪১
বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি ৫৪,
'বেঙ্গলী' ৮২
বেঙ্গল কেমিক্যাল ৮১
বেঙ্গল নেশন্যাল ইউনিভার্সিটি ৯৮
বেথুন কলেজ ১০০
বেদান্ত ১২৭
'বেদে' ৫০
বেনেট ১২৪
বের্গস্যঁ ২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬
বেলকুনি ৮৫
বেলগ্রাম ১০২
বেলজিয়াম ৫৭
বেসান্ত, অ্যানি ৯৭, ১০১
বোম্বাই ৫৫, ৬১, ৮৮, ৯৪, ১০৪
ব্যষ্টির মহত্ত্ব ৯২
ব্যারাকপুর ৭৯
ব্রাহ্মসমাজ ৯৮
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নেভিগেশন কোম্পানী ১০৪
ব্রিটেন ৫৭
ব্রহ্মদেশ ৮৮
ব্রুয়ার ১২৯
ব্লুম ১১৫
ব্লেক, টম পেন ২৭

ভগবানপুর ৮৫
ভাদুড়ী, সুকুমার ১০৬
ভদ্রাবতী ৫৫
ভাববাদ ২৬, ২৯
ভাববাদী অদ্বৈতবাদ ২৫
ভাববাদী অস্তিত্ববাদ ১৪১
ভাববাদী সম্প্রদায় ২৪, ৪৪
'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ৮৮
'ভারত সরকার আইন' ৬৫, ৬৯, ১০১
'ভারতী' ৯৬, ৯৭, ১০৫
'ভারতের অন্তর-পুরুষের জাগরণ' ৯২
ভাসেরমান, য়্যাকপ্ ১২৪, ১২৭, ১৩৮
ভিক্টর হিউগো ৪৮
ভিক্টোরীয় যুগ ৪৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১৪২
ভিয়েনা ১২৮, ১৩৩
ভেরফেল, ফ্রান্ৎস ১২৪, ১২৭
ভ্যালেন্সিয়া ১২৬

মগ্ন চৈতন্য ১৩১
মজফ্‌ফরপুর ৮৩
মজুমদার, মোহিতলাল ১০৬, ১০৮, ১০৯
মজুমদার, রমেশচন্দ্র ৬২
মধ্যপ্রদেশ ৮৬
মন ২৫, ৩৩, ৩৬
মনসুরউদ্দীন মহম্মদ ১০৭
'মনের আগুন' ১০৮
মম্‌, সমারসেট ১৪৪
'মরুতৃষ্ণা' ১০৬
মর্লি-মিন্টো সংস্কার ৮৫
মল্লিক, সুবোধ ৮১'
মহরম ৬৭
মহারাষ্ট্র ৮১
মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০
মহিষাদল ৮৫
'মাৎসুয়্যামার আর্শি ১০৭
'মাদার' ১১৭, ১৪৩
মাদেলিন ১২৮
মাদ্রাজ ৮৬, ৯৮. ১০২, ১০৪
মাধব ৭১
'মানবতা' ১০৭
মানিকতলা ৮৩, ৮৪
'মানুষ যখন একা থাকে' ১০৮
মারিয়াক, ফ্রাঁসোয়া ১১৩, ১২৬
মারিয়ান ১১৫
মার্কস্‌, কার্ল ৩৪, ৩৭
মার্কস্‌বাদ ২৫, ৩৪, ৩৭, ৯৪. ৯৬, ১৪১,
১৪২, ১৪৩
মার্কিন ১১৮
মার্লি-মিন্টো সংস্কার ৬৬
মার্সেল, গ্যাব্রিয়েল ১৪১
মালব্য, মদনমোহন ৬৮
মালয় ৮৮
মালাবার উপকূল ৬৬
মাল্‌রো ১৪২
মালার্মে ১৩৬
ম্যাক্‌সিম গোর্কী ১০৮
ম্যাক্সব্রেড ১৩৮
ম্যাঞ্চেস্টার ৫১
মান্‌, টমাস ১০৮, ১১৪, ১২৪, ১২৫,
১২৭, ১৩৮
ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ১২৯
মিখাইল শোলোকভ ১১৭, ১৪৩
'মিত্র ও ঘোষ' ৯২
মিত্র, কৃষ্ণকুমার ৮১
মিত্র, প্রেমেন্দ্র ৫০, ১১২
মিন্টো ৬৬
মিসেস্‌ ডল্‌ওয়ে ১৩৫
'মীনকেতন' ১০৭
মুকুন্দদাস ৮১
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ১০০
মুখোপাধ্যায়, গিরিজা ১০৭
মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ ৮৪
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল ৬৪, ৭৬, ৭৭
মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ ৫০, ১০৮, ১২২
মুখোপাধ্যায়. সতীশচন্দ্র ৯৭
মুদালিয়ার, এ. রামস্বামী ১০২
মুসলিম লীগ ৫৭, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৮৫,
৮৭
মুরারিপুকুর ৮৩
'মৃত্যুঞ্জয়ী' ১০৮
মেকলে ৫২
মেদিনীপুর ৬৩, ৭৯, ৮৩, ৮৪, ১০২
মেয়ের ১২৩

মেরিডিথ ১২৬
মেলরস ১২৮
'মেস' ১০০
মোপলা ৬৬
মোপাসাঁ ১০৬, ১২২
মোস্তানা ১২৬

যাদবপুর কলেজ অফ টেকনোলজি এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৮১, ৯৭
যাদব, মাধব রাও ৮২
যান্ত্রিক জড়বাদ ৩১, ৩২, ৩৪, ৪০
যুক্তরাজ্য ৬১
'যুগান্তর' ৮২, ৮৩
'যোগ' ৯১
যোশী, এন এম. ১০৩
য়ুং ১৩৩
য়ুরোপ

রংপুর ৭৯
রজনীকান্ত ৮১
রবীন্দ্রনাথ ২৭, ২৮, ২৯, ৪৩, ৪৭, ৪৮
৮১, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ১১০, ১১৭,
১১৯, ১২০, ১৩৬
রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ১১০, ১১৯
রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভী ৮৮
'রলাঁ ও তরুণ বাংলা' ১০৬
রলাঁ, রোম্যাঁ ১০৬, ১১৩, ১১৬ ১২৭
রসুল, আবদুল ৬৬, ৮১
রাইটার্স বিল্ডিংস্ ৮৫
রাওলপিণ্ডি ৬৭
রাওলাট আইন ৮৬
রাজকোট ৯৮
রাজরাজেশ্বরী যাত্রা ৬৭
রামকৃষ্ণ মিশন ৯৮
রামমোহন ৯৯
রামমোহন লাইব্রেরী ৯৫
রামানন্দ ৭১
রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৮১
রায়, তারানাথ ১০৭
'রায়তের কথা' ৯৭
রায়, লালা লাজপৎ ৭৬, ৮০, ৮১, ৯৪,
১০৩, ১০৪
রায়, সুবোধ ১০৮
রাশিয়া ৯৪, ১১৭, ১১৮, ১৪৩
'রাশিয়ার চিঠি' ৯৪
রাসেল, বার্ট্রাণ্ড্ ৭৪, ৯৬
রাস্কিন ৯২
রিচার্ড্সন্, ডরোথি ১৩৪, ১৩৫
'রিয়েলিজ্ম্' ১২০
রিয়োসাই, আজুমী ১০৭
রিফড়া ৫৫
রুথ এইচ. ভি. ১১১
রুশ ১১৭, ১১৮, ১৪০, ১৪২
রুশ-জাপান যুদ্ধ ৮২
'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙ্গালী' ১০৭
রেঙ্গুন ১০৪
রেমণ্ট্, ব্লাডিশলাশ ১০৭
রোলাঁ, জুল ১১৬, ১২৭

লণ্ডন ৬৮, ৯০, ১০১
'লণ্ডন মার্কারি' ১০৭
লবণ কর ৭৯
লবণ আইন অমান্য ৮৭
লায়েন্স, পেথিক্ ৭০, ১২৮, ১৩৪
লাহোর অধিবেশন ৬৯, ৮৭
'লিওনিদ্ আন্দ্রিভ' ১০৭, ১০৮

লিণ্ডসে, জ্যাক্ ১৪২
লিনলিথ্গাও ৬৯, ৮৭
লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয় ১০০
লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লি ৫৮
লেডিঅফ্ শ্যালট্ ১০৯
লেডি চ্যাটার্লি ১২৮
লেডি চ্যাটার্লির লাভার ১২৮
লেবার পার্টি ৭০, ৮৮
লেনিন ৩০, ৩৩, ৩৬
লোকায়ত জড়বাদ ৩০

শঙ্কর ২৮
শরৎচন্দ্র ৪৭, ৪৮, ১১০
শলোকভ, মিখাইল ১১৭, ১৪৩
শান্তাদেবী ১০৬, ১০৭
শান্তিপুর ৫১
শারকো, জাঁ ১২৯
শাসমল, বীরেন্দ্র ৮৫
শাস্ত্রী, শিবনাথ ৮১
শিক্ষার মিলন ২৯
শিলার ৩৮, ৩৯
শেক্স্পীয়র ১২৮
শেলি ২৭
শেলির জীবনী ১০৮
'শেষ পাণ্ডুলিপি' ৫০
শৈলজানন্দ ৫০
শ্যালট বাসিনী ১০৯

'সংগ্রহ' ১০৮
সংজ্ঞান ১৩১
সংযুক্ত প্রদেশ ৯৮
'সঞ্জীবনী' ৮২
সতীদাহ ৯৯
সত্যাগ্রহ ৮৬, ৮৭
সন্তান বিদ্রোহ ৭৯
সন্ত্রাসবাদ ৮৩
'সন্ধ্যা' ৮২
'সন্ন্যাসী' ১০৭
সন্স্ এণ্ড লাভার্স্ ১২৮
সপ্রু কমিটি ৫৯
সফোক্লিস ১২৮
সমবায় সাহিত্য ২২
'সমাজতন্ত্রবাদ' ৯৬
সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি
১০০, ১০১
সর্বোদয ৯৪
'সর্ব্বনাশ' ১০৮
সাইমন কমিশন ৬৮, ৮৬, ৮৭
সাউদি ২৭
সাঁওতাল বিদ্রোহ ৭৯
সাক্টী ৫৫
'সাড়া' ৫০
'সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তাহার' ৯৬
সান্যাল গোপাল ৯৬
'সাহিত্যজিজ্ঞাসায রবীন্দ্রনাথ' ৩৯
সার্ত্র ১১৬, ১২৬, ১৪১, ১৪৫
সিংহ, মোহন ৮৪
সিঙ্গাপুর ৮৮
সিন্ক্লেয়ার, মে ১৩৫
সিপাহী বিদ্রোহ ৭৯
(শ্রী)সীঙ্গবেলু ৯৫
সুইজারল্যাণ্ড্ ১২৩
সুপার ইগো ১৩০
সুভদ্রা কুমারী ১০২
সুররিয়েলিজম্ ১৩৮, ১৪০
সুরাট কংগ্রেস ৮২

সুরাবর্দি ৬৩, ৭০
সুরেন্দ্রনাথ ১০০, ১০১
সৃষ্টিচৈতন্য ২১, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৩
সেতেম্ব্রিনি ১৩৯
সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার ১০৭, ১২২
সেনগুপ্ত, বিজয়১০৬
সেন, দেবেন্দ্রনাথ ১৩৭
সেন, সুকুমার ১০৫
সেন, সুশীল ৮৩
সেন, সূর্য ৮৪, ৮৫
'সেল্মা ল্যাগার্লফ' ১০৭
সোজাসুজি আন্দোলন ৭০
সোয়ানেস ১১৪
সোলাপুর ১০৪
স্টিভেন্স ১০২
স্বদেশী আন্দোলন ৮১
স্বরাজ ৮১, ৮২
স্বরাজ্য পার্টি ৮৩
স্বর্ণময়ী দেবী ১০০
'স্বামী' ১০০
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৬৮

হরিজন ৮৮
হরিজন আন্দোলন ৭১, ৯২
'হরিজন' পত্রিকা ৮৮
হল্, ক্যাল্ভিন, এস ১২৯
হল্, ডক্টর স্ট্যানলি ১৩১
হল্যাণ্ড ৫৭
হাওড়া জেলা ৫৬, ৮৪
হাক্স্লি অলডাস্ ১১৫, ১২৬, ১৪৪
হাঙ্গেরি ১০৬
হাজরা, মাতঙ্গিনী ৮৫, ১০২
হাফেজ ১০৮
হার্ডিঞ্জ লর্ড ৮৪
হান্স্ ১৩৯
'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ১২৫
হিউগো, ভিক্টর ৪৮
হিটলার ১২৪
'হিতবাদী' ৮২
হিন্দু মহাসভা ৬৭
হুগলী ৭৯
হেগেল ২৮, ২৯
হেওার্স্ন, মিরিয়াম ১৩৫
হেসে, হেরমান ১২৭
হোসেন, খান্ বাহাদুর পিরজাদা মুহম্মদ ৬৮
হোসেন, লিকায়ৎ ৬৬, ৮১
হ্যামলেট ১২৮

Absolute Idea ২৮
A Case of Hysteria ১২৯
Adler ১৩২
'A History of French Literature' ১৩৯, ১৪১
'A Kiss for the Leper ১১৩
'A La recherche du temps perdu ১৩৪
Aligarh Anglo-oriental College ৬৬
Aligarh Muslim University ৬৭
All India College Students' Conference ৭৬
All India Depressed Classes Conference ১০৩
All India Economic Conference ৬৪
All India Muslim League ৬৮
All India Non-Brahmin Conference ১০২
All India Socialist Youth Congress ৯৫

All India Trade Union Congress ৫৯, ৯৪, ১০৩, ১০৪
All India Women's Conference ১০১
Amendment of Workmen's Compensation Act ১০৪
America ১৩৮
'Amerika' ১৩৮
'An Advanced History of India' ৫৬, ৯৮
An Analysis in Sociological Bulletin ৭৪
'An Autobiography' ৬৪
'And Quiet Flows the Don' ১৪৩
An Introduction to Hegel ২৭, ২৮
'An Introduction to Social Psychology' ২২
'Anti-Durhing' ৩৮
Apollinaire, Guillanme ১৪০
'A Primer of Freudian Psychology' ১২৯
A rebours ১২৩
Aristotle ৩৫
'Art and Society' ২৩
Aurobindo (Sri) ২৯, ৮০, ৯২, ১১২
Auvergne ১২৫

Barkeley,George Bishop ২৬
Baroja, Pio ১২৬
Barrie, J.M. ১০৬
Basler, R.P. ১৩৩
Beckett ১৪১
'Bel-Ami' ১২২
Belgaum ১০২
'Bella' ১৩৭
Benedict, Dr. Ruth ৪৪
Bengal Legislative Council ৬২
Berdyayev ১৪০
Bergal, J.D. ৩৭
Bergler, Dr. Edmund ১৩৩
'Betrayed Spring' ১৪২
Bombay ৬৪
Bosco, Henry ১২৫
Bourges, Ele'mir ১৩৬
Bourget, Paul ১৩৬
'Bouvard et Pecuchet' ১২১
Braque, Picasso ১৪০
'Brave New World' ১১৫, ১২৬
Breton ১৩৭, ১৪০
Breuer ১২৯
Brittany ১৩৭
Burgess E.W. ৭৫
Byron ২৭

Caballero, Fer nan ১২৬
Cabinet Mission ৭০
Calcutta Gazgette ৬৭
Calvinism ৩১
Camus, Albert ১৪১
Capitalist System ৯৫
Cartesian ২৮
'Caspar Hauser' ১২৭
Caudwell, Christopher ৩৭
Cayrol, Jean ১৪২
Cazamian, L. ১২১, ১৩৯, ১৪০, ১৪১
Cecilia Boehl von Faber ১২৬
Cevennes ১২৫

Champfleury ১২০
Chamson, Andre ১২৫
Charcot, Jean ১২৯
Chronicle novel ১১৬
'Chronique des Pasquier' ১১৭
Clamence, Jean Baptise Colette ১৩৭
Collected works ৩৩
Colline ১২৫
'Columbia Dictionary of Modern European Literature' ১০৯
Communal representation
Companionship family ৭৫
Comte, Auguste ১২০
'Concept of Dread ১৪০
Congress ৭৯
Conscious ১৩১
Consciousness
Constituent Assmbly ৬৯, ৭০
Contemporary Social Problems in India ৭৪
Council of State ৫৯
Creative consciousness ২১
C. R. Formula ৬৯
Critique of Political Economy ৩৪
Culture and Society 1780-1950 ২৭, ৩৪

'Dada' ১৩৯
'Dadaism' ১৩৯
'Dadaists' ১৩৮
'Das Schloss' ১৩৮
Daubdet ১২১
Deccan Education Society ৯৮
'De l' intelligence' ১২১
Derain ১৪০
'Der Prozess' ১৩৮
Der Tod in Venedig ১২৪
Der Zaberberg ১৩৯
'Der Zauberberg' ১২৪
Desai I.P. ৭৪
Descrates ২৫
Dialectical Materialism ৩১
Die Epigonen ১২৩
Direct Action ৭০
'Dominique' ১২৩
Duhamel ১১৭, ১১৮
Dujardin ১৩৫
Dutta Gupta, Bela ৭৪
Dutta, Dr. K. K. ৫৬
Dutt, Dr. Ramesh Chandra ৫২

Economic History of India ৫২, ৫৩
Economic History of India 1857-1956 ৫৭
Ednond ১২১
Educational Congrss ৬৬
Ego ১৩০
Eliot, T.S. ৪২, ৭৮
Engels ৩৬, ৩৮, ৯৫
England ৯৭
English Literature & Ideas in 20th century ৪৯, ১১০
En route ১২৩
Estang, Luo ১৪২
Eugene Fromentin ১২৩

Existentialism ১৪০
Expressionist ১২৪

'Fear and Trembling' ১৪০
Federal Assembly ১০১
Federal council of state ১০১
Feudal System ৯৫
Flaubert, Gustave ১২০
Fondane ১৪০
Foreconscious ১৩২
'Fort comme la, mort' ১২২
Freud ১৩১,' ১৩২
Freudianism and the Literary Mind' ১৩৩
'Friends in Love' ১০৬
Fros ১৩১
Fournier, Alain ১৩৬
'Fundamentals of Marxism-Leninism' ৩২
Further Studies in Dying Culture ৩৭
Galiano, Juan Valeray Alcala ১২৬
Gandhi, M. K. ৯৩
Gautier ১৪০
George Bishop Barkeley ২৬
'Germinal' ১২২
Gide, Andre ১৩৭
Giono, Jean ১২৫
Giraudoux, Jean ১৩৭
'Govt. of India Bill' ১০১
Grenier ১৪০
Great ideal

Hailey William Malcolm ৬২
Halfman, F J. ১৩৩

Hall C.S. ১২৯
Hamlet ১১২
Hamlet and Oedipus ১৩২
Hans Castrop ১২৪
Harijan ৯৩, ৯৪
Hegel ২৮
Historical Laws ৩১
Historical Materialism ৩১
History of Education in India ৯৭
Holback ৩১
How the steel was Tempered ১৪০, ১৪৩
Husserl ১৪০
Huysman, Joris-karl ১২৩

Id ১৩০
Idealistic monism ২৫
Immermann, Karl Lebrecht ১২৩
Inclan, Ramon Maria Del Valle ১২৬
Indian Annual Register ৫৯, ৬০, ৬২, ৭৬, ৮০
Indian Communists Conference ৯৫
Indian Factories Act. ১০৪
Indian Home Rule ৯৫
Indian Mines Act. ১০৪
Indian Quarterly Register ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৯৬, ১০৩
Industrialisation ৫৪
Nihilism ১৪২
Intellectual novel ১৪৬
International Labour Bureau ১১৩
International Labour Conference ১০৩

'(The) Interpretation of Dream' ১২৯
In the steeppes' ১০৮
Institutional family ৭৫
Iyenger, A Rangaswami ৫৮

Jacques Vingtras ১২১
Jamia Millia Islamia ৯৮
Jean ১৩৬
Jean Baptise clamence ১২৭
Jérome ১৩৬
Jevivrai l'amour des autres ১৪২
Joint Select Committee ১০১
Jones, Ernest ১৩২
Joshi, R C 'Towards National Self-Sufficiency' in Historical and Economic Studies ৫৪
Joyce ১২৫
Jules ১২১
Jung ১২২

Karl Marx ৩৪
Kafka, Franz ১২৭
Karve, D G ৫৮
Kierkegaard, Soeren ১৪০, ১৪১ ১৪২
Keller Gottfried ১২৩

'La-bas' ১২৩
'La-cathedrale' ১২৩
La condesa Emilio Pardo Bazan ১২৬
'Lady Chatterley's Lover' ১২৮
La Fetearabe' ১৩৬
'La mort dans l'ame' ১৪১
'La Porte etroite' ১৩৭
'La Rose de Saron' ১৩৭
'La Symphonie pastorale' ১৩৭
'La Tragedie de Ravaillac' ১৩৬
'La Vagavonde' ১৩৭
'L' Education sentimentale' ১২১
'Le Mas Theotime' ১২৫
Lenin ৩০, ৩৩
L 'Entrave' ১৩৭
'Les Caves du Vatican' ১৩৭
L 'Envers du music-hall' ১৩৭
'Les Faux-monnayeurs' ১৩৭
'Les Hommes de bonne votonte' ১১৭, ১১৮
'Les Lauricras sont coups' ১৩৫
Les monches ১৪১
Les Socurs vatard ১২৩
'Les Vrilles de la Vigne ১৩৭
L' Homme a lu beche ১২৫
'Les Silences du Colonel Bramble ১১৮
Letters de mon moulin ১২১
Libido ১২১
Limaye P M ৫২, ৫৯
'L' Immoraliste ১৩৭
Lloyd, Sir George ৬১
Lionel, Trilling ৩৫
Locke H J ৭৫
'L' Ombre de la croix ১৩৬
Loti ১৩৬, ১৩৭
Lucas ১২২

Maciver, R M. ৪৩
Macquart, Rougon ১২২
'Madame Bovary' ১২১
'Magic Mountain' ১২৪, ১২৭, ১৩৯

Mahomedan-Anglo-Oriental College ৬৭
Mallarme ১৩৬
'Manifesto du surre' alisme' ১৪০
Manifesto of the Communist Party ৯৬
Mann, Thomas ১২৪
'Marakech on les seigeurs de l' Atlas' ১৫৭
Marcel, Gabriel ১৪১, ১৪২
Martin Salander ১২৩
Marxist thesis of history ৩২
Materialistic monism ২৫
Materialism and Empirio-Criticism ৩০
Maupassant, Guy de ১২২
Mauriac, Francois ১১৭
Maurois, Andre ১১৭, ১১৮
Mazumder, Dr R. C. ৫৬
Mazumder, Dr. Ramesh Ch. and others ৯৮
Mel Dougal, William ২২, ৪২
Mechanical Meterialism ৩১
'Metamorphosis' ১৩৮
Meyer ১২৩
Mikszath, Koloman ১০৬
Mitsou ১৩৭
Moderate
'Modern Fiction' ১৩৬, ১৪৩
Modern Quartertly ৩৭
Mohommedan Anglo-oriental defence
Association of upper India-৬৬
'Mon frere yves' ১৩৭
Moreas, Jean ১৩৬
Morgan, Bayard a
Mrs. Dolloway ১৩৪
Muenchhause ১২৩
Mukherjee, Dr. Radhakamal ৫৩
Mure, G. R. G. ২৭, ২৮

Naoroji, Dadabhai ৮০
National College ৯৮
National Muslim University ৯৮
Naturalism ১১৯
Nehru, Jawharlal ৬৪
Neo-Idealism ১৩৬
Nietzsche ১৪০
Nurullah, Syed and Naik J. P. ৯৭

Objective Idealism ২৬, ৪০
Oedipus Complex ১২৮
'Ordeal' ১১৮
'Orestes' ১৪১
'Origin of the Species' ১১৯, ১২৯
'Origin of the Family' ৯৫

Page, Charls H. ৪৩
Patterns of Culture ৪৪
Payment of wages Act. ১০৪
Pecheur d' Island' ১৩৭
Pereda, Jose Maria de ১২৬
Pierre-et Jean' ১২২
Pierre Loti ১৩৭
'Pilgrimage' ১৩৫
Plato ১১২
Pleasure principle ১৩০
'Poetics' ৩৫

'Point Counter Point' ১২৬
'Pointed Roofs' ১৩৪
Pourrat, Henre ১২৫
Poverty and Population in India ৫৮
Prevost, Mercel ১০৭
Primary process ১৩০
Primitive Communal System ৯৪
Principles of Psychology
Proust ১২৫, ১৩৪
Provence ১২৫

Quand Israel est roi' ১৩৬

Rabat on les heures morocaines ১৩৬
Ray chaudhuri, Dr. H. C. ৫৬
Read, Herbert ২৩
'Realisme' ১২০
'Remembrance of the Things Past' ১১৫
Report of the Femine Enquiry Committee ৬৩
Report on All India Muslim League Conference ৬৮
Report on Bengal Legislative Council ৬২
Republic ১১২
Republican Congress ১০২
Dr Rieux ১১৭
'Roads to Freedom' ১১৬
Romains, Jules ১১৭, ১১৮
Rougon Macgast ১২২
Routh, H. V. ১১০, ১১১
'Roux le bandit' ১২৫
Rumanian ১৪০
Russel, Brain ৩৩

'Salavin' ১১৬, ১১৭
Salerno, Masuccio ১০৬
Sapru Committee ৫৯
Satre, Jean Paul ১৪১
'Second Manifeste du surrealisme' ১৪০
Selected correspondence ৩৬
Sengupta Dr. S.C. ৩৯
Senne ১৪০
Sept dialogues de betes ১৩৭
'Sept manifestes Dada' ১৪০
Seventh Indian Economic Conference ৬১
Sex, Symbolism and Psychology in Literature ১৩৩
Shakespeare ১১২
Shabber & Shoben ১৩১
Shestov ১৪০
Singaravelu ৯৫
Singh, Dr. V.B. ৫৭
Sitaramayya, Dr Pattabhi ৯৮
Slave System ৯৪
Smith, Horatio ১০৯
Socialist System ৯৫
Social Psychology ৪২
Society for the Promotion of National Education in Bengal 97
Sollund Haben ১২৩
Some Reflections on Genius and other Essays ৩৩
Southey ২৭

Star of the unborn ১২৭
Stern der Ungeborenen ১২৭
Stream of consciousness ১৩৪
Sub-conscious ১৩১
Subjective Idealism ৪০
Subjectivism ১৩৪
Sublimity ৮৯
Super Ego ১৩০
Superman ৯১
'Surrealiste' ১৪০
Surrealism ১২৪, ১৩৮
'Suzanne et le Pacifique' ১৩৭
'Swann's Way' ১৩৫
Switzesland ১৩৯
Symbolism ১৩৫
'Symposium' ১১২

Tagpre, Rabindranath ৪৩
Taime, Hippolyte ১২১, ১২২
'The Art of Bernard Shaw' ৩৯
The Blank Monk ১০৭
The Castle ১৩৮
The Century was young ১৪২
The Communists ১৪২
The Conquerors ১৪২
The Counter Feiters ১১৬
The Demon Lover ১৩৩
The Desert of Love ১১৩
The Duel ১২৫
The Enemy ১১৩
The Fall ১২৭
'The Fall of Paris' ১১৮
The Family ৭৫
The Immoralist ১২৮
The Interpretation of Dream ১২৯, ১৩২
The Joint Family in India–An Analysis ৭৪
The Liberal Imagination ৩৫
'The Libe Divine' ২৯, ৯১, ৯২, ১১২
The Man of Good will ১১৬
The Outsider ১১৬, ১৪২
The Plague ১১৬, ১৪২, ১৪৪
The Problem of Unemployment in Historical and Economic Studies ৫২, ৫৯
The Psychopathology of Adjustment ১৩১
The Psychopathology of Every day Life ১২৯
'The Religion of an Artist' ৪৩
The Rising Tide ১৪২
The Storm ১১৮
The Train ১১৮
The Trail ১৩৮
The Unvanguished ১১৮
The waves ১৩৫, ১৪৩
The way of All Flesh ১১৪
The Writer and Plychoanalysis ১৩৩
Three Essays on Sexuality ১২৯
Tonio Kroeger ১২৪
Trans ১২৪
Treatise Concerning the Principles of Human Knowledege ২৬

Tristan ১২৪
Tristan Tzara ১৪০
Two Notion Theory ৬৯
Unconscious ১৩১, ১৩২
Unevie ১২২
United Patriotic Association ৬৬
Untermann, E. ১৯৫

Valdes, Armando Palacio ১২৬
Vicente Blasco Ibanez ১২৬
'Vie des martyrs' ১১৮
Viereck, George Sylvester ১০৬, ১০৮
Viaude, Julien ১৬৭
'Virgen Soil Upturned' ১৪৩
Visveswarayya, Sir M. ৬১

Wassermann, Jakob ১২৭, ১৩৮
Warfell, Franz ১২৭
'Werke' (Hegel), Sechster Band, ২৮
Williams, Raymond ২৭, ৩৪
'Wit and its relation to the Unconscious' ১২৯
Woolf, Virginia ১৩৬, ১৪৩
Workmen's Compresation Act ১০৪
'Yama the Pit' ১১৮
'Young India' ৯৩

Zola Émile ১০৫, ১২১
Zurich ১৩৯

একটি উদ্ধৃতি :

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

"যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।. .

* * *

অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগেব বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজেই পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না, অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।" —**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

দ্বিতীয় পর্ব
বিবিধ প্রসঙ্গ

ক. প্রসঙ্গ : বাংলা সাহিত্য

১. বাংলার নবজাগরণে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র

মানুষ একটি জীবন্ত সত্তা। জীবন্ত সত্তার বৈশিষ্ট্য হল যে, তার পারিপার্শ্বিক থেকে প্রাণরস আহরণ করে সে নিজেকে পুষ্ট করে তোলে। ক্রমে সে যতই প্রাণের জোয়ারে কানায়-কানায় ভরে ওঠে ততই সে আর নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। সে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, প্রবাহিত করে দেয় বিশেষ-বিশেষ খাতে— অর্থাৎ বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আসে গতি। গতি এসে তাকে যতই সচল করে দেয় ততই সে যেন নতুনতর পরিবেশে নিজেকে দেখতে পায়—তার প্রবাহের মূল থেকে যেমন নানা শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে যায় তেমনি তাতে এসে মিলিত হয় নানা বাইরের স্রোত। এসবই তার পরিপুষ্টিতে সহায়তা করে। এ সত্য যেমন জীবন্ত সত্তা মানুষের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি মানুষের সৃষ্টি যে সাহিত্যসংস্কৃতির ধারা তার ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য।

কৃষ্টির প্রবাহকে আমরা প্রাণেরই একটি নদীপ্রবাহ বলতে পারি। এই নদীর দুই ধারে যে কূল এই নিয়ে তার জাতীয়তার গণ্ডি। বিশেষ-বিশেষ দেশের বা জাতির যে কৃষ্টি তার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয় এই কূল-চিহ্ন থেকেই। এই কূলটি কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য নয়। নদীর দুপাশের এই কূল ভেঙ্গে কখনো-কখনো তা থেকে শাখা নদী বেরিয়ে যায়, কখনো বা অন্য নদী থেকে বেরিয়ে আসা স্রোত তাতে উপনদী হিসাবে যোগ দেয়। কৃষ্টির নদীতে যখন এমনি কোন উপনদী এসে মিলিত হয় তখনই আমরা তাকে বলি বিদেশী প্রভাব।

বাংলা সাহিত্যের নদীপ্রবাহেও এমনি যুগে-যুগে এসে মিলিত হয়েছে বিদেশীর কৃষ্টিস্রোত। বলা যেতে পারে তার জন্ম ইতিহাসই এরকম অনেক স্রোতের মিশ্রণে রচিত। উত্তর ভারতের অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালীর মধ্যে মূল আর্য রক্তস্রোত অনেক কম— দ্রাবিড় এবং বিশেষ করে অস্ট্রিক মিশ্রণই বেশি। এই মিশ্র রূপে গঠিত বলেই বোধ হয় বাঙালীর চিত্ত সহজেই বিদেশী প্রভাবের আনুগত্য স্বীকার করে। আজো বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী তরুণদের যোগ যত বেশি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তরুণদের ক্ষেত্রে ততটা দেখি না। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগসূত্রেই নব্যভারতের অভ্যুত্থান এবং এই পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণে অগ্রণী হয়েছে বাঙালীই। এর সুফল কুফল দুই আছে। কিন্তু সে বিবেচনায় না গিয়ে মনে করবো বাঙালী যেমন মীরজাফরি বৃত্তি করে ইংরাজকে ডেকে এনেছে, তেমনি বাংলার পুরুষ রামমোহনই পাশ্চাত্যের জীবনদৃষ্টির নবজীবনের দীক্ষা দিয়ে সারা ভারতবর্ষে নবযুগ সূচিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই পাশ্চাত্য প্রভাবটি বিশ্লেষণ করে দেখার একটি বিশেষ নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে এই প্রভাবের প্রকৃতি দ্বিবিধ—(১) সাধারণ বা সামগ্রিক প্রভাব (২) বিশেষ প্রভাব।

এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, যেদিন থেকে বাংলার জীবনধারার সঙ্গে পশ্চিমের জাতিগুলির যোগাযোগ সূচিত হয়, সেদিন থেকেই

অল্পে-অল্পে আমাদের ভাবভাবনা ও সৃষ্টির উপরে সাধারণ প্রভাব পড়তে থাকে। অষ্টাদশ শতক থেকেই পশ্চিমের দুই-একটি জাতি বাংলা দেশে পদার্পণ করতে থাকে। এদের মধ্যে প্রধান হল পর্তুগীজ ও ইংরাজ এবং অপ্রধান হলো ফরাসী। প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এদেশে এলেও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের যুগ্ম কর্মপদ্ধতি তারা রূপায়িত করতে থাকে। তারপরে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে যখন 'বণিকের মানদণ্ড' রাজদণ্ডে বপান্তরিত হল তখনই বাংলার জীবনধারার আমূল রূপান্তরের বীজ উপ্ত হল। রাজনৈতিক বিচারে পলাশীর পরাজয় বাঙালীর জীবনে অভিশাপ হলেও, সাংস্কৃতিক বিচারে বাংলার উপরে ইংরাজের বিজয় বাঙালীর পক্ষে ছিল প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ। এরই ফলে ধর্মে, শিক্ষায়, রাজনৈতিক জীবনদৃষ্টিতে ইংরাজের প্রভাব জাতির জীবনে ব্যাপক হতে থাকে। এদেশের মনীষীবৃন্দ পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করে নবজীবনের দীক্ষা লাভ করেন। রামমোহন এঁদের মধ্যে ছিলেন নেতৃস্থানীয়। মধ্যযুগীয় জীবনধারা ছেড়ে নবজাগরণের মন্ত্রে বাঙালী উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল রামমোহনেরই প্রেরণায়। হিন্দু কলেজকে'কেন্দ্র করে ডিরোজিওর দীক্ষায় যে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী শুধু প্রাচীনকে ভাঙতে চেয়েছিল, রামমোহনের প্রচেষ্টায় তারা পাশ্চাত্যের আদর্শে একটি সংগঠনশীল নতুনের স্বপ্ন দেখল। জীনবদৃষ্টির এই যে রূপান্তর, যার ফলে জাতির জীবনে একটি সম্পূর্ণ কালান্তরই সাধিত হল, এইটিই বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক সাধারণ পাশ্চাত্য প্রভাবের নিদর্শন।

কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রভাবে জীবনদৃষ্টির এই যে পরিবর্তন, যার প্রতিফলন সাহিত্যে অপরিহার্যভাবে পড়েছে, সেই পরিবর্তনের প্রধান সূত্র কি? যদিও এই সূত্রবিশ্লেষণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার, তবু মোটামুটিভাবে বলা যায় এই কয়েকটি প্রধান সূত্র আমরা জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি—

যুক্তিবাদ (Rationalism) ঃ আমরা জানি, বাংলার মধ্যযুগীয় জীবনদৃষ্টি ছিল প্রধানত বিশ্বাসলালিত, আবেগ-চালিত। গতানুগতিক বিশ্বাসে, অলৌকিকের প্রতি আস্থায়, ধর্মীয় আবেগে জীবন ছিল আত্মতৃপ্তির খোলসে আবৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের প্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গি হল যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তবধর্মী। এযুগে এমন কি যাঁরা শাস্ত্রধর্ম আলোচনা করলেন, তাঁরাও বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করলেন অন্ধ বিশ্বাসের উপরে নয়, যুক্তি ও বিশ্লেষণের উপরে। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গালী হয়েছিল যুক্তিবাদী ও জিজ্ঞাসু।

মানবতাবাদ (Humanism) ঃ আধুনিক-পূর্ব যুগে বাংলার জীবনে ও সাহিত্যে ছিল দেববাদের প্রাধান্য। মানুষের উপরে দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানুষ যেখানে এই শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেয়নি, সেখানে দেবতা মানুষের সর্বনাশ করে তার উন্নত উদ্ধত পৌরুষকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। মনসার মত একটি 'চেং মুড়ি কানি'-দেবীও চাঁদ সদাগরের মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে পরাজিত করেছেন। দেবতার ছত্রছায়াতলে মানুষকে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলতে হত। কিন্তু আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ এসে আমাদের

চোখ খুলে দিল। মানুষ দেবতাকে সরিয়ে সাহিত্যে মানুষের আসন প্রতিষ্ঠিত করল। এর আগে মানুষের জীবন সাহিত্যে যে প্রাধান্য পায়নি, তা নয়। যেমন চৈতন্যদেবের জীবনচরিতগুলিতে আমরা মানুষকে নিয়ে, মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে কাব্য রচনা করতে দেখি। কিন্তু সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চৈতন্যদেবের মানবীয় জীবনচিত্র অল্পস্বল্প স্থান পেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেবতা বলেই—অবতার বলেই—প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সাহিত্য পুরোপুরি মানুষেরই চিত্র একেবারে প্রাধান্য পেতে দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। মধুসূদনের রাবণচরিত্রে, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মানুষের রক্তমাংসের রূপটি পরম সমবেদনার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হল। বেন্থাম-মিল-কোঁতের দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের অনেককেই প্রভাবিত করেছিল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) ঃ ফরাসী বিপ্লবের নেতা রুশোর সাম্যমৈত্রী ভ্রাতৃত্বের বাণীর সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি মন্ত্র পাশ্চাত্যে বিশেষ ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল— If I am not better than you, at least I am different from you এইখানেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বীজ নিহিত রয়েছে। এই নতুন মূল্যবোধ ইংরাজীর মাধ্যমে ঊনিশ শতকে বাংলার চিত্তেও এসে আঘাত দিল। ব্যক্তি সমাজের গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে নিজেকে পৃথক করে দেখতে শিখল। বঙ্কিমের নবকুমার বলল—'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' সমাজের জন্য ব্যক্তিহৃদয়ের আর জলাঞ্জলি নয়, ব্যক্তির নিজস্ব মহিমাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিশেষ করে 'যোগাযোগ' 'চার অধ্যায়ে' এই তত্ত্ব বিশেষভাবে রূপ পেল।

নারী-মহিমার স্বীকৃতি ঃ ব্যক্তির মহিমা স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নারীজীবনকে সমাজের বেদীতে বলি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হল—রামমোহনের সতীদাহ প্রথা রোধে, বহুবিবাহরোধে, বিদ্যাসাগরের ক. বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে, ও নারী শিক্ষা প্রচারে। পাশ্চাত্যের নারী-সমাজ অনেক আগে থেকেই স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন লাভ করেছিল। ঊনিশ শতকে বাঙ্গালী যখন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হল, তখন তার কাছ থেকে নারী-মহিমার এই স্বীকৃতও শিখল। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা থেকে রবীন্দ্রনাথের কুমু ও শরৎচন্দ্রের অনেক নারী চরিত্রেই এই পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট।

স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেম ঃ ভারতবর্ষে জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করা হলেও আধুনিক কালে আমরা যাকে Patriotism ও Nationalism বলি তাও আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকেই শিখেছি। দেশকে শুধু ভালবাসা নয়, তাকে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক একক রূপে উপলব্ধি করা এবং তার স্বাধীনতার জন্যে সচেষ্ট হওয়া, এই বোধটি যে আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে পেয়েছি তা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিতেই পাই। তাই এদেশে পাশ্চাত্য প্রভাব আসার আগে কেউ বলতে পারেন নি—

'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?'

ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রে এই যে অভিনবত্ব এসবই সাহিত্যে ও জীবনদর্শনে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। এবং জীবনদর্শনে যেমন পাশ্চাত্যের প্রভাব এল তখন স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যের রূপবন্ধে এবং শিল্পরূপেও পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখা দিল। রূপবন্ধ ও শিল্পরূপের দিক থেকে এই কয়েকটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

গদ্যসাহিত্য ঃ সাহিত্যের রূপবন্ধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে অভিনবত্বের জন্ম হল, তা হল গদ্যসাহিত্য। ইউরোপীয়রাই এদেশে গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত করেন। এদেশে ইউরোপীয়দের আসার আগে লোকমুখে গদ্য-ভাষা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু গদ্যসাহিত্য ছিল না। প্রথমে পর্তুগীজ মিশনারীদের উদ্যোগে ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ লিখিত হল—দোমঅ্যান্তনিওর 'ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং ম্যানোয়েল-দ্য-অ্যাস্‌সুম্পসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। তারপরে ক্রমে-ক্রমে শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেল অনুবাদ ও সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেষ্টায় আইন গ্রন্থের অনুবাদ এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রভৃতি শিক্ষক-লেখকের দ্বারা গদ্যগ্রন্থ রচনা। এখানে বিদেশীর উদ্যোগ তো লক্ষণীয়ই, তা ছাড়া এক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব যেটা সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে লক্ষণীয়, তা হল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবেই গদ্যের জন্ম। কারণ গদ্য হল প্রধানত যুক্তিরই বাহন।

উত্তরকালে আমাদের দেশে গদ্যসাহিত্যের যে কয়টি শাখাপ্রশাখা গড়ে ওঠে—উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ সমালোচনা—তা সবই পাশ্চাত্যের অনুসরণেই বিকাশ লাভ করেছিল। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনা—এগুলির কোনটিরই ভারতীয় উৎস থেকে জন্ম হয়নি। নাটকের জন্মও বাংলা যাত্রা থেকে নয়, কতকটা সংস্কৃত প্রভাবে এবং অনেকটাই ইংরাজীর সচেতন অনুসরণে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তা পাশ্চাত্যের রেনেসাঁসের সমগোত্রীয় ছিল না। পাশ্চাত্যের নবজাগরণের মূলেও গ্রীস ও রোমের ক্লাসিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছিল; কিন্তু সেই নবজাগরণ শুধু গ্রীস ও রোমের চিন্তাসম্পদের বিশ্লেষণ ও স্বী-করণের (assimilation) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর ফলে সেখানে জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল তা একটা সামগ্রিক উদ্যোগ ও বিচিত্র সংগঠনমুখী প্রয়াসের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের নবজাগরণের প্রথম পর্যায়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-পর্যন্ত, সংগঠনমুখী ও সংস্কারমুখী কর্মপ্রয়াসে আলোড়িত হলেও, মূলত তাতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ও স্বী-করণের প্রয়াসই ছিল মুখ্য। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ ভবতোষ দত্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় ঃ 'আমাদের মনীষীদের প্রয়াস মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশ থেকে পাওয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্যবিশ্লেষণে এবং গ্রহণে।"[১]

অন্যভাবে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের মূলে ছিল পাশ্চাত

১। দত্ত, ডঃ ভবতোষ ঃ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৫৪

জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার প্রভাব এবং এই জীবনদর্শনই হলো আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মূল পরিচয়। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে সমগ্র পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যেও ভারতীয় জীবনদৃষ্টির সনাতন আদর্শ বর্জিত হয়নি, বরং তা নব্যরূপায়ণ লাভ করে আমাদের জীবনদৃষ্টির কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। রামমোহনের বেদান্ত ধর্মে, বঙ্কিমচন্দ্রের গীতোক্ত আদর্শে ও রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-ভাবনায় এই সনাতন আদর্শই নবরূপ লাভ করেছে; তবু বলা যায় ভারতের সনাতন আদর্শ যে পাশ্চাত্য প্রভাবে নবরূপ লাভ করেছিল সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যেই এদেশের নবজাগরণের মূল কারণটি নিহিত আছে, এবং এতেই তার প্রধান পরিচয়ও ধরা পড়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নবজাগরণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের যে প্রভাবটি ক্রিয়াশীল ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রও তাকে উদারতার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন। এই কারণে রক্ষণশীল স্বাদেশিকতা বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেননি এবং পাশ্চাত্যের প্রতি অনুরাগের বশেই বলেছিলেন : "যাহারা বিবেচনা করেন এদেশীয় পূর্ব-পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল, উহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।"[২]

মধ্যযুগের ভারতীয় চিন্তা মূলত ধর্মপ্রভাবিত এবং পরলোকমুখী ছিল। আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য প্রভাবে সেখানে দেখা দিল দেববাদ ও পরলোক সর্বস্বতা থেকে মুক্তি এবং পার্থিব জীবনের মহিমা স্বীকৃতি। এই ঐহিকতা এবং মানবিকতা যে পাশ্চাত্য থেকে গৃহীত উপাদান, সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সচেতন ছিলেন। একটি ইংরাজী রচনায় তিনি স্বীকার করেছেন— "The very idea that external life is worthy subject of the attention of a rational being, except in its connection with religion, is amongst ourselves, unmistakably of English origin."[৩]

বঙ্কিম এই ঐহিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই ইন্দ্রিয়ের বিলোপ নয়, সামঞ্জস্যকেই সুখের পথ বলে গ্রহণ করেছিলেন :

"ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধর্ম্মানুমত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুমত।" (সুখ কি?)

নবজাগরণের যুগে যে মননরীতির দ্বারা এদেশীয় যুবকেরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা ছিল হিউম্ প্রবর্তিত এম্পিরিসিজ্ম্ ও কান্ট-প্রবর্তিত র‍্যাশনালিজ্ম্। প্রথমটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও দ্বিতীয়টি যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের চর্চায় বিশ্বাসী। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই দুটি মতবাদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় অসম্ভব, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে নব্যবঙ্গের যুবকেরা একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকের মতো সমস্ত সত্যকে অভিজ্ঞতানির্ভর মনে করতেন, অন্যদিকে তেমনি যুক্তির মানদণ্ডে সমস্ত কিছুকে বিচার করতে চাইতেন। এবং যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ তাঁদের জ্ঞানসাধনার মূল দীক্ষামন্ত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও এই দীক্ষামন্ত্রে

২। বঙ্কিমচন্দ্র . শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভূমিকা।

৩। English Works The Confession of a Young Bengal

দীক্ষিত ছিলেন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যুক্তিশীল বিশ্লেষণী মনোভাবই প্রধান। তাই কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আবেদন যেখানে মূলত বোধ ও বোধির কাছে, বঙ্কিমের প্রবন্ধের আবেদন সেখানে বুদ্ধির কাছে। বঙ্কিমের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও এই কারণে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিন্যাসরীতি প্রাধান্য লাভ করেছে যদিও গভীর অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব নেই। গীতিকাব্য এবং জয়দেব ও বিদ্যাপতি বিষয়ক প্রবন্ধে সাধারণত গীতিকাব্যিক আবেগ ও সমপ্রাণতাই প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু এখানেও বৈজ্ঞানিকের যুক্তি পারম্পর্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। বিষয়টি পরিস্ফুট হবে যদি আমরা বঙ্কিমের গীতিকাব্য বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের একই বিষয়ে উল্লিখিত প্রবন্ধটির তুলনা করি। বঙ্কিমের প্রবন্ধ যেখানে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের রীতিতে লিখিত, চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধ সেখানে আবেগকম্পিত অনুভূতিময়। পাশ্চাত্য যুক্তির দ্বারা এবং কোঁতের ঐহিকতাবাদের (positivism) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মত অবতার-চরিত্রকেও যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে তাঁর মধ্যে দেবত্বের নয়, মানবত্বেরই পরমোৎকর্ষের সন্ধান করেছিলেন। পাশ্চাত্য মনীষী সীলি (Seeley, 'Ecce Homo', ১৮৬৬) তাঁর গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের মধ্যে যে মানবতার সন্ধান করেছিলেন, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। যদিও ধর্মতত্ত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের অনুশীলনতত্ত্বকে নিরীশ্বরবাদী বলে অসম্পূর্ণ বলেছেন, তবু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশ্লেষণ করলে বঙ্কিমের চিন্তায় কোম্‌তের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বরং মনে হয় "কোঁতের যুগে মানবতা সেই ধর্মের স্থান নিয়েছে।......বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতকে অনুসরণ করে ধর্ম অর্থে মানবতাকেই মোটামুটি ধরেছেন।" তাই দেবতার উপাসনায় নয়, অন্তর্নিহিত মানবিক শক্তির বিকাশের মধ্যেই ধর্মের অনুসন্ধান করেছেন ঃ

"আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম।" [বঙ্কিমচন্দ্র ঃ 'দুঃখ কি'?]

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় মননচিন্তনে তিনটি পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখা যায়—ইতিহাস চর্চা, অর্থনীতি ও রাজনীতির তত্ত্ব। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য রীতিতে গবেষণার সূত্রপাত হয়। এরপর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সদস্যারা এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতি মনীষীরা প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হয়ে স্বদেশী মনীষীর দ্বারা স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। 'বাংলার ইতিহাস', 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাংলার কলঙ্ক', 'বাংলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ,' 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বংলার ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং 'বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে তিনি ভবিষ্যৎ ইতিহাস-রচয়িতাদের জন্য সুস্পষ্ট ব্যবহারিক পথনির্দেশ দেন। বাংলার

ইতিহাস রচনার জন্যে ' কোথায় কোন্ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে' তার কথাও এই প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। যেমন ইতিহাস রচনায় তেমনি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এদেশের কৃষকদের দুরবস্থা, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী-বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই সময় বাংলার মনন-চিন্তনেই অনুরূপ বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীষীরা এদেশের জমিদার ও রায়তদের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় মনীষায় ধর্মের যান্ত্রিক অনুশাসন অবসিত হওয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ দেখা যায়। সামাজিক যান্ত্রিক শাসনকে অস্বীকার করে ব্যক্তি এগিয়ে চলছিল 'বুদ্ধির মুক্তি ও মুক্তির বুদ্ধি'তে। বঙ্কিমের প্রবন্ধে এই বুদ্ধির মুক্তিই স্বাধীন চিন্তার বিরাট সম্পদ এনে দিয়েছে। এই মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য প্রভাবকে গ্রহণ করেছেন, অথচ তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নি। জাতীয়তার দীক্ষাও তাই বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশের ইতিহাস-চর্চাও এই কারণে বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত কৌতূহল মাত্র নয়, এ হল স্বজাতির অতীত মহিমা উদ্ধার। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে এবং বাংলার ইতিহাস ও বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধে সর্বোপরি তাঁর স্বদেশ প্রীতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় পাশ্চাত্য-প্রভাবিত বঙ্কিম কখনোই পাশ্চাত্য প্রভাবের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করেননি।

২. বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি

উপন্যাসে মানবিক উপাদান জীবন থেকে এত সোজাসুজি আসে যে তার অপরিস্রুত রূপকে কোন বাঁধা ফর্মের ছাঁচে ঢালা শক্ত। একাধারে ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস-সমালোচক ছিলেন বলে ফস্টার একথা খুব ভাল করে বুঝেছিলেন। তাই তাঁকে বলতে শুনি—"The novel is not capable of as much artistic development as the drama : its humanity or the grossness of its material hinders it."[১]

উপন্যাসের ফর্মে পারিপাট্য বিধানে এই প্রতিবন্ধকতা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমই বোধহয় সবচেয়ে সার্থক ভাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। এই জন্যে অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টির তুলনায় বঙ্কিম-উপন্যাসে ফর্মের উৎকর্ষ পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। প্রশ্ন হতে পারে এক্ষেত্রে বঙ্কিমের এবংবিধ সাফল্যের কারণ কি? এর উত্তর বোধহয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র খুব বেশি মননশীল ছিলেন, তিনি জীবনভোক্তার চেয়ে বেশি জীবনদ্রষ্টা ছিলেন, মনীষী ছিলেন। ফলে জীবনানুভূতির যে আবেগ সাধারণত শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের শিল্পচেতনাকে প্রায়ই ভাসিয়ে দিয়েছে, বঙ্কিমকে তা ভাসাতে পারে নি। বঙ্কিম যেন নিজের সৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছেন। এই দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য অপরিহার্য। এ নিয়ম বিজ্ঞানেরই নিয়ম। এই জন্য আর্কিমিডিস্ পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্যে চেয়েছিলেন পৃথিবীর বাইরে একটুখানি জায়গা।

মননধর্মের আধিক্যই লেখকের মধ্যে তাঁর সৃষ্টি থেকে তাঁকে মুক্তি এনে দেয়। আজকের সাহিত্যে শিল্পী-চেতনার মুক্তির কারণও হল আজকের দিনে আমরা খুব বেশি মননশীল হয়ে উঠেছি। আমাদের এযুগের নামই দিয়েছি Age of Reason। এই যুক্তি-প্রাধান্য আবেগের উপরে অনুভূতির উপরে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। বিদগ্ধ মনীষার অধিকারী বঙ্কিমের শিল্পী মানসও এই কারণে আবেগের উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে উপন্যাসের বহিরঙ্গ প্রকরণকে নিয়ন্ত্রিত করবার অবকাশ পেয়েছে, সুপরিকল্পিত ফর্ম রচনা করতে পেরেছে। এখানে বঙ্কিম সমগ্র বাংলা উপন্যাসে অনন্য, অতুলনীয় রূপকার। অথচ ফিল্ডিং-এর উপন্যাসে অতিমাত্র আঙ্গিক সচেতনতা যেমন মাঝে মাঝে তার অনুভূতিসম্পদ সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসু করে তোলে, বঙ্কিমের উপন্যাসে ফর্ম সম্পর্কে অতিনিষ্ঠা তাঁর জীবনানুভূতি সম্পর্কে কোন সংশয় জাগায় না। সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিকল্পিত ফর্মের আধারে অকৃত্রিম জীবনরস পরিবেশনে তাঁর শিল্প-সামর্থ্য প্রশ্নাতীত। তার কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, বঙ্কিম-মানসে রোমান্টিক ও ক্লাসিক, লিরিক ও এপিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক সমন্বয় হয়েছিল। বঙ্কিমকে মোহিতলাল যে মূলত প্রেমের কবি বলেছেন তার কারণ তিনি লিরিক প্রতিভার অধিকারী। অন্যদিকে তাঁর শিল্পরূপে ক্লাসিক কবির সংযম, ফর্মের বন্ধন ও পারিপাট্য এবং বর্ণনায় রাজকীয় ঐশ্বর্য দেখা যায়। বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রধান নৈপুণ্য মূলত উপন্যাসের

১। Forster, E.M. 'Aspects of the Novel', 1927, ch. VIII

গঠনগত beauty of form কিংবা beauty of pattern। এই ফর্ম রচনার ক্ষেত্রেই বঙ্কিম বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম যুগের ঔপন্যাসিকেরা বহিরঙ্গের গঠনগত সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন। বঙ্কিমও তাই করেছেন। এখানে আধুনিক ঔপন্যাসিক থেকে বঙ্কিমের স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা বহিরঙ্গের গঠনগত সৌন্দর্য থেকে সরে এসে উপন্যাসে অন্যরকম সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মন দিয়েছেন। উপন্যাসে একটা আভ্যন্তরীণ Rhythm ও Symphony সৃষ্টি করা আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। বাহ্য গঠনের সৌন্দর্য নেই এমন নয়। ফর্স্টারের মতে মার্সেল প্রুস্ত্ এই rhythm সৃষ্টিতে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছেন এবং ফ্লবেয়ার তাঁর উপন্যাসে Symphonic effect সঞ্চারিত করেছেন। উপন্যাসে সঙ্গীতধর্ম সঞ্চারিত করার ব্যাপারে আন্দ্রে জিদ বলেছেন—"I cannot see why what was possible in music should be impossible in literature."[২] ভার্জিনিয়া উল্ফও উপন্যাসে সঙ্গীতের ধর্ম সঞ্চারিত করেছেন। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের এই ছন্দ স্পন্দন ও সঙ্গীত ভাবগত, কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের ছন্দ স্পন্দন বর্ণনাগত, ভাষাগত অর্থাৎ ধ্বনিগত

বঙ্কিম উপন্যাসের গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন panoramic নয়, analytical বা dramatic। এর ব্যাপ্তি যেমন কম, এর সংহতি তেমন বেশি। এই সংহতি ও গঠনগত পারিপাট্যের দিক থেকে বঙ্কিম জেন অস্টেন, হেনরি জেমসের সঙ্গে তুলনীয়। অন্যদিকে টলস্টয়ের Panoramic গঠন থেকে বঙ্কিমের গঠন স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। তাই দেখা যায় কাহিনীর পরিণতি লক্ষ্য করে তিনি প্রথমে কাহিনীকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করেন, তারপরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নেন। প্লট নিয়ে এতখানি পূর্বপরিকল্পনা এখন আর চোখে পড়ে না। প্লট নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র খুব নিষ্ঠাশীল শিল্পী ছিলেন। এইজন্যে কাহিনীর প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক একটি স্বতন্ত্র ইউনিট। এগুলি কাহিনীর অংশ এবং অঙ্গ আবার এর সৌন্দর্যও কম নয়। এইজন্যে বঙ্কিম প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের পৃথক-পৃথক নামকরণ করেছেন। এই সব পরিচ্ছেদের নামকরণ কখনো সাধারণ আভিধানিক, কখনো লাক্ষণিক অর্থ বহন করে। কখনো বা এসব নাম হয়েছে ব্যঞ্জনাধর্মী। এইভাবে পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ তাদের সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যকে মহিমান্বিত করে তোলে—পরিচ্ছেদগুলির গোড়ায় প্রায়ই চিরায়ত সাহিত্য থেকে-কালিদাস, শেক্স্পীয়র প্রভৃতি থেকে তিনি যে উদ্ধৃতি দেন তাতে পরিচ্ছেদগুলির অলঙ্করণ ও ভাবপুষ্টি সাধিত হয়। অলঙ্করণের ক্ষেত্রে বঙ্কিম যেন মহাকাব্যের কবির পথ অনুসরণ করেন। শিল্পে বৈধব্যবেশ বঙ্কিম প্রতিভার কাছে অসহ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যেসব রোমান্স্ রচনা করেছেন সেগুলির প্লটে অতিনাটকীয়তা এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক রোমান্সের এ হল অন্যতম

২। Andre Gide Les Faux Monnayeurs, 1925, pt II, Ch III, trans Dorothy Bussy-*1959*

বৈশিষ্ট্য। এর সাহায্যে লেখক গল্পভুক্ পাঠকের জন্য চমক সৃষ্টি করেন। যেসব পাঠক চিন্তা চায় না, গভীরতর জীবনজিজ্ঞাসা চায় না তারা কাহিনীকেই প্রধানভাবে উপভোগ করে। কিন্তু কাহিনী থেকে জীবনজিজ্ঞাসা বাদ দিয়ে দিলে কাহিনী হয়ে যায় পান্‌সে। তখন সেই কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে তার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত ও চমক সৃষ্টি করতে হয়, নয়তো কাহিনীর একঘেয়েমি বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের স্রষ্টা। বাঙালী পাঠকের কাছে উপন্যাসের স্বীকৃতি তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। এবং তখন কাব্যের, বিশেষত মহাকাব্যের রসে শিক্ষিত বাঙালী-চিত্ত পরিষিক্ত। সুতরাং উপন্যাসকে জনচিত্তের কাছে সুগৃহীত করতে হলে জনচিত্তের যে চিরকালীন গল্প-বুভুক্ষা তাকে পরিতৃপ্ত করার কৌশলগত যুগ-প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বঙ্কিমের মধ্যে কবিদৃষ্টি ও নাটকীয় প্রতিভার সমন্বয় হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। বস্তুত এই দুয়ের মিশ্রণেই রোমান্স্ গড়ে ওঠে। বঙ্কিম তাঁর রোমান্সে নাটকীয়তার সঙ্গে কবিত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে কাহিনীর মধ্যে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ, ক্ষিপ্রগতি ও সংঘর্ষে। এবং কাব্যধর্মিতা ধরা পড়েছে বর্ণনায়—বিশেষ করে নিসর্গচিত্র ও প্রেমের প্রথম শিহরণের উপস্থাপনায়। প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর সূচনাই হয়েছে অপ্রত্যাশিত ঘটনার যোগাযোগে। বিষ্ণুপুর থেকে একজন বীরপুরুষ যখন নিদাঘ শেষে, মান্দারণের পথে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। রাত্রির ঘোর অন্ধকারে তখন কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকে তিনি সামনে বিরাট দেবমন্দির দেখতে পেলেন। তাঁর ঘনঘন করাঘাতে হঠাৎ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভেতরে প্রবেশ করেই অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল। এই ধ্বনি তিলোত্তমা ও বিমলার। আর এই বীরপুরুষ জগৎসিংহ। তারপরে সেইদিনই তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিপাতেই অনুরাগের সঞ্চার!

বঙ্কিমের উপন্যাসে এই যে অপ্রত্যাশিত দৈব যোগাযোগ তা কাহিনীর মধ্যে চমৎকারিত্ব ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে, অথচ তাঁর প্লটকে শিথিল করে না। সাধারণত এ জাতীয় যোগাযোগে আমাদের কার্যকারণ-বোধ ক্ষুণ্ণ হয় বলে প্লট শিথিল হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে উপন্যাসের চরিত্রই এমন উপাদানে গঠিত যে, তার জন্যে জীবনে নাটকীয় ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ সম্ভব এবং যেখানে উপন্যাসে গৃহীত যুগগত পটভূমিতে এমন দৈবঘটনা স্বাভাবিক সেখানে কিন্তু প্লটের শৈথিল্য হয় না। ডিকেন্স্ একথাটিই বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"Where the accident is inseparable form passsion and action of the character, where it is strictly consistent with the entire design, and arises out of some culminating proceeding on the part of the individual which the individual has led up to ; it seems to me as it were, an art of divine justice."[৩] বঙ্কিমী রোমান্সের যুগ-পরিবেশ ও চরিত্র-ধর্মের সঙ্গে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত যোগ এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে এতে তাঁর উপন্যাসের গঠনগত শৈথিল্যের প্রশ্নই

৩। Charles Dickens, vide John Forster : 'The Life of Charles Dickens' (1874 vol III).

অবান্তর হয়ে ওঠে। বঙ্কিমের প্লট সম্পর্কে কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, বঙ্কিম শুধু গল্প বলার জন্যে গল্প বলেন নি, শুধু পাঠককে ভোলাবার জন্যে প্লটের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেন নি। বঙ্কিমের ভেতরে সৃষ্টি-প্রেরণার অপরিহার্য প্রকাশ রূপেই এ ধরনের গল্প রূপলাভ করেছে। তাঁর প্লট তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিপ্রেরণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার প্রকাশকে তিনি অন্যবিধ পরিণতি দিতে পারতেন না। অ্যান্টনি ট্রোলোপ যে কথা অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা বঙ্কিমের প্লট প্রসঙ্গে বিশেষ করে বলা যায়—" . . The writer, when he sits down to commence his novel, should do so, not because he has to tell a story, but because he has a story to tell."[৪]

প্রায় সব দেশেই উপন্যাসের জন্মের আগে রোমান্সের অস্তিত্ব পাই। এইজন্যে উপন্যাসের জন্ম-লগ্নে তাতে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য কিছু-কিছু পাওয়া যায়। চমৎকারিত্বপূর্ণ কাহিনী, প্লট সাজানো, প্লটের উপরে জোর দেওয়া—এসব জিনিস রোমান্স্ থেকেই এসেছে এবং উপন্যাসের প্রথম যুগে প্লটের প্রতি নিষ্ঠা বেশি দেখা যায়। তারপরে দৃষ্টিভঙ্গি যত পরিণত হয়েছে তত ঔপন্যাসিক দুটো জিনিস উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এক, নিছক গল্পের পিপাসা অপরিণত পাঠকের মধ্যে পাওয়া যায়। পাঠক যত বিদগ্ধ হয় তত তার কাছে গল্পের চমক গৌণ হয়ে যায়। দুই, শুধু ঘটনাই নয়, ঘটনার কারণও পরিণত পাঠক জানতে চায়। আর প্রত্যেক ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে-করতে আমরা যতই এগিয়ে যাই ততই দেখতে পাই ঘটনার বীজ রয়েছে মানুষের চরিত্রের মধ্যে। চরিত্রের কতকগুলি প্রবণতাই মানুষকে বিশেষ-বিশেষ কাজে নিযুক্ত করে—সুতরাং কাহিনীর কারণ সন্ধান করতে-করতে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে এসে থামতে হয়। এইভাবে প্লট থেকে ক্রমে চরিত্রে দৃষ্টি এসে পড়ে। প্রথম যুগে প্লটের উপরে জোর ছিল। ক্রমে চরিত্রের উপরে জোর পড়ে। বঙ্কিম পর্যন্ত আমরা বাংলা উপন্যাসে প্লটের প্রাধান্য পাই। আধুনিক যুগ যত এগিয়ে এল তত আমরা চরিত্রের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে দেখলাম। শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করেই বললেন—"আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্যে প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়। পাশ্চাত্যেও আধুনিক যুগের লেখকদের দৃষ্টি চরিত্রের উপরে পড়ল, হেনরি জেম্স্ বললেন—"What is character but the determination of incident? What is incident but the illustration of character?" এ যেন শরৎচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি।

বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাসে প্লটের প্রাধান্য ছিল। তাই চরিত্রের জটিল রহস্য সন্ধানে তিনি মনোযোগী নন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র ঋজু ও বলিষ্ঠ। বিশেষত নায়ক-সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত ঋজু ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা যেখানে নিম্নবংশের পতিত চরিত্র নিয়েও উপন্যাস রচনা করছেন, বঙ্কিম সেখানে মূলত সমাজের উচ্চস্তর থেকেই নায়ক চরিত্র সংগ্রহ করেছেন। ভিক্টর হিউগোর মত পলাতক কয়েদী, ডস্টয়েভস্কির মত পতিতা বা জুয়াড়ীর চরিত্র, কিংবা শরৎচন্দ্রের মত পতিতা বা ভবঘুরে চরিত্রকে

৪। Anthony Trollope 'Autobiography (1883), ch XII

বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে কেন্দ্রীয় স্থান দিতে অসম্মত। এই প্রসঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎসিংহের বর্ণনা মনে আসে ঃ "পথিকের (জগৎসিংহের) বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃটসম্ভূত নবদুর্ব্বাদল তুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি; বসন্ত—প্রসূত নবপত্রাবলী তুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষ—সম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল, মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক, কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল।" কিংবা মৃণালিনীতে হেমচন্দ্রের বর্ণনা—"যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধৃবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর।"

বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের যে রূপটি স্বপ্নে দেখেছিল, সেটি তার বাস্তবরূপেরই পূর্বাভাস। এই রূপের বর্ণনা—

"নীলগগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার উন্নত প্রশস্ত প্রশান্ত ললাট, সরল সকরুণ কটাক্ষ, তাহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষ-লক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে।..... সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই।"

Stevenson উপন্যাসকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— (১) Novel of Adventure, (২) Novel of Character ও (৩) Dramatic Novel।[৫] এই তিনশ্রেণীর উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের রীতি তিনরকম।

প্রথমটির পরিচয় তো নাম থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এই জাতীয় উপন্যাসের চরিত্ররা হয় যুদ্ধপ্রিয়, বীর, দুঃসাহসী। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণই প্রধান, it requires no coherence of plot এখানে চরিত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতি, গভীর বিসর্পিল মানসিক ক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে চরিত্রের সূক্ষ্ম জটিল বিশ্লেষণের চেয়ে চরিত্রের ঋজু বলিষ্ঠ উপস্থাপনাই প্রধান। চরিত্রের মধ্যে কোন একটি প্রবেগকে (passion) প্রখরভাবে ঋজুভাবে চিত্রিত করা হয়। তাতে গতি ও প্রচণ্ডতা থাকে কিন্তু জটিলতা ও অস্পষ্টতা থাকে না। "All should be plain, all straight towards the end বঙ্কিম-উপন্যাসের চরিত্র-সৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য আমরা প্রত্যক্ষ করলাম [illegible] সিদ্ধান্ত করতে পারি—এদিক থেকে বঙ্কিমের উপন্যাস হলো dramatic novel Annal lactitia Barbauld-এর মতে উপন্যাসে কাহিনী বিবৃতির রীতি তিন রকমের হয়—

(১) narrative or epic রীতি

৫। Robert Louis Stevenson A Humble Remonstrance, reprinted in the 'Memories and Portraits,' 1887

(২) personal memoirs-এর রীতি এবং

(৩) epistolary correspondence-এর রীতি।

আগেই বলেছি, বর্ণনায় ও বিবৃতিতে (description and narration) বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্যির রীতি অনুসরণ করেন। বঙ্কিমের বর্ণনা বর্ণাঢ্য ও ঐশ্বর্যদীপ্ত। শরৎচন্দ্রের অনাড়ম্বর মসৃণ বর্ণনার বিপরীত কোটিতে বঙ্কিমের অবস্থান। এর কারণ দুজনের উপজীব্যই আলাদা। বঙ্কিমের উপজীব্য ঐশ্বর্যবান উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়, পটভূমি ইতিহাসের বাস্তবের শাসনমুক্ত কল্পনাদীপ্ত জগৎ। আর শরৎচন্দ্রের উপজীব্য সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পটভূমি আমাদের বাস্তবের দৈনন্দিন সংসার। আধুনিককালে বঙ্কিমের বর্ণনার আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য, তাঁর সমুচ্চ মনন ও জীবনদৃষ্টি, তাঁর ঋজু বলিষ্ঠ ধীরোদাত্ত নায়ক পরিকল্পনার আদর্শ যদি কারো মধ্যে অনুসৃত হয়ে থাকে তবে তিনি হলেন তারাশঙ্কর। আমরা আগে বলেছি যে, বঙ্কিম মাত্র একবার দ্বিতীয় রীতি অবলম্বন করেই ত্যাগ করেন, তার কারণ তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক এই রীতির অনুকূল ছিল না। অথচ বিষয়বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই সম্পর্কের উপরেই রীতির নির্বাচন নির্ভর করে।

Percy Lubbock তাঁর 'Craft of Fiction-এ বলেছেন—

"The whole intricate method, in craft of fiction, I take to be governed by the question of point of view—the question of the relation in which the narrator stands to the story

বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল যা বঙ্কিমকে যে-কোন কাহিনীতে পুরোপুরি মিশে যেতে দিত না। গল্পের সঙ্গে তার এই দূরত্ববোধ তাঁকে প্রথম রীতি অবলম্বনে উদ্যোগী করেছিল। আর প্রথম রীতির মধ্যে যে ধারণ-ক্ষমতা আছে, লেখকের যে কল্পিত সর্বজ্ঞতার সুযোগ (Omniscience) আছে তা তাঁকে ইতিহাসের ও সমাজের সর্বক্ষেত্র উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করেছে। উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনী বর্ণনায় কাহিনীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা বাড়ে। এতে কোন-কোন দিক এবং কোন-কোন চরিত্র যারা কাহিনীতে বক্তার অর্থাৎ লেখকের খুব ঘনিষ্ঠ তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন লেখকের পক্ষে অসুবিধাজনক। তাই উত্তমপুরুষে কাহিনী বর্ণনার যেমন সুবিধা আছে, তেমনি তার সুবিধার সীমাও আছে। বঙ্কিম একবার মাত্র ইন্দিরাতে এই রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে আর এ রীতি তিনি অবলম্বন করেননি। কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আভিজাত্যবোধ ছিল, সেটা নিয়ে কাহিনীতে সর্বশ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে মেশা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যে অন্তরঙ্গ রীতি ত্যাগ করে তিনি উপর থেকে দ্রষ্টা রূপে গোটা কাহিনীকে দেখে বর্ণনা করার রীতি অবলম্বন করেন। তাছাড়া তাঁর প্রতিভায় একটি নাট্যকার-সুলভ সুমহান নৈর্ব্যক্তিকতা (Olympian impersonality) ছিল। এই জন্যে অন্তরঙ্গ রীতি তাঁর প্রতিভার অনুকূল নয়, এ রীতি শরৎচন্দ্র বা ডিকেন্সকেই ভাল মানায়। তাছাড়া অন্তরঙ্গরীতি সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়াশ্রয়ী উপন্যাসেই চলে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ রীতি অবলম্বনের অসুবিধা আছে। যিনি

রাজসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তিনিই আবার মোগল অন্তঃপুর বা চঞ্চলকুমারীর অন্তঃপুরের দ্রষ্টা কেমন করে হতে পারেন? যার জবানীতে কাহিনী বিবৃত জীবনের সবকথা তার অভিজ্ঞতার মধ্যে আসতে বাধ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মননে ও ভাষণে, চিন্তা ও ভাষায় যে আভিজাত্য ছিল এই আভিজাত্য সাধারণ পাঠক থেকে বঙ্কিমকে খানিকটা দূরে রেখেছে। এই দূরত্ব খানিকটা কমেছে বঙ্কিম যখন নিজের আভিজাত্যের সিংহাসনে বসেই পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। দুর্গেশনন্দিনীব প্রথম খণ্ডের প্রথম দুই পরিচ্ছেদে আকস্মিক ভাবে তিলোত্তমা-বিমলার সঙ্গে জগৎসিংহের আলাপ হবার পর তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিম হঠাৎ পাঠককে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন—"নিশীথকালে জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে যাত্রা করিলেন। আপাতত তাঁহার অনুগমনে অথবা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মনোমোহনের সংবাদ কথনে পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তর-মধ্যে গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষ্যে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা সকল সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচয় ইতিবৃত্ত সম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য ভাল নহে।"

কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে এইভাবে পাঠকবর্গকে সম্বোধন করে কথা বলা বা পরামর্শ দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায়ই দেখা যায়। এতে তাঁর স্টাইল অন্তরঙ্গ (intimate) হয়েছে বলে কেউ-কেউ মত প্রকাশ করেছেন। এ রীতি তুর্গেনিভের উপন্যাসেও দেখা যায়। এতে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু এমন স্টাইলও হতে পারে যাতে এই রকম কোন সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজনই নেই। যেমন শরৎচন্দ্রের স্টাইল। শরৎচন্দ্র পাঠককে সম্বোধন করে ক্বচিৎ কথা বলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গতা তো প্রশ্নাতীত। বস্তুত বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের মত তাঁর স্টাইলেও এমন একটা অভিজাত মহিমা ছিল যাকে দূর থেকে সম্ভ্রম করতে হয়। এই সম্ভ্রম কাটাবার জন্যেই বোধহয় এভাবে পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলার রীতি তিনি গ্রহণ করেন। এতে অন্তরঙ্গতা খানিকটা সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু কাহিনীর মসৃণ প্রবাহ এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জলের মসৃণ প্রবাহ বয়ে যাবার পথে মাঝে-মাঝে দুএকটি খুঁটি পোঁতা থাকলে জিনিসটা দেখতে যেমন লাগে তেমনি, কাহিনী প্রবাহের মাঝে মাঝে লেখকের ব্যক্তিত্ব যেন খুঁটির মতই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক জায়গায় কাহিনীর মাঝে-মাঝে পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। এসব কথা কোথাও কাহিনীর পটভূমি বা ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে। আবার কোথাও-কোথাও শুধুই নীতি উপদেশ দিয়েছেন—"নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন। ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব,

সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?—কপালকুণ্ডলা ১/২। পাঠকের উপরে এতখানি লেখকের অভিভাবকত্ব আধুনিক পাঠকের আত্মচেতনাকে যেন খানিকটা পীড়িত করে। উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনী বর্ণনা বঙ্কিমের ইন্দিরা থেকেই শুরু। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমের বর্ণনারীতির আর একটি ত্রুটি চোখে পড়ে। রোমান্সগুলিতে তো পুরোপুরি ঐতিহাসিক তথ্য রচিত হয়নি। তবু এইগুলিতেও কোথাও-কোথাও ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে তথ্যের এমন ঘনীভূত উপস্থাপনা দেখিয়েছেন যে মাঝে-মাঝে সাহিত্যের স্বাভাবিক রসস্নিগ্ধতা নষ্ট হয়েছে এবং ইতিহাসের শুষ্ক তথ্যজাল বিরক্তিকর হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক তথ্যকে তিনি কৌশলে কাহিনীর মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে মিলিয়ে দেন না, তথ্য একদিকে, আর কাহিনীর রস একদিকে যেন ছানা কেটে গেছে। এ ত্রুটি প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতেই বেশি। শেষের দিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহে এই ত্রুটি আর বিশেষ চোখে পড়ে না। দুর্গেশনন্দিনীর সেই অংশটি হল প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ। এ অংশটুকু একটু পড়লেই বোঝা যাবে কি রকমভাবে ঐতিহাসিক তথ্য সাহিত্যরস থেকে পৃথক হয়ে একটা কোণে ডেলা পাকিয়ে গেছে—খুব সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য যেন তরল সাহিত্য-রস থেকে পৃথক হয়ে থাকে না, তাতে কাস্টার্ড মিল্কের মত মিশে সবটাকে ঘনীভূত রূপ দেয়।

উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের দুটি ক্ষেত্র আছে—(১) লেখকের বিবৃতির (narration) অংশ (২) পাত্রপাত্রীর সংলাপের (dialogue) অংশ। বিবৃতি অংশে ভাষা ব্যবহার করা হয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সংলাপে ভাষা ব্যবহার করা হয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। বঙ্কিম উপন্যাসে এই রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেনে চলেছেন। বিষয়বস্তুর বর্ণনায় ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিমের কৃতিত্ব লক্ষ্য করবার মত। রাজপুত বীরদের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন সেখানে স্বাভাবিকভাবে সেই বীরের বেশ হিন্দু বীরত্বের আদর্শে চিত্রিত হয়েছে এবং সেই চিত্রে বঙ্কিম সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শব্দ গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে যখন তিনি মোগল অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য ও বিলাস চিত্রিত করেছেন তখন ঐশ্লামিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ এমন. কি কোথাও কোথাও বাক্যাংশ পর্যন্ত, ব্যবহার করেছেন। সংলাপের উপযোগিতা উপন্যাসে তিন দিকে—(১) কাহিনী বর্ণনা, (২) চরিত্র স্ফুটন (৩) লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন ব্যাখ্যা। এর মধ্যে প্রথম দুটি ক্ষেত্রেই বঙ্কিম সংলাপ ব্যবহার করেছেন। আর নিজস্ব জীবনাদর্শন ব্যাখ্যার জন্যে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, ফ্লবেয়ার ও আলডায়াস হাক্সলি করেছেন খুব বেশি—বঙ্কিম সংলাপ খুব বেশি ব্যবহার করেন নি। কারণ বঙ্কিম তাঁর তত্ত্ব উপদেশ অনেক সময়ই নিজের মুখেই পরিবেশন করেছেন, চরিত্রকে তিনি বস্তুনিষ্ঠ (objective) নাট্যকারের মত ছেড়ে দিয়েছেন তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য। সংলাপের একটি বড় উপযোগিতা হল সংলাপ কাহিনীতে দৃশ্যগুণ সঞ্চারিত করে। সাধারণত উপন্যাস শ্রব্যকাব্য বা বর্ণনাত্মক শিল্পকলা (narrative art), কিন্তু তাতে সংলাপ খানিকটা দৃশ্যকাব্য বা নাটকের গুণ সঞ্চারিত

করে। এতে উপন্যাসের একঘেয়েমি কেটে যায়।

উপন্যাসে সংলাপকে করতে হয় সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক এবং স্বাভাবিক। বঙ্কিমের সংলাপ এদিক থেকে রসোত্তীর্ণ। বঙ্কিমের সংযমের কথা তো সর্বজনস্বীকৃত। সংলাপের ক্ষেত্রেও তিনি সংযমী। 'গোরা' উপন্যাসের মতো বক্তৃতাধর্মী দীর্ঘসংলাপ বা 'শেষের কবিতা'র মতো বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বঙ্কিমের উপন্যাসে নেই। তাছাড়া উপন্যাসে সংলাপকে জীবন্ত করার জন্যে তিনি অনেক জায়গায় চরিত্রানুযায়ী আঞ্চলিক ভাষা ও বিদেশী ভাষাও ব্যবহার করেছেন। যে কাজ আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিকেরা করছেন, পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে ফর্স্টার ও গ্রাহাম গ্রীন করেছেন, তা বাংলায় বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখে বিস্মিত হতে হয়। এ প্রসঙ্গে রাজসিংহে তসবিরওয়ালী বুড়ি ও তার ছেলের মধ্যে কথোপকথনটি মনে পড়ে— ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, "আম্মাজী। রূপনগর কা যো কেস্‌সা আপ্‌ ফরমায়েঙ্গে বোলী থী।"

মা বলিল 'চুপ্‌! বহ বাত মুহ্‌মে মৎ লও বাপ্‌জান্‌। মেয়নে কিয়া বোলী থী? খেয়াল মে বোলী থী শায়েদ্‌।"

বুড়ী কখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা তাহার উদর-মধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন।

এবারকার উত্তর শুনিয়া ছেলে বলিল, 'চুপ রহেঙ্গে কাহে মাজী? য়ৈসা কিয়া বাত্‌ হোগী?"

মা। শুন্‌নে কা মাফিক বাত্‌ নেহিন্‌ বাপ্‌জান্‌!

ছেলে। বহু কুমারীন্‌ বড়া খুব সুরত? যেহ য়ৈসা পুযিদা বাত্‌?

মা। সো নেহিন্‌—বাঁদিকি বড়া দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়নে কিয়া বোল্‌ চুকা।"

ইত্যাদি।

ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিম এই একটি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রগতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক কালে আমরা কোন বিশেষ শ্রেণীর চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বা কোন আঞ্চলিক জীবনধারাকে রূপায়িত করার জন্যে আঞ্চলিক উপভাষা বা ভিন্নভাষা ব্যবহার করে থাকি। একাজ বঙ্কিম আজ থেকে একশ বছর আগেই শুরু করেছিলেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে তার পরিচয় রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সাধারণত পুরোপুরি সাধুভাষার লেখক বলে জানি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রও সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই মিশ্রণ অচেতনভাবেই ঘটে গেছে এবং বঙ্কিমের রচনারীতির সামগ্রিক আভিজাত্যের মধ্যে এমন মিলেমিশে এবং সাঙ্গীকৃত (assimilated) হয়ে গেছে যে তা শ্রুতিকটু মনে হয় না। অভিজাত পরিবারে অনেক সময় দু'একটি নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য যেমন নিজেদের নিম্নশ্রেণীর ছাপ হারিয়ে মিলেমিশে যায় এবং তাদের আচার-আচরণে এমন একটা স্বাভাবিক আভিজাত্য এসে যায় যে তাদের বংশ পরিচয় ধরিয়ে না দিলে জানবার উপায় থাকে না, বঙ্কিমের সাধুভাষার মধ্যে চলিত ভাষার এই মিশ্রণ অনেকটা সেই রকমের। এই মিশ্রণের কারণ বোধহয় এই যে,

বঙ্কিম সৃজনধর্মী অনুভূতি-মুখ্য সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন হিসাবে যে নতুন জীবন্ত ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাতে সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তাঁকে একদিকে বিদ্যাসাগরী অন্যদিকে আলালীভাষার মধ্যপন্থী ভাষা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।[৬] এই সৃষ্টিতে উভয় ভাষারীতির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সমন্বয় সার্থক হয়েছিল। কিন্তু অল্প দুএকটি ক্ষেত্রে সার্থক সমন্বয় না হয়ে শুধুই মিশ্রণ হয়ে গেছে। এটা হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের অনবধানতার জন্যেই হয়েছে। যেমন—সাধু চলিতের আপত্তিকর মিশ্রণ চোখে পড়ে—

"বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে পিলে সম্বৎসর খাবে কি?"—কপালকুণ্ডলা ১/১ 'প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্র ভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"—কলাপকুণ্ডলা ১/১

কিন্তু এই যে বিদ্যাসাগরী ভাষার সঙ্গে আলালী ভাষাকে বঙ্কিম মিশ্রিত করেছেন এবং স্থানে-স্থানে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন এর কারণ এ নয় যে তিনি ভাষাকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করতে চেয়েছিলেন, বা ভাষাকে সাধারণের প্রাত্যহিকতায় নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। এর কারণ এই যে তিনি ভাষাকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের কাছে তাঁর ভাষা খানিকটা কৃত্রিম মনে হলেও তাঁর নিজস্ব বিষয়বস্তু আর তাঁর উপন্যাসের যে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ভাবমণ্ডল তাতে এ ভাষাকে কৃত্রিম মনে হয় না। সেখানে এ ভাষাই অপরিহার্য এবং জীবন্ত। বঙ্কিম উপন্যাসে ভাষাকে প্রাকৃতজনের ভাষা করতে চাননি, প্রকৃত শিল্পের ভাষা করতে চেয়েছেন। আর প্রকৃত শিল্পের ভাষা কখনো পুরোপুরি জনগণের মুখের ভাষা হতে পারে না, এখানে আংশিক পারিপাট্য এবং তজ্জনিত কৃত্রিমতা কিছুটা থাকতে বাধ্য। যিনি বাংলার মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রচলিত করতে বিশেষ আন্দোলন করেছিলেন, সেই প্রমথ চৌধুরীর ভাষাও কখনো পুরোপুরি মুখের ভাষা হয়ে ওঠেনি। সাহিত্যের ভাষায় একটা আভিজাত্য থাকেই। এই ভাষাকে জনসাধারণের স্তরে নামিয়ে না এনে জনসাধারণেরই ভাষাকে এই আভিজাত্যে উন্নীত করতে হবে বস্তুত এইটাই আমাদের কৃষ্টিসাধনার উদ্দেশ্য। বঙ্কিম এসম্পর্কে অসঙ্কোচে বলেছেন—

"পাঠকের পাঠোপযোগী অতি সরল ভাষা" ব্যবহার করলেই রচনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না, বা হলেও সেরকম জনপ্রিয়তা লেখকের কাম্য হওয়া উচিত নয়। বস্তুত বঙ্কিমের মতে "যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল"

অবশ্য ভাষার আভিজাত্য বলতে বঙ্কিম পণ্ডিতী গদ্য বোঝাতে চাননি। প্রাঞ্জলতা সঞ্চার বঙ্কিমী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রথমে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরী গদ্যের প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় কতখানি

৬। বঙ্কিমচন্দ্র যে আলালীভাষাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন তার প্রমাণ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাবলী যখন 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি তার ভূমিকা লিখে দেন।

বিদ্যাসাগরী প্রভাব রয়েছে দেখা যায় যদি পরবর্তী উপন্যাস কপালকুণ্ডলার ভাষা এর পাশে স্থাপিত করি—

"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"—দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

"প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্‌দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকে নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন।"—কপালকুণ্ডলা, ১ম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুর্গেশনন্দিনীর তুলনায় কপালকুণ্ডলার গদ্য অনেক প্রাঞ্জল অথচ আভিজাত্য তার কিছুমাত্র কমেনি। দুর্গেশনন্দিনীর সুদীর্ঘ সমাস ও তৎসম শব্দের আধিক্য কপালকুণ্ডলায় নেই। নিদাঘ-শেষ, অস্তাচলগমনোদ্যোগী, নীলনীরদমালা, বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত প্রভৃতির মত প্রয়োগ স্পষ্টত কপালকুণ্ডলায় চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ক্রমশ প্রাঞ্জল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ বাস্তবতার অজুহাতে তিনি মার্জিত সংস্কৃতি-চেতনা থেকে স্খলিত হয়ে সাহিত্যকে তাব উন্নত মান থেকে ভ্রষ্ট করে আনেননি। এখানেই বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রকরণ ও প্রযুক্তির কলানৈপুণ্য এবং এইটাই বঙ্কিমের শিল্পীসত্তার মূল অভিজ্ঞান।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর

বিষবৃক্ষ ও গৃহদাহকে সম্মুখে রেখে আঙ্গিক ও জীবনদর্শনের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ একদিক থেকে এ দুটি হল তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র দুটি ভিন্ন যুগের প্রতিনিধি। তাঁদের যুগ পৃথক, সামাজিক পটভূমিকাও পৃথক। এবং যেহেতু সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় বিশেষ করে উপন্যাসের সঙ্গে যুগ-পরিবেশ ও সমাজজীবনের সম্পর্ক নিবিড়তর সেহেতু দুই ভিন্ন যুগের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জীবনবীক্ষা ও আঙ্গিকও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে স্রষ্টার আত্মিক পরিচিতিও যথেষ্ট পরিমাণে আত্মবিকাশ লাভ করেছে।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) এবং গৃহদাহের (১৯২০) মধ্যে কালগত ব্যবধান ৪৭ বছর অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল। বিষবৃক্ষ যখন রচিত হয়েছে, এদেশে তখন ইংরাজী শিক্ষা-সভ্যতার বিস্তাব হয়েছে, নবজাগরণ পরিণতিব পথে। একটা বহুমুখী জাতীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধির পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল বঙ্কিম-মানস, পক্ষান্তবে গৃহদাহ রচনাব কাল বঙ্গদেশে একটা ভাঙন ও জটিলতার কাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তখন সমাপ্তি। তার ফলস্বরূপ বিচিত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয় জাতীয় জীবনকে গ্রাস করেছে। এই পটভূমিকায় স্বাভাবিক ভাবে জীবনের অন্ধকার দিকটি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিচৈতন্যকে অধিকতর বিষণ্ণ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাত্রপাত্রী অধিকাংশই বাংলাব উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, বাংলাব নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছবি বঙ্কিমচন্দ্র আঁকতে পারেন নি, অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের প্রধান উপজীব্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে বাংলায় জমিদারী প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তাঁর অধিকাংশ সামাজিক উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল জমিদার-গৃহ—যেমন কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি সাধাবণ মধ্যবিত্ত বাঙালির গৃহ। দেনাপাওনা প্রভৃতি যে দুই-একটি উপন্যাসে জমিদারদের জীবনচিত্র গৃহীত হযেছে সেগুলিতে জমিদারীর অবক্ষয়ের চিত্রই প্রকট।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল মূলত কল্পনাপ্রবণ কবির দৃষ্টি। এই জন্যে তাঁর কল্পনার সহজ সঞ্চরণ-ক্ষেত্র ইতিহাসের পটভূমিকা, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস বস্তুত ঐতিহাসিক রোমান্স্। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি যথার্থ বাস্তব-সচেতন ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি। তাই সাধারণত তাঁকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে সঞ্চরণ করতে দেখা যায় না। বাংলার সামাজিক এবং একান্ত পারিবারিক সুখ-দুঃখ দেনাপাওনা হাসিকান্নার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি দানে তিনি নিজের প্রতিভাকে নিযুক্ত

রেখেছেন। এই দু'জন ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য তাঁদের সামাজিক উপন্যাসেও দুর্লক্ষ্য নয়। বিষবৃক্ষ সামাজিক উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও তাতে কবিসুলভ আবেগ উচ্ছ্বাস একাধিক স্থানে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে প্রেমের চিত্রগুলিতে কবির বিমুগ্ধ দৃষ্টিলব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে গৃহদাহের দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই বাস্তব। বাস্তব জীবনের সমস্যা, পল্লীর বিপর্যয়, নারী-চরিত্রের নির্মম আত্মদ্বন্দ্ব—এসব শরৎচন্দ্র কখনো বিস্মৃত হতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই যদিও এদেশে নারী-জাগরণ সূচিত হয়, তবু সমাজের মুক্তক্ষেত্রে নারীর অবাধ সঞ্চরণ তখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। ফলে নারীচিত্তের মুক্তি ও সঞ্চরণশীলতা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, নারী-জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতিও লেখকদের দৃষ্টি বড় একটা পড়েনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সেদিন বিধবা-বিবাহ সমর্থন করতে পারেন নি। মূলত তখন লেখকের দৃষ্টি ছিল পুরুষের সমস্যার দিকে। কারণ পুরুষই ছিল সমাজের মুক্তক্ষেত্রের প্রধান চরিত্র। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মুখ্যত পুরুষকেন্দ্রিক। বিষবৃক্ষ তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণই প্রধান। একটি পুরুষের জীবন-রঙ্গভূমিতে দুইটি নারীর সঞ্চরণ এবং তার ফলে সেই পুরুষের চিত্তদ্বন্দ্বই বিষবৃক্ষের মূল উপজীব্য।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সামাজিক পটভূমি ছিল ভিন্নতর। শরৎচন্দ্রের যুগে নারী শুধু সমাজের মুক্ত ক্ষেত্রে সঞ্চরণের অধিকারই লাভ করেনি, কোন-কোন ক্ষেত্রে নিজের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করেছে। সমাজে নারীর এই প্রাধান্য লাভের ফলে নারীজীবনের দুঃখবেদনা, চিত্তের দ্বন্দ্ব ও সমস্যা স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসে অধিকতর স্থান লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী সমস্যার উপস্থাপনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। গৃহদাহে একটি নারীর জীবনে দুইটি পুরুষের পদক্ষেপ ও তার ফলে সেই নারীর চিত্তের দ্বিধা-বিভক্তই প্রধানভাবে আলোচ্য। এক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ ও গৃহদাহ দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, দু'টিতে দুই স্বতন্ত্র যুগের চিত্র, দুই স্বতন্ত্র লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রকাশ।

চরিত্র-চিত্রণ ও চিত্তবিশ্লেষণের রীতিতেও দুই লেখকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদৃষ্টিতে খানিকটা ক্লাসিকতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে—চরিত্রগুলিকে যথাসম্ভব ঋজু ও বলিষ্ঠ করেছেন তিনি। চিত্তদ্বন্দ্ব তাঁর চরিত্রেও আছে, তবু সে দ্বন্দ্বে যেন আধুনিক মনের দুর্বোধ্য জটিলতা নেই। নগেন্দ্র প্রথমে সূর্যমুখীকে ভালবেসেছে, তারপরে কুন্দনন্দিনীর প্রতি সমবেদনার ফলে তার মধ্যে একটি ভালবাসার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, এবং সর্বশেষে সে আবার সূর্যমুখীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। নগেন্দ্র চরিত্রের তলদেশে সূর্যমুখীর প্রতি একটি চিরস্থায়ী প্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এসব বিশ্লেষণ একান্তই সরল ও সুবোধ্য। একই কালে একাধিক চিত্ত-বৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব, যার ফলে কোন চরিত্র নিজের কাছেই নিজে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, এটা নগেন্দ্রের মধ্যে নেই, অচলার মধ্যে

আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলিতে যে বিপরীত বৃত্তির চিত্তদ্বন্দ্ব তা যেন বিশাল অরণ্যে দুইটি বিশাল শালবৃক্ষের মধ্যে বায়ু সঞ্চালনে পারস্পরিক ঘর্ষণ মাত্র, কিন্তু শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিতে বিপরীত বৃত্তির জটিলতা গলিত বৃক্ষপত্রের মধ্যে দৃশ্যমান শিরা-উপশিরার জালরচনার মতো। একে বিশ্লেষণ করা বড়ই কঠিন।

উপন্যাসের আঙ্গিকের দিক থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগের ঔপন্যাসিক। স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসের গল্পরসের উপরে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশি। তাই প্লট রচনাকে তিনি উপন্যাসে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর প্লটের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর প্লট সর্বদা সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও সুষম। দ্বিতীয়ত প্লটের মধ্যে রোমান্সসুলভ আকস্মিকতা ও চমৎকারিত্ব এনে প্লটকে রমণীয় করার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে এই দুই বৈশিষ্টই লক্ষ্য করা যায়। বিষবৃক্ষের প্লট এতদূর পূর্বপরিকল্পিত ও সুষম যে, এই উপন্যাসের প্রথম অর্ধাংশে বিষবৃক্ষ রোপণ ও দ্বিতীয় অর্ধাংশে বিষবৃক্ষের ফলভোগ বর্ণিত হয়েছে, এবং আরও বিস্ময়কর এই যে এই দুটি অর্ধাংশ পরিচ্ছেদসংখ্যার দিক থেকে প্রায় সমান-সমান। বিষবৃক্ষের মধ্যে সূর্যমুখীর নিরুদ্দেশ যাত্রা এবং তার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে আকস্মিকতা ও চমৎকারিত্ব রয়েছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি প্লটের উপরে ছিল না, ছিল চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রহস্য সন্ধানে। তিনি নিজেই বলেছিলেন "প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই। তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার, আপনি আসিয়া পড়ে। ......আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র, তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।"[১] সুতরাং শুধুমাত্র গল্পরস সৃষ্টির জন্যে প্লটের নিজস্ব উপযোগিতা শরৎচন্দ্রের কাছে বড় একটা নেই, প্লটের উপযোগিতা চরিত্র সৃষ্টির জন্যেই। তাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্লট চমৎকারিত্বহীন, মসৃণ, আমাদের চোদ্দ আনা মধ্যবিত্ত বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের মত। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে শরৎ উপন্যাসে রমণীয়তা নেই। রমণীয়তা আছে, তবে তার উপাদান নাটকীয়তা বা আকস্মিকতায় নয়, তার ভিত্তি জীবনরসের স্নিগ্ধ সিঞ্চনে রচিত। গৃহদাহের নায়ক-নায়িকা আমাদের সাধারণ গৃহেরই মানব-মানবী, একান্তই পরিচিত আপনার জন। অথচ তাদের সাধারণ জীবনেই কত ঘূর্ণাবর্ত কত জটিলতা, জীবনরহস্যের কী সূক্ষ্ম রম্য আলোছায়া খেলা! শরৎচন্দ্র প্লট-পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেন নি বলে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের প্লট শিথিল। গৃহদাহের প্লটে যদিও এই শৈথিল্য নেই তবু চরিত্রচিত্রণের উপরে প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে।

১। ৫৩ তম জন্মদিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রদত্ত ভাষণ

উপন্যাসের আঙ্গিকের মধ্যে আরো একটি বড় দিক হল তার ভাষা ও সংলাপ। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় যথার্থই সৃজনধর্মী সাহিত্যের উপযোগী প্রথম ভাষাসৃষ্টি করেন, তবু তাঁর উপন্যাসে কোথাও-কোথাও পণ্ডিতী গাম্ভীর্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু যেমন প্রধানত উচ্চবিত্ত অভিজাত সমাজ বা ইতিহাসের লীলাভূমি, তেমনি তাঁর ভাষায়ও একটি পরম বনেদী আভিজাত্য রয়েছে, অধিকাংশ বর্ণনায় কাব্যধর্মী উচ্ছ্বাস ও মহাকাব্যিক ঐশ্বর্য দেখা যায়। এমনকি সংলাপের ভাষাতেও তিনি চলিত ভাষা ব্যবহার করে তাঁর আভিজাত্য বা ইতিহাসের দূরত্ব ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভাষা একান্তই সরল ও মসৃণ এবং তা সত্ত্বেও সাবলীল ও প্রাণপূর্ণ। লেখকের বিবৃতিতে সাধুভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত ভাষার ব্যবহারের ফলে শরৎ-উপন্যাসে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে। এখানে বিষয়বস্তুতে যেমন অতিরিক্ত কল্পনাধর্মী মোহময়তা নেই, ভাষাতেও তেমনি কোন কৃত্রিমতা নেই। শরৎচন্দ্র নিজে এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর নিজের উক্তি হল ঃ— "Dialoguc ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া 'চাই—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি বলছে।"[২]

বিষবৃক্ষ ও গৃহদাহ দুইটিই সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু দুইটি উপন্যাসের বর্ণনা ও সংলাপে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য শুধু দুটি উপন্যাসের নয়, দু'জন ঔপন্যাসিকের নয়, এ হল দুটি যুগের পার্থক্য।

মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন—বাংলায় শেক্‌স্‌পীয়রেব সমতুল্য প্রতিভা নিয়ে যদি কেউ আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তবে তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আবার আমার মনে হয়, এযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার সবচেয়ে বেশি নিয়ে যদি কেউ জন্মে থাকেন, তবে তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিভার স্বরূপে ও মূল প্রকৃতিতে তারাশঙ্কব বঙ্কিমচন্দ্রের সমগোত্রীয়, যদিও দুটি বড় প্রতিভা কখনো পুরোপুরি একে অন্যেব হুবহু কার্বন কপি হতে পারে না, দুই প্রতিভার কিছু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই থাকে বলে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর কোনো-কোনো দিকে পৃথক ও স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত।

বিচিত্র ও গভীর জীবনবীক্ষা, জীবনের মর্মমূলে ও তার শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে নাট্যিক দ্বন্দ্বের উপলব্ধিতে ও রূপায়ণে তারাশঙ্কর সচেতন বা অচেতনভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী। উপন্যাস বিবৃতিমূলক শিল্পকলা (narrative art) , নাটকেব উপস্থাপনা সংলাপ (dialogue) ও দৃশ্যমান ঘটনার (action) মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক, শেক্‌স্‌পীয়র মূলত নাট্যকার। সুতরাং দুজনের শিল্পরীতিতে আপাত পার্থক্য অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁদের সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য আপাত নয়, গভীর—গভীরতর—শিল্পরীতিতে নয়,

---

২। দিলীপকুমার রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের পত্র, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৮

জীবনদৃষ্টিতে। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মধ্যে যে সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য, তা বাহ্য নয়, আন্তর— এই সাধর্ম্য মূল জীবনদর্শনের উপলব্ধিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্কর দুজনেই প্রগতিশীল হলেও দুজনেই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিবর্তনরেখায় দ্রুত দিক্‌পরিবর্তন *দেখা যায়—প্রথম জীবনে বেন্থাম-মিলের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ (humanism), প্রত্যক্ষবাদ (positivism), যুক্তিবাদ (rationalism), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) প্রভৃতি মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শে বিশ্বাসী; পরবর্তীকালে* সেই বঙ্কিম মহাভারত মন্থন করে জীবনাদর্শের সন্ধান পেয়েছেন গীতার কর্মযোগে যাকে তিনি নবরূপ দিয়েছেন অনুশীলন-তত্ত্বে।

কিন্তু তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের পটভূমিকা এত ব্যাপক ছিল না, একটু সাহস করে বলতে পারি তাঁর জীবনোপলব্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো গভীর হলেও তাঁর মনীষায় বঙ্কিমতুল্য পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য ছিলো না। মোটামুটি রাঢ়বঙ্গের ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং বাউল-বৈষ্ণবের জীবনচর্যা ছিল তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। একমাত্র 'আরোগ্য নিকেতনে'র মৃত্যুদর্শনে ভারতীয় দর্শনের গভীর জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির পরিচয় পাই।

তবে ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমি দুজনের যা-ই থাক, দুজনের মধ্যেই ছিল যুগোচিত প্রগতি চেতনা। বরং ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রগতির দ্বন্দ্ব, সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার সঙ্গে নতুন বৈশ্য সভ্যতার সংঘর্ষ, এমন কি প্রাচীন ধর্মীয় জীবনদৃষ্টির সঙ্গে নতুন বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টির সংঘর্ষ ও প্রগতির দিকে ঝোঁক বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে তারাশঙ্কর অনেক তীব্রতা ও সাহসের সংগে উপস্থাপিত করেছেন। তারাশঙ্কর তীক্ষ্ণভাবে যুগসচেতন স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোহিণীর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পদক্ষেপ দ্বিধাকম্পিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যুগসচেতনতার চেয়ে রোমান্টিকতা বঙ্কিম-উপন্যাসে বেশি, এই জন্যে তিনি অনেক বেশি ইতিহাসচারী অতীতচারী, এই জন্যে সমসাময়িক সমাজ সমস্যা কোথাও কোথাও (বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল) তুলে ধরলেও অতীত বর্তমানের দ্বন্দ্ব ও প্রখর যুগসচেতনতা তারাশঙ্করের মতো বঙ্কিম উপন্যাসে পাই না। বরং মনে হয়, বর্তমানের যুগদ্বন্দ্ব এড়িয়ে রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যেই বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার চারণক্ষেত্র রূপে ইতিহাসের পটভূমিকা বেছে নিয়েছেন বেশি।

এক অর্থে প্রত্যেক যুগসচেতন লেখকই তাঁর নিজের কালে আধুনিক। আধুনিকতার মূল পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে :

"পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের ততটা কথা নয়,

যতটা ভাবের কথা। এই আধুনিকতাটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। ..আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।"

এই বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিই হল আধুনিকতার অভিজ্ঞান। তারাশঙ্কর এই বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নিয়েই যুগকে দেখেছেন, তাই যুগের মধ্যে যা পেয়েছেন তাকেই তুলে ধরেছেন। এই জন্যে তিনি আধুনিক। নাস্তিক হলেই কোনো স্রষ্টা আধুনিক, আর আস্তিক হলেই তিনি প্রাচীনপন্থী, এমন কোনো কথা নেই। টি. এস. এলিয়ট খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক। তারাশঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রখরভাবে যুগসচেতন, তাই বলিষ্ঠভাবে আধুনিক ঔপন্যাসিক, আধুনিকতার ভাষ্যকার মহাশিল্পী।

৪. পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ

বিপ্লবী কবি মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে যেমন গতানুগতিক চিন্তাধারা ও জীবনদৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তেমনি সাহিত্যের প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি এবং আঙ্গিকের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন। এবং তাঁর এই পুরাতন-বিরোধী প্রচেষ্টা শুধু ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, নতুনতর সৃষ্টির দ্বারা জাতির সাংস্কৃতিক ক্ষতিপূরণেও উদ্যোগী হয়েছিল। সাহিত্যের রূপকর্মের দিক থেকে তাঁর এই অভিনব সৃজনী-প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হল অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি। পদ্মাবতী নাটকেই মধুসূদন এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন। এই হিসাবে পদ্মাবতী নাটকের একটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেকালের সমালোচকরাও উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন—

> এই ছন্দ (অমিত্রাক্ষর) ইঙ্গরেজির মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বাঙ্গালায় কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুকরণ করেন নাই— মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তয়িতা, এবং পদ্মাবতী নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল।[১]

এই স্বীকৃতির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পদ্মাবতী নাটকে এই ছন্দ প্রয়োগের সার্থকতা বিচারের প্রশ্ন। এ প্রশ্নটি আজ পর্যন্ত পূর্ণ মর্যাদা পায় নি বলে এ সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসার আগে স্মরণ করা দরকার, 'পদ্মাবতী'তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয়বাহী। মধুসূদন বুঝেছিলেন বাংলা নাটক ইউরোপীয় নাটকের মতো বস্তুনিষ্ঠ হতে পাবে না। কারণ প্রথমত, আমাদের জীবন অব্জেক্টিভ (objective) নাটকের যোগ্য উপজীব্য নয়। এ জীবনে কর্মোদ্যম, সংঘর্ষ ও তীব্র জীবনাসক্তি (passion) নেই, আছে চিন্তামুখীনতা, শান্তিপ্রিয়তা ও ভাবাবেগ, যা কাব্যের, এবং বিশেষ ক'রে গীতিকাব্যের, ও বড় জোর সাঙ্কেতিক নাটকের, খোরাক যোগাতে পারে। এইজন্যে মধুসূদন একবার মুসলমান সমাজের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে চেয়েছিলেন, এবং 'বিজিযা' নামে একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন হিন্দুদের চেয়ে মুসলমান-সমাজে প্রচণ্ডতা বেশি. এবং তাই তাদের জীবনই 'would afford splendid opportunity for display of passion'[২]। দ্বিতীয়ত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অব্জেকটিভ নাটকের উপযোগী নয়, এ দৃষ্টি প্রায়ই রোমান্টিকতায় স্বপ্নাতুর। শুধু বাঙালির কেন, মোটামুটি সমগ্র এশিয়াবাসীর মধ্যেই সাধারণ ভাবে এই ভাবপ্রবণতা রয়েছে। আমাদের নাটকও তাই কাব্যধর্মী। সেকালের বিখ্যাত নট এবং নাট্যতত্ত্বের বিজ্ঞ সমঝদার কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে

১। রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,' ১৮৭৩, পৃ. ২৬৫।

২। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (নগেন্দ্র নাথ সোম : 'মধুস্মৃতি,' ২য় সং, পৃ. ৬৩৩ - ৩৪)।

লেখা একটি চিঠিতে আমাদের জীবনদৃষ্টির এই কল্পনাপ্রবণতা সম্পর্কে মধুসূদনের সচেতনতার পরিচয় রয়েছে—

...we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours...In the great European drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairy lands... Ours are dramatic poems [৩]

সুতরাং আমাদের এই ভাবপ্রবণতার জন্যে আমাদের যে-কোনো রচনাই অল্প-বিস্তর ভাবপ্রধান ও গীতিধর্মী হতে বাধ্য। সেইজন্যে বাস্তবতা ও যুক্তির বাহন গদ্যের চেয়ে কল্পনা ও আবেগের বাহন কাব্য, বিশেষ ক'রে পদ্যবন্ধ, আমাদের আত্ম-উন্মোচনের যোগ্যতর আধার। নাটকেও আমরা এই জন্যে পদ্যবন্ধ ব্যবহার করতে পারলে অধিকতর সার্থকতা লাভ করবো, এই ছিল মধুসূদনের ধারণা। যেখানে পদ্যবন্ধ ব্যবহার করা হয় নি সেখানে, গদ্যকেই স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে কাব্যধর্মী হতে হয়েছে, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা দেখতে পেয়েছি। অথচ পদ্যবন্ধের মধ্যে পুরানো পয়ার-ত্রিপদীকে নাটকীয় সংলাপে ব্যবহার করা যায় না। কারণ সেখানে ভাব-ছেদ ও শ্বাস-যতি সর্বদা সহগামী হওয়ায় ভাবকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রকাশ করা যায় না—যতিপতনের নির্দিষ্ট স্থানে ভাবের এক-একটি ইউনিট্‌কে সমাপ্ত করতে হয়। তাই প্রয়োজন হল নতুনতর ছন্দোবন্ধ, যেখানে ছেদ যতিকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, ভাবকে স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবহমান রাখা যায়, অথচ কাব্যের স্পন্দন বজায় থাকে। এর জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দই অনুকূল। অন্তত নাটকের সংলাপে ভাবপ্রকাশের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু স্বীকার করা অপরিহার্য বলে অমিত্রাক্ষর ছাড়া অন্য ছন্দ এখানে অচল। অতএব, মধুসূদন দেখলেন, আবেগপ্রবণ কল্পনাপ্রিয় বাঙালিকে যদি পদ্যবন্ধে নাটক লিখতে হয় তবে অমিত্রাক্ষরই বেছে নিতে হবে। মধুসূদন জাতির প্রাণধর্ম বুঝে এই ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন—

I am of opinion that our drama should be in blank-verse and not in prose.[৪]

এই ধারণার বশবর্তী হয়েই মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'পদ্মাবতী'তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রেখে তাঁর বাংলায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের ঝোঁকটি বাইরের একটি যোগাযোগ। একে উপলক্ষ ক'রেই আমাদের নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে মধুসূদনের মনে জিজ্ঞাসার আবির্ভাব, তারই ফলে এর সফলতা সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের জন্ম, এবং তার পরেই পদ্মাবতী নাটকে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

নাটকে আগাগোড়া কবিতা ব্যবহার ক'রে কাব্যনাটক রচনা করা যেতে পারে। এ

৩। তদেব, পৃ: ৬১৯।

৪। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র (যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,' ৪র্থ সং, পৃ : ৩১৬-১৭

ছাড়া গদ্য নাটকেও মাঝে-মাঝে কবিতা ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যে এ রীতি অনেক বড়-বড় নাট্যকারই অনুসরণ করেছেন। সংস্কৃতেও গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত নাটক লেখার বহুল নিদর্শন রয়েছে। মধুসূদন 'পদ্মাবতী'তে এই রীতিই অবলম্বন করেছেন। এই রীতিতে নাটকের মধ্যে কাব্যভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্বাচন সম্পর্কে সমালোচকদের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সাধারণত অনুভূতি যেখানে গভীর এবং আবেগ যেখানে তীব্র অথচ ঋজু, সেখানে গদ্যের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ করতে গেলে গদ্যকে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত হতে হয়। তাই এক্ষেত্রে প্রকাশের যোগ্য বাহন হল পদ্যবন্ধ কবিতা। পদ্যের স্পন্দন ও অনুপ্রাসে উচ্চগ্রামের অনুভূতির তরঙ্গগুলিকে ধরে রাখা যায়। চরিত্র যেখানে গভীর উপলব্ধিতে বা তীব্র আবেগে আন্দোলিত সেখানে চরিত্রটিকেই মনে হয় কবিতা; সেখানে তার ব্যবহৃত মুখের ভাষা অপরিহার্য রূপেই কাব্যভাষা হবে। অ্যাবারক্রম্বে এই মতই প্রকাশ করেছেন তাঁর একটি বহুখ্যাত প্রবন্ধে—

as every force which moves in them (characters) is made thereby to be of intense unobstructed significance—so also the language which is in their mouth has been simplified out of grey complexity of ordinary speech into an ordered medley of colour and every word they use is required to have the intense unobstructed significance which words can only have in poetry.[৫]

কিন্তু অনুভূতি যেখানে একান্তই মাটির কাছাকাছি, বাস্তব প্রাত্যহিকতায় অভিনবত্বহীন, সেখানে ভাষা হবে গদ্য, কিংবা বক্তব্য যেখানে একান্তই যুক্তিধর্মী— যেমন বার্নার্ড শ'র নাটকে— সেখানে গদ্যের আশ্রয় অপরিহার্য। নাটকের মধ্যে স্থানভেদে এইভাবে হবে পদ্য ও গদ্যের ব্যবহার। কিন্তু পদ্মাবতী নাটকে মধুসূদন এই ব্যবহারবিধি সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এখানে তিনি সাধারণভাবেই করেছেন, অবশ্য তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও অল্প-স্বল্প বেশ শিল্পগুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় এই কয়েকটি জায়গায়—

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকীর স্বগত উক্তি—

'আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
সে অমূল্যধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? ...'

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কলির স্বগত উক্তি—

'আমি কলি, এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম?

এবং

'ঐ শুন—

৫। Lascelles Abercrombie 'The Function of Poetry in Drama' ("Twentieth Century Critical Essays', P 254

বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। ...'

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কলির স্বগত উক্তি—

'এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে'।

এবং শচী-কলি-মুরজার সংলাপ—

'প্রণাম! হে দেববর! কি করেছ বল?
...
যে আজ্ঞা, বিদায় তবে হই আমি সতি।'

এবং পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নারদের উক্তি।

এই সংলাপ ও স্বগত উক্তি ছাড়া এই নাটকে আরো আটটি জায়গায় পদ্যবন্ধ চোখে পড়ে। সেগুলি গান, প্রায় সবই নেপথ্যে গীত। রামগতি ন্যায়রত্ন এই নাটকে অমিত্রাক্ষরছন্দে রচিত' 'অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীত'এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ নাটকে কোনো গানই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়। অমিত্রাক্ষর পাওয়া যায় শুধু পূর্বোক্ত স্বগত উক্তি ও সংলাপে। 'গীত' বলতে তিনি বোধ হয় এই স্বগত উক্তি ও সংলাপের কবিতাগুলিকেই বুঝিয়েছিলেন, নাটকের গানগুলিকে বোঝান নি।

এই নাটকে সবচেয়ে বেশি এই ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে কলির মুখে। কিন্তু কলির চরিত্রে কাব্যধর্মিতার বিশেষ পরিচয় পাই না। একান্ত স্বার্থপ্রণোদিত স্থূল ষড়যন্ত্রকারী এই কূট চরিত্রের মধ্যে না আছে ঔদাত্য কিংবা মহিমা, না আছে কোমলতা কিংবা মাধুর্য। অনুভূতির ঋজুতা এবং তীব্রতার বদলে তার মধ্যে রয়েছে কূটবুদ্ধির চক্রান্তলিপ্সা। তাই এই চরিত্রের আন্তরিক স্বরূপের সঙ্গে তার মুখের ছন্দোবাণীর মিল হয় নি। এইজন্যে কলির মুখে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দও আমাদের বেশ শিথিল এবং গদ্যধর্মী বলেই মনে হয়—

কি আশ্চর্য্য ! আহা!
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী।
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে? কেনই না হব?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে? —পদ্মাবতী,৪/১

মনে হয়, যে কথা গদ্যেও প্রকাশ করা যেত সে কথা অকারণেই পদ্যে প্রকাশ করা হয়েছে, কবিতা যেন অন্তর থেকে আসে নি। অবশ্য কোথাও-কোথাও এই চরিত্রই যখন আপন অনুভূতিতে স্পন্দিত তখন আবার তারই মুখে এ ছন্দ সুশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। কলি একটি অশুভ শক্তির ঘনীভূত ভাবমূর্তি যেন।—তখন তার আত্মপ্রকাশের যোগ্য বাহন অমিত্র ছন্দ।

কলি বলেছে—

আমি কলি; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে। —পদ্মাবতী, ৪/১

—কলির এই আত্মোপলব্ধি কিন্তু গদ্যে প্রকাশ করা যেত না। এ সব ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার তাই সার্থকতা লাভ করেছে।

পদ্মাবতী নাটকে এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই ছন্দে কথা বলেছে কঞ্চুকী। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে তার আগমন-অনুভূতিকে ধরে রাখবাব জন্যে মধুসূদন সুচিন্তিতভাবেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেছে নিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কে অমিত্রাক্ষর আরো সৌকর্য লাভ করল—

এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি বাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল, তাব প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুবজা রূপসী, কুবের রমণী;—
এ দোঁহার অনুবোধে, মাযাজালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে,—নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোব বনে বধিতে তাহাবে। —পদ্মাবতী, ৪/১

এখানেই মধুসূদনকে চিনতে পাবা গেল পুবোপুবি। ছন্দ নির্বাচনেই নয়, ছন্দ নির্মাণেও তিনি এবারে কৃতিত্বের পবিচয় দিলেন। যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, আভ্যন্তরীণ অনুপ্রাস, এবং তৎসম শব্দেব ব্যবহাবে অমিত্রাক্ষব ছন্দের ঔদাত্ত ও গাম্ভীর্য সঞ্চাবিত হল। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ওজোগুণও যেন আভাসিত এখানে। প্রবহমান ভাবকে পযাবেব যতিস্থান অতিক্রম ক'রে প্রলম্বিত করেছেন, তাই সর্বদা বাঁধা নিয়মে চৌদ্দ অক্ষরের চরণেব পরে ছেদ না পড়ে অসঙ্কোচে ছেদ পড়েছে কখনো-কখনো চরণের মাঝেও। এতে নাটকীয সংলাপেব স্বাভাবিক ভঙ্গিটিও রক্ষা পেয়েছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরম উৎকর্ষ দেখতে পাই 'বীবাঙ্গনা কাব্যে'। এখানে এই ছন্দ বিভিন্ন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ভাবভঙ্গীকে প্রকাশ করাব জন্যে বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত' শুধু মহাকাব্যিক মহিমা এবং ওজস্বিতাই নয়, গীতিকাব্যিক কমনীয়তা কান্তি ও মাধুর্যকে রূপায়িত করতেও এ ছন্দের প্রয়োগ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এ ছন্দের নমনীয়তা ও চাবুতার এখানেই পরাকাষ্ঠা। অমিত্রাক্ষব ছন্দের এই গুণটিও 'পদ্মাবতী' নাটকেই যেন প্রথম উঁকি দেয়—

যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনি,
যযাতির প্রণয়িণী দৈত্যরাজবালা
শর্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব

গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্য-রত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা। —পদ্মাবতী, ৫/২

একে মনে হয় অমিত্রাক্ষরে রচিত ঠিক যেন একটি মুক্তোর মতোই ছোট্ট উজ্জ্বল গীতিকবিতা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টির গুরুত্ব দু'দিক থেকে বিচার্য হতে পারে।— এক : সেই নতুনত্ব সেই বিশেষ স্রষ্টার নিজস্ব সৃষ্টিকে কতখানি মহিমা দান করেছে? দুই : সেই নতুনত্ব সমগ্র জাতির সাহিত্যে পরবর্তীকালে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে অর্থাৎ সাহিত্যে সেটি কোনো নতুন ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছে কি না কিংবা তার কোনো উত্তরাধিকার রাখতে পেরেছে কি না?

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে দেখি তিনি দু'টি ধারায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন—নাটকে এবং কাব্যে। এই দুই ধারার মধ্যে কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ব্যাপকতর ও সার্থকতর হলেও এই ব্যবহার মধুসূদনের সৃষ্টিকেই মহিমান্বিত করেছে বেশি। বাংলা কাব্যের পরবর্তী ধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের উত্তরাধিকার বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দেয় না। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যধারায় প্রভাববিস্তারের দিক থেকে কাব্যের তুলনায় নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অমিত্রাক্ষর ছন্দই অল্পবিস্তর পরিবর্তিত করে বাংলা নাটকে বহুলভাবে ব্যবহার করেন গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্রের অসম-চরণ অমিত্রাক্ষর এবং রবীন্দ্রনাথের সমিল প্রবহমান ছন্দের মূল ভিত্তি ঐ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এই দিক থেকে একটি নতুন পথনির্দেশের তাৎপর্যমণ্ডিত। এখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের যে ত্রুটি বিচ্যুতি তা প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা অপরিহার্য বলে ক্ষমার্হ ; এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাটি।

একটি রম্যরচনা :

৫. রবীন্দ্র-ঋতুচিত্র : বর্ষা-প্রসঙ্গ

নিদাঘের দাবদাহে দগ্ধ-কণ্ঠ জীবকুলের আকুতি বিফল হয় না—বর্ষা বুঝি আসে।.......

ম্রিয়মাণ যারা, তারা থাকে নব জীবনের আশায়, বিশীর্ণ প্রকৃতি অপেক্ষা করে—ঐ বুঝি শোনা যায় তার পদধ্বনি—

'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।''

কিন্তু যার আগমনের জন্য এত আকুতি, এত আয়োজন, সে সহজে আসে না। আগে পাঠায় তার বার্তাবহ। প্রকৃতিকে সে সচেতন করে যায়, সুপ্ত, ম্রিয়মাণকে উত্থিত জাগ্রত করে যায়, তার উদ্দাম নট-লীলা বিশ্বকে আলোড়িত করে যায়। কালবৈশাখীর নৃত্যের তালে তালে কবির মনও নেচে উঠে গেয়ে ওঠে—

'হে উতলা, শোনো কথা শোন,
মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু
নৃত্যমাঝে নেচে উঠে উরু
কাহারে করিবে রোষ—
কার' পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু।।'

উদাস প্রকৃতি প্রত্যাশা করে তার শূন্য কাননে সেই নব সৌন্দর্যের নব-প্রকাশ। নিষ্পত্র বৃক্ষপল্লবে শ্যাম সম্ভারের আনন্দ-সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশের বাসনায় ব্যাকুল। থেকে-থেকে সচল সমীরণে শ্রাবণের কৃষ্ণাভ উত্তরীয় গগনের প্রান্ত দিয়ে উঠে যায় তবু তার দেখা নেই। সময় কাটে।.....

সে-ও না এসে পারে না। বিশ্বের সকল মেঘপুঞ্জ গলে ঝরে পড়ে অবিরাম ধারায়। মহোল্লাসে কবি বর্ষাকে বরণ করেন, কুলবধূদের আহ্বান জানান তাঁর মনোহারিকা, অভিসারিকারূপে—

'কোথা তোরা অয়ি তরুণী. ....
*   *   *
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুর
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়-সুখ-ভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে আয় ভাবকুললোচনা
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী।'

কবির আহ্বান তারা শোনে, তারা সাড়া দেয়, উচ্ছ্বসিত আনন্দে বর্ষাকে বরণ করে, কবির সাথে অভিনন্দনী গায়—

"আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।'

বৃষ্টিতে তাদের মন ছুটে যায়—

"ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।"...

অন্তরে কলধ্বনি ওঠে। হৃদয়দ্বার ভেঙ্গে যায়, বন্ধন মানে না, বুঝি—

"হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।"

হৃদয়ের নৃত্য কবিব চোখে ধরা পড়ে—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচেরে।

সজল সমীরণে চলে-যাওয়া শৈশবের দিনগুলি মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসে, কবির মনে পড়ে আষাঢ়-সন্ধ্যায় বসে ছড়া আবৃত্তি করা—

দিনের আলো নিবে এল, সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ্।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ্ ঢঙ্।'....

কলাপ-কলাপীর নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীত ধরে দাদুরী, কুসুমের বাসে মন মেতে ওঠে—

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তালকুঞ্জ-তিমিরে।
.....ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত দাদুরী বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।'

তখন 'শতশত গীত মুখরিত বন-বীথিকা' কবিকে বাইরে নিয়ে যায়। ঘরের গণ্ডির বাইরে এসে কবি আর এক নূতন রূপ দেখেন, দেখেন কার নবীন সাজ—

কেতকী-কেশরে কেশপাশ সুরভিত, ক্ষীণ কটিতটে করবী-শেফালির মালিকা-বেষ্টনী নয়নে অঞ্জন আঁকা, স্মিত বিকশিত বদন, কদম্বরেণুর ফুল-শয্যা। এ কোন্ শুভ মুহূর্ত! এ যে সেই মহামিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ!....তবে 'সে' কোথা? সে আসে না কেন?—বিলম্ব

করে কেন? বুঝি আহ্বানের অপেক্ষা করে—চায় আগে মাধবের মুরলী-ধ্বনি। মাধবী-প্রকৃতিকে কবি আহ্বান জানান—

"জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-রাগে ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে।
কোথা পুলকের তুলনা
নীপশাখে সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।"

এমন সময় সহসা—

"ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।'

—এগিয়ে আসছিল সে, কিন্তু তার ভয় হল, সে ফিরে গেল—দূরে চলে গেল। কবির প্রাণ উন্মুখ।— সে কি আর আসবে না? সময় কেটে যায়, তার দেখা নেই। কবির মনে জাগে বিরহ 'বাত্রে হাওয়া দেয়; ধরণী শয্যার 'পরে বসে বুক ব্যথিয়ে উঠে।' মনে হয়, 'তারি পাশে আছি তবু নির্ব্বাসন!' ......

বর্ষাসুন্দরী আর বর্ষাকবি – দুই শাশ্বত প্রেমিক - জোড়। প্রেমে - বিরহে চলে তাদের এমনই লীলা।

কিন্তু এখন এসেছে দীর্ঘ বিরহ। এবার প্রেমিকের আত্মগোপন– প্রেমিকার হৃদয়-বেদনা। প্রেমিকা বর্ষা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার প্রিয় প্রেমিক কবিকে – কোথায তিনি? তার উত্তর উৎসারিত বিরহ বাণী দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে যায়—

"বর্ষাসুন্দরী নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে?"

—হে বর্ষাকবি, বিরহিণী বর্ষার এই বিচ্ছেদ বেদনার অবসান হবে কবে? আবার কবে হবে সেই মিলন?

৬. দেশবন্ধুর কবিতা

কর্মযোগী চিত্তরঞ্জনের দেশসেবা ও সুমহান্ আত্মত্যাগের স্বীকৃতি তাঁর 'দেশবন্ধু' আখ্যায় চিহ্নিত করলেও এতে তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়কে আমরা প্রচ্ছন্ন করেছি অনেকখানি। 'দেশবন্ধু' অভিধা তাঁর জীবনের শুধু একদিকেরই রূপোদ্‌ঘাটন করে এবং তাই তার খণ্ডিত পরিচয় বহন করে মাত্র। আবার এই অভিধা তাঁর শুধু একদিকের পরিচিতি বহন করেই নীরব নয়, তাঁর অন্যদিকের পরিচয়টিকে আবৃত করার জন্যেও অনেকখানি দায়ী। সূর্য উদিত হয়ে যেমন নিজের প্রতিষ্ঠাই শুধু ঘোষণা করে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক তারকার রশ্মিকে করে প্রচ্ছন্ন, চিত্তরঞ্জনের জীবনে দেশবন্ধুত্বের আবির্ভাব তেমনি তাঁর একটি জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করেই নিবৃত্ত নয়, অনেকটা অজ্ঞাতসারেই যেন তাঁর জীবনের অনেক স্নিগ্ধ সুন্দর তারকাকে করেছে আবৃত। চিত্তরঞ্জনের জীবনাকাশের এই রমণীয় স্নিগ্ধ তারকাগুলি হল তাঁর অনবদ্য গীতিকবিতামালা।

চিত্তরঞ্জনের কবি-জীবনের সূত্রপাত তাঁর যৌবনেই। ১৮৯৬ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। তারপরে ক্রমান্বয়ে পাই 'মালা' (১৯২০), 'সাগব সঙ্গীত' (১৯১৩), 'অন্তর্যামী' (১৯১৪) এবং 'কিশোর কিশোরী' (১৯১৫)। সুদীর্ঘ প্রায় বিশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে পরিমাণের দিক থেকে চিত্তরঞ্জনের সৃষ্টি বিস্ময়কর কিছু নয়, গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকেও তাকে প্রথম সারিতে বসাতে হয়তো অনেকে কুণ্ঠিত হবেন। কিন্তু একথা যদি স্বীকার করি যে কবিদের মধ্যে ছোট বড় বিচারটা বেরসিকের দোকানদারি, রসিকজন শুধু জিজ্ঞাসা করবেন কবি খাঁটি না কৃত্রিম, তবে বলতে হয় চিত্তরঞ্জন যথার্থ খাঁটি কবি। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে অনুভূতির আন্তরিকতা সাফল্যের প্রথম শর্ত এবং কৃত্রিমতার খাদ এক আত্মঘাতী মরীচিকা। দেশবন্ধুর কবিতার আকর্ষণ এই জন্যে যে তাঁর হৃদয়ের সত্য-ভাষণ এতে গুঞ্জরিত এবং যুগপ্রবণতা থাকলেও যুগগত ম্যানারিজম্ তাকে গ্রাস করেনি।

দেশবন্ধুর কবি-ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয় ধরা পড়েছে তাঁর যেসব কবিতায় সেগুলিতে আমরা মানব-হৃদয়ের তিনটি মৌল বৃত্তি সক্রিয় হতে দেখি—মানবীয় প্রেম, ভগবৎ-ভক্তি ও নিসর্গচেতনা। কবিচিত্তের এই মূল ত্রিধারা অনুসারে তাঁর কবিতাগুলিকে মোটা রেখায় আমরা এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি ঃ প্রেম বিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক এবং প্রকৃতি বিষয়ক। এই শ্রেণী বিন্যাস নিশ্চয়ই চরম কিছু নয়; শিল্প-সৃষ্টির শ্রেণী-বিভাগ বৈজ্ঞানিকের শ্রেণী-বিভাগের মতো নিখুঁত হতেও পারে না। প্রাকৃত জনের আলোচনার সুবিধার জন্যেই এর কিঞ্চিৎ উপযোগিতা রয়েছে, অন্যথা শুধু রসোপলব্ধির প্রেরণায় যদি চিত্তরঞ্জনের সৃষ্টির দিকে তাকাই তা হলে এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও একটি অন্তরালশায়ী ঐক্য, একটি জৈবিক অখণ্ডতা অবশ্যই লক্ষ্য করা যাবে।

দেশবন্ধুর কাব্যসৃষ্টির সূচনা প্রেমকে আশ্রয় করেই এবং প্রেমই তাঁর প্রথম দিকের সৃষ্টিতে প্রায় সার্বভৌম স্থান অধিকার করে আছে। সমাজসেবা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিণত বয়সের দেশবন্ধু অতিমানবীয় মহিমায় ভূষিত, ব্যক্তিগত জীবনের ভোগবিলাস

ত্যাগ করে যে বিরল দৃষ্টান্ত তিনি ভারত-ইতিহাসে বেখে গেছেন, তা তাঁকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সেখানে সাধারণ মানুষের জৈব ধর্মের বহু ঊর্ধ্বে আসীন তিনি। কিন্তু প্রথম বয়সের চিত্তরঞ্জনের এক ভিন্নতব রূপ ধবা পড়েছে তাঁর কবিতায়, যখন তিনি মানবীয জীবন ও জীবিকার জন্যে অত্যুৎসাহী, মানবীয় সুখ ও প্রতিষ্ঠার কামনায় তাঁর যৌবনেব রক্ত যখন চঞ্চল। এ বযসেব প্রেমেব কবিতাগুলিতে চিত্তরঞ্জন ভাওযালের কবিব মতই প্রেযসীকে ভালবেসেছেন 'অস্থিমজ্জাসহ'। এখানে তিনি সর্বত্যাগী অতিমানব নন। পুরোপুরি জীবন-বস-পিপাসু মানুষ। প্রেম ও সুবার নিরবচ্ছিন্ন মদিবায কবি এখানে চরমভাবে নিমগ্ন থাকতে চান ঃ

"দিও না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিশ্বাস,
আবক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিযা মুখ,
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ, কোথা দুখ।
মলিন গম্ভীব দিন লাগে না গো ভাল,--
অনলে দহিতে চাই, স্বর্ণ-সুবা ঢাল।"

—দিবসে, মালঞ্চ।

সুবা ও দেহমদিবায নিমগ্ন চিত্তবঞ্জনেব এ পরিচয আমাদেব বিস্মিত করে। আবাব দেশপ্রেম যখন তার চিত্তকে অধিকাব কবল তখন তাঁব জীবননাট্যেব দ্রুত পটপবিবর্তনেও আমবা কম বিস্মিত হই না। ভোগে পবিপূর্ণ জীবনপাত্র থেকে যখন তিনি মুখ ফিবিয়ে নিলেন, তখন আব একবাবেব জন্যেও পিছু ফিবে তাকান নি। চবম ভোগ থেকে আত্যন্তিক ত্যাগে চিত্তবঞ্জনেব এই পবিবর্তন অনন্যসাধাবণ হলেও কবিদেব জীবনে এবংবিধ ঘটনা একান্ত দুর্লভও নয়। এ বকম পরিবর্তন হলে বোমাণ্টিক কবিবা তাঁদের বিলাস-সঙ্গিনীকে ভোগোত্তীর্ণ জীবনে যে স্বপ্নসঙ্গিনীতে রূপান্তবিত কবে নিতে পারেন, চিত্তরঞ্জনও তা স্বাভাবিকভাবেই পেবেছেন। কিন্তু যৌবনলীলাব সঙ্গিনীকে কবি তাঁর কাব্যে যতখানি প্রকাশ কবেছেন, কল্পনা-সঙ্গিনীকে ততটা প্রকাশ করতে চাননি। ববং তাকেও অতিক্রম কবে তখন গণদেবতা ও বিশ্বদেবতাব প্রতি প্রেম তাঁব মধ্যে প্রবল হযে উঠেছে।

চিত্তবঞ্জনেব প্রথম জীবনেব বচনায যেমন প্রেমবিষযক কবিতাব প্রাধান্য রযেছে, তেমনি পবিণত বযসেব বচনায় ঈশ্বব বিষযক কবিতাব আধিক্য দেখা যায। 'সাগব সঙ্গীতে' কবি যে কথা সাগবকে উদ্দেশ্য কবে বলেছেন তা বস্তুত কবিব নিজেব সম্পর্কেই প্রযোজ্য ঃ

"সাধন ভজনে আজি কুমুদ উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভবে। তোমাব নযন দুটি
ভক্তিবসে ঢুলু ঢুল।"

—সাগব সঙ্গীত, ৩৬।

'সাগব সঙ্গীতে' কবি অসীম নীলাম্বুরাশিব কাছে পেযেছেন অসীমেবই ডাক। তখন তাঁব সীমাব জগতেব 'হযেছে সকল প্রেম- -সকল কর্মেব শেষ', এপাবেব কর্ম অবসানে যেন ওপাবেব অপেক্ষায বসে আছেন কবি

"ওপারে কি আলো জলে রহস্যের মত,—
যে আলো দেখিনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়?
ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শোনেনি কেহ দিবসে নিশায়?
* * *
আমারে ডুবায়ে দাও ওগো মহাপ্রাণ।
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপারে....
* * *
এপার ওপার করি পারি না ত আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!"

—সাগর সঙ্গীত, ৩৮,৩৯।

সাগর সঙ্গীতের পরের কাব্য হল 'অন্তর্যামী'। এ কাব্যে চিত্তরঞ্জনের ঈশ্বর সমুদ্রের অসীমতায় আর নেই, ঈশ্বর এখানে কবির কাছে এসেছেন কবির প্রাণের সাকার সসীম ঠাকুর হয়ে। এই প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে কবির লুকোচুরি খেলার আত্মগুঞ্জরণই হল তাঁর 'অন্তর্যামী' কাব্য :

"গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব
মনে মনে সেই গান তোমায় শোনাব!"

চিত্তরঞ্জনের ঈশ্বরবিষয়ক কবিতার পরিসমাপ্তি হয়েছে ভক্তি-রসের কোমলতায় এবং ভগবানের সঙ্গে ভক্তের চিরন্তন লীলা–বিলাসে প্রেম বিষয়ক ও ঈশ্বরবিষয়ক কবিতার তুলনায় চিত্তরঞ্জনের বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বিশেষ করে যৌবনে চিত্তরঞ্জনের কবিচিত্তে প্রকৃতির আবেদন ছিল খুবই কম। এই জন্যে তখন প্রেমের কবি হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতা তিনি বেশি রচনা করেননি। পাশ্চাত্যের রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী বা রবীন্দ্রনাথের মত দেশবন্ধু প্রথম যৌবনে প্রকৃতির নিজস্ব সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেননি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত প্রকৃতির অধ্যাত্মস্বরূপের উপলব্ধি তাঁর কাছে তখন অনায়াসলভ্য হয়নি। প্রকৃতি তাঁর কাছে তাই নিছক মানবীয় অনুভূতি প্রকাশের পটভূমিকা হয়েই ছিল, স্বয়ং একটি চরিত্র হয়ে ওঠেনি। সন্ধ্যার শান্তি কিংবা সমুদ্রের ব্যাপ্তি তাই তাঁর কাছে প্রথমে পরম প্রভুর পদে ভক্তের আত্মনিবেদনের উপযুক্ত পরিবেশই শুধু রচনা করেছে, স্বয়ং একটি সত্তা হিসাবে কবির দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনিঃ

"আজি কেন, আজি কেন,
আকুল পরাণ হেন?
শতধারা ভাঙ্গি' যেন যাইবে ছুটিয়া!
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে,
ধূসরিত সাগরান্তে,
তোমার চরণপ্রান্তে পড়িবে লুটিয়া।"

—সান্ধ্য সাগরে, মালঞ্চ।

দুই-একটি ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে মানবানুভূতি প্রকাশের পটভূমিকারূপে না দেখে কবি প্রকৃতির এক-একটি সৌন্দর্যের আধারকে চরিত্ররূপে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু সেখানেও প্রকৃতির কোন গভীরতর আন্তর সত্তার উপলব্ধি নেই, নিতান্ত বাহ্যরূপের উপরেই মানবীয় ভাবারোপের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ঃ কবি যেমন পূর্ণিমাকে সম্বোধন করে বলেছেন—

"সতত সরস হাসি পূর্ণিমা আমার।
জীবন ডুবিয়া গেছে হাসিতে তোমার!
আমি নিশি, তুমি চাঁদ,
ভেঙ্গেছে জীবন বাঁধ
ভাসায়ে হৃদয় মোর প্রেয়সী আমার!
সতত সরল হাসি অধরে তোমার!"

—পূর্ণিমা মালঞ্চ।

এসব ক্ষেত্রে মহান্ রোমাণ্টিক কবিদের মত দেবযানী কল্পনার উত্তুঙ্গ বিহার নেই, গার্হস্থ্য মানুষের বাসর কক্ষেব মামুলি কল্পনার ক্ষণিক স্ফুরণে কবিকৃতির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাই 'পূর্ণিমা' তার নিসর্গব্যাপ্তি হারিয়ে কবির গৃহবধূরই রূপ গ্রহণ করেছে। 'জোছনা'ও কবিব কাছে একই রূপে প্রতিভাত ঃ

"এস প্রিয়ে স্বপ্নময়ী!
প্রেমময়ী সুধাময়ী!
কাছে এসে একবার দাঁড়াও হাসিয়া!—
সায়াহ্ন সঙ্গীত তলে,
পুষ্পিত প্রদোষ কালে,
স্বপ্নভরা রূপ তব রাখ বিস্তারিয়া।"

— জোছনা, মালঞ্চ।

কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিসর্গ চেতনার এক ব্যতিক্রমী পরিচয় রয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'সাগরসঙ্গীতে'। এখানে তিনি প্রকৃতির এক মহান রূপের বন্দনা গেয়েছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন সাগরের মধ্যে এক অসীম সত্তাকে। সাগর যে তাঁর কাছে অসীমের আহ্বান এনে জীবাত্মার সীমামুক্তির সন্ধান দিয়েছে, সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই ক্ষীণভাবে লক্ষ্য করেছি। শেষে নিসর্গ কবিকে অসীমের পানে টেনে নিয়ে গেছে; কিন্তু এই অসীমের চেতনায় কবি-চিত্তের নিমগ্নতাই কবিকে নীরব করেছে ক্রমে-ক্রমে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ব্যবহার করে বলা যায়—ভ্রমর যতক্ষণ ফুলের উপরে না বসে ততক্ষণই সে গান গেয়ে বেড়ায়। তারপর যখন ফুলের উপর বসে সে মধু খেতে আরম্ভ করে তখন সে নীরব হয়ে যায়, তার গান যায় থেমে। বোধ হয় অসীমের আস্বাদ পেয়েই চিত্তরঞ্জনের কবিকণ্ঠও নীরব হয়ে গিয়েছিল।

৭. আধুনিক বাংলা কবিতা : একটি প্রশ্ন

কৃষ্টির ধারাকে বলতে চাই নদীর ধারা। সে ধারা কখনো দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে, কখনো ক্ষীণপ্রাণ হয়ে বয়ে চলে, কখনো আবার শুকিয়ে যায় একেবারে। কৃষ্টির এই প্রবাহ যখন মন্থর হয়ে আসে, তখন বান ডেকে যায় সেখানে ক্রান্তির নবোচ্ছ্বাসে। একে বলি, ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ক্রান্তির বন্যা না এলে জীবনে এবং সমাজে নতুন প্রাণ পেতাম না। প্রাণ না পেলে প্রগতি হত না।

সাহিত্যকে ধরেছি কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ বলে। সাহিত্যেও তাই আসে যুগে যুগে ক্রান্তি। ক্রান্তি নিয়ে আসে প্রাণ। প্রাণ চলে প্রগতির পথে এগিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে—বাংলা কাব্যে—এমনি দু'টো বড় ক্রান্তিকাল হল ষোড়শ শতকের চৈতন্যযুগ আর উনিশ শতকের নবজাগরণ Renaissance। দু'টোই, দেখেছি বাঙ্গালীর দু'টো বড় নব-জাগরণের—নতুন সংগঠনের যুগ। আমাদের সমাজে সভ্যতার উৎক্রান্তিমুখীনতার দু'টো বড়ো ইতিহাস বিধৃত রয়েছে এই দুই ক্রান্তিকালে। তার পরে, বলা হয়, আর একবার ক্রান্তি এসেছে বাংলা কাব্যে, বাংলা সাহিত্যে। এই ক্রান্তি অবশ্য আগের দুটোর মতো কোন মহৎ আত্ম-উদ্বোধনের, কোন নব-সংগঠনের ইতিহাসকে আশ্রয় করে নেই। বরং একটা বিরাট ভাঙনের বিষাদময় স্বীকৃতিতেই এই ক্রান্তিকালের সাহিত্যের সংগঠন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্রান্তিকালের অভিধা দিয়েছেন অনেকে— 'কল্লোল যুগ' (সূচনা ১৩৩০ বঙ্গাব্দে)।

বাংলা কাব্যে যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণুতা ও ভাঙনের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে এই যে 'কল্লোল যুগ' আজ তো তার সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের কোন ব্যবধান নেই। একজন পশ্চিমী কবি আমাদের কাছে এই যুগের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন—

> This is the way the world ends
> This is the way the world ends
> This is the way the world ends
> Not with a bang, but a whimper ![১]

মনে হয়েছে এ যুগ চরম নারকীয় যন্ত্রণার যুগ : এই নরকের গানই হয়েছে এ যুগের কবির সামগান—

> অমেয় জগতে
> নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ;
> মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
> সংক্রামিত মড়কের কীট;
> শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
> অতএব পরিত্রাণ নাই। ...

—সুধীন্দ্রনাথ : 'নরক'।

১। T.S Eliot The Hollow Men

এ যুগের ক্ষয়িষ্ণু জীবন তাই আত্মরক্ষার জন্যে আপ্রাণ যুদ্ধরত। এ জীবনে তাই অনেক আবর্ত, অনেক তির্যক্ গতি; অনেক জটিলতা। কাব্যেও তাই এল দুর্বোধ্যতা, দুরূহতা, বিক্ষিপ্ততা। এ যুগের কবি-সমালোচক এইজন্যেই বলতে বাধ্য হয়েছেন—

Our civilisation comprehends great variety and complexity playing upon a refined sensibility, must produce various and complex results The poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to disolate, if necessary, language into his meaning.[২]

এ যুগের শিল্পোদ্যোগে, যন্ত্রজীবনে তাই বাস্তবতাই ধ্যান, এ যুগের অবসরের গানও হট্টগোলের আতঙ্কে পীড়িত। এসবই আমরা জানি—একই সুরে সবাই আমরা এই কথা বলে আসছি! একটি প্রশ্ন কিন্তু এর পরে না এসে পারে না : আধুনিক যুগের গোলযোগে গলা-যোগ করেছেন এই যে আধুনিক কবিরা, তাঁদের সাধনার সিদ্ধি কি এইখানে? জীবনে ও কাব্যে এই যে ক্ষয়িষ্ণু যুগ, এই কি আমাদের কৃষ্টির ধারার সাগর-সঙ্গম?

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিজেদের কাছে। আমাদেব অন্তর-পুরুষ কি বর্তমান যুগ ও জীবনকে নিয়েই তৃপ্ত হয়েছে? বর্তমান সমাজের ভাঙন ও চক্রাবর্তে নিষ্পিষ্ট হয়েই কি জীবনেব মহত্তম সিদ্ধির আনন্দ পাব? নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের এক উত্তর হবে বর্তমানকে আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু বর্তমানই আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। ভাঙন জীবনেরই একটা সত্য, কিন্তু এই ভাঙনও আব একটা মহত্তম সংগঠনের জন্যেই। নইলে ভাঙনের এমন স্বীকৃতি আমাদের কাছে হত না।

মৃত্যুকে আমরা চাই, কিন্তু মৃত্যুকে মৃত্যুর জন্যে চাই না। মৃত্যু আমাদের জীবনের সঞ্চিত আবর্জনাকে ধুয়ে জীবনকে করে শুদ্ধ, সুন্দর, বার-বার তাকে ভেঙে নতুন করে গড়ে—এতেই জীবনে মৃত্যুর প্রয়োজন অনুস্যূত। মৃত্যুকে চাই না , চাই অমরত্বকে। মৃত্যু হয়েছে সেই অমৃত সাধনার সহায় মাত্র। ভাঙন ও মৃত্যুর এই সার্থকতা যুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যের কবিরা হয়তো ধরতে পারেন নি, কিংবা অবসরও হয়তো পান নি এত কথা ভাববার। হতে পারে, দুঃখ-মৃত্যু-ভাঙনকে আমরা চিরকাল স্বীকার করতে ভয় পেয়েছি বলেই তাঁরা আরো জোর গলায় তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। মৃত্যুর পথ অতিক্রম করেই হবে তাঁদের অমরত্ব লাভ, পিতামহ যেমন বলেছেন—

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

কিংবা মহাকবি দান্তে যেমন স্বর্গযাত্রার জন্যে প্রথমে নেমেছিলেন নরকে।

কিন্তু আজ আবার সেই প্রশ্ন উঠেছে,—দুঃখ-মৃত্যু-জরা-ভাঙন – এই কি জীবনের পরম প্রাপ্য, সর্বশেষ এষণা? এই প্রশ্নই আনতে চাইছে বাংলা কাব্যে আর এক ক্রান্তিকাল। কল্লোলের পরে একে বলব আর এক ক্রান্তিকাল, কিংবা তারই পরিপূরক দিব্যপরিণতি। বাংলা কাব্যে এই নতুন ক্রান্তির পদধ্বনি বেজেছে। কবি তাই নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছেন মৃত্যু ও তমিস্রার যথার্থ উপযোগিতা—

২। T S Eliot · 'Selected Essays' p 289

"ডুবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে নয়তো কেমন করে বেঁচে উঠবে আবার?
লুপ্ত হতে হবে পাতালে নয়তো কেমন করে ফিরে আসবে আলোয়?"
—বুদ্ধদেব বসু : 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'।

এ যুগের এক কবি-মনীষী এই কথাই ঘোষণা করেছেন তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টি থেকে—

He has need of darkness to perceive some light,
And need of grief to feel some bliss.
He has need of death to find a greater life.[৩]

আমাদের চরম নৈরাশ্যের যুগেও কবির অন্তরে প্রচ্ছন্ন আশাবাদ। অপূর্ব একটি কবিতায় তাই কবির বিহ্বল প্রশ্ন : শ্রী ও ছন্দকে কেন যে খুন করে ছুরিকা?—

"মরচে-পড়া এই মৃত্যুদৃশ্য কি
পুনর্জন্মেরই ভূমিকা?
হঠাৎ মনে মনে যে-পরিকল্পনা—
মরবে সে-ও, তাই উপক্রমণিকা।
ধ্রুব সে-উত্তরে কাব্যজিজ্ঞাসা—
এখনো কতো অবধৃতিকা!
কী জানি, প্রশ্নের ধরনে ভোঁতা ঐ
শ্রী ও ছন্দকে—
কেন যে খুন করে ছুরিকা?" —বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

আমাদের বক্তব্য হল—প্রত্যেক নবযুগের জোয়ার তখন আসে, যখন প্রথমে থাকে একটা উত্তেজনা, উন্মাদনা, বিক্ষোভ, প্রচণ্ডতা। জাতির দৃষ্টি তার পরে হয়ে আসে শান্ত, প্রত্যয়বান ও সংগঠনশীল। বাংলার নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে এমনি দেখি 'হিন্দু কলেজ' ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রচণ্ড উন্মাদনা। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন— It was more a destruction of the old than a construction of the new. এই আবেগ, এই উচ্ছ্বাস যখন শান্ত হয়ে এল, তখনই পেলাম প্রকৃত বড় সৃষ্টি, মহৎ সংগঠন। পেলাম যথার্থ নবযুগ-স্রষ্টা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমকে। আমাদের আধুনিক কালেও এই প্রচণ্ডতা, এই কল্লোল আজ শান্ত হয়ে আসছে, জীবনদৃষ্টির বিক্ষুব্ধ ঘোলা-জল থিতিয়ে স্বচ্ছ হয়ে আসছে। এই স্বচ্ছতার জন্যেই জীবনের একটা লক্ষ্য, একটা অর্থ ধরা পড়ছে কবিদৃষ্টিতে। আধুনিক বাংলা কাব্যের যে পাঁচজনকে প্রধান ("major five") বলে ধরা হয়, তাঁদের জীবনদৃষ্টির মধ্যে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা-না-একটা দৃঢ় প্রত্যয়। বুদ্ধদেব প্রেম ও কাব্য-সত্যে আস্থাবান্। সুধীন্দ্রনাথের 'নেতি'র উল্টো পিঠে রয়েছে 'ইতি'র পরোক্ষ স্বীকৃতি। বিষ্ণু দে সাম্যবাদী আদর্শে প্রত্যয়বান। এমনকি যে জীবনানন্দ ছিলেন 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি,' তাঁরও কবিমানসে আসন পেতেছে রোমান্টিক সত্যের শেষ বিজয়ে অব্যভিচারী শ্রদ্ধা—

শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক

৩। Sri Aurobindo : 'SAVITRI, Book III, Canto IV

তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

—'নীলিমা'।

আর সবচেয়ে লক্ষণীয় অমিয় চক্রবর্তীর আশ্চর্য বিশিষ্ট সুর—নব্যবিজ্ঞান ও অমৃতবিদ্যাকে সমন্বিত করার, দিব্যসত্যের প্রতি আস্থার, এক বিশিষ্ট সুর—পরম পুরুষের কল্যাণধর্মে সুদৃঢ় প্রত্যয়—

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।..
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

—'সংগতি'।

আধুনিক বাংলা কাব্যে নানাভাবে যিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেই এলিয়টের জীবনেও দেখছি আশ্চর্য রূপান্তর। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর মনে হয়েছিল—এই জীবন ও জগতে আর কিছু উর্বরতা রইল না, সবই হল 'পোড়ো জমি' (Waste Land)—

Here is no water but only rock—
Rock and no water and sandy road

সেই Waste Land ও Hollow Man এর কবির জীবনদৃষ্টি ক্রমে আরো প্রশান্ত হল, প্রজ্ঞাবান হল। প্রবীণ প্রাজ্ঞ জীবনদর্শন যখন গড়ে উঠল, তখন এল প্রসন্ন নিরাসক্তি। তাঁর খুঁজে পেলেন অমৃত পুত্র মানুষের জীবন সাধনার প্রকৃত যুগোপযোগী পথ—'অহং থেকে মুক্তি ও নিষ্কাম কর্মসাধনা। 'অহংকে উত্তীর্ণ হবার সাধনাই তিনি করেছেন' এখন থেকে কর্মহীনতা নয় নিষ্কাম কর্মই তাঁর লক্ষ্য। Waste Land-এর Inferno ও Four Quartets এর এই Paradiso (নাকি এখনও Purgatorio?) এমন এক অবাঙমনসোগোচর জগতের অবতারণা করেছে যেখানে মানুষের ভাষা প্রায় মন্ত্রের স্ফটিক-সংহত রূপ গ্রহণ করেছে।' আধুনিক বাংলা কাব্যজগতেও অনন্তের স্বাদ নিয়ে কেউ কেউ সাগর থেকে ফিরছেন। অনেকে আবার সাগর পানে নতুন করে যাত্রা করছেন। কণ্ঠে তাঁদের ব্যাকুল অমৃত পিপাসা।

বাংলা কাব্যে এই স্বতন্ত্র সুরের আর এক অধিকারী হলেন কবি নিশিকান্ত। রবীন্দ্র-সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তিনি অপরিচিত হতে চলেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে অমৃত-সংবেদনা একটি গভীর তীব্র লিরিক অনুভূতিময় প্রকাশ লাভ করেছে। কল্লোলের পরে আধুনিক বাংলা কাব্যে এসেছে যে নতুন পর্যায়, কবি নিশিকান্ত তার মধ্যে সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

যুগ ও জীবনের জটিল সংঘাতে আধুনিক বাংলা কাব্যের সুর বিচিত্র। কারো সুরে 'নেতি', কারো 'ইতি', কারো বা 'অজ্ঞেয়বাদ'। কিন্তু সকলেরই সোচ্চার আত্মঘোষণার মধ্যে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দৃঢ় প্রত্যয়ই উত্তর-ক্ষয়িষ্ণু যুগের (post-decadent period) একটা ইতিমূলক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনে। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য।

৮. নলিনীকান্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিত্যিক

'শিল্পে অশ্লীলের স্থান আছে, কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই।'—এই ছিল যাঁর সাহিত্যবিচারের একটি মূল সূত্র তাঁর জীবনদৃষ্টি যে কোনো নৈতিকতার গণ্ডির বা ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। জীবনে এবং সাহিত্যে এক উদার পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন এই মনীষী সমালোচক, নলিনীকান্ত গুপ্ত। জীবনের পূর্ণ রূপকেই সামনে রেখে প্রতীচ্যের সারস্বত ঐতিহ্যকে সাঙ্গীকৃত করেও পাশ্চাত্যের 'জ্ঞানের বিশ্বরূপ'কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনি। উনিশ শতকেই আমাদের চিত্তের দরজা খুলে গিয়েছিল পশ্চিমের সংস্কৃতির এই বিশ্বরূপের দিকে। সেদিন প্রধানত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই বিশ্বসংস্কৃতির সৌরলোকে প্রবেশ করে তার রশ্মিকে আমাদের ঘরে এনেছিলেন অধিকাংশ বাঙালী মনীষী। কিন্তু আরো একালে সাহসী সন্ধানী ছিলেন যাঁরা তাঁরা ইংরেজীর ঘুর পথে যাননি, সোজাসুজি পঠনীয় ভাষা-সাহিত্যের দরজা খুলেই তার সংস্কৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার ফসল এনে আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছিলেন বিচিত্রতর সম্পদে। এঁদের মধ্যে প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা গ্রীক-লাতিনের চর্চা করে এই পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং অনেক পরে মহামনীষী দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ। আর ইংরেজী ছাড়াও অন্যান্য আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার যাঁরা চর্চা করেন তাদের মধ্যে প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব এবং পরে প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণ মিত্র প্রমুখ কবি সাহিত্যিকের ফরাসী চর্চার কথা বিশেষভাবে মনে আসে। এই দ্বিতীয় ধারাতেই পড়ে বহুভাষাবিদ্ সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্তের বিশ্বসাহিত্য-জিজ্ঞাসা, তাঁর মনীষায় স্বদেশের বিদেশের দুই সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা সংস্কৃত ও ইংরেজীর সম্মিলন তো হয়েই ছিল, তা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান ভাষা সাহিত্যেও তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল। এই অধিকারই তাঁর মূল সাহিত্যদৃষ্টি গড়ে তুলেছিল। বিশ্বসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বহুকাল আগে যেকথা বলেছিলেন তা তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য-অন্বেষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে : 'এই বিশ্বের হাওয়া যেখানে পাই না, সে শিল্পসৃষ্টি যতই মনোরঞ্জক, যতই চমৎকার, যতই সূক্ষ্ম বা নিবিড় হউক না কেন, তাহাকে কেমন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।...আর যেখানে এই জিনিসটা পাই সেখানে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাহা অতি সাধারণ কথাই হউক, তবুও সেখানে কথা তত্ত্ব অর্থ অপেক্ষা বড় একটা জিনিসই পাই, আমরা সেখানে তৃপ্ত, চিত্ত সেখানে আমাদের কেমন ভরাট হইয়া যায়।' (রচনাবলী ১/২২)। দেশভাবনা, সমাজজিজ্ঞাসা ও সাহিত্য সমালোচনামূলক তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থাবলীতে যে বিশ্বতোমুখ বিদগ্ধ মানসিকতার স্পর্শ পাই তা বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে তো পরিপুষ্ট করেছেই, তা ছাড়া বাঙালীর মন ও মানসিকতাকে ডাক দিয়েছে আজকের বহু ঘোষিত যুগধর্ম বিশ্বমানবতার দিকে, সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার দিকে।

একশ' বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। শৈশবের প্রথম ভাগ কাটে উত্তরবঙ্গের রংপুরে। স্কুলের পড়া শেষ করে সেকালের প্রথম সারির মেধাবী ছাত্রদের মতো, ভর্তি হয়েছিলেন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে। সে-সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যান্য কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বিশ্বাস, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিনয় সরকার আর অতুল গুপ্ত। অতুল গুপ্ত ছিলেন তাঁর ছাত্রজীবনে Friend, Philosopher and Guide', আর তিনি ছিলেন অতুল গুপ্তের 'সাকরেদ, সর্ব বিষয়ে—দেশসেবায়, পড়াশোনায়' ('স্মৃতির পাতা')। সেটা ১৯০৫ সালের কাছাকাছি সময়। সুতরাং সেকালের অনেক ভাল ছেলের মতোই অগ্নিযুগের স্বদেশী মন্ত্রের ডাকে কলেজের পড়া ছেড়ে তিনিও শেষে যোগ দিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী গোষ্ঠীতে যার প্রাণপুরুষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। সে ইতিহাস আমাদের জানা, যার শেষ পর্বে মানিকতলার মুরারিপুকুরে বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু যে ঘটনা অনেকেই আমরা জানি না, তা হল মুরারিপুকুর বাগানে যে বোমা প্রস্তুত হল তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য একদল কর্মীকে পাঠানো হল দেওঘরের কাছে এক পাহাড়ে। সেই দলে ছিলেন নলিনীকান্ত। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্তও ধরা পড়েন। তারপরে ১৯০৮ সালের ২মে থেকে ১৯০৯-এর ৬ মে পর্যন্ত আলিপুর জেলে থাকার পর ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মামলায় মুক্তি পেয়ে মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে, অমৃতসাধনার পথ বরণ করে হলেন মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ। এই নাটকীয় পটপরিবর্তনে শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম অনুগামী ছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত। এর কয়েক বছর বাদে নলিনীকান্ত নীলফামারীতে (রংপুরে) ফিরে যান। তিরিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন। স্ত্রী ইন্দুলেখা দেবী স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। নলিনীকান্ত এর পর গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স সাঁইতিরিশ। অতঃপর ইন্দুলেখা দেবী তাদের তিন পুত্রকে লালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনিও পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ দেন।

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে হাতেখড়ি হয় শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়—বাংলা 'ধর্ম' এবং ইংরেজী 'কর্মযোগিন' পত্রিকার সঙ্গে নলিনীকান্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন জীবনের শেষ অবধি। পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত 'দ্য অ্যাড্‌ভেন্ট', 'বুলেটিন অফ্ শ্রীঅরবিন্দ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টর অফ্ এডুকেশন' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'কর্তিকা', 'শ্রী অরবিন্দ মন্দির অ্যানুয়াল' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনে তিনি ছিলেন যুক্ত।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের মতই নলিনীকান্তর জীবনেও দুটি ধারা যেন নিয়তিনির্দিষ্ট পথে এসে মিলিত হয়েছে—সাহিত্যসাধনা ও অমৃতসাধনা। প্রথম থেকেই বিশেষভাবে সাহিত্য সমালোচনায় অনুরাগী ছিলেন তিনি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' ও চিত্তরঞ্জন

দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত। 'কল্লোল' 'কালি-কলমের' যুগে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যোগস্থাপন করেছিলেন তিনিই। কালিকলমের প্রথম বর্ষে শ্রীঅরবিন্দের চারটি রচনার বাংলা অনুবাদ করেন তিনি— 'কর্মযোগীর আদর্শ', 'কর্মযোগ', 'উভয়ত' আর 'ভারতের অন্তরপুরুষের জাগরণ'।

কালিকলমের দ্বিতীয় বর্ষেও প্রকাশ করেন তিনটি রচনা—'ত্যাগধর্ম', 'ক্রমবিকাশের ধারা', ও 'ব্যষ্টির মহত্ত্ব'। পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। সুব্যাপ্ত তাঁর সারস্বত জীবনে ৬০টিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি, কিছু ইংরেজীতে এবং অনেকগুলি বাংলায়। এসব গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর রচনা হল—'সাহিত্যিকা,' 'রূপ ও রস', 'আধুনিকী', 'রবীন্দ্রনাথ', 'শিল্পকথা' 'কবির্মনীষী' আর 'বাংলার প্রাণ'। সমাজ ও সাহিত্যের নানা দিকে তাঁর প্রতিভার সঞ্চরণ ছিল।

বিশ্বসাহিত্যের রসসন্ধানী সমালোচক তিনি। সাহিত্য-সমালোচনার দুটি দিক— নান্দনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও প্রয়োগমূলক সমালোচনা,—দুটিই তিনি অভিনিবিষ্ট অধ্যয়ন ও উদ্‌ঘাটনে সমৃদ্ধ করেছেন।

শিল্পকলার মূলসূত্র থেকে শুরু করে ট্র্যাজিডির তত্ত্ব, কাব্যের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক, প্রতিভার মূল রহস্য, মিস্টিক কাব্যের স্বরূপ, সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা, বিশ্বসাহিত্যের তাৎপর্য ইত্যাদি নানা মৌল সমস্যা আলোকপাত করেছেন তিনি।

ব্যবহারিক সমালোচনায় প্রাচীন চর্যাপদের কবি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরো সাম্প্রতিক বাঙালী কবি পর্যন্ত তাঁর আলোচনার আওতায় এসেছেন। প্রাচীন থেকে আধুনিক পর্যন্ত যেমন তাঁর আলোচনার কালগত বিস্তার, তেমনি স্বদেশী সাহিত্য থেকে কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পর্যন্ত তাঁর আলোচনার দেশগত ব্যাপ্তি। এস্‌কিলিস, শেক্‌সপীয়র, গ্যেটে, বদলেয়র, মালার্মে, মেটারলিঙ্ক্‌, রিল্‌কে, হিমেনেথ, হাফিজ, পাউণ্ড, পাস্তেরনাক সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি গভীরতা সহজেই ধরা পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দের কাছেই বিদেশী ভাষার পাঠগ্রহণ শুরু করেছিলেন তিনি—গ্রীক ও লাতিনে অল্পস্বল্প, আর ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় পুরো দমে। আর সেই পাঠগ্রহণ ছিল ব্যাকরণ ধরে সাবেকি পদ্ধতিতে নয়, একেবারে সাহিত্য ধরে ভাষার অন্তঃপুরে প্রবেশ— একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে, যাকে বলি ডিরেক্ট্‌ মেথড্‌। এমনি করে অর্জন করেছিলেন বিশ্বসাহিত্যে সরাসরি প্রবেশের অধিকার। এই কারণে নলিনীকান্ত গুপ্তের সাহিত্যচর্চার একটা বড় অংশ হল দেশবিদেশের সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ—বেদের কবিতা থেকে শুরু করে ফরাসী জার্মান কবিতা পর্যন্ত। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে মালার্মের দীর্ঘ প্রতীকী কবিতা L' Aprés-midi d' un faune-এর বাংলা অনুবাদ 'কিন্নরের দিবাস্বপ্ন'।

তাঁর অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী রচনার অনবদ্য বাংলা অনুবাদ। এগুলির মধ্যে বিশে রসজ্ঞদের প্রশংসা অর্জন করেছে

শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকীধর্মী ইংরেজী মহাকাব্য 'সাবিত্রী'-র কাব্যানুবাদ। অন্তত এই একটিমাত্র কীর্তিস্তম্ভের জন্যে তিনি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রথম থেকেই যেমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক তেমনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজজিজ্ঞাসুও। স্বদেশের সমাজের নানা প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় এসেছে। ভারতের ঐতিহ্যের মূল প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য থেকে শুরু করে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, বলশেভিক আদর্শের স্বরূপ ও সীমা, সমসাময়িক যুদ্ধ, স্বরাজ গঠনের দিক্-নির্দেশ, নারীজাগরণ ও নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ; যা সেকালের বাঙালী মনীষীদের ভাবিত করেছিল, তা সবই তাঁকেও ভাবিয়েছে; নিজস্ব মনীষার আলোকে সেকালের সমস্যাবলীর যেসব সমাধান তিনি দিয়েছেন তাতে মৌলিকতা তো আছেই, আর লক্ষ করা যায় এমন অনন্যসুলভ প্রগতিশীলতা যা আজকের দিনেও আমাদের পথ দেখাতে পারে। শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আজকের নানাবিধ নারীনিগ্রহের দিনে যতই আমরা মিটিং স্লোগান প্রস্তাব গ্রহণ করি না কেন, এ-সমস্যার মূল সমাধান কিন্তু এপথে নেই। নারীকে শিক্ষা দিলে, তার সামনে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের পথ খুলে দিলে এ-সমস্যার মূল শেকড়টিই কেটে দেওয়া যাবে, তার পরে ক্রমে এ-সমস্যার ভয়াবহ মহীরুহটি আপনি শুকিয়ে যাবে। একথা অনেক আগেই তিনি বুঝিয়ে ছিলেন তাঁর 'নারীর কথা'য়।

সামাজিক সমস্যার মূলটি তলিয়ে দেখে বাস্তবধর্মী সমাধান দেবার যে দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল, তা আজকের স্লোগানপন্থী যুগে অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না। এই মুক্ত দৃষ্টি বিশ্বসাহিত্য-রসিক সমালোচকের চিত্তে নান্দনিক অন্বেষার সঙ্গে দেশ কালের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক চেতনা যুক্ত হয়েছিল। মনে হয় এই মনীষীর জীবনভাবনা শুধু আকাশচারী স্বপ্নবিলাস ছিল না, তা এই মাটির পৃথিবীর সংসার সমাজের-সংস্কার-উন্নয়ন রূপান্তরের জন্যেও নিযুক্ত ছিল নিজস্ব পথে। এই কারণে তঁর ভাব-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা আজও হারিয়ে যায়নি।

সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে তার চারিপাশে গ্রহ-উপগ্রহের যে বিচিত্র মালিকা রচিত তাকে বাদ দিলে সূর্যের জ্যোতি হয় তো ম্লান হ'ত না, কিন্তু লীলা-সৌন্দর্যটি কি হতে পারত পূর্ণাঙ্গ? থাকত না যদি এই গ্রহমণ্ডলী তবে কাকে গিয়ে স্পর্শ করত সূর্যের আলোক-বিস্তার? প্রতিদিন প্রভাতে কার ললাটে এঁকে দিত সে তার অরুণ-আভায় রক্ত-তিলক? জীবনের বর্ণালীই বা তবে রচিত হ'ত কিসে? সূর্যের চারিপাশের গ্রহমণ্ডলীর নিত্যকালের এই যে ছন্দিত নৃত্য, নন্দিত লাস্য, আবর্তনের আনন্দ, বিবর্তনের উল্লাস—এর স্বাদটি তবে পেতাম কেমন ক'রে? সূর্যের সঙ্গে তার চারিপাশের গ্রহমালাকে নিয়েই রচিত হয় তাই একটি পূর্ণাঙ্গ লীলামণ্ডলী।

সৌর জগতে যা দেখেছি, চেতনার জগতেও দেখি যেন তারই প্রতিরূপ, অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে পারি, তারই পূর্ব-রূপ। কল্প-কল্পান্তের তরঙ্গমালার উত্থান পতনের তলে-তলে সেখানেও এক-একটি চৈতন্য-সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে এক-

একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। তারপরে অন্তর্লোকের এই সূর্য যখন দৃশ্যমান জগতে প্রকাশমান হয়ে ওঠেন অবতার বা আচার্যরূপে, কবি বা নবী রূপে, তখন তাঁর চারিপাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও প্রমূর্ত হয়ে ওঠেন তাঁর লীলাসহচর পারিষদ বা প্রচারকরূপে, লীলাশুক দ্রষ্টা বা স্রষ্টারূপে। এ যেন সমগ্র লীলা-বিধানেরই একটি অপরিহার্য সূত্র, ইতিহাসের বিবর্তনের অব্যর্থ নিয়ম।

অতিমানস-সূর্য শ্রীঅরবিন্দের মহা-আবির্ভাবও এমনি এক ভগবৎ-পরিকল্পিত পারিষদমণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে তুলনায় এই পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে নলিনীকান্ত গুপ্তের রূপ ও স্বরূপটি চিহ্নিত করতে গেলে বলতে হয়, এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তিনি চন্দ্রস্বরূপ। তাঁর ব্যক্তিত্বে চান্দ্রস্বভাব বিদ্যমান এবং তাঁর প্রতিভার রূপটিও চন্দ্রধর্মী। চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোকেই আলোকিত অথচ তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হলে সেই আলোককে পাই আমরা নবতররূপে—সূর্যরশ্মি হয়ে ওঠে জ্যোৎস্নালোক,—নলিনীকান্ত গুপ্তের প্রতিভাও তেমনি শ্রীঅরবিন্দেরই দিব্যালোকে আলোকিত, কিন্তু এই আলোকমালা তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে যেন নবরূপ লাভ করে। এই নবরূপায়ণ তাঁর সৃজনী-প্রতিভার (creative genius) স্বাতন্ত্র্যের সূচক। এইজন্যে সৃষ্টি-ক্ষেত্রে তাঁর মনোলোক দর্পণের মত শুধু প্রতিফলনধর্মী নয়, চন্দ্রের মত নবরূপায়ণব্রতী। প্রতিভাকে আমাদের দেশে বলা হয়েছে নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি—যা থেকে নিত্য-নতুন সৃষ্টির প্রেরণা উৎসারিত। সাহিত্য সৃষ্টিতে নলিনীকান্ত এই প্রতিভার অধিকারী। এইখানেই ভাষ্যকারের সঙ্গে সমালোচকের দূরত্ব। সার্থক সমালোচক শুধু ব্যাখ্যাতা নন, স্রষ্টাও। তাঁর সমালোচনা নতুন সৃষ্টির তাৎপর্যমণ্ডিত। এই অর্থেই নলিনীকান্ত গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে একজন প্রতিভাবান স্রষ্টা। আবার নব সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে তাঁর চেতনায় প্রজ্ঞার স্থৈর্য বিস্ময়কর ভাবে সম্মিলিত। সাহিত্যের যে ক্ষেত্রটিতে তাঁর প্রতিভার হয়েছে স্বাভাবিক সঞ্চরণ, তা হল প্রধানভাবে প্রবন্ধ-সাহিত্য। এবং এই ক্ষেত্রেই সৃষ্টিপ্রেরণার সঙ্গে এই অবিচল স্থৈর্য একটি অপরিহার্য এবং দুর্লভ গুণ বলা যায়। জীবন-সাধনায় যেমন, সাহিত্য-সৃষ্টিতেও তেমনি, প্রথমাবধিই তিনি একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনে অবিকম্প প্রত্যয়ের অধিকারী।

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের শাখাটি একান্তভাবে কৃশাঙ্গ এবং যে কয়জন বিরল প্রতিভা এই শাখায় পরিপুষ্টি সঞ্চারে উদ্যোগী, নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁদেরই মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর এই বিশিষ্ট স্থানটি চিনে নেবার জন্যে বাংলা প্রবন্ধের ক্রমবিকাশের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ অপরিহার্য। এই পরিচিতি গ্রহণে এসে আমরা প্রথমেই দেখতে পাই, আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্য ছিল না। প্রবন্ধের জন্যে প্রয়োজন যে বিশিষ্ট মনোভঙ্গি, জাতীয় জীবনে তখন তারও উন্মেষ ঘটেনি। তাই সে-যুগে প্রবন্ধের বিকাশটি প্রত্যাশিত নয়। আমাদের দেশে প্রবন্ধের বিকাশ হ'ল উনিশ শতকে নবজাগরণের সঙ্গে-সঙ্গে। নবজাগরণের দীক্ষাগুরু রামমোহনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিকরূপেই। কিন্তু রামমোহনের রচনায় মনন ও মনীষার

অফুরন্ত সম্ভার থাকা সত্ত্বেও তাঁর গদ্য-রীতিতে শিল্পগুণের স্পর্শ তত ছিল না, তাই তাঁর প্রবন্ধ জ্ঞানসাহিত্যের সীমা পেরিয়ে রস-সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ হ'ল না। কবিতার মত গদ্যেরও যে একটি নিজস্ব ছন্দ আছে, তা আবিষ্কার করলেন, তাঁর পরে, বিদ্যাসাগর। ছন্দ ও লালিত্যের সঞ্চারে বাংলা গদ্য প্রথম শিল্পরূপ লাভ করল বিদ্যাসাগরের হাতেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মূলত প্রাবন্ধিকের প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন নি। তা ছাড়া, তিনি প্রবন্ধ হিসাবে রচনা করেছিলেন যে দু'চারটি গ্রন্থ, সেগুলির রচনার প্রেরণাও সাহিত্যিক নয়, মূলত সমাজসংস্কারের তাগিদে সেগুলি রচিত। তাই বিদ্যাসাগরেও প্রবন্ধের পূর্ণ বিকাশ ঘটল না। বাংলা প্রবন্ধে সে যুগের সব চেয়ে সার্থক স্রষ্টা ও শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। রামমোহনের মনীষা ও বিদ্যাসাগরের শিল্পগুণ তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে তাঁকে সার্থক প্রাবন্ধিকের মর্যাদা দান করল। বঙ্কিমের ঈষৎ পূর্ববর্তী কাল থেকে তাঁর কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধের ব্যাপক কর্ষণা ও পরিপুষ্টি বিস্ময়কর। অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু ক'রে বঙ্কিমের মধ্য দিয়ে অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ চলেছে। কিন্তু এই বিকাশের একটি সীমা আছে, সেই সীমার প্রাচীরের উপর থেকে এ যুগের প্রবন্ধসাহিত্য মাঝে-মাঝে অন্যতর লোকে উঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই সীমাটি কখনো সে পুরোপুরি অতিক্রম ক'রে যেতে পারে নি। এই সীমাটি হ'ল মনোলোকের সীমা। মননে ও চিন্তনে সে সমৃদ্ধ, কিন্তু বুদ্ধির বন্ধন ও যুক্তির শাসন তার মধ্যে বোধির স্বয়ংপ্রকাশকে যেন প্রতিহত করেছে।

এর পরে বাংলা প্রবন্ধের আর এক যুগ—রবীন্দ্র যুগ। রবীন্দ্রনাথে এসে যেন যুক্তি বুদ্ধি থেকে অধ্যাত্মের বোধিতে উত্তরণ ঘটল। মনন সেখানে বর্জিত হ'ল না বটে, কিন্তু অমৃতের স্বতঃউৎসারণ তাকে যেন আত্মসাৎ ক'রে নিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর নিজের পথে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সন্ধানী, শ্রীঅরবিন্দের কথায়— Tagore has been a wayfarer towards the same goal as ours। তাঁর ঔপনিষদিক অমৃতস্পৃহার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল গন্ধর্বলোকের সৌন্দর্যচেতনা। প্রবন্ধকে তিনি অমৃতের স্পর্শে নান্দনিক সৌন্দর্যে এক নবতর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধেই এই প্রচেষ্টার পরিচয় ফুটে উঠলেও তাঁর 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় ঘটেছে এই সাধনার শেষ সিদ্ধি। রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধকার স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়ও এই যুগধর্মের পরিচয় অল্প-বিস্তর পাই। বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধ-সাহিত্যে যেখানে প্রধানত মননধর্মের সঙ্গে শিল্প চেতনার সমন্বয় ঘটেছে, রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধ-সাহিত্যে সেখানে প্রধানত অধ্যাত্মরসের সঙ্গে শিল্পবোধের সমন্বয় ঘটেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রযুগেরও পরে জাতীয় জীবনে আর একটি নবতর চেতনার যুগ সম্ভাবিত হয়ে আসছে। ব্যক্তিগতভাবে এই নবতর চেতনার ধারক ও প্রকাশক শ্রীঅরবিন্দ যদিও রবীন্দ্রযুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবু জাতীয় জীবনে- বিশ্বগত জীবনে—এই ঊর্ধ্বতর

নবতর চেতনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালেই—রবীন্দ্রোত্তর যুগেই। এবং রবীন্দ্রনাথের পরে এই নব চেতনার স্পর্শে একটি নবীন সাহিত্যের সূত্রপাত বাংলা সাহিত্যের একটি যুগান্তরের প্রতিশ্রুতি বহন করে। নলিনীকান্ত গুপ্ত এই নতুন বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রগণ্য। যে নবতর স্পর্শে এই নতুন সাহিত্যের সূচনা সেটি শুধু অধ্যাত্মচেতনা নয়, সেটি আরো একধাপ উপরের চেতনা—অতিমানস চেতনা। রবীন্দ্র-যুগ ও রবীন্দ্রোত্তর-যুগ—অধ্যাত্ম-যুগ ও অতিমানস-যুগ—এই দুইয়ের সন্ধিলগ্নে নলিনী গুপ্তের আবির্ভাব। অথচ যতটা তিনি দুই যুগের সেতুস্বরূপ, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি আগামী দিনের পুরোধা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট আসনটির এইটিই হ'ল পরিচয়-চিহ্ন।

কিন্তু সাহিত্যে সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের পরে যে নবতর উচ্চতর চেতনার যুগসম্ভাবনার ইঙ্গিতটি আমরা দিলাম, বাংলা সাহিত্যে নলিনীকান্ত গুপ্তের আবির্ভাবের সময় সেই যুগচেতনাটি তখনো সুপ্রকাশ হয়ে ওঠে নি। এই নবতর চেতনার নবীন সাহিত্য রচনারও সূত্রপাত তখন বিশেষ হয় নি। এবং বাংলার চিন্তানায়কেরা তখনো শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের সঙ্গে সুপরিচিত হন নি। শ্রীঅববিন্দের নবীন আদর্শ তখনো সূক্ষ্ম জগতে এদেশের চিত্তকে স্পর্শ করেছে, অন্তরে-অন্তরে একটা নতুন কিছু সংঘটনের ক্ষীণ ইঙ্গিত পাচ্ছি। বাইরে তখন রবীন্দ্রোত্তর যুগের আর এক বিষম রূপ সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পর্বের বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে উপজীব্য ক'রে এবং ফ্রয়েড প্রভাবিত চিন্তাধারাকে আশ্রয় ক'রে সাহিত্য সংস্কৃতিব এই ভযাবহ রূপটি গড়ে উঠেছে। দীনেশ দাশ ও গোকুল নাগের 'কল্লোল', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কালি কলম' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি', তখন এই তথাকথিত আধুনিকতার ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই এই পত্রিকাত্রয়ীর লেখকগোষ্ঠী বাংলায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনায় অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছেন! কিন্তু এহ বাহ্য। আমরা আগেই বলেছি, এ সবের তলে তলে একটি নবীন চেতনা জাতীয় জীবনে অনুপ্রবেশ কবেছে। এবং আধুনিকদের এই প্রচণ্ড উৎক্ষেপ যে তারই আমূল রূপান্তরকারী শক্তিরই প্রতিক্রিয়া, তারও পরিচয় সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। আধুনিকরা জীবন ও জগতের যে গহন অন্ধকার দিকটি উদঘাটিত করতে তৎপর হয়েছিলেন, তার সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে নলিনীকান্ত গুপ্তই তাঁর বাংলা রচনার মাধ্যমে এই নতুন চেতনার যাদুকাঠিটি ছুঁইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'কালি-কলমে'ই। আগেই বলেছি আধুনিকতার এই মুখপত্রেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি যুগোপযোগী রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন—'কর্মযোগীর আদর্শ', 'কর্মযোগ', 'উভয়ত', 'ভারতের অন্তর পুরুষের জাগরণ' ইত্যাদি। 'কালি-কলমে'ই প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দর একটি রচনায় আধুনিক যুগের স্বরূপটি নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। এ যুগের সাহিত্যে ভোগবাদ ও জড়চেতনার যে আধিক্য তার তাৎপর্যটি ধরা পড়ে এইভাবে :

"ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ পর্ব যখন শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা যায়

তাহার ভিতর হইতে যেসব জিনিস চলিয়া যাইবেই, ঠিক সেইগুলিই নূতন বল সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে মানুষের ব্যষ্টিগত বা ব্যক্তিগত কোন গভীর সংস্কার বা তীব্র প্রেরণাকে তাড়াইতে হইলে আগে যে জিনিসটি ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করিয়া আনিতে হয়, তারপর নিগ্রহের দ্বারা বশীভূত করিতে হয়, এবং শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়।"—শ্রীঅরবিন্দ। নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ ('কালিকলম' দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৮১, 'ক্রমবিকাশের ধারা')।

বাংলায় যখন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা গড়ে ওঠে নি তখন নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর মৌলিক রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিচিতি দানের গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বস্তুত প্রত্যক্ষভাবে বাংলার ভাবসংঘর্ষের রঙ্গভূমিতে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের প্রবেশের আগে নলিনীকান্ত এই মহানাট্যের মঙ্গলাচরণ করেছিলেন। এই হ'ল জাতীয় চেতনার বিবর্তনে নলিনীকান্ত গুপ্তের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

এব সঙ্গে অবশ্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্যে সঞ্চরণ করতে হবে তাঁর সাহিত্য রচনার রস-কুঞ্জে। আগেই বলেছি, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিব ক্ষেত্র দ্বিধা বিভক্ত— মৌলিক রচনা এবং অনুবাদ। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য অবদান থাকা সত্ত্বেও প্রথমে আমরা তাঁর শুধু মৌলিক রচনার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। মৌলিক রচনা তার প্রায় সবই প্রবন্ধ, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধমালায় বিষয়বস্তুর বিপুল বিস্তার সম্ভ্রম উৎপাদন করে। সৃজনমূলক সাহিত্য (creative literature) তিনি বিশেষ কিছু বচনা করেন নি বটে, কিন্তু তাঁর সমালোচনামূলক (critical literature) সাহিত্যের যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, জ্ঞানের প্রতিটি কুঞ্জের মধুকর তিনি, জীবনের প্রতিটি কন্দরে সঞ্চারী তাঁর প্রতিভা। পূর্ণ জীবনের উপাসক তিনি, তাঁর প্রতিভার রশ্মিস্পর্শ থেকে তাই জীবনে কোন দিগন্তকেই তিনি যেন বঞ্চিত করেন নি। বিষয়বস্তু অনুসারে তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থাবলীর যদি শ্রেণীবিন্যাস করি তা হলেই আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে :

১। সাধনা : 'পূর্ণযোগ', 'দেবজন্ম', 'চেতনার অবতরণ', 'আলোর পথে', 'এ যুগের সাধনা', 'সাধকের কথা'।

২। সমাজ : 'নারীর কথা', 'ভাবী সমাজ', 'শিক্ষা ও দীক্ষা', 'বাংলার প্রাণ' (প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ প্রবন্ধ)।

৩। রাজনীতি · 'বোলশেভিকী', 'ভারতের হিন্দু ও মুসলমান', 'স্বরাজ গঠনের ধারা', 'স্বরাজের পথে'।

৪। সাহিত্য : 'সাহিত্যিক', 'শিল্প কথা', 'রূপ ও রস', 'কবিমনীষী', 'রবীন্দ্রনাথ'।

৫। বিজ্ঞান : 'নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান' (কয়েকটি প্রবন্ধ)।

৬। স্মৃতিচিত্র : 'স্মৃতির পাতা'।

৭। বিবিধ : 'বেদমন্ত্র', 'উপনিষদ কথা ও কাহিনী', 'গানের গান', 'মৃতের

কথোপকথন', 'ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা', 'ভারত রহস্য', 'ফরাসী ষোড়শী', 'নীটশের বাণী'।

এছাড়া আছে তাঁর ইংরেজি রচনা। যেমন ঃ অ্যাপ্রোচ্ টু মিস্টিক্স্, দ্য মার্চ অফ সিভিলিজেশন, ম্যালাডি অভ দ্য সেঞ্চুরি, টুয়ার্ডস এ নিউ সোসাইটি, দ্য কোয়েস্ট অ্যান্ড দ্য গোল, সিয়্যার পোয়েটস, ম্যান হিউম্যান অ্যান্ড ডিভাইন, যোগ অফ্ শ্রীঅরবিন্দ, লাইট অভ লাইটস, সুইট মাদার ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণী বিভাগ পূর্ণাঙ্গ নয় এবং এটি একান্ত মোটা রেখায় চিহ্নিত হয়েছে মাত্র, সুতরাং অব্যর্থও নয়। নলিনী গুপ্তের মনীষার বহুমুখিতা দেখাবার জন্যেই এটি করা হয়েছে। অবশ্য তাঁর এই বহুবিষয়ক ও বহুসংখ্যক রচনাবলীর প্রত্যেকটির পরিচয় দিয়ে রচনাকে দীর্ঘায়ত করার উপযোগিতা দেখি না। সব কটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য আলোচনারও সুযোগ নেই। শুধু সমগ্র রচনাসম্ভার থেকে তাঁর জীবনদৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য এবং রচনাশৈলীর স্বকীয়তাটুকু বিশ্লেষণ ক'রে বুঝে নিলেই বোধহয় তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে।

নলিনীকান্ত গুপ্তের প্রবন্ধে গভীর-তল-সঞ্চারী এমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি পাই যা প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের পক্ষে অপরিহার্য। এই দৃষ্টি জীবনের স্তরের পর স্তর ভেদ করে চলে গেছে সত্যের আদি উৎসে— সেখানকার নিত্য রসক্ষরণে এ দৃষ্টি সদা সঞ্জীবিত এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে স্পন্দিত। ঠিক এই কারণে জটিল তাত্ত্বিকতা (theory mongering) কিংবা শুধুই কথার কসরতে তাঁর উৎসাহ নেই। বরং সত্যকে তিনি যেমন ক'বে অন্তরে পান তেমন ক'রে উপস্থাপিত ক'রেই তাঁর তৃপ্তি। তাঁর সাধনা বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে যে কোনটিই এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে। 'চেতনার অবতরণ', 'এযুগের সাধনা' কিংবা 'সাধকের কথা' তাঁর মৌলিক রচনা—এগুলিতে ব্যক্তি-অনুভূতির ও উষ্ণ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর 'পূর্ণযোগ'? এ রচনাটির বক্তব্য শ্রীঅরবিন্দের 'Synthesis of Yoga' থেকে গৃহীত। সাধারণভাবে মনে হতে পারে, এতে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত না হওয়ায় এবং এটি অন্য এক বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার হওয়ায় এর রচনায় অনুভূতির দৈন্য ও রীতিতে অন্তরঙ্গতার অভাব থাকতে পারে। কিন্তু এইটিই বিস্ময়ের কথা, এইখানেই তাঁর রচনারীতির স্বকীয়তা যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের মহাগ্রন্থের বক্তব্যটিকে আপন অন্তরানুভূতির জারক রসে জারিত ক'রে--'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'—যখন পরিবেশন করেছেন তখন তা মৌলিক রচনার মতই অন্তরস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই বোধ হয় তাঁর যোগ-দর্শন বিষয়ক রচনাবলীতেও কাব্যের একটি স্নিগ্ধ কান্তি বিদ্যমান। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের মূল যে বিজ্ঞান-শক্তি (Supermind) তার স্বরূপ যখন তিনি ব্যাখ্যা করছেন তখন লক্ষ্য করুন তাঁর যোগীসুলভ প্রত্যয়ের সঙ্গে কবিসুলভ চিত্রকল্প রচনার অনায়াস কৌশল :

'উপরটা সত্য নীচেরটাকে বাদ দিয়া নয়, অনন্ত আকাশ পৃথিবী হইতে মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া যায় নাই, পৃথিবীকে ঘিরিয়া পৃথিবীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই অনন্তের

কেন্দ্র হইতেছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতেই মূল সৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনন্ত যখন নামিয়া বিজ্ঞানের মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে, পৃথিবীও তখন উঠিয়া সেই বিজ্ঞানের মধ্যে অনন্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে"।[১]

নলিনীকান্ত গুপ্তের জীবনবোধের এক কোটিতে আছে যেমন অন্তর্দৃষ্টি, অন্য কোটিতে তেমনি আছে প্রগতিশীলতা। এর একটি প্রান্ত যেমন জীবন-ভূমির গভীরে শিকড় প্রোথিত করেছে, অন্য প্রান্তটি তেমনি নিত্য-নবীনের সন্ধানে সমস্ত মিথ্যা সংস্কারের জঞ্জালভাব ঝেড়ে ফেলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত আকাশ-সঞ্চারী হয়েছে। তাঁর এই গগন-বিহারে দেশ-বিদেশেব সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র জল-বাতাস এসে তাঁকে দোলা দিয়ে গেছে, তাঁর চেতনার পরিপুষ্টিই সাধন করেছে। ধর্ম ও নীতির বন্ধন তাঁর চেতনাকে কোন সঙ্কীর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পাবে নি। তাঁর জীবনদৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্য ও সমাজবিষয়ক রচনাবলীতে। **'নারীর কথা'** এদিক থেকে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। নরনারীর সম্পর্ক যোগজীবনে কেমন হওয়া উচিত, নবযুগের সমাজব্যবস্থায় দাম্পত্যসম্পর্কের স্বরূপটিই বা কি হবে, নীতিবাগীশদের দাম্পত্য একনিষ্ঠতার আদর্শটিব মূলে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা বা কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি আছে কিনা, প্রভৃতি অনেক মৌলিক জীবনসমস্যার উপরে আলোকপাত করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। গ্রন্থ-সমাপ্তিতে তিনি যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে তাঁব অন্তর্ভেদী সমাজবীক্ষা, যুগসচেতনতা ও সংস্কারমুক্ত চিত্তের পরিচয় সুস্পষ্ট ঃ

> "কলিযুগে শরীরগত নিষ্ঠাকেই বড় করিযা ধরা হইযাছে, দ্বাপরে প্রতিষ্ঠা ছিল প্রাণময় সত্তার নিষ্ঠা, ত্রেতায় ছিল মনোময় সত্তার নিষ্ঠা, আর সত্য যুগে ছিল অন্তরাত্মার সত্যের উপর নিষ্ঠা। অন্যান্য যুগে ব্যক্তির সহিত এক ধরনের একনিষ্ঠতাই ছিল বৈবাহিক সম্বন্ধের মূল সূত্র, গোড়ার বনিয়াদ, কিন্তু সত্যযুগে এই সম্বন্ধ ব্যক্তিগত মিলনের মধ্যে চরম হইয়া উঠে নাই, ব্যক্তিতে সম্বন্ধ তখন তেমন সুদৃঢ়, একান্ত হইয়া উঠে নাই, তাহা বাহিরের দিক দিয়া অন্তত ছিল অনেকটা মুক্ত, উদার—ব্যক্তি তখন স্বধর্মের নিজস্ব সত্যের পথে চলিয়া ব্যক্তির সহিত এই একটা মুক্ততর উদারতর সম্বন্ধ স্থাপন করিত। ইদানীং আমরাও কি ঘুরিয়া আবার ক্রমে এই রকম একটা লক্ষ্যের দিকেই চলিতেছি না?"[২]

নলিনীকান্ত গুপ্তের রাজনীতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু একটি কথাই এখানে বলা যায় যে, পূর্ব থেকেই বাংলা গদ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের একটি সুস্পষ্ট ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকারকে শিরোধার্য করেই নলিনীকান্ত গুপ্ত বাংলা ভাষায় যে দু-

---

১। 'পূর্ণযোগ', ১৩৩০, পৃ ৭০-৭১

২। 'নারীর কথা', ১৩৩৮, পৃ. ১১৭-১১৮

একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেগুলির অনন্যতাও অনস্বীকার্য। পূর্বসূরিদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, **পূর্বাচার্যেরা যেখানে মূলত বৈজ্ঞানিক হয়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত সেখানে মূলত সাহিত্যিক হয়ে বিজ্ঞান চর্চা করেছেন।** এখানে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর আপাত অনধিকারের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাফল্যের একটি অন্যতর সুযোগ ছিল তাঁর একটু বেশি। সেটা হ'ল, বিজ্ঞানের রচনাকে শুধু মাত্র সহজবোধ্য ক'রে তোলাতেই তাঁর দায়িত্বের সীমা রচিত হয় নি, তাকে পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ ক'রে তোলাতেও তাঁর কৃতিত্বের বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে **আপেক্ষিকতাবাদ** সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধটি তাঁর দুর্লভ সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু সাধনাই বলি, সমাজই বলি, কিংবা রাজনীতি বা বিজ্ঞানই বলি—এ সমস্ত বিষয়ে তাঁর রচনাগৌরব গৌণ না হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি মূলত অন্য একটি বিষয়ের জন্যে—সাহিত্য-সমালোচনার জন্যে। এ ক্ষেত্রে তাঁর অপরিমেয় অবদানের সামগ্রিক উদ্‌ঘাটন অসম্ভব। এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রোত্তর-যুগে যে কয়েকজন সমালোচক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব স্টাইল নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নলিনীকান্ত গুপ্তের একটি অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। স্বদেশী ঐতিহ্যেব ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে শুধু ইংরেজী নয়, সমগ্র কন্টিনেন্ট্যাল সাহিত্যের রসসমুদ্র মন্থন করে তিনি যে নবনীত আহরণ করেছেন, তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থে তিনি তা-ই পরিবেশন ক'রে গেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীনতম রচনা ঋক্-সংহিতা থেকে শুরু ক'রে গ্রীক, জার্মান, স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরেজি, এবং এমন কি, আরবী-ফার্সী সাহিত্যেরও বিশিষ্ট স্রষ্টা এবং সৃষ্টিব সঙ্গে তিনি বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ সব স্রষ্টার এবং সৃষ্টির তলদেশ স্পর্শ ক'রে কখনো-কখনো তাদের প্রতিভার গভীরতার সীমা এবং সংসিদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ও ক'রে দিয়েছেন। এই মূল্যায়নেব ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য **দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা** ও **সিদ্ধান্তের ভারসাম্য** বোধ।

শিল্পীর আদর্শের 'প্রাথমিক' প্রতিষ্ঠা ঋষির মুক্ত চেতনায়, ঋষির মুক্ত চেতনা সাধুব শুচিবায়ুগ্রস্ততা থেকে স্বতন্ত্র। এদিক থেকে ঋষিদৃষ্টির সঙ্গে, তাঁর মতে, কবিদৃষ্টির সাধর্ম্য বিদ্যমান :

> "শিল্পী ইন্দ্রিয়ের খেলা যে দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা একদিকে যেমন বিষয়বদ্ধেব দৃষ্টি নহে, অন্যদিকে তেমনি সাধুরও দৃষ্টি নহে, তাহা হইতেছে ঋষিদৃষ্টি। .. শিল্পীর দৃষ্টি সাধুর দৃষ্টি নহে, কারণ শিল্পী ইন্দ্রিয়ের সব খেলাতেই ভালমন্দ পাপপুণ্য ক্ষুদ্র-মহৎ সমানভাবে সকলের মধ্যে নিগূঢ় ভাগবতরসেরই বিচিত্র সঞ্চার দেখিতে পান, সাধু কিন্তু ইন্দ্রিয়ের খেলার বিশেষ প্রকরণের মধ্যে—পুণ্যের মধ্যে মঙ্গলের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইবার প্রয়াসের মধ্যে শুধু ভগবানকে দেখেন।"[৩]

সমালোচক হিসাবে নলিনীকান্ত গুপ্ত নিজেও এই দৃষ্টির অধিকারী। তাই মুক্তচেতন

সমালোচক নলিনীকান্ত অবাধে আধুনিকতম কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যলোকে এবং সাগরপারের কাব্যজগতেও বিচরণ করতে কুণ্ঠিত হন না! তাই আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ, অশোক বিজয় রাহা, রসময় দাস, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক গ্যেটে, রিল্কে, হিমেনেথ, এজরা পাউণ্ড, পাস্তেরনাক, রবার্ট গ্রেভস, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর আলোচনা চোখে পড়লে বিস্মিত হবার কারণ নেই। সুদীর্ঘ কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছিলেন, চলতে চেয়েছিলেন, নলিনীকান্ত গুপ্তও তেমনি তাঁর সুবিস্তৃত সমালোচক-জীবনে নতুন কালকে প্রতিপদে স্বাগত জানিয়েছেন—কোন-কোন ক্ষেত্রে নতুনকালের ভ্রান্তি ও উচ্ছলতাকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন, এবং সর্বোপরি সর্বক্ষেত্রে যুগ-সচেতন থেকেছেন।

জ্ঞানরাজ্যের বিচিত্র শাখায় সঞ্চরণের ফলে প্রায়ই যে পল্লবগ্রাহিতা আধুনিককালে দেখতে পাই, নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনায়, পাঠক মাত্রেই জানেন, তিনি সেই দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর রচনায় এ কালের পণ্ডিতম্মন্যতার মিথ্যাচার আদৌ নেই। বরং সর্বক্ষেত্রেই এই গুপ্তসমালোচক আপন জ্ঞানের 'বিশ্বরূপ'কে যথাসাধ্য সংগুপ্ত রেখেই বক্তব্য বিষয়ে উপস্থাপনা করতে সচেষ্ট। সৃষ্টি-চৈতন্যে একটি সহজাত আত্মীকরণের (assimilation) ক্ষমতা থাকায় অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় সর্বভুক্ তবু এ যুগের জাতীয় ব্যাধি তাঁর মানসিকতাকে স্পর্শ করে নি। এবং লক্ষণীয়, তার বৈদগ্ধ তাঁর মানসিকতায় ভার হয়ে চেপে বসে নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নিম্নের প্রতিষ্ঠাভূমি হয়ে তাঁর জীবনদর্শনের সমুচ্চ স্তম্ভকে বলিষ্ঠভাবে ধারণ ক'রে রেখেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সাবলীল বাচনভঙ্গির অপরিহার্য অলঙ্করণরূপে দেখা দিয়েছে। এতে তাঁর রচনারীতি গুরুভার হয়ে ওঠেনি, বরং তার রমণীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর গদ্য যেমন তড়িৎপ্রবাহের মত তীব্র গতিশীল, তেমনি তা অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎচমকের মতই হঠাৎ অন্তর্লোক আলোকিত উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। গদ্যের মধ্যে এই স্বচ্ছন্দ মুক্ত গতি এবং অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী উপস্থাপনা নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্টতর করে।

নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনায় আর একটি আকর্ষণীয় গুণ সহজেই চোখে পড়ে। সেটা হ'ল তাঁর **অনন্য সুলভ প্রসাদগুণ**। অনির্বাণের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন ওজোগুণ, নলিনী কান্তের রচনার প্রধান আকর্ষণ তেমনি প্রসাদগুণ। নলিনীকান্ত প্রতিভাকে আগে যে চন্দ্রধর্মী বলেছি তার আরো একটি কারণ হ'ল তাঁর বাণীভঙ্গির এই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাস্বচ্ছ প্রসাদগুণ। এগুণ সম্ভ্রম উৎপাদন করে না, প্রীতি আকর্ষণ করে। যদিও একই আলোচনায় স্থান-বিশেষে সাহিত্য-গুণের তারতম্য হয়ে থাকে, তবু সাধারণভাবে বলা যায়, দর্শন আলোচনায় ওজোগুণ যেমন কাম্য, সাহিত্য সমালোচনায় প্রসাদগুণ তেমনি বোধহয় প্রকৃষ্ট। নলিনী গুপ্তের রচনাবলীতে এই প্রকৃষ্ট গুণের সঙ্গে রসাবেদন যুক্ত থাকায় তাঁর প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে সৃজনধর্মী সাহিত্যের মতই উপভোগ্য। প্রাবন্ধিক হয়েও তিনি

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আচার্যভাবে উপদেশ দেন না, কান্তাভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। এই কারণে তাঁর রচনারীতি এত আকর্ষণীয়, এত রম্য ও রসোত্তীর্ণ। ভাবের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যে ঋষিদৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে, হৃদয়ের মুক্তি ও প্রসন্নতায়, রচনারীতির গতিশীলতা ও প্রসাদগুণে, নলিনীকান্ত গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম, একটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব।

এবার তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে—

প্লেটো তাঁর আদর্শ জগৎ 'রিপাব্লিক' থেকে কাব্যকে বহিষ্কৃত করতে চেয়েছিলেন।[৪] এর একাধিক কারণের মধ্যে একটি কারণ বোধ হয় এই যে, কবিরা হলেন তাঁর মতে অনুকরণকারী। সত্যের অনুকরণ হল জগৎ, আর জগতের অনুকরণ হল সাহিত্য বা কাব্য। সুতরাং সত্য থেকে সাহিত্য অন্তত দু'ধাপ দূরে সরে এসেছে। এর পরে যদি আমরা আবার অনুবাদের কথা ধরি, তা হলে হয়তো অনেকে বলবেন—অনুবাদ হল আবার মূল সাহিত্যের অনুকরণ, সুতরাং সত্য থেকে আরো এক ধাপ দূরবর্তী। তাই প্লেটোর একাডেমিতে যিনি মানুষ, তাঁর কাছে অনুবাদের উপযোগিতা আরো প্রশ্নাধীন হবে।

সত্যের থেকে যা এত দূরে,—যা অনুকরণের অনুকরণ তস্য অনুকরণ,—তাকে নিশ্চয়ই কেউ তাঁর ধ্যানের ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে স্থান দেবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—জগৎ কি সত্যি সত্যের মিথ্যা রূপ? সাহিত্য কি জগতের শুধুই অনুকরণ? আবার অনুবাদ কি মূল সাহিত্যের যান্ত্রিক ভাষান্তর মাত্র?

জগৎ ব্রহ্মের মিথ্যা রূপ না সত্যময় লীলা—শঙ্কর ও রামানুজের সেই চিরন্তন বিতর্কে সাহিত্যরসিকের যাবার প্রয়োজন হয় না। কারণ সাহিত্যরসিক মাত্রেই জীবন-রসিক, লীলা-রসিক। জীবন ও জগৎ সত্যেরই প্রকাশ—এটা স্বতঃসিদ্ধ রূপে ধরে নিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু। তাঁর জিজ্ঞাসার সূচনা দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকে—সাহিত্য কি জগতের শুধুই অনুকরণ, হুবহু ফটোগ্রাফ? প্লেটো-অ্যারিষ্টটল দু'জনেই সাহিত্য-শিল্পকে অনুকরণ (মাইমেসিস) বলা সত্ত্বেও, এবং আমাদের নাট্য সূত্রকার ভরতও দৃশ্যকাব্যকে 'লোকবৃত্তানুকরণং' বললেও আজ মোটামুটিভাবে একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, সাহিত্য জীবনের হুবহু অনুকরণ নয়। জীবনের রূপ কবিচিত্তে প্রতিফলিত হয় যখন তা কবির দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে, তখন তা কবির মন-প্রাণ-আত্মার অনেক রং মেখে অনেক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নবরূপ লাভ করে, সেটা কবির নিজস্ব জগৎ, একটি নতুন সৃষ্টি; তা কোন ক্রমেই বাস্তব জগতের হুবহু ফটোগ্রাফ নয়। এ মতের সত্যতা সম্পর্কেও আজ আর কেউ প্রশ্ন তোলেন না, বরং অনেকে বলে থাকেন—হয়তো বা

৪। "যদি কোনও শব্দানুকারী ভদ্রলোক, যাঁরা এত চতুর যে, যে কোন বস্তুর অনুকরণ করতে পারেন, আমাদের কাছে আসেন, তাঁর কবিতা এবং কেরামতী দেখাবার প্রস্তাব করেন, তা হলে তাঁকে আমরা মনোহর, দিব্য এবং আশ্চর্য বলে পূজা করবো, কিন্তু তাঁকে সেই সঙ্গে জানিয়ে দেব যে আমাদের রাষ্ট্রে তাঁর মতো লোক থাকবার অনুমতি পান না, আইন তাঁকে বরদাস্ত করবে না।" — প্লেটোর 'দি রিপাব্লিক', শ্রী বসন্ত রায় চৌধুরী কৃত অনুবাদ, পৃঃ ১০৫

প্লেটো-অ্যারিষ্টটল-ভরত মুনিই 'অনুকরণ' কথাটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেননি। সুতরাং এই প্রশ্নের আলোচনাতেও আমরা যাব না, যাবার প্রয়োজন নেই। সর্বজন-স্বীকৃত সর্বজন-বিদিত একথাটি ধরে নিয়েই আমরা আসবো আমাদের শেষ প্রশ্নে, আসল প্রসঙ্গে : অনুবাদ কি মূল সাহিত্যের যান্ত্রিক ভাষান্তর মাত্র?

বলা বাহুল্য আদালতের বা পর্যটকের সহায়ক দো-ভাষী যা করে থাকেন, এখানে অনুবাদ বলতে আমরা তা বোঝাচ্ছি না। অনুবাদ বলতে সাহিত্যের অনুবাদ,—সাহিত্যের সাহিত্যিক অনুবাদই বোঝাচ্ছি। দো-ভাষী মূল বক্তার বক্তব্যকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে তাকে ভাষান্তরে পরিবেশন করলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। বক্তব্যকে অবিকৃত রাখতে হলে আক্ষরিক অনুবাদের পথ তাঁকেও মাঝে-মাঝে পরিত্যাগ করতে হয়; কিন্তু মূল লক্ষ্য তাঁর হল বক্তব্যকে যথাযথ প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত করা। বলা যেতে পারে তার মনটি হওয়া চাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ । সফল প্ল্যানচেটের "মিডিয়ামে"র মত, কিংবা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে তুলনা চলে না, দো-ভাষীর অনুবাদেব ক্ষেত্রে সেই তুলনাই ব্যবহার করে বলা যায়, তাঁর মনটি হবে পরিষ্কার আরশিব মত। সেই আরশিতে মূল বক্তার বক্তব্যের যথাযথ প্রতিবিম্ব পড়বে, তাকে তিনি তাঁর ভাষায় যথাসম্ভব অবিকৃত অপরিবর্তিত রেখেই প্রতিফলিত কববেন। ভাষান্তরে তিনি শেষ পর্যন্ত যা পরিবেশন করবেন, তা দেখে আমরা বুঝব, একটা কিছুর প্রতিবিম্বই দেখছি, সেটা হুবহু রূপ বটে, কিন্তু মূলেরই ছায়া। সেটা প্রতিবিম্বই, তাই তাকে স্পর্শ করলে তার মধ্যে কোন সংবেদন জাগবে না, সেও কারো মধ্যে কোন সংবেদন জাগাতে পারবে না! সংক্ষেপে বলতে পারি দোভাষী তাঁর অনুবাদে মূলকে প্রতিবিম্বিত করেন বটে, কিন্তু সেই প্রতিবিম্বে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন না। সেটা নিজে নিষ্প্রাণ বলে পাঠকের প্রাণেও তার কোন আবেদন নেই।

কিন্তু দোভাষীব অনুবাদ ছাড়া আরো এক বকমের অনবাদ আছে; তা শুধু ভাষান্তর নয়, তা-ও এক রকমের সপ্রাণ সৃষ্টি। একে অনুবাদ না বলে সঠিকভাবে বলা উচিত অনুবাদ-সাহিত্য। এটি শুধু পণ্ডিতী মনীষার কৃতিত্ব নয়, সৃজনী প্রতিভার সৃষ্টি। তাই যিনি অনুবাদ-সাহিত্যিক তাঁর মধ্যে শুধু অনুবাদক থাকলেই চলে না, তাঁব মধ্যে প্রচ্ছন্ন হলেও সক্রিয়ভাবে একজন সাহিত্যিকের অধিষ্ঠান অপরিহার্য।

এক দিক থেকে মূল সাহিত্যিকের চেয়ে অনুবাদ-সাহিত্যিকের সাধনা দুরূহতর। তাঁর স্বাধীনতা কম, অথচ দায়িত্ব কম নয়। মূল সাহিতিকের অলক্ষ্য শাসন এবং নিজের সৃষ্টিশীল প্রাণের স্বাধীনতা-কামনা—এই দুয়ের মাঝখানে থেকে এক ক্ষুরধার পথে তাঁর লেখনীকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দোভাষীর সঙ্গে তাঁর আংশিক মিল আছে। তাঁরও চিত্তকে হতে হবে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরাসক্ত। মূল স্রষ্টার বুদ্ধিগত বক্তব্যকেই শুধু নয়, তাঁর অখণ্ড-সৃষ্টির জীবন্ত নিটোল রূপটিকেও অনুবাদ-সাহিত্যিকের মানস-সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত করতে হয়; সেখানে তাঁর নিজের চিন্তার তরঙ্গ যদি ওঠে তবে সেই প্রতিবিম্বটি কেঁপে উঠবে, বিকৃত হবে। অতএব 'শান্ত স্বচ্ছ নিরাসক্ত চিত্ত অনুবাদ

সাহিত্যিকের সাফল্যের প্রথম শর্ত, এও এক রকমের যোগযুক্ত অবস্থা। সব মহৎ স্রষ্টাই যেমন নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, অংশত বা পূর্ণত ঋষি-চেতনার অধিকারী, তেমনি সব মহৎ অনুবাদকই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অংশত বা পূর্ণত যোগযুক্ত চেতনার অধিকারী।

কিন্তু আপন মানস সরোবরের মূলের রূপটি প্রতিফলিত করেই অনুবাদকের দায়িত্ব শেষ হয় না, মহৎ সার্থক অনুবাদক তো শুধু ধ্যানী নন, স্রষ্টাও। সুতরাং মানস-লোকে প্রতিফলিত রূপটিকে তাঁকে ভাষার মাধ্যমে বাণীমূর্তি দিতে হয়। আবার ধ্যানরূপকে যখন তিনি শব্দরূপ দেন তখন শুধু 'খড়-বিচুলি' কিংবা মৃত্তিকা ও বর্ণ দিয়ে প্রতিমা রচনা করেই তাঁর দায়িত্বটি শেষ হয় না, তাতে প্রাণসঞ্চারের দায়িত্বও তাঁরই। যদি সৃষ্টি (creation) নয়, শুধু নির্মাণের (construction) কাজটুকু তাঁর ব্রত হ'ত তবে তাঁকে প্রাচীনদের ভাষায় ব্রহ্মা না বলে বিশ্বকর্মাই বলতাম। কিন্তু শুধু নির্মাণ নয়, প্রাণ-সঞ্চারও তাঁর দায়িত্ব তাঁর অনুবাদও মূল সৃষ্টিব মতই জীবন্ত হওয়া চাই। এই দায়িত্বের জন্যেই অনুবাদ-সাহিত্যিক দো-ভাষী থেকে পৃথক। এ দায়িত্ব পালিত হলেও অনুবাদ হয়ে ওঠে অনুবাদ-সাহিত্য। তখন তাকে প্রতিবিম্ব বলে মনে হবে না, সেটিও একটি স্বতন্ত্র সত্তা— এখানেই অনুবাদ-সাহিত্যের সাফল্যের পরাকাষ্ঠা। এইভাবে একটি প্রতিবিম্বকে নিয়ে মূলের মত তুলে ধরা, বলা যেতে পারে, এতে এক রকমের কৌশল, এক রকমের লোকভোলান চোখ-ধাঁধান ছলা-কলা আছে। কিন্তু অনুবাদ-সাহিত্যিকের কৃতিত্ব সেখানেই যেখানে এই কৌশলটি ধরা পড়ে না। এখানেও একই কথা সত্যি : "Art lies in concealing art"। এই সৃষ্টি জীবন্ত বলে এর আবেদন শুধু চোখের কাছে নয়, শুধু বুদ্ধির কাছেও নয়, এর আবেদন প্রাণের ভিতর দিয়ে আত্মার কাছে। কানের ভিতর দিয়া মরমে না পৌঁছালে অনুবাদ-সাহিত্য ব্যর্থ।

সুতরাং সার্থক অনুবাদ-সাহিত্য মূলের সত্যকে ধারণা কবে নিজেও সত্যময় হয়ে ওঠে। জীবন্ত সৃষ্টির মতই তার লীলা, মূল সত্যের মতই তার আবেদন। সার্থক সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, অনেক সমালোচনার মাধ্যমেও মূল সাহিত্যেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা আস্বাদ পেয়ে যেতে পারি :

"...the light we get from a vital and illuminative criticism from within by another mind can sometimes almost take the place of a direct knowledge."[৫]

এ কথাটি সার্থক অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কেও সমান সত্য।

অনুবাদককে যথাসাধ্য মূলের অনুগত থাকতে হয় বটে, কিন্তু সবার উপরে তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত অনুবাদকে যেন অনুবাদ বলে মনে না হয়, তাকে মৌলিক সৃষ্টি বলে মনে হয়। মৌলিক সৃষ্টির রূপ ও রস পেলেই তা সার্থক অনুবাদ-সাহিত্য হয়ে উঠবে। এই জন্যে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না করে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করে একটি নিটোল

৫। The Future Poetry. 1953. p.5

সৃষ্টিরূপ দেওয়ার স্বাধীনতা অনুবাদ-সাহিত্যিকের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর এই স্বাধীনতা শুধু অনুবাদকের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বিবেচনা করেই স্বীকার করা হয়নি, সেটি পাঠকের জাতীয় চিত্তের স্বাতন্ত্র্য, তার দেশ-কালোচিত সংস্কার, তার ভাষাভঙ্গি ও ভাব-ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বিবেচনা করেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থাৎ এই স্বাতন্ত্র্য যদি স্বীকৃত না হ'ত, তবে শুধু অনুবাদকের পক্ষেই একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টিরূপ গড়ে তোলা শক্ত হ'ত তা নয়, পাঠকের পক্ষেও সেই সৃষ্টির রসাস্বাদ গ্রহণ করা কষ্টকর হয়ে উঠত। মাত্র বাল্মীকি-রামায়ণের ভাবানুবাদও নয়। সমগ্র রামায়ণ কাহিনীকে বাঙালী কবি আপন প্রতিভার জারক-রস দিয়ে ক্রমে-ক্রমে আত্মসাৎ (assimilate) করে নিয়েছেন, তারপরে সেই কাহিনী-রস থেকে সহজভাবে জাতীয় জীবনের আলো-বাতাস পেয়ে সৃষ্টির যে নতুন ফুলটি ফুটে উঠেছে কবি তাকে সংস্কৃতের ছাঁদে ফেলে তার আর কোন যান্ত্রিক সংস্কার করতে চাননি। ফলে বাংলা দেশের মাটিতে এখানকার বাতাবরণের মধ্যে যে ফুলটি ফোটা স্বাভাবিক, তা-ই ফুটেছে। পশ্চিম ভারতের শুষ্ক মাটির রুক্ষ প্রকৃতির দেশের আর্য নৃপতি রাম-চরিত্রের দার্ঢ্য, কাঠিন্য এবং ক্ষাত্রতেজ বাংলার ভিজে মাটি সবুজ প্রকৃতির দেশে অনেকখানি তরলীকৃত হয়েছে, কৃত্তিবাসের হাতে রামচন্দ্র বাউল-বৈষ্ণবের দেশে যেন প্রেম অহিংসার অবতার হয়ে উঠেছেন! আবার দেশ-কাল বিবেচনা করে কৃত্তিবাস তাঁর অনুবাদে শুধু চরিত্রেরই রূপান্তর করেন নি, বাল্মীকি-রামায়ণের অনেক কাহিনী তিনি বাদ দিয়েছেন, আবার অনেক স্বরচিত কাহিনী যোজনা করেছেন। রত্নাকরের 'মরা-মরা' জপ করতে করতে 'রাম-রাম' জপ করার গল্প মূল বাল্মীকি-রামায়ণে থাকার কথা নয়, কারণ 'মরা' শব্দই সংস্কৃতে নেই, ওটি বাংলা শব্দ। আবার নাম-জপের এতখানি শক্তি যে, তার ফলে দস্যুও হয়ে ওঠে ঋষি-কবি—এও নাম-মহিমার দেশ বাংলারই জিনিস। স্পষ্টত তাহলে এ গল্পটি কৃত্তিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি, মূল থেকে গৃহীত নয়। মূলের এত যে পরিবর্তন কবি করেছেন, পণ্ডিতেরা বলবেন, এতে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে অনুবাদ না বলে একে একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। আমার মনে হয়, এটি কৃত্তিবাসের নিন্দা নয়, প্রশংসা; এটা তাঁর প্রতিভার ব্যর্থতা নয়, সার্থকতার প্রমাণ। এর সমর্থন জানিয়েছে শত শত বর্ষের বাংলাদেশ— এই অনুবাদককে হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছে। এই আসন কবি পেয়েছেন বাংলার শুধু ভাষাভঙ্গি নয়, বাঙালীর মনোভঙ্গিও বুঝে তিনি অনুবাদ করেছিলেন বলেই। মূলের আরো অনুগত থেকে বাঙালীর জাতীয় চিত্তের রস-সংস্কারকে উপেক্ষা করে যাঁরা মূলের ভাব ও ভাবনাকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন, অন্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভা যথেষ্ট স্বীকৃতি পেলেও অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁদের স্বীকৃতি তেমনটি হয় নি। এই অস্বীকৃতির অন্যতম দৃষ্টান্ত রাজশেখর বসু কৃত বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদ। মূলের রস ও রূপ তিনি অনেকখানি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, বিদগ্ধ জনের মধ্যে তাঁর স্বীকৃতিও কম নয়, কিন্তু কৃত্তিবাসের মত সমগ্র জাতির চেতনে-অচেতনে এমন সুদূর প্রসারী অনুপ্রবেশ এবং এমন ব্যাপক অবিসংবাদি স্বীকৃতি তিনি লাভ করেছেন কি? অন্যদিকে মূলের কাহিনী পরিবর্তিত করলেও, মূলের

চরিত্র ও ভাবসম্পদ অল্প-বিস্তর রূপান্তরিত করলেও একথা কি বলতে পারি—রামায়ণকে জাতীয় চিত্তে কৃত্তিবাস অমর করে দিতে পারেননি? অথবা এই দেশে, সেই কালে, রামায়ণের রস কৃত্তিবাসের চেয়ে বেশি সার্থকতার সঙ্গে আর কেউ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন বা আর কারো পক্ষে আর কোন পদ্ধতিতে তা সম্ভব ছিল?

সাহিত্যে এমনি স্বাধীন অনুবাদের সাফল্যের দৃষ্টান্ত আরো অনেক পাওয়া যাবে। এই সাফল্যের কথা বিবেচনা করেই অনুবাদকের এই স্বাধীনতা অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য যুগ যত এগিয়ে চলেছে, জাতীয়তার গণ্ডি পেরিয়ে ততই আমাদের চিত্তের সম্প্রসারণ ঘটেছে। আজকে আন্তর্জাতিকতা (internationalism), বিশ্ব-মানবতা (pan-humanism) ও বিশ্বায়ন (globalisation) আমাদের যুগবাণীর প্রধান ধুয়া হয়ে উঠেছে। এ আমাদের চেতনার ব্যাপ্তিরই সাক্ষ্যবাহী। এমন দিন হয়তো আসবে, হয়তো ইতিমধ্যে অনেকখানি এসেই গেছে, যখন আমরা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেও অন্য দেশের অন্য কালের চিত্তের সঙ্গে ভাবসম্মিলন লাভ করব। তখন জাতীয় রস-সংস্কার হয়তো আর কোন গণ্ডি হয়ে আমাদের চিত্ত-ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না, তখন অনুবাদক যদি মূলের ভাব ও ভাবনাকে কৃত্তিবাসের মত অতখানি পরিবর্তিত না-ও করেন, তবু আমরা তাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারব। তখন অনুবাদকের লক্ষ্য হবে মূলের রস, মূলের ভাবসম্পদকে যতদূর সম্ভব অনুকরণ করেই শুধু ভাষার গণ্ডিটি অতিক্রম করতে আমাদের সাহায্য করা, শুধু ভাষার ক্ষেত্রে ও রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে রূপান্তর সাধন করা। সেখানেও কিন্তু তিনি মূলের আক্ষরিক রূপান্তর সাধন করবেন না, যথাসাধ্য মূলের ভাববস্তুর অনুগত থেকেই ভাষার ক্ষেত্রে, বাগ্‌ভঙ্গি, প্রবচন, অনুষঙ্গ (association) ও প্রসঙ্গ-সূত্র (allusion) ব্যবহার এবং স্টাইলে মূল থেকে সরে এসে একটি স্বাধীন শিল্প গড়ে তুলবেন, সে প্রয়োজন তাঁর আছে। কারণ যে ভাষার আধারে সাহিত্যের পরিবেশন, অনুবাদের পরিবেশন, সেই ভাষা ও ভাবের একটি জীবন্ত সত্তা, ভাষারও বিন্যাস তাই যথাসাধ্য নৈসর্গিক হওয়া উচিত; সেখানে যান্ত্রিক রূপান্তর হলে ভাষার প্রাণটি শুকিয়ে যায়। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গ্রহণীয় :

"A translator is not necessarily bound to the exact word and letter of the original he chooses, he can make his own poem out of it if he likes, and that is what is very often done This is all the more legitimate since we find that literal translations more completely betray than those that are reasonably free—turning life into death and poetic power into poverty and flatness."[৬]

আগেই বলেছি অনুবাদকের দায়িত্ব দ্বিবিধ—প্রথম, তাঁকে যথাসাধ্য মূলের ভাববস্তুর অনুগত হতে হয়; দ্বিতীয়, তাঁকে নতুন ভাষার মধ্যে স্বাধীনভাবে অল্পস্বল্প পরিবর্তন সাধন করে একটি নতুন শিল্পরূপ গড়ে তুলতে হয়। এই দ্বিবিধ দায়িত্বই আমাদের

৬। Letters of Sri Aurobindo, 3rd Series, 1949, p 208

সাহিত্যধারায় যাঁরা সার্থকতার সঙ্গে পালন করেছেন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যের সমৃদ্ধি উপেক্ষণীয় নয়। বলা যেতে পারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকেই এর সূচনা। মৌলিক সাহিত্য শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গল কাব্য যতটা জনপ্রিয় হয়েছিল, অনুবাদ-সাহিত্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ তার চেয়ে কোন অংশে কম জনপ্রিয় হয়নি। উপরন্তু মুসলমান আক্রমণের পরবর্তী বাংলার বৃহত্তর জনচিত্তকে বিজাতীয়দের কালাপাহাড়ী আক্রমণ থেকে রক্ষার মহৎ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল এই অনুবাদ-সাহিত্যই। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী প্রভাবে নবজাগরণ যখন সূচিত হল, তখন জাতীয় চিত্তকে বিশ্বজনের চিত্তের সঙ্গে যুক্ত করার প্রাথমিক দায়িত্বও পালন করেছিল নবযুগের অনুবাদ-সাহিত্যই। ডানকান-কৃত আইনগ্রন্থের অনুবাদ ও কেরীর বাইবেলের অনুবাদ থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরের 'কমেডি অব এবর্স', হরচন্দ্র ঘোষের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', ও 'রোমিও জুলিয়েট'-এর অনুবাদের ধারা বেয়ে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদ পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে দেখি, যে ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নবজাগরণের শিহরণ দেখা দিয়েছিল তার রস বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছে অনুবাদ-সাহিত্যের মাধ্যমেই। শুধু ইংরাজী নয়, হিন্দী থেকে চণ্ডীচরণ মুন্সীকৃত 'তোতা ইতিহাস'-এর অনুবাদ, বিদ্যাসাগরকৃত 'বৈতাল পচ্চিসী'র অনুবাদ, সংস্কৃত থেকে তারাশঙ্কর তর্করত্নকৃত 'কাদম্বরী' র অনুবাদ, বিদ্যাসাগর নন্দকুমার রায় প্রমুখ বহু মনীষীকৃত কালিদাসের একাধিক রচনার একাধিক অনুবাদ, এমন কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত ফরাসী নাট্যকার মলেয়রের প্রহসনের অনুবাদ—এসবই বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যে রকম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা আজ নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। তারপরে তো বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গুণগত উৎকর্ষও যথেষ্টই হয়েছে, তার খতিয়ান নেবার প্রয়োজন এখানে আমাদের নেই। আমাদের বক্তব্য শুধু এই,—বাংলার এই যে সুবিস্তৃত অনুবাদ-সাহিত্য, তাতে নলিনীকান্ত গুপ্ত একজন বিশেষ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অনুবাদক। এখন আমাদের আলোচ্য এই বিশিষ্ট ধারাটি কি? এ ক্ষেত্রে নলিনীকান্ত গুপ্তের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নই-বা কি রকমের?

ভারতে যেমন সংস্কৃতও ছিল প্রথমে একটি বিদেশাগত ভাষা পরে এখানকার দীর্ঘকালের ইতিহাসের সঙ্গে তার পরিণয়-বন্ধন হওয়ায় সংস্কৃত আজ হয়ে উঠেছে ভারত-আত্মারই মাতৃভাষা, তেমনি ইংরেজীও বিদেশ থেকে এসে এ দেশের মনীষায় শ্রদ্ধার আসন লাভ করে এদেশের এক বিশিষ্ট সংখ্যক মনীষীর সাধনায়। এক সময় ইংরেজীতে সাহিত্য-সাধনা করতে গিয়ে মধুসূদন প্রমুখ স্রষ্টাদের মধ্যে ব্যর্থতা এসেছিল সত্য, কিন্তু আরো পরবর্তীকালে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ ও আত্মীয়তার ফলে ইংরাজীর সঙ্গে ভারতীয়দের একটি আত্মিক যোগও স্থাপিত হয়েছিল। এই কারণে অন্তত কিছু-সংখ্যক ভারতীয় ইংরাজীতে সাহিত্য-সাধনা করে ভারতীয় সাহিত্যেই একটি বিশিষ্ট

ইংরেজী সাহিত্যের ধারা যোগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ কুমারস্বামী প্রমুখ কেউ-কেউ আবার এই ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের ধারাকে কাজে লাগালেন এক মহত্তর উদ্দেশ্যে—ভারত-আত্মার অধ্যাত্ম-সাহিত্য ও শিল্প-বাণীকে ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের দ্বারে পৌঁছে দিতে চাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই ধারারই শেষতম শ্রেষ্ঠতম লেখক এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীমৎ অনির্বাণ এই ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

ভারতের যে বাণী বিশ্বের জন্যে প্রচারিত, তাতে ভারতের নব্য-ভাষা-ভাষীরও প্রাপ্য অংশ আছে। এ যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠতম বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দের অমৃতবার্তাকে শুধু আন্তর্জাতিক ভাষায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে নব্য বাঙালীর বৃহত্তর চেতনায় প্রসারিত প্রচারিত করার পবিত্রতম দায়িত্ব পালন করেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের রচনায় অধ্যাত্ম-রস ও সাহিত্য-রসের সমন্বয় ঘটেছে, এবং সেই জন্যে তাঁর সার্থকতম অনুবাদক তিনিই হতে পারেন, যিনি একাধারে সাধক ও সাহিত্যিক। নলিনীকান্ত গুপ্তের মানসিকতায় এই দুইকেই পাই। অগ্নিযুগের আমল থেকেই তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের দক্ষিণ হস্ত, আবার যখন পণ্ডিচেরীতে যোগের হোমাগ্নি জ্বেলে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পারিষদদের নিযে ধ্যানস্থ হলেন, তখনও নলিনী গুপ্তই তাঁর প্রধান সহচর। এই ঐতিহাসিক যোগাযোগ, এবং প্রতিভার ঐ বিশিষ্ট গঠন নলিনী গুপ্তকে শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্যের সার্থক অনুবাদকরূপে নিয়তির বিধানেই যেন গড়ে তুলেছে।

বাইবেল, বেদ এবং স্বদেশী-বিদেশী অন্যান্য রচনা থেকেও নলিনীকান্ত গুপ্তের কিছু-কিছু অনুবাদ চোখে পড়ে, কিন্তু তাঁর প্রধান অনুবাদ কীর্তি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার রচনা থেকেই। শ্রীঅরবিন্দের রচনার অনুবাদ হল—'যোগসাধনার ভিত্তি' (Bases of Yoga), 'মা' (The Mother) , চিন্তাকণা ও দৃষ্টিনিমেষ (Thoughts and Glimpses), 'ভারতের নবজন্ম' (The Renaissance in India), 'সাবিত্রী' (Savitri), 'যোগের পথে আলো' (Lights on Yoga মোহিনীমোহন দত্তের সঙ্গে একযোগে)। শ্রীমায়ের রচনা তিনি যা অনুবাদ করেছেন সেগুলি হল—'ছোটদের সাধনা' (The Ideal Child) 'মায়ের আলাপ'(Conversations, চারুচন্দ্র দত্তের সঙ্গে একযোগে), 'ভাবীকালে' (Towards the Future),'মাতৃবাণী' (Words of the Mother), 'ধ্যান ও প্রার্থনা' (Prayers and Meditations), ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞের কাছে এই তালিকার নিশ্চয়ই কোন উপযোগিতা নেই, কিন্তু এটি উপস্থাপিত করা হল এই জন্যে যে, এই অনুবাদ গ্রন্থাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটি কথা সহজেই মনে হয়— গ্রন্থ-নির্বাচনে এখানে মানুষী-বুদ্ধির কোন পরিকল্পনা নেই। সাধারণ সাহিত্যসাধক যেমনটি করে থাকেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত সে রকম শ্রীঅরবিন্দ বা শ্রীমায়ের গ্রন্থ অনুবাদে মূল রচনার কালানুক্রম বা বিষয়ানুক্রম কোনটিই অনুসরণ করেননি। এমন কি কোন বৃহৎ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অনুবাদও তিনি করেননি। বৃহৎ গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র 'সাবিত্রী'-র অনুবাদই চোখে পড়ে। সেখানেও লক্ষণীয় এই যে, এই অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে বা দ্রুতগতিতে তিনি করেননি। 'সাবিত্রী'

অনুবাদের আঙ্গিকও সর্বত্র এক রকম নয়, না হবারই কথা। কোথাও এই অনুবাদ অমিত্রাক্ষর ছন্দে, কোথাও স্বচ্ছন্দ গদ্য-ছন্দে। অনুবাদের জন্য তাঁর নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা এবং অনুবাদ প্রক্রিয়ায় এই বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই মনে হয় তাঁর অনুবাদের মধ্যে কোন মানুষী বুদ্ধির পরিকল্পনা যেমন নেই তেমনি, সাহিত্যকীর্তি অর্জনের কোন মানবীয় আকাঙ্ক্ষাও নেই। মানুষী বুদ্ধির অতীত এক দিব্যপ্রেরণার বশে তাঁর সাহিত্য-সাধনা চালিত। এক অলক্ষ্য জীবনদেবতার দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিতে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের নির্বাচন, তাঁর সাহিত্য প্রক্রিয়ার ধারা নিয়ন্ত্রিত। আগে যে বলেছি তিনি শ্রীঅরবিন্দের নিয়তি নির্দিষ্ট অনুবাদক; সে কথা এখানে আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। এই নিয়তি কোন জড় নিয়তি নয়, জড় জগতের কার্যকারণের বন্ধন থেকে মুক্ত যে যোগীচেতনা তাকেও এক দিব্যজননীর অঙ্গুলিনির্দেশে চালিত হতে হয়, এ নিয়তি হল সেই দিব্য জননীরই নির্দেশ। এই দিব্য নিয়তি ব্যক্তিচেতনাকে শাসনের ভয়ে চালিত করে না, মুক্তির আনন্দের মধ্যেই ঊর্ধ্বের টানে শ্রেয়ের পানে নিয়ে চলে। এই দিব্য নির্দেশের কম-নির্বাচনেও একটা নিজস্ব বিধান আছে, কিন্তু সে বিধান মানব-বুদ্ধির অগম্য বলে মানবীয় শৃঙ্খলার বোধকে তা প্রতিপদে প্রহত করে। নলিনীকান্ত গুপ্তের বুদ্ধিগত নয়, বোধিলব্ধ সাহিত্য-সাধনায়, বিশেষত শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের গ্রন্থ অনুবাদে এই লোকোত্তরা নিয়তি বারেবারে বিদ্যুৎ-চমকের মত উদ্ভাসিত হয়ে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে; কিন্তু আমাদের মানুষী চেতনা তাতে বিহ্বল হয়ে তার গতিবিধির আন্তর শৃঙ্খলাটুকু অনুধাবন করতে পারে না। সাধারণত কবির চেতনা, শিল্পীর মন, এমনিতেই 'বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি'র কাছে একটু খেয়ালী প্রতিভাত হয়, তার উপরে বোধির বিধান এসে যদি সীমাবদ্ধ বুদ্ধির বিধানকে ওলট পালট করে দেয়, তা হলে তো সাধারণের চোখে তাকে এলোমেলো মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ ভগবানের বিধান মানুষের বিধান নয়। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের কথা নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদের মাধ্যমেই শোনা যাক

"ভগবানের ধারা মানব-মনের ধারা নয়, আমাদের রচিত পরিকল্পনারও অনুযায়ী নয়। ভগবানের ধারা বিচার করা অথবা তিনি কি করবেন আর না করবেন তার ব্যবস্থা দেওয়া অসম্ভব।"[৭]

কিন্তু দিব্য-প্রেরণার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রাকৃত দৃষ্টিতে এলোমেলো মনে হলেও তার মধ্যেও একটি নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে। নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ রচনার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দিব্য পরিকল্পনা বিদ্যমান, তার সবটা আমরা অনুধাবন করতে না পারলেও শান্ত মনে অপেক্ষা করে থাকলে এর একটা আভাস আমাদের চেতনায় ভেসে ওঠে। তাঁর সমগ্র অনুবাদ-গ্রন্থাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, গ্রন্থ-নির্বাচন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এমনভাবে করা হয়েছে যে, এই স্বল্পসংখ্যক ছোট-ছোট বইগুলির মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্যের সার আস্বাদন করা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, বেদের সার বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে নিহিত। শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি উপনিষদতুল্য, নলিনীকান্তের অনুবাদে

৭। 'যোগসাধনার ভিত্তি', ১৩৫৭, পৃ. ২৫।

সেগুলিই অগ্রাধিকার পেয়েছে। আবার প্রাচীনেরা বলেছেন, উপনিষদরূপ গাভীর দোহন করা দুগ্ধ হল 'গীতা'; গীতা এদিক থেকে ভারতীয় মনীষার নির্যাস-স্বরূপ। এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত একবার আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের The Mother ('মা') হল গীতার মতই শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও সাধনার নির্যাস স্বরূপ। আবার এই ছোট বইটির অনুবাদই হল নলিনীকান্ত গুপ্তের শ্রেষ্ঠতম অনুবাদকীর্তি। শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী রচনায় যাঁদের প্রবেশাধিকার নেই, বিশেষত, শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী গদ্যের ধ্রুপদী বিন্যাসে অনুপ্রবেশের চেষ্টা না করেই যারা ভয়ে পশ্চাৎপদ হন, তাঁরা যদি সহজে সংক্ষেপে শ্রীঅরবিন্দের যুগান্তকারী সাধনার পথটি জানতে চান তো বিনা দ্বিধায় আমরা নলিনী কান্ত গুপ্তের অনুবাদটি তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারি। এই 'মা' বইটির মত একটি যুগান্তকারী সাধনার, একটি সুমহান জীবন-দর্শনের নিটোল এমন স্বল্পায়তন ভাবঘন compendium সারা বিশ্বের চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির জগতে আছে কি না সন্দেহ। এর বিষয়-গৌরব আমাদের আলোচ্য নয়। কারণ বিষয়গৌরবের কৃতিত্ব মূল লেখকের প্রাপ্য। কিন্তু অনুবাদকের কৃতিত্ব যদি অনুসন্ধান করতে হয়, তবে প্রথমে চোখে পড়বে অনুবাদের ভাষায় অতুলনীয় শিল্পগুণ। মূলের বিষয়গৌরব অনুযায়ী অনুবাদের ভাষাতেও দেখি অপূর্ব মহিমা-সমুন্নতি (sublimity)। শ্রীঅরবিন্দের মূল রচনাটিই একটি সাধন-গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে কাব্যগুণান্বিত। নলিনীকান্ত গুপ্ত মূলের বিষয়গৌরবের সৌম্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে কাব্য-ভাষার অপূর্ব সমৃদ্ধি অনন্য-সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চারিত করেছেন। এই দক্ষতা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, যেখানে দিব্য জননীর চারিটি ব্যক্তিত্বের বর্ণনা আছে। মাতৃশক্তির চারিটি ব্যক্তিত্বের চারিটিস্বতন্ত্র রূপ, এবং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র রূপের জন্যে মূল লেখকের মত অনুবাদকও স্বতন্ত্র বাণী বিন্যাস করেছেন। মহাকালীর প্রচণ্ড রুদ্ররূপের বর্ণনার জন্যে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার শব্দধ্বনির মধ্যেও যেন অনুরণিত হয়ে উঠেছে মহাকালীর অসি-ঝঙ্কার :

"মহাকালী আর এক প্রকৃতির। বিস্তৃতি নয়, উচ্চতা জ্ঞান নয়, বল ও বীর্য তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব। ......তাঁর সমগ্র ভাগবতী প্রকৃতি ঝঞ্ঝারুদ্র কর্মের প্রভায় প্রস্ফুরিত—তিনি রয়েছেন ক্ষিপ্রতার জন্য, আশুফলদায়ী প্রক্রিয়ার জন্য সাক্ষাৎ সঘন আঘাতে সব পরাভূত করে সম্মুখ আক্রমণের জন্য। অসুরের প্রতি ভয়ঙ্কর তাঁর মুখমণ্ডল, ভগবদ্‌বিদ্বেষীর উপর নির্মম নিদারুণ তাঁর চিত্ত। বিশ্বলোকের রণরঙ্গিনী তিনি—সংগ্রামে কখন পশ্চাৎপদ নন। .....অদম্য তাঁর প্রবৃত্তি ঃ তাঁর দৃষ্টি তাঁর সঙ্কল্প শ্যেনবিহঙ্গের ব্যোমবিহারের মত উত্তুঙ্গ দূরপ্রসারী, ঊর্ধ্বারিত পথে ক্ষিপ্র তাঁর গতি....।"[৮]

আবার যখন মহালক্ষ্মীর লাবণ্যময় শ্রীরূপ বর্ণনা করেন, তখন অনুবাদকের ভাষার কমনীয়তা, রমনীয়তা ও মাধুর্য বিস্ময়কর। বিষয়ের লাবণ্য যেন ভাষার উপরেও তার কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে :

"মহালক্ষ্মীর শক্তি— দেহধারী জীবের কাছে ভাগবতী শক্তির এতখানি চিত্ত-বিমোহন

৮। 'মা', ১৯৫২, পৃ: ৫৩ ৫৫।

আর কোন প্রকাশ নাই। .....ভগবানের উন্মাদন মাধুর্যের যাদু তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্য নিবিড়তম আনন্দ; হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে অনুভব করা সারা জীবনকে এক আত্মহারা সুখ, পরম আশ্চর্যে পরিণত করা। সূর্য হতে আলো যেমন তেমনি তাঁর হতে শ্রী শোভা স্নেহ প্রবাহিত। আর যেখানেই তিনি তাঁর অনুপম দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন কিংবা তাঁর স্মিতহাস্যের মধুরিমা ঢেলে দিয়েছেন, সেখানেই মানুষের অন্তরাত্মা বাঁধা পড়েছে, বন্দী হয়েছে, অতল আনন্দের গর্ভে ডুবে গিয়েছে। তাঁর হস্তের স্পর্শে কুহক, তাদের প্রচ্ছন্ন সুকুমার প্রভাব মনকে প্রাণকে দেহকে শোধিত মার্জিত ক'রে তোলে। আব যেখানেই তাঁর পায়ের ভর পড়েছে সেখানেই উৎসারিত হয়েছে চিত্তোন্মাদন আনন্দের সুরধুনী।"[৯]

মায়ের দুইরূপে যেমন পার্থক্য, তার বর্ণনাতেও তেমনি পার্থক্য এবং উভয় ক্ষেত্রে গদ্য ও কাব্যের সীমারেখাটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গদ্যের কাঠি ছুঁইয়ে অনুবাদক যেন এক অপূর্ব প্রতিভাব যাদু দিযে আমাদের কখন কাব্যের কাঞ্চনজঙ্ঘায় তুলে ধরেছেন তা আমরা বুঝতেও পাবি না। প্রতিপক্ষ বলবেন, এ গুণটি তো মূল গ্রন্থেই আছে। আমরা বলব, অনুবাদক যে মূলেব গুণটি অনবাদেও সঞ্চারিত করতে পেবেছেন, এটাই তো তাঁর কৃতিত্ব, আবার এই কৃতিত্ব দ্বিগুণিত হয়ে ওঠে যখন এই অনুবাদ পড়েও একে একটি মূল রচনা বলেই মনে হয়। (শ্রীঅরবিন্দেব ভাষায বলা যায় – 'the result does not read like a translation but like an original.) তখনই অনুবাদের উৎকর্ষের চরম বিন্দু। এই চরম উৎকর্ষই নলিনীকান্ত গুপ্তের স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন। আমরা আগে বলেছি, একটি বিশেষ ধারার সাহিত্যের অনুবাদে নলিনীকান্ত গুপ্তেব একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত আসন আছে। এই স্বাতন্ত্র্যটি ধরা পড়বে যদি এরই পাশে এই ধারার একটি অনুবাদ গ্রন্থেব কতকাংশ উদ্ধৃত করি :

"একটি ভাবকে নূতন বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেটির নূতনত্ব চলিয়া গেলে পুনরায় আর একটি নূতন ভাব আশ্রয় করা, এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি নানাদিকে ক্ষয় হইয়া যায়। সাধন করিবার সময় এইরূপ নূতনভাব-প্রিয়তারূপ বিপদ আইসে। একটি ভাব গ্রহণ করে, সেটি লইয়াই থাক। উহার শেষ পর্যন্ত দেখ। উহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা ভাব লইয়া মাতিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়ের সত্য তত্ত্বের উন্মেষ হয়। আর যাহারা এখানকার একটু ওখানকার একটু এইরূপ অল্পাস্বাদনবৎ সকল বিষয়ে একটু একটু দেখে তাহাবা কখনই কোন বস্তু লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের স্নায়ু একটু উত্তেজিত হইয়া তাহাদের একরূপ আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে আর কিছু ফল হয় না।"[১০]

বলা বাহুল্য, এটি বিবেকানন্দের মূল রচনা নয়, এটি তাঁর মূল ইংরাজির বাংলা রূপান্তর। এই অনুবাদে বিষয়বস্তুর উপযোগী ধীর গাম্ভীর্য আছে। কিন্তু মূল রচনাটির যে প্রাঞ্জলতা সেটা কি অনুবাদক এখানে রক্ষা করতে পেরেছেন? এক্ষেত্রে বিষয় বিবেচনায় নলিনীকান্ত গুপ্তের মত কল্পনার দীপ্তি এবং ভাষার কান্তি হয়তো প্রত্যাশিত নয়; কিন্তু

৯। তদেব, পৃ ৫৮ - ৫৯।
১০। স্বামী বিবেকানন্দ : 'রাজযোগ', ষষ্ঠ অধ্যায় পৃ ৯৩।

'নূতন-ভাব-প্রিয়তারূপ বিপদ আইসে' বা 'অম্লাস্বাদনবৎ' প্রভৃতি বাক্যাংশ বা প্রয়োগরীতির আড়ষ্টতাও নিশ্চয়ই কাম্য নয়। যাঁরা ইংরেজী 'রাজযোগ' পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন, এই ভাবটি সেখানে আছে, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিটি এ-রকম আড়ষ্ট নয়। যে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে কোন আড়ষ্টতা ছিল না, যাঁর মধ্যে ভিতরে-বাইরে কোন প্রভেদ কোন কৃত্রিমতা ছিল না, তাঁর গ্রন্থ অনুবাদের সময় তাঁর নিজের কথাটিই মনে রাখার প্রয়োজন ছিল :

"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; .....ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।"[১১]

কোন অনুবাদককে ছোট করে আর একজনকে বড় করার রীতি আমাদের নয়; কিন্তু কারো স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন প্রদর্শনের জন্যে সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার রীতি বহুজন- স্বীকৃতর এই তুলনার আলোকে আরো প্রখরভাবে অনুভূত হয়, নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ এতখানি স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল যে তাকে মৌলিক রচনা বলে প্রায়ই ভুল হয়। এইখানেই এই ধারার অনুবাদকদের মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তাছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দের রচনার সব অনুবাদের ভাষায় এরকম আড়ষ্টতা নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদের ভাষায় এমন ওজোগুণ বিদ্যমান যে তাতে বীর সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বই যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে।

'মা' গ্রন্থখানিতে শ্রীঅরবিন্দের সাধন-তত্ত্বের সার কথা বিধৃত হলেও প্রবর্তক সাধকের জন্যে তা যোগের প্রথম পাঠ। এইরকম প্রথম পাঠ—যদিও সে পাঠ খুব সহজ নয়—পাই তাঁর 'যোগসাধনার ভিত্তি'-তে। 'মা'-তে যেমন সাধনার উচ্চাঙ্গের কথা, মাতৃশক্তির উপলব্ধির ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ প্রকাশ এবং তাকে প্রকাশ করার উপযোগী কবিকল্পনা ও কাব্যভাষার অপূর্ব শিল্পশ্রী পাই, তেমনি 'যোগসাধনারও ভিত্তি'-তে আছে সাধনার গোড়ার কথা,—সাধক যেন সবে মাত্র এপথে এসেছেন। গুরু তাই শিষ্যকে অপত্যস্নেহের সঙ্গে পাশে বসিয়ে সাধনার কথা সহজ করে বোঝাচ্ছেন। এখানে তাই ধ্যানী চিত্তের উত্তুঙ্গ বিহার নেই, ভাষার মণ্ডনকলা নেই, আছে যেন গুরু-শিষ্য-সংলাপের অন্তরঙ্গতা। এবং মূলের এই অন্তরঙ্গতা নলিনী গুপ্তের প্রাঞ্জল অনুবাদে কত সুন্দরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে লক্ষ্য করুন :

"কামাবেগের কথা। জিনিসটিকে পাপ, বিভীষিকা অথচ লোভনীয় কিছু হিসাবে দেখবে না, দেখবে নিম্নতন প্রকৃতির একটা ভুল, একটা ভ্রান্ত-ক্রিয়া হিসাবে। একে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করবে—তবে এর সঙ্গে যুদ্ধ করে নয়, এর থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে তোমার সম্মতি না দিয়ে—"[১২]

শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলীর সঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রীমায়ের রচনারও অনুবাদ করেছেন

১১। স্বামী বিবেকানন্দ : 'ভাববার কথা, "বাংলা ভাষা"'।

১২। 'যোগসাধনার ভিত্তি', ১৩৫৭, পৃ. ৮৫

সেই একই দিব্য-প্রেরণার বশে। শ্রীমায়ের মূল রচনার মধ্যেই আছে একটা স্ফটিক-স্বচ্ছতা এবং স্বচ্ছন্দ গতি। নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদে মূলের এসব গুণই আমরা পাই। এক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ কম। দুটি মাত্র অনুবাদের কথা স্মরণ করলেই এখানেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরকালে কাব্যের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন—এক, উত্তরকালের কাব্য হবে আত্মার আত্মগত সত্যপ্রকাশ, দুই, তার প্রকাশরীতিতে থাকবে বৈদিক মন্ত্রের সংহতি ও মর্মস্পর্শিতা। শ্রীমায়ের 'ধ্যান ও প্রার্থনা'-য় পাই আত্মার সেই **আত্মগত সত্যপ্রকাশ—গীতিকাব্যের পরমতম** সম্পদ আর পাই **মন্ত্রের সেই সংহতি ও মর্মস্পর্শিতা**। বলা হয়, বৈদিক ঋষিরা মন্ত্রকে রচনা করেননি, তাকে ধ্যানে দেখেছিলেন মাত্র— এবং যেমন দেখেছিলেন তেমনই প্রকাশ করেছেন। বস্তুত একথার তাৎপর্য এই যে, সার্থক মন্ত্র মানুষী বুদ্ধির রচনা নয়, এ হল এক দিব্য প্রেরণার বশে অন্তর থেকে স্বতঃউৎসারিত বা ঊর্ধ্ব থেকে স্বতঃ-অবতীর্ণ বাণী। শ্রীমায়ের 'ধ্যান ও প্রার্থনা'-র লেখাগুলি এই জাতীয় বাণীমালা। নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদে এই স্বতঃগতিও লক্ষণীয়। শ্রীমায়ের 'মাতৃবাণী' হল ভাবঘন সুভাষণের সঙ্কলন। এখানে প্রত্যেক স্তবকে রয়েছে সুদূর প্রসারী ব্যঞ্জনা। নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ থেকে এই ব্যঞ্জনার দৃষ্টান্ত দিই ঃ

"পাহাড়ের পথ দু'দিকে নিয়ে যায়—উপরের দিকে, নীচের দিকে—সব নির্ভর করে কোন দিকে আমাদের মুখ।" ('মাতৃবাণী', ১ম পর্যায়, ১৩৬১, পৃ. ১০)

পরিশেষে আমরা বলব, বিন্দুতে সিন্ধুকে প্রতিফলিত করার যে মহান্ ব্রত নিয়ে নলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের স্বল্পসংখ্যক স্বল্পায়তন গ্রন্থাবলীর অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর সিদ্ধি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনি একাধারে যোগী ও স্রষ্টা বলেই শ্রীঅরবিন্দের ভাবগঙ্গাকে শুধু যোগী মহাদেবের মত আপন মস্তকে আবদ্ধ করে ধরে রাখেননি; তিনি স্রষ্টা প্রজাপতির মত আপন অনুবাদ-সৃষ্টির কমণ্ডলু-মুখে মুক্তি দিয়েছেন তাকে গণচেতনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে। আমরা গণসাধারণ তাঁর মধ্যে একাধারে সাধক ও সাহিত্যিক, যোগী ও কবি, শিব ও ব্রহ্মাকে দেখে বিস্ময়ে বলি—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ...'।

৯. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

এ কথা এখন বিতর্কিত নয় যে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে অন্বিত। এই সম্পর্কের বিশেষ মাত্রা স্মর্তব্য। সাহিত্য ও শিল্পকলা বায়ুভুক্ নয়। জীবনের সরস ক্ষেত্রের প্রতি দিগন্তে তার শিকড় বিস্তৃত। প্রতি প্রকোষ্ঠ থেকে রস আহরণ করে শিল্প-সাহিত্য তার পত্র-পল্লব ফুলফল বিকশিত করে তোলে। তাই একান্ত ভাববাদী দার্শনিকও এই সত্যকে সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রত্যেকটি মহৎ সৃষ্টির জন্যে জীবনের গভীর বিচিত্র অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা অপরিহার্য্য। সাহিত্য বা শিল্পকলা শুধুই কল্পনার ফানুস নয়। তাই বলেছেন অকুণ্ঠ কণ্ঠে : " For any considerable creation there must be a background of life . ...."[১]

শিল্প-সাহিত্যের মূল পটভূমি জীবন। জীবন যেহেতু সমাজবিবিক্ত হতে পারে না, সেহেতু জীবন মানেই সমাজবদ্ধ জীবন। সমাজবিবিক্ত সন্ন্যাসীর জীবন সাধারণত সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না। সমাজের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কে যুক্ত যে জীবন, সেই জীবনই শিল্পসাহিত্যে বিচিত্র রসধারা উৎসারিত করতে পারে।

এবং জীবন যতক্ষণ জীবন্ত জীবন, ততক্ষণ তা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা প্রাণের ধর্ম; পরিবর্তনশীলতার অন্বিষ্ট লক্ষ্য আবার প্রগতি। সুতরাং পরিবর্তনশীল প্রগতিশীল জীবনই সাহিত্য ও শিল্পকলার পটভূমি ও উপজীব্য। আর সাহিত্য ও শিল্পকলার মূল পটভূমি ও উপজীব্যই পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল বলে সাহিত্য এবং শিল্পকলাও পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল।

কিন্তু এই পরিবর্তন হয় কীভাবে, কেমন করে? কেউ-কেউ বলেছেন—সমাজে সকলের মূলে রয়েছে উৎপাদন-পদ্ধতি (mode of production)। এই উৎপাদন - পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে পরিবর্তিত হয় এবং তার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোও (economic super-structure) পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর অর্থনৈতিক কাঠামো সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোকে গড়ে তোলে নতুন করে প্রত্যেক যুগে। আবার সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ (value-sense) অনেকটা গড়ে তোলে। এই মূল্যবোধই সাধারণভাবে আমাদের শিল্পসাহিত্যের আদর্শগত প্রতিষ্ঠা।

যেদিন আমাদের লাঙল ভিত্তিক কৃষি-উৎপাদন প্রচলিত ছিল সেদিন আমাদের সেই উৎপাদন-পদ্ধতির প্রয়োজনে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা গড়ে উঠেছিল এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার জন্যে আমাদের জীবনের মূল্যবোধও সেইরকম গড়ে উঠেছিল। তখন পিতৃসত্য পালনের জন্যে পুত্রের বনবাসবরণ, অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাবশত অনুজের অগ্রজের সঙ্গে বনবাস গমন, স্বামীর প্রতি আনুগত্যবশত পত্নীর অজস্র দুঃখ

১। Letters of Sri Aurobindo. 3rd series, 1949, p 51

বরণ প্রচলিত আদর্শ ছিল। সেদিনের উৎপাদন-পদ্ধতি ধরে রাখার জন্যে একান্নবর্তী পরিবার দরকার ছিল এবং তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এরকম ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবারেব ও সমাজের কাঠামোকে পরিবর্তিত করেছে এবং তাই সেই পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, স্ত্রীর সতীত্ব আর সামাজিক আদর্শ রূপে টিকে থাকতে পারছে না। সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের এবং মূল্যবোধের এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন এযুগের যুগন্ধর অর্থনীতিবিদ এই ভাবে : "The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual process of life."[২]

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, মার্ক্সীয় জড়বাদ যান্ত্রিক জড়বাদ (mechanical materialism) নয়, মার্ক্সীয় জড়বাদ হল দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (dialectical materialism)। মার্ক্স্ একথা বলতে চাননি যে, শিল্পীর চেতনা জডজগতের বা সমাজ-পরিবেশের হুবহু প্রতিবিম্ব মাত্র। শিল্পী এবং সাহিত্যিক নিত্যনতুন ভাব ও আদর্শের স্বপ্নদ্রষ্টা ও জন্মদাতা। সাহিত্যিক ও শিল্পীব সেই নবদৃষ্ট আদর্শ সমাজকে গঠনমুখী পরিবর্তন এবং প্রযোজনীয ক্ষেত্রে বিপ্লবের দিকেও নিয়ে যায়। গোর্কীর 'মাদার' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর ভূমিকা এরকমই। এই ভাবেই আসে কবি-সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতার কথা। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর চেতনা সমাজেব অবক্ষয়িত রূপেব প্রতিবিম্ব না হযে নতুন গঠনমুখী রূপের স্বপ্নদ্রষ্টাও হতে পারে—একথা প্রথম বিধিবদ্ধ মার্ক্স্বাদী নন্দনতত্ত্ববিদ কড্ওয়েল্ স্বীকার করেছেন : "The artist is continually besieged by new feelings as yet unformuated, he continually attempts to grasp beauties and emotions yet unknown."[৩]

আগেই বলেছি জীবনের ভূমিতেই সাহিত্যের ফুল ফোটে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তাই নিবিড়। জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সাহিত্যের তরু আপনার শিকড় প্রোথিত করে রস আহরণ করে। সাহিত্যের প্রাণমূলে আছে জীবনের উর্বর ভূমি। এই ভূমি যেখানে যত ব্যাপক, সাহিত্যের পুষ্পবিকাশ সেখানে তত সমৃদ্ধ। মাটির সঙ্গে সাহিত্যকে তাই নিবিড় যোগ রেখে বাড়তে হয়।

ঠিক এই কারণে একটি প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের সামনে এসেছে : জীবন যখন পরিবর্তনশীল, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তখন কি? একটি কথা আমরা উপলব্ধি করছি মর্মে-মর্মে। মানবসভ্যতা একটি বিশেষ উৎক্রান্তিমুখীনতায় উপস্থিত। হয় একটা নতুন জীবন, একটা নতুন সভ্যতার জন্ম হবে, নয এর সার্মগ্রিক বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর মানুষ বুঝতে শিখেছে, রাজনৈতিক প্রশাসনে মানব জীবনে ঐক্য পূর্ণতা

২। Karl Marx 'Critique of Political Economy', Preface, Eng trans by Stone, pp 11 11

৩। Christopher Caudwell, 'Further Studies in a Dying Culture", London, 1949, p 109

শান্তি আনা সম্ভব নয়। মানবসত্তার মধ্যেই কোথাও তার মৃত্যুর বীজ নিহিত আছে। সমাজের যে দুষ্ট ক্ষত, অনৈক্য, অসাম্য, অসুস্থ জীবনের ক্লেদ, তার আদি কারণ রয়েছে মানুষের স্বভাবের মধ্যে বা তার সত্তার আরো গভীরে। মানবজীবনের যে বহু বিচিত্র জটিলতম ট্র্যাজিডি, তার মূল উৎস রয়েছে মানুষের নিজের মনোরাজ্যে, তার দেহগত প্রাণগত বিকৃতির মধ্যে। এ সবের আমূল সংশোধন না হলে জীবনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা যাবে না, সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। সাম্যের বাণী তখন শোনাবে ব্যর্থ পরিহাস। তাই আজ 'শুদ্ধিকরণ'-এর উপযোগিতা স্বীকৃত হচ্ছে। রাজনৈতিক কাঠামো নানাভাবে বদলেও দেখা গেল, মানুষের স্বভাবগত লোভ, স্বার্থ, ক্ষমতাস্পৃহা বারবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। মানুষের কল্যাণের আদর্শকে বারবার পরাস্ত করে। নিজের ক্ষমতালিপ্সাকে তৃপ্ত করার জন্যে পরের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেও কল্যাণের আদর্শ প্রচারে তার নির্লজ্জতা কোথাও বাধা পায় না।

মানুষের এই তীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতা মানুষকে হয়তো এখনো সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি দিতে পারেনি। কিন্তু নতুনভাবে প্রশ্ন করতে শিখেছে মানুষ,—সভ্যতার বাঁচার পথ তাহলে কোথায়? সে নিজের দিকে তাকিয়েছে, দেখেছে তার অন্তরের মধ্যেই রয়েছে সমস্ত ব্যর্থতার গহ্বর। এবং অন্তরের মধ্যেই রয়েছে তার সংশোধনের পথ। নতুন জীবনের নতুন সভ্যতা গড়ার শক্তি তাই কোন রাজনৈতিক মতবাদে নেই, কোন নীতিগত আদর্শের মধ্যেও নেই, আছে ব্যক্তির অন্তরের আমূল সংশোধনের ও আত্মিক পূর্ণতার মধ্যে। এযুগের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক তাই সাবধান করে দিয়েছেন—" This erring race of human beings dreams always of perfecting their environment by the machinery of government and society, but it is only by the perfection of the soul within that the outer environment can be perfected What thou art within, that outside thee thou shalt enjoy, no machinery can rescue thee from the law of thy being."[৪] ভাবীকালের নতুন সভ্যতার জন্মভূমি তাই প্রতিটি ব্যক্তি। ব্যক্তিকে ধরে সমাজের ক্রমিক পূর্ণতা, এই হল নবযুগের জীবনসাধনার পথ।

এই ব্যক্তির একটি অবিনশ্বর আত্মসত্তায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজের অত্যাচারে, রাজনৈতিক নিষ্পেষণে কিংবা পারিপার্শ্বিকের বিষাক্ততায় তার বিনষ্টি অসম্ভব। বরং এসবের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে এগিয়ে চলে জীবনের আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধানে। তার এই বহুবিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিত্য তার উপাদান গ্রহণ করে। সেই অভিজ্ঞতা মৃত্যুর হতে পারে, অমৃতেরও হতে পারে। ঊর্ধ্ব এবং অধঃ—জীবনের দুই কোটি থেকেই সাহিত্যের উপাদান গৃহীত হতে পারে। দেখতে হবে, জীবনের মর্মমূলে বসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে এই যে কেন্দ্রীয় জীবনদেবতা, সাহিত্য তার যাত্রাটি সম্পর্কে সচেতন কিনা, অভিজ্ঞতাগুলিকে সেই জীবনদেবতার কণ্ঠে গ্রথিত মালারূপে সে দেখছে কিনা। যদি সাহিত্য এই জীবনদেবতাকে আবিষ্কার করতে পারে এবং তার

জীবনযাত্রাটির সার্মগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, তবেই বলব সাহিত্য জীবনের মর্মমূলে তার শিকড়কে প্রোথিত করেছে। জীবনের উপরিতলে নয়, জীবনের গভীরতর সত্যসন্ধানে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। জীবনের এই আত্মিক স্বরূপের উদ্‌ঘাটনই হবে নবযুগের সাহিত্যের লক্ষ্য। এইখানেই আমরা দেখছি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—"Art for Art's sake, certainly—art as a perfect form and discovery of Beauty, but also Art for the Soul's sake, the Spirit's sake and the expression of all that the Soul, the Spirit, wants to seize through the medium of beauty' ৫

আধুনিক কালের ব্যক্তি-আত্মার যাত্রাপথের তাৎপর্য আবিষ্কার করতে এলেই সাহিত্যিকের চোখে ধরা পড়বে আমাদের সভ্যতার সেই পূর্বকথিত উৎক্রান্তি-লগ্ন (transitional period)। বহির্মুখী সভ্যতায় বিষিয়ে উঠেছে মানুষের আধুনিক আত্মা। তার ব্যর্থতা তাকে করেছে নতুন কোন সভ্যতার সন্ধানী, সেখানে কূটনৈতিক বুদ্ধিজাল নয়, হৃদয়ের সত্য, আত্মার প্রেরণা সমাজজীবনকে গড়বে এবং নিয়ন্ত্রিত করবে। বুদ্ধিবাদী সভ্যতা আজ আপনার বিনষ্টির মুখোমুখি। বোঝা গেছে, বুদ্ধিও মানব চেতনাকে মুক্ত করেনি, বুদ্ধিও একরকমের কূটজালে ব্যক্তির সত্যবোধকে, হৃদয়ের সত্যকে নিষ্পেষিত করছে। বুদ্ধিচালিত সভ্যতা রাজনৈতিক প্রয়াসে পৃথিবীতে পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করতে পারল না, সব রকমের রাজনৈতিক কাঠামোই ব্যর্থ হল। অপূর্ণতা, বিকৃতি, অসুস্থতার মূলটি সে উৎপাটন করতে পারল না। চাই এমন কোন ঊর্ধ্বতর বৃহত্তর আন্তর সত্য, যার আলোকে জীবন নতুন পথ পাবে। আধুনিক ব্যক্তি-আত্মার এই আর্তিকে রূপ দেবে নবযুগের সাহিত্য।

জীবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে কোন ঊর্ধ্বতর (supramental) সত্যকে নামিয়ে আনার যে সাধনা তার একটি পদ্ধতি আছে। তার সাধনা হলো প্রথমত নিরাসক্তির সাধনা। নিরাসক্তি মানে ত্যাগ নয়। অন্তরের এক গভীর প্রশান্তিকে আশ্রয় করে জীবনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকা এবং একটি ঊর্ধ্বতর আলোকের স্পর্শলাভের জন্য ব্যক্তিচেতনাকে উন্মুক্ত রাখা। এই হল সেই সাধনার সংক্ষিপ্ত ধারা।

এরই ফলে ব্যক্তির আত্মা ক্রমে লাভ করবে মুক্তির গভীর প্রশান্তি এবং উপর থেকে নেমে আসা নবচেতনা তাকে দেবে নবজীবনের পথ নির্দেশ। অন্তরের যে সমস্ত বিকৃতি—কাম, লোভ, স্বার্থ, প্রভুত্বস্পৃহা—সমাজজীবনে ক্ষত সৃষ্টি করে রেখেছে, ব্যক্তির হবে তা থেকে মুক্তি এবং নতুন কর্মপ্রেরণা তাকে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করবে। বস্তুত একদিকে ব্যক্তি-আত্মা যখন সমস্ত বিকৃতি থেকে মুক্ত হবে, অন্যদিকে তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে বিশ্বলীলার সুষম ছন্দ, তখনই মানবজীবনে আসবে পূর্ণতা। আমাদের নবযুগের পুরোধার মন্ত্রটিই এই—'Man, too, becomes perfect only when he has found within himself that absolute calm and passivity of the Brahman and sup-

৫। Sri Aurobindo on Art for Art's sake' 'সুন্দরের সীমানা'

ports by it with the same divine tolerance and the same divine bliss a free and inexhaustible activity.'[৬]

সাহিত্য হবে এই নবযুগের পূর্ণ জীবনের শিল্প-রচনা। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা যে জীবনের ভূমিতে, সে জীবনই যখন সর্বময় বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণতার রসে অভিসিঞ্চিত হবে, তখন সাহিত্যও স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রাণমূলে পাবে নতুন রস, সুস্থতর, বৃহত্তর উপাদান। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের ভবিষ্যতের উপরে এই ভাবেই নির্ভরশীল।।

৬। Sri Aurobindo The Life Divine, Vol 1, Chap VI

খ. প্রসঙ্গ : ভাষা

১. উইলিয়াম কেরির সাধুগদ্য : ভাষাতাত্ত্বিক বিচার

একসময় কেউ সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছিলেন— শেক্‌স্‌পীয়র নামে কেউ ছিলেন না। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাতে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের রসগ্রহণে আমাদের অসুবিধা হয়নি। তেমনি উইলিয়াম কেরির নামে প্রচলিত রচনাগুলি সব তাঁর নিজের রচনা কিনা এবিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। সে প্রশ্নের বিচার আমরা ঐতিহাসিকের ওপরে ছেড়ে দিলাম। কেরির নামে প্রচলিত মৌলিক রচনা ও বাইবেলের অনুবাদের ভাষায় যে পার্থক্য আছে তা স্বীকার করে নিলেই আমরা প্রধানত তাঁর নামে প্রচলিত সাধুগদ্যে লিখিত মৌলিক বচনার ভাষিক বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি দিক শুধু এখানে সবিনয়ে নিবেদন করব।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অন্যান্য দিক সম্পর্কে বিদেশী মনীষীরা সবাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করেনি। মাক্‌স্‌ম্যুলর কিংবা গ্যেটে কিংবা রোমাঁ রোলাঁর কথা মনে রেখেও বলা যায় বার্ট্রাণ্ড রাসেল—যিনি নিজেকে খুব যুক্তিবাদী মনে করেন তিনিও—দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কেও বিস্ময়কর নীরবতা পালন করেছেন। অথচ পাশ্চাত্যের ভাববাদী দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য দিক কোনো-কোনো ইউরোপীয় মনীষীর চোখে উপেক্ষিত হলেও ভারতের ভাষা ও ভাষাজিজ্ঞাসার প্রতি অনেক বিশিষ্ট মনীষী আবার বিস্ময়কর শ্রদ্ধা ও বৈজ্ঞানিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী পাণিনির অবদান ব্লুম্‌ফিল্ড্‌ (Bloomfield) থেকে চমস্কী (Chomsky) প্রায় সব প্রধান ভাষাবিজ্ঞানীই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃতের গুরুত্ব স্বীকার করে স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) যেমন বলেছিলেন (১৭৮৬)—

"The Sanscrit language, whatever be its antiquity is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either; yet hearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammer than could possibly have been produced by an accident, so strong, indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source which perhaps no longer exists" [১]

তেমনি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাউন্সিলকে ১৮২২ সালে লিখেছিলেন—

"the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility it yields to none"[২]

বাংলা ভাষার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সমগ্র ভারতীয় ভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিকাশেই তাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান লক্ষ্য করি প্রধানত চারটি দিকে :

এক. অনুবাদ—বাইবেলের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ—'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' ১৮০০ খ্রী., 'নিউ টেষ্টামেন্ট' ('ধর্মপুস্তক') ১৮০১ খ্রী., 'ওল্ড টেষ্টাম্বেন্ট' ('ধর্মপুস্তক') ১৮০১ খ্রী., 'গস্‌পেল অব্ ম্যাথু' ১৮২৪ খ্রী., 'গস্‌পেল অব্ মার্ক' ১৮২৪ খ্রী.।

দুই. মৌলিক রচনা—'কথোপকথন' (Dialogues) ১৮০১ খ্রী., 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রী.।

তিন. ব্যাকরণ রচনা—ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণ ('A Grammer of the Bengalee Language') ১৮০১ খ্রী.।

চার. অভিধান রচনা—বাংলা-ইংরেজি অভিধান (A Dictionary of the Bengalee Language) ১৮১৫-১৬ খ্রী.।

কেরির বাইবেল অনুবাদের দ্বারা বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলা ভাষার প্রাঙ্গণ প্রসারিত হয়েছিল। উত্তর কালে বাঙালি ক্রমশ উদার ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বমানবতার দিকে যে এগিয়ে গিয়েছিল তার বলিষ্ঠ সূত্রপাত হয়েছিল কেরির এইসব অনুবাদের মাধ্যমেই। বাংলা ভাষার ভাব-চেতনার বিস্তার প্রথম ঘটেছিল এসব অনুবাদের ফলে কম নয়। তবে শুধু ভাষাগত উৎকর্ষ বিচার করলে একথা মানতেই হয় যে, বাইবেলের অনুবাদের ভাষায় খুবই আড়ষ্টতা ছিল, বিশেষত অনুবাদে বাংলা বাক্যগঠনে ইংরেজি বাক্-রীতির (syntax) যে প্রভাব ছিল তা আধুনিক গদ্যরসিককে যথেষ্ট পীড়া দেয়। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছন্দতা লাভ করতে পারেনি। কেরির বাইবেল অনুবাদের ভাষায় এইসব ত্রুটির কথা মনে রেখেই অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনাবলীর আপেক্ষিক মূল্যায়ন করেছিলেন: "কেরী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়েছেন বাইবেল অনুবাদের জন্য ততটা নয়, যতটা বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের প্রধান সহায়ক রূপে।" আর অধ্যাপক সুকুমার সেন যে "প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও কেরিকে সুশৃঙ্খল বাংলা গদ্যের পথিকৃৎরূপে অভিহিত" করতে চেয়েছিলেন, সেটাও তাঁর মৌলিক রচনাগুলির গদ্যভাষার জন্যেই।

কেরির মৌলিক রচনায় এই যে সাধু বাংলা গদ্যের কাঠামো (structure of Bengali prose) গড়ে উঠেছিল, ভাষার তিনটি স্তরে (levels) তার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই এখানে উল্লেখ করব। ভাষার তিনটি প্রধান স্তর হল—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও বানানগত (phonological and orthographic), রূপতাত্ত্বিক (morphological) এবং বাক্য-গঠনগত (syntactic)। এ ছাড়া ভাষার আর -একটি স্তর আছে যা অনেকের মতে প্রান্তিক ভাষাবিজ্ঞানের (peripheral linguistics) এলাকায় পড়ে। সেটা হল শৈলীগত স্তর যাকে নিয়ে একালে গড়ে উঠেছে শৈলীবিজ্ঞান (stylistics)। কিন্তু ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল রচনাভঙ্গি—যা শৈলীর মূল পরিচয়—ফুটে উঠেছে কেরির রচনায় ততটা নয় যতটা মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায়।

এইজন্যে কেরির রচনাশৈলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যাচ্ছি না, তবু ভাষার পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান স্তরে তাঁর শৈলীগত দু-একটি স্বল্প-স্ফুট বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ কবে যাব। এ পর্যন্ত কেরির মৌলিক রচনা পাঠ ও বিশ্লেষণ করে যা দেখেছি তাতে এটুকু অসংকোচে বলতে পারি যে, ভাষাব তিনটি প্রধান স্তরেই বাংলা সাধু গদ্যের মূল কাঠামো তাঁর রচনাতে ফুটে উঠেছিল। পরবর্তী কালের বাংলা সাধুগদ্যের দুই প্রধান শিল্পী বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাংলা গদ্যের যে বানান, যে রূপতাত্ত্বিক গঠন এবং বাক্যের যে গঠন ও পদান্বয় পাই তার মূল ছাঁদটি কেরির রচনাতেই প্রথম পরিস্ফুট হতে দেখি।

আমরা প্রায়ই বলি—বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের রচনায়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বাংলা গদ্যের জন্মদাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ নন, কেরিও নন। বাংলা গদ্য আগেও ছিল। চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে ছিল। কিন্তু আমি তার কথাও বলছি না। এসবেরও আগে বাংলা গদ্য ছিল বাঙালির মুখে মুখে। সেইখানেই ভাষার আসল অবস্থান। জনসাধারণের মুখে যে মৌখিক ভাষা সেটাই তো জীবন্ত ভাষা, সেই কথ্য ভাষাই তো ভাষার আসল রূপ, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আসল উপজীব্য। আর আজকে যে 'সাব্-অল্টার্ন স্টাডি'র ওপরে আমাদের নজর পড়েছে, সমাজের যে স্তরের দিকে গ্রামশি (Antonio Gramsci) আমাদের চোখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন, তাতে জনসাধারণের মুখের ভাষাতেই খুঁজতে হবে ভাষার অন্তর্নিহিত মূল কাঠামো। সুতবাং বাংলা গদ্যেব মূল জন্ম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তিবিশেষেব দান নয়। লোক-সাধারণেব মুখের ভাষা, বাংলা গদ্যের মূলে যে কাঠামো অন্তর্নিহিত ছিল তার ওপরে ভিত্তি কবেই বাংলা সাধু গদ্যের পরিচ্ছন্ন পরিকল্পিত রূপটি গড়ে তুলেছিলেন কেবি, অথব' আরো সঠিক ভাবে বলা যায় তাকে লিখিত রূপে সাধুগদ্যে তুলে এনেছিলেন অন্তর্নিহিত কাঠামো রূপে। এই সাধুগদ্যের রূপ পাই তাঁর 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে। তাঁর আর একটি রচনা 'কথোপকথন' সাধু গদ্যে রচিত নয়, কিন্তু এতে সর্বজনীন আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali = S C B) রূপও পাই না। এটি ছিল অনেকটা গ্রাম্য ও আঞ্চলিক অপরিশীলিত কথ্য বাংলার নমুনা সংকলন। সাব-অল্টার্ন স্টাডির পক্ষে সে-ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে কেরির সাধুগদ্যই আলোচ্য।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের রচনায় আমরা শিল্পের শেষ সিদ্ধি আশা করতে পারি না। কেরির গদ্য রচনাতেও অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে গেছে। তবে তাঁর গদ্য ভাষার গুণগত উৎকর্ষ ও দোষত্রুটি দুটি দিকই ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুরূপভাবে বিশ্লেষণ করা বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়, এসব দিক থেকে ভাষার বিভিন্ন স্তরে যেসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে তাব মধ্যে দু-একটি মাত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

উইলিয়াম কেরি একেবারে প্রথম যুগের গদ্যকার। তখনো বাংলা সাধু গদ্যের রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেযুগে কেরির একটি অবিস্মরণীয় অবদান হল সাধুগদ্যে প্রাঞ্জল রচনারীতি। কেরির রচনা থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করছি। এতে বোঝা যাবে

সাধু গদ্যেই তিনি সে যুগের পক্ষে কীরকম প্রাঞ্জল, গতিশীল ও মসৃণ রচনারীতির নিদর্শন রেখে গেছেন :

"কাশ্মীর দেশে বিষ্ণুপদ নামে এক ব্রাহ্মণ—তাহার চারি পুত্র। ঐ চারি জন সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। আর চারি ভাইয়ের বড়ই প্রীতি। এক দিবস ঐ চারিজন নির্জন স্থানে থাকিয়া বিচার করিলেন যে, আমরা অনেক শাস্ত্র পড়িয়া বিদ্যা করিলাম, কিন্তু মৃত জীব যাহাতে প্রাণ পায়, এমত শিক্ষা করিব।' ইহা মনে করিয়া চারিজন দেশান্তরে চলিলেন।"

মনে হয়, বাইবেল-বিদ কেরি বাইবেলের parable গুলি থেকে এই প্রাঞ্জল গদ্যের আদর্শ লাভ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের রচনায় বাংলা সাধুগদ্যের যে মার্জিত রূপ দেখতে পাই সেই মার্জিত রূপের পূর্ণ বিকাশ কেরির রচনায় সর্বক্ষেত্রে আশা করা যায় না, কিন্তু তার আংশিক পূর্বসূচনা কেরির হাতেই হয়েছিল। ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও বানানগত, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যগঠনগত সব ক্ষেত্রেই এর নিদর্শন দেখতে পাই।

বিশেষ করে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও বানানগত দিকে সাধুগদ্যের প্রচলিত রীতির এমন পূর্ণ-বিকশিত পরিণত রূপ কেরির রচনায় পাই যে, সেটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। সবটাই যেন আদর্শ সাধুগদ্যের রূপ! বরং এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে প্রচলিত আদর্শ সাধুগদ্যের যে রূপটি পাই, তার সঙ্গে তুলনায় তাঁর গদ্যরূপে যে দু-একটি ব্যতিক্রম দেখা যায় তারই একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায়—উইলিয়াম কেরি সাধারণত তৎসম শব্দে সংস্কৃত বানানই রক্ষা করেছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা পারেন নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলিত বাংলার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান (phonetic spelling) এসে গেছে। যেমন—

"ব্রাহ্মণ সেইরূপ করিয়া প্রথমতো গৃহে গিয়া দেখিলেন....।"

এখানে সংস্কৃত নিয়মে সন্ধি করেন নি। সন্ধি না করলে তো বানান হওয়া উচিত ছিল 'প্রথমতঃ'। কিন্তু আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali = S C B) উচ্চারণ অনুসরণে কেরি বানান লিখেছেন 'প্রথমতো'।

আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। রেফ-যুক্ত বর্ণের দ্বিত্বসাধন অপেক্ষাকৃত পুরোনো প্রথা, যদিও বিকল্পে দ্বিত্ববর্জনের বিধানও সংস্কৃতে ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের পরে আধুনিককালে এই দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে। কেরি বাংলা গদ্যের একেবারে আদিযুগের লেখক হওয়া সত্ত্বেও এই দ্বিত্ব অনেক ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। যেমন—'সর্বশাস্ত্রবেত্তা'।

কেরির পরে একসময় সাধুগদ্য ও চলিত গদ্য প্রায় সমান্তরালভাবে চলেছিল। এসময়ের ভাষিক পরিস্থিতিকে সমাজভাষাবিজ্ঞানে (socio-linguistics) দ্বিবাচন (diglossia) বলা হয়। এই দুই সমান্তরাল গদ্যরীতির মধ্যে যেটাকে আমরা সাধুগদ্য বলি তার দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথমত এর শব্দভাণ্ডার তৎসম (সংস্কৃত) শব্দবহুল আর দ্বিতীয়ত এর রূপতাত্ত্বিক গঠন মধ্যযুগীয় বাংলা থেকে গৃহীত :

"With its forms belonging to Middle Bengali, and its vocabulary highly Sanskritised, it could only be compared to a 'Modern English' with a Chaucerian grammar and a super -Johnsonian vocabulary, if such a thing could be conceived."[৩]

উইলিয়াম কেরি বাংলা সাধুগদ্যের এই গঠন-প্রকৃতি আজ থেকে বহুকাল পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। বাংলা সাধুগদ্যের শব্দভাণ্ডার মূলত তৎসম (সংস্কৃত) শব্দভাণ্ডার হবে একথা কেরিরও দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। কেরি তাঁর "A Dictionary of Bengalee Language" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন:

"The Bengalee language is almost entirely derived from Sangskrita considerable, more than three-fourth of the words are pure Sangskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little corrupt, that their origin may be traced without difficulty."

বাংলা শব্দভাণ্ডারের এই রূপটি তিনি অনুধাবন করলেও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা দক্ষতার পরিচয় দেননি। কোনো-কোনো শব্দ উইলিয়াম কেরি এমন পদবন্ধে (Phrase structure) ব্যবহার করেছেন যে পদবন্ধ বাংলায় স্বাভাবিক রীতিসম্মত নয়। যেমন:

"তাঁহার সভাতে এক রাক্ষসী আসিয়া সমস্যা দেয়।"

অথবা-

"রাজা কাতর হইয়া আপন রাজ্যে ঘোষণা দিলেন।"

বাংলা শব্দের পদ-পরিচয় সম্পর্কে কেরির জ্ঞান সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল ছিল না। কোথাও-কোথাও বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে তাকে বিশেষ্যরূপেই ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"হিংস্র জন্তুসকল আমার মাংস ভোজন করিলে মনুষ্য-মাংসের স্বাদু জানিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য মনুষ্যসকলকে খাইবেক।"

বলা বাহুল্য এখানে শুদ্ধ প্রয়োগ হবে 'মনুষ্য-মাংসের স্বাদ' অথবা মনুষ্য মাংস স্বাদু।

কেরি শব্দপ্রয়োগে সর্বক্ষেত্রে সংগতিও রক্ষা করতে পারেন নি যেমন "তাঁহার সভাতে শ্রুতিধর নামা সর্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকে।" আবার "সেই পণ্ডিত আপন বাটী হইতে সুরঙ্গ দেশে সুশর্মা নাম ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইলেন।" লক্ষণীয় যে, কোথাও 'নামা', কোথাও 'নাম' শব্দ তিনি অসংকোচে ব্যবহার করেছেন।

বাংলায় মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিনটি স্তরভেদ আছে—সম্মানসূচক (honoriorific) সাধারণ (general) এবং তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা জ্ঞাপক (intimate) যথাক্রমে 'আপনি' 'তুমি', 'তুই'। আমরা একই ব্যক্তি সম্পর্কে সচরাচর একই স্তরের সর্বনাম ব্যবহার করি কিন্তু এই সঙ্গতি তিনি কখনো-কখনো ভঙ্গ করেছেন। যেমন : 'হে মহারাজ, আমি অনেক কাল পর্যন্ত তোমার নিকটে আছি; কিন্তু আপনি আমার বিদ্যা বিবেচনা করিয়া কিছু ধনাদি দিলেন না।"

এখানে প্রথম বাক্যে 'তোমার' স্থলে 'আপনার' হওয়া উচিত ছিল।

সাধু বাংলায় 'ইহা' সর্বনামটি সাধারণত প্রথম পুরুষের অপ্রাণীবাচক সর্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কেরি এই সর্বনামটি প্রাণীবাচক অর্থেও ব্যবহার করেছেন। যেমন:

"এ ব্যক্তি সাধুপুর-নিবাসী; ইহা হইতে সাধুপুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারি।"

কেরির হাতে বাংলা সাধু গদ্যের রূপতাত্ত্বিক গঠন (Morphological Structure) মোটামুটি আদর্শ রূপ লাভ করেছিল। তবু দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ও ত্রুটি লক্ষ্য করাই যায়। কেরির সময় সাধু বাংলা গদ্যের কারক-বিভক্তিগুলি পুরোপুরি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি। বাংলায় সপ্তমীবিভক্তির একাধিক চিহ্ন আছে। যেমন—এ, তে। কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট। কোনো-কোনোটি প্রতিযোগী অবস্থানেও (Complementary Distribution) থাকে। কেরির সময় এগুলির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হয় নি। ফলে কোন্‌টির অবস্থান (Distribution) কী, তা কেরি তখনো ভালো করে স্থির করতে পারেন নি। যেমন:

"তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে।".

এখানে 'তথাতে' স্থলে 'তথায়' হলে বাংলায় স্বাভাবিক হত।

গৌণকর্মে একবচনে -'রে' বিভক্তিটি বাংলায় সাধারণত কবিতাতেই চলে। কিন্তু কেরি '-রে' বিভক্তিটি গদ্যেই ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর অনুসরণে এই বিভক্তি সে যুগে আরো কেউ-কেউ গদ্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন—কেরীর প্রয়োগ:

"সমুদ্র প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণেরে এক দিব্য চক্ষু দিয়া কহিলেন....."

বাংলা কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তি '-রা' ব্যবহৃত হয়েছে মধ্য যুগে প্রথমে সর্বনাম শব্দে, পরে বিশেষ্যে। তার আগে সংস্কৃতের কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তির বদলে বাংলায় বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হত সমষ্টিবাচক শব্দ 'সভা' 'সকল' ইত্যাদি যোগ করে। এমন-কি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'গুলা' 'গুলি'ও এসেছে সমষ্টিবাচক শব্দ 'কুল' থেকে, যদিও এ মত ড. সুকুমার সেন সমর্থন করেন নি।[৪] সে যাই হোক, আধুনিক যুগের গদ্যকার উইলিয়াম কেরি যদিও কিছু-কিছু বহুবচনের বিভক্তি ব্যবহার করেছেন, তবু সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করে বহুবচনের অর্থ প্রকাশের পুরাতন পদ্ধতিও অনুসরণ করেছেন কোনো-কোনো ক্ষেত্রে, তা পূর্বে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তেই দেখা গেছে। যেমন— 'হিংস্র জন্তুসকল' ইত্যাদি।

ক্রিয়ার অতীত কালের ও ভবিষ্যৎকালের প্রথম পুরুষের রূপের সঙ্গে pleonastic suffix. '-ক'-এর ব্যবহার উইলিয়াম কেরির রচনায় বহু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যেমন—

৪। "গোলক", 'গোলিকা' (অর্থ—গোটা, আস্ত) শব্দজাত 'গুলা', 'গুলি' উত্তরপদ অথবা প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করিলে নির্দেশক বহুবচনের (Definitive Piural) অর্থ প্রকাশ করে। আসলে এ পদগুলি সমাহার (Collective) শব্দ, সুতরাং ব্যাকরণের দৃষ্টিতে একবচন। এ প্রয়োগ মিলিতেছে ষোড়শ শতাব্দ হইতে। যেমন 'চৈতন্যভাগবতে—"সেইগুলা আইল কিবা আমারে ভাণ্ডিয়া", "বামনগুলা", "নগরিয়াগুলা"। সংস্কৃত 'কুল' শব্দে সঙ্গে 'গুলা', 'গুলি' প্রত্যয়ের কোন সম্পর্ক নাই, তবে নির্দেশক 'গোটা, গোটি (গুটি)' শব্দের সঙ্গে আছে। যেমন ম-বা বাঁশীগুটি (= বাঁশীটি)। মধ্য-বাঙ্গালায় সংখ্যাবাচক শব্দে 'গোটা, -গুটি, (> -টা, -টি) প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন, "সাত গুটি বিন্ধ" (= সাতটা বিধ), দুগুটি বেগুআ" (-দুটি বিড়া), "সাত গোটা বাণ"। তুলনীয় "শঙ্খ দুগুলি" (= দুগাছি শাঁখা)"—

"রাক্ষসী সে রাজ্য ত্যাগ করিলেক।" "সে কহিলেক"। আরো দৃষ্টান্ত: 'করিবেক' 'খাইবেক' ইত্যাদি। এই প্রয়োগ বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরবর্তী লেখকদের রচনায় ব্যাপকভ্রবে পাওয়া যায়। আবার কেরি কোনো-কোনো ক্রিয়ার এমন রূপ ব্যবহার করেছেন যা পরবর্তীকালের সাধু গদ্যেও বহু প্রচলিত হয় নি। যেমন—"পণ্ডিত আপন দেশে আইলেন।" 'আইলেন'-এর বদলে 'আসিলেন' রূপটিই বেশি প্রচলিত।

বাংলা বাক্যে শব্দবিন্যাস-ক্রম (word order) প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। সংশ্লেষণমূলক ভাষা (synthetic language) প্রাচীন ভারতীয় আর্য—বৈদিক ও সংস্কৃতে—সমস্ত কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল বলে "বাক্যের পদবিন্যাসে নির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্যকতা"র কথা উল্লেখ করেছেন ড. সেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথাগতভাবে বৈদিকে পদবিন্যাসের একটি ক্রম মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বেদ-ভাষা বিশেষজ্ঞ এই ক্রম সম্পর্কে বলেছেন–

The general rule is that the subject begins the sentence and the verb ends it, the remaining members coming between. The verb occasionally moves to the beginning of the sentence when it is strongly emphasized... As regards the cases, the accusative is placed immediately before the verb "[৫] ক্রমে ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের ধারায় যতই বিভিন্ন কারকের বিভক্তিগুলি লোপ পেতে থাকে ততই বাক্যে পদক্রমের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দাঁড়িয়ে যায়। ক্রমে বাংলা ভাষার মূল বাক্যে (Kernel sentence) স্বাভাবিক পদক্রম দাঁড়িয়ে যায়:

কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া

Subject+object+verb=SOV

বাংলার এই SOV ক্রমের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় ইংরেজির মূল স্বাভাবিক ক্রমের সঙ্গে তুলনা করলে:

আমি + বই + পড়ি = SVO

I + read + books = SOV

উইলিয়াম কেরির সাধুগদ্যে এই মূলক্রমই অনুসৃত হয়েছে। এই ক্রম অবশ্য তিনি সৃষ্টি করেন নি, বাংলার জীবন্ত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন। কেরির রচনা থেকে দুটি উদাহরণ দিই:

কর্তা + গৌণকর্ম + ক্রিয়া

"তিনি রাজাকে কহিলেন।"

কর্তা + গৌণকর্ম + মুখ্যকর্ম + ক্রিয়া:

"আমি তাহাকে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিব।"

দেখা যাচ্ছে, ভাষার বিভিন্ন স্তরে উইলিয়াম কেরি সাধু গদ্যের মূল রূপটি রচনা করে দিয়েছিলেন। এর ওপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যিক লেখকবৃন্দ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল শৈলীসুন্দর গদ্য (Stylistic prose) রচনার বিচিত্র সৌধ নির্মাণ করেন।

২. বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-ভাবনা

ফরাসী Renaissance (রনেসাঁস্) কথাটির মূল অর্থ 'নবজন্ম' বা 'পুনর্জাগরণ'। এই অর্থে ফরাসী মনীষী জ্যুল্ মিশ্‌লে (Jules Michelet) প্রথম ব্যবহার করেন 'renattre' (রন্যেত্র্) শব্দটি। এ শব্দটিরও আভিধানিক অর্থ প্রায় একই। কিন্তু মিশ্‌লে্ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন অনেক ব্যাপক অর্থে। তাঁর দেওয়া সেই ব্যাপক তাৎপর্য হলো 'Discovery of the world and man' (মানুষকে আবিষ্কার করা, বিশ্বরহস্য সন্ধান করা)। এই ধারণার ওপরেই Renaissance কথাটির মূল তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত। পরে ইতালীতে যখন নবজাগরণের সূত্রপাত হলো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, তখন এই মূল ধারণার সঙ্গে আরো কতকগুলি ধারণা যুক্ত হলো নবজাগরণের বিশেষ মন্ত্ররূপে—যুক্তিবাদ (rationalism), মানবতাবাদ (humanism), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism)ইত্যাদি। এর সঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাও বলিষ্ঠ ছিলো—প্রাচীন বিদ্যার পুনর্জাগরণ (Revival of Classical Learning)। অবশ্যই প্রাচীন বিদ্যাকে নবযুগে গ্রহণ করা হয়েছিলো যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে।

পাশ্চাত্যের নবজাগরণে প্রাচীন বিদ্যার এই পুনর্জাগরণের মূলে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কাজ করেছিলো। সেই ঘটনাটি হলো ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা পূর্ব রোমের রাজধানী কন্সতান্‌তিনোপ্‌ল্ (Constantinople) আক্রমণ। এর আগেই রোমানরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদি পীঠস্থান গ্রীস আক্রমণ করায় গ্রীসের কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-মনীষীরা রোমের সেই রাজধানীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তুর্কীরা সেই রাজধানী আক্রমণ করায় গ্রীস ও রোমের সারস্বত-সমাজ ইউরোপে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ইতালীতে ইতিমধ্যেই যে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিলো, তাকে স্পর্শ করলো গ্রীক-রোমান সারস্বত সমৃদ্ধি। নতুনেরা প্রাচীনকে যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে বরণ করে নিলেন ঐতিহ্যের ধারাকে। পাশ্চাত্যে নবজাগরণের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে এমনি করে যুক্ত হলো প্রাচীন বিদ্যার পুনর্জাগরণ।

আমাদের দেশেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণ হলো, তার মূলে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে প্রাচীন বিদ্যার পুনর্জাগরণও (Revival of Classical Learning) ছিলো। তবে ইতালীর নবজাগরণে গ্রীক-লাতিন সাহিত্য-সংস্কৃতির স্পর্শ যেমন বাইরে থেকে এসেছিলো, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা তেমন বাইরে থেকে আসেনি। শুধু তার পুনর্জাগরণের পদ্ধতি ছিলো পাশ্চাত্য। সেটা হলো যুক্তির মানদণ্ডে পুনর্মূল্যায়ন। এখানে বরং বিদেশী ধর্ম-দর্শনের ব্যাপক প্রসারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর (encounter) জন্যেই সংস্কৃত-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শনের পুনর্জাগরণ ঘটানো হয়েছিলো। খ্রীস্টধর্মের একেশ্বরবাদের সামনা-সামনি পূর্ণ আত্মসম্মানের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যেই নবজাগরণের দীক্ষাগুরু রামমোহন উপনিষদ-বেদান্তের একেশ্বরবাদকে তুলে ধরেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান দুটি

ধারা— মনন-সাহিত্য ও সৃজনমূলক সাহিত্য, যা রূপায়িত হয়েছে যথাক্রমে দর্শনে ও সরস সাহিত্যে (কাব্য-নাটক ইত্যাদিতে)। রামমোহন যেমন মনন-সাহিত্যের (দর্শনের) মূল ধারাটিকে যুক্তির মানদণ্ডে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তেমনি সৃজনমূলক সরস সাহিত্যের (সংস্কৃত কাব্য -নাটকাদির) সমৃদ্ধ ধারাটিকে তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে জীবন্ত নবরূপ দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মোটামুটি ইতিহাস বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা করেছিলেন; তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'-এ (১৮৫৩)। এইখানে তিনি অগ্রণী। তাঁর এই অগ্রণী ভূমিকার কিঞ্চিৎ পরিচয়ই এখানে আমাদের বিবেচ্য। পাশ্চাত্য মনীষীরা বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক ইতিহাস লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে Arthur A.Macdonell (A History of Sanskrit Literature), A Berriedale Keith (A History of Sanskrit Literature, এবং The Sanskrit Drama), M. Winternitz (A History of Indian Literature) এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে Dr. Surendranath Dasgupta ও Dr. Sushil Kumar De (History of Sanskrit Literature)-এর কথা বিশেষভাবে মনে আসে। তাঁদের রচনা বিদ্যাসাগরের রচনার চেয়ে অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ও ইতিহাস-নির্ভর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাথমিক ইতিহাস হিসাবে বিদ্যাসাগরের রচনাটির অগ্রণী ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এমনকি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকের রচনার চেয়েও বিদ্যাসাগরের রচনাটি পূর্ববর্তী।

বিদ্যাসাগরের রচনাটি অতি সংক্ষিপ্ত হবার কারণ হলো এটি গ্রন্থাকারে রচিত হয়নি, এটি বীটন সোসাইটিতে পাঠের জন্যে একটি বক্তৃতার আকারে লিখিত হয়েছিলো। বিদ্যাসাগর এই রচনার 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন:

"এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুইশত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।" (-১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩)।

বিদ্যাসাগর তাঁর রচনাটির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিজেই অবহিত ছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন:

"আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক কোনও ক্রমেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র হইয়াছে, তদ্‌গ্রন্থেরও প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ গুণ বিচার করা হয় নাই। তদ্ভিন্ন, কত শত গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হয় নাই।....."

আসলে এক ঘণ্টার বক্তৃতায় সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রত্যাশিত হতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থের অগ্রণী পথিকৃতের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আচার্য সুকুমার সেন এই গ্রন্থটিকে আরো মর্যাদা দিয়ে বলেছেন—এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সারা ভারতেই অগ্রণী:

"সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক ছোট পুস্তিকাটি ভারতবর্ষে সাহিত্য-ইতিহাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহা আদর্শ করিয়াই রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) রচনা করিয়াছিলেন।"[১]

মনে হয় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরে ঋষি রাজনারায়ণ বসুও রচনা করেছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮)। সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর যে পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেই পথে বাংলা সাহিত্যকে অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু এবং আরো পরবর্তীকালে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক সুকুমার সেন, অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ গবেষকবৃন্দ। এই ধারায় একক প্রচেষ্টায় সমাপ্য অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুল তথ্যপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' প্রায় অতিমানবীয় সারস্বত সাধনার সাক্ষ্যবাহী এবং ইংরেজীতে বহু ব্যক্তির রচনা সম্বলিত Cambridge History of English Literature এবং Literary History of England-এর মতো চিরায়ত সম্পদ। এসব সাহিত্য-সম্পদের কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারি কী সুমহান সম্ভাবনাপূর্ণ পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর ঐ ছোট বইটিতে।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো নবজাগরণের যুগের অন্যান্য মনীষীদের মতোই আধুনিক। সংস্কৃত ভাষার উৎস সম্পর্কে অনেক রক্ষণশীল ভারতীয় পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আর্য জাতির আদি বাসস্থান ছিল ভারতবর্ষেই, এখান থেকেই আর্য জাতির বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ভারতীয় উৎস থেকেই সংস্কৃত ভাষার জন্ম। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই রক্ষণশীল মত সমর্থন করেননি। এইখানেই তাঁর সংস্কারমুক্ত আধুনিকতা। তবে ভারতের বাইরে আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত আছে। বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল ভারতীয় পণ্ডিতদের মত উল্লেখ করলেও পাশ্চাত্যের তৎকালীন ভাষাতত্ত্ববিদদের (Philologists) গবেষণা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদদের মতই ব্যাখ্যা করেছেন:

"ভারতবর্ষীয়রা আদিকালাবধি ঐ দেবভাষায় (সংস্কৃত ভাষায়) কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন; তদনুসারে, সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যানুশীলন-নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃতভাষী লোকেরা, পৃথিবীর অন্য কোনও প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভরতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদিগের গবেষণা দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে, অতি পূর্বকালে, ইরানের আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জার্মানি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা ইরানে অবস্থানকালে এক জাতি ও এক ভাষাভাষী ছিলেন। ঐ এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; এবং ঐ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক,

১। সেন, ডঃ সুকুমার. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, ১৪০৩, পৃ. ৩৬-৩৭।

ইটালিতে লাটিন, জার্মানিতে জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।...এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষমাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই"।[২]

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) স্বর্ণযুগ গিয়েছিলো, তাতেও য়াকপ্ গ্রীম্ (Jacob Grimm; 'Über das Conjugations-system der Sanskritsprache in vergleichung mit jenem der Griechischen, Lateinischen, Persischen und Germanischen Sprache,' এবং Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Lituanischen, Gotischen und Denutschen), আউগুস্ট্ শ্লাইশার (August Schleicher: 'Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen sprachen') কার্ল ব্রুগ্‌মান্ (Karl Brugmann: 'Grundriss der vergleschenden Grammatik der indogermanischen Sprachen') প্রমুখ মনীষীদের মধ্যে কেউ বিদ্যাসাগরের আগে, কেউ পরে, অনেকটা এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন যে, একটি মূল ভাষাবংশ থেকেই সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হয়েছিলো। বিদ্যাসাগর এঁদের মধ্যে কারো-কারো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং এই জন্যই লিখেছেন: "এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষমাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই।" এই আদিভাষাবংশের কোনো নাম বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেননি; জার্মান পণ্ডিতেরা একে ইন্দো-জার্মানিক (Indo-Germanic) বংশ বলতেন, পরবর্তীকালে এর নাম দেওয়া হয় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ, চাইল্ড্ (V.Gordon Childe) এরই নাম 'আর্য' ভাষাবংশ দিতে চেয়েছেন।[৩] এক ভাষা-বংশ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ইউরোপীয় মনীষীদের সঙ্গে একমত হলেও এই মূল ভাষাভাষী জাতির আদি বাসস্থান বিষয়ে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ একমত হতে পারেননি। মনীষী শ্র্যাডারের (Schräder)মত অনুসারে এই মূল ভাষাভাষী জাতির আদি বাসস্থান ছিলো রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে। আমরা আজকাল মানি এই আদি বাসস্থান থেকে সেই মূল জাতির বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরই একটি শাখা হলো ইন্দো-ইরানীয় শাখা এবং সেই শাখার একটি উপশাখা হলো ভারতীয় আর্য যা থেকে সংস্কৃতের জন্ম। সুতরাং বিদ্যাসাগর যখন বলেন ইরান ছিলো মূল বাসস্থান এবং সেখান থেকে সংস্কৃতভাষার আগমন, তখন আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো—বিদ্যাসাগর সত্যের অনেক কাছাকাছি এসে পৌঁচেছেন।

জার্মান মনীষীদের অনেকেরই রচনা বিদ্যাসাগরের রচনাটির পরে প্রকাশিত হয়েছে, তাদের ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে আরো পরে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই, জার্মান মনীষীদেরও আগে, সংস্কৃতকে নিয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বীজ উপ্ত হয়েছিলো বাংলার মাটিতেই-কলকাতার বুকে। প্রাচ্য-বিদ্যার একজন অগ্রণী পুরুষ স্যার উইলিয়াম্ জোন্‌স্ (রয়্যাল) এশিয়াটিক সোসাইটির একটি বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন (১৭৮৬):

২। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২, পৃ. ১০১-১০২।

৩। Childe, V.Gordon: 'The Aryan', London, 1926 (Preface)

"The Sanscrit language.......is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philoloser could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source...."[৪]

জোনসের এই বক্তৃতাটি ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় স্তম্ভ (land mark) হয়ে আছে। কারণ, যে মূল উৎস (ভাষাবংশ) থেকে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার জন্মের কথা বিদ্যাসাগর বলেছেন, স্পষ্টত তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জোন্‌সের এই বক্তৃতাতেই। এই বক্তৃতা বিদ্যাসাগরের অনেক পূর্ববর্তী হলেও এর বক্তব্য তখনকার সংস্কৃত ও সংস্কৃতির বাতাবরণে অবশ্যই ছিলো এবং বিদ্যাসাগর এর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এটা অনুমান করা যুক্তিহীন হবে না।

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকাটি সংস্কৃত সাহিত্যের সন-তারিখ-যুক্ত অনুপুঙ্খ ধারাবাহিক ইতিহাস নয় ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে এটি একটি প্রাথমিক পথ-প্রদর্শক রচনা, একথা আগে বলেছি। এই রচনাটির অন্য একটি গুরুত্বও আছে—সেটা হলো ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সংস্কৃত ভাষার উৎস নির্ণয়। তার কথাও আমরা আলোচনা করেছি। এছাড়া এ গ্রন্থের আরো একটি গুরুত্ব লক্ষণীয়। সেটা হলো বৈদিক ভাষা থেকে স্বতন্ত্র ঠিক সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা। তাঁর ধারণাটি কী এবং সেটি কেন সঠিক সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের ধারাটি একটু স্মরণ করা দরকার।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি আর্য) ভাষাবংশ থেকে একটি শাখা বেরিয়ে ভারতবর্ষ ও ইরানের দিকে এগিয়ে আসে। এই শাখাটির নাম ইন্দো-ইরানীয় শাখা। এই শাখাটি দুভাগ হয়ে যায়—একটি উপশাখা ইরান-পারস্যে চলে যায়, অন্যটি ভারতবর্ষে আসে। যে উপশাখাটি ইরানে চলে যায় সেই শাখার লোকেরাই নিজেদের 'আর্য' বলে গর্ব করতো (ড. সুকুমার সেন)। সেই জন্যে সঙ্কীর্ণ অর্থে কেউ কেউ শুধু সেই শাখাটিকে আর্য বলে থাকেন। কিন্তু আগেই বলেছি গর্ডন্ চাইল্ড প্রমুখ মনীষীরা মূল ইন্দো-ইউরোপীয ভাষাবংশটিকেই 'আর্য' বলেছেন। এটা 'আর্য' শব্দের ব্যাপক অর্থ, সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরও এই অর্থেই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন যুগে (আ: ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ-৬০০ খ্রীঃ পূঃ) এই ভাষার দুটি রূপ ছিলো—একটি সাহিত্যিক, অন্যটি কথ্য। এর সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন রয়েছে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষত ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে। এই ভাষার সঠিক নাম বৈদিক ভাষা, প্রাচীনেরা বলতেন 'ছান্দস ভাষা'। অন্যদিকে কথ্যভাষাটি লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে আসছিলো। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই পরিবর্তন এত বেশি হয়ে গিয়েছিলো যে, তখন

৪। Vide : 'Asiatic Researches', vol. 1, 1979, Cosmo Publications, New Delhi, pp. 348-49.

থেকে ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় যুগ—মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগ—ধরা হয়। এই মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ ব্যাপক নাম দেওয়া হয় প্রাকৃত ভাষা। এই যে পরিবর্তন হয়ে চলেছিলো, এটা জীবন্ত ভাষার স্বাভাবিক প্রাণের ধর্ম। কিন্তু একে জীবন্ত ভাষার প্রাণের ধর্ম বুঝতে না পেরে, বা একে স্বীকার না করে, বিদগ্ধ আর্য নেতৃবৃন্দ মনে করলেন—এই পরিবর্তন হলো ভাষার বিকৃতি, অশিক্ষিত লোকেদের মুখে ভাষার শৈথিল্য সাধিত হচ্ছে। তখন পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণ রচনা করে ভাষার সংস্কার করতে চাইলেন। নিঃসন্দেহে এই সংস্কার থেকে 'সংস্কৃত' কথাটির উৎপত্তি। কিন্তু বৈয়াকরণেরা ভাষার শুদ্ধিবিধানের জন্যে সংস্কার করতে চাইলেও একথা ঠিক যে, সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষার সংস্কার-করা রূপ নয়। শূরসেন অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ ছিলো শিক্ষিত বিদগ্ধ আর্যদের কেন্দ্রস্থল। এইখানকার বিদগ্ধ মার্জিত অভিজাত ভাষাকে মানদণ্ড করে এবং পাণিনির জন্মভূমি উদীচ্য অঞ্চলের ভাষার কিছু উপাদান নিয়ে বৈয়াকরণেরা যে শুদ্ধ ভষার রূপ বেঁধে দিলেন, সেইটাই সংস্কৃত ভাষা।[৫] এর পেছনেও সংস্কার-স্পৃহা ছিলো। ভাষার বিকৃতি রোধ করা এবং সংস্কার সাধন করার জন্যেই তাঁরা এই মানদণ্ড রচনা করে দিলেন। এই মানদণ্ডে বাঁধা অভিজাত ভাষাই হলো আসল সংস্কৃত ভাষা। এটা পাণিনির (আঃ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) পরবর্তী ভাষা। এ ভাষা ছিলো শূরসেন অঞ্চলের মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের ভাষা। আর এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছিলো সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা—প্রাকৃত ভাষা। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাণিনির পরবর্তী মার্জিত অভিজাত শিক্ষিত ('শিষ্ট') আর্যদের ব্যাকরণবদ্ধ ভাষাই হলো ঠিক সংস্কৃত ভাষা; একে আমরা ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতও (Classical Sanskrit) বলে থাকি। বৈদিক যুগের আর্যভাষা থেকে এভাষা অনেকটা স্বতন্ত্র। ব্যাপক অর্থে অনেকে বৈদিক ভাষাকেও সংস্কৃত ভাষা বলে থাকেন। ব্যাপক অর্থে 'সংস্কৃত ভাষা' কথাটি গ্রহণ করলে সংস্কৃতের দুটি পর্ব বলতে পারি—বৈদিক সংস্কৃত ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, ঠিক যেমন গ্রীক ভাষার দুটি পর্ব—হোমরীয় গ্রীক (Homeric Greek) ও ক্লাসিক্যাল গ্রীক (Classical Greek)। কিন্তু সঠিক ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতকেই সংস্কৃত ভাষা বলে থাকি এবং বিদ্যাসাগরও এই অর্থেই 'সংস্কৃত ভাষা' কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর পুস্তিকাটিতে শুধু ঐ ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যেরই বিবৃতি দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাবনা তাই আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-সম্মত ও বৈজ্ঞানিক।

৫। "It (Classical Sanskrit is a literary language basad on the speech of the educated men (sista) of midland (Madhyadeśa) At the same time it contains features which really belonged to the dialect of North-west (Udichya), the language of Panini, the codifier of classical Sanskrit" -Sen Dr Sukumar 'History and Pre-History of Sanskrit' (University of Mysore Exth. Lecture, 1957, p 15)

৩. পদ্মানদীর মাঝি : ভাষা ও শৈলীবিচার

উপন্যাসের ভাষা বিশ্লেষণের দু'টি উপযোগিতার কথা উল্লেখ করে সাগরপারের একজন সমালোচক বলেছেন :

'The study of the language used by an author serves two purposes. It can lead the way to a better understanding of the author's meaning and a fuller appreciation of his literary skill, and it can provide material for the study of the history of the language. The two approaches to a literary work are closely interwined and one helps the other.'[১]

কারণ উপন্যাসে আমরা দু'রকমের ভাষা পাই। এক, লেখকের বিবৃতিতে (narration) লেখকের ভাষা; আর দুই, পাত্রপাত্রীর সংলাপে তাদের মুখের ভাষা। সমালোচক এই দ্বিবিধ ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য-রেখা টানতে বলেছেন, সেই পার্থক্য বাংলা উপন্যাসে সুস্পষ্ট হতে থাকে শরৎচন্দ্র থেকে। লেখকের বিবৃতির ভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভাষায় পার্থক্য উপলব্ধি করে এ দু'টিকে পৃথক করেছেন শরৎচন্দ্রই। শরৎচন্দ্রই প্রথম লক্ষণীয় ভাবে নিজের বিবৃতিতে সাধুভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিতভাষা ব্যবহার করেন। এই রীতিই পরে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রধান রচনায় অনুসরণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের আগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং অংশত রবীন্দ্রনাথ লেখকের বিবৃতি ও পাত্রপাত্রীর সংলাপ উভয়ক্ষেত্রেই সাধুগদ্য ব্যবহার করেছিলেন। দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। আবার আধুনিক লেখকেরা উভয় ক্ষেত্রেই চলিতগদ্যের ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক লেখকেরা লেখকের বিবৃতি ও পাত্রপাত্রীর সংলাপ উভয় ক্ষেত্রেই চলিতগদ্যের ব্যবহার করলেও উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য যে নেই তা নয়। কারণ লেখক যতই চলিত গদ্যের ব্যবহার করুন না কেন লেখকের বিবৃতির ভাষাটি তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের বাহক, সুতরাং এখানেই তাঁর নিজস্ব স্টাইলের (style) পরিচয় বেশী ধরা পড়ে। কিন্তু পাত্রপাত্রীর সংলাপকে স্বাভাবিক (natural) করার জন্যে তার ভাষা লেখক সমাজ থেকে যথাযথ তুলে এনে বসিয়ে দেন। তার ফলে তাতে সমাজের জীবন্ত ভাষারই প্রতিফলন বেশী। এই সূত্রে সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিক উপভাষা (regional dialect) ও শ্রেণীগত উপভাষা (class-dialect) ব্যবহার করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংলাপের ভাষাকে আরো জীবন্ত ও natural করেছেন।

তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে লেখকের বিবৃতির ভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভাষার মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্য কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে না। কারণ আঞ্চলিক জীবনচিত্র বর্ণনায় লেখকের ভাষাতেও আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করে সেই জীবনচিত্রকে জীবন্ত করার চেষ্টা দেখা যায়, সেখানে স্টাইলের নিয়ন্ত্রক লেখক-ব্যক্তিত্ব

১। Brock, G.L 'The Language of Dickens,' London, Andre Deutsch Ltd, 105 Great Russel St, London W.C.I, 1970, p 13

(subject) নয়, লেখকের আলোচ্য বিষয়বস্তু (object)ও। এক্ষেত্রে বলা উচিত দুইএর রাসায়নিক মিলনেই সার্থক স্টাইল গড়ে ওঠে।

আবার পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভাষাও যে সবসময় পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিতে রচিত, তা নয়। পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসে বিশেষ মুহূর্ত-রচনা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিকল্পনা (design) অনুসারে স্রষ্টার কল্পনার ছাঁচে ঢেলে-গড়া (recast) জিনিস, তা লেখকের শিল্পদৃষ্টি ও মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর চরিত্রের সংলাপ যেহেতু লেখক-প্রতিভার সৃষ্টি, চরিত্রের প্রকাশ এবং সংলাপের পটভূমি লেখকের শৈল্পিক পরিকল্পনার অঙ্গ, সেহেতু চরিত্রের সংলাপের ভাষাতেও লেখকের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে। উপন্যাসের বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তের সংলাপগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—এ ভাষা পাত্রপাত্রীর স্বাভাবিক যথাযথ (objective) ভাষা নয়, এই ভাষারীতিও লেখকের তুলিকাস্পর্শ রয়েছে। এবং সেখানেই লেখকের সূক্ষ্ম শিল্পের পরিচয়।

আগেই বলেছি বিবৃতি ও বর্ণনায় (narration and description) সাধুভাষা এবং পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিতভাষা ব্যবহার করেছেন শরৎচন্দ্র। ভাষারীতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রধান রচনায় মোটামুটিভাবে শরৎচন্দ্রের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। অথচ লক্ষণীয় এই যে, ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় ও চলিতভাষার পক্ষে তাঁর ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার অনেক পরে 'পদ্মানদীর মাঝি' ১৯৩৪ সালে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলনের প্রায় ২০ বছর পরেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চলিতভাষার আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। অথচ একই সময়ে (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লেখকের বিবৃতিতেও (narration) চলিতভাষা ব্যবহার করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রমথ চৌধুরীর চলিত-ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে পুরোপুরি সচেতনভাবেই তিনি ক্রমে সাধুভাষার ব্যবহার ছেড়ে চলিতভাষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই আন্দোলনের সেরকম কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। প্রমথ চৌধুরী যখন চলিতভাষা-আন্দোলন করেন, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স মাত্র ৬ বছর। আর তিনি যখন লেখা শুরু করেন তখন এই আন্দোলন স্তিমিত। ভাষা ব্যবহারের যেটুকু স্বাভাবিকতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দেখা যায়— যেমন আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার— সেটুকু তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে স্বাভাবিক যোগসূত্রেই এসেছে, কোনো সচেতন আন্দোলনের ফলে আসেনি। তাঁর ভাষা শিল্পে ও রচনাশৈলীতে স্বাভাবিকতা এসেছে আপনা থেকেই। কিন্তু বিদগ্ধ লেখকের সতর্ক ভাষা-সাধনা—যা প্রমথ চৌধুরী বা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায়—তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে ছিল না। সাধুভাষা বর্জনে অতি সতর্ক হওয়ার ফলে প্রমথ চৌধুরী সাধুভাষা ও চলিত ভাষাকে দুই পৃথক watertight compartment করে তুলেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন করতে পারেন নি। ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই রচনায় লেখকের বিবৃতিতে

সাধুভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিতভাষা ব্যবহার করেছেন। আবার সাধুভাষায় লেখকের যে বিবৃতি তাতেও স্বচ্ছন্দে তিনি চলিতভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন—তার (তাহার), দুটি (দুইটি), তারই (তাহারই), তারা (তাহারা), তাদেরও (তাহাদেরও), বিক্রি (বিক্রয়), তাকে (তাহাকে), মাঝে (মধ্যে), যারা (যাহারা), কারো (কাহারো) ইত্যাদি।

কখনো-কখনো এসব শব্দেরও সাধু ও চলিতরূপ একই বাক্যে ব্যবহার করেছেন: 'শরীরটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল।' (পদ্মানদীর মাঝি, প্রথম অধ্যায়)। 'ধমকের মত করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয় তাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।' (ঐ)।

সাধু ও চলিতের এই মিলন-মিশ্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় স্বচ্ছন্দভাবেই হয়েছে; এত স্বচ্ছন্দভাবে যে এটি ত্রুটি হিসাবে চোখেই পড়ে না। এইটি তাঁর রচনাশৈলীর স্বচ্ছন্দতাবই (ease) পরিচয় দেয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ঘষামাজা ঘুড়ির সুতোর মতো। তা শুকনো ও টান্‌টান্ হয়ে আছে ; তাব ধার ও টান দুই-ই বিপজ্জনক; কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা গুটিয়ে রাখা জালের সূতোর মতো, তা শক্ত কিন্তু শিথিল, ভিজে এবং স্থানে-স্থানে পদ্মার মাটি-মাখা। তার পাকে-পাকে তৎসম শব্দের রেশমের তন্তুর সঙ্গে দেশী-বিদেশী শব্দের কাপাসতন্তু অবাধে মিশে গেছে।

'পদ্মানদীর মাঝি'র সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অথচ ঐ একই রচনায় লেখকের বর্ণনায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্টাইল খুবই অভিজাত (clevated) :

'পদ্মাব ইলিশ মাছ ধরিবার মরসুম চলিয়াছে। দিবাবাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীব বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকাব আলো এগুলি। সমস্ত বাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদী-বক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতেব মত সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেল-স্টেশনে ও জাহাজ-ঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইযা পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা-ভাঙা মেঘে-ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত শাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছেব আঁশ চক্‌চক্ করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়।' (প্রথম অধ্যায়)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিক অবহেলিত অনভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেছেন বলেই সর্বক্ষেত্রে অভিজাত স্টাইল থেকে অকারণ সতর্ক-দূরত্ব বজায় রেখে চলার কোনো জেদ তাঁকে পেয়ে বসেনি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ, আবেগপূর্ণ রচনারীতি, কাব্যধর্মী বর্ণনা যে এই গণশিল্পীর মধ্যেও পাওয়া যায়, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ডিকেন্স্‌ও এমনি অবহেলিত মানুষের জীবনশিল্পী ছিলেন। অথচ তাঁর রচনাতেও এরকম পরিশীলিত মার্জিত অভিজাত কাব্যধর্মী বর্ণনারীতির নিদর্শন রয়েছে :

"Darkness rests upon Tom-all-Alone's Dilating and dilating since the sun went down last night, it has gradually swelled until it fills every void in the place. For a time there was some dungeon lights burning as the lamp of Life burns in Tom-all-Alone's, heavily, heavily in the nauseons air, and winking—as that lamp, too, winks in Tom-all-Alone's—at many horrible things. But they are blotted out. The moon has eyed Tom will a dull cold stare, admitting some puny emulation of herself in his desert region unfit for life and blasted by volcanic fires, but she has passed on and is gone. The blackest nightmare in the infernal stables grazes on Tom-all-Alone's and Tom is fast asleep."[২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত অংশটিতে দেখা যায়, style-এর সমুন্নতি (elevation) সাধনের জন্যে লেখক অসঙ্কোচে অভিজাত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন : দিবারত্রি, শত শত, অনির্বাণ, নদীবক্ষ, নীলাভ ইত্যাদি। আবার একই অনুচ্ছেদে মরসুম, সানাই, ভাঙা-ভাঙা, খোল, চকচক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে স্টাইলের কৃত্রিমতার ব্যবধান দূর করার চেষ্টাও আছে। শুধু তাই নয়, 'ক্ষীণ চাঁদের' সঙ্গে 'টি' যোগ করে একদিকে অন্তরঙ্গতার সুর সঞ্চারিত করা হয়েছে, অন্যদিকে 'চাঁদে'র মাধুর্যটুকু পাঠকের হৃদয়ের কাছে এনে দেওয়া হয়েছে।

আসল কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাশৈলীতে বিষয়ানুগ শব্দ-প্রয়োগ স্বচ্ছন্দভাবে যেন বিষয়ের সঙ্গে আপনা থেকেই এসেছে, এবং বিষয়োপযোগী যখন যে শব্দই এসেছে তাকে তিনি তখন সহজেই গ্রহণ করেছেন। যেমন অনভিজাত দেশী বা গ্রাম্য শব্দের প্রতি কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই, তেমনি তৎসম ও অভিজাত শব্দের প্রতি স্পর্শকাতরতাও নেই :

'ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোন্‌খানে সে যে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।' (প্রথম অধ্যায়)।

এই উদ্ধৃতির তিনটি শব্দের অপরিহার্যতা বিশ্লেষণ করলে তাঁর স্টাইলের উৎকর্ষ বোঝা যাবে। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্যের পূর্ববর্তী বিশেষণ পদকে স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ না দিলেও চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলার এই রীতি অনুসারে 'বিপুলা'র বদলে 'বিপুল'-পদ্মা বললে একাধারে পদ্মার বিস্তৃতি ও মাতৃভাব ব্যঞ্জিত করা যেত না। অথচ পরের বাক্যে তার যে সন্তানগুলির উল্লেখ আছে তাতে পদ্মার উপরে এই মাতৃভাব আরোপ করে পূর্বাহ্নে পাঠক চিত্তকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। দ্বিতীয়ত 'মীনসন্তানগুলি' শব্দে মণিমুক্তোসুলভ ঔজ্জ্বল্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'মীনসন্তানগুলি'-শব্দের যে ধ্বনিসৌন্দর্য তার ব্যঞ্জনাটি অপূর্ব,— যেন ছোট ছোট কটি মণিমুক্তা মুঠায় করে কেউ নাড়াচাড়া করছে। 'মাছের চারা' বা অন্য কোনো শব্দে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি হত না। তেমনি 'মাঝে' শব্দে যে গীতিধর্মী মসৃণতা আছে তা 'মধ্যে' শব্দ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হত। অতলান্ত জলরাশির বিরাট

২। Bleak House, Chapter 46

বিস্তৃতির যে মসৃণ প্রবহমানতা তা 'মধ্যে' শব্দ ব্যবহার করলে নষ্ট হত।

যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগত কর্কশতা (harshness) অনেক সময় কোমল স্নিগ্ধ পরিবেশের অনুকূল নয়। সেখানে তৎসম শব্দকে সরলীকৃত করে তার অর্ধতৎসমরূপ ব্যবহার করে লেখক রচনারীতিতে কোমলতা এনেছেন। পূর্ব আকাশে যখন প্রভাতের প্রথম সূর্যোদয় হয় তখনকার উদীয়মান সূর্যে মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রচণ্ডতা থাকে না। তার প্রথম লাল-আভার মধ্যেও একটা কোমলতা ও স্নিগ্ধতা থাকে। এই মুহূর্তটি বর্ণনা করার সময় লেখক বলেছেন :

'পূবদিকে লাল হইয়া ওঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়ায়।' এখানে 'পূর্বদিকে'র বদলে 'পুবদিকে' শব্দে ব্যবহার লক্ষণীয়। এখানে পরিবেশ স্টাইলকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দকে আভিধানিক অর্থের গণ্ডির বাইরে এনে প্রয়োগ করেছেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যেমন—

'কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে।'

এখানে ক্রিয়াটি ('ধরিতেছিল') অতীত কালের হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়ার কালবাচক বিশেষণটি হল 'আজ'। 'আজ' শব্দটি এখানে 'যেদিনের ঘটনা বলা হচ্ছে সেইদিন' অর্থে প্রযুক্ত। উপরন্তু এই প্রয়োগের ফলে সূক্ষ্ম বোধটি জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ঘটনাটি অতীতকালের হলেও নিকট-অতীত। তারপরের বাক্যে আবার বর্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে— 'নৌকায় আরো দু'জন লোক আছে।' এখানে 'আছে' ক্রিয়াটি প্রয়োগ করে ছবিটি অতীতের কাহিনী থেকে এনে বর্তমানের দৃশ্যপটে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলের মধ্যে শব্দ ব্যবহারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের narrative-রীতিতে অন্তরঙ্গতা সঞ্চারের এইসব কৌশল শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার মনে হয়। আরো একটি দৃষ্টান্ত দিই—'শরীরটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই।' (প্রথম অধ্যায়)

—এখানেও 'ছিল' ক্রিয়াটি অতীতকালের, ঘটনাটিও অতীতের। কিন্তু অতীতের সঙ্গে ব্যবধানটুকু কাটিয়ে তোলার জন্য লেখক 'আজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে ব্যঞ্জনা অনেকখানি বেড়েছে। লেখক যেন সেই ঘটনার অংশীদার, সেই কালে চলে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে গেছেন, যেন কেউ চোখের সামনে যেমনটি দেখছে ঠিক তেমনটি বলে যাচ্ছে। এই অন্তরঙ্গতা অনায়াসসৃষ্ট, স্বচ্ছন্দ, প্রশ্নাতীত।

বাক্যবিন্যাসে পদক্রম (word order) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 'কুবের মাঝি আজ দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে মাছ ধরিতেছিল।'—সাধারণ বিবৃতিমূলক (indicative) বাক্যের এই শব্দক্রম উল্টে দিয়ে তিনি লিখেছেন—'কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে' (প্রথম অধ্যায়)। পদক্রমটুকু এইভাবে পরিবর্তিত করে দেওয়ার ফলে বাক্যের ব্যঞ্জনা অনেক বেড়ে গেল এবং যা লেখা নেই তারও ইঙ্গিত পাওযা গেল। যেমন, কুবের মাঝি

রোজই মাছ ধরে, এক-একদিন এক-এক জায়গায় ধরে, আজ তার মাছ ধরার জায়গা হচ্ছে—দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। এই অধ্যায়েব পরবর্তী অংশ পড়লে দেখা যায় এই মাছ ধবতে গিয়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা ঐ বিশেষ স্থানটি ছাড়া অন্য যে কোনো স্থানেই ঘটতে পারত। সুতরাং ঐ স্থান-নাম-উল্লেখের কোনো তাৎপর্য নেই। বরং যা খোলাখুলি বলা হয়নি, ব্যঞ্জনায় বোঝানো হয়েছে, সেই কথাটিই বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। তা হল—কুবের মাঝি রোজই মাছ ধরে এবং এক-একদিন এক-এক জায়াগায় ধরে অর্থাৎ এইটিই তার উপজীবিকা। এত সব কথার ইঙ্গিত ঐ সামান্য শব্দক্রম পরিবর্তনের ফলে পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে শব্দক্রম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ বাক্যের word-order পরিবর্তিত করে বিশেষ শব্দের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং অনেক অলিখিত কথা ব্যঞ্জিত করা হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝি থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দিই---মাছের বোঝা লইয়া 'যথাসময়ে ওয়াগানগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি।' (প্রথম অধ্যায়)

'বাঙ্গালী আড্ডাবাজ। অফিস করে বাজার করে সোজা বাড়ি ফেরে না। কিন্তু যেদিন ইলিশমাছ কেনা হয় সেদিন একটা বিজয়গর্ব নিয়ে অবিলম্বে বাড়ি ফেরা চাই। তখন আর কোথাও যাওয়া নয়, সোজা বাড়ি। এই ভাবটির ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে 'বাড়ি' শব্দটিকে ক্রিয়ার আগে না বসিয়ে টেনে আনা হয়েছে বাক্যের শেষে।'

আরও একটি বাক্য লক্ষণীয়—'হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই।' (প্রথম অধ্যায়)

এখানেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাধারণ বাক্যের প্রচলিত শব্দবিন্যাসক্রম পরিবর্তিত করা হয়েছে। ক্রিয়া-বিশেষণ 'সঙ্গে সঙ্গেই'-কে ক্রিয়ার আগে সরিয়ে এনে বাক্যের শেষে বসানোর রীতি বাংলায় চলে ক্রিয়া-বিশেষণটির উপরে জোর দেবার জন্য। এখানে সেই রীতিকেও ছাড়িয়ে ক্রিয়া-বিশেষণটিকে মূল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হয়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে বসানো হয়েছে যাতে ঐ ক্রিয়া-বিশেষণের উপরে পাঠকের মনোযোগ স্বতন্ত্রভাবে আকৃষ্ট হয়। এ হল আধুনিক গদ্য শৈলীরই একটি বৈশিষ্ট্য।

কোনো কোনো জায়গায় মনে হতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দবিন্যাসে (word-order) অনবধানতার পরিচয় রয়েছে। যেমন— 'সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়, কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।' (প্রথম অধ্যায়)। এখানে প্রথমত মনে হবে 'সশব্দে' শব্দটির বিন্যাসে সতর্কতার অভাব রয়েছে। এর রৈখিক-বিন্যাস (linear ordering) এরকম হওয়া উচিত ছিল— 'নোঙর তুলিয়া কোনো স্টীমার সশব্দে ছাড়িয়া যায়, কোনো স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।'

দ্বিতীয়ত মনে হবে 'নোঙর তুলিয়া' বাক্যাংশটির রৈখিক-বিন্যাসেও (linear ordering) বিপর্যয় ঘটেছে। এটি হওয়া উচিত ছিল— 'কোন স্টীমার নোঙর তুলিয়া সশব্দে ছাড়িযা যায়, কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।' বাক্যটির hierchical arrangement

বিশ্লেষণ করলে প্রচলিত রীতি থেকে এর ব্যতিক্রম ধরা পড়বে :—

S
NP VP ছাড়িয়া যায়
নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার

এতে 'নোঙর তুলিয়া' NP-এর মধ্যে পড়ে যায়, কিন্তু ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠন (deep structure) বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এটা আসলে NPএর অংশ হতে পারে না। এটা হওযা উচিত :

S
NP
VP
কোন স্টীমার
নোঙর তুলিয়া সশব্দে ছাড়িয়া যায়

সশব্দে ছাড়িয়া যায়

আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র যৌগিক বাক্যটি এইরকম—

S
সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়
কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।

রৈখিক বিন্যাসেও (linear arrangement) এর ত্রুটি ধরা পড়ে ঃ—

সশব্দে নোঙর তুলিয়া—[কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়
কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।

কিন্তু একথা আমরা মনে-মনে নিশ্চয়ই বুঝি যে, স্টীমার ছেড়ে যাবার জন্য নোঙর তোলার দরকার হয়, জেটিতে এসে ভেড়ার জন্য নোঙর তোলার দবকার হয না। বাংলা বাক্যের সাধারণ পদক্রম (word-order) বিবেচনা করলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এটা লেখকের অনবধানতা। কিন্তু প্রচলিত পদক্রম (word-order) পবিবর্তিত কবে 'সশব্দে নোঙর তুলিয়া' বাক্যাংশটি প্রথমে আনার ফলে লঞ্চে প্রথম গতি-সঞ্চারের ভাবটি যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সমগ্র বাক্যের পদক্রম (word-order) ঈষৎ পরিবর্তিত করাতে কর্মব্যস্ততার ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রচলিত গতানুগতিক রীতিতে বাক্যটি রচনা করলে দাঁড়াত— 'কোন স্টীমার নোঙর তুলিয়া সশব্দে ছাড়িয়া যায়, কোন স্টীমার জেটিতে গিয়া ভিড়ে।' কিন্তু এরকম বাক্যে সেই কর্মব্যস্ততার ভাবটি সঞ্চার করা যেত না। অথচ এই ভাবটি প্রকাশ করাই যে লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য তা অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি থেকে বোঝা যায়—'নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।' 'কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।' এ বাক্যেও ক্রিয়াকে ক্রিয়া-বিশেষণের আগে আনায় কর্মের উপরে, কর্মব্যস্ততার উপরে জোর পড়েছে। প্রচলিত পদক্রম (word-order)এর গতানুগতিক নিয়ম থেকে সরে এসে ভাবের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম পার্থক্য ব্যঞ্জিত

করাতেই স্টাইলের পরিচয়। এই সরে আসাই (deviation) এক অর্থে স্টাইলের পরিচয়-চিহ্ন। এতে প্রচলিত রীতিতে বাক্যটি ভুল মনে হতে পারে কিন্তু দেখতে হবে যে, এতে লেখক তাঁর বাঞ্ছিত অর্থটি প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা এবং সেই অর্থ পাঠক গ্রহণ করতে পারছে কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তবে আপাতদৃষ্টিতে তা ভুল প্রয়োগ মনে হলেও বাক্যটিকে নতুন সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। একজন শৈলী-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ হল—"One of the central problems to which the student of linguistics can apply himself is that of the possibility of making statements which have never been made before but which are completely intelligible to speakers of the language in which the statements are made. Any use of language, the moment it comes into existence, is a new creation, a structure of language substance, which can be looked upon as a thing in itself."[৩]

আরো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বাংলার প্রচলিত word-order বিপর্যস্ত হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন— 'কেতুপুরে পদ্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে কুবেরের মোচার খোলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল', (সপ্তম অধ্যায়)। এখানে linear arrangement হওয়া উচিত ছিল এইরকম—'কেতুপুরের পদ্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে মোচার খোলা বলিয়া কুবেরের মনে হইতে লাগিল।'

এখানে বাক্যগঠন নিঃসন্দেহে লেখকের ভাষা-শৈথিল্যের পরিচয় দেয়। প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনলে বাক্যটির অস্পষ্টতা (ambiguity) ধরা পড়ে। কিন্তু এরকমের বিপর্যয় ইচ্ছাকৃত নয়, এবং এতে স্টাইলের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। অবশ্য এবংবিধ শৈথিল্য বাংলা-বাক্যরীতিতে সচরাচর অনুমোদিত বলে ধরা হয়। এরকম গঠনগত অস্পষ্টতা (structural ambiguity) সব ভাষাতেই অল্পবিস্তর দেখা যায়। Langacker তাঁর গ্রন্থে ইংরাজী ভাষার এরকমের অস্পষ্টতার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মাত্র একটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি : 'The policeman killed the woman with a gun.'

ল্যাঙ্গাকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই বাক্যটির দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, The policeman killed (the woman with a gun)= বন্দুক-হাতে ভদ্রমহিলাটিকে পুলিশ মেরে ফেলেছে অর্থাৎ যে ভদ্রমহিলাটি বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছিল পুলিশ তাকে মেরে ফেলেছে। দুই, (The policeman killed with a gun) the woman= বন্দুক দিয়ে পুলিশ ভদ্রমহিলাকে মেরে ফেলেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোদ্ধৃত বাক্যেরও দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারত—এক, (কুবেরের মোচার খোলা) বলিয়া মনে হইতে লাগিল; দুই, (মোচার খোলা) বলিয়া কুবেরের মনে হইতে লাগিল। বাক্যাংশটিকে এই দ্ব্যর্থকতা (ambiguity) থেকে রক্ষা করেছে এব প্রসঙ্গ ও পূর্বসূত্র। কুবেরের গল্পটি যে জানে,

বাক্যটি তার কাছে, বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরলে এই দ্ব্যর্থকতার শিকার হয়ে যেতে পারে। এরকমের গঠনগত শৈথিল্য ও দ্ব্যর্থকতা সব ভাষার বাক্যরীতিতে রয়েছে ঠিকই; কিন্তু পদক্রম (word-order) পরিবর্তিত করে সচেতন-শিল্পী যথাসাধ্য এই শৈথিল্য থেকে তাঁর ভাষাকে রক্ষা করেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাক্যটির পদক্রম পরিবর্তিত করলে বাক্যটি অস্পষ্টতা থেকে রক্ষা পেত তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

যেখানে একাধিক কর্তা দ্বারা পৃথক-পৃথক কর্ম সম্পন্ন হচ্ছে অথচ সবগুলি মিলিয়ে একটি সামগ্রিক আবেদন (effect) সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে, সেখানে লেখক ছোট ছোট সরল বাক্য কমা (,) দিয়ে যোগ করে একটি বড় যৌগিক বাক্য রচনা করেছেন :

'পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না' (প্রথম অধ্যায়)

আবার যেখানে কর্তা একই, কার্য অনেক, অথচ কার্যগুলি একই কালে (simultaneously) ঘটে অথবা কার্যকারণসূত্রে যুক্ত সেখানে লেখক সবটা মিলিয়ে একটি সামগ্রিক আবেদন (effect) সৃষ্টি করার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়া পর-পর সাজিয়ে শেষে সমাপিকা ক্রিয়ায় আসল বক্তব্য পেশ করেছেন·

'একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতলজলো বাতাসে শীতবোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে' (প্রথম অধ্যায়)

পৃথিবী নিজের কক্ষপথে ঘোরে, রোজ ঘোরে, এ ঘটনা যেমন গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন, তেমনি বৈচিত্র্যহীন হচ্ছে পদ্মানদীর মাঝির জীবন। এ জীবন বৈচিত্র্যহীন, বিস্বাদ ও অবসন্ন। ক্লান্ত মানুষের টেনে টেনে পা ফেলে চলার মতো মন্থর গতিতে চলে কাটা-কাটা ছোট-ছোট বাক্যে সেই জীবনের বর্ণনা :

'দিন কাটিয়া যায়! জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলে পাড়ার ঘরে-ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না।........জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়। আর দেশী মদে' (প্রথম অধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারীতিতে মাঝে-মাঝে চাপা রসিকতার সুর শোনা যায়। কোনো চরিত্রের অসঙ্গতি দেখে লেখক যেন নিজেই অন্তরালে একটু স্নিগ্ধ স্মিত ব্যঙ্গের হাসি হেসেছেন। যে গণেশ 'একটু বোকা', যার 'মনের ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়' এবং যে 'কোন কথা বলিলে লোকে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে তোলে না এটুকুও সে বুঝিতে পারে না', সেই গণেশ যখন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার গান

ধরে তখন লেখক একটু কৌতুক বোধ করেন :

'কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শুনে। যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। সে বড় সহজ গান নয়।'

এখানে লেখকেব রচনাশৈলীতে কৌতুক উপভোগের পরিচয় আছে, কিন্তু তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ নেই। লেখকের রচনাশৈলী পদ্মা তীরবর্তী ভূপ্রকৃতির মতোই স্নিগ্ধ ও কোমল। কোথাও তাপ বা ধার নেই। যে নিরন্ন অবহেলিত মানবগোষ্ঠীর জীবনবেদনা পরম মমতায় লেখক উপস্থাপিত করেছেন তাদের জীবনের অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করে কোথাও তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করেন নি।

পদ্মানদীর মাঝিতে লেখকের রচনারীতি সেখানকার ভূপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মতোই মমতাব রসে ভিজে, নরম, সরল—ওখানকার মাঝিদের মতোই যেন নাগরিক বৈদগ্ধ্যহীন। এই কারণে তাতে বুদ্ধির দীপ্তি ও ধার নেই, হৃদয়ের সারল্য ও আবেগ আছে। কিন্তু হৃদয়েব উপরে দুঃখের চাপ বাড়তে থাকলে কখনো-কখনো চরম মুহূর্তে নিতান্ত সবল মানুষও যেমন দু' একটি শাণিত উক্তি করে ফেলে সেইবকম লেখক যেন কখনো-কখনো তীক্ষ্ণ উক্তি করে বসেছেন .

'স্থানেব অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবাব ঠাঁই এদের ঐটুকুই' (প্রথম অধ্যায়) -এরকম anti-thesis-এর ব্যবহাব বুদ্ধিদীপ্ত রচনারীতির বৈশিষ্ট্য, এটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাভাবিক রীতি নয। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে চরম জ্বালায় কথাগুলি যেন আপনা থেকেই লেখকের মুখ দিযে বেরিয়ে এসেছে, তা পূর্বাপর বর্ণনা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়- 'পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাকা জায়গার অন্ত নাই, কিন্তু জেলেপাড়াব বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সঙ্কীর্ণতা, উন্মুক্ত উদাব পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায। স্থানের অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদেব ওইটুকুই। সবটুকু সমতলভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসব বাড়িতে পায় না।'-(প্রথম অধ্যায়)

পদ্মানদীর মাঝির ভাষা-ব্যবহারের সর্বজনবিদিত বৈশিষ্ট্য হল, এর সংলাপ অংশে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহাব। এই ভাষা-ব্যবহার তার উপজীব্য আঞ্চলিক জীবনচিত্রের জীবন্ত উপস্থাপনার অপরিহার্য অঙ্গ। উপন্যাসের সামগ্রিক শিল্পরূপটি উপলব্ধির জন্য এই বিশেষ ভাষারূপটির স্বরূপবৈশিষ্ট্য অনুধাবনের উপযোগিতা আছে। এই বৈশিষ্ট্যের কিছু-কিছু দিক বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

উপস্থাপ্য মৎস্যজীবীদের জীবনের রূপটি নানাভাবে বাস্তব করে তুলেছেন লেখক। তাদের বিশেষ জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ-বিশেষ জীবিকা-শব্দ (professional words)

লেখক যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন :

১. 'কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি **ছইয়ে** টাঙাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল!' (প্রথম অধ্যায়)

২. 'ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায় পোঁতা **লগির** সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তার সংখ্যা নাই।' (প্রথম অধ্যায়)

৩. '**মেছো নৌকার** ঘাটটি একপাশে।' (প্রথম অধ্যায়)

৪. 'কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া **চালানবাবু** কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে।' (প্রথম অধ্যায়)

৫. 'কুবের নৌকায় গিয়া **গলুইয়ের** দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।' (প্রথম অধ্যায়) (গলুই= নৌকার দু'দিকের সরু অংশ)

এই মৎস্যজীবীদের ভাষারূপের গ্রাম্যতা লেখক নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার জন্য গ্রাম্য উচ্চারণে ভাষার strong form এর স্থানে weak form-এর ব্যবহার করেছেন লেখক—'**তা'লি** খানিক খাড়াও শেতলবাবু।' (প্রথম অধ্যায়) (তাহা হইলে · তা হলে তা'লে তা'লি)।

পূর্ববাংলার ভাষারীতিতে সেখানকার ভিজে মাটির যে আর্দ্রতা ও মমতা রয়েছে তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ উপস্থাপিত করেছেন। এই মমতা সঞ্চারের যে ভাষারীতিগত পদ্ধতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশী অনুসরণ করেছেন তা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্বোধনাত্মক শব্দ বাক্যের শেষে ব্যবহার।

১. ধনঞ্জয় বলে, সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।' (প্রথম অধ্যায়)

২. 'রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিগাই গো আজান খুড়ো।' (প্রথম অধ্যায়)

৩. 'হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কি জাড় কুবির।' (প্রথম অধ্যায়)

পূর্ববাংলার ভাষায় নামধাতুর ব্যবহার একটু বেশী। এবং নামধাতুর মধ্যে আবার তার তদ্ভব রূপও খুব বেশী প্রচলিত। পদ্মানদীর মাঝিতে এই বিশেষ রীতির বহু দৃষ্টান্ত মেলে :

১.'সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।'

২. 'তা'লি খানিক খাড়াও শেতলবাবু।'

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক জীবনচিত্রটি জীবন্ত করে তোলার জন্য আঞ্চলিক শব্দ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। যেমন :

১. 'কুবের হাঁকিয়া বলে, যদু হেএএএ-মাছ **কিবা**?' (প্রথম অধ্যায়)

২. ধনঞ্জয় বলে, সাঁজের দরটা **জিগা** দেখি কুবের।'

৩. 'হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কি **জাড়** কুবির।'

৪. 'পয়সা নাই ত **দিমু** কি? কাল দিমু, **নিয্যস** দিমু।' (প্রথম অধ্যায়)

পূর্ববাংলার জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামধর্মাবলম্বী। এই অংশটি হিন্দু

ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সঙ্গে মিশে সেখানে যেমন পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে গেছে—তেমনি তাদের মাধ্যমে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় অনায়াসে গৃহীত হয়ে স্বী-কৃত (assimilated) হয়ে গেছে। রাঢ়ী উপভাষার তুলনায় বঙ্গালীতে আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা বেশী। এই শব্দগুলি কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচয়বাহী না হয়ে সেখানকার আঞ্চলিকতারই দ্যোতক হয়ে উঠেছে। এরকমের শব্দ মানিব বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে সেখানকার জনজীবনের এরূপ চিত্রণে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। এবংবিধ শব্দের মধ্যে যেগুলি আদর্শ চলিত ভাষায় চলে না বা যেগুলির প্রচলন কম সেরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করা যায় :

১. 'কুবের হাঁকিয়া বলে, যদু হে এ এ এ—মাছ কিবা? খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে; **জবর**।' (প্রথম অধ্যায়)

২. 'রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিরাই গো **আজান** খুড়া।' (প্রথম অধ্যায়) (আজান—আরবী শব্দ)

৩. 'হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে **সরগরম**। (প্রথম অধ্যায়) (গরম-ফারসী শব্দ)

৪ 'অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া **হরদম** মাছ বেচাকেনা চলিতেছে।' (হরদম—ফারসী)

এছাড়া আছে পূর্ববাংলার বিশেষ পদবন্ধ ও বাগ্‌ভঙ্গির (phrase ও idiom) ব্যবহার :

১. 'তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না।'

২. গান গাওয়া অর্থে 'গীত কওয়া' : 'একখানা গীত কওয়া দেখি কুবির। (প্রথম অধ্যায়)

ব্যক্তিভাষা (idiolect)-এব রূপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝিতে সুস্পষ্ট নেই। কারণ এখানে পদ্মানদীব মাঝিদের জীবনচিত্র সাধারণভাবে উপস্থাপিত। community-র দিকেই লেখকের মন বেশী। ব্যক্তিচরিত্র আছে, সবই শ্রেণীচরিত্র নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-সব ব্যক্তি-চরিত্র আছে তাদের ব্যক্তিসমস্যা থাকলেও তাদের ব্যক্তি-ভাষায় বড় একটা স্বাতন্ত্র্য নেই। সামান্য দু'একটি পার্থক্য দেখা যায়। যেমন 'কুবের'কে ধনঞ্জয় বলে 'কুবের', গণেশ উচ্চারণ করে 'কুবীর'।

পূর্ববাংলার উচ্চারণে এ-কার স্থানে ই-কার এবং ই-কার স্থানে এ-কারের উচ্চারণ একটি বহু-প্রচলিত 'মুক্ত বৈচিত্র্য' (free variation)। যেমন 'শীতল' স্থলে 'শেতল'—'মাছ ত নাই শেতলবাবু।' (প্রথম অধ্যায়)

তুচ্ছার্থক সর্বনাম 'তুই' এর সঙ্গে ক্রিয়ারূপে রাঢ়ী ও বঙ্গালীতে পার্থক্য আছে—রাঢ়ীতে যেখানে 'জানিস' হয়, বঙ্গালীতে সেখানে 'জানস' হয়। যেমন :

'জানস কুবির, আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।' (প্রথম অধ্যায়)

অব্যয় প্রয়োগে বঙ্গালীর কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—'হাঁ' (affirmative)-এর স্থানে বঙ্গালীতে 'হ' উচ্চারিত হয় :—

'হ, গীত না তর মাথা।' (প্রথম অধ্যায়)

নঞর্থক অব্যয় (negative particle) রাঢ়ীতে যেখানে 'নেই' হয়, বঙ্গালীতে সেখানে 'নাই' হয় ঃ-'মাছ ত নাই শেতলবাবু।' (১ম অধ্যায়) চতুর্থী বিভক্তি অর্থে 'লাগিয়া' ক্রিয়া-অনুসর্গটি আদর্শ বাংলা ভাষায় (Standard Bengali) কেবল কবিতাতেই চলে। কিন্তু বঙ্গালী উপভাষায় 'লাগিয়া'র অপিনিহিত রূপটি সাধারণ কথ্যভাষায় বহুপ্রচলিত ঃ 'জিবানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি।' অধিকরণ অর্থে সপ্তমী বিভক্তিতে ত প্রয়োগ বঙ্গালীতে প্রচলিত—'বাড়ীত গিয়া সারাডা দিন জিরাইস।' (প্রথম অধ্যায়)

সপ্তমী বিভক্তি রূপে ত-এর ব্যবহার আদি বাংলারই উত্তরাধিকার—

'ডোম্বিত আগলি নহি চ্ছিনালী' (অপাদানের অর্থে সপ্তমীর তির্যক প্রয়োগ)—চর্যাপদ।

ভাববাচক বিশেষ্যের রূপে রাঢ়ী-বঙ্গালীর মধ্যে পার্থক্য আছে। রাঢ়ীতে যেখানে 'দেওয়া' হয়, বঙ্গালীতে সেখানে 'দেওন'-এর প্রয়োগ হয়। তেমনি 'কওয়া'র স্থলে 'কওন'-এর প্রয়োগ দেখা যায়—'মিছা কওনের মানুষ তুমি না।' (প্রথম অধ্যায়) পূর্ববাংলার উপভাষায় কিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় এবং কিছু সাধুভাষার ক্রিয়া-বিশেষণ এখনো ব্যবহৃত হয়—

'অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না।' (প্রথম অধ্যায়)

বলা অর্থে কওয়া ক্রিয়ার প্রয়োগ বঙ্গালীতে বহু-প্রচলিত :

১. 'জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি।' (প্রথম অধ্যায়)

২. 'তারপর কাছে গিয়া বলিল,—কী কন?' (প্রথম অধ্যায়)

'লওয়া' ক্রিয়া থেকে আদর্শ চলিত বাংলায় (SBC) হয়েছে 'নেওয়া'।

কিন্তু বঙ্গালী উপভাষায় 'লওয়া'ই থেকে গেছে : মাছ লইয়া আয়।' (প্রথম অধ্যায়)

'আছে' স্থানে পূর্ববাংলার ভাষায় 'রইছে' হয়—'আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না?' (প্রথম অধ্যায়)

'রওয়া' ক্রিয়াটি 'থাকা' অর্থে ব্যবহৃত, আবার কোথাও 'অপেক্ষা করা' অর্থেও ব্যবহৃত ঃ

'রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না।' (প্রথম অধ্যায়)

সর্বনামেও রাঢ়ী-বঙ্গালীর পার্থক্যের কিছু নিদর্শন এই উপন্যাস থেকে দেওয়া যায়—

রাঢ়ী	বঙ্গালী	
তোর	তর	(১ম অধ্যায়)
আমার	মোর (ঐ)	
আমাকে	আমারে (রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর?' (ঐ)	

সংখ্যা-শব্দ ব্যবহারে গ্রাম্য গণনারীতির নিদর্শনও আছে—'ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, 'হ, চাইরশ' না হাজার! দুইশ সাত পঞ্চাশ খান মাছ।'

পদ্মানদীর মাঝির সংলাপের ভাষায় সেখানকার উচ্চারণের যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাতে আঞ্চলিক জীবনচিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এইসব ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যেরও কিছু নিদর্শন দেওয়া যাক—

শব্দের আদিতে 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ বঙ্গালীর একটি অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. **'হালার** (< শালার) মাছ ধইরা জুত নাই।' (প্রথম অধ্যায়)

২. 'অস্ফুট স্বরে কুবের বলিল, **হালা** ডাকাইত।' (প্রথম অধ্যায়)

দুই স্বরের মধ্যবর্তী মহাপ্রাণধ্বনির হ-কারে পরিণত হবার এই প্রবণতা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাতেই সূচিত হয়েছিল—সুখ সুহ।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম শব্দ ব্যবহারে সঙ্গতি রাখতে পারেন নি। একই চরিত্রের মুখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়েছেন। বঙ্গালী উপভাষা যে রাঢ়ীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত মধুর তার একটা কারণ হলো অল্পপ্রাণীভবন (deaspiration) বঙ্গালীতে একটু বেশী :

১. **সাঁজের** দরটা জিগা দেখি কুবের। (সাঁজ সাঁঝ < সন্ঝা < সন্ধ্যা)

২ 'আজান খুড়া **সিদা** মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না' (সিদা < সিধা < সিদ্ধ)

এই মাধুর্যের আর একটা কারণ ঘোষীভবন (voicing) :

১. 'বাড়িত গিয়া **সারাডা** দিন জিরাইস।' (প্রথম অধ্যায়)

২. 'মাছ লইয়া আয়। **তিনডা** আনিল।' (প্রথম অধ্যায়)

অপিনিহিতি ও স্বরধ্বনির বিপর্যাস--বঙ্গালীর এই দুই বৈশিষ্ট্যের বহুল নিদর্শন রয়েছে এই উপন্যাসে :

১. **'কাইল চাইরে** নামব'। (প্রথম অধ্যায়)

২. 'হালার মাছ **ধইরা** জুত নাই' (প্রথম অধ্যায়)

৩. 'জানস কুবির, **আইজকার** জাড়ে **কাঁইপা** মরলাম।' (প্রথম অধ্যায়)।

৪. 'বড় **দেইখা** আনিস।' (প্রথম অধ্যায়)

ওকার স্থানে অ-কার উচ্চারণের দৃষ্টান্তও মেলে—

১. 'তোর' স্থানে 'তর'—

'গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখানা গীত ক দেখি কুবির। হ, গীত না তর মাথা।' (প্রথম অধ্যায়)

'না' স্থানে 'নি' উচ্চারণ :

'মাছ **নি** কাল বেশী বেশী পড়ছিল।' (প্রথম অধ্যায়)

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আঞ্চলিক উপভাষা ও লোকভাষা ব্যবহারের মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তই উপরে দেওয়া গেল। এই আঞ্চলিক ভাষা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক জীবনচিত্র রচনার অপরিহার্য শৈল্পিক উপকরণরূপেই বিবেচ্য। তবু এ ছাড়াও উপন্যাসের ভাষা-বিশ্লেষণের আরো যে একটি উপযোগিতার কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, সেদিক থেকেও এই উপন্যাসের ভাষারূপের গুরুত্ব যে কি অপরিসীম তা উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যাবে।

৪. সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক

সব দেশের প্রায় সব ভাষাতেই মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে অল্পাধিক পার্থক্য থাকেই। সাহিত্যের ভাষা আর দৈনন্দিন ব্যবহারের মুখের ভাষা সর্বদা পুরোপুরি এক হতে পারে না। ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের অগ্রণী কবি ওয়র্ড্স্ওয়ার্থ্ একসময়ে বলেছিলেন—কবিতা লিখতে হবে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়; অথচ তিনি নিজেই এই নিয়ম সর্বদা মেনে চলতে পারেন নি! কাব্যের ভাব যখন অভিজাত ,কল্পনা যখন উন্নত, অনুভূতি যখন গভীর ও অনন্যসাধারণ, তখন তাকে প্রাকৃত জনের দৈনন্দিন জীবনের অমার্জিত মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন সেই ভাবের বাহন ভাষাকে হতে হয় তেমনি পরিশীলিত মার্জিত অলঙ্কৃত। কেবল কাব্যের ভাব বা বিষয় যখন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ভাব বা ঘটনা হয় তখন ভাষা সাধারণ মুখের ভাষাই হবে। এই সূত্রে আঞ্চলিক লোকভাষাও গৃহীত হতে পারে। সুতরাং সাহিত্যের ভাষা বনাম মুখের ভাষা--এই বিতর্কটির এই সনাধান প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।

কিন্তু বাংলা ভাষায় এই বিতর্কটি ছাড়া আরো এক রকমের বিতর্ক আছে। সেই বিতর্কটি আবার উঠেছে। সেটা হলো সাহিত্যের ভাষারই দুটি রীতির দ্বন্দ্ব—সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা। এই বিতর্কের স্বরূপটা বুঝতে হলে সাধু ও চলিতভাষার উৎস, ইতিহাস, স্বরূপ ও গঠনরীতির পার্থক্যটা আগে একটু স্মরণ করে নেওয়া দরকার। তার আগে বলে রাখি—এই দুটি স্বতন্ত্র ভাষা নয়, একই ভাষার দুটি রীতি। এ দুটিকে তাই সাধুরীতি ও চলিতরীতিও বলা যায়। এ কথা বিশেষজ্ঞদের জানা যে, ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাংলার পাঠ্যপুস্তক, ধর্ম ও আইনগ্রন্থ রচনার জন্যে প্রয়োজন অনুভব করলেন তখন তাঁদের সামনে বাংলা গদ্যের কোন পূর্ব-ঐতিহ্য বা আদর্শ ছিলো না। তখন তাঁরা বাংলা গদ্যের জন্ম দিলেন—সাধারণত একথা বলা হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কারণ বাঙালীর মুখে তো বাংলা গদ্য প্রচলিত ছিলোই। বাঙালী পদ্যে তার দৈনন্দিন কথাবার্তা চালাতো না, গদ্যেই চালাতো। এই যে লোকমুখে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিলো, সমস্যা দেখা দিলো সেই গদ্যে পাঠ্যপুস্তক বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ লেখা যাবে কিনা। বোধহয় তখনকার লেখকেরা মনে করেছিলেন মৌখিক গদ্য লঘু, খেলো, অমার্জিত, তাই সাহিত্য রচনার অনুপযুক্ত। তখন তাঁরা এক নতুন গদ্যরীতি প্রবর্তন করলেন যার শব্দভাণ্ডার মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া এবং শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপ-অনুসর্গ-সর্বনাম ইত্যাদি প্রধানত মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ভাষা থেকে নেওয়া। এই ভাষারীতির গঠন ব্যাখ্যা করে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— "Prose is written for the first time seriously, but for fifty years the literary language is under the tyranny of Sanskrit. Out of the large number of forms, dialectal, and archaic, which prevailed in Middle Bengali, specially in the verb, documentary and epistalary Bengali of the three centuries 1500-1800 was evolving a standard language for prose,.......

Literary Bengali of prose, during the greater part of the 19th century, was thus a doubly artificial language; and with its forms belonging to Middle Bengali, and its vocabulary highly Sanskritised, it could only be compared to a 'Modern English' with a chaucerian grammer and a super-Johnsonian vocabulary, if such a thing could be conceived."[১]

এই যে সাধু গদ্যের কাঠামোটি যাঁরা তৈরী করে দিলেন, সেই ফোর্ট উইলিয়ামের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামরাম বসু অবশ্য আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছিলেন বেশি। এই গদ্যরীতিটাকেই আমরা বলি সাধুগদ্যরীতি বা সাধুভাষা।

অন্যদিকে চলিতভাষা হলো মুখের ভাষা। কিন্তু এখন আমরা যাকে চলিতভাষা বলছি, তারও একটু স্বাতন্ত্র্য ও একটু ইতিহাস আছে। সেটা ঠিক দৈনন্দিন ব্যবহারের মুখের ভাষা নয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষার কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বহু কাল থেকেই কথ্যভাষাকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান আঞ্চলিক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলিকে আমরা বলেছি বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা (Regional dialect)। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে—রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। এগুলির মধ্যে পূর্বী রাঢ়ীর অন্তর্গত—মূলত মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা—বিশেষ করে কলকাতার উপভাষা-ইতিহাসের ধারায় ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে। কারণ ব্রিটিশ আমল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণে কলকাতা হয়ে উঠেছিলো বাংলার প্রাণকেন্দ্র। তাই প্রথমে মূলত কলকাতার উপভাষার ওপরে ভিত্তি করেই একটি সর্ববঙ্গীয় কথ্য বাংলা গড়ে উঠেছিলো। এই ভাষার সমর্থনেই স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন:

"যদি বল ও-কথা বেশ; বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে; সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।"[২]

কিন্তু কলকাতা ক্রমে বহু জাতিক বহুভাষিক নগরী হয়ে ওঠায় এখানকার বাংলার ওপরে অন্য ভাষার প্রভাব পড়তে থাকে এবং এখানকার বনেদী বাংলা ক্রমশ তার শুদ্ধতা হারাতে থাকে। তাই আদর্শ চলিত বাংলার রূপটি খুঁজতে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চলে গিয়েছিলেন কলকাতার সঙ্গে নদীয়ার ভিত্তিভূমিতে:

"The speech of the upper classes in the western part of the Delta and eastern Radha gave the literary language of Bengali, and now the educated colloquial of this tract, especially of the cities of Nadia and Calcutta, has become the standard one for Bengali, having come to the position of which educated Southern English now occupies in great Britain and Ireland."[৩]

তাঁর আগে অবশ্য জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁর ভাষা জরিপে আদর্শ চলিত বাংলার ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন হুগলীর উপভাষায়:

" the purest and most admired Bengali is spoken in the area marked as Central and. perhaps, that spoken in the District of Hooghly, near the river of the same name is the shade with which it is considered the most desirable to be familiar"[৪]

নদীয়াই হোক বা হুগলীই হোক, আসল কথা হচ্ছে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্তী গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই হলো আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali=SCB) মূল ভিত্তি। যখন চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস দেখা দিলো, তখন খানিকটা স্বাভাবিকভাবে আপনা থেকেই এবং খানিকটা পরিকল্পিতভাবে সাহিত্যিক আন্দোলনের মাধ্যমে চলিতভাষা সাহিত্যে যতই ব্যবহৃত হতে থাকে, ততই তা মার্জিত হতে থাকে এবং সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী প্রায় সর্ববঙ্গীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ক্রমে আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে এই ভাষাই সার্বজনীন আদর্শ বা মান্যরূপ লাভ করে। এই ভাষারীতি প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়। একেই আমরা বলি আদর্শ বা মান্য চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali=SCB)। একেই এখানে আমরা সংক্ষেপে বলছি চলিত বাংলা। বাংলায় একসময় বেশ কিছুদিন সাধুভাষা ও চলিতভাষা (বা সাধুরীতি ও চলিতরীতি) পাশাপাশি চলেছিলো। বাংলার এই ভাষিক পরিস্থিতিকে কেউ কেউ দ্বি-বাচন (বা Diglossia) বলেছেন। সাহিত্যের ভাষার এরকম পাশাপাশি দুটি রীতির প্রচলন বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় আছে বলে জানা নেই। একমাত্র তামিলে [illegible] ভাষার (Standard Language) দুটি রূপ আছে বলে ভাষাবিজ্ঞানী তারাপুরওয়ালা উল্লেখ করেছেন।[৫] একটি আমাদের সাধুভাষার সঙ্গে তুলনীয়, অন্যটি আদর্শ চলিতভাষা। বাংলা সাহিত্যে সাধু ভাষারীতি ও চলিত রীতির বিবর্তনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই সাধু রীতি ক্রমশ সহজ হয়ে এসেছে এবং চলিত রীতি ক্রমশ মার্জিত হয়ে এসেছে এবং রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন সাধু ও চলিত রীতির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমে এসেছে। "বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে,— একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন [illegible] আসিতেছে।"[৬] *এই দুটি ভাষা রীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এখন রয়েছে শুধু ক্রিয়াব রূপে, সর্বনামে আর অনুসর্গে। শরৎচন্দ্রের সাধুভাষা বরং অনেক বেশি সহজ সরল প্রাঞ্জল, আর প্রমথ চৌধুরীর* চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম, বিদগ্ধ ও অভিজাত।

৪। Grierson, George Abraham 'Linguistic Survey of India,' Vol V, part I, Delhi, 1968, *p 18*

৫। "*The modern dialects (of Tamil) are fairly uniform but there are two forms of the standard dialect One is the "perfect'(when) form used in poetry and is somewhat* stilted and artificial, the other is the so-calles 'vulgar' (kudum) form which is colloquial"--Taraporewala, I J S 'Elements of the Science of Language", C.U. 1962, p 223

৬। *জীবনস্মৃতি (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১৭ খণ্ড, ১৩৬১, পৃ. ২৭৮*

এক সময় বিতর্ক উঠেছিলো সাহিত্যে চলিতভাষা ব্যবহৃত হবে না সাধুভাষা? আজ সেই বিতর্কের প্রায় অবসান হয়েছে। নতুন করে সেই বিতর্ক আবার তোলা অর্থহীন। আজকে যে বিতর্কটা দেখা দিয়েছে, সেটা অনেক সীমিত ক্ষেত্রে। আজকের বিতর্ক সূচিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র করে। শোনা যাচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নাকি নির্দেশ দিয়েছেন :

১। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের গদ্যাংশে শুধু চলিত রীতির রচনাই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২। সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাধুভাষায় লেখা গদ্যাংশ চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করা যাবে না, শুধু চলিত ভাষায় লিখিত রচনাই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। পরে অষ্টম শ্রেণীতে গদ্যাংশে বিখ্যাত লেখকদের সাধু ও চলিত উভয় রীতিরই রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগে অনুমান করা যাক এই রকম নির্দেশের পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে।

সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা যদি চলিত ও সাধু রীতিতে লেখা গদ্য পাঠ করে তা হলে পরবর্তী কালে তাদের লেখায় সাধু চলিত গদ্যের মিশ্রণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত সাধু রীতিতে লেখা রচনাগুলি অল্পবয়স্ক কিশোর কিশোরীদের দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি কথা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বিবেচনার জন্যে সবিনয়ে নিবেদন করছি।

সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য গ্রন্থে সাধুরীতিতে লেখা বাদ দিলে তারা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং সর্বোপরি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকী শিশুর কাছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'ও পড়ে শোনানো উচিত হবে না, পড়ে শোনালে পরবর্তীকালে তাদের লেখায় চলিত রীতির সঙ্গে সাধু রীতির মিশ্রণ হতে পারে। শিশুদের কাছে ঠাকুরমার ঝুলি পড়ে শোনানো উচিত হবে না এটা কল্পনাও করতে পারি না আমরা।

দ্বিতীয়ত উপরিউক্ত লেখকদের রচনায় শুধু সাহিত্যরস নেই, যে মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শবোধের অভাবে আজ মানবজাতি ক্রমশ রোবোটে পরিণত হতে চলেছে তার বীজবপন হয় এই শিশু কিশোর বয়সেই। এই সব লেখকের সব রচনাই দুর্বোধ্য নয়, কিছু কিছু সহজ সরল রচনাও আছে যা ষষ্ঠ বা অন্তত সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ্য করা যায় এবং সেগুলি পাঠ্য তালিকায় আনলে কিশোর কিশোরীদের মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শের বীজ উপ্ত হবে।

তা ছাড়া যে কবিতাগুলি পাঠ্য থাকবে, সেগুলিতে সাধুরীতিতে লেখা কিছু কিছু পংক্তি থাকতেই পারে। যদি সাধুরীতির রচনা পড়লেই পড়ুয়াদের লেখায় সাধু চলিতের মিশ্রণ হয়, তবে কবিতাগুলি পাঠে সেই সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

তৃতীয়ত সাধুরীতির রচনা পাঠ করলে পড়ুয়াদের রচনায় দু একটি ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ ঘটতে পারে, সেটা এমন কিছু দোষের নয়। একে তথাকথিত 'গুরুচণ্ডালী' দোষ বলে পড়ুয়াদের সামনে বেত উঁচু করারও দরকার নেই। স্বয়ং বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও দু-একটি ক্ষেত্রে সাধু চলিতের মিশ্রণ ঘটেছে, এমনকী শিশুদের প্রিয় বই 'ঠাকুরমার ঝুলি'তেও এই মিশ্রণ চোখে পড়ে। সকলের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দেবার এখানে অবকাশ

নেই। আপাতত কেবল দুটি রচনা থেকে সাধু চলিতের মিশ্রণের দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে: "বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"—কপালকুণ্ডলা ১/১ (সাধুরীতি: 'কাটিয়া', 'লইয়া', চলিত রীতি: 'খাবে')। "প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, 'আসব্ না? তিনকাল গিয়ে এক কালে *ঠেকেছে*। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?—কপালকুণ্ডলা ১/১। (সাধুরীতি: 'কহিলেন', 'করিব', চলিত রীতি: 'আসব্', 'গিয়ে','*ঠেকেছে*')।

'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে:

"দাদাকে নিয়া গিয়া অজিত নিরাশায় *চোকের* জল মুছায়—'দাদা, আর থা'ক্, আর আমরা মা'র কাছে যা'ব না?—নীলকমল আর লালকমল, (১)। সাধুরীতি গিয়া; চলিত রীতি : 'যা'ব'; ' চোখের' স্থলে ' চোকের' প্রয়োগটি লক্ষণীয় অথচ যুক্তিযুক্ত।

আর বাংলা কবিতায় এই রকম সাধু-চলিতের মিশ্রণ তো প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। বিশেষ করে বাংলা আধুনিক কাব্যের দীক্ষাগুরু জীবনানন্দের কবিতায় তো এরকম মিশ্রণ ঘটেছে ছন্দ ও স্টাইলের অপরিহার্য প্রয়োজনেই। সেখানে সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে আমরা পরিবর্তিত করে দেবার নেবার কথা ভাবতেই পারি না।

দৃষ্টান্ত : (জীবনানন্দ থেকে)

"হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে; আবার তাহারে
কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?" —মহাপৃথিবী 'হায় চিল'।

(সাধু রীতি : 'আহারে', চলিত রীতি : কেঁদো' 'উড়ে-উড়ে', 'তার', 'চলে', গেছে', 'নিয়ে', ডেকে', 'খুঁড়ে', 'জাগাতে'।)

কিংবা—

"বাংলার মুখ আমি *দেখিয়াছি*, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে *জেগে উঠে* ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছায়ার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি......'—'*রূপসী* বাংলা', (বাংলার মুখ আমি *দেখিয়াছি)*।

(সাধু রীতি: 'দেখিয়াছি', 'খুঁজিতে, চলিত রীতি: 'জেগে', 'উঠে', 'চেয়ে', 'বসে')।

কবিতায় সাধু ও চলিতের মিশ্রণ হয় প্রধানত ছন্দের প্রয়োজনে আর স্টাইলের অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু গদ্যে এই মিশ্রণ হয় প্রধানত অনবধানতার জন্যে, অবশ্য কখনো কখনো স্টাইলের অঙ্গ হিসেবেও হতে পারে। প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের গদ্যরচনাতেও অনবধানতার জন্যে যখন এই মিশ্রণ হতে পারে, তখন ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের রচনায় এই মিশ্রণ ঘটলে, তা সংশোধন করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করা উচিত, কিন্তু তার জন্যে মহান সাহিত্যিকদের সাধুরীতিতে লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ সরল গদ্য রচনা পাঠ থেকে

বঞ্চিত করা বোধ হয় ঠিক হবে না। পরে নবম-দশম শ্রেণী থেকে আমাদের এ-ব্যাপারে বেশি সতর্ক হতে হবে। নবম-দশম শ্রেণীতে সাধু ও চলিত গদ্যরীতির পার্থক্য ব্যাকরণের অন্যতম পাঠ্য বিষয় করে দেওয়া উচিত এবং সাধু থেকে চলিত ও চলিত থেকে সাধু রীতিতে রূপান্তর পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আবশ্যিক রাখা উচিত। কথা উঠতে পারে যে, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও পরবর্তী কালে বাঙালীর লেখায় প্রায়ই সাধু-চলিতের মিশ্রণ দেখা যায়। আমার মনে হয়, এর কারণ এ নয় যে, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি, এর কারণ বোধ হয় আমাদেব সেই দোষ যার জন্যে বাংলায় এম.এ পাশ করা ব্যক্তি পর্যন্ত শিক্ষকতা করতে গিযে ব্ল্যাক বোর্ডে 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দের বানান 'রবিন্দ্রনাথ' লেখেন। এর কারণ আমাদের শিক্ষাদানে আন্তরিকতার অভাব, এবং ছাত্রছাত্রীদের পাঠগ্রহণে লঘুচিত্ততা ও অন্যমনস্কতা।

তবু যদি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে সাধু ও চলিত রীতিতে লেখা গদ্যরচনা আবশ্যিক পাঠ্যতালিকায় রাখলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধু-চলিত মিশ্রণের বীজ উপ্ত হয়ে যাবে এবং তা পরে দুরপনেয় হয়ে যেতে পারে, তবে ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীর জন্যে একটি সমন্বয়ী সূত্র বিশেষজ্ঞদের বিবেচনা করে দেখার জন্য এখানে সবিনয়ে নিবেদন করছি :

যে-রকম দ্বিভাষিক (bi-lingual) অনুবাদ-গ্রন্থে থাকে, সেই রকম পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি বাম দিকের পৃষ্ঠায় সাধুরীতিতে লেখা মূল রচনাটি ছাপা যেতে পারে (তাতে মূলের বানানও অপরিবর্তিতই রাখা উচিত। এমনকী যেখানে মূলে 'ধর্ম্ম', 'কর্ম্ম' 'কার্য্য' প্রভৃতি বানান আছে সেখানে 'ধর্ম', 'কর্ম', 'কার্য' করারও অধিকার আমাদের নেই।) এবং ডানদিকের পৃষ্ঠায় তারই চলিত ভাষায় রূপান্তরটি ছাপা যেতে পারে। শুধু মূল রচনার ওপরেই লেখকের নাম ছাপা থাকবে কিন্তু রূপান্তরিত অংশের ওপরে ছাপা থাকবে শ্রী অমুকের মূল রচনা থেকে শ্রী অমুক কর্তৃক চলিত রীতিতে রূপান্তরিত। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্যে শুধু এই রূপান্তরিত অংশটিই পাঠ্য থাকবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিলে তারা মূল রচনাও পাঠ করে দেখতে পারে। আমার মনে হয় সাধু রীতিতে লিখিত মূল রচনাটি একটু দুর্বোধ্য হলেও ছাত্রছাত্রীদের সামনে তা উন্মুক্ত রাখাই ভালো। তাছাড়া সাহিত্যের সবটা ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিগম্য হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাহিত্যের অনেকটাই অনুভূতিগম্য রস যা বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে অনেকটা যুক্তিবুদ্ধির অজান্তেই আপনা থেকে সঞ্চারিত হয়। খানিকটা অস্পষ্টতা, খানিকটা দুর্বোধ্যতা দুর্বোধ কিশোর বয়সের কল্পনাকে উদ্দীপ্তই করে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে যা লিখেছেন তা একটু দীর্ঘ হলেও এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করি:

"আমার বাল্যকালে..... ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়।... ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম-- যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুইই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার

যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের পর হয় তো আমাদের শিক্ষাচিন্তায় আরো অগ্রগতি হয়েছে, অন্তত 'বিবর-প্রজাপতি' জাতীয় গ্রন্থের ছড়াছড়ি তো হয়েছেই, এখন আর কিশোর-কিশোরীদের পাঠ্য বইয়ের ব্যাপারে এতখানি উদারতা কিছুতেই স্বাস্থ্যকর নয় (যদিও দূরদর্শনে খুন-ধর্ষণের চিত্র তাদের সামনে অবাধে উন্মুক্ত, এখানে আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ক্ষীণ)। কিন্তু যে রচনাটির চলিত ভাষায় রূপান্তর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য করা হচ্ছে, তার মূলটা সাধু রীতিতে নিহিত বলে মূলটাও তাদের সামনে তুলে ধরাই ভালো। অবশ্য তাদের পাঠ্য থাকবে চলিত রীতিতে রূপান্তরিত অংশটিই এবং পরীক্ষায় তাদের চলিত রীতিতেই উত্তর লিখতে হবে। এতে পাশাপাশি উপস্থাপিত সাধু ও চলিত রীতিতে লিখিত অংশ দুটি তাদের চোখের সামনে থাকবে। দু-য়ের তুলনা ও পার্থক্য তাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে না, কিন্তু তারা নিজেরা ইচ্ছা করলে দুই রীতির অল্পস্বল্প তুলনা করবে এবং পার্থক্যটি আপনা থেকেই তাদের চোখে ধরা পড়বে।

প্রশ্ন হতে পারে—সাধু ও চলিত দুই রীতির রচনা পড়লে কিশোব-কিশোরীদের মস্তিষ্কের ওপরে অতিরিক্ত চাপ পড়বে কিনা? কিন্তু দুই রীতি শিখে নেবাব এইটিই বয়স। শুধু দুই রীতি কেন, একাধিক ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতাও অল্প বয়সেই বেশি থাকে, বয়স যত বাড়তে থাকে ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতা ততই কমতে থাকে। এটা আমার নিজের কথা নয়, বিশেষজ্ঞদেরই সিদ্ধান্ত। একজন স্নায়ু-বিজ্ঞানীব লেখা থেকে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি :

"মানুষেব ভাষা শেখার ক্ষমতাও মুদ্রিত স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। ....ছয় বছব বযসের পর ভাষাশিক্ষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা ধীরে ধীরে কমে আসে।..অনেক বাবা-মাকে বলতে শুনি, আজকাল স্কুলে পড়াশুনায় এত চাপ, শিশু দম ফেলার সময় পায় না। অনেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে শিশুকে ভর্তি করতে চান অন্য কোথাও যেখানে পড়াশোনার চাপ কম। এইসব বাবা-মা যে শিশুর কি পরিমাণ ক্ষতি করেন তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। ফলে কাজে লাগে না প্রকৃতির দেওয়া সেইসব স্নায়বিক যোগসূত্রগুলি যারা শিখতে চায় এবং শুধুই শিখতে চায। অজানাকে জানা, নতুনকে শেখার কি উদগ্র ক্ষিদে যে শিশুর থাকে তা অকল্পনীয়। শৈশবে তাই শিশুকে যত বেশি জিনিস শেখানো যায়, যত বেশি ভাষা শেখানো যায়, তত বেশি চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, তত বেশি বিস্তৃত হয় তার মনের দিগন্ত এবং মনের সীমা।"[৮]

যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্কুল-পালানো ছেলে, তাঁব ওপরে বিচিত্র-বিদ্যা পড়ার কোন চাপ ছিলো না, তাঁদের "জীবনস্মৃতি" একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। *

৭। 'জীবনস্মৃতি' (রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১৭ খণ্ড, ১৩৬১, পৃ. ২৭৮)

৮। ভৌমিক, ডাঃ নৃপেন 'ভাষা ও মস্তিষ্ক', ২০০২ পৃ ২ , ২৮।

*এখানে যা লিখেছি তা আমাব ব্যক্তিগত ভাবনা মাত্র। এখানে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি, তা বিশেষজ্ঞদের ভেবে দেখবার জন্যে আমার ব্যক্তিগত প্রস্তাব মাত্র, এটা কারো সমালোচনা নয়।— লেখক।

৫. ভাষা-সমস্যা প্রসঙ্গে

—একং বীজং বহু শক্তিযোগাৎ।"—উপনিষদ।

--বৈচিত্র্যের মূলে এক ও একের প্রকাশ বহুতে, শক্তিসংযোগে ইহাই সাধিত হইতেছে।

"আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তুবিশ্বতঃ।"—ঋগ্বেদ।

—মহত্তর জ্ঞানের উপকরণ আসুক আমাদের কাছে সর্বদিক হইতে।

'শব্দব্রহ্মেতি তাং প্রাহ'—পিতামহেরা বলিয়াছেন, শব্দই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই সৃষ্টির উৎস। অর্থাৎ সৃষ্টির উৎস হইতেই শব্দের জন্ম। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন, নাদ-ব্রহ্মের উপাসনা কর—বাক্‌কে উপাসনা কর--বাচসুপাস্স্বেতি। শব্দব্রহ্মের উপাসনা আমরা নিত্যই করিতেছি—প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে, চায়ের দোকানের আড্ডায় কিংবা পড়ার টেবিলের অধ্যয়ন-তপস্যায়। যাহার নিত্যসেবা করিতেছি তাহার গুরুত্ব অনেকখানি, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পিতামহের মত শব্দকে অতখানি দার্শনিক গুরুত্ব না দিলেও, আজ সভ্যতার এই উচ্চ-শিখরে উঠিয়া জীবনের ছন্দ হইতে তাহাকে যে আর বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না, একথা আমরা সবাই বুঝি। আজই শুধু বুঝি না, শব্দকে সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে চিবকালই বিশেষ গুরুত্ব দিয়া আসিতেছি, এবং গুরুত্বের কারণ যুগে-যুগে বিভিন্ন হইলেও তাহার মূল্য আমাদের নিকট চিরকালই অনেকখানি।

যে শব্দ বা ভাষার গুরুত্ব অনেকখানি, তাহাকে লইয়া আজ এতখানি হাঙ্গামা বাধিয়া যাইবে, তাহাতে আব আশ্চর্যের কি? বিশেষত এই মন্ত্রোপাসক ভাবতভূমি। এখানকার আচার্যেবাই এক অক্ষরের মধ্যে বিশ্বের সুর-মূর্চ্ছনা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন— "ওম্ ইতি একাক্ষবং ব্রহ্ম।' আর আজ এই ভারতেই আবাব ভাষা সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমবা যদি বৈজ্ঞানিক-সুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইহার একটা আবেগহীন সুযুক্তিপূর্ণ বিচার দাবী করিতে পারি, তবে ভাবতবাসী হিসাবে নিশ্চয়ই তাহা আমাদেব অশোভন হইবে না।

রাষ্ট্রভাষার হুজুগ লইয়া ভাবতের অধিকাংশ মানুষ প্রায়ই মাতিয়া উঠিয়াছে - ইংরাজীর স্থলে হিন্দীকে বসাইতেই হইবে, এই হুজুগ ছাড়া তাহারা আর কিছুই চায় না, যুক্তি-বিচারের কথা দূরে থাকুক। ভাষা-সমস্যা লইয়া তাই সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষা-বিজ্ঞানী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মধ্যে তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। এই যোগাযোগে গলা যোগ করিবার অধিকার অবশ্য আমারও আছে, এবং বোধ হয়, না করিলেই যেন নাগরিকের কর্তব্যকে অবহেলা করা হইবে, এমনই একটা হুজুগ আমারও যে নাই একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমি অবাঙ্গালী হিন্দী ভাষাভাষী অথচ জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে বঙ্গবাণীব উপাসনা করিয়া আসিতেছি। এক্ষেত্রে দুই ভাষার সহিত পরিচয় আছে বলিয়া কতকটা নিরপেক্ষভাবে কিছু বলিতে পারিব এই আশায় আমিও এ প্রসঙ্গে কিছু বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনাই করিতে চাই।

ভাষা কি? যাহার দ্বারা ভাব প্রকাশ করি তাহাই ভাষা।—শৈশব হইতে এই সূত্র

মুখস্থ করিয়া আসিতেছি, তাই ইহার মধ্যে যে ভুল নিহিত আছে তাহা কোনদিন ভাবিয়া দেখি নাই। যাহার দ্বারা ভাব প্রকাশ করি তাহাই ভাষা নয় এবং ভাষার একমাত্র উপযোগিতা ভাবপ্রকাশ নয়। আমাদের আসল ভুল এইখানে। ভাষা-কমিশনও এই ভুল করিয়াছিলেন। ভাষাকে তাঁহারা ভাব-প্রকাশের যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই মনে করেন নাই। তাই তাঁহাদের কাছে—Language is in a sense profoundly important and in another sense of little or no consequence! যে ক্ষেত্রে ভাষা তাঁহাদের নিকট 'profoundly important' সে ক্ষেত্রেও তাঁহাদের মতে তাপ হইল শুধু 'level of instrumentality'। তাই তাঁহারা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যে, 'It is, however, of no intrinsic consequence in itself, because it is essentially an instrumentality... ....only a vehicle of thought and not thought itself,... ..it is not language but good government that is aimed at in the field of public administration' ভাষার এই সংকীর্ণ-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা এত সহজে এই সমস্যার সমাধানও করিয়া দিয়াছিলেন,— That which lends itself to the most convenience is the correct solution of the language problem in the various fields, surely, there does not have to be heat and passion over the issue of Language, ever instrumentality and not the substance!' একথা কমিশন যে হঠাৎ নতুন করিয়া আবিষ্কার করিয়া বসিলেন তা নয়, আগেও অনেকে এরকম ধারণার বশবর্তী ছিলেন। --ভাবই আগে, ভাষা পরে। কিন্তু ভাব আগে বলিয়াই সে কুলীন এবং ভাষা পরে বলিয়াই তাহার নিজস্ব কোন শিল্পসৌষ্ঠবের প্রয়োজন নাই, এমন কোন কথা নাই! স্বামী বিবেকানন্দ যে বলিয়াছিলেন—"ভাষা, ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়?"—তাহার অর্থ এ নয়, যে ভাষা যেমন-তেমন হইলেই চলিল, শুধু ভাব-পুষ্ট বলিষ্ঠ গরীয়ান হওয়া চাই। বরং একথাই বলা যায় যে, ভাষা ও ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই। হীরে মতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর যেমন বাঁদর বসাইলে মানায় না, গাধার উপর তেমনি রাজ-রাজেশ্বরকে বসাইলেও কি আমাদের রসদৃষ্টি পীড়িত হয় না? আসল কথা ভাষারও একটা নিজস্ব মহিমা আছে, তাহারও একটি বিশিষ্ট রসরূপ আছে, এবং এ-রূপ প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব। তাই ভাষা ও ভাব কোনটিকেই আমরা অপ্রধান করিতে চাই না, বরং ভাব ও ভাষা উপনিষদের সেই দুইটি বিহঙ্গের মত একই শাখায় বসিয়া সমানাধিকারে স্বমহিমায় গান করুক— 'দ্বসপর্ণা সমানা সযুজা।'........

আমরা আরও বলিতে পারি, ভাব ও ভাষার সম্বন্ধ দুইটি পৃথক বস্তুর মিলনই নয়, ইহা হইতেছে রাসায়নিক সংমিশ্রণ। ভাব-অনুযায়ী ভাষা এবং ভাষা-অনুযায়ী ভাব এই দুইটি সত্যই আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী তাহার ভাব রহিয়াছে এবং প্রত্যেকের ভাব-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাহার নিজস্ব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের ভাষা-সমস্যা তাই হিন্দী বনাম ইংরাজী নয়, এখনকার ভাষা-সমস্যা হইতেছে স্বীকৃত সব কয়টি ভাষার (জনৈক প্রধান মন্ত্রী

এগুলিকে একদা জাতীয় ভাষা বলিয়া) বিকাশের এবং ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে জাতির সাংস্কৃতিব সমৃদ্ধির প্রশ্ন।

ইহার পর আরও একটি প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করিতে চাই,—ভাষা এবং ভদ্রভাষা কি এক কথা? জ্ঞানীর ভাষা, কবির ভাষা আর আমার-আপনার হাটে বাজারের ভাষা কি এক? আমার-আপনার সঙ্গে কবির পার্থক্য কোথায়? আমি-আপনি যেমন করিয়া ভাবি, যেমন করিয়া প্রকাশ করি, জ্ঞানী কবি নবি কি সেই রকম করিয়া প্রকাশ করেন? লক্ষ্য করিতে হইবে, তিনি কেমন করিয়া বলেন, কেমন করিয়া অবস্থান করেন, কোন্ ভাষায় কথা বলেন?

'স্থিত-প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থ্শ্য কেশব
স্থিতধীঃ কিং প্রভাযতে কিসাসীত ব্রজেত কিব্।' গীতা

--সাধারণ জীবনের ভাষা আর কাব্যের ভাষা এক নয়। সাধারণ জীবনে আমরা অতিমাত্রায় চঞ্চল, অতিমাত্রায় ব্যস্ত বিক্ষিপ্ত। সেখানে ভাষা শুধু ভাবের বাহন-মাত্র হইলে ক্ষতি নাই। সেখানে বলিতে আপত্তি নাই--'ওরে ওঠ, সকাল হল, অপিস্ যাবি না?' কাব্যেব ক্ষেত্রে শিল্পের লোকে কিন্তু ভাব একই, ভাষা অন্য—'উষা বা অশ্বশ্য মেধ্যস্য শিরঃ।' আর এই যন্ত্র-সভ্যতায় অবসরক্ষীণ মানুষও যখন অতিমাত্রায় যান্ত্রিকতায় হাঁপাইয়া উঠিতেছে তখন সেও সময়ে একটু কাব্য, একটু রস, না হয় বিছানায় শুইয়া একটু গল্পো রসই, একটু রম্যরচনার রসই, না হইলেই বাঁচে না, তখন একমাত্র ব্যবহারিক সুবিধার (কমিশনের ভাষায় 'convenience') দিক দিয়া বিচার করিয়া ভাষা সমস্যার সমাধান করায় যে বিপত্তি আছে, একথা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই।

আমরা দেখিলাম, ভাষা ও ভাব উভয়ে স্বমহিমায় মর্যাদাবান্, ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, প্রত্যেক জাতিব ভাষা ও ভাব তাহার সমৃদ্ধিরই প্রকাশক এবং ভাষার স্থূল প্রয়োজন ছাড়াও তাহার নিজস্ব শিল্পরূপ ও মণ্ডনশিল্প রহিয়াছে—সা মণ্ডনান্মণ্ডন ভুক্তঃ। আমাদের ভাষা-কমিশন যে ব্যবস্থা কারয়াছিলেন; (—এখানে তাহার বিস্তৃত বর্ণনার অবসব নাই—), তাহাতে ভারতের বহুভাষার কোন গুরুত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, অথবা মনে-মনে স্বীকাব করিলেও এই ভাষাগুলির সমৃদ্ধি ও বিকাশ লইয়া মাথা-ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রকাশন ও শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভাষাগুলির (—এগুলি উপভাষা বা dialect নয়, ভাষাই) ব্যবহার সঙ্কুচিত কবা হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই করা হইয়াছে। শাসনের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি আপাতত স্থগিত রাখিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার আলোচনা করিলেই সবটা বুঝিতে পারিব। শিক্ষা যতদূর সম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন একথা আজ নূতন করিয়া বলিবাব আবশ্যকতা নাই।—

"কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চির পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশে সর্ব্বত্র সমাদৃত, অন্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্য-কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির

মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে।' সমস্ত জাতির জীবন-ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ সাধন হয়।" (—শিক্ষা : রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড)।

—রবীন্দ্রনাথের একথা শুধু যে আবেগ-প্রসূত দেশপ্রেম বা উগ্র অন্ধ স্বাজাত্য-বোধ (— যেটা হিন্দী সমর্থকদের এক রকম পাইয়া বসিয়াছে) নয়, ইহার পশ্চাতে যে মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে একথাও আজ নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। প্রশ্ন হইল এদেশের মাতৃভাষাগুলি উচ্চশিক্ষার বাহন ও মাধ্যম হইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সমৃদ্ধ কিনা। বিশ্বের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করিযা একবাক্যে বলিয়া ফেলা যায়—না, তা নয়। তা যখন নয়, তখন এমন একটি ভাষা আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু সে ভাষা তো হিন্দী নয়। কারণ ভারতের অনেক ভাষার তুলনায়ই সে অধিক সমৃদ্ধ নয়, বাঙ্গালার কথা মনে রাখিলেই আমরা তাহা সহজে বুঝিতে পারিব। তাহা হইলে প্রশ্ন আসে দুইটি—প্রথমত ভাষাকে সমৃদ্ধ করা, দ্বিতীয়ত যতদূর ও যতদিন তাহা না হয় ততদিন ও ততদূর যোগ্য ও নিরাপদ ভাষা ইংরাজীকে বহাল রাখা। ইংরাজীকে সরাইয়া তাহার স্থলে আজই কোন ভারতীয় ভাষাকে বসাইবার মত যোগ্যতা কোন ভাষার নাই, বলা বাহুল্য ইংরাজীর স্থলে অন্য কোন অ-ভারতীয় ভাষা আনার প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তা খুব বেশী নাই, বরং বিপদ অনেক। হিন্দীকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে, তাহার ব্যবহারকে প্রসারিত করিতে হইবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাগুলি কোন্ অপরাধে সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে? যে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি, রামমোহন-বিবেকানন্দ হইতে শ্রীঅরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখনও স্বীকার করিয়াছেন । আমাদের ভাব ও ভাষা উভয়েব সমৃদ্ধির জন্যই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা এখনও প্রয়োজন।

বহু বিদেশী ভাষা জানা যখন মনে হইতেছে আজ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তখন যে ভাষায় সব অভিযানেব পদধ্বনি অল্পবিস্তর শুনিতে পাই, তাহাকে রাতারাতি সরাইয়া দিয়া 'হিন্দীর সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের এখন নয়। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতেব কাছে আমাদের অনেক কিছু গ্রহণ করিবার আছে এবং তাহা হিন্দীর মাধ্যমে পাইতে পাবিব কতখানি, সে বিষয়ে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ইংরাজী চিরকাল শিক্ষার বাহন হইবে, তাহা নয়, তবে ইংরাজীকে সরাইয়া ক্রমশঃ মাতৃভাষাকে আনিতে হইবে যেমন-যেমন মাতৃভাষায় শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িতে থাকিবে। তখন ইংরাজী আমাদের শিক্ষার মাধ্যম না হইয়া শিক্ষার অঙ্গ হইবে। এ স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথও দেখিয়াছিলেন—

"বাল্যকাল হইতেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক, কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিব রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজীকে কেবল ভাষা-শিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরাজী শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়।"

এই শিক্ষা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের নিকট সর্ব্বোত্তম বোধ হইয়াছিল—

"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থ স্থান হইবে।"

(—পরিচয় ঃ র, র, ১৮শ খণ্ড)

কেহ কেহ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ইংরাজীর বিরুদ্ধে বলিয়াছেন—যে ছাত্র ইংরাজীতে পাশ করিতে পারে নাই সে তাহার নির্দ্দিষ্টমান (standard)পাশ করিতে পারে নাই এমন হইবে কেন? তাহাদের কাছে বক্তব্য, সে যে ইংরাজী বাদে বাংলা এবং অন্যান্য বিষয়গুলিতে পাশ করে নাই এমন কথা তো বলা হয় না, যে মানে (standard)যে পরিমাণ পাঠ বিস্তৃত (course) থাকা দরকার তাহার যে কোন একটি অংশেই যে অযোগ্য হইবে তাহার সে মানের অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে, ইহাতে তো সন্দেহ নাই। এ প্রসঙ্গে আমবা প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য স্মরণ করিতে চাই—

"ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যতদূর জানি, শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম এবং বাধ্যতামূলক ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ছাত্রদের কোন মতামত নাই। মেধা ও পড়াশুনায় আগ্রহ যাহাদেব কম, তাহারা মাতৃভাষার পক্ষেই ভোট দিবে। অলস ও অকর্ম্মণ্যেরা দেশপ্রেমেব দোহাই দিবে। কিন্তু মননশীল ভাল ছাত্রেবা যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু ডিগ্রিই চায না, জ্ঞানও চায, আমার দৃঢ় ধারণা তাহারা নিশ্চযই ইংরাজীকে রাখিবার পক্ষেই, হয় ত মাতৃভাষাব সহ রাখিবার পক্ষেই, ভোট দিবে।" (—প্রতিবেদন-পত্র)

আচার্য্যেব উদ্ধৃতিতে ইংরাজীর উপর একটু বেশী গুরুত্ব আবোপিত হইলেও বক্তব্যটি যে আমাদের প্রসঙ্গে অনেকখানিই সত্য তাহা আমবা সহজেই বুঝতে পারি। যাহারা ইংরাজীকে এড়াইযা কোন রকমে ডিগ্রি পাইলেই ধন্য, তাহাদেব কথা বাদ দিযা, যাহারা সত্যই জ্ঞানার্জ্জন কবিতে চায় তাহারা ইংরাজীকে ত্যাগ করিবার পক্ষপাতী হইবে না। যাহারা শুধু বাঙ্গলা সাহিত্য পড়ে তাহাদেবও ইংরাজী পড়িবাব প্রয়োজন কতখানি সে সম্বন্ধে আমরা নিয়তই অধ্যাপকদের নিকট নির্দ্দেশ পাইতেছি। ইংরাজী শিক্ষা যেখানে সত্যই প্রয়োজন সেখানে ইহাকে জাতীয়তাবিরোধী মনে কবিবার কোন কারণ নাই। ইংরাজী বিদেশাগত ভাষা হইলেও ইহা আজ ভারতের একটি স্বীকৃত ভাষা। একথা ভুলিলে চলিবে না যে সংস্কৃতও একদিন বিদেশাগত ভাষা ছিল, কারণ আর্যরাও ভারতে বিদেশ হইতেই আসিয়া ছিলেন। আর মাতৃভাষা? জন্মের পরে যে শিশু যে সমাজে মানুষ হইয়া উঠে সেই সমাজের ভাষাই তাহার মাতৃভাষা হয়। মাতৃ দুগ্ধের সঙ্গে আমবা কোনো ভাষা পাই না। যদি কোনও বাঙালি মায়ের সন্তান নির্জন দ্বীপে দ্বীপে মানুষ হয় তবে তাহার কোনো মাতৃভাষা থাকে না। আর যে শিশুর মা ইতালীয় ও বাবা ফরাসী তাহার দুইটি মাতৃভাষা হইবে। ইহা মনস্তত্ত্ববিদের কথা। সুতরাং মাতৃভাষা সম্পর্কে অত্যুৎসাহ থাকা উচিত নয়। ইংরাজীব প্রতি একটা অন্ধ বিদ্বেষ আমাদের এতখানি বিমুখ

করিয়া দিয়াছে, নতুবা ভারতীয়রাও একদিন ইংরাজী শিখিয়াছিল, তাহারাও যে English English লিখিতে পারিত তাহা George Sampaon, C R Reddy প্রমুখ মনীষীরা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যে নবপ্রেরণা লইয়া ভারতীয়রা ইংরাজী লিখিতে আরম্ভ করিল, তাহা যথেষ্ট পরিমাণ সাহিত্যিক ইংরাজী। মুল্‌করাজ আনন্দের রচনাবলী, রমেশচন্দ্রের রামায়ণ-মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদ, মনোমোহনের Songs of Love and Death, শ্রীঅরবিন্দের Savitri মহাকাব্য বহু ইংরাজী সমালোচকের প্রশংসা-ধন্য হইয়াছিল। এত কথার পর আচার্য্য চট্টোপাধ্যায়ের সহিত একমত হইতে আর আমাদের বাধা থাকে না—"**নিজের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য যদি কোন ভাষা আমি আয়ত্ত ও ব্যবহার করিতে সমর্থ হই, তবে সে ভাষা আমারই ভাষা হইয়া যায়।............ দেশে লক্ষ লক্ষ লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের পটভূমিকায় ইংরাজীকে সার্ব্বজনীন ভাষারূপে ব্যবহার করিলে ভারতের মর্য্যাদা 'কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইবে না।** আমাদের অগ্রণী চিন্তানায়কদের অনেকেরই এই অভিমত।"

এভাবে আপাতত প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে আপত্তির বিশেষ কিছুই দেখি না। ভারত যুক্তরাষ্ট্র। ইহার প্রদেশগুলির যেমন বিদেশ হইতে ভাববিনিময় করিবার প্রয়োজন আছে, তেমনি নিজেদের মধ্যেও একটা ঐক্যসূত্র গড়িয়া তুলিবার আবশ্যকতা আছে। ভাষাগত একটা ঐক্যের তাই প্রয়োজন হইয়া পড়ে! এই ঐক্যসাধন প্রচেষ্টা তাই বৈজ্ঞানিক হওয়া প্রয়োজন। বাতারাতি 'হিন্দী-সাম্রাজ্য' গঠন করিলে তাহাতে কোন ফল হইবে না। আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া অপুষ্ট কৃশাঙ্গ করিয়া তুলিলে তাহাতে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে না। ভাবতকে Unitary না করিয়া federal করিবার পশ্চাতে যুক্তি ছিল, তাহার রাজ্যগুলিকে নিজস্ব শিক্ষা ঐতিহ্য ও ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের গতিতে বিকশিত হইতে দিয়াই তাহার মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তোলা। এই আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ হইতে দিলেই তাহাদের মধ্যে ঐক্য হইবে আন্তরিক এবং স্বর্বাঙ্গিত। কারণ, মিলন হয় সবলে সবলে। সবলে দুর্বলে যে মিলন, সবল যখন দুর্বলকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়, তখন সেই মিলনের নাম ন্যাশন্যালিজম্ নয়, তাহা ইম্পিরিয়ালিজম্। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অজগর সাপের ঐক্য-নীতি বলিয়াছেন। আজকের সমস্যা প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তি এমনই প্রাসঙ্গিক যে মনে হয় তিনি যেন আজই দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন—

"ভারতবর্ষে আজকাল ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজী ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে ক'রে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয় তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইবে থেকে দাঁড় দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াসমাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয় সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই

তবে যথার্থ মিলন হতে পারে, কিন্তু যদি বাহ্যবন্ধন পাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে পরিণাম হয় পরম শক্রতা। কারণ সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন অথবা শৃঙ্খলার মিলন মাত্র।''........... (—সাহিত্যের পথে ঃ র, র, ২৩শ খণ্ড)

আর জাতীয় ভাষা? আমাদের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়—ভারতের জাতীয় ভাষা তো একটি নয়, চৌদ্দটি। তবে সর্বভারতীয় আদান-প্রদানের জন্য ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। আমরা পূর্বে ইহা বলিয়াছি ভাষাবস্তুটি মানুষ কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া গড়িয়া তোলে নাই। প্রকৃতির দান ও প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার বিকাশ। আমাদের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহাও আমরা নির্ধারিত করিব প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া নয়। কারণ প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার্র করিয়া যাহা করা যায় তাহা কৃত্রিম ও তাহা কোন সুফল প্রসব করে না। এই কথাটাই 'গীতা' ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারবারই বলিয়াছেন—তোমার নিজের প্রকৃতিকে তোমার নিজের স্বভাবধর্মকে অস্বীকার করিও না, তাহার চেয়ে নিধনও শ্রেয়—'প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?' যদি সব প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীকে পক্ষপাতীত্ব না করিয়া মোটামুটি সমান সুবিধা ও প্রায় সমান অসুবিধা দিয়া ভারতের জাতীয় সংহতির প্রতীক (ইংরাজীর পাশাপাশি আরো একটি) রাষ্ট্রভাষা রূপে সরলীকৃত সংস্কৃত ভাষাকে রাখা যায়, তা হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা হইবে। ইজরায়েল রাষ্ট্রের কথ্যভাষারূপে পুনর্জীবিত ও সর্বগ্রাহ্য হইয়াছে।'' (—ড. সুকুমার সেন : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ২০০২, পৃ. ৬৯)। যে হিন্দীকে লইয়া এত টানাটানি বাংলার তুলনায় তাহার শক্তি ও যোগ্যতা কতখানি তাহা আমরা জানি। তাহার ভবিষ্যৎ রূপও অনিশ্চিত। একধারে তাহার মধ্যে কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিমুখী দুই প্রকার শক্তিই কাজ করিতেছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন, মৈথিলী, অবধী, ভোজপুরী, উর্দ্দু প্রভৃতি যাহাদের লইয়া হিন্দীর 'খড়িবোলী' গঠিত, সেই ভাষাগুলি মূলত এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং স্বতন্ত্র ভাষারূপে তাহারা এখন মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। ফল কথা অবহট্‌ঠ, মৈথিলী ও বাঙ্গালা লইয়া এক কালে যেমন কৃত্রিম অথচ সরল ভাষা 'ব্রজবুলি' গড়িয়া উঠিয়াছিল, অভিজাত খড়ি বোলীর অবস্থা অনেকটা তাহাই। হিন্দিকে এতখানি গুরুত্ব দিবার আগে তাহার ভবিষ্যৎ সহজ রূপ কি এবং কতখানি দৃঢ় হইবে তাহাও আমরা দেখিয়া লইতে চাই।

আর যাহাকে বিজাতীয় বলিয়া বিতাড়িত (অস্পৃশ্য বলিব কি?) করিতে আমরা এতই উৎসুক তাহার ''জ্ঞানের বিশ্বরূপ''-কে অস্বীকার করিবার মধ্যে আজ কোন মাহাত্ম্য নাই, কারণ আমরা সংস্কার-মুক্ত হইতেছি বলিয়া গর্ব করি এবং বিশ্বায়নের বুলি আওড়াই! পৃথিবীর অনেক দেশই ইংরাজীকে অস্বীকার করে না। অন্য বহু দেশের কথা না বলিয়া কেবল একটি ৺েশের কথা বলিলেই আমাদের সংস্কারে ঘা লাগিবার কথা। সে দেশ রাশিয়া। রাশিয়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরাজীই আগে পড়ান হয়। ইংরাজীর মাধ্যমে আজ বিশ্বের জ্ঞানবার্তা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আমরাই তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিব কেন?

অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি আমরা অত্যন্ত আবেগ-প্রধান হইয়া পড়িয়াছি। যে জাতি আমাদের পদদলিত করিয়াছিল তাহার ভাষাকে আমরা পদদলিত না করিলেই যেন আমাদের প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। কিন্তু ইংরাজী আজ কোন বিশেষ জাতিমাত্রের ভাষা নয়। তাহার শক্তি গ্রহণ ও তাহাতে শক্তি-সঞ্চার আজ বিশ্ব করিতেছে। আর শুধু ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষই নয়, এই আবেগমত্ততাকে অবলম্বন করিয়া আজ এক সঙ্কীর্ণ ভাষাগত অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা (stark blind Linguism)দেখা দিয়াছে। হিন্দীপ্রধান অঞ্চলে কেহ কেহ যে হিন্দু হিন্দু ও হিন্দীর মধ্যে অভেদ কল্পনা করিতেছেন তাহা আমাদের জাতিগত বিপদের প্রতিই অঙ্গুলি-সংকেত করিতেছে। ভাষার এই সমস্যার উপর যে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার রং মাখান হইতেছে তাহা আমাদের বহুকালের অভ্যাস হইলেও ত্যাগ করিতে হইবে। উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান প্রভৃতির Difinitely localized groups। যাহারা ভারতের জনসংখ্যার ২/৩ অংশ তাহারা —তাহাদের মাতৃভাষাকে অন্যদের উপর চাপাইয়া দিতেছে, এরূপ মতবাদও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। উপসংহারে আমরা বলিতে চাই ভাষা সমস্যাটি কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা নয়, ইহাকে ঐ দুইটি হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। ইহা মূলতঃ সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং ইহার বৈজ্ঞানিক সমাধানই জ্ঞানের পরিচায়ক। তাই যদি করি ভাষা সমস্যার যদি বৈজ্ঞানিক সুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া সমাধান করি, তবেই আমরা বিশ্বের দরবারে যথার্থ রাজনীতি জ্ঞানেরও পরিচয় দিতে পারিব।

৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের মূল স্বরূপ

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেদান্তকেশরী রূপেই চিহ্নিত হয়ে আছেন ভারতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে। ভারত-সংস্কৃতির উৎক্রান্তিমুখীনতার বিশেষ এক সন্ধিলগ্নে স্বামী বিবেকানন্দেব ধ্রুব আবির্ভাব ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। সেই তাৎপর্যের বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেকানন্দের সামাজিক সংস্কারও সাধারণের কাছে সুপরিচিত হয়ে আছে। কিন্তু তাঁব ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকগুলি আজ আর আমাদের মনে আসে না। তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্বেব প্রাণপূর্ণ দৃঢতার সঙ্গেই স্মরণীয তাঁর বাগ্মিতার দুর্লভ সাফল্য। কিন্তু এই তেজস্বী ব্যক্তিত্বেরই অঙ্গীভূত বিশেষ একটি দিক সাধারণের কাছে আজো অজ্ঞাত হয়ে আছে। সেটি তাঁর লেখক-ব্যক্তিত্ব, তাঁর ওজস্বী বচনাশৈলী।

বিবেকানন্দের রচনাবলীর অধিকাংশই মূলত ইংরেজী এবং তারও বিরাট অংশ জুড়ে আছে তাঁব বক্তৃতাবলীরই সঙ্কলন। কিন্তু সামান্য যে ক'টি মৌলিক বাংলা রচনা তাঁব লেখনী-নিঃসৃত হয়েছে তাতেই রয়েছে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে স্মরণীয় একটি দিক। তাকেই আমরা সাধারণেব কাছে তুলে ধরে তাঁর কৃতিত্বের একটি অজ্ঞাত দিক আবিষ্কারের চেষ্টা করব।

বিবেকানন্দের বাংলা রচনার মধ্যে প্রধান হলো · 'পবিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' আব 'পত্রাবলী'। বিবেকানন্দ সারা ভারত দেখেছিলেন পদব্রজে ঘুরে। 'পরিব্রাজকে' তিনি বাংলার তথা ভারতের প্রাণকে আবিষ্কার করেছেন, তার নানা বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন নানা রেখায় ও রঙে। বিবেকানন্দের গদ্যের দুটি গুণ . ওজস্বিতা ও বলিষ্ঠ প্রাঞ্জলতা। কিন্তু 'পরিব্রাজকে'র বর্ণনা ও চিত্রণে তেজস্বিতার বদলে কোমলতা অনেক স্থলে কমনীয মোহময কাব্য পরিবেশ রচনা করে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দেব আর এক রূপ এখানে,—ঔপন্যাসিকেব পর্যবেক্ষণ ও সপ্রেম দৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করে। বাংলার রূপচিত্রণের পাশে-পাশে ভারতের অন্য অঞ্চলের রেখাচিত্রও আভাস ফেলেছে নানা প্রসঙ্গে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিবেকানন্দের মৌলিক দৃষ্টিব সঙ্গে ইতিহাস সমাজতত্ত্ব আর নৃতত্ত্বে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমী সভ্যতার জীবন দর্শনের মৌল পার্থক্য বিবেকানন্দ যা নির্ণয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক আমরা পর্যন্ত তাই মেনে আসছি। এই দুই সভ্যতার আত্মিক পার্থক্যই নয়, তাদের প্রাণ জীবনের ধারা, মানবদেহের গঠন, বেশভূষা, আহার-বিহারেব খুঁটিনাটি পার্থক্যও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমন্বয়ের কেন্দ্রীয় সূত্রটিও খুঁজে বের করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনাও হয়েছে সহজ আব সরস। এমন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাতেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অন্তরঙ্গ বাগ্‌ভঙ্গি আব ভারহীন তীব্রগতি অপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করে। কোন-কোন জায়গায় তাঁর বক্তব্য এমনই মৌলিক যে তা আমাদের প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে বুদ্ধিকে সচকিত করে তোলে :

> "একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে...কাজ-কর্ম্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক।.....আর আমাদের ঠাকুর বলেছেন, মহা উৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্‌টা বুঝলি রাম' হলো; ওরা ইউরোপীরা.....মহা কার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি।...গীতার উপদেশ শুন্‌লে কে? না—ইউরোপী। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না কৃষ্ণের বংশধরেরা!"[১]

'ভাব্‌বার কথা' আর 'বর্তমান ভারতে' বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন রয়েছে। 'বর্তমান ভারতে'র দু'একটি প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের যে পরিচয় পেয়েছি, বাংলার গণমানসে সেই বিবেকানন্দই অমর হয়ে আছেন। দেশপ্রাণতার মূর্তপ্রতীক বিবেকানন্দ ভারতের আত্মিক স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন, জাতিবর্ণবিত্তনির্বিশেষে সর্বভারতীয় দেশপ্রীতি ও ঐক্যের যে বাণী তিনি উচ্চারণ করেছেন, শক্তিমন্ত্রের মত ওজস্বী আবেগ-কম্পিত সেই আহ্বান আজকের ভেদবুদ্ধি-আক্রান্ত ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বলা হয় Style is the man himself—লেখকের রচনাশৈলী তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। এই সূত্রের সপক্ষে বহু উদাহরণের মধ্যে বিবেকানন্দের রচনাশৈলী যেন বেশি করে মনে আসে। বীর সন্ন্যাসীর তেজস্বী ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ যেন তাঁর ওজস্বী রচনাশৈলী। কর্মে এবং সাধনায় যিনি বিশ্বাস করতেন,—ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না, তাঁর রচনায় বক্তব্য আর ভণিতির মধ্যে কোন ফাঁক নেই। সহজ কথাটি দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত করেছেন তিনি; ভাষার মধ্যে নেই কোথাও প্রসাধনের অতিমাত্র প্রচেষ্টা। শিল্পরূপ যা ফুটেছে তাও অনায়াসসিদ্ধ। আজীবন খাঁটি হবার উপদেশ দিয়েছেন তিনি, রচনায়ও তিনি তেমনি কৃত্রিমতার বিরোধী। বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনে চলিত রীতি ক্রমশ সাহিত্যের বাহন হয়েছে। ভাবপ্রকাশের সর্বময় ক্ষমতা ক্রমশ তার যতই বেড়েছে সাধুরীতিকে ততই মনে হয়েছে আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম। গতানুগতিকতার খাতিরে সাধুগদ্যের যে ব্যবহার, তাকে কটাক্ষ করে বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন—

> "পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?"[২]

'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'হুতোম পেঁচার নক্‌সা' থেকে শুরু করে বাংলায় চলিত গদ্য প্রয়োগের যে ক্রমিক ইতিহাস রয়েছে তাতে বিবেকানন্দের আসন স্পষ্ট-চিহ্নিত হওয়া উচিত। চলিত গদ্য-সাহিত্যের ভূমিতে অধিকার যতই বাড়িয়ে চলেছে,

---

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উদ্বোধন, ১৩৪৮, পৃ. ১৪-১৫।

২. ভাববার কথা, উদ্বোধন, ১৩৪৬, পৃ -৯

একটা জিনিস ততই লক্ষণীয় হয়ে উঠছে—চলিত গদ্য যেমন সাধুগদ্য নয়, তেমনি তা আবার প্রাকৃত জনের মুখের ভাষাও নয়! মুখের ভাষার ছাঁচে-ঢালা তা হল একটি পরিমার্জিত শিল্পিত ভাষা। বিবেকানন্দের চলিত গদ্য সেদিক দিয়েও সার্থকতার দাবি রাখে। সাধারণের ভাষার প্রাণদীপ্তি গ্রহণ করে এবং তার গ্রাম্যতা আর অশিষ্ট রূপ বর্জন করে যে আদর্শ তিনি স্থাপন করেছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখনীয় আন্দোলনের আগে তা বিস্ময়কর সার্থকতার নিদর্শন। সাহিত্যের মাধ্যম রূপে চলিত ভাষার প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। চলিত ভাষা যে কোলকাতা-কেন্দ্রিক গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই ভবিষ্যৎ-বাণীও তিনি করেছিলেন। সর্বোপরি এই চলিত ভাষার উপযোগিতা তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা স্মরণ করেই আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের সমাপ্তি-রেখা টানবো।

"চলিত ভাষায় কি....শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? স্বাভাবিক...ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী করা ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, ...এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।...

"যদি বল ও-কথা বেশ, বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।...

"...ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়?... যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ডাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে—'রাজা আসীৎ'!!! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ওসব মড়ার লক্ষণ।... এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে।" '—বাণী ও রচনা' উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ('ভাববার কথা', বাঙ্গালা ভাষা) ১৯৯১ ২৯-৩০।

৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচন

আমরা জানি, যেসব ব্যাকরণিক সংবর্গ (Grammatical Categories) কোনো ভাষার রূপতত্ত্বকে (Morphology) নিয়ন্ত্রিত করে সেইগুলির মধ্যে বচন (Number), লিঙ্গ (Gender), পুরুষ (Person), কারক (Case), কাল (Tense) ও ভাবপ্রকারের (Mood) ভূমিকা বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ। এই সব ক'টি ব্যাকরণিক সংবর্গ সবভাষায় সমান সক্রিয় নয় এবং কোনো একটি ভাষাতেও সর্বক্ষেত্রে সব সংবর্গের সমান ভূমিকা নেই। যেমন, লিঙ্গ হিন্দীভাষায় ক্রিয়ার রূপকেও নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ক্রিয়ার রূপ লিঙ্গ ভেদে পরিবর্তিত হয় না। এমনকি সংস্কৃতের মতো সুসংবদ্ধ ভাষায়ও (Synthetic language) ক্রিয়ার রূপ-নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গের ভূমিকা নেই। তেমনি রূপতত্ত্বে বচনের ভূমিকাতেও বাংলার স্বাতন্ত্র্য আছে। বাংলাভাষায় শব্দরূপের ক্ষেত্রে বচনের ভূমিকা লক্ষিত হয়, কিন্তু ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের ভূমিকা নেই। অথচ যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে ধাপে-ধাপে পরিবর্তনের ফলে বাংলার জন্ম, সেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যে শব্দরূপ তো বচন ভেদে পৃথক হতই, ক্রিয়ারূপও বচন ভেদে পৃথক হত, এবং সংস্কৃত থেকে জাত হিন্দী ভাষাতেও ক্রিয়ার রূপ বচন ভেদে পৃথক হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলায় শুধু বিশেষ্য ও সর্বনামের রূপ-নিয়ন্ত্রণে বচনের ভূমিকা আছে, অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামের শব্দরূপে বচনভেদ দেখা যায়, ক্রিয়ার রূপে বচনভেদ নেই অর্থাৎ বহুবচনে ক্রিয়ার পৃথক রূপ দেখা যায় না।

এখন দেখা যাক, আদিমধ্য যুগের বাংলা রচনা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষার রূপতত্ত্বে বচনের এই স্বতন্ত্র ভূমিকা কতটা ফুটে উঠেছে এবং সেখানে বচনের কী রূপ পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাভাষার ইতিহাস আলোচনায় দেখি বাংলাভাষা ক্রমশ সংশ্লেষণমূলক (Synthetic) গঠন থেকে বিশ্লেষণমূলক (Analytic) গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলাভাষার এই প্রবণতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বচনবিধিতেও দেখা যায়। বাংলার আদি উৎস যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য, সেই ভাষা ছিল পুরোপুরি সংশ্লেষণমূলক (Synthetic)। বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল। শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্যসাধনে বচনের সুস্পষ্ট ভূমিকা ছিল, কারণ শব্দরূপে এবং ক্রিয়ারূপে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের পৃথক-পৃথক বিভক্তি ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যে এই বিভক্তিগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক অবক্ষয়ের (Phonetic decay) ফলে অনেক বিভক্তি লোপ পেলো এবং আর্যভাষা তার মূল সংশ্লেষণমূলক রূপ থেকে অনেকখানি সরে এলো। তবু মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শেষ পর্যন্ত একবচন বহুবচনের ভেদ বজায় ছিল, কারণ কিছু অবক্ষয় হলেও বহুবচনে পৃথক বিভক্তি ছিল, কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে, বিশেষ করে পূর্বী ভাষাগুলির কোনো-কোনোটিতে ধ্বনিতাত্ত্বিক অবক্ষয়ের ফলে বহুবচনের বিভক্তি লোপ পেলো এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের পৃথক রূপ রক্ষিত

থাকলো না—বাংলাতেও এই বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল। এইজন্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচনের স্বতন্ত্র বিভক্তি-চিহ্ন পাওয়া যায় না। কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তির অবক্ষয়িত রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও কর্তৃকারকের বহুবচনে কোথাও-কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে এরও প্রচলন খুব কম ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুত্ববোধক কোন শব্দ যোগ করে বহুবচন গঠন করা হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুক্ষেত্রে বহুবচনাত্মক সর্বনামের দ্বারা বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এই সব সমষ্টিবাচক সর্বনাম হল—সম্হাই, সম্হাই, সম্হাঞি ইত্যাদি। যেমন—

ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সহ্মেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।—জন্মখণ্ড।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। যেমন—সর্বে হি > সব্বা হি > সব্বাই > সবাই[১]।

সংস্কৃত বহুবচন পদের ধ্বংসাবশেষ অর্ধতৎসম রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরো পাওয়া যায়—'পীতরে'। যেমন—

মারন্তাক যে না মারে।
তার পাণী না লএ **পীতরে**। —বাণখণ্ড।

এখানে 'পীতরে' হল সংস্কৃত পিতরঃ। পিতৃ কর্তৃকারক বহুবচন পদের অর্ধতৎসম রূপ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তৃকারকে গুলা, গুলি এবং তির্যক কারকে দিগ, দিগকে, দিগের প্রভৃতি বহুবচনের বিভক্তি পাওয়া যায় না। শুধু সংস্কৃত সমষ্টিবাচক শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তৃকারকে বহুবচনেব বিভক্তি রূপে বহু ব্যবহৃত হয়েছে। গণ হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচনের বহু ব্যবহৃত বিভক্তি। কর্তৃকাবকের বহুবচনে 'গণ' ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বিশেষ্যপদের সঙ্গে। কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায়, কখনো বা ছন্দোমিল বজায় রাখার জন্য 'গণ'-এর সঙ্গে 'এঁ' যুক্ত হয়েছে। যেমন—

সুসর পঞ্চম শর গাএ **পিকগণে**।
তেকারণে থীর নহে মনে। —তাম্বূলখণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তৃকারকে 'এঁ'/'এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে অনির্দিষ্ট কর্তায় একবচনে এবং বহুবচনেও। যেমন, বহুবচনে—

সব **দেবেঁ** মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।। —জন্মখণ্ড

১. In the word সবাই sabāi 'all' (MB, সম্হাই, সম্হাঞি samhāi, -ani, as in the ŚKK) beside an emphatic সব্বাই sabbāi, we have possibly a unique relic of the OIA nominative plurtal affix : sarve hi > sabba hi (generalised-a) sab (b) ai. The force of the -hi > -i is no longer present The form সবে sabe may be a contracted form of it, rather than * sabahi!"

—Chatterji, Prof. Suniti Kumar : 'The Origin and Development of the Bengali Languag', London : George Allen & Unwin Ltd., 1970, P. 726.

একবচনের 'এ' বিভক্তিটির উৎস করণ কারকের একবচনের এন > এঁ > এ, আর বহুবচনের 'এ' বিভক্তির উৎস বহুবচনের এভিঃ > এহি > হি > এ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

"Cases of instrumental nominative like the above can thus be regarded as representing both—ena>ẽ>e in the singular and ebhih>—ehi>ei>e in the plural."[২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এভিঃ থেকে জাত মধ্যবর্তী '-অই' ও '-অঈ' বিভক্তি বহুবচনে পাওয়া যায়। যেমন—সবই, সবঈ। আগেই বলেছি, কর্তৃকারকে বহুবচনের বহুপ্রচলিত বিভক্তি হল 'গণ'। যেমন—

সময় উপেখিআঁ রহিলা **দেবাগণ**। —জন্মখণ্ড

কিন্তু 'গণ' বিভক্তিটি অহেতুক একবচনে সম্ভবত ছন্দ মেলাবার জন্যেও শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস **বাসলীগণ**।। —জন্মখণ্ড

অনেক সময় 'গণ'-এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তিও যোগ হতে দেখা যায়—

সব **দেবগণে** মেলি সেহি অবসরে।
দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে।। —জন্মখণ্ড

বিশেষ্যের আগে বহুত্ববোধক সর্বনামীয় বিশেষণ (Pronominal adjective) থাকলে তাতেই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হত, মূল বিশেষ্যের সঙ্গে কোন বহুবচন প্রত্যয় যোগ করার প্রয়োজন হত না। যেমন—

এবে হতেঁ দৈবকীর **যত গৰ্ত্ত** হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।। —জন্মখণ্ড

বহুত্ববোধক সর্বনামীয় বিশেষণ (pronominal adjective) 'যত'/'জত' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুবচনের অর্থপ্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হত। "যত নানা ফুল/পান করপুর/সব পেলাইল পাএ।"—তাম্বূলখণ্ড

বিশেষ্যের আগে বহুত্ববাচক সর্বনাম থাকলে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনের বিভক্তি যোগ করার প্রয়োজন হত না। যেমন—

সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে।।
নিতি জাএ সর্বাঙ্গসুন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী।। ল রাধা।। —তাম্বূলখণ্ড
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেঁসি জাণ।
তোহ্মে মোর **সব তীথ** তোহ্মে পুণ্যস্নান।। —দানখণ্ড
সব গোপী লআঁ রাধা করি বিমরিষে।

২. Ibid P. 724

মথুরায় হাট জাইউ চিত্তের হরিষে।। —তাম্বূলখণ্ড
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞিঁ।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞিঁ।। —দানখণ্ড
সুঝি যাহা মোর **সব দানে**।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে।। —ঐ
খণ্ডউ **সব জঞ্জাল** আর ঠেঁঠা দান।
মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান।। —ঐ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'সব' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুবচনের অর্থপ্রকাশের জন্যে বিশেষ্যের আগে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তা বহুবচনের অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—

যত কিছু বোলোঁ মোএঁ **সব পরমাণে**।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। —দানখণ্ড

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিশেষণ পুনরাবৃত্ত করেও বহুবচনের অর্থপ্রকাশ করা হয়েছে। যেমন— "বড় বড় গাছের।"। বিশেষ্যের আগে বহুত্বপ্রকাশক সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকলে সেখানে বিশেষ্যের সঙ্গে কোন বহুবচন প্রত্যয় যোগ করতে হত না। যেমন—

পূর্ব্বে **ছয় গর্ত্ত** তার মায়িল কংশাসুবে।
তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ভয়ে।। —জন্মখণ্ড

এই রীতি আধুনিক বাংলাতেও প্রচলিত আছে। এই রীতি বাংলা রূপতত্ত্বের একটি স্বাতন্ত্র্য দ্যোতিত করে। কারণ সংস্কৃত, ইংরাজী, জার্মান, এমন কি হিন্দী ভাষাতেও, দেখা যায় যে, বিশেষ্যের আগে বহুত্ববাচক সর্বনাম বা বিশেষণ থাকলেও বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে বা বিশেষ্য পদটির বহুত্ববাচক রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিশেষ্যের আগে বহুত্বজ্ঞাপক সংখ্যা-শব্দ থাকলে বিশেষ্য পদটির সঙ্গে বহুবচনের বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয়নি—

ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ।
দারুণ করম দোষে আহ্মাকে রহাএ।। —দানখণ্ড
লেখা করে কাহ্নাঞিঁ আপণে খড়ী পাড়ী।
বাকী ভৈল রাধা তোতে **নবলক্ষ কড়ী**।। —ঐ
বারহ বরিষের দান সুনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী।। —ঐ
সকল বএসে এগাব বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে।। —ঐ

সংখ্যা-শব্দ অনেক ক্ষেত্রে বহুত্ববোধক হয়েও বিশেষ্যরূপে বিশেষ অর্থে (idiomatic অর্থে) প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—আধুনিক বাংলায়—"সাত পাঁচ কি ভাবছো?" বা 'উনি অনেক টাকা নয় ছয় করেছেন'। যেমন—

আহ্মার বচন তোহ্মে শুনে শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ **শত পঞ্চাস** উপেখী।। —দানখণ্ড

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত সর্বনামের বহুবচনের কর্তৃকারকের বিভক্তি 'রা' এসেছে সম্বন্ধ পদের বিভক্তি র-এর সঙ্গে 'যা' যোগ করার ফলে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুবচনের কর্তৃকারকের এই বিভক্তি শুধু উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও খুবই কম। যেমন—

আজি হৈতে **আহ্মারা** হৈলাহোঁ একমতী।। —বৃন্দাবনখণ্ড
পুছিল **তোহ্মারা** কেহ্নে তরাসিল মণে। —কালিয়দমনখণ্ড

ভারতীয় আর্য ভাষার সংশ্লেষণাত্মক গঠন থেকে বিশ্লেষণাত্মক গঠনের দিকে পরিবর্তনের একটি বড় নিদর্শন যেটা চোখে পড়ল তা হল—মধ্য ভারতীয় আর্যের সূচনাতেই দ্বিবচনের স্বাতন্ত্র্য লোপ পেল; দ্বিবচন বহুবচনের অন্তর্গত হল। বিশেষ যুগ্মক শব্দ ছাড়া দ্বিবচনের স্বতন্ত্র বিভক্তি আর রইল না। এই প্রবণতার উত্তরাধিকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরোপুরি রয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্যের গোড়াতেই দ্বিবচনের রূপস্বাতন্ত্র্য লোপ পেল; কিন্তু একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য এবং বহুবচনের রূপ-স্বাতন্ত্র্য মধ্যভারতীয় স্তরে শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অনেকক্ষেত্রে বহুবচনের স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে। সংস্কৃতে দ্বিবচন ছিল। বাংলায় নেই।

যুগ্মতাজ্ঞাপক ক্ষেত্রে দ্বিবচনের যেখানে অর্থপ্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে সেখানেও কোনো স্বতন্ত্র বিভক্তি নেই, যুগ্মতাজ্ঞাপক শব্দ দিয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

কামাণ সদৃশ শোভে **ভ্রূহিযুগল**।
কন্নযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল।
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা **জংঘযুগল**।
কাঠী সম **বাহুযুগলে**।
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে। —জন্মখণ্ড

নিত্যযুগ্ম শব্দে সংস্কৃতে দ্বিবচনের বিভক্তি যোগ করা হত। কিন্তু বাংলায় কোন দ্বিবচনের বিভক্তি ব্যবহার করা হয় না। যেমন—

আহোনিশি দহে সকল পবাণ
আব থির নহে মনে। —তাম্বূলখণ্ড
ওঠ-অধর তার বন্ধুলীর তুল। —ঐ

তবে যুগ্মতাজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহারই বেশী। যেমন—

কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।

কনকযূথিকামালা **বাহু যুগলে**।
চরণযুগল থলকমল আকারে। —তাম্বূলখণ্ড
ডাকর ডালিম **দুঈ কুচে**।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁ রুচে।। —দানখণ্ড
দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ। —ঐ

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুবচনের রূপবৈচিত্র্য নিতান্তই কম। এর একটি উপলক্ষজাত কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তা বা কর্মরূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও সর্বনামের প্রয়োগও কম। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত সংলাপমূলক রচনা; আর সংলাপ এখানে একজনের সঙ্গে অন্য একজনের। সংলাপের পাত্রপাত্রী একবচনাত্মক—হয় কৃষ্ণ, নয় রাধা, নয় বড়াই। সংলাপের বিষয়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন। ফলে একবচনাত্মক কর্তা বা কর্মের রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী রয়েছে। বহুবচনের প্রয়োজন কম, প্রয়োগও কম।

গ. প্রসঙ্গ : ভারতীয় প্রাদেশিক ও বিদেশী সাহিত্য

১. কবি মৈথিলীশরণ

বঙ্কিমচন্দ্রে সৃজনীপ্রতিভা এবং মনীষা—এই দুই দিক হিন্দী সাহিত্যে যেন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় সাহিত্য ও ভাষাসৃষ্টিতে যেন একই রকম ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই দুই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে যথাক্রমে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র ও মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। প্রতিভার বিশালতা ও ব্যাপ্তিতে হয় তো এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্তরের নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক কর্তব্যপালনে এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রেরই সমশ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন :

> 'রাজনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে,.....কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন।'

হিন্দী সাহিত্যে অনুরূপ 'চিরসম্পদ' দান করেন দু'জন স্রষ্টা—গদ্যে নাট্যকার ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র আর কাব্যে মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। দ্বিবেদীজী অবশ্য কবি ছিলেন না, কিন্তু হিন্দীকাব্যে নবযুগের নব্যভাষা 'খড়িবোলী' প্রবর্তনে তিনিই ছিলেন প্রধানতম উদ্যোগী ও উৎসাহদাতা। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'ব্রজভাষা'র পথ ছেড়ে হিন্দী কাব্যধারা আধুনিক হিন্দীভাষার খাতে প্রবাহিত হল। আর দ্বিবেদীজীর এই মহান জাতীয় ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। মহাবীর প্রসাদের বিপ্লবী প্রেরণা যেন মৈথিলীশরণেরই বলিষ্ঠ প্রতিভার আশ্রয়ে সিদ্ধির সিংহদ্বারে উপস্থিত হতে পেরেছিল।

বাংলায় যেমন 'বঙ্গদর্শন', হিন্দীতে তেমনি 'সরস্বতী'। এলাহাবাদের একই ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে বেরুত 'প্রবাসী' এবং 'সরস্বতী'। মনে হয় 'সরস্বতী'র আদর্শ পরিকল্পনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'র প্রভাব ছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী যখন 'সরস্বতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন অনেক বিখ্যাত কবি ও সমালোচক। মৈথিলীশরণ তাঁদের মধ্যে প্রধান এবং উত্তরকালের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি। তিনি ছাড়া 'সরস্বতী' গোষ্ঠীতে আর যাঁরা ছিলেন—মন্মথ দ্বিবেদী, রামনরেশ ত্রিপাঠী, রামচরিত্র উপাধ্যায়, বামনারায়ণ পাণ্ডেয় ও সিয়ারামশরণ গুপ্ত—তাঁদের মধ্যে কেউই মৈথিলীশরণের মত সিদ্ধি ও সফলতার অধিকারী হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের সকলকে নিয়েই পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ কাব্যে 'খড়িবোলী'র ব্যাপক প্রয়োগে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঝান্সীর চিরগাঁও গ্রামে মৈথিলীশরণের জন্ম হয়। পিতা রামচরণ গুপ্ত জাতিতে আগরওয়াল বৈশ্য, কিন্তু কাজের ফাঁকে কবিতা লেখার বাতিক ছিল তাঁর। অন্যদিকে তিনি ছিলেন পরম রামভক্ত। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মৈথিলীশরণ এই রামভক্তি এবং কাব্যপ্রবণতা দুই-ই পেয়েছিলেন। পিতারই কবিতার খাতায় মৈথিলীশরণ একদিন তাঁর ছোট একটি কবিতা লিখে রেখেছিলেন। সে কবিতা দেখে পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলা বাহুল্য বাবার সেই আশীর্বাদ একদিন সফল হয়েছিল। ঝান্সীর

হাইস্কুলে পড়তে গিয়েছিলেন মৈথিলীশরণ, কিন্তু বাঁধাধরা পড়া তাঁর ভাল লাগে নি। দু'বছর পরে যখন ফিরে এলেন তখন বাড়িতেই সুযোগ্য পণ্ডিতের কাছে তাঁর সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা হল। ভারতীয় কাব্য সাহিত্য ও ধর্মদর্শনে তাঁর অনুরাগ ও ঐতিহ্যপ্রীতি তিনি এই সূত্রেই লাভ করেন। প্রথম যৌবনের কবিতা তাঁর বেরোতে আরম্ভ করে কলকাতারই একটি পত্রিকায়—'বৈশ্যোপকারকে'। তারপরে দাদার মধ্যবর্তিতায় দ্বিবেদীজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ। হিন্দী সাহিত্যে এই দুই সারস্বত পুরুষের সম্মিলন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। এরপরেই 'সরস্বতী' গোষ্ঠীতে তাঁর যোগদান এবং কবি হিসাবে তাঁর ব্যাপক স্বীকৃতি।

মৈথিলীশরণ 'সরস্বতীতে' প্রথমে চিতোরের রাজপুত বংশগৌরব অবলম্বনে তাঁর একটি গাথা-কাব্য প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র যে ভূমিকা, মৈথিলীশরণের গাথা-কাব্যটি হিন্দী সাহিত্যে সেই ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর সুখ্যাতি ছড়ায় তাঁর পরবর্তী কাব্য 'ভারত-ভারতী' থেকে। ভারতের লুপ্ত প্রাচীন গৌরবের জন্য কবির আন্তরিক বেদনা, ভারতবাসীর বর্তমান দুরবস্থা এবং তার ভবিষ্যতের জন্য পথ-নির্দেশ এ কাব্যের উপজীব্য। কবি বলেছেন, আমরা কী ছিলাম, কী হয়ে গেছি, কী-ই বা হবো, তা ভেবে দেখবার দিন এসেছে ঃ

হম্ কৌন্ থে, ক্যা হো গয়ে, ঔর্ ক্যা হোংগে অভী।
আও, বিচারেঁ, আজ মিলকর, য়ে সমস্যাএঁ সভী।।

ভারতে তখন জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্রোত এসেছে, স্বাভাবিক ভাবেই সমগ্র উত্তর ভারতের জনচিত্তে গুপ্তজীর এই জাতীয়তার সুর সাড়া জাগিয়ে তুলল।

যদিও গুপ্তজী খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রচনায় উৎসাহী, তবু তিনি প্রধানভাবে মহাকাব্যেরই কবি। প্রায় ষাট বছরের কবিজীবনে বহু রচনাই তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু প্রধান দু'টি কাব্য 'সাকেত' এবং 'যশোধরা'। দু'টিই বৃহৎ কাহিনী-কাব্য। প্রথমটি হিন্দী সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' (literary epic)। দ্বিতীয়টিতে তিনি মহাকাব্যের রূপবন্ধের সঙ্গে নাট্যগুণ মিশ্রিত ক'রে এক অভিনব শিল্পকলার জন্ম দিয়েছেন। উত্তরকালে নিজের প্রচেষ্টায় কবি বাংলা শিখেছিলেন, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের হিন্দী অনুবাদও করেছিলেন। এই সূত্রে কাব্যকলা ও জীবনে-দর্শন দুই দিক থেকেই গুপ্তজীর উপরে মধুকবির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মূলত জাতীয়তাবাদের কবি মৈথিলীশরণ মানবতাবাদী মধুসূদনের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন। 'যশোধরা'য় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের অপূর্ব সমন্বয়ের সুরটি লক্ষ্য করা যায়। 'সাকেতে'ও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' নাকি এ কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছিল। ঊর্মিলাই এই কাব্যের নায়িকা। বহিরঙ্গে মহাকাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ থাকলেও অন্তরঙ্গে এ কাব্য মেঘনাদ-বধের মতই গীতিপ্রাণ। ঊর্মিলার বিরহের অশ্রুজলে এ কাব্য বারে বারে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে। এ কাব্যের আরো একটি বৈশিষ্ট্য রাম-চরিত্রে মানবীয়তার আরোপ। এক সুনিবিড়

মর্তাপ্রীতি এ কাব্যের মৌল প্রেবণা বলা যায়। মানুষের বাইরে রামচন্দ্র কোনো দুর্লভ স্বর্গলোকের অনুসন্ধান করেন না। তিনি চান মানুষেরই মধ্যে দেবত্বের স্ফুরণ ঘটাতে ঃ

ভব মেঁ নব বৈভব ব্যাপ্ত করানে আয়া।
নর কো ঈশ্বরতা প্রাপ্ত করানে আয়া।।

মৈথিলীশরণের কবিজীবনে তিনটি স্তর স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরে কবি জাতীয় ঐতিহ্যমূলক গাথাকাব্য রচনা করেছেন। এ পর্বে তাঁর ভাষা-নির্মিতেব সাধনাও চলেছে। দ্বিতীয় স্তর কবি-প্রতিভার স্বর্ণযুগ। এ হ'ল তাঁর মহাকাব্য রচনার পর্ব। সমালোচক বলেছেন, বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং মধুকবির কাব্যচর্চাব ফলে এই পর্বে মৈথিলীশরণের ভাষায় লালিত্য এসেছে। এই স্তরে তাঁব জীবনদর্শনও একটি সুপরিণত ও সুসঙ্গত রূপ লাভ করেছে। তৃতীয় বা শেষ পর্বে কবি 'ছায়াবাদে'র (Romanticism) নব আন্দোলনেব সঙ্গে সুব মিলিয়েছেন। এখানে তাঁর গীতিকবিতার অফুরন্ত উৎসার। 'ঝঙ্কার' তাঁর এই পর্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার সঙ্কলন।

মৈথিলীশবণের কবিমানসের এই বিবর্তনে গতিশীলতাই সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হিন্দী সাহিত্যেব প্রামাণিক ইতিহাস-রচয়িতা আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন ঃ

> 'গুপ্তজীব প্রতিভার সবচেযে বড বিশেষত্ব হ'ল তাঁর কালানুসরণেব ক্ষমতা অর্থাৎ উত্তবোত্তব পরিবর্তনশীল ধ্যানধারণা ও কাব্যকলা গ্রহণ করাব ক্ষমতা। এদিক থেকে হিন্দীভাষী জনগণের তিনি প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, তাতে সন্দেহ নেই।'—হিন্দী সাহিত্ কা ইতিহাস, পৃঃ ৬১৬।

হিন্দী সাহিত্যেব এই প্রতিনিধিস্থানীয় কবি নবাগতকে চিবকাল উদারচিত্তে স্বাগত জানিযে গেছেন আমাদেব কবিগুরুর মতই।

২. মধুসূদন ও মৈথিলীশরণ : সম্পর্ক নির্ণয়

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ফলশ্রুতি সারা ভারতের প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য। বাংলার সাহিত্যিক অভ্যুত্থানের কেন্দ্র বিন্দু থেকে তরঙ্গবৃত্ত ছড়াতে দেখেছি ভারতভূমির চতুর্দিকে। বাংলা গদ্যে বঙ্কিম এবং কাব্যে মধুসূদন যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন তার প্রভাব ভারতের অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চার করল। বাংলার সাহিত্যদীক্ষাকে বরণ করে নিয়ে হিন্দী সাহিত্যে নবযুগের জন্মদাতা ভারতেন্দুজী স্মরণীয় উক্তি করেছিলেন—

"আমাদের সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড় বোন বাংলা ভাষার অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডারের সহাযতায় হিন্দী ভাষা নিজের প্রভূত উন্নতি সাধন করুক।"

এই কাজে ভারতেন্দুজী নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন, হিন্দীতে অনুবাদ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহনের বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দর'। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে একই ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত হত বাংলা "প্রবাসী" এবং হিন্দী "সরস্বতী"। শোনা যায় দ্বিবেদীজী সরস্বতীকে গড়ে তুলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর আদর্শেই। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উর্দূ অনুবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন হিন্দীর কথাসাহিত্য সম্রাট প্রেমচাঁদ। হিন্দী বাংলার এই সখ্যের বন্ধনকেই দৃঢ়তর কবেছেন একালের বাষ্ট্রকবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। মহাকবি মধুসূদনের কাব্যের প্রতি গুপ্তজীর গভীর অনুরাগ ও সক্রিয় শ্রদ্ধা এই আত্মীয়তাকে করেছে আরো ব্যাপক, আবো নিবিড়। দুজনেব কবি ধর্মের আশ্চর্য সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে। গুপ্তজী এবং মধুকবি দুজনেই আমাদেব কাছে মহাকবি—প্রধানভাবে মহাকাব্যের কবি বলে পরিচিত। একালে সাহিত্যিক মহাকাব্য বলতে আমরা যা বুঝি, বলতে গেলে মধুকবিই বাংলা সাহিত্যে তার প্রথম ও একক সার্থক রচয়িতা। ভারতচন্দ্র পর্যন্ত চলে এসেছে মধ্যযুগের ধারা, সেখানে মঙ্গলকাব্যেব মধ্যে মহাকাব্যের লক্ষণ দু'একটি পেলেও কোন মঙ্গলকাব্যকেই সত্যিকারের সাহিত্যিক মহাকাব্য বলতে পাবি না। ভারতচন্দ্রর পর ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বস্তুধর্মী খণ্ডকবিতারই রচয়িতা। মধুসূদনের আগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য পাই না, পরেও হেম-নবীনের যে কটি মহাকাব্য পাই, তাদেব কোনোটিতেই মধুসূদনের তুল্য সফলতার নিদর্শন নেই। মধুসূদনের মেঘনাদবধই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং অতুলনীয় মহাকাব্যের মর্যাদা আজো পেয়ে আসছে।

হিন্দী সাহিত্যেও দেখতে পাই, 'বীর গাথা' পর্বে বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও যথার্থ সাহিত্যিক মহাকাব্যের জন্ম আধুনিক কালেই, মৈথিলীশরণ গুপ্তের হাতে। বিশেষত আজকে আমরা হিন্দী ভাষা বলতে যে খড়িবোলীকে বুঝে থাকি কবিতার ক্ষেত্রে তার যথার্থ প্রয়োগ শুরু হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিবেদীজীর হাতে 'সরস্বতী' সম্পাদনার ভার আসার পর থেকেই। 'সরস্বতী-গোষ্ঠী' বা "দ্বিবেদী মণ্ডলে" যে কবিরা এসে মিলেছিলেন গুপ্তজী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ গোষ্ঠীতে আরো ছিলেন রামনরেশ

ত্রিপাঠী, মন্মথ দ্বিবেদী, রামচরিত উপাধ্যায়, রামনারায়ণ পাণ্ডে আর সিয়ারামশরণ গুপ্ত। দীর্ঘ কাহিনীকাব্য এঁদের অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু মৈথিলীশরণ ছাড়া আর কেউ সাহিত্যিক মহাকাব্যের জন্ম দিতে পারেন নি। এঁদের অল্প পূর্ববর্তী কবি অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের 'প্রিয়প্রবাস' খড়ীবোলীর বৃহত্তম কাব্য হলেও মহাকাব্যের গুণধর্ম এতে প্রায় নেই বললেই হয়। বাস্তবিক গুপ্তজীর সাকেতকেই প্রথম সাহিত্যিক মহাকাব্য বলা যায়। কিন্তু মধুকবির মেঘনাদবধ যেমন একাধারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ এপিক, গুপ্তজীর সাকেত তেমন খড়িবোলীর প্রথম এপিক হলেও শ্রেষ্ঠত্ব তার অবিসংবাদিত নয়। অবিশ্যি মনে রাখতে হবে, হিন্দী সাহিত্যের মহাকাব্য ক্রমশ ক্লাসিক মানদণ্ডের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে এবং প্রসাদজীর 'কামায়নী' ক্লাসিক বিধিবন্ধন থেকে সরে এলেও আজ হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সুমহান এপিক বলে স্বীকৃত।

বহিরঙ্গের দিক থেকে সাকেত ক্লাসিক আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। এর সর্গবন্ধ বিপুল আয়তন মহাকাব্যের ক্লাসিক মানদণ্ডকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আন্তরধর্মে সাকেতের মধ্যে মহাকাব্যিক উপাদান খুব বেশী পাই না। সাকেতের ভাব-পরিমণ্ডলে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে কিন্তু সেই উচ্চতা ও দৃঢ় পিনদ্ধতার অভাব দেখতে পাই। রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন থেকে চিত্রকূটে রাম ভরত মিলন পর্যন্ত প্রথম আটসর্গের বিস্তৃত ঘটনা যেন পরবর্তী দু সর্গে লক্ষ্মণ-বিরহবিধূরা উর্মিলার বিয়োগ বেদনার চিত্রণের জন্যেই আয়োজিত মনে হয়। বস্তুত মহাকবি নির্দেশিত 'কাব্যে উপেক্ষিতা' উর্মিলার অন্তর্বেদনার চিত্রণই এই কাব্যরচনার মূল প্রেরণা। নানা দিক থেকে সাকেতের সফলতা আংশিক। কারণ কবি ক্রমশ লিরিক কবিসুলভ অন্তর্মুখীনতা, কোমলতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই মহাকাব্যের রচনা হয়, কবি যখন তাঁর কাব্যজীবনের তৃতীয় পর্বে প্রবেশের মুখে, যখন তাঁর প্রতিভা বস্তুনিষ্ঠ বীররসাত্মক কাব্যধারা ছেড়ে ছায়াবাদের কবিদের মত গীতিকবিতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে।

গুপ্তজীর মহাকাব্যের এই আকৃতি ও প্রকৃতি মধুকবির মহাকাব্যের সঙ্গে আশ্চর্য সাধর্ম বহন করে। 'গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'—এই সঙ্কল্প নিয়ে মেঘনাদের পরিকল্পনা হলেও এর প্রাণ মূলে একটি গীতিকাব্যিক কোমলতা ফল্গু প্রবাহের মত বয়ে চলেছে।

মনে হয় মধুকবি ও গুপ্তজী—এই দুই মহাকবি জন্মগত ভাবেই লিরিক প্রতিভার অধিকারী অথচ আত্মপ্রকাশ করেছেন মহাকাব্যের আধারে। অবশ্য কবিধর্মের প্রাণকেন্দ্রে এঁরা সমগোত্রীয় হলেও সৃষ্টি বৈচিত্র্যে এঁদের স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য নয়। ক্লাসিক-রোমান্টিক, এপিক লিরিক প্রভৃতি ভিন্নমুখী ধারার মিলন হলেও মধুকবির কবিধর্মের এক এক দিক অধিকাংশ সময় আত্মপ্রকাশ করেছে স্বতন্ত্র আকারে। তাঁর সৃষ্টিতে তাই বৈচিত্র্য আছে, নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা ও লিরিকের বিচিত্র সাহিত্যশাখায় তাঁর প্রতিভার পদসঞ্চার। মৈথিলীশরণের সৃষ্টিতে তেমন বহুমুখী বৈচিত্র্য নেই। বীর গাথা, মহাকাব্য এবং সামান্য গীতিকবিতাতেই তাঁর কবিধর্মের ভিন্নমুখী বৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। একই রচনায় তাই এপিক লিরিক, কাব্যিক-নাট্যিক প্রভৃতি প্রেরণা মিলিত

হয়েছে। 'যশোধরা' তাই খানিকটা এপিক ধর্মী কাহিনীকাব্য অথচ নাট্যাঙ্গিকে লিখিত।

মধুকবির প্রতিভা ধূমকেতুব মতো, দীপ্ত অথচ ক্ষণস্থায়ী। তাঁর কবিজীবনের প্রসার পাঁচ ছ বছর মাত্র। কিন্তু গুপ্তজীর সৃষ্টি জীবন অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপ্ত। আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের মতে তাঁর প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কালানুসরণ। সাহিত্যের যুগধর্ম অনুসারে তিনি প্রথম জীবনে কাব্যে খড়িবোলীর ব্যবহারে মসৃণতা আনয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মধ্যপর্বে আসে তাঁর মধুসূদনের প্রতি গভীর অনুরাগ, তখন মেঘনাদবধ ব্রজাঙ্গনার অনুবাদে তাঁকে ব্যস্ত দেখতে পাই। এর পূর্বেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং সাকেত ও যশোধরার জন্ম। এরপর তৃতীয় পর্বে তাঁর মধ্যে ছায়াবাদের প্রবণতা। কবি গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন।

মানবতাবাদ ও জাতীয় ঐতিহ্যে গভীর শ্রদ্ধা উনিশ শতকের এই দুই যুগবাণী মধুসূদনের পরিণত জীবনচিন্তার দুই মূল সূত্র। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর মনোভাব অনেকের কাছে প্রশ্নাধীন মনে হলেও ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ অনলস। অবশ্য মধুকবি মুখ্যত মানবতাবাদী। মানবতার দৃষ্টিতেই তিনি রাবণের অন্তর্বেদনার রসোদ্ধারে ব্রতী, তথাকথিত সমাজশাসনে নিন্দিত তারা-সূর্পনখা-উর্বশী-জনার মত পৌরাণিক নায়িকাদের ব্যক্তিমহিমা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল। মধুসূদনের জীবন দৃষ্টির এই দুই মন্ত্রই মৈথিলীশরণের জীবনদর্শনে পরিস্ফুট। মুখ্যত তিনি জাতীয়তাবাদী কিন্তু মানবতার মহিমা তাঁর কাছেও সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত। সাকেতের নায়িকা উর্মিলাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানবীয়তার দাবীতেই। এই কাব্যে রামচন্দ্রের চরিত্রে মানবীয়তার আরোপ আরো লক্ষণীয়। রামচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—পৃথিবীতে এসেছি আমি স্বর্গের মহিমা কীর্তন করতে নয়, পৃথিবীকেই স্বর্গোপম করে গড়ে তুলতে'—

"সন্দেশ য়হাঁ মৈঁ নহীঁ স্বর্গ কা লায়া।
ইস ভূতল কো হী স্বর্গ বনানে আয়া।"

যশোধরায় এই মানবীয়তা ভারত-আত্মার স্বধর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়েও এক অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভগবান তথাগত যশোধরাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে গোপনে সংসার ত্যাগ করলেন। যশোধরার আক্ষেপ শুধু এই—তিনি যদি আমায় বলে যেতেন, সখি, তবে আমি কি তাঁর মহত্তর জীবনসিদ্ধির পথে বাধা দিতাম? আমায় তিনি এত ভালবাসতেন, তবু আমায় তিনি চিনতে পারলেন না!" তাই তথাগত যখন ফিরে এলেন সিদ্ধি লাভ করে, যশোধরা তখন অভিমান করে রইলেন। তিনি নিজে এসে তাঁর মানভঞ্জন না করলে যশোধরা নিজে গিয়ে কথা বলবেন না। তথাগত তাই নিজে এলেন ছোট হয়ে, মেনে নিলেন মানবী প্রিয়ার মানবীয় দাবী।

"মানিনি, মান তজো লো রহী তুম্‌হারী বান্।"

এখানে নারীর ব্যক্তিমূল্যও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মনে পড়ে মধুকবিতেই উনবিংশ শতাব্দীর নারীমূল্য স্বীকৃতির প্রথম পূর্ণ সাহিত্যিক প্রকাশ হয়েছিল বীরাঙ্গনা কাব্যে।

মধুসূদনের জীবনবীক্ষা ও কাব্যাদর্শের প্রভাব মৈথিলীশরণে যেমন সুস্পষ্ট, তাঁর

কাব্যকলাও তেমনি, বোধ হয় আরো স্পষ্ট ভাবে, গুপ্তজীর কাব্যে ছায়া ফেলেছে। মধুসূদনের কাব্যের অনলস চর্চার ফলে মধুকবির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল যথার্থই বলেছেন মধুসূদনের কাব্যচর্চার ফলে গুপ্তজির ভাষায় এসেছে কোমলতা এবং সরসতা। বর্ণনারীতিতে গুপ্তজী মধুকবির প্রত্যক্ষ পদানুসরণ করেছেন অনেক জায়গায়। পঞ্চবটী বাসের দিনগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে মধুকবির সীতা বলেছেন—

"যাগাত প্রভাতে মোরে কুহেরি সুস্বরে
পিক রাজ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্ত- বিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর নর্ত্তক নর্ত্তকী
এ দোহর সম, রমা, আছে কি জগতে?"

পক্ষান্তরে লক্ষ্য করুন গুপ্তজীকে—

"বৈতালিক বিহঙ্গ ভাভীকে
সম্প্রতি ধ্যান মগ্ন সে হ্যাঁয়,
নয়ে গান কী রচনা মেঁ ওয়ে
কবি-কুল তুল্য মগ্ন-সে হ্যাঁয়।
নাঁচ নাঁচ মে নর্ত্তকী কেকী
মানো য়হ্ কহ দৈত্যে হ্যায়—
মৈঁ তো প্রস্তুত হুঁ, দেঁখে কল
কৌন্ বড়াই লেতা হ্যায়।"- -পঞ্চবটী—

প্রকৃতি বর্ণনায় এই উপকরণ সাদৃশ্য অনেকটা অনুবাদের মত শোনায়, অথচ 'পঞ্চবটী' গুপ্তজীর মৌলিক কাব্য! প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার চিত্রণেও গুপ্তজী মধুকবিরই অনুসারী। মেঘনাদবধের রচনাশৈলী মৈথিলীশরণের কাব্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার শুধু মেঘনাদবধের অনুবাদেই নয়, গুপ্তজী নিজের মৌলিক রচনাতেও করেছেন।

জীবন দৃষ্টি, কবিধর্ম এবং আঙ্গিকের দিক থেকে গুপ্তজীর কাব্যে মধুকবির অনুপ্রবেশ হয়েছে নানাভাবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে মৈথিলীশরণের কাব্যমহিমা এতে কিছুমাত্র কমেনি। মধুকবি ছিলেন গুপ্তজীর পূর্বসূরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাছে যে জীবনদীক্ষা মধুসূদন নিয়েছিলেন মধুসূদনের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীতে তা-ই মৈথিলীশরণে সঞ্চারিত। এই দীক্ষা এক অর্থে মহৎ ঐতিহ্যের কাছে একজন মহান সারস্বত পুরুষের শ্রদ্ধা নিবেদন। এই শ্রদ্ধা মৈথিলীশরণের সংস্কৃতিচেতনায় প্রসারতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদন ছিলেন যুগপ্রবর্তক, তাঁর পথপ্রদর্শন সংস্কৃতি-মানস মাত্রকেই আকৃষ্ট করবে। এখানেই তাঁরও সার্থকতা, এখানেই সাহিত্য প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। *(সুমন রায়চৌধুরী ছদ্মনামে পূর্বে প্রকাশিত)*

৩. শেক্‌স্‌পীয়র : জীবনচেতনার ত্রয়ী উপাদান

"About any one so great as Shakespeare it is probable that we can never be right; and if we can never be right, it is better that we should from time to time change our way of being wrong"—T. S. Eliot

নিখুঁত নাট্যকলার জন্যে ততখানি নয়, যতখানি ব্যাপক বৃহৎ জীবনচেতনার জন্যে শেক্‌স্‌পীয়রের অমরত্বের দাবী। বিশ্বজীবনের এমন বিপুল বৈচিত্র্য, মানবজীবনের এমন বহুমুখী রূপ পৃথিবীর কয়েকজন মাত্র মহাকবির চেতনায় বিধৃত। শেক্‌স্‌পীয়রের দৃষ্টিতে এই বিরাট বিশ্ব একটি নাট্যমঞ্চ, একথা যতখানি সত্য তার চেয়েও বেশী সত্য, তাঁর নাট্যসাহিত্যই একটা বিরাট বিশ্বস্বরূপ। শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টি-মানসের যে কেন্দ্র থেকে বিচিত্র বিরাটের এমন বিস্ফোরণ সম্ভব হয়েছে তার মুলে তিনটি মৌল উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণ আশা করা যায়—কবির আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা, যুগগত চেতনাব রসসিঞ্চন এবং কবি-আত্মার নিজস্ব মায়াশক্তি। এই ত্রয়ী উপাদানের স্বরূপ-সন্ধানে সৃষ্টি-রূপের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির সামগ্রিক ভাষ্য রচনা অবশ্যই আমাদের দাবী নয়, কিন্তু সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটনে তার সাহায্য অনস্বীকার্য।

বিশ্বজীবনের কথা যিনি বলেছেন এত বিচিত্র রূপে, আত্মজীবন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ মৌন। নিজের সৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কোন প্রক্ষেপ নেই, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা পরোক্ষে কাব্যসৃষ্টিতে রসসিঞ্চন করে, কবিমানসের মাধুরী মিশেই সৃষ্টি একদিকে যেমন হয়ে ওঠে অনন্য, অন্যদিকে তেমনি প্রাণপূর্ণ। শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যচেতনার সংগঠনে তাঁর জীবনের অবদান কম নয়। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আকস্মিক উত্থান ও অপ্রত্যাশিত পতন, বিরুদ্ধ পরিবেশ ও সমস্যার সংগে তীব্র সংঘর্ষ ও প্রচণ্ড গতিশীলতা—নাটকীয়তার এই সব কটি উপাদানের অপূর্ব যোগাযোগ ঘটেছিল মহাকবির নিজেব জীবনেই। গণজীবনের সঙ্গে যে নিবিড় যোগ তাঁর নাট্যাবলীকে বিচিত্র প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত করেছে তা তিনি পেয়েছিলেন পিতৃসূত্রেই। স্ট্রাটফোর্ডের কাছে স্নিথর্ফিল্ডের ছোট পল্লীতে তাঁর পিতামহ রিচার্ড শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন গণসাধারণেরই নিম্নবিত্ত অত্যন্ত সাধারণ একজন কৃষক। এই দরিদ্র পরিবারে জন্মেই শেক্‌স্‌পীয়রের পিতা জন শেক্‌স্‌পীয়র ব্যবসাসূত্রে নিজের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধন করেন। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তিও পেলেন, অল্ডারম্যান ও মেয়র নির্বাচিত হলেন। কিন্তু পরে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে এল। ফলে কিশোর শেক্‌স্‌পীয়রকে স্কুল ছেড়ে পিতার ব্যবসায়ে মন দিতে হল। এমনি করে সুখ দুঃখ, প্রতিষ্ঠা ও অসম্মান, নানা বিরোধী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে কবিকে প্রথম থেকেই। একদিন যিনি প্রখ্যাত ব্যবসায়ীর পুত্রের প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, মেয়রের পুত্র বলে লোকে যাঁকে সমীহ করে চলেছে, তাঁরই ভাগ্যে চরম দুঃখ জুটেছিল। স্কুল মাস্টারি করে সংসার চালাতে হয়েছে। এমন গল্পও

শোনা যায় যে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই অভাব ও অসম্মান তাঁর জীবনে ঈশ্বরের প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদরূপে এল। সংসারের দুঃখেই হোক, কিংবা চুরির অভিযোগ এড়াবার জন্যেই হোক, পল্লী ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে শহরে চলে আসতে হল তাঁকে। সেখানে ভাগ্যলক্ষ্মী অপেক্ষা করেছিলেন তাঁর কণ্ঠে সাফল্যের মালা পরিয়ে দেবার জন্যে। থিয়েটারে প্রথমে অভিনেতারূপে যোগদান করেছিলেন, পরে নাট্যকারের সম্মান পেলেন তিনি।

তাঁর জীবন-কথা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর সৃষ্টিতে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আস্বাদ পাই, যে বহুবিধ চরিত্র ও ঘটনাবলীর যোগাযোগ দেখি, মানবনিয়তির উত্থান-পতনের যে রূপ দেখে জীবনরহস্যের অভ্যন্তরে তলিয়ে যাই, জীবনের লঘু হাস্যচপল এবং গভীর করুণ দিকের যে রূপায়ণ দেখি, তার অধিকাংশ কবির ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার রসসিঞ্চনে পল্লবিত বিকশিত। আপনার ভাগ্য আপনি জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। আত্মজীবনে পুরুষকারের এই প্রতিষ্ঠা তাঁকে শিখিয়েছিল—ভাগ্যের নির্মাতা মানুষ নিজে, কোন অন্ধ নিয়তি বা দৈব নয়। শেক্‌স্‌পীয়রীয় এই জীবনচেতনা থেকেই এই সূত্র আসে "Our remedies oft in ourselves do lie, which we ascribe to heaven"—All's well that Ends well গ্রীক ট্রাজেডিতে নায়কের উত্থান পতন নিয়ন্ত্রিত হত অন্ধ নিয়তি (নেমেসিস) দ্বারা। শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্রাজেডির নায়কের উত্থান-পতনের বীজ কোন দৈবনিয়তির মধ্যে নেই, আছে পুরুষকারেরই মধ্যে, চরিত্রের নিজস্ব কোন দুর্বলতার ছিদ্রে। শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্রাজেডির এই মূলসূত্র অনেকখানিই তাঁর নিজের জীবন থেকে গৃহীত বলা যায়।

আবার কোন ব্যক্তিজীবনই যুগ-বিবিক্ত বা সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। কারণ মার্ক্‌স্‌ নিজে ব্যাখ্যা করেছেন, Man adapts his all-sided being in an all-sided manner, in other words, as a total man Every one of his human relations with the world seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, thinking contemplating, willing, acting, loving, in short, all the organs of his individuality as well as the organs which in their immediated form are common to all, are in their objective attitude or in their attitude to the object an adoption of the latter The adoption of human reality and its attitude toward the object is the manifestation of human reality human activity and human suffering, for suffering, viewed humanly, is man's self-enjoyment."[১] শেক্‌স্‌পীয়রের পুরুষকারের চেতনার মূলেও নবজাগ্রত ইংল্যাণ্ডের আত্মপ্রত্যয়বোধ, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ ক্রিয়াশীল ছিল। ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘকাল ধরে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপলে রোমান সাম্রাজ্যের শেষ শিখাটি নেবে গেল তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড বায়ুবেগে। দেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়লেন সেখানকার গ্রীক ও রোমান চিন্তাবিদেরা, তাঁদের

১। Karl Marx, "Oekonomisch philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 MEGA, Part 1, Vol 3 pp 118 19 166 67

দর্শন ও সাহিত্য ইউরোপের নানাদেশে নবজীবনের মন্ত্র দিল। গ্রীসের বলিষ্ঠ জীবনবাদ, মানববুদ্ধির মুক্তি ও মহিমা, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের তীব্র অভীপ্সা, ইউরোপে রেনেসাঁসের সূত্রপাতের কারণ। ইংল্যাণ্ডের নবজীবন সূচিত হল সর্ববিধি সমৃদ্ধির মাধ্যমে। চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা হল, রিফর্মেশনের ফলে নতুন নৈতিক মান নির্দিষ্ট হল, ক্লাসিক সাহিত্যের নবচর্চায় আগ্রহ দেখা দিল, তেমনি ভৌগোলিক সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক অভিযান ও নব-নব আবিষ্কার এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য জাতীয় জীবনকে পূর্ণতায় ভরে তুলল। জাতি আত্মশক্তিতে প্রত্যয় ফিরে পেল, সমৃদ্ধির যুগে জীবনের প্রতি, জীবনরসের প্রতি তীব্র মমতা দেখা দিল। জীবনের প্রতি এই তীব্র আসক্তি ও উত্থানের পথে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামে অদম্য উৎসাহ, এই তো শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের বিপুল ফসলের সুযোগ্য ভূমি। জীবনের এই বহুমুখী বিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের এই অগ্নিকামনা জাতীয় জীবনে ছিল বলেই জীবনের এত বিচিত্র রূপ, মানবচরিত্রের এত বহুমুখী ক্রিয়া শেক্‌স্‌পীয়রের কবিমানস কল্পনা করতে পেরেছিল। যুক্তিবাদী নবজাগ্রত জাতি বুঝেছিল মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা বা পতন কোনটিই দৈবনিয়তির অধীন নয়, মানুষের নিজের চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে তার বীজ। শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির এই তত্ত্ব একদিকে যেমন কবির ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার ফল, অন্যদিকে তেমনি একে সমগ্র নবজাগ্রত জাতীয় জীবনেরই অভিজ্ঞতা বলতে পারি। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে প্রচণ্ড জীবনাসক্তির মূলে গ্রীক Paganism এর কিছু প্রভাব রেনেসাঁসের মাধ্যমেই পড়েছিল। Pragmatic মনোভঙ্গির মূলেও গ্রীসের মুক্ত বুদ্ধির ছায়াপাতও দুর্লক্ষ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতনকে যদি রেনেসাঁসের বীজ বপনের মর্যাদা দিই তো প্রায় একশ' বছর পরে ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে এলিজাবেথের রাজত্বের সূত্রপাতকে এই বীজের ফলভারাবনত সমৃদ্ধির পূর্ণরূপ বলতে পারি। শেক্‌স্‌পীয়র পূর্ণ মাত্রায় এই সমৃদ্ধির ফলভোগ করেছেন, তাঁর সাহিত্যজীবন ১৫৮৮ থেকে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। একশ' বছর ধরে যে প্রস্তুতি শেক্‌স্‌পীয়রের জন্য চলছিল তাকে কেউ-কেউ যথার্থই incubation period বা লালনের পর্ব বলেছেন। আমাদের দেশে এই incubation period ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবের পতন থেকে রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠা পূর্ব পর্যন্ত। ভারতীয় রেনেসাঁসের সমৃদ্ধির পূর্ণফল রবীন্দ্রনাথে। এখানেও বীজবপন থেকে পূর্ণবিকাশের ব্যবধান প্রায় একশ বছরের।

নবজাগরণের প্রথমাংশে থাকে নানা চিন্তা ও চেষ্টার সংঘর্ষ, উদ্দামতার সঙ্গে উচ্ছ্বাস এবং বিভিন্ন বিবিধ ভাব আদর্শ ও দর্শনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। কোন বিরাট প্রতিভাধর উত্তরপুরুষের শিল্পে ও সাধনায় তার সর্ব্বাঙ্গীণ সমন্বয় সাধিত হয়। ও দেশে এই প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র, এদেশে রবীন্দ্রনাথ। শেক্‌স্‌পীয়র-পূর্ব রেনেসাঁসের পরিচয় প্রসঙ্গে যথার্থই বলা হয়েছে: "**The new conditions favoured a pragmatic outlook and the ideal of self-development through action. But the sixteenth century was restless, in the atmosphere created by the new discoveries and the new wealth, by political upheavals and religious wars, and there**

was no fresh intellectual synthesis... ...Thus it was left to the following century to consolidate the advances in knowledge."[২]

এই সমন্বয় সাধিত হল শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনচেতনায়। বিশ্বচ্ছন্দের পটভূমিকায় স্থাপন করে জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে; বিবিধ পরিণতিকে নানা মত ও পথকে ঐক্যবদ্ধ করলেন তিনি। রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না রেখে দেখালেন মানবসমাজেরই দুই স্তর এই দুইই সত্য। জীবনের তলদেশে দৃষ্টি নিমগ্ন করে দেখলেন একই জীবনবৃক্ষে কত রকমের ফুল ফোটে। আদর্শবাদী ব্রুটাস, আদর্শ লেশহীন ফলষ্টাফ, নৈরাশ্যবাদী টাইমন কিংবা জ্ঞানবৃদ্ধ প্রস্‌পোরো—এরা জীবনেরই এক-একটি দিকের প্রকাশ। এদের কারো একজনের মধ্যে জীবন সীমাবদ্ধ নয়, জীবনদর্শনের কোন একটি 'ফর্মুলা'য় জীবনকে তো বাঁধা যায়না। ফলষ্টাফের কাপুরুষতা ও নীচতা, হ্যামলেটের জিঘাংসা ও আত্মজিজ্ঞাসা, ওথেলোর প্রেম ও প্রতিহিংসা, কিংলিয়রের পিতৃহৃদয় ও উন্মাদনা, ম্যাকবেথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা এসবই মহাজীবনের ছন্দে গ্রথিত। এই মহাজীবন যিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যাঁর কাছে জীবনের কোন লীলারূপই মিথ্যা নয়, তাঁর কোন জীবনদর্শন ছিলনা একথা বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়। বরং বলতে হয় তাঁর জীবনচেতনা উদারতর, ব্যাপকতর। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, এখানে "All truths, even those which seem to be in conflict, have their validity.. ....all philosophies have their value,—if for nothing else, then because they see the Self and the universe from a point of view of the spirit's experience of many sided Manifestation and in doing so shed light on something that has to be known in the infinite."[৩]

এই অনন্ত জীবনের ব্যাখ্যাতা বলেই শেক্‌স্‌পীয়রকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে জীবনদর্শনের অভাবে। বলা বাহুল্য এ অভিযোগ ভ্রান্ত। কোন সুসম্বন্ধ সুসমঞ্জস (coherent) জীবনদর্শন তাঁর যুগের কাছে আশা করা যায় না; নানারকমের জীবনদৃষ্টি, মত ও পথ, এমন কি পরস্পরবিরোধী জীবন-চেতনার পরিচয় আছে তাঁর যুগের ইংল্যাণ্ডে। তবু নিজের যুগকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে শুধু রিপোর্টারের কাজ করেন নি শেক্‌স্‌পীয়র। জীবনের বিচিত্র তথ্যকে ব্যাখ্যাতার দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে মৌলিক ঐক্য আবিষ্কার করেছে কবি-আত্মার সেই দুর্লক্ষ্য মায়াশক্তি। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই ঐক্যসন্ধানী ব্যাখ্যাতার প্রতিভা ছিল না বলেই শেক্‌স্‌পীয়রের সমসাময়িক নাট্যকারেরা যুগগত সৃষ্টির সীমাতেই আবদ্ধ হয়ে রইলেন, আর ব্যাখ্যাতার দৃষ্টিভঙ্গি (interpretative vision') ছিল বলেই কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির সাফল্য শেক্‌স্‌পীয়রের সাধ্যায়ত্ত হল।[৪]

শেক্‌স্‌পীয়রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে টি. এস. এলিয়টও অনেকটা একই কথা বলেছেন: "It has been said that Shakespeare lacks unity; it might, I think, be said equally well that it is Shakespeare chiefly that

২। The Pelican Guide to English Literature, Vol II, edited by Boris Ford, p. 18.

৩। Sri Aurobindo. The Life Divine. -1955, p 559.

৪। Sri Aurobindo: The Future Poetry, 1953, p. 93.

is the unity, that unifies as far as they could be unified all the tendencies of a time that certainly lacked unity"[৫]

যুগের এবং জীবনের বিচিত্র রূপ ও বিচ্ছিন্ন প্রবণতাকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রেই কবিচেতনায় তৃতীয় একটি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। এ হল কবি-আত্মার সেই সৃজনশীল মায়াশক্তি (Creative power)—যা কবির জীবন চেতনাকে বিশ্বচ্ছন্দের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, মহাজীবনেব মূল সুরটি ধরিয়ে দেয়, কবিমানসকে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের গভীরতম মৌল সত্যের ভূমিতে। কবি উপলব্ধি করেন জীবনের যা মূল বৃত্তি গভীরতম এষণা তা কোন কালে সীমাবদ্ধ নয়, কোন ব্যক্তিতে বাধিত নয়। যুগের ও জীবনের যে বহুমুখী প্রবণতা ও বিকাশ তা এই মৌলিক সত্যেরই পাত্রভেদে কালভেদে বিচিত্ররূপে প্রকাশ মাত্র। এই মৌল সত্যের উপরে শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনচেতনার অধিষ্ঠান ছিল বলে শুধু একটি যুগেরই বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে তিনি ঐক্য আবিষ্কার করেন নি, একটি যুগের সঙ্গে পরবর্তী যুগের যোগ সাধনও তিনি করেছেন।

শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের বিষযের সঙ্গে আজকের সমস্যার কোন যোগ নেই, তাই আধুনিক মানুষের কাছে শেক্‌স্‌পীয়র অচল: শেক্‌স্‌পীয়রেব বিরুদ্ধে বার্ণার্ড শ'র এই ছিল প্রধান অভিযোগ। কিন্তু এ অভিযোগ তাঁকে স্পর্শ কবতে পারেনি, তাঁর নাটকের সমস্যা অতীতের নয়, বর্তমানেরও নয়, চিরকালের বলেই। জীবনের যে অংশ সঞ্চারী তা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যে অংশ স্থায়ী তাই হল মৌলবৃত্তি। সাহিত্যের উপজীব্য শুধু সঞ্চারী হলে তা যুগগত হতে বাধ্য। সাহিত্যে স্থায়ী জীবনবৃত্তিই তাকে যুগান্তরের দ্বারে পৌঁছে দেয়। কালোত্তীর্ণ সাহিত্য শাশ্বত জীবনবৃত্তিব সঙ্গে যুগের সঞ্চাবী জীবনরূপেরও কিছু ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী। উত্তরকালের কাছে সেই সঞ্চারী অংশটুকু পূর্ণ রসাবেদন সৃষ্টি করতে পাবেনা। কিন্তু তাব বাধাটুকু সরিয়ে অন্তরে প্রবেশ করলে জীবনেরই শাশ্বত হৃদয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে। স্বীকার করে নিতে বাধা নেই সমস্ত মহাকবির মত শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনচেতনায়ও সঞ্চারী যুগচিত্র অনুপস্থিত নয়, কিন্তু যুগান্তরের পাঠকের কাছে তাঁর চিরন্তন জীবন-রহস্যের আবেদন তো চিরকালই অমর।

৫। T S Eliot Shakespeare and the Stoicism of Seneca (World Classics, Shakespeare Criticism, Oxford University Press p 224)

৪. শেক্‌স্‌পীয়রীয় ও গ্রীক ট্র্যাজিডি

নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ট্র্যাজিডি যেমন প্রাচীনতম, তেমনি শ্রেষ্ঠতমও। প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ সমালোচক আরিস্ততোতেল ট্র্যাজিডিকে কমেডি ও ফার্সের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ট্র্যাজিডির সেই মর্যাদা অবিসম্বাদিত রয়েছে। বিশ্বের ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য যুগে-যুগে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তনেব ইতিহাসে ট্র্যাজিডির দুটি স্বর্ণযুগের অমরত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রীক ট্র্যাজিডি এবং শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডি— বিশ্বসাহিত্যের এই দুই অবিনশ্বর সম্পদ। স্বভাবতই এদের স্বরূপ ও পার্থক্য রসজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গ্রীক ট্র্যাজিডির সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডিব কালগত ব্যবধান অনেকখানি। শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজিডির পরোক্ষ যোগাযোগও যে ছিল, তাব ও কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়নেব সৌভাগ্য শেক্‌স্‌পীয়রেব হয় নি। পিতার ভাগ্যবিপর্যয়েব ফলে স্কুলের শিক্ষাও তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি। যদিও জনসনের মতে শেক্‌স্‌পীয়র small Latin ও less Greek জানতেন, তবু গ্রীক সাহিত্যের রস গ্রহণের মতো উচ্চশিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, শেক্‌স্‌পীয়বের ট্র্যাজিডিতে গ্রীক ট্র্যাজিডির কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। গ্রীক সাহিত্যদর্শনের পরোক্ষ যাদুস্পর্শে ইউরোপের নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল আর এই নবজাগরণের চরম সমৃদ্ধির যুগে শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্যসাধনা (১৫৮৮—১৬১২)। যতটুকু গ্রীকসংস্কৃতি জাতীয় জীবনের রক্তস্রোতে মিশে গিয়েছিল, তারই পরোক্ষ প্রভাব শেক্‌স্‌পীয়রে পড়ে থাকতে পারে, একে তাই প্রভাব না বলে সাঙ্গীকরণ (assimilation) বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। গ্রীক ট্র্যাজিডির সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির তুলনামূলক আলোচনায় মনে রাখতে হবে, সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য ঠিক এই কারণেই বেশি। সাদৃশ্য দেখিয়ে প্রভাব নির্ণয়, বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে আমাদেব দাবী হতে পারে না। তুলনায় স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রাথমিক প্রয়াসই লক্ষণীয়।

গ্রীক ট্র্যাজিডি ও শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডিব অভিনয়-উপলক্ষ স্বতন্ত্র। দৃশ্যকাব্যের মান ও স্বরূপ অভিনয়-সাপেক্ষ বলেই উপলক্ষের স্বাতন্ত্র্য শিল্পকর্মের স্বরূপ অনেকখানিই নিয়ন্ত্রিত করেছে। গ্রীক ট্র্যাজিডি ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। পূজাপার্বণ, ধর্মীয় উৎসবের পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হত গ্রীক ট্র্যাজিডি অভিনয় করে। গিলবার্ট মারে, ট্রেভেলিয়ান, শেফার্ড, নরউড্, হেগ — গ্রীক ট্র্যাজিডির এই বিশেষজ্ঞদের সকলেরই সাক্ষ্য নিয়ে বলা যায়, উপলক্ষের এই পবিত্রতা বজায় রাখতে গিয়ে শিল্পকর্মকে অনেকখানিই ধর্মভাবাপন্ন হতে হয়েছে।

অন্যদিকে শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির উপলক্ষ সম্পূর্ণ পৃথক। ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠার অধিকারী শেক্‌স্‌পীয়র যখন মহারাণী এলিজাবেথের দ্বারা পুরস্কৃত হলেন রাজদরবারে তখন থেকেই তাঁর নাটকের চাহিদা বেড়ে গেল। প্রথম জেম্‌সের সময়ে কোনো রাজকীয় উৎসবই পরিপূর্ণ হত না শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় ছাড়া। এই সময়টাই শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির সুবর্ণযুগ। স্পষ্টতই শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির উপলক্ষ ধর্মীয় নয়, রাজকীয়; এর স্বরূপ তাই সাত্ত্বিক নয়, রাজসিক। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্রতা

ও গাম্ভীর্য যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য গ্রীক ট্র্যাজিডিতে জীবনের প্রচণ্ড উগ্র রূপ পরিত্যক্ত হয়েছে। কামনার উদ্দামতা, জীবনের উচ্ছলতা সেখানে প্রশান্তি নষ্ট করতে পারে না। এমনকি গ্রীক্ ট্র্যাজিডিতে এই কারণে যুদ্ধ ও মৃত্যুর মত উগ্র ঘটনা যতদূর সম্ভব নেপথ্যে ঘটান হয়েছে। শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজিডি কিন্তু জীবনরসিক সংগ্রামী মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার সংঘর্ষে রক্তবর্ণ। প্রাণময় মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রেম ও ব্যর্থতা, স্নেহ ও প্রতিহিংসার যুগপৎ আকর্ষণে প্রচণ্ড ক্রিয়াশীল। শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডিতে মৃত্যু অপরিহার্য।

ঠিক এই কারণে গ্রীক ট্র্যাজিডিকে যদি ব্রাহ্মণ্য জীবনরসের কাব্য বলি, তবে শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডিকে ক্ষাত্রজীবনাবেগের কাব্য বলব। গ্রীক নাট্যকারের দৃষ্টি যতখানি স্রষ্টার দৃষ্টি, ততখানিই দার্শনিকের দৃষ্টি। জীবনের ব্যাখ্যাতা শেক্‌স্‌পীয়র কিন্তু জীবন-রসিক, ঠিক জীবন-দার্শনিক নন। জীবন-রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করেই শেক্‌স্‌পীরীয় রসতৃপ্ত, গ্রীক নাট্যকারেরা জীবন-সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব নিজের হাতেই রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই গ্রীক ট্র্যাজিডিতে একটি নীতিধর্মের সুর অনুরণিত হয়েছে। বরং বলা যায়, এই সুর প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিডির অন্যতম বৈশিষ্ট্য:

This latter characteristic—this ethical elevation of tone and purpose—is perhaps the most salient feature in the ancient drama, and it is one which was fostered by the circumstances of the time [১]

অবশ্য এই নীতির সুর নাটকের সাহিত্য-গুণ ক্ষুণ্ণ করেনি। জীবনের রহস্য-সন্ধানী যিনি, জীবন সম্পর্কে একটা জীবন-দর্শন তাঁর গড়ে ওঠা স্বাভাবিকই। এই জীবন-দর্শনকে আপন অনুভূতির রসে জারিত করে যিনি শিল্পরূপ দিতে পারেন, ধর্মনীতি বা আদর্শ তাঁর সাহিত্যকে স্বধর্মভ্রষ্ট করতে পারে না, যেমন পারেনি রবীন্দ্রনাথে, তলস্তয়ে, রোঁমা রোঁলায় কিংবা ইয়েট্‌সে। গ্রীক ট্র্যাজিডির রচয়িতাদের ক্ষেত্রে একথা সত্য বলেই রসজ্ঞ মানসে আজও তার অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ:

Beauty, no less than truth and impressiveness, was the constant aim of the ancient tragic writers [২]

গ্রীক ট্র্যাজিডি ভাবপ্রধান ও চিন্তাপ্রধান, শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডি ঘটনাপ্রধান ও আবেগ প্রধান। এই জন্যে গ্রীক ট্র্যাজিডিতে আবৃত্তির ভাগ বেশি, শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিডিতে অভিনয়ের ভাগ বেশি।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পূর্ণফল ভোগ করেছেন শেক্‌স্‌পীয়র। ক্লাসিক সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে চিন্তাগত সমৃদ্ধি, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও জীবনপ্রেম—ইউরোপের নবজাগরণের এই সবকটি সূত্র শেক্‌স্‌পীয়রকে নতুন জীবন-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আর্থিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে যে পূর্ণ বিকাশ সূচিত হয়েছিল, তার পটভূমিকায় স্থাপিত ছিল বলেই শেক্‌স্‌পীয়রের রোমাণ্টিক দৃষ্টি জীবনের এত বিচিত্র রূপ, এত ঘটনা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কল্পনা করতে পেরেছিল। জীবনের এই বিচিত্র বৈভবকে শেক্‌স্‌পীয়র ক্লাসিক সাহিত্যের সংযত আধারে ঢালতে পারেন নি। কিন্তু গ্রীক নাট্যকারেরা মূলত ক্লাসিক যুগের সাহিত্যস্রষ্টা, জীবনভাবনা ও

১। A E Haigh 'The Tragic Drama of the Greeks

২। Ibid

প্রকাশকলা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা সংযম ও সংহতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। স্থান, কাল ও ঘটনার ত্রয়ী ঐক্য গ্রীক ট্র্যাজিডির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ত্রিবিধ ঐক্য বজায় রাখতে গিয়ে গল্পের অংশ সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে, চরিত্রসংখ্যা করতে হয়েছে স্বল্প। গ্রীক নাট্যকারেরা নাটকে তাই উপকাহিনী যোজনায় উৎসাহী ছিলেন না। শেক্‌স্‌পীয়র কিন্তু টেম্পেস্ট ও আরো দু একটি নাটক ছাড়া স্থান-কাল ঘটনার ঐক্য কোথাও রক্ষা করেন নি। তিনিই প্রথম দেখালেন, নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী যোজনায় ঘটনার ঐক্য তো নষ্ট হয়ই না, বরং কখনো বৈপরীত্য কখনো সাদৃশ্যের সহযোগে মূলরস স্ফুটতর হয়ে ওঠে।

বসের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যে গ্রীক নাট্যকারেরা ট্র্যাজিডিতে প্রায়ই হাস্যরসের সমাবেশ করেন নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসাবে করুণারসাত্মক নাটকে হাস্যরসেব যোগান দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়ব বৈচিত্র্য সাধন কবলেন। শেক্‌স্‌পীয়রীয ট্র্যাজিডির এই বৈশিষ্ট্য মধুসূদন বুঝেছিলেন এবং অনুসবণ কবেছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একটি চিঠিতে বলেছেন ঃ

"... never strive to be comic in a tragedy, but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety This I believe to be Shakespeare's plan."

ক্লাসিক নাট্যকার গ্রীক ট্র্যাজিডির রচয়িতাবা চরিত্রকে যতদূর সম্ভব ঋজু ও একমুখী করেছেন। জীবনের এক-একটি মৌলিক বৃত্তির প্রকাশ এক-একটি চরিত্রেব বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। শেক্‌স্‌পীযর রোমাণ্টিক নাট্যবার। জীবনধর্মকে সরলবেখায় চিহ্নিত করা রোমাণ্টিক মনোভঙ্গির স্বভাবধর্ম নয। রহস্যময় মানব চরিত্রে আলো-আঁধারি গোধূলি-লগ্নের অস্পষ্টতাই বেশি। মহত্ত্ব ও নীচতা, প্রেম ও প্রতিহিংসা, অপত্যস্নেহ ও ব্যর্থতা, প্রভুভক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জিঘাংসা ও আত্মজিজ্ঞাসা — এমনি কত পরস্পর বিরোধী বৃত্তির দ্বন্দ্বে জটিল মানব-চরিত্র শেক্‌স্‌পীযরেব ট্র্যাজিডির অন্যতম আকর্ষণ।

সভ্যতার আদিম লগ্নেব সংস্কার ও দৈববিশ্বাস গ্রীক ট্র্যাজিডির রচয়িতাদের আচ্ছন্ন করেছিল। ট্র্যাজিডির নায়কের উত্থান-পতন তাঁদের মতে একটি অন্ধ দৈব নিয়তি (নেমেসিস) দ্বারা চালিত। শেক্‌স্‌পীয়র কিন্তু রেনেসাঁস ও বিফর্মেশনের নতুন মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠা—এই যুগ-বৈশিষ্ট্যে তাঁর মনের গঠন স্বতন্ত্র। তিনি দেখলেন, মানব-ভাগ্যের উত্থান কিংবা ট্র্যাজিক পতনের বীজ রয়েছে মানুষের নিজেরই চবিত্রে, তারই দুর্বলতার ছিদ্রে ট্র্যাজিডির অনুপ্রবেশ।

> Men at some time are masters of their fate,
> The fault, dear Brutus, is not on our stars,
> But in ourselves, that we are underlings
>
> —Julius Caesar

গ্রীক ট্র্যাজিডি ও শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডর স্বরূপধর্মের এই পার্থক্য দুটি দূর ব্যবধানগত যুগেরই পার্থক্য ঘোষিত কবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এবং এলিজাবেথের ইংল্যাণ্ড মানবসভ্যতার ইতিহাসে সমৃদ্ধির দুই স্বর্ণযুগ। এই দুই যুগের দুই প্রতিনিধি গ্রীক ট্র্যাজিডি ও শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডি।

৫. সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিয়ট

প্রতিভার মৌলিকতা সমাজ-বিবিক্ত নিঃসঙ্গতার নামান্তর নয়। কারণ সৃজনীশক্তি অনিকেত বা বায়ুভূক্ হয়ে বাঁচতে পারে না। জীবনের এবং বিশেষ করে সমাজ-জীবনের রসভূমিতে তার মূল চলে যায় দুর্লক্ষ্য এক গতিতে অনেক গভীরে এবং সমাজ-জীবনের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য বন্ধনের জন্যেই স্রষ্টার সৃষ্টিতে সমাজের শুধু রসায়িত প্রতিফলনই হয় না, অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ সমাজ-সমীক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সৃজনীশক্তির সঙ্গে মহৎ মনীষার ভাব-সম্মিলন যেখানে হয়েছে অত্যন্ত খাঁটি, সমাজ-চিন্তা সেখানে যেন প্রতিভার আপন দায়িত্বেরই অঙ্গীভূত—যেমন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথে তেমনি টি. এস. এলিয়টে। বিশেষ কালের সৃষ্টি এঁরা শুধু নন, বিশেষ বিশেষ কালের স্রষ্টাও। আর যুগসৃষ্টির জন্যে তাঁদের এই সচেতন দায়িত্বের সার্থকতা তো অনস্বীকার্যই।

কবি এলিয়টের সঙ্গে সমালোচক এলিয়ট অনেকটা পরিচিত এবং কিছুটা ব্যাখ্যাতও হয়েছেন; কিন্তু তাঁর সমাজ ভাবনার পরিচয় আজও প্রায় অনুদ্‌ঘাটিতই। অথচ এলিয়ট সাহিত্য-সমীক্ষায় যেমন, সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুধ্যানেও তেমনি অনলস। এ প্রসঙ্গেও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল তিনি। তাঁর প্রতিভার এই দিকটি কম লোভনীয় নয়।

সংস্কৃতির স্বরূপ-সন্ধানে এলিয়টের দৃষ্টি একাধারে জীবন-নিষ্ঠ ও শিল্পীজনোচিত। 'Culture may even be described simply as that which makes life worth living.'[১] এমনি সংস্কৃতির সংজ্ঞা তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন একাধিকবার; কিন্তু সংস্কৃতির বিকাশের পথনির্দেশ তিনি দিতে চাননি। কারণ সংস্কৃতি কোন একটি দিকের উন্মেষ বা তার ফলশ্রুতির নাম নয়। সমাজ-জীবনের একাধিক স্বতন্ত্র দিকের সুসমঞ্জস বিকাশে সংস্কৃতি আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। সুতরাং সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে আমাদের করণীয় যদি কিছু থাকেই তবে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির পৃথক পৃথক কর্ষণা প্রয়োজন। সেখানেও এই প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বিকাশের দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে; গোটা সংস্কৃতির সৃষ্টি লক্ষ্য করে, আমাদের করার কিছু নেই। এলিয়ট এজন্যে স্পষ্ট করেই বলেছেন—

'.... ..culture is the one thing that we cannot deliberately aim at. It is the product of a variety of more or less harmonious activities, each pursued for its own sake...'[২]

এলিয়টের মতে সংস্কৃতির বিকাশ অনেকটা 'নৈসর্গিক' ব্যাপার যা স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের যা কিছু করণীয় আছে তা হল এই বিকাশের পথে বাধা না দেওয়া এবং এপথে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা দূর করা। অনুমান করা যেতে পারে

১। T S Eliot Notes towards the Definition of Culture, 1948

২। T S Eliot Notes towards the Definition of Culture, 1948.

যে এলিয়ট সমাজ-চৈতন্যের মধ্যে সংস্কৃতির বিকাশের অন্তর্নিহিত শক্তিতে বিশ্বাসী। আবার এই শক্তিকে প্রাকৃতিক বলার তাৎপর্য অবশ্যই এ নয় যে, যা কিছু ঘটবে তা মানব-স্পর্শের বাইরে অলৌকিক কোন ব্যাপার। বাস্তবিক যা ঘটবে তা মানুষের মধ্যে দিয়েই ঘটবে, তবে তা হবে ব্যক্তির বুদ্ধির সচেতন পরিকল্পনা ব্যতিরেকে। সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক পরিপূর্ণতার দিকে সমাজ আপন বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এগিয়ে যায়, এতে মানববুদ্ধির করণীয় কিছু নেই। বোঝা যায় বুদ্ধিবাদী যুগের কবি এলিয়ট এখানে বুদ্ধির সীমা স্বীকার করে নিচ্ছেন।

সংস্কৃতিকে এলিয়ট কোন মৌলিক নয়, যৌগিক বিষয় মনে করেন—সমাজ বিকাশের নানা দিকের এক রাসায়নিক সংমিশ্রণকে সংস্কৃতি বলতে চেয়েছেন। যেহেতু কোন একজন ব্যক্তির মধ্যে এই সমস্ত দিকেরই বিকাশ পূর্ণমাত্রায় হতে পারে না সেহেতু কোন এক ব্যক্তিকে যথার্থ সংস্কৃতিমান বলতে পারি না। আসলে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সমষ্টির মধ্যে, সংস্কৃতির আধার ব্যষ্টি নয়, সমষ্টি। এলিয়টের সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা সুতরাং সম্পূর্ণই সমাজ-সাপেক্ষ। এলিয়টের ভাষাতেই তাঁর মত উদ্ধৃত করা যাক—

'And if we do not find culture in any one of these perfections alone, we must not expect any one person to be accomplished in all of them, we shall come to infer that the wholly cultured individual is a phantasm, and we shall look for culture, not in any individual or in any one group of individuals, but more and more widely, and we are driven in the end to find it in the pattern of the society as a whole.'[৩]

প্রত্যেক ব্যক্তি সমস্ত গুণাবলীর সমান বিকাশে সক্ষম হলে প্রত্যেকে হত স্বয়ংপূর্ণ এবং এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির কোন পার্থক্য থাকত না। ফলে ব্যক্তি ব্যক্তিত্বের তাৎপর্য হারাতো এবং কার্যত সেটা ব্যক্তির উন্নতি নয়, মৃত্যু— যেহেতু সেটা ব্যক্তিত্বের বিলোপ। আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে সমাজ হতো অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং এলিয়ট যে বলেছেন কোন ব্যক্তি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তাতে বুঝতে পারি সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টির গভীরতা। ব্যষ্টির নিজস্বতাকে এতখানি মহিমা একমাত্র ভারতীয় লীলাবাদেই মধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

তা হলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এলিয়টের মতে অচ্ছেদ্য। কিন্তু ব্যক্তিচেতনাকে কখনো সম্পূর্ণরূপে সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উৎপাদন-ফল বলে তিনি স্বীকার করেন নি। সামাজিক বাতাবরণ অবশ্যই ব্যক্তিচৈতন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, সমাজ-প্রভাব ব্যক্তি চৈতন্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়। বরং একদিকে পরিবেশ অন্যদিকে ব্যক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে চলতে থাকে নানা রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—কখনো সংঘর্ষ, কখনো বোঝা-পড়া, কখনো লেন-দেন। এর ফলে উভয়েরই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ হয়। সেদিক থেকে অনেক সময়

৩। T S Eliot Selected Prose (Penguine Book) 1958 p 244

অনুকূল পরিবেশের চেয়ে প্রতিকূল পরিবেশ বেশি সহায়তা করে। পরিবেশ যেমন ব্যক্তিচৈতন্যের নির্মাণে নিজের ছায়া ফেলে যায়, তেমনি ব্যক্তি থেকে উৎসারিত সৃজনীশক্তির স্পর্শ পরিবেশকে নতুন করে রচনা করে।

'It is not necessarily those lands which are the most fertile or most favoured in climate that seem to me the happiest, but those in which a long struggle of adaptation between man and his environment has brought out the best qualities of both, in which the landscape has been moulded by numerous generations of one race, in which the landscape in turn has modified the race to its own character.'[৪]

শেক্‌স্‌পীয়র প্রসঙ্গে যেখানে এলিয়ট আলোচনা করেছেন সেখানেও পরিবেশ ও ব্যক্তিচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর এই সমন্বয়ী ভঙ্গিই প্রধান। তাই দেখা যাবে শেক্‌স্‌পীয়রের সময়ের যুগগত প্রবণতা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষা-পটে বিচার করেছেন, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র-প্রতিভাকে শুধুই এই পরিবেশ-পরিস্থিতির উৎপাদন-ফলরূপে দেখেননি। বরং দেখিয়েছেন পরিবেশ-পরিস্থিতি যা ছিল, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভা তাকে শুধু ধারণ করেনি, তাকে রূপান্তরিত করেছে, পরিবর্তিত করেছে আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে— যে যুগে বহু ভাব ও বিচিত্র আদর্শ ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না, তাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেছে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভাই :

'It has been said that Shakespeare lacks unity; it might, I think, be said equally well that it is Shakespeare chiefly that is the unity, that unifies as far as they could be unified all the tendencies of a time that certainly lacked unity.'[৫]

ব্যক্তিচেতনা হল সমাজ-পরিবেশের ক্রিয়াবলীর উপজাতদ্রব্য বা উৎপাদন-ফল,— দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের এই আলোচনা-রীতির সমর্থন এলিয়টের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। আবার সামাজিক ঘটনাবলীর অস্তিত্ব শুধুই প্রতিভাস বা মায়া—এ তত্ত্বও এলিয়টের নয়। এলিয়ট যথার্থই সমন্বয়পন্থী এবং সেজন্যে তাঁকে বর্তমান যুগের চেয়ে ভাবী যুগেরই কবিমনীষী বলা বেশি যুক্তিযুক্ত।

এলিয়টের কবিদৃষ্টি তাঁর সমাজচিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ সাহিত্য ও সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী। এইজন্যে তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে, আবার সমাজ প্রসঙ্গে একাধিকবার কাব্যচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক অনুধ্যান এলিয়টের সমাজচিন্তার অন্যতম অঙ্গ। সাহিত্য ও সমাজের নিবিড় যোগ প্রশ্নাতীত, কিন্তু এ সম্পর্কের প্রকৃতি অবশ্যই প্রশ্নাধীন। বিকাশের গতি এদের একমুখী অথবা বিপরীতমুখী—এ ভাবনা চিরকালের মনীষাকে স্পর্শ করেছে।

৪। T S Eliot After Strange Gods, 1934.

৫। T S Eliot Shakespeare and the Stoicism of Seneca (World Classics, Shakespeare Criticism, Oxford University Press, 224)

আদর্শ মানবসমাজ 'রিপাবলিকে'র স্বপ্নদ্রষ্টা প্লেটো বুঝেছিলেন কবি-সাহিত্যিকেরা সমাজের মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে; অতএব কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সমাজের শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী। কিন্তু তাঁরই শিষ্য অ্যারিস্ততোল মনে করেছেন সাহিত্য কৃষ্টিরই অপরিহার্য অঙ্গ। একে অবহেলা করলে সংস্কৃতিরই হয় অঙ্গহানি। তাই তাঁর মনীষার যে বহুমুখী 'বিশ্বরূপ' তাতে তর্কশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, পরাবিদ্যা ও রসায়ন-বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য-জিজ্ঞাসাও পেয়েছে অন্যতম স্থান। আবার মনীষী মেকলে বিস্ময়কর উক্তি করেছেন—সাহিত্য ও সভ্যতার সম্পর্ক নাকি অহি-নকুল সম্পর্ক—একের বিকাশ মানে অন্যের বিনাশ! আজকের কাব্যজগতের সবচেয়ে প্রভাবশালী মনীষী এলিয়টও এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, যদিও এর সমাধান কিছু তিনি দেন নি :

'Whether the arts flourish best in a period of growth and expansion or in one of decay, is a question that I cannot answer.'[৬]

সমাজ-সভ্যতার উন্নতি এবং শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ—এদের গতি ইতিহাসের দৃষ্টান্তে কখনো একমুখী কখনো বিপরীতমুখী। বিশ্বসাহিত্যের অমর অবদান গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি রচিত হয়েছে গ্রীক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির দিনে, শেক্‌স্‌পীয়রের আবির্ভাব হয়েছে নবজাগ্রত ইংল্যাণ্ডের সর্বমুখী বিকাশের সময়, ভারতে কালিদাসের জন্ম হিন্দু রাজত্বের স্বর্ণযুগে। আবার গ্যেটের আবির্ভাব যখন হয়েছে তখন জার্মানীর সামাজিক সমৃদ্ধির এত বড় নিদর্শন ঠিক নেই। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন পরাধীন ভারতে ইংরেজ শোষণের চরম দুর্দিনে। স্বয়ং এলিয়টের আবির্ভাব হয়েছে, যখন ইংরেজের বিশ্ব-শাসন গুটিয়ে আসছে, অন্য যুগের তুলনায় তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেকখানি কমে এসেছে। বস্তুত সমাজ এবং সাহিত্যের বিকাশধারা এমন সহজে মোটা রেখায় চিহ্নিত করা যায় না। সৃজনীপ্রতিভা যে বিশেষ জলবায়ুতে আত্মপুষ্টিসাধন করে, তার সঙ্গে সমাজের বিভিন্নমুখী বিকাশের সম্পর্ক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। কোন কোন সময় জাতির চরম অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই প্রতিভার মধ্যে জাগে অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার গূঢ়তম প্রেরণা যার ফলে সৃষ্ট হয় সাহিত্য-শিল্প-দর্শন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রতিভাকে স্বধর্মভ্রষ্ট করে। কারণ তাতে সহজ সুখে মসৃণ জীবনে অলস দৃষ্টি জীবন-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন বোধ করে না। আজ কোন কোন দেশে অর্থনৈতিক অসাম্যের অবসান জীবনে খানিকটা নিরাপত্তা এনেছে, কিন্তু সে সব দেশে সে রকমের বড় কবি-ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব বিরল হয়ে আসছে। আবার বিপরীতটিও বিস্ময়কর। জাতির জাগরণ যখন হয় শতদল বিকাশে তখন অনেক সময় প্রতিভা তারই মধ্যে খুঁজে পায় জীবনের বিচিত্র মধুসঞ্চয়। তাই শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সভ্যতার অন্যদিকের বিকাশের সম্পর্ক দুর্ভেদ্য। রহস্যময় ও ইতিহাস-সচেতন এলিয়ট এইজন্যে সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যের বিকাশটিকে খুব বেশি যুক্ত করতে চান নি। ফলত শিল্পসংস্কৃতির বিকাশের জন্যে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ রচনার পরিকল্পনা অর্থহীন। কারণ কোন পরিবেশে শিল্পীর প্রতিভা কি রকমের প্রতিক্রিয়া করবে, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে সে

৬। T S Eliot The Idea of a Christian Society, 1939

সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। এখানে পরিবেশ রচনার পরিকল্পনা না করে, সমাজদেহের কোথায় কোথায় ক্ষত আছে তা সারিয়ে দিয়ে সুস্থ সমাজদেহকে আপন পথে স্বাভাবিকভাবে যেতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে ব্যক্তির কাজ ইতিমূলক নয়, নেতিমূলক।

আমাদের সমাজের ক্ষত এলিয়টও অনুসন্ধান করেছেন। গণতন্ত্রের বর্তমানরূপে এলিয়ট তৃপ্ত নন। সমাজে এমন ক্ষত এতে সৃষ্ট হয়েছে যা নিরাময় না হলে শিল্প-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাজনক মনে হয় না। গণতন্ত্র অবশ্যই চাই। কারণ প্রতিভার উপরে রাষ্ট্রের বা নীতির শাসনদণ্ড তিনি চান না। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে চল্‌ছে যে আত্মঘাতী স্রোত তা রোধ করতেই হবে। বাহ্যত কোন শাসনদণ্ড না রেখে এমন সব প্রচারকার্য চলছে শিল্পীর স্বাধীনতা যাতে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। গণশিক্ষার নামে মনন ও মানসিকতার যে অবনতি হচ্ছে শিল্পের ক্ষতি তাতে অবশ্যই হচ্ছে। উঁচুদরের রসবোদ্ধা গণতন্ত্রের ভ্রান্ত লোকায়ত হুজুগের প্রভাবে সংখ্যায় কমে আসছে, ফলে গুরুত্বপূর্ণ রচনার পাঠক সংখ্যায় বিরল, সুলভ সাহিত্যেরই জনপ্রিয়তা বেশি। তাই রাজনৈতিক দিক থেকে শিল্পীর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং রুচির দিক থেকে অভিজাততান্ত্রিক বৈদগ্ধ্য—প্রমথ চৌধুরীর মতো এই ছিল এলিয়টের আদর্শ সমাজ-পরিকল্পনা।

এলিয়টের সমাজচিন্তায় একাধিকবার এ প্রশ্ন জেগেছে—কাব্যের কোনও সামাজিক উপযোগিতা আছে কিনা? কাব্যের তথা শিল্পের উদ্দেশ্য বিষয়ে এলিয়ট নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের মতই আনন্দবাদী। আনন্দ দান করাই কবি-শিল্পীর প্রথম সামাজিক কর্তব্য। আপাতদৃষ্টিতে এলিয়টের মতের সঙ্গে কলাকৈবল্যবাদী বা রসবাদী সমালোচকদের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় কবির সামাজিক দায়িত্বকে তিনি কম গুরুত্ব দেননি। বরং রসবাদের সঙ্গে উদ্দেশ্যবাদের সমন্বয়ই তাঁর সাহিত্যচিন্তার তথা সমাজচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এলিয়ট নিজেই স্পষ্ট করে বলেছেন,—আনন্দদান নিঃসন্দেহে কাব্যসৃষ্টির প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সমাজের অন্যদিকের যোগ না থাকলে সে আনন্দই পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এই অন্যদিকের মধ্যে প্রধানভাবে তিনি সমাজ-কর্তব্যের দিকটিই লক্ষ্য করেছেন এবং ব্যাখ্যাও করেছেন। অবশ্যই একথা স্পষ্ট যে, যে সমাজকর্তব্যকে এলিয়ট প্রাধান্য দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক সংস্কারপ্রবণতা নয়। তাঁর মতে এ ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে, অনেক সময় মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে ছিলও। কিন্তু তাঁর আলোচ্য সামাজিক উপযোগিতাটি গভীরতর, সূক্ষ্মতর এবং দুর্লক্ষ্যও অনেকটা। কবির ব্যক্তিচৈতন্য থেকে সৃষ্টি হয় যে নতুন চিন্তা, ভাবনা, ভাষাভঙ্গী, রসবোধ, তা ক্রমে সমাজচৈতন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করে।[৭] ভারতীয়দের মতই কবিকে এলিয়ট ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মনে করেন। কবিপ্রতিভার যে

৭। দু'জন প্রামাণিক সমাজবিজ্ঞানীর কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে: "...a system of social relationships grows and changes in accordance with the changing attitudes and interests of its members, of some or all of the units of individuals who compose it. Here the system derives its significance from its support of and contribution to the ends – the purpose of individuals themselves." R M Maciver and Charles H Page, "Society", McMillan & Co Ltd, London, 1959, pp, 49-50

মৌলিক অবদান—যা শুধু পুরাতনের অনুবর্তন নয়, যা নবীনের পথিকৃৎ—তাতে থাকে নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ, নতুন চিন্তার স্পর্শ, অভিনব বাণীভঙ্গীর মূর্ছনা। এর দ্বারা সমগ্র জাতির চেতনার সীমা প্রসারিত হয়, বোধ ও বোধির গভীরতা বাড়ে, সূক্ষ্মভাবে সর্বসাধারণের ভাষাভঙ্গী পরিবর্তিত হতে থাকে। এইটিই হল এলিয়টের মতে কাব্যের সামাজিক উপযোগিতা : 'This is what I mean by the social function of poetry in its largest sense: that it does, in proportion to its excellence and vigour, affect the speech and the sensibility of the whole nation.'[৮] সমগ্র সমাজ-চৈতন্যের উপরে কাব্যের এই অতিসূক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী প্রভাব আবিষ্কার এলিয়টের সমাজচিন্তার গভীরতাকে সুস্পষ্ট করে। বাংলা দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এর তুলনা খুঁজে পাই।

ভারতের উপনিষদ-গ্রন্থাবলীর সঙ্গে এলিয়টের পরিচয় ছিল তার প্রমাণ তাঁর কবিতাতেই রয়েছে। তবে ব্যাপকভাবে ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ কতখানি ছিল তা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু আধুনিক অনেক ইউরোপীয় কবি ও চিন্তানায়ক থেকে এখানেও তিনি স্বতন্ত্র। তাঁর সমাজ বিষয়ে লেখা একাধিক রচনায় ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ পাওযা যায়। বিশেষ বিশেষ সমাজ-পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় সমাজের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যায় ভারতের সমাজসংস্কৃতির প্রকৃতি তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, পরিবেষ্টনী ও ব্যক্তিচেতনার পারস্পরিক প্রভাব, কাব্যে আনন্দবাদের সঙ্গে উদ্দেশ্যবাদের সমন্বয় প্রভৃতি বিষয়ে যেমন আধুনিক ভারতীয় মনীষীদের সঙ্গে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ভারত-আত্মার সেই বহুঘোষিত বাণী—যার বীজ উপনিষদে এবং বিকাশ রবীন্দ্রনাথে-- সেই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য',—তার সঙ্গে এলিয়টের সমাজচিন্তার মূল সূত্র আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। আধুনিক কালে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে ভাব-ভাবনার আদান-প্রদান আমাদের সোচ্চার বাণী। বস্তুত বহুর মধ্যে এই রকম একটি আত্মিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনকে আমরা বুঝেছি। তেমনি প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, তার কবিত্ব ও কাব্যভাবনার নিজস্বতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সব একাকার করে দেওয়াও অর্থহীন। ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুইই সংস্কৃতির প্রাণধর্ম: "A variety is as essential as the unity."[৯] বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেই একটি আত্মিক ঐক্য এলিয়টের অন্বিষ্ট।

সমাজ ও সংস্কৃতিকে এলিয়ট একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ মনে করেন। সংস্কৃতির জগতে ক্রান্তি মহৎ কথা, কিন্তু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কোন মহৎ স্রষ্টার কল্পনা অসম্ভব। যুগ-যুগান্তরের সৃষ্টি নিয়ে জাতীয় জীবনে যে রসচৈতন্য গড়ে ওঠে তার প্রবাহই নবাগতকে স্তন্য দান করে। অবশ্য এর মানে ঐতিহ্যের প্রাণহীন অনুকরণ নয়। আসলে সত্যকার

৮। T. S. Eliot : On Poetry and Poets', Faber of Faber Ltd., London, p.23

৯। T. S. Eliot On Poetry and Poets, p. 23

ঐতিহ্যবোধ অক্ষমের অনায়াসে উত্তরাধিকার পাওয়া নয়; ঐতিহ্যবোধ আয়ত্ত করতে হয় সনিষ্ঠ প্রয়াসে। এখানে জাগ্রত বুদ্ধির সক্রিয় ভূমিকা আছে। অতীতের কালগত যা তাকে ঠিক ঠিক চিনে নিতে হবে, যা কালোত্তীর্ণ শাশ্বত তাকেই স্বাগত জানাতে হবে নতুন সৃষ্টিতে। এলিয়টেরই ভাষায়—

"Tradition is a matter of much wider significance It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense,.....and the historical sense involves a perception .of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and the temporal together."[১০]

ঐতিহ্যচেতনা মহৎ প্রতিভার বৃহৎ দায়িত্ব; ইতিহাস সম্পর্কে প্রজ্ঞাদৃষ্টি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বোধিদৃষ্টির মতই কবি-কোবিদের পক্ষে অপরিহার্য। এলিয়টের প্রতিভাকে আধুনিকের প্রতিনিধি বলতে গিয়ে তাঁর সমাজচেতনার এই অন্তর্দৃষ্টি যেন ভুলে না যাই!

১০। T. S. Eliot The Sacred Wood, Methuen & Co Ltd, London, 1957, p. 49

৬. জার্মানি কথাসাহিত্যিক : ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফ্‌কা

মেঘদূতের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির চিরন্তন বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে: "মনে পড়িতেছে কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।"[১] ব্যক্তির এই বিচ্ছিন্নতা-বোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে থাকেনি, ব্যাপক সামাজিক অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছিল। এই সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার নিঃসঙ্গ ভাবুক শিল্পী হলেন জার্মানি ঔপন্যাসিক ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফ্‌কা (Franz Kafka—১৮৮৩-১৯২)।

দ্বিতীয় ভিল্হেল্‌মের অধীনে জার্মানী যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে বসেছিল, সেই যুদ্ধে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ের পরে ব্যাপক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয় দেশের জনজীবনকে গ্রাস করেছিল। ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফ্‌কার প্রতিভার বিকাশ এই ঐতিহাসিক-সামাজিক পটভূমিকায়। একদিকে কাফ্‌কার প্রতিভার পটভূমিকায় ছিল এই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অন্যদিকে আগের শতাব্দীর উগ্র বাস্তবতা ও নেচব্যালিজ্‌মেব বিরুদ্ধে মানুষের সৃজনশীল ভাবুক চিত্ত যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার ফলশ্রুতি কাফ্‌কারও চিত্ত স্পর্শ করেছিল। এই জন্যে নেচর্যালিজ্‌মের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যাঁবা নব্য-বোম্যাণ্টিকতার জন্মদান করেছিলেন, কাফ্‌কা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

পূর্ববর্তী যুগের বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকেরা সমাজের মুখোস খুলে দিয়ে তার ভেতরের বাস্তব নোঙ্‌বামিকে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন· এর ফলে প্রচলিত মূল্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা উদঘাটিত হওযায বিংশ শতাব্দীতে জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই পটভূমিকায 'সিবিযাস্‌' সাহিত্যিকেবা জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে তৎপব হয়ে ওঠেন। নতুন মূস্যবোধেব জন্যে এই বিহ্বল অন্বেষার যুগবাণী হল কাফ্‌কার উপন্যাস। দুই বিশ্বযুদ্ধেব মধ্যবর্তী জার্মানি উপন্যাসের এই মৌল অন্বেষার কথা সমালোচকরা প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন।[২]

কাফ্‌কাব ব্যক্তিজীবনও দুঃখময। শৈশব থেকেই স্নেহবঞ্চিত তিনি। বাবার স্নেহ তো পানই নি, বরং পেয়েছেন রূঢ় কঠোর ব্যবহার। সর্বদা সভয় দূরত্ব বজায় বেখে চলতেন তিনি বাবার সঙ্গে। পিতাব সঙ্গে পুত্রের এই অসুস্থ বিষাক্ত সম্পর্কের প্রতিফলন হয়েছে তাঁব প্রথম যুগের রচনা একটি ছোট গল্প "The Judgement" (১৯১২)-এ। তিন-তিনবার প্রেমের প্রলোভনে পড়েও বিবাহ করেন নি কাফ্‌কা; তাই সুখী গার্হস্থ্য জীবন

১। রবীন্দ্রনাথ · 'প্রাচীন সাহিত্য' (মেঘদূত)।

২। "Between 1914 and 1939 the novelists were seeking some meaning for the individual and for the nation in a world which had lost its meaning"—Trawick, Buckner B "World Literature," Vol II, New York, 1968, P 259

থেকে চির-নির্বাসিত তিনি। সাংসারিক মানুষের সাধারণ পরিতৃপ্তি কোন দিনই লাভ করেন নি তিনি। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিন্নমূল। সামাজিক পরিবেশেও তিনি বিচ্ছিন্ন। কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল তাঁকে চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত প্রাগে কাটাতে হয়েছিল, অথচ সেখানেও তিনি সহজ সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারেন নি। তাঁর মাতৃভাষা জার্মান বলে চেক্‌দের সঙ্গে মিশতে তিনি বাধা বোধ করতেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার যে অঞ্চলে জার্মান-ভাষীদের প্রাধান্য, সেখানে তিনি বসবাস করতেন না। তাঁর বসবাস ছিল চেক্‌ভাষীদের অধ্যুষিত এলাকায়। আবার জার্মানদেব সঙ্গেও এক হতে পারতেন না তিনি। তাঁর পৈতৃক ধর্ম ছিল ইহুদী ধর্ম। তাই খ্রীষ্টানরা তাঁকে সুনজরে দেখেনি কোনদিন। সাংসারিক সুখ থেকে যেমন চিরবঞ্চিত তিনি, তেমনি স্বাস্থ্য-সুখও লাভ করেন নি। ক্ষয়রোগে অভিশপ্ত জীবন মানবসঙ্গ বর্জিত। ভিয়েনাতে একটি স্যানাটোরিয়ামে নিঃসঙ্গ বদ্ধজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত। এইসব অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে করেছে বিচ্ছিন্নতার প্রতিভূ, নিঃসঙ্গতার শিকার, অন্তর্মুখী আত্মমুখী সত্যসন্ধানী।

কাফ্‌কা কথাসাহিত্যিক— ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সাকুল্যে মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি—Der Prozess (The Trial) (১৯২৫), Das Schloss (The Castle) (১৯২৬), ও (America) (১৯২৭) এই তিনটিই অসমাপ্ত রচনা। কোনটিই তাঁর জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত হয় নি। উপন্যাসগুলি প্রকাশ কবার কোনো ইচ্ছা তো তাঁর ছিলই না, বরং তিনি সেগুলি পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যুব পরে তাঁর বন্ধু মাক্স্ ব্রড (Max Brod) সেগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

ব্যক্তির যে বিচ্ছিন্নতার কথা আগে বলেছি, সেই বিচ্ছিন্নতার মর্মর-ধ্বনি হল এই উপন্যাস-ত্রয়ী। জনৈক সমালোচক কাফ্‌কাব উপন্যাসে উপস্থাপিত এই মূল জীবনদর্শনটি সংক্ষেপে সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"Like every other work of Kafka's, they reflect, in a seriously religious sense, the experience of human isolation and the pathos of exclusion."[৩]

অস্তিত্ববাদের দু'টি রূপ আছে—নাস্তিক ও আস্তিক। কাফ্‌কা হলেন আস্তিক অস্তিত্ববাদী। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর আস্থা আছে, ঈশ্বরকে তিনি জানতে চান, অথচ তাঁকে পান না। সৃষ্টির অর্থ কি? বিশ্বসৃষ্টির নিয়ন্ত্রীশক্তি কে? তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমরা পুরোপুরি তা জানাতে পারি না। এই রকমের এক অজ্ঞেয়বাদের আলো-আঁধারি অস্পষ্টতা কাফ্‌কার জীবনদর্শনে ব্যর্থতার সুর ধ্বনিত করে। মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ এক ভয়াবহ অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা চালিত। একটা রহস্যময় জগতে আমরা যেন বোবায়-ধরা অবস্থায় সেই সর্বব্যাপী শক্তিব কাছে আত্মসমর্পণ করে আছি। এই রহস্যময় জগতের অদৃশ্য শক্তির কাছে আমরা খেলার পুতুল মাত্র। এই অসহায় বিষণ্ণতাবোধ মূলত এসেছে কাফ্‌কার ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা থেকে। এ থেকে মুক্তির জন্যে আর্ত সংগ্রাম করে চলেছে

৩। Lange, Victor Modern German Literature 1870-1940', Ithaca, New York, 1945, pp 88-89

মানুষ, কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের যান্ত্রিক বন্ধন থেকে তার মুক্তি নেই। ব্যক্তির এই অসহায়তা সবচেয়ে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে কাফ্‌কার 'দি ট্রায়াল' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক ব্যাঙ্ক-কর্মচারী জোসেফ্‌ কে-র বিচার হল, অথচ তার অপরাধ যে কী তা সে জানে না। এমন কি যখন আদালতের রায় সে মানতে অস্বীকার করল, তখন তার রেহাই নেই। আদালতের দু'টি ধামা-ধরা লোক তাকে নিহত করল। বক্তব্য এই যে, আমরা কোনো এক অজানা অপরাধে অপরাধী। প্রকৃতি তার বিচার করে চলেছে। সেই বিচার থেকে নিস্তার নেই; আমরা অসহায়। প্রকৃতির বিধানকে এড়াতে গেলে অন্যভাবে তার প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর বর্তাবেই। অতএব আমরা নিরুপায়। অনেকে মনে করেন ' The Trial'' উপন্যাসে যে বিচারের প্রসঙ্গটি আছে সেটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে জাত। জার্মানী যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে বসেছিল, তার ফলে সেই দেশের জন-চেতনায় একটি অপরাধ-মন্যতা ('war-guilt') দানা বেঁধেছিল। এই অপরাধমন্যতা থেকে কাফ্‌কার চিত্তও রেহাই পায়নি। আর এই অপরাধবোধ থেকেই আসে তার বিচারের প্রশ্ন। 'The Trial' উপন্যাসে এই সাময়িকতার প্রভাব বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান যুগের অবিন্যস্ত খেয়ালী, বুরোক্র্যাসির শিকার হল 'Das Schloss' (The Castle) উপন্যাসের নায়ক 'কে'। পাহাড়ের একটা দুর্গে চাকরির নিয়োগ নিয়ে সে হাজির হয়েছে, অথচ দুর্গের কর্তাব্যক্তিরা—যাঁরা তাকে ডেকেছেন— তাঁরাই তার নিয়োগের কথা জানেন না। এই উপন্যাসটি কাফ্‌কার জীবনদর্শনের বিচারে প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা। জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পথ করে আধুনিক মানবাত্মা এগিয়ে চলেছে সত্যোপলব্ধিব দিকে। আর তার এই এগিয়ে চলার পথে প্রধান বাধা হল আধুনিক মনের অবিশ্বাস, অথচ শত অবিশ্বাসের মধ্যেও জীবনপথের তীর্থযাত্রী সে যে এগিয়ে চলেছে বাধার সঙ্গে লড়াই করে, তার কারণ তার অন্তরে একটি দুর্লক্ষ্য বিশ্বাসও রয়েছে, তা ভস্মাবৃত বহ্নির মতো প্রচ্ছন্ন ইতিমূলক বিশ্বাসেব বাণীবহ বলেই কাফ্‌কা আধুনিক আত্মার বাধাবিঘ্ন-সঙ্কুল বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার ভাষ্যকার হলেও গভীরতব অর্থে আশাবাদী। একদিকে ইহুদিদের গোঁড়ামি, অন্যদিকে রাষ্ট্রের যান্ত্রিক প্রশাসন কাফ্‌কার মনে অন্ধ অনুশাসনের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করেছিল, তবু তিনি সর্ববিধ অন্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত কবেছেন।

কাফ্‌কার জীবনদর্শনে যেমন একটা অজ্ঞেয়বাদেব স্পর্শ আছে তাঁর বচনারীতিতে তেমনি বয়েছে সুর্‌রিয়েলিষ্টদের আবছা স্বপ্ন জড়িমা। তাঁর ভাষা তীক্ষ্ণ ও প্রতীকধর্মী। গভীব ধর্মীয় জিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নানা প্রতীকের সাহায্যে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। প্রতীকের দুর্বোধ্যতা থাকলেও কাফ্‌কার বচনারীতি, ভাষা ও শৈলী প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ। কাফ্‌কার শিল্পগুণের উৎকর্ষ এইখানে যে, তিনি যে রহস্যময় কল্পনার জগৎটি রচনা করেছেন, সেটা কোনো অবাস্তব সৃষ্টি বলে মনে হয় না; বাহ্যত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনচিত্র অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। এই বাস্তব চিত্রের সঙ্গে প্রতীকধর্মিতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন কাফ্‌কা। এই জন্যে তাঁর কল্পনা-সৃষ্ট

জগৎ, তাঁর আধ্যাত্মিক অন্বেষা, তাঁর রহস্যময় নিয়ন্ত্রীশক্তির দুর্লক্ষ্যলীলা আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হয় না।

জার্মানি সাহিত্যে প্রকাশবাদের (Expressionism) যুগ সূচিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় কাছাকাছি সময় থেকে। এই যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের নামই হল ফ্রান্‌ৎস্‌ কাফ্‌কা। অথচ কাফ্‌কা Expressionism-এর যুগে তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করলেও তিনি ঠিক পুরোপুরি এই গোষ্ঠীর দলভুক্ত লেখক ছিলেন না। আপন স্বাতন্ত্র্যে তিনি অনেকটাই পৃথক্‌। সাহিত্যিক প্রবণতার বিচারে কাফ্‌কাকে সমালোচকেরা এক্‌স্‌প্রেশনিষ্ট, নব্যরোম্যাণ্টিক, সুর্‌রিয়েলিষ্ট্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন ছাপ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আসল কথা, তিনি কোন একটি সাহিত্যিক আন্দোলনের দায়বদ্ধ (Committed) লেখক ছিলেন না। জীবনের অভিজ্ঞতার পটপরিবর্তনের ফলে সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি নানা স্তর পেরিয়ে গেছেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপন অস্তিত্ব-চেতনার পুষ্টিসাধন—অস্তিত্ববাদের এই কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি উপনীত হয়েছিলেন। এই অর্থে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি মূলত অস্তিত্ববাদী (Existentialist) লেখক।

৭. জার্মান কবি রিলকে*

I Speak Spanish to God.
Italian to women,
French to men and
German to my horse

—‘‘আমি ঈশ্বরের সঙ্গে স্পেনীয় ভাষায় কথা বলি, নারীর সঙ্গে ইতালীয় ভাষায় কথা বলি, পুরুষের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলি, আর আমার ঘোড়ার সঙ্গে আমি কথা বলি জার্মান ভাষায়।’’

—কথাটি রোমের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের নামে চলে আসছে। তিনি এতগুলি ভাষা জানতেন এবং বলতে পারতেন কিনা আর জানলেও তিনি সত্যি একথা বলেছিলেন কিনা, তার সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এর মধ্যে যে একটি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তা আমরা আমাদের ভাষাজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে পারি। আমরা দেখি, প্রত্যেক ভাষার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য প্রথমত তার ধ্বনি-প্রকৃতির ওপরে নির্ভরশীল। ইতালীয়, ফরাসী, সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু প্রভৃতি ভাষা সাধারণত হলো শ্রুতিমধুর, অন্যদিকে জার্মান, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হলো অপেক্ষাকৃত কঠোর, কর্কশ। এটা অবশ্যই অত্যন্ত সহজ সাধারণীকরণ। কোনো ভাষাই সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে মধুব বা কঠোর হতে পারে না। বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম সব ভাষাতেই রয়েছে, তবু প্রত্যেক ভাষার একটি সাধারণ স্বধর্ম আছে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিচারেই ফরাসী, ইতালীয় ভাষাব তুলনায় জার্মান ভাযা কানে শুনলে অপেক্ষাকৃত কর্কশ মনে হয়। এই সত্যেবই ইঙ্গিত আছে রোমের সম্রাটের কথায়। আবার বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ফরাসী ভাষায় সাহিত্য সমৃদ্ধ জার্মান ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনা সমৃদ্ধ। জার্মান ভাষাতেও ক্লাসিক্যাল যুগ বেশি সমৃদ্ধ (গ্যেটে, শীলার ইত্যাদি), রোমান্টিক যুগের (হাইনে প্রমুখ) তুলনায়। যাই হোক অপেক্ষাকৃত কর্কশ-কঠোর জার্মান ভাষায় শ্রুতিমধুর কোমল গীতিকবিতার গঙ্গোত্রী-উৎসটি প্রথম খুলে দিয়েছিলেন স্টিফান জর্জ (Stefan George)। এবং মাইকেলের অন্য প্রসঙ্গে প্রযুক্ত তুলনাটি ব্যবহার করে বলতে পারি মহাদেবের জটা থেকে এই ধারাটিকে উৎসারিত করে প্রবল বেগে বইয়ে দিয়েছিলেন রিলকে—রাইনব মারিয়া রিলকে। জার্মান ভাষা- সাহিত্যের ইতিহাসে এই হচ্ছে রিলকের মূল ভূমিকা। অন্তরতম সত্তা থেকে উৎসারিত বলে তাঁর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সুগভীর এবং

---

* কবিতার অনুবাদ করার অধিকার কবিদেরই আছে—এক্ষেত্রে অধিকারীভেদ অনস্বীকার্য। এইজন্যে যেখানে আমি রিলকের কবিতার বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদ পেয়েছি, সেখানে আমি তা-ই গ্রহণ করেছি। কিন্তু যেখানে কোনো কবি-কৃত অনুবাদ পাইনি বা সংগ্রহ করতে পারিনি সেখানে আমি অ-কবি হওয়া সত্ত্বেও নিজেই অনুবাদ করে দিয়েছি। তবে সকলেই স্বীকাব কববেন—শুধু কোনো ভাষার জ্ঞান থাকলেই সেই ভাষার কবিতার অনুবাদ করা যায় না, অন্যপক্ষে কোনো কবি-কৃত অনুবাদ যে কত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে তা বুঝতে পেরেছি যখন বুঝেছি বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদের মাধ্যমেই রিলকে আমার প্রিয় কবি হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মূল কবিতা পড়ার জন্যেই আমি জার্মান ভাষা শিক্ষা করি।

এই আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন বলে তাঁর কবিতায় মরমিয়া (mystic) কবিতার বৈশিষ্ট্য আছে। এই মিস্টিক উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্যে সাধারণ ভাষা অক্ষম মাধ্যম, তাই কবিকে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়। রিলকে হলেন বিশ্বের একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতীকবাদী মিস্টিক কবি। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। জার্মান সাহিত্যের সবচেয়ে প্রামাণ্য ইতিহাসকার লিখেছেন :

"The most successful lyrical poet of this period is unquestionably Rainer Maria Rilke (1875—1926). Literary critics inside and outside Germany consider him to be the greatest lyrical poet of modern Germany and equal in stature to poets such as W. B Yeats, Eliot, Valéry and Claudel.... In Rilke is to be found in its most sublimated form the new poetry that had emerged from the conflicting factors of Impressionism and Mysticism, of Neo-classicism and Symbolism."[১]

এই হলো বিশ্বসাহিত্যে রিলকের সুনির্দিষ্ট স্থান। রিলকে জার্মান ভাষার কবি হলেও তাঁর জন্ম বর্তমান জার্মানীতে নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার কেন্দ্র প্রাগে রিলকের জন্ম হয় ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৭৫ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং তা থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরীর স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তার আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীন প্রতিষ্ঠা ছিলো না। পরাধীন দেশেই রিলকের জন্ম। এখানে কয়েক লক্ষ জার্মানের বসবাস ছিলো। সেই সব জার্মানের একটি পরিবারের সন্তান রিলকে। এই প্রাগ্‌ একসময় ভাষাবিজ্ঞান চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিলো এবং এখানে একটি বিশিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী (Prague School of Linguistics) গড়ে উঠেছিলো।' যার নেতা ছিলেন নিকোলাই ত্রুবেৎস্‌কয় (Prof Nikolai Trubetzkoy)।

রবীন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘজীবন রিলকে পাননি। রবীন্দ্রনাথের মতো বহুধাবিস্তৃত সৃষ্টিও তাঁর নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর জন্ম হয় আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় একপাদ তিনি দেখে গিয়েছিলেন—তাঁর মৃত্যু ১৯২৬ সালে ২৯শে ডিসেম্বর। মাত্র ৫১ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন—তার মধ্যে সৃষ্টি-পর্ব মাত্র ১৭ বছরের (১৯০০ থেকে ১৯১৭)। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবনপর্ব কিন্তু নাটকীয়তায় পূর্ণ, নাটকীয় ঘটনার মতোই দ্রুত গতিশীল, দ্রুত তার পট-পরিবর্তন। তাঁর জীবন ছিলো ভবঘুরে, দুঃখপূর্ণ।

রিলকের প্রথম জীবনেই তাঁর পারিবারিক পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপরে দ্বিমুখী প্রভাব ফেলে। রিলকের মায়ের প্রথম সন্তান একটি কন্যা অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। তার পরেই রিলকের জন্ম হওয়াতে তাঁর মা তাঁকে মেয়ের মতো করেই মানুষ করতে থাকেন— মেয়েদের পোষাক পরাতেন, মেয়েদের পুতুল খেলতে দিতেন। এর ফলে শৈশব থেকে তাঁর মনের মধ্যে নারীসুলভ কোমলতার বীজ উপ্ত হয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন—শিশুর প্রথম পাঁচ বছরের স্মৃতি যে গভীর ছাপ (ingram) রেখে যায়, তা তার পরবর্তী জীবনে আর কোনো দিন মুছে যায় না, তার সচেতন মনে না থাকলেও তার

১। Robertson, J.G · *'A History of* German *Literature'*, 6th ed. 1970 p. 569.

মনের অবচেতন অংশে থেকে তার মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। রিলকের ভাব-ভাবনা ও কাব্যসাহিত্যে কোমলতার উৎসটি হয তো এইখানেই নিহিত ছিলো। অন্য দিকে রিলকের পিতা তাঁকে সৈনিক করে তোলার জন্যে তাঁকে সৈনিক স্কুলে ভর্তি করে দেন। যদিও এই শিক্ষা তিনি মন থেকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, তবু জীবনের সমগ্র ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও তিনি যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ভেঙে পড়েননি, তার কারণ তাঁর সৈনিক-শিক্ষার দৃঢ়তা।

তাঁর জীবন-কালের জার্মানীর জাতীয় ইতিহাসও তাঁর জীবনের জন্যে নাটকীয় পট-ভূমিকা রচনা করেছিলো। তাঁর জীবনকালের বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিও ছিলো উত্তপ্ত। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে তবু ২য় কাইজার ভিল্‌হেল্ম এর (Kaiser Wilhelm II) অধীনে জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করে প্রত্যক্ষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪) জড়িয়ে পড়ে। তারপর ১৯১৮ সালে যখন মিত্রশক্তির কাছে জার্মানী পরাজিত হয়, তখন যদিও জার্মানী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তবু যুদ্ধের নিদারুণ দুঃখময় পরিণাম জার্মানীকে ভোগ করতে হয়। যুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধির (১৯১৯) ফলে মূলত আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স্ জার্মানীর ওপরে নানা শর্ত আরোপ করে তাকে পঙ্গু করে দেয়। জার্মানীর শিল্প ও খনি চলে যায় আন্তর্জাতিক কমিশনের অধিকারে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে জার্মানীকে বাধ্য করা হয়। টেলর যথার্থই বলেছিলেন—যুদ্ধের ফলে জার্মানীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো এবং এই রাজনৈতিক-সামাজিক বিপর্যয়ের ঝড়ঝাপ্টা রিলকের জীবনেও অল্পবিস্তর আঘাত হানে। ১৯১৮-তে জার্মানীর পরাজয়ের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রিলকে দেখেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানীর চারিদিকে অনিশ্চয়তা, অভাব, অনটন, দুঃখ-বেদনা ও সামাজিক ভাঙনের চিত্র। বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপর্যয়ের পাশে ছিলো জনসাধারণের মনে যুদ্ধাপরাধ-বোধ (War-Guilt)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রিলকের জন্ম হয়। ১৮০' থেকে জার্মানীতে শিল্পের পসার ঘটতে শুরু হয় এবং এই শিল্পায়নের ফলে স্বাভাবিক পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হতে থাকে। এই দূষিত পরিবেশে জীবনের বিকৃতি ও যৌনচেতনার বাড়াবাড়ি চিত্রশিল্পে ন্যাচারালিস্ট্ গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। এর প্রভাবও জার্মান কবিদের ওপর অল্পবিস্তর পড়েছিলো। জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে (F. W Nietzsche) এই সময়ের বুদ্ধিজীবী মহলকে বেশ প্রভাবিত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ন্যাচারালিজমের উগ্র বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ারই ফল হলো কাব্যে নব্য-রোমাণ্টিক (Neo-Romanticism) আন্দোলন। উগ্র বাস্তবতাকে ছেড়ে দিয়ে নব্যরোমাণ্টিক কবিরা কল্পনার সৌন্দর্যের আরাধনায় নিমগ্ন হন। এ যুগের প্রধান কবি ছিলেন— ডেট্‌লেফ্ ফন্ লিলিন্‌ক্রন্ (Detlev von Liliencron)। তিনি মন্ময় গীতিকবিতায় সঙ্গীতধর্ম সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর পথ ধরেই পরে স্টিফান জর্জ (Stefan George) গীতিকবিতায় মাধুর্য ও সঙ্গীতধর্মিতার প্রস্রবণ খুলে দেন। রিলকের মৃত্যুর আগেই হিটলার (Adolf Hitler)

নিজের শক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থ "Mein Kampf" থেকে তাঁর দুষ্ট ইচ্ছা ধরা পড়ে যায় এবং তাঁর চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যে যে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিলো, তাও যুদ্ধের পরে পরাজিত জার্মানীর গণজীবনে কঠোর বিপর্যয়ের ফলে বেশি দিন টিকতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে রিলকের জন্ম হলেও তাঁর কাব্যসৃষ্টি সবই বিংশ শতাব্দীতে—বিংশ শতাব্দের প্রথম পাদে। এই সময়কার জার্মানীর সাহিত্যিক চালচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন। "The pendulum swung away from naturalism and materialistic impressionism and toward Symbolism and sentimental form of romanticism known as "Expressionism", After the First World War the lyric became soberer, deeper and more spiritual."[২]

এই পটভূমিকায় রিলকের মতো অন্তর্মুখী কবির পক্ষে আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষী হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। জার্মান সংস্কৃতিতে নেচার্যালিজমের উগ্র ব্যাস্তবতার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া ঘোষিত হয় "Blätter für die Kunst" (1892-1919) পত্রিকায়। উগ্র বাস্তবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে সমাজ-বাস্তবতার দাসত্ব থেকেও শিল্পের মুক্তি ঘোষণা করা হয়। এই প্রতিবাদী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন স্টিফান জর্জ (Stephan George)। বলতে গেলে জার্মান কাব্যে তিনিই রিলকের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

আগেই বলেছি, রিলকের জীবন ছিলো ভবঘুরে। কোনো এক দেশে তিনি চিরস্থায়ী ছিলেন না। জন্ম প্রাগে; আর রাশিয়া, ফ্রান্স্, ইটালী, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডে জীবনের বিভিন্ন সময় বাস করেছেন। তবু যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অবক্ষয়ী পটভূমিকার প্রভাব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। বিশেষ করে প্যারিসের আন্তর্জাতিক ঘনবসতির ভোগ-বিলাস, বিকৃত রুচি ও অবক্ষয়িত নাগরিক জীবনের অপসংস্কৃতি তাঁর মনে প্রথমে গভীর বিষন্নতা ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেছিলো, যদিও পরে তিনি আধুনিক চিত্রশিল্প ভাস্কর্য ও সাহিত্যের নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্রভূমি প্যারিসকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তার আগে অবশ্য তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাশিয়ার নিসর্গ-প্রকৃতিতে—এত গভীরভাবে যে তিনি দু-বার রাশিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তিনি প্রকৃত অর্থে ঘর বাঁধতে পারেন নি। জীবনে অনেক নারীকেই তিনি ভালবেসেছিলেন, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই স্থূল অর্থে নয়। এই রমণীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পাউলো-বেকার, ক্লারা ভেস্টয়, টুন ও টাক্সিস্-হোহেন লোহের রাজকন্যা মেরী, ভুগুারলি-ফোল্‌কার্ট এবং সর্বোপরি লূ আন্দ্রিয়াস-সালোমে। এরা কেউ রিলকেকে ভালোবেসেছিলেন, কাউকে রিলকে ভালোবেসেছিলেন, কেউ রিলকেকে সেবা করেছিলেন, কেউ প্রেরণা দিয়েছেন, কেউ আশ্রয়, কেউ অর্থ-সাহায্য। এঁদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী চিরন্তন বন্ধু-প্রেমিকা প্রেরণাদাত্রী ছিলেন প্রিয়তমা সালোমে। কিন্তু কোনো রমণীকেই চিরসঙ্গী

ঘরনী করতে পারেন নি রিলকে। ১৯০১ সালে অবশ্য তিনি ক্লারা ভেস্টয়কে বিয়ে করেছিলেন, একটি কন্যাও হয়েছিলো। কিন্তু তাকে নিয়ে চিরকালের জন্যে সংসার করতে পারেন নি তিনি। মাত্র এক বছর কয়েকমাস পরেই তারা স্বেচ্ছায় পরস্পর থেকে দূরত্বে সরে গিয়েছিলেন।

জার্মান সাহিত্যে বাস্তবতা-নেচার্যালিজমের যুগে (১৮৩০-১৯০০) ইব্‌সেনের (Henrik Ibsen, 1828-1906) মতো বড়ো নাট্যকারের আবির্ভাব হলেও এই যুগের কোনো-কোনো সাহিত্যিকের রচনায় যে উগ্র বাস্তবতা ছিলো, তাতে পরবর্তীকালের পাঠক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণা ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রিলকে ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ কোমল মনের অধিকারী; তাই তিনি ঠিক পূর্ববর্তী যুগের রূঢ় বাস্তবতাকে সহ্য করতে পারেন নি। বরং আরো পূর্ববর্তী যুগের রোমান্টিকতার পথ ধরে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। রোমাণ্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হাইনে-ই (Heinrich Heine, 1797-1856) তাঁর প্রথম জীবনে আদর্শ ছিলেন। কিন্তু হাইনের পথ ছেড়ে রিলকে ক্রমশ নিজস্ব আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার পথে যাত্রা করেন। হাইনের রোমাণ্টিকতার পথ ধরে রিলকে সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণতা তাঁকে আরো গভীরতায় মরমিয়া (mystic) উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। আর মরমিয়া উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যই হলো তাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এর জন্যে প্রতীকের প্রয়োজন হয়। 'ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রাতিভাসিক রূপের নেপথ্যে পৌঁছে আত্মার সত্যকে প্রকাশ করার ব্রত নিয়েছে যে কাব্য, বস্তুত সে এমন এক সাহিত্য রচনার চেষ্টা করছে যার জন্যে শুধু প্রতীকধর্মী ভাষা ছাড়া তার চরিত্রধর্ম অনুযায়ী আর কোনো বিশিষ্ট ভাষাশক্তিই এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।'[৩] এই জন্যে মালার্মে, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স্‌, ভালেরির মতো রিলকেও প্রতীকবাদী কবি হয়ে ওঠেন।

জার্মান ভাষার স্বাভাবিক কাঠিন্য ভেদ করে তাতে যে কোমল গীতিকবিতার প্রস্রবণ খুলে দিয়েছিলেন স্টিফান জর্জ সেই ধারাকে পুষ্ট করেন রিলকে, এর মূলে ছিলো নিশ্চয় রিলকের কোমল কবিহৃদয়। আর এর জন্যে কোনো বাহ্য প্রভাব যদি কাজ করে থাকে তবে তা হলো জার্মান লোকসাহিত্যের প্রভাব। এর আগেই জার্মান সাহিত্যে লোকসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা গিয়েছিলো যার ফলশ্রুতি হলো গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় (Grimm Brothers) কর্তৃক জার্মান লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশ। য়াকপ গ্রীম (১৭৮৫-১৮৬৩) ও ভিল্‌হেল্‌ম্‌ গ্রীম (১৭৮৬-১৮৬৯) নামে দুই ভাই জার্মানীতে লোকমুখে প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। যে-সব সঙ্কলন তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন সে গুলির মধ্যে প্রধান হলো 'Kinder und Hausmärchen' (১৮১২-১৫) (শিশুদের রূপকথা ও ঘরোয়া গল্প) এবং 'Deutsche Sagen' (১৮১৬-১৮) (জার্মানীর উপকথা)। গ্রীম ভাইদের সঙ্কলিত রূপকথাগুলি শুধু জার্মানীতেই নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে জনপ্রিয়

হয়েছিলো। রিলকেও জার্মান লোকসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লোকসাহিত্যে যে গ্রাম্য সারল্য ও অনুভূতির অন্তরঙ্গতা পাওয়া যায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিলকের কবিতাকে সারল্য ও কমনীয়তা দান করেছিলো, যদিও রিলকের কোনো-কোনো কবিতায়.মিষ্টিক উপলব্ধির জন্যে দুর্ভেদ্য দুর্বোধ্যতা রয়েছে। বিলকের কবিতায় লোকসাহিত্যের প্রভাব আছে—এটা যেমন তাঁর অনুভূতির অন্তরঙ্গতায় ও রচনারীতির সারল্যে দেখা যায়, তেমনি লোকসাহিত্যের কিছু-কিছু আঙ্গিকেরও প্রভাব রয়েছে। কবিতায় ধুয়ো (refrain) ব্যবহার লোককবিতায় একটা আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য, রিলকের কবিতায় এই বৈশিষ্ট্য কোনো-কোনো জায়গায় দেখা যায়। যেমন 'প্রেমের গান' (Liebes Lied) কবিতায় দেখা যায়—

„O sage, Dichter, was du tust?—**Ich rühme.**
Aber das Todliche und Ungetüme,
wie haltst du'aus, wie nimmst du's hin?
—**Ich rühme.**
Aber das Namenlose, Anonyme,
wie rufst du's, Dichter, dennoch an?
—**Ich rühme.**
Woher dein Recht, in jeglichem Kostüme,
in jeder Maske wahr zu sein?—**Ich rühme.**
Und dass das Stille und das Ungestüme
wie Stern und Sturm dich kennen? —
Weil Ich rühme."[৪]

"বল কবি, বল তুমি এটা কী কব
—আমি প্রশংসা কবি
কিন্তু যেসব মারাত্মক ও ভয়াবহ জিনিস রয়েছে
সেগুলি কেমন করে তুমি সহ্য কর?
কেমন করে মেনে নাও, তাদের?
—আমি প্রশংসা করি
এমন কী যা অনামী, যার কোনো নাম নেই,
কেমন করে ডাক তাদের
—আমি প্রশংসা করি
সমস্ত ছদ্মবেশের মধ্যে, মুখোশের আড়ালে
খাঁটি হবার অধিকার কোথায় তোমার
—আমি প্রশংসা করি
আর এটা কেমন করে হয় যে শান্ত আর বিক্ষুব্ধ জিনিস
—নক্ষত্র আর ঝড়ের মতো

কেমন করে জান তাদের নিজস্বতাকে?

—কারণ আমি প্রশংসা করি।"

লোকসাহিত্যের স্রষ্টারা যেমন সাহিত্যসূত্র ও নন্দনতত্ত্বের নিয়মাবলী আয়ত্ত করে তার সূত্র অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, অন্তরের স্বতঃ-উৎসারিত প্রেরণা অনুযায়ীই সাহিত্য রচনা করেন, রিলকেও তেমনি সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের যান্ত্রিক বিধিবিধান অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন—"And let me here at once request you: read as few aesthetic-critical things as possible,—they are either partisan opinions, became hardened and meaningless in their lifeless petrification or else they are a skilful play upon words, in which one view is upper-most today and its opposite tomorrow."[৫] এইজন্যে রিলকের অনেক কবিতায় স্বভাবকবির সারল্য ও অনুভূতির নিবিড়তা পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি— রোম্যাণ্টিক যুগের কবি হাইনের (Heinrich Heine) পথ ধরে রিলকে কাব্যরচনা শুরু করেছিলেন। তাই রিলকের প্রথম জীবনের কবিতায় ঈশ্বর-ভক্তি থাকলেও হাইনের চাপা দুঃখবাদের প্রভাবও কোথাও-কোথাও লক্ষ্য করা যায়। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মানুষের মতোই হাইনে একসময় লিখেছিলেন—

„Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser freilich
Das Beste wäre nie geboren sein!

—"ঘুমিয়ে থাকা ভালো, মরে যাওয়া আরো ভালো; কিন্তু সবচেয়ে ভালো হলো একেবারে না-জন্মানো।"

রিলকের কবিতায় হাইনের কথার যেন সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়:

"ভগবান, দাও প্রতি মানুষের সেই মৃত্যু, যা তার স্বকীয়,
যা তার বেঁচে থাকার কেন্দ্র থেকে ধীরে ওঠে গ'ড়ে—
যে বাঁচা একদা ছিলো অর্থময়, ছিলো প্রেমে, প্রয়োজনে তা বরণীয়।"[৬]

কিন্তু রিলকের মৃত্যু-কামনা শেষপর্যন্ত তাঁর ব্যর্থতাব পরিণাম হয়ে থাকেনি, পরবর্তী কালে তা পূর্ণতায় পরিণতি লাভ করে। মৃত্যু-চেতনায় হাইনের চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রিলকের সাধর্ম্য অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের মতো রিলকের কাছেও মৃত্যু সুমহান—

"কেননা আমরা আর-কিছুই নই—শুধু পাতা, খোসা।
কিন্তু মৃত্যু—সুমহান—আমাদেরই মধ্যে যার বাসা,
তা-ই শেষ ফল, যার বৃত্ত ঘিরে সব-কিছু ঘোরে।"[৭]

মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। বেঁচে-থাকা ও মরে-যাওয়া দুই নিয়েই মহাজীবন—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শনের মূল কথা। উপনিষদ ও গীতার পটভূমিকায় লালিত

রবীন্দ্রমানসের পক্ষে এরকম উপলব্ধি বিস্ময়কর কিছু নয়, কিন্তু একজন পাশ্চাত্য কবির পক্ষে এরকমের মৃত্যুভাবনা পাশ্চাত্য পটভূমিকার চেয়েও উচ্চতর উপলব্ধির দ্যোতক। আরো লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য কবি রিলকে মৃত্যু ও জীবনকে সমান গুরুত্ব দেননি, বরং মৃত্যুকেই মহত্তর করে দেখেছেন। মৃত্যু ছাড়া জীবন অন্তঃসারশূন্য খোসা বা ঝরাপাতা।

লোকসাহিত্যের প্রভাবই হোক বা হাইনের প্রভাবই হোক, কোনো প্রভাবই রিলকে-কে বেশিদিন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। প্রথম জীবনের কবিতাতেই তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালের কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত স্টাইল যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি জীবনদর্শনের দিক থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যে সমগ্র পাশ্চাত্য কাব্যে তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন।

তাঁর জীবনদর্শনের একটা দিক যেমন তাঁর মৃত্যুচেতনা, তেমনি আর একটা দিক হলো তাঁর ঈশ্বরচেতনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি। দুই-ই আবার অন্বিত। রিলকের সমগ্র কবিজীবনকে সমালোচক বলেছেন—ঈশ্বরের অন্বেষা। এই অন্বেষা শুরু হয়েছিলো তাঁর কাব্যগ্রন্থ Das Studenbuch-এ (The Book of the Hour)। রিলকে প্রথম জীবনে একাধিকবার চলে গেছেন রাশিয়ায়। সেখানে তখন জারের আমল। সেখানকার জনজীবনে তখন দুঃখ, দারিদ্র্য, সর্ববিধ বিকৃতি ও অপসংস্কৃতির বিস্তার—যার চিত্র পাই ম্যাক্সিম্ গোর্কীর মা (Mother) গ্রন্থে। সেই বিকৃতির পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তিনি রাশিয়ার বিস্তৃত ভূ-প্রকৃতির মধ্যে শান্তির সন্ধান করেছেন। এবং এই প্রকৃতির মাধ্যমেই তাঁর ঈশ্বরচেতনার উন্মেষ। প্রথম জীবনের এইসব রচনার মধ্যে তাঁর এই ঈশ্বরচেতনার পরিচয় ধরা পড়েছেঃ Stundenbuch (The Book of the Hour), 1905, Buch der Bilder (The Book of Pictures), 1902.

এর পরে তাঁর কাব্যরচনার স্বর্ণযুগ (1903-1922)। অবশ্য এই যুগের উৎকর্ষের সূচনা হয়েছিলো পূর্ববর্তী যুগের 'Studenbuch' থেকেই। তাঁর 'New Poems' (Neue Gedichte—1907-1908)-এ তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতার সূত্রপাত হয় এবং তার চরম বিকাশ হয় 'Duineser Elegien' (1911-1922) কাব্যগ্রন্থে। রিলকের মৌলিকতা যেমন তার নিবিড় মরমিয়া উপলব্ধিতে, তেমনি তাঁর প্রকাশভঙ্গিতেও। রিলকের রূপক (Rilken Metaphor) ইউরোপীয় কবিদের একসময় বিশেষ আকৃষ্ট করেছিলো। তিরিশের দশকের ইংরেজ কবিরা রিলকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন খুব বেশি। রিলকে একসময় বলেছিলেন কবিতা শুধুই অনুভূতি নয়, গভীর উপলব্ধির প্রকাশ—"Verses are not, as people imagine, simply feelings, they are experiences."

রাশিয়ায় অবস্থানের সময় থেকেই রিলকে ঈশ্বরচেতনার মধ্যে শান্তির সন্ধান করেছেন এবং তারই ফলে রচিত হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা। একটি চিঠিতে রিলকে বলেছেন রাশিয়া এবং প্যারিস তাঁকে সব দিয়েছে। এর মধ্যে রাশিয়ার কাছে তাঁর ঋণ সবচেয়ে বেশি। Das Studenbuch কাব্যে ঈশ্বরের জন্যে এই আর্তিই মূল সুর—

„ Du, Nachbar Gott,
wenn ich dich manchesmal
in langer Nacht mit hartem Klopfen störe,—
so ists, weil ich dich selten atmen höre
und weiss : Du bist allein im Saal.
Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da,
um deinem Tasten einen Trank zu reichen :
Ich horche immer. Geib ein kleines Zeichen.
Ich bin ganz nah.“
—Das Stunden Buch

"প্রতিবেশী ভগবান, কত রাত্রে,
হঠাৎ দেওয়ালে দিয়ে টোকা
তোমার বিশ্রাম করি ব্যাহত—কেননা
মনে হয় তোমার নিশ্বাস যেন
শুনি কি শুনি না,
আর জানি, তুমি আছো একা।
এবং এমন কেউ উপস্থিত নেই
যে তোমার সন্ধানের অর্থ বুঝে,
দেবে তাতে সাড়া :
আমি আছি কান পেতে।
পাঠাও ইশারা।
আমি রয়েছি কাছেই।"[৮]

ভগবানের লীলার সার্থকতা মানুষকে নিয়েই। মানুষ না হলে ভগবানের লীলাই হতো ব্যর্থ। মানুষ না থাকলে ভগবানের অস্তিত্বও হতো অর্থহীন। এই কথাটাই বলেছেন রিলকে আরো তীক্ষ্ণ ভাষায়—

„ Was wirst du tum, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)
Bin dein Gewand und dein Gewerbe,
mit mir verlierst du deinen Sinn. “
—Das Stunden Buch.

"ভগবান, বলো, কী করবে তুমি—
আমার মৃত্যু হ'লে?
তোমার ভাণ্ড—ভাঙি যদি শতখণ্ডে?
তোমার পানীয়—যদি আমি হই নিঃশেষ,
আমিই তোমার বৃত্তি ও বেশবাস,
আমার সঙ্গে তোমারও অর্থ লুপ্ত।"[৯]

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'আমি এলাম তাই তো তুমি এলে' এবং 'আমি নইলে তোমার প্রেম হতো যে মিছে'—মনে করিয়ে দেয়।

ভগবানের উপলব্ধি অতীন্দ্রিয়। চোখ দিয়ে যে রূপ দেখি আমরা তার বাইরে ভগবানকে দেখা যায় চোখের বাইরে অন্তরের চোখ দিয়ে। কারণ 'অরূপ রতন' তিনি। আমরা জানি 'সুরদাস' কবিতায় ও 'রাজা' নাটকে এই কথাই বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। রিলকেও বলেছেন—

„ Lösch mir die Augen aus :
ich kann dich sehn, wirf mir die Ohren zu :
ich kann dich hören,

"নিবিয়ে দাও চোখ :
আমার তবু তুমি দৃশ্য;
বন্ধ কর কান, শুনতে পাই
তবু তোমাকে;

৮। তদেব, পৃ ৭৫
৯। তদেব, পৃ. ৭৬

und ohne Füsse kann
ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich
dich beschwören.
Brich mir die Arme ab,
ich fasse dich
mit meinem Herzen wie
mit einer Hand....."
—Das Stunden-Buch

পা যদি না-ও থাকে,
তোমার দিকে আমি চলমান;
জিহ্বাহীনভাবে তোমাকে
অবিরাম ডাকছি।
দাও না ভেঙে বাহু :
হৃদয় দেবো আমি বাড়িয়ে,
হাতের মতো তা-ই তোমাকে
ফের কাছে টানবে ......"[১০]

উপলব্ধির গভীরতায় গিয়ে রিলকে পেয়েছেন সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে। সবকিছুর পেছনে রয়েছে তাঁর ঈশ্বর-উপলব্ধি। বাইরের ঐশ্বর্যহীনতার মধ্যে তিনি অন্তরে ঐশ্বর্যবান। ঈশ্বর কবির কাছে দারিদ্র্যে ভাস্বর। আরো বড় কথা, ঈশ্বর স্থির, অবিনশ্বর, নিষ্ক্রিয় কোনো দিব্য সত্তা নন, তিনি সৃষ্টিশীল, তিনি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে জীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান। তিনি যেন শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে 'অতিমানস' শক্তির মতো।

„ Du... bist...
... der Bettler mit verborgenem Gesicht;
du bist der Armut grosse Rose,
dei ewige Metamorphose
des Goldes in das Sonnenlicht."
—Das Stunden-Buch

"তুমি ভিক্ষুক, মুখ চিরকাল গুপ্ত;
বিশাল গোলাপ, দারিদ্র্যে ভাস্বর-
তুমি সেই চিরকালীন রূপান্তর,
যাতে সোনা হয় সূর্যকিরণে মূর্ত।"[১১]

জার্মান কবিতায় নেচারালিষ্ট কবিরা জীবনের কুৎসিত দিকটি যথাযথ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তার ধারা দু দিকে প্রবাহিত হয়। স্টিফান জর্জ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সৌন্দর্য সন্ধানে মগ্ন হন, এবং সুন্দর জীবনের (das schöne Leben) আদর্শ তুলে ধরেন। অন্যদিকে রিলকে চলে যান অধ্যাত্ম-অন্বেষায়। এমন কি তিনি শ্রীঅরবিন্দের মতো মানুষের আত্মার সুন্দরতর গুণাবলীর প্রকাশের ফলে এক সুন্দরতর মানবজাতির সম্ভাবনাও দেখেছিলেন—

"In his last volumes of poetry, 'Der Stern des Bundes' (1914) and 'Das neue Reich' (1928) he is aware of the destruction that is inherent in his age and foretells the coming of a never and better civilisation, in which the finer aspects of man's spirit will prevail."[১২]

রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে—যেমন রবীন্দ্রনাথ এবং ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের মধ্যে—দেখা যায় যে, তাঁরা প্রথমে নিসর্গের প্রতি আকৃষ্ট, ক্রমে প্রকৃতি-প্রেমের গভীরতায় গিয়ে একটা আধ্যাত্মিক সত্তাকে আবিষ্কার করেন। কিন্তু রিলকের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ এইভাবে প্রকৃতিপ্রেমের মাধ্যমে হয়নি। প্রথম থেকেই রিলকের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা ছিলো। বরং বলা যায়-এই আধ্যাত্মিকতা দিয়েই তাঁর কবিজীবনের সূচনা। রিলকের

১০। তদেব, পৃ. ৭৭

১১। তদেব, পৃ. ৮০-৮১

১২। Robertson, J. G. 'A History of German Literature', 6th ed. 1970, p 568

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রহর পুঁথি' (Das Studenbuch)-তে আধ্যাত্মিকতাই প্রধান সুর। তারপরে তো তাঁর সমগ্র কবিজীবন ধরেই চলেছে ঈশ্বরের অনুসন্ধান।—যার চরম বিকাশ হয়েছে 'ডুইনো এলিজি' (Duineser Elegien 1923) তে। শেষ বয়সে অবশ্য মানবমহিমার দিকে রিলকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যেমন রবীন্দ্রনাথও হয়েছিলেন।

রিলকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রপুঁথি' (Das Buch der Bilder 1902) তে ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গে নিসর্গ-চেতনাও দেখা দিয়েছে। নিসর্গের মধ্যে ঋতুপ্রকৃতির একটা বিশেষ স্থান আছে এবং ঋতুপ্রকৃতির মধ্যে রিলকের কাছে বিশেষ স্থান পেয়েছে হেমন্ত। জীবনানন্দকে যদি হেমন্তের কবি বলা যায়, তাহলে রিলকে-কেও হেমন্তেরই কবি বলতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের হেমন্ত ভারতের মতো নয়। এ হেমন্ত 'অতি দৃপ্ত এই গ্রীষ্ম'। এখানে 'দুএকটি দক্ষিণী দিন' আছে। তাতে 'ওজস্বী মধু মদিরা'র কথাও আছে। কিন্তু প্রকৃতির এই উপলক্ষটুকু পাশেই পড়ে থাকে কবি তলিয়ে যান নিজের গৃহহীন শান্তিহীন নিঃসঙ্গ এলোমেলো জীবনের উদ্‌ঘাটনে।

"যার কোনো বাড়ি নেই, এখন সে তুলবে না ভিটে।
একা যে এখন, আরো বহুদিন কাটাবে সে একা,
জেগে ওঠা, বই পড়া, মাঝে-মাঝে লম্বা চিঠি লেখা—
এই সব শেষ ক'রে, শান্তিহীন, বেড়াবে সে পথে পথে হেঁটে
যখন বাতাসে মৃত পত্রদল ঝরে আঁকাবাঁকা।"[১৩]

এই আত্মউদ্‌ঘাটনেই রিলকের নিসর্গচিত্র গভীরতা লাভ করে, মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। হেমন্তের পাতা-ঝরা দিনে কবির মনে হয় আমরাও ঝরে যাই; প্রকৃতি থেকে জীবনের নশ্বরতায় চলে যান কবি। তবে এই নশ্বরতাতেই কবি যদি ঝরে যেতেন, তাহলে তিনি হতেন নৈরাশ্যবাদী কবি। কিন্তু সকল নৈরাশ্যের মধ্যে দুঃখ-দিনের সখা হাত বাড়িয়ে রয়েছেন মানুষকে ধরে তোলবার জন্যে, শান্তি দেবার জন্যে। এইভাবে কবির উত্তরণ ঘটেছে। হেমন্তের প্রকৃতি তাঁর কবিতায় উপলক্ষ, তাঁর জীবনদর্শনটাই মুখ্য—

"এবং পৃথিবী ঝরে প্রতি রাত্রে গতিপথচ্যুত,
নক্ষত্রশৃঙ্খল ছিঁড়ে—নিঃসঙ্গতায়।
আমরাও ঝ'রে যাই। এই হাত—তাও পড়ে ঝ'রে।
দ্যাখো অন্য সকলেরে: সকলেই এর অংশীদার।
তবু আছে একজন, যার হাত, কোমল, নির্ভার,
এইসব পতনেরে অন্তহীনভাবে রাখে ধ'রে।"[১৪]

রিলকের মধ্যে এই যে রবীন্দ্রসুলভ আধ্যাত্মিকতা এটা ভারতীয়দের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ধারা সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন।

১৩। Das Buch der Bilder (বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা', পৃঃ ৯০।)

১৪। *'Das Buch der Bilder' (বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ: 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা' ১৯৭০) পৃঃ ৯০-৯১।*

একথা আগে বলা হয়েছে যে, রাশিয়া রিলকেকে একাধিকবার আকৃষ্ট করেছে। রাশিয়ায় তাঁর দুটো প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিলো: এক, সেখানকার নিসর্গ-প্রকৃতি এবং দুই, সেখানে ঋষি টলস্টয়ের সান্নিধ্য। ঋষি টলস্টয়ের বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা রিলকের কবিতার মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে 'Das Studenbuch (The Book of the Hour)-এর কবিতাগুলিতে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা পত্নী ক্লারা ভেস্টফকে (Clara Westholf) ত্যাগ করার পর রিলকে প্যারিসে চলে যান এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। সেখানে ভাস্কর শিল্পী রঁদ্যার (Rodin) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর শিল্পকর্ম ভাস্করের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে নিটোলরূপে দেখার ও উপভোগ করার প্রেরণা যোগায়।

প্রথম জীবনে রিলকে কবিতা ছাড়া নাটক এবং ছোট উপন্যাসও লিখেছিলেন। যেমন— নাটিকা 'Ohne Gegenwart' (1898), 'Das tägliche Leben', (1900); ছোট উপন্যাস হলো 'Zwei Prager Geschichten' (1899), 'Von lieben Gott und anderes' (1900); এবং একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'Ewald Tragy' (1998)। এই রচনাগুলি কোনোটিই জনপ্রিয় হয়নি। তাঁর একটি রচনা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো, সেটা কাব্যধর্মী গদ্যে লেখা একটি গীতিকা—'Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke' (1899)। তাঁর প্রথম যুগের কাব্য রচনা 'Buch der Bilder (1902) থেকেই তাঁর প্রতীকী শিল্পরূপ গড়ে উঠতে থাকে। কারণ এখান থেকেই তাঁর কাব্যে জগৎ ও জীবন এবং ঈশ্বর ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর অনির্বচনীয় গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশিত হয়। তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা হলো— 'Das Studenbuch' (1905)। এ কাব্যে একজন রুশ সন্ন্যাসীকে আশ্রয় করে রিলকে নিজেরই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। রাশিয়ার নিসর্গ-প্রকৃতি রিলকের একটা চিরপ্রিয় আকর্ষণ ছিলো। এই প্রকৃতি রিলকেকে দিয়েছে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি। এই গ্রন্থ রচনার সময় তিনি টলস্টয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মরমিয়া উপলব্ধি অনেকটা ভারতীয়দের উপনিষদের ঋষিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সমগোত্রীয়। আর এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্যে রিলকে অপরিহার্যভাবেই প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। খ্রীস্টীয় মিথ (Myth) থেকেও তাঁর অনেকগুলি প্রতীক গৃহীত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে রাশিয়া ছাড়া ইতালী ও ফ্রান্সের পটভূমিও গৃহীত হয়েছে। এই কাব্যে মৃত্যু-চেতনা অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মতো রিলকের দৃষ্টিতে মৃত্যু এক মহাজীবনেরই অঙ্গ। রাশিয়া থেকে চলে আসার ফলে রিলকের কাব্যে ক্রমশ প্যারিসের পটভূমি এসে যায়। রিলকের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে 'Neue Gedichte' (1907) দেখি প্যারিসের দারিদ্র্যপীড়িত জনজীবন তাঁকে খুবই পীড়িত করেছিলো। এই সময় ভাস্কর রঁদ্যা (Rodin)র সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়। ভাস্করের চোখ দিয়ে এই সময় তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, ফলে লিরিক কবিতার মন্ময় উপলব্ধির বদলে তন্ময় চিত্র উপস্থাপনা এই সময়কার কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। এই কবিতাগুলি

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গদ্যকবিতার সঙ্গে তুলনীয়।

১৯১০-এ প্রকাশিত হয় রিলকের একমাত্র বৃহৎ উপন্যাস—'Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge'. এই উপন্যাসটিতে একজন কবির জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কবির নাম মাল্টে (Multe)। রিলকে নিজেই ছিলেন দারিদ্র্য ও ব্যাধিক্লিষ্ট। নিঃসঙ্গ জীবনও কাটিয়েছেন অনেকদিন। নিজের প্যারিস-বাসের অভিজ্ঞতাই এখানে বর্ণনা করেছেন। সেই জন্যে কেউ-কেউ কবির এই উপন্যাসটিকে কবির আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে থাকেন। রিলকের জীবনদর্শনকে কেউ-কেউ Philosophy of Immanence (Weltinnenraum) বলেছেন। এই জীবনদর্শন রিলকের জীবন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। রিলকে মানবজাতির আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। মানুষের তুচ্ছ অহং থেকে মুক্তি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব তার মানবতার আসল স্বরূপ। প্রাচ্য দেশের মতো বিশেষ করে ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনের মতো রিলকেরও বিশ্বাস ছিলো—মানুষের আত্মা হলো পরমাত্মার প্রতিরূপ। এই আত্মা আবার পরমাত্মার স্বরূপে ফিরে যেতে পারে বুদ্ধ ও যিশুর মতো মানবসেবা ও মানবপ্রীতির মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক নগরী প্যারিসে রিলকের দিনগুলি বিষণ্ণতায় কেটেছিল। ১৯১০ সালের পরেও কিছুদিন এই বিষণ্ণতা চলে। মৌলিক কাব্যপ্রেরণা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন আফ্রিকা, ফ্রান্স, ইতালী, ডেনমার্ক, সুইডেন ও স্পেনে। এলোমেলো ভাবে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন ইংরেজী, ফরাসী ও ইতালীয় কিছু কবিতা। মৌলিক রচনার প্রেরণা যখন আসছে না, প্রায় অনুর্বর দিন কাটছে রিলকের, সেই সময় ১৯১১-১২ সালে Triest-এর কাছে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। এইখানে দুইনো দুর্গে (Scgkiss Duino) তাঁকে ১৯১১ র ডিসেম্বর থেকে ১৯১২-র এপ্রিল পর্যন্ত একা কাটাতে হয়। এই নিঃসঙ্গ বাসের দিনগুলি তাঁর কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ ছিলো। আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দের ভগবৎ-দর্শনের মতোই এখানে হঠাৎ তাঁর দিব্যপ্রেরণা লাভ হয় এবং তাঁর বিখ্যাত মরমিয়া কাব্য 'দুইনো এলিজি'র প্রথম কবিতাটি রচিত হয়। ১৯১২ সালে একদিন এ্যাড্রিয়াটিক (Adriatic) সাগরের কূলে যখন তিনি অবস্থান করছিলেন তখন বহুকালের ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গ দুইনোতে হঠাৎ দিব্যপ্রেরণা এসে তাঁর অন্তরের কাব্য-নির্ঝরের মুখটি যেন খুলে দেয়। অনেকগুলি কবিতা লেখেন যা 'দুইনো এলিজি' নামে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য একান্তই অন্তর্মুখী অনুভূতির প্রকাশ। ১৯১৫ সালে স্পেনের নিসর্গ-প্রকৃতি দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"Everywhere appearance and vision came, as it were, together in the object, in everyone of them a whole inner world was exhibited"[১৫] এই অন্তরের জগৎকে (inner world) প্রকাশ করা যেন তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার মূল লক্ষ্য। দুইনোর কবিতাগুলিকে মরমিয়া (Mystic) কবিতা বলা যায়।

১৯২২ সালে তিনি অর্ফেউস্‌কে নিবেদিত ২৫টি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। ১৯২৬ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কবিতাবলী রচনা চলতে থাকে। তাঁর মৃত্যুব পরেও একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিলো, নাম Späte Gedichte (1934)। কিন্তু এই কাব্যের

১৫। Briefe aus den Jahren—1914—21, p 80

কবিতাগুলি আগের মতো উন্নত মানের নয়।

উপন্যাস, কাব্য ছাড়াও রিলকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন অনেক বন্ধু-বান্ধবকে। এইসব চিঠিতে রিলকের জীবনদর্শন ও কাব্যদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এইসব চিঠির মধ্যে শুধু "Letters to a Young Poet" বইটির একটি চমৎকার বাংলা অনুবাদ করেছেন তুলনামূলক সাহিত্যের নিবিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ডঃ রমেন্দ্র নারায়ণ নাগ।[১৬]

রিলকের কবিতার ভাষার মাধুর্য ও কোমলতার অন্যতম কারণ তিনি ফরাসী কবিতার অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি ফরাসী কবি বদলেয়ার (Charles Pierre Baudlaire 1821-57), ভোর্লেন (Paul Verlaine—1844-96), ভালেরির (Paul Valéry—1871-1945) অনেক কবিতা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

প্রথম থেকে রিলকের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিলো অবিচলিত। 'জসুয়ার সভা' (Jasuas Landtag) কবিতায় দেখি—যখন বাণী হলো ঈশ্বর আসেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে, তাঁর আবির্ভাব রুদ্র, আঘাতে আঘাতে সমস্ত তিনি ছিন্ন ভিন্ন করে দেন—

"Doch wenn ihr wählt,
wird euch der
Herr zermalmen."

তখনও কবির প্রত্যয় অবিচলিত। কবি বলছেন— হে ঈশ্বর, যখন আসবে তুমি দুঃখের বেশে, তখনো অতুলনীয় অহংকারে এবং অখণ্ড বিশ্বাসে আমি তোমায় ধরে থাকবো, প্রভু—

"Und dann, mit einem Hochmut
ohnegleichen:
'Ich und mein Haus, wir bleiben
ihm vermählt "[১৭]

তুলনীয় : 'দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমায় নাহি ডরিব হে'। —রবীন্দ্রনাথ।

রিলকের মন্ময়তা (Subjectivity) শেষ পর্যন্ত গভীর অন্তর্মুখীনতায় পর্যবসিত হয়। লাইস্‌ম্যান ও স্টিফেন স্পেণ্ডার যখন রিলকের 'দুইনো-এলিজি'র ইংরেজী অনুবাদ করেন, তখন তাঁর 'Wendung' (Turning) কবিতাটি (১৯১৪) প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *এই কবিতাটিতে রিলকে বলেছেন— চোখের দেখার কাজ শেষ হয়েছে, এবার* হৃদয়ের কাজে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে। সমস্ত বাইরের রূপ হলো অন্তরেরই ঝরনা থেকে উৎসারিত। লাইসম্যান ও স্টিফেন স্পেন্ডারের ভাষায়—"The multitudinous images he (Rilke) had collected must henceforth be regarded as equivalents for inward experiences, as material for 'heart-work".[১৮] একটি চিঠিতে রিলকে *তাঁর এই সময়ের প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে লিখেছেন—"Everywhere appearance and*

১৬। 'রিলকের চিঠি: জনৈক তরুণ কবিকে', (১৯৯৫)

১৭। Josuas Landtag ('German Lyric Poetry' by Macleod, Norman, 1930, p.150)

১৮। Leishsman, J. B. and Spender, Stephen· 'Introduction' to Rilke's 'Duino Elegies', 1981, p. 9

vision came, as it were, together in the object. in every one of them a whole inner world was exhibited".[১৯]

নির্জনতা মহৎ সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। বিশেষ করে রিলকে 'দুইনো এলিজি' ও 'অর্ফেউসের প্রতি সনেটগুচ্ছে' যে বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লিখেছেন, যেভাবে লিখেছেন, তার জন্যে নির্জন ধ্যান-তন্ময়তা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য ছিলো। রিলকের কাছে মহৎ সৃষ্টির জন্যে নির্জনতা চিরঈপ্সিত অবস্থান। জনৈক তরুণ কবিকে রিলকে লিখেছিলেন— "শিল্পসৃষ্টি নিঃসীম নিভৃতির ফসল"।[২০] দু-টি কালপর্বে দুইনো এলিজির কবিতাগুলি লিখেছিলেন—দুটি পর্বেই সেই নির্জনতা তাঁর অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই জুটে গিয়েছিলো। তার ইতিবৃত্ত রিলকের একাধিক জীবনীকার লিখেছেন। লাইসম্যান, স্টিফেন স্পেন্ডার এবং বুদ্ধদেব বসুও এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ১৯১২ সালের অক্টোবরে রিলকেকে সেই সুযোগ করে দিলেন তাঁর বান্ধবী মহান-হৃদয়া প্রিন্সেস মারী (Princess Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe)। এই রাজকুমারীর একটি দুর্গ ছিলো আড্রিয়াটিক উপকূলে—দুইনো দুর্গ। এইখানেই সমুদ্রের তীরে ভ্রমণের সময় একদিন হঠাৎ যেন দৈববাণী শুনতে পেলেন রিলকে :

„Wer, wenn ich schriee,
hörte mich denn aus der Engel
Ordnungen?"[২১]

—"যখন চীৎকার করি আমি,
তখন দেবদূতের জগতে
কে শুনবে আমার কথা?"

এ আহ্বান যেন রিলকেরই প্রতি। এই আহ্বানেই যেন সাড়া দিয়ে রিলকে লিখলেন দুইনো এলিজির প্রথম কয়েকটি কবিতা। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের এইসব কবিতার সংখ্যা খুবই কম। দিব্য প্রেরণা যেন ঈশ্বরের অহতুকী কৃপা। কখন আসে, আবার কখন নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তা কোনো কবিই বলতে পারেন না। দীর্ঘকাল আর প্রেরণার ছোঁয়া নেই। প্রায় দশবছর চলে দুইনো এলিজির কবিতার বিরতি। আবার নির্জন বাসের সুযোগ জুটে গেলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় পাঁচ বছর রিলকে জার্মানীতে আটকে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের পরে সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ হলো। রিলকে জার্মানী থেকে সুইজারল্যাণ্ডে চলে এলেন। এখানেও পত্রবন্ধু মের্লিনের সহযোগিতায় এবং এক ধনী ব্যক্তি ভের্নের রাইনহার্টের আনুকুল্যে সিয়েরে-র (Sierre) কাছে পেয়ে গেলেন মনোরম নির্জন নিবাস। পল্লীপ্রকৃতির বুকে একটি প্রাচীন দুর্গ। 'শাতোঁ দ্য মুজৎ' (Château de Mozote)। এখানে বসবাসের সময় ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারীতে আবার খুলে গেল তাঁর কাব্য-প্রেরণার দুয়ার। দুইনো এলিজির বাকি অধিকাংশ কবিতা রচিত হলো এখানে।

১৯। Rilke, Rainer Maria: 'Briefe aus den Johren 1914 -1921', p. 80
২০। 'রিলকের চিঠি : জনৈক তরুণ কবিকে'—ড: রমেন্দ্র নারায়ণ নাগ অনূদিত, ১৯৯৫, পৃ. ৪।
২১। Rilke, 'Duino Elegies', trans. by J. B. Leishman and Stephen Spender, 1st elegy. p. 24.

এখানে এলিজিগুচ্ছের কবিতাগুলি লেখার মাঝখানে তিনি লাভ করলেন তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের দিব্য-প্রেরণা। ফেব্রুয়ারী মাসেই মাত্র ১৭/১৮ দিনের মধ্যে রচনা করলেন অর্ফেউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছের ২৫টি কবিতা। তারপরে আবার চলে এলিজিগুচ্ছের রচনা। এলিজির পরে সমাপ্ত করেন অর্ফেউসের প্রতি নিবেদিত সনেট গুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩০টি কবিতা। এমনি করে ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী এই ক-দিনের মধ্যেই এলিজিগুচ্ছ ও অর্ফেউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছের সব রচনাই সমাপ্ত হয়ে যায় যেন ওপর থেকে নেমে-আসা এক দিব্য-প্রেরণার চাপে। স্মরণ করা যেতে পারে বৈদিক ঋষিরা বলতেন— বেদের সূক্তগুলি তাঁরা নিজেরা রচনা করেন নি, সেগুলি আগে থেকেই সূক্ষ্ম জগতে রচিত হয়েছিলো, তাঁরা শুধু ধ্যানে দেখতে পেয়েছেন মাত্র। এইজন্যে তাঁরা বেদকে বলতেন—'অপৌরুষেয়'। রিলকে তেমনি বলতেন—তাঁর কবিতাগুলি তাঁকে দেওয়া হয়েছে—এগুলি হলো 'দত্ত'। এগুলি রচনায় তাঁর নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। লাইস্‌ম্যান ও স্টিফেন স্পেন্ডার লিখেছেন—

"In his letters we constantly find him depreciating his own part in these words, speaking of them as having been 'given' to him, and expressing his reverent thankfulness for the 'grace' that enabled him to conceive and complete them "[২২]

বুদ্ধদেব বসুও একই কথা স্মরণ করে লিখেছেন—

"রিলকে নিজে অবশ্য প্রায়ই বলতেন যে, কবিতাগুলি তাঁকে 'দত্ত' হয়েছিলো, এক রহস্যময় 'শ্রুতিলিখনে'র লিপিকারমাত্র ছিলেন তিনি।"[২৩]

সব মহৎ কাব্যই এমনি করে ওপর থেকে আসে, অতিমানসিক স্তর থেকে দিব্যপ্রেরণা রূপে। ভারতীয় দার্শনিক নন্দনতত্ত্ববিদ শ্রীঅরবিন্দ একথা আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন— "*কাব্যের বাণী আমাদের উপরের একটা জগৎ থেকে আসে, সে জগৎ হল আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির অতীত এবং ঊর্ধ্বস্থ, আমাদের সত্তারই একটা স্তর—সে এমন একটা অতিমানস স্তর যেটা একটা আধ্যাত্মিক একাত্মতার সাহায্যে বস্তুকে তার অন্তরতম* এবং বৃহত্তম সত্যস্বরূপে দেখে থাকে। তার দেখার মধ্যে আছে একটা আলোর দীপ্তি ও দিব্য-রভস।"[২৪] রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার *নহে, তাহা দৈববাণী"।[২৫] বুদ্ধদেব বসু রিলকের 'দত্ত'* কথাটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। যদিও তিনি বলেছেন—'এখানে শব্দটির এক ভিন্ন অর্থ ধ্বনিত হচ্ছে,' তবু তিনিও স্বীকার করেছেন রিলকের কবিতার অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর দুটি প্রধান কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য এবং এক মরমিয়া উপলব্ধিই হল তাঁর পরম প্রাপ্তি "নিরীক্ষণ নয়, অন্তর্বীক্ষণ;

২২। Leishman, J B. and Spender, Stephen—'Introduction' to Rilke's—'Duino Elegics', 1981, p. 15

২৩। বসু, বুদ্ধদেব: 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা' ১৯৭০, পৃঃ ৫২।

২৪। শ্রীঅরবিন্দ: 'ভবিষ্যতের কবিতা' (The Future Poetry গ্রন্থের রামেশ্বর শ কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃঃ ৩৬০।

২৫। রবীন্দ্র রচনাবলী: ৮ম খণ্ড ('সাহিত্য'), বিশ্বভারতী, ১৩৬০, পৃঃ ৩৪২।

আত্মলোপ নয়, আত্মোপলব্ধি; অনাসক্তি নয়, আবেগতীব্রতা,—'প্রহরপুঁথি'র সুকুমার ফুলগুলি প্রগাঢ়ভাবে, অফুরন্তভাবে ফল হ'য়ে উঠলো এলিজি ও সনেটগুচ্ছে; রিলকের বৃত্ত পূর্ণ হ'লো।"[২৬]

অর্ফেউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছের উদ্দীপক বিভাব ছিলো অর্ফেউসের একটি মূর্তি। শাত্যঁ দ্য মুজ্যাতে থাকার সময় হঠাৎ একটি দোকানে মূর্তিটি দেখতে পেয়ে রিলকে কিনে এনেছিলেন এবং এটিকে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছিলেন। অর্ফেউসের এই মূর্তির হাতে একটি বীণা হিন্দুদের দেবী সরস্বতীর মতো। এই অর্ফেউস হলেন, গ্রীক পুরাণের মতে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার, বীণাবাদক ও গায়ক। তাঁর বীণার সুর এত মর্মস্পর্শী ছিলো যে, তা শুধু মানুষ বা পশুপ্রাণীদেরই আকৃষ্ট করতো না, বৃক্ষলতা, এমনকী পাহাড়ের পাথরের মধ্যেও সাড়া জাগাতো। গ্রীসের আদি কবি রূপেও তিনি কল্পিত। কেউ বলেন তিনি ধর্ম-প্রবর্তকও ছিলেন। তাঁর ধর্মের নাম—Orphism; কিন্তু তাঁর কোনো কবিতা বা ধর্মমতের কোনো নিদর্শন নেই। আসলে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র নন, পৌরাণিক দেবকল্প পুরুষ। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে অর্ফেউস এউরিদিস (Eurydice) নামে এক সুন্দরী পরীকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের পরে অকস্মাৎ সর্পাঘাতে তাঁর সেই পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় অর্ফেউস বিরহে বিহ্বল হয়ে পড়েন। ভারতীয়দের মনে পড়বে মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে সর্পাঘাতে সত্যবানের মৃত্যুর কথা। স্ত্রীর সন্ধানে অর্ফেউস ভূগর্ভস্থ মৃত্যুপুরীতে (Hades) যান। দেবতারা সেখানে তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর স্ত্রীর প্রাণ ফিরিয়ে দেন, কিন্তু শর্ত ছিলো তাঁর স্ত্রী যাবেন তাঁর পিছু-পিছু এবং পৃথিবীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি স্ত্রীর দিকে পিছু ফিরে তাকাতে পারবেন না। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ব্যাকুলতা বশে এ শর্ত তিনি মানতে পারেন নি। ফলে স্ত্রীকে এবার চিরকালের জন্যে হারাতে হলো—স্ত্রী পথেই অন্তর্হিতা হলেন। অর্ফেউস পৃথিবীতে থ্রেস নগরীতে ফিরে এলেন। কিন্তু স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে সেই বেদনা তিনি ভুলতে পারেননি এবং সমস্ত নারীজাতির প্রতি চিরবিতৃষ্ণা পোষণ করতে থাকেন। অর্ফেউসের এই নারীবিদ্বেষের পেছনে ছিলো তাঁর গভীর নারী-প্রেম। আর রিলকেও ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর কথায় চিরকাল 'নারী-নির্ভর'—*অবশ্যই স্থূল অর্থে নয়। জীবনের প্রতি পর্বে বিভিন্ন রমণী তাঁকে প্রেম, ভালবাসা, প্রেরণা,* আশ্রয়, সহযোগিতা দিয়েছিলেন; না হলে এই ভবঘুরে, ভগ্নস্বাস্থ্য, বিষয়বুদ্ধিহীন কবির জীবনধারণই কষ্টকর হতো, কবিতা রচনা হতো আরো বিঘ্নিত। অর্ফেউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছের মানবীয় প্রেরণা হয়তো এই গভীর নারীপ্রেম। কিন্তু এর একটি গভীর নান্দনিক প্রেরণাও ছিলো। অর্ফেউস ছিলেন—শ্রেষ্ঠ ও আদি সুরকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ। এই নান্দনিক ব্যক্তিত্বের প্রতি কবি রিলকের শ্রদ্ধা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্ফেউসের শ্রদ্ধার আরো একটি গভীরতর কারণের ইঙ্গিত পাই বহুভাষাবিদ সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনায়। গ্রীকপুরাণের যে কাহিনীটি শেষ হয়েছে অর্ফেউসের প্রণয়িনী ইউরিদিসের অন্তর্ধানে, রিলকে তার "করুণ পরিণতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মৃত্যুলোকে গিয়ে, মৃত্যুর আবহাওয়ায়

২৬। বসু, বুদ্ধদেব: 'রাইনের মারিয়া রিলকে'র কবিতা, ১৯৭০, পৃঃ ৫৫-৫৬।

ইউরিদিসের ঘটেছে রূপান্তর—Sea-change (শেক্সপীয়রের ভাষায়), শুধু দেহগত নয়, তার মধ্যে এসে গিয়েছে চিত্তগত বিপর্যয়, কেবল ভৌতিক নয়, তার হয়েছে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নবগঠন।"[২৭] অর্ফেউসের সঙ্গীত মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে দেবতারা যে তার প্রণয়িনীর প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—এই কাহিনীতেই মানুষের মৃত্যুকে জয়ের সাধনার ইঙ্গিত আছে। অর্ফেউসের এই কাহিনীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক-কাব্য 'সাবিত্রী'র (Savitri) আংশিক মিল আছে। সাবিত্রীও সত্যবানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিলো। যদিও শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের কাহিনীর বীজটি মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পে নিহিত আছে, তবু শ্রীঅরবিন্দ মূল কাহিনীটি প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তাঁর সুগভীর জীবনদর্শনকে প্রকাশ করেছেন।

রিলকের আধ্যাত্মিক চেতনার একটা বিবর্তন (Evolution) দেখা যায়। সেই বিবর্তন ঊর্ধ্বমুখী নয়, নিম্নমুখী। ঠিক দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করলে একে বিবর্তন বলা যায় না; বলা উচিত নিবর্তন (Envolution)। 'প্রহর পুঁথি' (Studenbuch)-তে তিনি ঈশ্বরের সর্বোচ্চ উপলব্ধির কথা বলেছেন, কিন্তু অনেক পরিণত রচনা হওয়া সত্ত্বেও 'দুইনো এলিজি'-তে (Duino Elegien) তাঁর উপলব্ধি যেন নীচের দিকে নেমে এসেছে—ঈশ্বরীয় স্তর থেকে নীচে দেবদূতের স্তরে। এ যেন উপনিষদের ভাষায় শিকড়টি ওপরে, শাখা-প্রশাখা নীচের দিকে—ঊর্ধ্বোমূলোহবাক্ শাখ। বুদ্ধদেব বসু এর একটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য বলে দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করছি ঃ "কত পরিবর্তনের স্তর পেরিয়ে রিলকে তাঁর অন্তিম সংশ্লেষে পৌঁচেছিলেন, কোনো মনস্ক পাঠকের তা দৃষ্টি এড়াবে না। কোথায় তাঁর সেই ঈশ্বর, যাঁকে একদা তিনি পথে-পথে অবির্ভূত হতে দেখেছিলেন, 'প্রহরপুঁথি'র প্রতিটি পাতা তাঁর নামাঙ্কিত ছিলো? 'ডুয়িনো এলিজি'তে 'ঈশ্বর' শব্দটি দু-বার মাত্র পাওয়া যায় (১:৫৮ ও ৮:১২); এখানে সেই উচ্চ-স্থানে যাঁরা অধিষ্ঠিত, তাঁরা দেবদূত—করুণাময় নন, ভয়ংকর, মানুষের পক্ষে অনধিগম্য। রিলকের মনের ভাবটি এখানে সহজেই বোঝা যায়: অজ্ঞান মানুষ, যে তার নিজের জীবনের অর্থ বোঝে না, তার মুখে ভগবানের নাম কী ক'রে উচ্চার্য হ'তে পারে? অতএব প্রয়োজন হ'লো দেবদূতের, যাঁর সাক্ষাৎ রিলকের পূর্বরচনায় আমরা বহুবার পেয়েছি, প্রধানত চিত্রকল্পরূপে, কিন্তু এখানে যিনি বলতে গেলে সশরীরে 'অবতীর্ণ'—হিন্দুরা যাকে অবতার বলে, যেন তা-ই। রেনেসাঁসের জ্ঞানীরা যেমন মানুষকে স্থান দিয়েছিলেন পশু ও দেবদূতের মধ্যস্থলে, রিলকে তেমনি ভগবান ও মানুষের মধ্যে দেবদূতকে স্থাপন করলেন। তাঁরা নন খ্রীষ্টীয় দেবদূত (এ বিষয়ে রিলকের ঘোষণা অতি প্রবল); ভগবানের সঙ্গে অমেয় দূরত্ব নিয়েও মানুষের তুলনায় তাঁরা দেবকল্প, তাঁদের চৈতন্যবিভা আমাদের পক্ষে অসহনীয়। অথচ তাঁদের সঙ্গে কোনোরকম বার্তা-বিনিময় করতে না পারলে আমরা—প্রকৃতিচ্যুত, উদ্বাস্তু মানুষ—এই পৃথিবীতে আমাদের নিজস্ব, মানবিক স্থানটি খুঁজে পাবো না।[২৮]

২৭। গুপ্ত, নলিনীকান্ত. রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৭৬ (কবির্মনীষী) পৃঃ ১৭৭-৭৮।
২৮। বসু, বুদ্ধদেবঃ 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা'—১৯৭০, পৃঃ ৫৯।

মনে পড়ছে দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ একদিকে ওপরে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তর সচ্চিদানন্দ, অন্যদিকে নীচে মানুষের মানবীয় স্তর— দেহ-প্রাণ-মন—এই দুই কোটির মধ্যে একটি প্রধান মধ্যবর্তী স্তরের কথা বলেছেন—অতিমানস (Supramental) স্তর। এবং বলেছেন বৈদিক দেবতারা এই মধ্যবর্তী স্তরের সত্তা :

"It is the cryptic verses of the Veda that help us here, for they contain though concealed, the gospel of the divine and immortal Supermind and through the veil some illununing flashes come to us. We can see through these utterances the conception of this Supermind as a vastness beyond the ordinary firmaments of our consciousness . ... these seem to be the essential terms of the Vedic description. The Gods, who in their highest secret entity are powers of this Supermind, born of it, seated in it as in their proper home, are in their knowledge *'truth-conscious' and in their action possessed of the 'seer-will'.[২৯]

হিন্দুদের অন্যান্য দেবদেবীরা অধিকাংশই হলেন অতিমানসের একটু নিম্নবর্তী অধিমানস (Overmind) স্তরের সত্তা। মনে হয় রিলকের দেবদূতেরা এই রকমই মধ্যবর্তী স্তরের দেবতা। বুদ্ধদেব বসু হিন্দুদের অবতারের সঙ্গে রিলকের দেবদূতের (Angel) সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু রিলকের দেবদূতের সঙ্গে হিন্দুদের অবতারের সাদৃশ্য নেই, সাদৃশ্য আছে বরং বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে। কারণ হিন্দুদের অবতার হলেন করুণাময়, বরং বৈদিক দেবতারাই কেউ-কেউ হলেন ভয়ঙ্কর। অনেক স্তব-স্তুতি করে সোমরস নিবেদন করে তাঁদের সন্তুষ্ট করতে হয়। তাছাড়া অবতারেরা কোনো মধ্যবর্তী স্তরের সত্তা মন, যখন তাঁরা অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে, তখন এই পৃথিবীর সত্তাই তাঁরা; কিন্তু দেবদূত ও বৈদিক দেবতারা মধ্যবর্তী স্তরের সত্তা।

তাছাড়া রিলকের দৃষ্টিতে দেবদূতেরা হলেন 'terrible' রিলকের ভাষায় 'schrecklich':

„Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel
Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme
einer mich plötzlich ans Herz : ich verginge von seinem
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts
als des Schricklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,
und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich."[৩০]

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদেও তাঁরা 'ভয়ঙ্কর'।

"কে, আমি চীৎকার ক'রে উঠি যদি, হবে শ্রোতা শ্রেণীবদ্ধ ঐ/দেবদূত-পর্যায়ের মধ্য

২৯। Sri Aurobindo. 'The Life Divine', 1993, p. 124
* "truth-conscious" and in their action possessed of the "seer-will"
৩০। Rilke, Rainer Maria 'Duino Eligies, id. by J.B Leishman Stephen Spender, 1981. p. 24

থেকে? আর যদি কোন-একজন অকস্মাৎ/আমাকে ঘনিষ্ঠ বুকে চেপে ধরে, আমি হবো মলিন, বিলীয়মান/তার আরো সমর্থ সত্তার মধ্যে। কেননা সৌন্দর্য আর-কিছু নয়,/শুধু সেই আতঙ্কের আরম্ভ, যা অতিকষ্টে আমাদের পক্ষে নয়/এখনো অসহনীয়। আরাধ্যা সে আমাদের, যেহেতু সে শান্ত উপেক্ষায়/তার সাধ্য সংহার হানে না। প্রতি ভিন্ন দেবদূত ভয়ঙ্কর।"[৩১]

আরো লক্ষণীয়, শ্রীঅরবিন্দের মতে অতিমানস স্তরের অবতরণের প্রভাবে মানবীয় জীবনের দিব্য-রূপান্তর (transformation) হবে। এই রূপান্তরের পদ্ধতি ও তাৎপর্য তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন:

"Transformation means that the higher consciousness or nature is brought down into the mind, vital and body and takes the place of the lower. There is a higher consciousness of the true self, which is spiritual, but it is above; if one rises above into it, then one is free as long as one remains there, but if one comes down into or uses mind, vital or body—and if one keeps any connection with life, one has to do so, either to come down and act from the ordinary consciousness or else to be in the self but use mind, life and body, then the imperfections of these instruments have to be faced and mended—they can only be mended by transformation"[৩২]

রিলকে শ্রীঅরবিন্দের মতো অত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে রূপান্তরের তাৎপর্য ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন নি, কিন্তু তাঁর কবি-চেতনাতেও মানবসত্তার রূপান্তর আভাসিত হয়েছে:

„Priese dem Engel die Welt, nicht die unsägliche
........Und diese, von Hingang
lebenden Dinge verstehn, dass du sie rühmt; vergänglich,
traun sie ein Rettendes uns, den Vergängichsten, zu.
Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbarn Herzen verwandeln......
Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar
in uns erstehn?—Ist es dein Traum nicht,
einmal unsichtbar zu sein?—Erde! unsichtbar!
Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender
Auftrag?"[৩৩]

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ :

"দেবদূতে শোনাও বন্দনা, এই পৃথিবীর—

৩১। বসু, বুদ্ধদেব: 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা' ১৯৭০, পৃঃ ১১৭।

৩২। Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Vol 24, 1972, p. 1143 ('Transformation', compiled from the writings of Sri Aurobindo, the Mother 1993. p. 2)

৩৩। Rilke, Rainer Maria : 'Duino Elegies,' ed. by J B Leishman & Stephen Spender, 1981, p. 86.

বচনাতীতের নয় :
অনুভূত জ্যোতির উদ্ভাসে
তুমি পারবে না তাঁকে চমকে দিতে।
*　　*　　*　　*
বস্তুরা বিদায়জীবী,
তাই বোঝে তোমার বন্দনা;
তারা ক্ষণপলাতক, আমাদেরই সাহায্যে উদ্ধার খোঁজে—
সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী আমাদের।
আমাদের হাতে চায় রূপান্তর
আমাদের অদর্শন হৃদয়ের মধ্যে চায় রূপান্তর,
*　　*　　*　　*
পৃথিবী, এই কি ঠিক তোমারও ঈপ্সিত নয় :
আমাদের মধ্যে এই অদৃশ্য উত্থান?
তোমারও কি স্বপ্ন নয়
একদিন দৃশ্যাতীত হ'য়ে যাওয়া?
হে পৃথিবী! দৃশ্যাতীত!
কী তোমার অলঙ্ঘ্য আদেশ,
বলো, যদি নয় এই রূপান্তর?"[৩৪]

এই রূপান্তরের ইঙ্গিত রিলকে পেয়েছিলেন অর্ফেউসের সাধনার মধ্যে। এইজন্যে অর্ফেউস যেন হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনদেবতা। যে ইঙ্গিতটি তিনি অর্ফেউসের মধ্যে পেয়েছেন তাকেই রূপায়িত করেছেন অন্যভাবে—মৃত্যুকে করেছেন জীবনের অবসান নয়, জীবনের পূর্ণতা-দাতা। মানবী ইউরিদিসকে মৃত্যুই তো করেছে সমস্ত সীমা থেকে মুক্ত, পতির দাসত্ব থেকে মুক্ত, পূর্ণতার প্রতীক। অর্ফেউসের চেষ্টায় জীবন ফিরে পেয়ে, ইউরিদিস চলেছে অর্ফেউসের পিছু পিছু—

"ঘিরে রেখেছে নিজেকে নিজের মধ্যে,
চলেছে আনমনে—
মৃত্যু তার কি পূর্ণতা দিয়ে তাকে পূর্ণ করে তুলছে।
পরিণত ফলের মধুরতায় আর গাঢ় আঁধারে পূর্ণ হয়ে,
সে রয়েছে তার মহামরণের সঙ্গে মিলে—
এমন নতুন জিনিস তা,
আর-কিছু সে-সময়ে আর তার অন্তরে প্রবেশ করে না।
ফিরে আবার সে কুমারী হয়ে উঠেছে নতুনভাবে,
স্পর্শের অতীত এখন,

৩৪। বসু, বুদ্ধদেব. 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা, ১৯৭০ পৃঃ ১৩০

নারীত্ব তার মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় ফুলের মত
আপনাকে গুটিয়ে নিয়েছে,
পাংশুল অঙ্গ তার
হারিয়ে ফেলেছে পত্নীত্বের অভ্যাস সব........
আর সে সেই সুন্দরী রমণী নয়,
কবির কাব্যকে যে একদিন প্রতিরণিত করে তুলেছিল,
আর সে সুরভিত প্রসারিত
শয্যার ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ নয়,
পতির সম্পত্তি নয়।"[৩৫]

রূপান্তরের মাধ্যমে মৃত্যুর বিরুদ্ধে এই অভিযান একটু ভিন্ন পথে হলেও পূর্ণরূপে রূপায়িত হয়েছে এ যুগের আর এক কবিমনীষী শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী'তে (Savitri)। রিলকে এবং শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানবাত্মার সংগ্রাম এবং অমৃতের অধিকার লাভের জন্যে তার চিরন্তন প্রয়াসের বাণীই উচ্চারণ করেছেন, তবু রিলকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কিছু পার্থক্যও আছে। প্রথমত রিলকের কবিতায় সংগ্রাম করেছে পুরুষ, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে নারীকে। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যে সংগ্রামী চরিত্রটি নারী, মৃত্যু থেকে রক্ষা করা হয়েছে পুরুষকে। কিন্তু এহো বাহ্য কথা। ভেতরে দেখি রিলকের কাব্যে নারীকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সমস্ত সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং কবির শেষ ঘোষণা—

'সে সুরভিত প্রসারিত
শয্যার ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ নয়,
পতির সম্পত্তি নয়।'

নারীবাদের যুগে রিলকের কথা প্রগতিশীল শোনাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মহাভারতের মূল কাহিনী ও শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের বাণী আরো যেন প্রগতিশীল। সেখানে প্রথমাবধিই নারী (সাবিত্রী) মুক্ত, পুরুষের সম্পত্তি কোনো সময়েই নয়। পুরুষের অধিকার থেকে নারীমুক্তির প্রয়োজনই হয় না। এখানে সাধনা আরো গভীর, সংগ্রাম আরো মৌলিক। রিলকের কাব্যে নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শুধু ইঙ্গিতটুকু আছে। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যে আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, চেতনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে মানবাত্মার অভিযান ও অন্তর্লোকের গভীরতম সাধনার উপলব্ধির জীবন্ত কাহিনী। সে-কাহিনী কাব্য-রসোত্তীর্ণ, চূড়ান্ত আশাবাদের দৃপ্ত ঘোষণা :

"Fate shall be changed by an unchanging will."[৩৬]

৩৫। নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ 'Requiem and Other Poems' থেকে (গুপ্ত, নলিনীকান্ত· রচনাবলী ২য় খণ্ড, ১৯৭৬, (কবিমনীষী), পৃঃ ১৭৮ ৭৯।

৩৬। Sri Aurobindo 'Savitri', Book-III. canto-IV

ঘ. প্রসঙ্গ : নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা

১. নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা

নন্দনতত্ত্ব ঃ বাংলায় বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই Aesthetics (< Æsthetics)-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।[১] (১৩৪৩)

তারপর থেকেই বাংলায় এ শব্দটি ক্রমশ বহু-প্রচলিত ও প্রায় সর্বজন-গৃহীত হয়েছে। নন্দনতত্ত্ব শব্দটির তাৎপর্য ও যথাযোগ্যতা বিচারের আগে মূল Aesthetics কথাটির তাৎপর্যই আমাদের বুঝে নিতে হবে। New Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে— আলেকজান্ডার বাউমগার্টেনই গ্রীক aisthēsis (perception) শব্দের ওপরে ভিত্তি করে প্রথম Aesthētics শব্দটি সৃষ্টি করেন।[২]

ইতালীয় নন্দনতত্ত্ববিদ বেনেদেত্তো ক্রোচে আরো বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন—বের্লিনের তরুণ গবেষক আলেকজান্ডার বাউমগার্টেন (Alexander Baumgarten) মাত্র একুশ বছর বয়সে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার পরে তাঁর Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibua' শীর্ষক যে অভিসন্দর্ভটি প্রকাশ করেন,[৩] তাতেই 'the word "Æsthetic" appears for the first time as name of a special science'[৪] এই অভিসন্দর্ভে তিনি মূলত rhetoric বিষয়ে বিশেষ বৈজ্ঞানিক আলোচনা অর্থে aesthetic শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে Aesthetic নামে একটি সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই প্রকাশ করেন। তার পর থেকেই শব্দটি পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে। অনেকে বাউমগার্টেনকে নন্দনতত্ত্বের জনক ('father of Aesthetic) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এই গ্রন্থে অনুভূতি-গ্রাহ্য বিষয় ('sensible facts') তাঁর আলোচ্য বিষয় হলেও বুদ্ধি (intellect) ও কল্পনার (imagination) মধ্যে পার্থক্যটি তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি। এবং নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে যেন ঘুলিয়ে ফেলেছেন। ক্রোচে তাঁকে নন্দনতত্ত্বের জনক বলতে চাননি। কারণ বাউমগার্টেন যদিও Aesthetic শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন তবু তিনি নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়টি ঠিক চিহ্নিত করতে পারেন নি। এই বিষয়টি ঠিক-ঠিক ধরেছিলেন ইতালীয় মনীষী জিয়ামবাত্তিস্তা ভিকো (Giambattista Vico)। তাই Aesthetic শুধু নামের বিচারে নয়, ঠিক বিষয়বস্তুর বিচারে ভিকোকেই Aesthetic অর্থাৎ যথার্থ নন্দনতত্ত্ব-বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা যায়।

১। রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্যের পথে' (আধুনিক কাব্য শীর্ষক প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩, নূতন সং ১৩৬৫, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১১০।

২। "The name aesthetics first appeared in 'Reflections on Poetry' (1735) by Alexander Baumgarten. ..Drawing upon the Greek word for perception (aisthēsis), Baumgarten coined the word aesthetics for the Science of the perceptual cognition i.e of perception as clear but confused knowledge" -*New Encyclopaedia Britannica.* Vol I, 15th, ed, p 150

৩। Halac Magdeburgicae, 1735, (reprinted. ed B. Croce, Naples, 1900)

৪। Croce, Benedetto : '*Æsthetic*', trans by Douglas Ainslie, 5th impress. Rupa and Co p. 212

তিনিই নন্দনতত্ত্বের আসল জনক। ক্রোচে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

The real revolutionary who by putting aside the concept of probability and conceiving imaginalion in a novel manner actually discovered the true nature of poetry and art and, so to speak, invented the science of Æsthetic, was the Italian Giambattista Vico."[৫]

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ভিকো তাঁর গ্রন্থ 'De constantia iurisprudentis'-এ প্রথম কাব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'Scienza nuova' গ্রন্থে কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে পূর্ণ বিকশিত রূপদান করেন। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর আলোচনাকে বর্ধিত করে দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেন।—(১) Della Sapienza poetica এবং (২) Della Discoperta del vero Qmero। এমনি করে তিনি নন্দনতত্ত্বকে একটি নতুন বিজ্ঞান রূপে (Sienza Nuova) দাঁড় করিয়ে দেন। আগে কাব্য ও শিল্প সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসে ও ভারতবর্ষে বহু মনীষীই আলোচনা করেছেন, কিন্তু ভিকোই আধুনিক কালে এই বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দান করেন। এইজন্যে তাঁকেই আধুনিক নন্দনতত্ত্বের (Æsthetics) জনক বলা যায়। ক্রোচে বলেছেন—

"Our view is that Æcthetic is the science of the expressive (representative or imaginative) activity. In our opinion, therefore, it does not appear until a precise concept is formulated of imagination representation or expression, or in whatever other manner we prefer to name that attitude of the spirit."[৬]

ভিকোর আগে শিল্পের ও কাব্যের তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সৃষ্টি-কল্পনার তত্ত্ব বা আত্মিক ক্রিয়ার তত্ত্ব আগে ব্যাখ্যাত হয়নি। সুতরাং কল্পনার আলোকে তথা আত্মিক ক্রিয়ার আলোকে শিল্পের তত্ত্ব আলোচনাই হলো নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এই অর্থে নন্দনতত্ত্ব হলো এক আধুনিক বিজ্ঞান।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—'নন্দনতত্ত্ব হলো সুন্দরের দর্শন' ('The philosophy of the beautiful') কিন্তু এই সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

কারণ সুন্দর দুরকমের আছে—এক: প্রকৃতির সৃষ্টি বা ঈশ্বরের সৃষ্টি, দুই: মানুষের সৃষ্টি অর্থাৎ শিল্পের সৌন্দর্য। নন্দনতত্ত্ব হলো মানুষের সৃষ্টি শিল্পের সৌন্দর্যের দর্শন। সুতরাং কার্যত দাঁড়াচ্ছে শিল্পেরই বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। যেমন— শিল্প কী, শিল্পের প্রেরণা কী, শিল্পের উদ্দেশ্য কী, শিল্পের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া কী, শিল্পের সঙ্গে জীবন ও সমাজের সম্পর্ক কী ইত্যাদি। Aesthetics বলতে আসলে শিল্পেরই তত্ত্ব বোঝায় একথা সর্বজন-স্বীকৃত বলেই New Encyclopaedia Britannica-তেও বলা হয়েছে : The discipline called aesthetics may be described broadly as the study of beauty and, to a lesser extend, its opposite, the ugly. It may include generaly and theoretical studies of the arts and of related types

৫। ibid p 220

৬। ibid. p 155

৭। Basanguet, Besnard 'Histry of Aesthic', 1956, p 1

of experiences, such as those of philosophy of art criticism, and the philosophy and sociology of the arts ....

.... The arts may include the visual, and theatre arts, music, dance and literature."[৮]

Aesthetics-এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা এর বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণয় করতে পারি। Aesthetics এর বাংলা প্রতিশব্দ দার্শনিক নন্দনতত্ত্ববিদ আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নির্ণয় করেছেন 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', অধ্যাপক প্রবাস জীবন চৌধুরী বলেছেন 'সৌন্দর্য দর্শন', অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন 'শিল্পতত্ত্ব' আর সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নন্দনতত্ত্ব'। aisthesis গ্রীক উৎসের তাৎপর্য ধরে এগোলে একে বলা উচিত 'রসশাস্ত্র'। আগেই বলা হয়েছে Aesthetics কথাটি সৃষ্টি করা হয়েছে গ্রীক শব্দ aisthesis থেকে এবং এই গ্রীক শব্দটির অর্থ হলো perception অর্থাৎ উপলব্ধি, বোধ, প্রত্যক্ষ অনুভব; আর অনুভব-উপলব্ধি-আবেগের যে শিল্পিত রূপায়ণ তার আস্বাদ্যমান অবস্থাই হলো রস।

গ্রীক ভাষাবিদ শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন—

"Aesthetics is concerned mainly with beauty, but more generaly with *'rasa'*, the response of the mind, the vital feeling and the sense to a "taste" in things which often may be but is not necessarily a spiritual feeling Aesthetics belongs to the mental range and all that depends upon it."[৯]

সুতরাং Aesthetics ও 'রস' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচারে অনেকটা কাছাকাছি; সেদিব থেকে Aesthetics-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'রসশাস্ত্র' কথাটিও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে রসশাস্ত্রে বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব সংযোগে রস নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াই প্রধানভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্য Aesthetics-এর আলোচ্য বিষয়ের এলাকা অনেক ব্যাপক। পাশ্চাত্য Aesthetics-এর মধ্যে এমন সব আলোচ্য বিষয় গৃহীত হয়েছে, যা ভারতীয় রসশাস্ত্রে উপযুক্ত স্থান পায়নি।

বিশেষত Aesthetics-এ সৃজনী কল্পনার (Creative Imagination) স্বরূপ ও ভূমিকা যে রকম বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে, রসশাস্ত্রে তা পরোক্ষ ভাবে স্বীকৃত হলেও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়নি। এইজন্যে কেউ-কেউ Aesthetics এর প্রতিশব্দ হিসাবে রসশাস্ত্র গ্রহণ করতে চাননি।

Aesthetics-এর সবচেয়ে সার্থক ও সহজ প্রতিশব্দ হলো শিল্পতত্ত্ব, কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন এবং যেহেতু এই শব্দটিই অধুনা ব্যবহৃত হচ্ছে সেহেতু আমরাও বর্তমান আলোচনায় এই শব্দটিই গ্রহণ করেছি। এই শব্দটি ব্যবহারেরও যৌক্তিকতা আছে। প্রথমত শব্দটির ব্যুৎপত্তি গত অর্থ হলো আনন্দিত

৮। *The New Encyclopaedia Britannica*, Macropaedia, Vol I, 15th ed, p 149

৯। *'Letters of Sri Aurobindo'*, 3rd Series, Bombay, 1949, pp 98-99

(নন্দ+ণিচ্+অন কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী), বা আনন্দিত হওয়া, সেহেতু শিল্পের উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতবহ এই শব্দটি। তবে শুধু এইটুকু ব্যাখ্যা দিলেই শব্দটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে যাবে। যে-কোনো রকমের আনন্দ দেওয়া শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে আনন্দ দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য। আবার এই সৌন্দর্য প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, শিল্পের সৌন্দর্য হওয়া চাই। এতখানি বিশেষীকৃত অর্থ যুক্ত হয়ে আছে আমাদের 'নন্দনকানন' কথাটির মধ্যে। কাননের সৌন্দর্য আর অরণ্যের সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। অরণ্যের সৌন্দর্য হলো প্রকৃতির সৃষ্টি। কাননের বা উদ্যানের সৌন্দর্য হলো মানুষের সৃষ্টি। আবার শিল্পের সৌন্দর্য হলো স্থূল পার্থিব ভোগের এলাকার বাইরের—এই কথাটি বোঝাবার জন্যেই আলঙ্কারিক বলেছেন রস হলো অলৌকিক। নন্দনকাননও হলো স্বর্গের উদ্যান, মানুষের ভোগ-সুখের বাইরের সৌন্দর্য, তা যেন স্বর্গীয়। এই নান্দনিক সৌন্দর্যই রূপায়িত হয়েছে "উর্বশী' কবিতায়। "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,

হে নন্দন বাসিনী উর্বশী।
অখিল মানস স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।।"

সে নারী হলো সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। সে হলো সমস্ত ভোগ-সম্পর্কের বাইবে পবিত্র পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতীক। সুতরাং Aesthetics এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নন্দনতত্ত্ব'ই গ্রহণীয়। আর নন্দনকানন হলো স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীক অর্থাৎ মানুষের স্থূল ভোগ-সুখের বাইরের সৌন্দর্য।

এইসব কথা বিবেচনা করে Aesthetics-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটিই গ্রহণ করা যায়।

শিল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও শ্রেণী বিভাগ ঃ আগেই বলেছি শিল্পসৃষ্টি মূলত মনের ক্রিয়া। শিল্পের প্রেরণা এবং ভাববস্তু, এমন কী শিল্পরূপের মূল কাঠামো মনেব মধ্যে আসতে পারে নীচের অবচেতন-অচেতন স্তর থেকে এবং ওপরের অধিচেতন / অতিচেতন স্তর (Subliminal / Super-consciousness) অধিচেতন Subliminal consciousness বা Super-conciousness স্তর থেকে, কিন্তু তাকে কার্যান্বিত কবে শিল্প সৃষ্টি কবে মনই।

এই মন হলো মানুষের অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য (differentia)-এই মন মানুষকে জড়বস্তু ও পশুপ্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। বিবর্তনের ধারায় পৃথিবীতে গ্যাসীয় স্তর জমে প্রথমে জড় পদার্থের জন্ম হয়েছিলো। ক্রমে জড় থেকে বিবর্তনের ধারায় শ্যাওলা বৃক্ষলতা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ও উন্নত প্রাণীর জন্ম হল—পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হলো। উন্নত প্রাণী আরো উন্নত হলো—মানুষের জন্ম হলো। মানুষ হলো মননশীল প্রাণী—পৃথিবীতে প্রাণের পরে মনের বিকাশ হলো। এই মন যত উন্নত হলো, তত তার নানা বৃত্তির বিকাশ হলো। এই মনের তিনটি প্রধান দিক বা মনেব তিনটি প্রধান বৃত্তি হলো মনন (thinking), সঙ্কল্প (willing) ও (অনুভব) feeling। এর মধ্যে যে অনুভবের দিক (feeling aspect), শিল্পসৃষ্টি হলো তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, যদিও মনন ও সঙ্কল্পের ক্রিয়াও শিল্পসৃষ্টিতে অল্পাধিক অংশ গ্রহণ করে। মনের মনন দিকের প্রকাশ ঘটে

যথাক্রমে যুক্তির সাহায্যে চিন্তা করার মধ্যে, সঙ্কল্প বা ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে সেই ইচ্ছাকে ক্রিয়া বা কার্যে রূপায়িত করার মধ্যে, আর অনুভবের দিকটির প্রকাশ ঘটে অনুভবের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক বস্তু সৃষ্টি করার মধ্যে অর্থাৎ শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে। আর মনের এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার তিনটি আদর্শ বা উদ্দেশ্য আছে যাকে আমরা বলি মূল্যবোধ অর্থাৎ এই ত্রিবিধ কর্মের পেছনে রয়েছে তিনটি আদর্শ বা মূল্যবোধ (value sense)। চিন্তার উদ্দেশ্য হলো যুক্তির আশ্রয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং সত্য (Truth) কে জানা। সঙ্কল্প রূপায়ণের জন্যে যে কর্ম করি আমরা, সেই কর্মের উদ্দেশ্য বা আদর্শ হলো নিজের ও সমাজের মঙ্গল-বিধান—এখানে মূল্যবোধ হলো শিব (good), আর মানুষের মনের যে অনুভূতির দিক সেটা সৃষ্টি করে শিল্প। এখানে আদর্শ হলো সুন্দর (Beauty)। এইভাবে Truth, Good, Beauty. যাকে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ বলা যায়, সেইটা এখানে আদর্শ। এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার যে তত্ত্বকথা (theory) বা বিদ্যা (discipline) তা হলো যথাক্রমে পরাবিদ্যা (Metaphysics), নীতিশাস্ত্র (Ethics) এবং নন্দনতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্ব (Aesthetics)।

বিষয়টা এইভাবে একটা চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা যায়—

মন (Mind)

চিন্তা (Thinking),	সংকল্প (Willing)	অনুভব (Feeling)	← তিনটি বৃত্তি (Faculty)
↓	↓	↓	
জ্ঞান (Knowledge),	ক্রিয়া (Action)	সৃষ্টি (Creation)	← ত্রি বৃত্তির প্রকাশ
↓	↓	↓	
সত্য (Truth),	শিব (Good)	সুন্দর (Beauty)	← তিনটি মূল্যবোধ
↓	↓	↓	
পরাবিদ্যা (Metaphysics)	নীতিশাস্ত্র (Ethics)	নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics)	← তিনটি বিদ্যা

নন্দনতত্ত্বের (Aesthetics) আলোচ্য বিষয় এবং মানবমনের সঙ্গে তার সম্পর্ক উপরিউক্ত চিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখন এই শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলে শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের এবং সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কটা স্পষ্ট করে ধরা যাবে। এর জন্যে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির আদি পীঠস্থান গ্রীসের নন্দনতত্ত্ববিদ্ আরস্তোতেলের পোয়েটিক্স্[১০] এ দেওয়া শিল্পের অভিজ্ঞানটি হাতে নিয়েই এগোতে চেষ্টা করবো এবং তাঁর সংজ্ঞার পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। নন্দনতত্ত্বের প্রথম বিধিবদ্ধ উদ্ঘাটন এই গ্রন্থেই হয়েছে।

আরিস্তোতেল তাঁর গ্রন্থের সূচনাতেই শিল্পসাহিত্যের এই অভিজ্ঞানটি দিয়েছেন ঃ "Epic

১০। গ্রন্থটি 'পোয়েটিক্স্' নামেই সর্বজন পরিচিত, মূল গ্রীক ভাষায় এর নাম ('পেরি পোয়েটিকাস্')। ইন্‌গ্রাম বাইওয়াটার (Ingram Bywater)-কৃত ইংরেজী অনুবাদ তাঁর 'On the Art of Poetry' গ্রন্থে, বুচার (A H Butcher)-কৃত ইংরেজী অনুবাদ 'Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art' গ্রন্থে রয়েছে। আমরা অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব' এবং অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের 'অ্যারিস্টটল কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ পাই।

poetry and Tragedy, as also Comedy, Dithyrambic poetry, and most flute-playing and lyre playing, are all, viewed as a whole modes of imitation."[১১] Imilation (মূল গ্রীক mimesis) কথাটি বহু বিতর্কিত, এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তির চাপান-উতোর বহুকাল থেকেই চলে আসছে। আমাদের সেই বিতর্কে যাবার প্রয়োজন নেই। সংজ্ঞার অন্তর্গত mimesis অর্থাৎ Imitation শব্দটির তাৎপর্য বিচার করলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। 'Imitation'-এর বাংলা আমরা করি 'অনুকরণ'। ব্যুৎপত্তি ধরলে শব্দটির আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়— 'পরবর্তী কর্ম' (অনু=পশ্চাৎ, কৃ+অনট্=করণ) পশ্চাৎবর্তী বা পরবর্তী কর্ম, বা কর্মের মাধ্যম। অর্থাৎ কোনো জিনিস বা ঘটনাকে দেখা বা উপলব্ধি করার পরে সেটি যদি আমাদের মনে দাগ কাটে তাহলে আমরা পরে তাকে কথা (ভাষা), ছবি, গান ইত্যাদির মাধ্যমে হুবহু তুলে ধরতে চেষ্টা করি। অতীতে দেখা ঘটনা বা বস্তুকে পুনঃ-উপস্থাপিত করাই হলো অনুকরণ। এই অনুকরণ করা মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা যা মানুষ ডারউইন-কথিত আপন পিতামহ বাঁদরের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো বস্তু বা ঘটনাকে হুবহু তুলে ধরাই যদি অনুকরণ হয় তবে সেটা শিল্প হবে কিনা। আরশি বা আয়না বস্তুকে সবচেয়ে হুবহু তুলে ধরে, কিন্তু আরশিতে প্রতিফলিত বস্তুর প্রতিবিম্ব শিল্প নয়। যে বস্তু আমরা প্রত্যক্ষভাবে নিজের চোখে দেখেছি তারই প্রতিবিম্ব আর একবার আরশিতে দেখার আমাদের কোনো আগ্রহ নেই; সেই প্রতিবিম্ব আমাদের বস্তুকে দেখার অতিরিক্ত কোনো আনন্দ দেয় না। কিন্তু শিল্পকে দেখে আমরা বস্তুকে দেখার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু আনন্দ লাভ করি, বস্তু ও বস্তুর প্রতিবিম্ব নশ্বর, কিন্তু শিল্প ও শিল্পের আনন্দ কালোত্তীর্ণ। যে বাস্তব জীবন ও সমাজকে দেখে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকগুলি রচনা করেছিলেন, কালের ধারায় সেই জীবন ও সমাজ আজ অতীতের গহ্বরে তলিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর নাটকের জীবনরস এখনো আমাদের আনন্দ দান করে। সুতরাং শিল্প বা সাহিত্য সেই অর্থে অনুসরণ নয়, আরিস্তোতেলও সেই অর্থে Imitation কথাটি ব্যবহার করেন নি, পোয়েটিক্‌স্ গ্রন্থের পরবর্তী অংশ পড়লেই সেকথা বোঝা যায়।

কিন্তু অনুকরণ বলতে বস্তুর বা ঘটনার হুবহু উপস্থাপনা না বোঝালেও একথাও বলা যায় না যে, শিল্প বাস্তব জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। বরং শিল্পসৃষ্টি জীবনের তথা সমাজের বাস্তব ভূমি থেকেই রস সংগ্রহ করে, জীবনের গভীরে শিল্পী তাঁর চেতনার শিকড়টি সঞ্চারিত করে রস আহরণ করেন, তারপরে সেই রস তাঁর শিল্পের শাখা প্রশাখায় সঞ্চারিত করে সৌন্দর্যের ফুলটি ফুটিয়ে তোলেন। সুতরাং শিল্পসৃষ্টির জন্যে প্রথমেই চাই শিল্পীর জীবনের প্রত্যক্ষ অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা (Experience of life)। জীবনের এই অভিজ্ঞতা যে শিল্পীর যত গভীর, যত ব্যাপক, যত বিচিত্র তিনি তত বড়ো শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন। এই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হতে পারে। স্থূলজীবনের অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে সূক্ষ্ম জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতাও হতে পারে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটি খাঁটি অভিজ্ঞতা হওয়া চাই।

এই ক্ষেত্রটিতে কোনো কৃত্রিমতা, কোনো মিথ্যাচার, কোনো ভণ্ডামি চলে না। এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কবির সাবধান-বাণী ছিলো—ভাল নয়, ভাল নয়, নকল সে শৌখিন

১১। Bywater, Ingram 'Aristotle on the Art of Poetry', 1959, p. 23

মজদুরি। জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা শিল্পীর মনোলোকে আহৃত হবার পরে তাঁর অন্তরের রসে তা জারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।"[১২]

শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার পরের আরো একটি ধাপ হলো জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার নির্বাচন (selection of significant experiences)। প্রশ্ন হতে পারে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা কী? যে অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে জীবনের কোনো গভীর সত্য বা রহস্য উদ্‌ঘাটন করে অথবা আমাদের কাছে জীবনের কোনো গভীর সত্য বা রহস্য সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসু করে তোলে তা-ই হলো তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এমনি কোনো ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সমগ্র জীবন সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করে ছিলেন- এই জীবন লইয়া কি করিব? এমনি জীবনের কোনো-কোনো ঘটনা জীবন সম্পর্কে শুধু প্রশ্নই জাগিয়ে দেয় না কবি সাহিত্যিকের কাছে কোনো গভীর জিজ্ঞাসার উত্তর তুলে ধরে, তাঁরা তখন কোনো জীবন-সত্যেরই অভিব্যক্তি দান করেন। বারবনিতার সঙ্গে প্রণয় একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এরকম কোনো একটি ঘটনার মধ্যে যখন প্রণয় হয়ে ওঠে গভীর, তখন তা প্রণয়ীর শুদ্ধ মঙ্গল কামনার রূপ নেয়। তখন তা সাধারণ ঘটনামাত্র নয় তখন তা বিশেষ ঘটনা, তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এমনি অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাই যখন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলে - মহৎ ভালবাসা শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরিয়ে দেয়। কিংবা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার যখন বলে—তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? তখন সেই ঘটনা, সেই ব্যক্তিত্ব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসব হলো পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা। তেমনি কবি যখন কোনো জীবন্ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে বলেন —

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রয়েছে। হে পুষণ্! সত্যধর্মের জন্যে এই আবরণ উন্মোচন করে তার দর্শন লাভ কর।-- ঈশোপনিষদ্।

কিংবা কবি যখন তাঁর ধ্যান-দৃষ্টিতে সৃষ্টির পূর্বের মহাশূন্যকে অপূর্ব চিত্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত করেন--

It was the hour before the Gods awake
Across the path of the divine Event
The huge foreboding mind of Night, alone
In her unlit temple of eternity.
Lay stretched immobile upon Silence' marge.

১২। রবীন্দ্রবচনাবলী, মূল বিশ্বভারতী সং, অষ্টম খণ্ড (সাহিত্য) ১৩৬০, পৃ ৩৩৯।

Almost one felt opaque, impenetrable,
In the sombre symbol of her eyeless muse
The abysm of the unbodied Infinite;
A fathomless zero occupied the world."
—Sri Aurobindo : SAVITRI, Book I, Canto I

—তখন মহাশূন্যের উপলব্ধির মধ্যে অভিজ্ঞতার সীমাহীন বিস্তার দেখি। সাহিত্য ও শিল্পের উপজীব্যরূপে শিল্পী এইসব তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে নির্বাচন করে নেন। এই নির্বাচন (selection)-এর সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হলো তাৎপর্যহীন অভিজ্ঞতার বর্জন (rejection of insignificant experiences)। দার্শনিক নন্দনতত্ত্ববিদ কাণ্ট্ বলেছিলেন—আমাদের মনটি হলো একটি সক্রিয় শক্তি (active principle)। মনের স্বাভাবিক ধর্মই হলো —তাৎপর্য পূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলিকে তার স্মৃতির মণিকোঠায় ধরে রাখা এবং তাৎপর্যহীন ঘটনাগুলিকে ভুলে-যাওয়া। জীবনের অনেক ঘটনা মন আপনা থেকেই ভুলে যায় এবং সেই ভুলে যাওয়া আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যেই প্রয়োজন। ঝাড়াই-বাছাইয়ের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কবি-শিল্পীরা অনেক সময় সচেতন-ভাবেও করে থাকেন। যাই হোক তাৎপর্যহীন ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলিকে বেছে নেওয়ার ফলে জীবনের ঘটনা-প্রবাহে ক্রমে অনেক ফাঁক থেকে যায়। এই ফাঁকগুলি শিল্পে উপস্থাপিত জীবনকাহিনীতে থেকে গেলে তার ঘটনাগুলি হতো বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গতিহীন। রবীন্দ্রনাথের কথায় কবিসাহিত্যিকেরা নিজের কল্পনাসৃষ্টি দিয়ে 'ফাঁককে ভরাট করিয়া' নিটোল শিল্পরূপ রচনা করেন। এইখানে শিল্পসৃষ্টিতে কল্পনার ভূমিকাটি অপরিহার্য। আরো একটি কারণে শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পে উপস্থাপিত জীবন আসল জীবন নয়, আসল জীবনের প্রতিরূপ বা ছবি মাত্র। এই প্রতিরূপ বা ছবিতে শিল্পীকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হয়, প্রতিরূপের মাধ্যমে আসল জীবনের অনুভূতি ও আবেদন সঞ্চার করতে হয়। তার জন্যে শিল্পে উপস্থাপিত জীবনের অনুভূতিকে মূল জীবনের অনুভূতির চেয়ে একটু তীব্রতর করে উপস্থাপিত করতে হয়। মূলচিত্রের ওপরে একটু কল্পনার রঙ্ ফলাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন—"আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।" রবীন্দ্রনাথ আবার অন্যভাবে বলেন—"সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না।" কারণ "শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক শোক-প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।"[১৩]

জীবন থেকে অভিজ্ঞতা আহরণের পরে তা কবির অন্তরের রসে জারিত হয়, সেই অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচন চলে, তার পরে নির্বাচিত অভিজ্ঞতার ওপরে হয় কল্পনার অতিরঞ্জন— এতগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এতগুলি ধাপ পেরিয়ে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা যখন সাহিত্যে শিল্পে উপস্থাপিত হয়, তখন তা আর বাস্তব জগতের হুবহু অনুকরণ থাকে না, তখন তা আর বাস্তব জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যা বলেও মনে হয় না। তাতে বাস্তব জগৎ থেকে যে পরিবর্তন ঘটেছে, কল্পনার যে সংযোজন ঘটেছে জ্যামিতির পরিমাপে তা অংশত মিথ্যা হলেও শিল্পের রসিক উপভোক্তার

১৩। তদেব, পৃ ৩৫০, ৩৪৮।

কাছে তা মিথ্যা মনে হয় না, তা জীবনের চেয়েও জীবন্ত, বাস্তবের চেয়েও বাস্তব, নশ্বর জগতের চেয়েও শাশ্বত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এস্থলে একটি অপরটির আর্শি হইয়া কোনো কাজ করিতে পারেনা।

"এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ-ভাষাভঙ্গির নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এই রূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।"[১৪]

এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিটি হলো কল্পনা। শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যে কল্পনার তাব স্বরূপটি কী? নিশ্চয় এটা ব্যক্তি-বিশেষের বিরল বৈশিষ্ট্য, সকলেব মধ্যে এই কল্পনাশক্তি থাকে না। এটি ভগবৎ-দত্ত কিনা জানি না, কিন্তু এটি প্রকৃতিদত্ত হলেও প্রকৃতি এই অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম-শক্তিটি সকলের পাতে সমান বিতরণ করেননি। কল্পনাব অধিকার রহস্যময় হলেও এর স্বরূপ ও প্রকৃতি মনস্তত্ত্বের আলোকে খানিকটা উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা। বস্তুজগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা নাসিকা-ত্বক) মাধ্যমে যে-সব অনুভূতি (sensation) স্নায়ুবাহিত হয়ে আমাদের মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় সেগুলি কোন্ বস্তুর অনুভূতি এইটা যখন মন বুঝে নেয় তখন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি (sensations) মনের কাছে প্রত্যক্ষ বোধের (perception) রূপ নেয়। বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে নির্বাচিত বস্তু বা ঘটনার বোধকে মন যখন ছবি রূপে নিজের মধ্যে ধরে রাখে, সেই মানসিক চিত্রগুলিকে ভাবচ্ছবি বা চিত্রকল্প বলি (Image)। কখনো-কখনো সেরকম ভাবচ্ছবি বাইরের জগৎ থেকে না এসে শিল্পীর অন্তর থেকে বা কোনো মানসোত্তর (supramental) স্তর থেকেও (ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ছাড়াই) বোধি (intuition) রূপে শিল্পীর মনে ভেসে ওঠে। পরবর্তী রূপায়ণ দু-ভাবে হয়। কিছু-কিছু ছবি বাইরের জগতের হুবহু প্রতিবিম্বমাত্র হয়ে থাকে সেগুলি শুধু স্মৃতি (Memory)। কিছু কিছু ছবির নবরূপায়ণ হয়। একটি বস্তুর অংশবিশেষের ছবির সঙ্গে অন্য বস্তুর অংশবিশেষের ছবি জুড়ে তাতে নিজের মনের রং বসিয়ে কোনো-কোনো অংশ অতিরঞ্জিত করে শিল্পী তাঁর মনোলোকে একটি নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন। যেমন ঘোড়ার সঙ্গে পাখির পাখা জুড়ে রূপকথার গল্পকার একটি অপূর্ব সুন্দর প্রাণী সৃষ্টি করলেন—পক্ষিরাজ ঘোড়া। কিংবা আমাদের পুরাণে মানুষের ছবির সঙ্গে সিংহের ছবির অংশ-বিশেষ জুড়ে নৃসিংহ অবতারের মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। শিল্পীব যে কল্পনাশক্তি এই নব-নব ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে তাকেই বলে সৃজনী কল্পনা (Creative Imagination)। হুবহু ভাবচিত্রটা স্মৃতি। আর নব রূপে রূপায়িত ভাবচিত্রটাই আসল কল্পনা। যাইহোক ব্যাপক অর্থে এই দুটিকে কল্পনার মধ্যে ধরে কল্পনাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা—

এক. স্মৃতি বা পুনঃউপস্থাপক কল্পনা (Memory or Reproductive Imagination)

দুই. আসল কল্পনা বা সৃজনশীল কল্পনা (Imagination proper or Productive or Creative Imagination)।

১৪। তদেব, পৃ ৩৫০।

এই সৃজনশীল কল্পনাই শিল্পসৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে যদিও স্মৃতিও কিছু-কিছু শিল্পসৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় ভাবে গৃহীত হতে পাবে। সৃজনী কল্পনা আবার শিল্পীর জীবনদর্শন অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। প্রধানত তাকে দুটি গোত্রে ভাগ করতে পারি। শিল্পীর জীবনদর্শন যদি আশাবাদী হয় তাকে শিল্পী স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন অংশ জুড়ে একটি সুন্দর নিটোল পূর্ণ রূপ গড়ে তোলেন। তখন তাঁর কল্পনা হয় গঠনমুখী কল্পনা (Constructive); আবার যখন শিল্পীর জীবনদৃষ্টি নৈরাশ্যবাদী হয় তখন তা পূর্ণ সুন্দর রূপকেও ভেঙ্গে খণ্ডিত করে দিতে পারে। তখন তাঁর কল্পনা হলো ভাঙনমুখী কল্পনা (Destructive Imagination)। একটি প্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি—একটি সবুজ শুঁয়ো পোকা দেখে যখন কোনো কবি বলেন—"বাঃ কী চমৎকার! এর গায়ে দুটো ছোটো রঙিন পাখা জুড়ে দিলে সুন্দর একটা প্রজাপতি হয়ে যাবে", তখন সেটা গঠনশীল কল্পনার কাজ। কিন্তু যদি কোনো কবি একটি সুন্দর প্রজাপতিকে দেখে বলেন—"এর পাখা দুটো ছিঁড়ে নিলেই এটা একটা শুঁয়োপোকা হয়ে যাবে", তখন সেটা ভাঙনমুখী কল্পনার কাজ। কল্পনার সামগ্রিক শ্রেণী বিভাগটা তা হলে এইভাবে উপস্থাপিত করতে পারি—

ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) ও বোধি (intuition) → বোধ (perception) → ভাবচিত্র (চিত্রকল্প) (image)

- সৃজনশীল অর্থাৎ আসল কল্পনা (Creative or Productive Imagination or Imagination Proper)
  - গঠনমুখী কল্পনা (Constructive Imagination)
  - ভাঙনমুখী কল্পনা (Destructive Imagination)
- স্মৃতি বা পুনঃউপস্থাপনামূলক কল্পনা (Memory or Reproductive Imagination)

শিল্পী নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার বর্ণালী মিশিয়ে যে ভাবমূর্তি রচনা করেন, শিল্পসৃষ্টির জন্যে তাকে প্রকাশ করা চাই। তাই শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ হলো প্রকাশ (expression)। কবি বা শিল্পীর নিজের ভেতরের অনুভূতিকে বাইরে মেলে না ধরলে সামাজিকের মধ্যে অর্থাৎ শিল্পের উপভোক্তা বা কাব্যের পাঠকের মধ্যে তাকে সঞ্চারিত করা যায় না। এই সঞ্চারিত করে দেওয়াও শিল্পীর দায়িত্ব, শিল্পসৃষ্টিরই অপরিহার্য অঙ্গ; টলস্টয় তো বলতেন সঞ্চারিত করাই (communication) হলো শিল্প—নিজের অনুভূতিকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যে ভেতরের অনুভূতিকে বাইরে মেলে ধরার জন্যে একটা কোনো মাধ্যম দরকার —আরিস্তোতেলের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে meansবা medium। আরিস্তোতেল বলেছেন এই প্রকাশ-মাধ্যমের পার্থক্যের জন্যে শিল্প পৃথক-পৃথক রূপ নেয় এবং সেই অনুযায়ী শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠে। শিল্পের প্রধান কয়েকটি শ্রেণী হলো :

শিল্প
(Art)

ভাস্কর্য	স্থাপত্য	চিত্রকল্প	নৃত্য	সঙ্গীত	সাহিত্য
(Sculpture)	(Architecture)	(Painting)	(Dance)	(Music)	(Literature)
					(মাধ্যম ভাষা)

প্রত্যেক শিল্পকলার মাধ্যম আলাদা। যেমন সঙ্গীতের মাধ্যম হলো সুর, চিত্রকলার মাধ্যম হলো রং ও রেখা। তেমনি সাহিত্যও একরকমের শিল্প কলা এবং তার প্রকাশ মাধ্যম হলো ভাষা। অবশ্য একটি শিল্পকলার মাধ্যম অন্য শিল্পকলাতেও গৃহীত হতে পারে এবং তার ফলে শিল্পের একটা শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণী মিশে যেতে পারে। যেমন কাব্য অনেক সময়ই সুর সহযোগে গাওয়া হয়। কাব্য হলো সাহিত্যেরই একটি শাখা। সুতরাং কাব্যের ক্ষেত্রেও সৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ হলো ভাষা, যদিও কাব্যের ভাষার (diction) কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। কিন্তু ভাষা বা কথার মাধ্যমে প্রকাশ না করা পর্যন্ত কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া পূর্ণাঙ্গ হয় না, এবং কবির কবিত্বও প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করে এই চরম সত্যটি ব্যাখ্যা করেছেন :

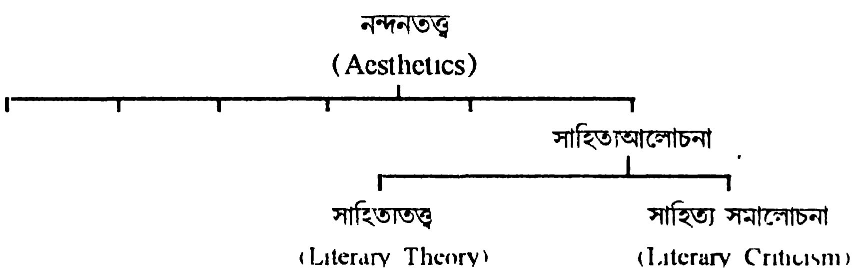
"নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব।"[১৫]

নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা : শিল্পের যে শ্রেণী বিভাগ করা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্য হচ্ছে শিল্পেরই একটা শ্রেণী। নন্দনতত্ত্ব হচ্ছে সব শিল্পেরই সাধারণ তত্ত্ব যা সর্বশিল্পের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য আর সাহিত্য যেহেতু শিল্পেরই একটা শাখা সেহেতু সাহিত্যতত্ত্ব হলো নন্দনতত্ত্বেরই একটা শাখা। তবে সাহিত্যের নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম (ভাষা) অন্য শিল্পকলার প্রকাশ-মাধ্যম থেকে পৃথক হওয়ার জন্যে সাহিত্য একটা স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই শিল্পরূপের নিজস্ব কিছু তত্ত্ব আছে। সাহিত্যতত্ত্বে শিল্পতত্ত্বের সাধারণ কথার সঙ্গে সাহিত্যের নিজস্ব তত্ত্বকথাও আলোচিত হয়। যেমন নন্দনতত্ত্বে একটি সাধারণ আলোচ্য বিষয় হলো শিল্পের প্রেরণা। এই প্রেরণার তত্ত্ব সব শিল্পের ক্ষেত্রেই সমানভাবে আলোচ্য, তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আলোচ্য। কিন্তু মহাকাব্যের রূপ, গীতিকাব্যের রূপ, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের পার্থক্য প্রভৃতি তত্ত্ব সর্ববিধ শিল্পকলার তত্ত্ব নয়। শুধু সাহিত্যেরই তত্ত্ব। তবে নন্দনতত্ত্ব কথাটি অনেক ক্ষেত্রে শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জার্মান নন্দনতত্ত্ববিদ্ লেসিং (Lessing) প্রধানত ট্র্যাজেডিতত্ত্বই আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি সাহিত্যতত্ত্ববিদ্, তবু তাঁকে নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রায়ই সাহিত্যতত্ত্বকেই নন্দনতত্ত্ব বলে গ্রহণ করা হয়।

আবার সাহিত্যতত্ত্ব (Literary Theory) ও সাহিত্যসমালোচনার (Literary Criti-

১৫। তদেব, পৃ ৩৪৩।

cism) মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব হলো শিল্পের ও সাহিত্যের তাত্ত্বিক (Theoretical) আলোচনা; কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা হলো তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ। এইজন্যে নন্দনতত্ত্ব হলো মূলত দর্শন (Philosophy); কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা হলো মূলত শিল্প (Art)। শিল্পতত্ত্বে ও সাহিত্যতত্ত্বে বিশেষ-বিশেষ (particular) সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে সাধারণ (general) সত্যে পৌঁছোনো হয়। এখানে পদ্ধতিটি অরোহমূলক (inductive); কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনায় সাধারণ সত্যের আলোকে বিশেষ-বিশেষ সৃষ্টির মূল্যায়ন করা হয়— এখানে পদ্ধতিটি অবরোহমূলক (deductive), যদিও দুই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টিরই আলোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। এই প্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনার সম্পর্কও উল্লেখ করা প্রয়োজন—নন্দনতত্ত্বে শিল্পের তথা সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও তার উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়; সুতরাং নন্দনতত্ত্বের স্থান হলো সাহিত্য-সমালোচনার মূল ভিত্তি। সাহিত্য-সমালোচনার বিশেষ একটি মান (standard) নির্ণীত হতে পারে নন্দনতত্ত্বের স্থানের ওপরে ভিত্তি করেই। এখানেও বলে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য-সমালোচনা কথাটিও অনেক সময় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তার মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব দুই-ই গৃহীত হয়। অবশ্য এই ব্যাপক অর্থ না ধরলে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি এইভাবে উপস্থাপিত করা যায়।



প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রও সাহিত্যতত্ত্বের একটি সমৃদ্ধ ধারা। অলঙ্কার-শাস্ত্র বলতে উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের আলোচনাই বোঝায় না, কাব্যতত্ত্বই বোঝায়। তাই এখানে সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে তার পার্থক্যটিও বিবেচ্য। সমালোচক-শিরোমনি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি প্রথমেই মনে আসে-–"সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় কি যাহাতে মনে হইতে পাবে যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্যদেহ পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটি সমালোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল? প্রত্যেকটি সূক্ষ্মতম অনুমিশ্রণ যে একটি কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন রচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায়?"[১৬]

কাব্য সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা দুদিক থেকে হতে পারে—

(১) কাব্যের সামগ্রিক ভাব ও রসের আলোচনা বা আস্বাদনপন্থী (appreciative) আলোচনা এবং

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমাব · 'সমালোচনা সাহিত্য'।

(২) কাব্যের সামাগ্রিক গঠনের বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণপন্থী (analytic) আলোচনা।

এই দুদিক থেকেই আলোচনায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচান অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিরল, তবে একেবারেই ছিলো না এমন নয়।

'ধ্বন্যালোক ও লোচনে'র অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনুযোগটির উল্লেখ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, কাব্যের সামগ্রিক বিচারের চেষ্টা যে ভারতীয় কাব্য-সমীক্ষায় একেবারে হয়নি, তা নয়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থের চতুর্থ 'উদ্যোতে' আনন্দবর্ধন রামায়ণ, মহাভারতের সামগ্রিক বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রামায়ণেব 'অঙ্গীরস' হচ্চে 'করুণরস' আর মহাভারতের অঙ্গীরস হচ্ছে 'শান্তবস'।"[১৭]

এখানে যেমন কাব্যের সামগ্রিক রস সম্পর্কে আলোচনা আছে, তেমনি বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণে মহাকাব্যের সর্গাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে, সেখানে কাব্যের সামগ্রিক গঠন সম্পর্কে সচেতনতা পাওয়া যায়।

তবু সমস্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের দিকে তাকালে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সেখানে সামগ্রিক নয়, খণ্ডিত বিশ্লেষণী দৃষ্টিরই প্রাধান্য রয়েছে।

পাশ্চাত্য Poetics বা কাব্যতত্ত্বের তুলনায় ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সূক্ষ্ম ও গভীর। "সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যবিচারের মধ্যে, যে আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় গ্রীক সমালোচনা খানিকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়াই মনে হয়। এমন কি আধুনিক সাহিত্য বিচারে যে পরিণত অন্তর্মুখীনতা তাহাবও সহিত ইহা সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পাবে।"— ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বস্তুত ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র মুখ্যত Poetics, কাব্য ও সাহিত্যের সাধাবণতত্ত্ব অনুসন্ধানই তার মুখ্য উদ্দেশ্য, বিশেষ বিশেষ রচনার মূল্যায়ন সেই তত্ত্বানুসন্ধানের data বা দৃষ্টান্ত হিসাবেই এসেছে, কিন্তু পাশ্চাত্যে সমালোচনা, বিশেষত আধুনিক সমালোচনা মুখ্যত সমালোচনাই। তত্ত্বের উল্লেখ সেখানে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় বা সমালোচনার মূল ভিত্তি হিসাবে এসেছে। কারণ পাশ্চাত্য Poetics ও Criticism দুই ধারারই পূর্ণ বিকাশ হয়েছে অনেকটা স্বতন্ত্র ভাবে, কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্র মুখ্যত Poetics রূপেই বিকাশলাভ করেছে আধুনিক রীতির সত্যকার সাহিত্য-সমালোচনা প্রাচীন ভারতে ছিলো না। অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। (শ্রী) অরবিন্দ .
'ভবিষ্যতের কবিতা'
(শ্রীঅরবিন্দের 'The Future Poetry' গ্রন্থের রামেশ্বর শ'-কৃত অনুবাদ),
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

২। ইগলটন, টেরী .
'মার্কসবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা'
(Terry Eglcton-এর Marxism & Literary Criticism গ্রন্থের
নিরঞ্জন গোস্বামী-কৃত ভাষান্তর)

১৭। মুখোপাধ্যায় মণীন্দ্রকুমার · 'সাহিত্যদর্শনের ভূমিকা' পৃ ৩৮৯।

২. শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা

It is much easier to point out the faults and errors in the work of a great mind than to give a distinct and full exposition of its value*

SCHOPENHAUER

Criticism of the Kantian Philosophy

জীবন ও রচনাঃ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয় ১৮৭২ সালে ১৫ই আগস্ট উষালগ্নে। তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে, বর্তমানে যেখানে রয়েছে শ্রীঅরবিন্দ ভবন (৮ নং শেক্সপীয়র সরণী)। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের জননী। মাতৃকুলের উত্তরাধিকারে শ্রীঅরবিন্দ পেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পিতা ছিলেন তখনকার দিনের বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, পুরোপুরি বিলেতি ভাবাপন্ন। তাই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদান শুরু করেন মাত্র ৫ বছর বয়সে একটি ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে—দার্জিলিং-এর লরেটো কন্‌ভেন্ট্ স্কুলে। তারপর মাত্র ৭ বছর বয়সে তাঁকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন। কৃষ্ণধনের সহধর্মিণী তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যাকে নিয়ে একেবারে বিলেতে চলে যান। সেখানে উইলিয়াম এইচ. ড্রয়েট্‌সের গৃহশিক্ষকতায় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা শুরু হয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনের সেন্ট্ পল্‌স্ (St. Pauls School) স্কুলে পড়াশুনা করেন। সেখানকার পড়া শেষ করে ১৮৮৯ খ্রীঃ তিনি কেম্ব্রিজে চলে আসেন। সেখানে কিংস্ কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে ১৮৯০-৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত। কিংস্ কলেজে ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস্ প্রথমাংশের (Classical Tripos, Part-I) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেণ্ট্ পল্‌স্ স্কুলের ছাত্রজীবনে শেষ দুবছর তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (I C S) (এখনকার I A S) পরীক্ষার জন্যে পড়াশুনা করেছিলেন। এর লিখিত পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন ১৮৯০ সালে। কিন্তু এই পরীক্ষার অঙ্গ ছিলো অশ্বারোহণ পরীক্ষা, তাতে তিনি অনুপস্থিত থাকেন। এর কারণ হলো তখনকার দিনের অশ্বারোহণ-প্রশিক্ষণের ফি ছিলো খুব বেশি। অর্থাভাব-বশতঃ শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশিক্ষণ নিতে পারেননি। শ্রীঅরবিন্দের পিতা বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার হলেও নিজের বদান্যতা ও দানশীলতার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন, কিন্তু বিলেতে

---

* Quoted in *Kant* by S Korner, Penguin Book, 1967

তাঁর পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষা ও ভরণপোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাতেন না। তার ফলে নিদারুণ অর্থকষ্টে তাঁদের দিন কাটতো। কিংস্ কলেজে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা এবং তাঁর মা ও ভাইদের ভরণ পোষণ কিছুকাল চলেছিল শ্রীঅরবিন্দ নিজে সেন্ট্ পল্স্ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্যে যে বৃত্তি (৮০ পাউণ্ড) পেয়েছিলেন, তাইতে। শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর ভাইদের সেই অর্থকষ্টের দিনগুলির প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করি—

> "মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাঁদের মা যখন ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশু বয়সেই আমি তাঁদের দেখেছি। ইংল্যাণ্ডে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করেছেন।"[১]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরোদায় রাজ-সরকারে চাকরী নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। সেখানে অল্প কিছুদিন সাভে সেটেল্‌মেন্ট বিভাগে ও রাজস্ব বিভাগে চাকরী করেন। কিন্তু মহারাজার প্রশাসনিক কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এরপরে বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষার অংশকালীন অধ্যাপক এবং তারপরে ক্রমান্বয়ে ঐ কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের পূর্ণসময়ের অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ এবং সবশেষে কার্যকরী অধ্যক্ষ রূপে কাজ করেন। বরোদায় তাঁর কর্মজীবন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ থেকে ১৮ই জুন ১৯০৭ পর্যন্ত –সর্বমোট ১৩ বছরের কিছু বেশি। এর আগেই বরোদায় থাকার সময় ৭ই আগষ্ট ১৮৯৩ থেকে ৫ই মার্চ ১৮৯৪ পর্যন্ত কে. জি. দেশপাণ্ডে সম্পাদিত দ্বি ভাষিক 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তিনি নিউ ল্যাম্পস্ ফর দি ওল্ড (New Lamps for the Old) নামে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। এ দেশে এই তাঁর প্রথম ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ। এর আগেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তখন কংগ্রেসের প্রচেষ্টা ছিলো শুধুই আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজের কাছ থেকে ভারতীয়দের জন্যে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা কংগ্রেস তখন কল্পনাও করতে পারেনি। ইন্দুপ্রকাশের প্রবন্ধগুলিতেই শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের এই নরমপন্থী নীতির সমালোচনা করেন। বলা যেতে পারে ভারতে আবেদন-নিবেদনের নীতি ত্যাগ করে সংগ্রামের পথে পূর্ণ-স্বাধীনতার বাণী তিনিই প্রথম প্রচার করেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় থাকার সময়েই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে বাংলায় যে জাতীয় চেতনার জাগরণ হলো শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে সেই উপলক্ষে বিপ্লবীদের লিখলেন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিপ্লবকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্রমে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন এবং বিদেশী-বর্জন তীব্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গরূপে স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজকিশোর রায়চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষার আদর্শ রূপায়িত করার জন্যে ১৯০৫ সালের

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঃ 'মনোমোহন ঘোষ' (বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৬, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬, পৃঃ ৫)।

১৬ই নভেম্বর 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' (National Council of Education) স্থাপন করেন। এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সদস্যবৃন্দই কোলকাতায় বৌবাজারে ১৯০৬ সালে আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত করলেন 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ ও স্কুল' (এই প্রতিষ্ঠানই পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে ওঠে)। এই বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হন শ্রীঅরবিন্দ। বরোদায় তাঁর শেষ বেতন ছিলো ৭১০ টাকা। এখানে মাত্র ২৫০ টাকা বেতন নিয়ে তিনি চলে আসেন স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন সরকারের লেখা থেকে জানতে পারি "বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম বছর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, তিনি পদত্যাগ করেন (১৯০৭) সক্রিয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে।"[২] জাতীয় কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে ১৯০৭ সালে মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজী দৈনিকের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাতে ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল ১৯০৭ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিকভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) নামে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এই পত্রিকায় পূর্ণ-স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করার জন্য বৃটিশ সরকার দেশদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে সমর্থন করে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বিখ্যাত 'নমস্কার' কবিতায় লিখেছিলেন—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমার লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
... ... বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।

* * *

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে !" —শান্তিনিকেতন, ৭ই ভাদ্র, ১৩১৪

বাস্তবিকই ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে শাস্তি দিতে পারেননি। এই কবিতা লেখার ২দিন পরেই রবীন্দনাথ আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে লেখেন—

২। সরকার, অধ্যাপক সুশোভন : 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ', বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, ১৯৭৯, পৃ : ১৪।

"Statesman" কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকব।"[৩]

শ্রীঅরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সক্রিয় নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিপ্লব ও গুপ্তসমিতির গঠনে ব্যাপক প্রয়াস রূপলাভ করে শ্রীঅরবিন্দ হয়ে ওঠেন তার মূল তাত্ত্বিক নেতা। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হলে মূলত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই পত্রিকার মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লবী-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে সেই গোষ্ঠী কোলকাতায় ৩২ নং মুরারী পুকুর রোডের বাগানবাড়ীতে বোমা তৈরী করা শুরু করেছিলেন। এই দলেরই দুই বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড্‌কে মুজফ্‌ফর-পুরে বোমা মেরে হত্যার চেষ্টা করেন (১৯০৮ সালে ৩০শে এপ্রিল)। এই প্রচেষ্টায় বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় কিংস্‌ফোর্ড্ মারা যাননি বটে, কিন্তু এর মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে বৃটিশ সরকার কোলকাতা থেকে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেন, যদিও এরকম দু-একজন জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারী কর্মচারীকে বিচ্ছিন্নভাবে হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ছিল না, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে পরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী বিপ্লব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ আদালতে যে জবানবন্দী দেন, তাতে তিনি বলেন—"স্বাধীনতার আদর্শ প্রচাব করা যদি অপরাধ হয় তবে আমি অপরাধী, আমি স্বীকার করছি যে আমি তা করেছি—আমি কখনো তাতে প্রতিবাদ করিনি। এই আদর্শের জন্যেই আমি আমার সমস্ত সম্ভাবনা উৎসর্গ করেছি, এই জন্যে আমি কোলকাতা এসেছি এবং এর জন্যেই আমার জীবনধারণ, এর জন্যই আমাব সমস্ত তপস্যা। এ হল আমার জাগরণের একমাত্র চিন্তা, আমাব নিদ্রার একমাত্র স্বপ্ন।"[৪] এই মলায় শ্রীঅরবিন্দকে অ্যারেস্ট্ করা হয়েছিলো ১৯০৮ সালে ৪ঠা মে। যাই হোক এই মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ওকালতি করেন এবং আদালতে শ্রীঅরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণ করে ১৯০৯ সালে ৬ই মে তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। শ্রীঅরবিন্দেব পক্ষ সমর্থন করে সবশেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যা বলেছিলেন তা শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে এক অব্যর্থ ভবিষ্যৎ-বাণী মনে হয় : "মহামান্য আদালতের কাছে আমার বক্তব্য হল এই যে, এই বিতর্ক নীরব হয়ে যাবার অনেক পরে, এই বিক্ষোভ, এই উত্তেজনা থেমে যাবার অনেক পরে, তাঁর দেহত্যাগ ও লোকান্তরিত হয়ে যাবারও অনেক পরে, তিনি দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী এবং মানবজাতির প্রেমিক রূপে গৃহীত হবেন। যখন তিনি দেহত্যাগ করবেন, আমাদের মধ্যে আর থাকবেন না, তার অনেকদিন পরেও শুধু ভারতবর্ষে নয়, দূর সমুদ্র ও দূর-প্রান্তর পেরিয়েও তাঁর বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে।" মূল ইংরেজীতে দেশবন্ধুর বক্তৃতাটি অপূর্ব :

"My appeal to you is this, that long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil and agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the

৩। মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার 'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড, ১৩৫৫, পৃ ১৬১

৪। মুখোপাধ্যায়, উমা এবং মুখোপাধ্যায় হরিদাস "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান" ১৯৯৬, পৃঃ ৩৭ ৩৮।

prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will have echoed and re-echoed, not only in India, across distant seas and lands. Therefore I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of History."[৫]

জেলে থাকবার সময়ই শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনা করতেন। সেখানে তিনি যোগসাধনা-কালে ধ্যানে কিছুদিন সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনতে পান। শেষে ঐ জেলেই তাঁর ভগবৎ-দর্শন হয়। তারপরে তাঁর জীবনের গতি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি কিছুদিন বাংলায় 'ধর্ম' এবং ইংরেজীতে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্তরের নির্দেশে ১৯১০ সালে চন্দননগর হয়ে ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে চলে যান, এবং বাকি জীবন মূলত যোগসাধনায় অতিবাহিত করেন। ১৯২৬ সালে ২৪ নভেম্বর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ১৯৫০ সালে ৫ই ডিসেম্বর তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। নিবিষ্ট যোগসাধনার ফলে শ্রীঅরবিন্দের মুখমণ্ডলে যে দিব্যকান্তি ফুটে উঠেছিলো তা ১৩৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে প্রত্যক্ষ করে এসে তখনকার 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখেছিলেন—

"অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে : ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁব মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। ....তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা।....

"আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব।"[৬]

দেহত্যাগের পর ৫ই ডিসেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর দেহ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিলো। এই জ্যোতি সরে যাবার পরে পণ্ডিচেরীতেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এখানেই বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মূলকেন্দ্রটি অবস্থিত।

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে যোগ-পথে চলে গেলেন তিনি। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে ('বাংলাদেশের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ড) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের আগে নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের আদর্শ ছিলো আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে ভারতীয়দের জন্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। মূলত শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণাতেই কংগ্রেসের একটি চরমপন্থী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ভারতীয়দের সামনে পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ শ্রীঅরবিন্দই প্রথম তুলে ধরেছিলেন। এই পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ সামনে রেখেই মহাত্মা গান্ধী শুরু করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে

৫। Agarwala, B.K : 'Trials of Independence'. New Delhi . National Book Trust– 1914. p.69.

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রবাসী, ১৩৩৫, শ্রাবণ।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন। 'রবীন্দ্রজীবনী'তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— ১৯০৬ সালের "অক্টোবর মাসে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষকে লইয়া সম্পাদক সংঘ গঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র সম্পাদক- প্রধান। নবগঠিত জাতীয় দলের মুখপাত্ররূপে India for Indians মন্ত্র লইয়া 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক কাগজে পরিণত হইয়া বাহির হইল। India for Indians হইতেছে মহাত্মা গান্ধীর Quit India মন্ত্রের অগ্রণী।"[৭] দ্বিতীয়ত মহাত্মা গান্ধীর যে 'অহিংস-অসহযোগ' আন্দোলনের পথে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এসেছিলো সেই অসহযোগের তত্ত্ব শ্রীঅরবিন্দই প্রথম 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁর 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' (Passive Resistance) শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। (৯—৩০ এপ্রিল ১৯০৭)।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

"এক কথায় বলিতে গেলে দশ বছর পরে মহাত্মা গান্ধীর যে অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল, বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষই যে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে সেই নীতি ঘোষণা করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"[৮]

১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ পাণ্ডিচেরী চলে যাবার পরে পূর্ণ যোগসাধনায় নিমগ্ন হন এবং তারই সঙ্গে চলতে থাকে নানা বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও সাহিত্যসাধনা। ১৯১৪ সালে ১৫ই আগস্ট তিনি ইংরেজীতে মাসিক পত্রিকা 'আর্য' (Arya) প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা চলে ১৯২১ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মানুষ যখন বিপন্ন বিপর্যস্ত তখনই আর্য পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববাসীর কাছে শোনালেন তাঁর অমৃতবার্তা- চরম নৈরাশ্যের দিনে মানবজাতির আমূল দিব্য-রূপান্তরের দর্শন ও সাধনা। আর্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান রচনাগুলি—

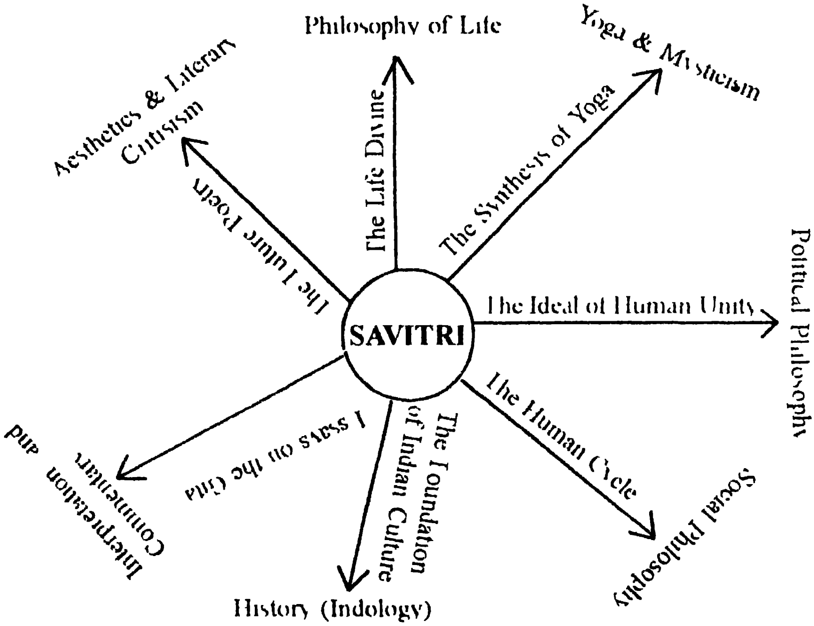
১) Philosophy দর্শন	The Life Divine : দিব্য জীবন
২) Yoga and Mysticism যোগ এবং মরমিয়াতত্ত্ব	The Synthesis of Yoga : যোগ-সমন্বয়
৩) Political Philosophy রাষ্ট্রদর্শন	The Ideal of Human Unity : মানবজাতির ঐক্যের আদর্শ
৪) Social Philosophy সমাজদর্শন	The Human Cycle : মানব-জীবনচক্র
৫) History (Indology) ইতিহাস (ভারততত্ত্ব)	The Foundations of Indian Culture : ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি
৬) Interpretation and Commentary ব্যাখ্যা ও ভাষ্য	Essays on the Gita : গীতানিবন্ধ
৭) Aesthetics and Literary Criticism নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যসমালোচনা	The Future poetry : ভবিষ্যতের কবিতা

৭। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার 'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড, ১৩৫৫ পৃঃ ১৬০।

৮। মজুমদার, ডঃ রমেশচন্দ্র 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ৯৫।

'আর্যে' প্রকাশিত এই সাতটি প্রধান গ্রন্থ ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের আরো একটি প্রধান গ্রন্থ আছে — বলা যেতে পারে প্রধানতম। সেটি হলো ইংরেজী ভাষায় লেখা সুবৃহৎ প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী' (Savitri)। এই মহাকাব্যের নলিনীকান্ত গুপ্ত-কৃত পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের বহু কাব্য-কবিতা, নাটক ও পত্রাবলী। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে তাঁদের বাণী প্রচার করতে চেয়েছিলেন বলে তাঁদের দু'জনেরই প্রায় সব রচনা ইংরেজী ভাষায় লেখা। শ্রীঅরবিন্দেব মূল বাংলা রচনা হচ্ছে — 'জগন্নাথের রথ', 'গীতার ভূমিকা', 'শ্রীঅরবিন্দের পত্র', 'কারাকাহিনী', 'ধর্ম' ইত্যাদি। 'গীতা' যেমন হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূলকথা তেমনি শ্রীঅরবিন্দের ধর্মনিরপেক্ষ সাধনার মূল কথা বিধৃত আছে একটি ছোট্ট ইংরেজী বইতে, সেটি হলো 'The Mother' : নলিনীকান্ত গুপ্তের কাব্যধর্মী অপূর্ব বাংলা অনুবাদ 'মা'। শ্রীঅরবিন্দের মূল দার্শনিক রচনা 'The Life Divine'[১] এটি একটি সুবিস্তৃত মহাগ্রন্থ (magnum opus), সারা বিশ্বে পঠিত ও অনেক বিদগ্ধজনের কাছে সম্মানিত পাঠ্য।

'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের এই সাতটি প্রধান রচনাকে তাঁর প্রতিভার সপ্তরশ্মি রূপে কল্পনা করা যায়। মানবমনীষার জ্ঞানসাধনার সপ্তলোককে আলোকিত করেছে এই সপ্তরশ্মি। আর এর কেন্দ্রে রয়েছে তাঁর প্রতিভাসূর্যের মূল শক্তি— 'সাবিত্রী'। সাবিত্রী শব্দটির সঙ্গে ব্যুৎপত্তিগত যোগ আছে 'সবিতৃ' শব্দের, যার অর্থ হলো 'সূর্য'। এটা শুধু কোনো একটা কাকতালীয় যোগাযোগ নয়, কিছুতেই নয়। এর পেছনে একটি সার্মগ্রিক দিব্য পরিকল্পনা বিদ্যমান। এই দিব্য পরিকল্পনাটিকে একটি চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা যায় এইভাবে :



১। 'The Life Divine' মূল গ্রন্থ এবং অনির্বাণকৃত অনুবাদ 'দিব্যজীবন' অনেকের মতে দুর্বোধ্য বলে আমি এই গ্রন্থের একটা প্রাঞ্জল অনুবাদ করি। সেই অনুবাদ "দিব্য যে জীবন" নামে 'শৃন্বন্তু' পত্রিকায় (৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ থেকে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

নান্দনিক প্রস্তুতি ঃ টি এস্. ইলিয়ট্ বলেছিলেন—তিনিই শ্রেষ্ঠ নন্দনতত্ত্ববিদ ও সাহিত্য সমালোচক হতে পারেন, যিনি একাধারে কবি এবং সমালোচক দুই। রবীন্দ্রনাথও অনেকটা একই রকম কথা বলেছিলেন—যাঁরা নিজেরা সরস্বতীর বরপুত্র, সারস্বতদের বরণ করে নেবার যোগ্যতা তাঁদেরই বেশি। "সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান; তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।"[১০] রবীন্দ্রনাথ, টি. এস্. ইলিয়টের মতোই শ্রীঅরবিন্দও একাধারে কবি ও সাহিত্য-সমালোচক দুই-ই ছিলেন। তাঁর দার্শনিক ও যোগী পরিচয় তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বকে অনেকটা আবৃত করেছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছিলেন তিনি যোগী বা দার্শনিক হবার আগে থেকেই কবি ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন --" তোমাকে যথার্থ বলছি যে জীবনে কখনো, কখনো, কখনোই আমি দার্শনিক ছিলাম না--যদিও লিখেছি বটে সেইরকম, কিন্তু সে হলো অন্য কথা। যোগ করার ও পণ্ডিচেরীতে আসার আগে দর্শনের বিষয় থোড়াই জানতাম—ছিলাম শুধু কবি ও রাজনৈতিক, দার্শনিক নয়। ... প্রত্যহ যোগ সাধনা করতে গিয়ে আমি যা কিছু জেনেছি ও অনুভব করেছি সেগুলিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষাতে লিখতে গিয়ে দেখি তাই আপনা হতে দার্শনিক হয়ে দাড়াল। কিন্তু তাতেই তো কেউ দার্শনিক হয় না।"[১১] বাস্তবিকই লণ্ডনে ছাত্রাবস্থা থেকেই শ্রীঅরবিন্দ কবিতা লেখা শুরু করেন। আর জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তাঁর প্রিয় 'সাবিত্রী' মহাকাব্য লিখেছেন, সংশোধন করেছেন, পরিমার্জিত করেছেন। অতিঅল্প বয়স থেকেই শ্রীঅরবিন্দের কবিতা লেখার প্রবণতা ছিলো। যখন তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে ছিলেন তখনই 'ফক্স্' পারিবারিক পত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। লণ্ডনে সেণ্ট পল্স্ স্কুল থেকে পাশ করে যখন তিনি কেম্ব্রিজে কিংস্ কলেজে ভর্তি হবার পর ঐ কলেজ থেকে ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপস্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, তখন তিনি ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা ও গ্রীক ভাষায় আয়াম্বিক (Iambic) ছন্দে কবিতা রচনার জন্যে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এর আগে সেণ্ট্ পল্স্ স্কুলে পড়বার সময়ে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি ইংরেজী কবিতা লিখেছিলেন। কেম্ব্রিজে থাকার সময় শ্রীঅরবিন্দ যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন সেগুলি বরোদা থেকে ১৮৯৫ সালে Song to Myrtila নামে প্রকাশিত হয়। এইটিই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তারপর তিনি অনেকগুলি গীতিকবিতা, নাটক এবং দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। সেগুলি তিনটি বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো—আগেই বলেছি সুবৃহৎ প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী' (Savitri)। এই মহাকাব্যের সাহিত্যমূল্য প্রমাণের জন্যে বিদগ্ধজনের প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন নেই, সহৃদয় পাঠকের রসবোধেই এর আবেদন প্রতিষ্ঠিত। শ্রীঅরবিন্দ একদিকে যেমন সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তেমনি সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকও ছিলেন। ড্রয়েট্ পরিবারে থাকার সময় তিনি

১০। রবীন্দ্র রচনাবলী (মূল বিশ্বভারতী সং), ৮ম খণ্ড পৃ · ৩৫৪

১১। শ্রী অরবিন্দ 'নিজের কথা' (পশুপতি ভট্টাচার্যকৃত 'On Himself' গ্রন্থের অনুবাদ), ১৯৮৩, পৃ · ২৯৫ (৪/৯/১৯৩৪ তারিখে লেখা চিঠি)।

লাতীন ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ড্রয়েটের কাছে ভালোভাবে লাতীন ভাষা এবং শ্রীমতী ড্রয়েটের কাছে ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন। এখানে একদিকে তিনি যেমন প্রাচীন ভাষা লাতীন শিক্ষা করেন, তেমনি আধুনিক ভাষা ইংরেজীর বাইবেল এবং রোমান্টিক যুগের কবিদের প্রভৃত কাব্যপাঠের সুযোগ পান। শেক্স্‌পীয়র, কীট্‌স্‌ ও শেলী তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন। সেন্ট্‌ পল্‌স্‌ স্কুলে ভর্তি হবার পর সেই স্কুলের অধ্যক্ষ লাতীন ভাষায় তাঁর দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজেই তাঁকে গ্রীক পড়িয়ে ঐ ভাষায় সুদক্ষ করে তোলেন। ফলে সেন্ট্‌ পল্‌স্‌ স্কুলে থাকার সময়ে তিনি প্রধান-প্রধান গ্রীক ও লাতীন সাহিত্য পাঠ করেন। সেন্ট পল্‌স্‌ স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষায় ক্লাসিক ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্যে বার্ষিক বৃত্তি লাভ করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় ক্লাসিক্‌স্‌-এ উচ্চ নম্বর পান। স্কুলে সাহিত্যে তাঁর দক্ষতার জন্যে তিনি বাটারওয়ার্থ্‌ পুরস্কার (২য়) (Butterworth 2nd Prize) লাভ করেন। দীর্ঘকাল বিলেতে থাকার ফলে ইংরেজীই শ্রীঅরবিন্দের মাতৃভাষা হয়ে গিয়েছিলো। পরে তিনি নিজের চেষ্টাতেই এত ভালোভাবে বাংলা শিখেছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের রচনা পাঠ করে তার রস গ্রহণ করতে পারতেন। বঙ্কিম-রচনা তিনি এমন অধিগত করেছিলেন যে, ১৮৯৪ সালের ১৬ই থেকে ২৭শে আগষ্ট মুম্বইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ইংরেজীতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলি এখনো মান্য মূল্যায়ন হিসাবে বিদগ্ধ ব্যক্তিরা স্মরণ করে থাকেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বাংলা সাধুগদ্য পাঠ ও রসগ্রহণ করতে পারলেও চলিত ভাষায় কথা বলতে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। তাই বরোদার চাকরিতে থাকার সময়েই ১৮৯৮-৯৯ প্রায় দুবছর তাঁকে কথ্য বাংলায় অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে তৎকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার রায় এই সময় তাঁর প্রায় নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাঁর লেখা 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' (প্রথমে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত) থেকে জানতে পারি বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ কী গভীর জ্ঞানতপস্যায় অতিবাহিত করেছেন। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন এবং বহুভাষার সাহিত্যগ্রন্থ নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন বিশ্বসাহিত্যের মধুকর। দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন—"অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্যন্ত দুঃসহ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্পের' আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর একইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইস্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম।....তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানাভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানাভাষায় গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, লাতিন......প্রভৃতি কত ভাষার কতরকমের পুস্তক,....... হোমারের ইলিয়াদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল।.....তিনি কোনও সপ্তাহে দুই একদিন বাঙ্গালা পড়িতেন।........বাঙ্গালা একটু ভাল রকম শিখিয়া অরবিন্দ 'স্বর্ণলতা', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', প্রভৃতি পুস্তক পাঠে

মনঃসংযোগ করেন।.....বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন; আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ। অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের এই কোকিল-কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন।"[১২]

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে একাধারে কবির সৃজনী প্রতিভা, সাহিত্যানুরাগীর রসবোধ, বিশ্বসাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক মনন সার্থকভাবে সমন্বিত হয়েছিলো বলেই তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নন্দনতত্ত্ববিদ এ সাহিত্য-সমালোচক হতে পেরেছিলেন।

নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ

১. The Future Poetry এবং

২. Letters on Poetry and Art

শ্রীঅরবিন্দ 'আর্য' (Arya) নামে যে পত্রিকা বের করেছিলেন, তাতেই ১৯১৭ র ডিসেম্বর থেকে ১৯২০ র জুলাই পর্যন্ত তাঁর মূলগ্রন্থ 'The Future Poetry' (ভবিষ্যতের কবিতা) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনার উপলক্ষটি এই রকম : জেম্‌স্‌ এইচ্‌. কাজিন্সের (James H Cousins) লেখা বই 'New Ways in English Literature' শ্রীঅরবিন্দের কাছে আসে এই পত্রিকায় সমালোচনার জন্যে। শ্রীঅরবিন্দ এই পুস্তক সমালোচনাটি লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে-লেখাটি আর শেষ করেন নি। কারণ শিল্প ও জীবন সম্পর্কে নিজের ধ্যান ধারণা ও ইতিমধ্যে গড়ে-ওঠা নিজের মতামতগুলি সুপরিণত সুপরিকল্পিত ভাবে প্রকাশ করার জন্যে নিজের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কথা তাঁর মনে আসে এবং তারই ফলে 'আর্যে' প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থ—'The Future Poetry'। এটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। এবং এর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। এই গ্রন্থের আমি যে অনুবাদ করি সেটি 'শৃন্বন্তু' পত্রিকায় ১৩৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র থেকে ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৯৯৫ সালে 'ভবিষ্যতের কবিতা' নামে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৭ সালে 'অনুবাদের জন্যে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে' সম্মানিত হয়।

দ্বিতীয় বইটির মূলরূপ শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর তৃতীয় খণ্ড রূপে 'Letters of Sri Aurobindo' (On Poetry and Literature) ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশিত। তারপরে এর পরিবর্ধিত রূপটি প্রকাশিত হয় Letters on Poetry Literature and Arts' নামে। এর বাইরে ছিলো তাঁর নিজের প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী' প্রসঙ্গে তাঁর পত্রাবলী এবং 'On Himself' গ্রন্থে প্রকাশিত 'The Poet and the Critic' শীর্ষক অধ্যায়ে মুদ্রিত তাঁর পত্রাবলী। এই সব পত্রই 'Complete Works of Sri Aurobindo' শীর্ষক রচনাবলীর সপ্তবিংশ খণ্ডে 'Letters on Poetry and Art' নামে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ডাঃ নীরদ বরণের সঙ্গে তাঁর যে পত্রবিনিময় হয় (Correspondence with

১২। রায়, দীনেন্দ্রকুমার : 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ', ২য় সং, ১৩৭৯, পৃ : ৪৩-৪৭

Sri Aurobindo) তাতেও শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মতামত পাই।

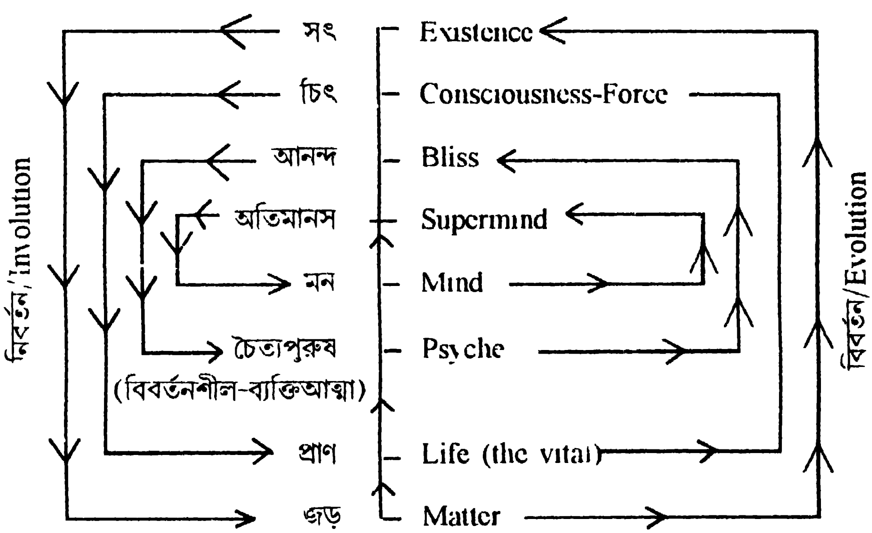
শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ঃ রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ 'কবিমনীষী'র জীবনদর্শন তাঁদের সমগ্র জীবনসাধনার পরিণত প্রাপ্তি, ঘনীভূত নিষ্কর্ষ এবং তাদের শিল্প-দর্শন বা নন্দনতত্ত্ব হলো তাঁদের অখণ্ড জীবনদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এইজন্যে শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব তাঁর জীবনদর্শনের আলোকেই বিবেচ্য। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন হলো মূলত বিবর্তনবাদী দর্শন। যদিও শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তবু আধুনিক কালে সারা বিশ্বের চিন্তা-জগতে বিবর্তনবাদের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৯ সালে চার্লস্ ডারউইনের The Origin of the Species গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর থেকে। ডারউইনই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম বিবর্তনবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। বিবর্তনবাদের তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীতে গ্যাসীয় পদার্থ জমে ক্রমশ জড় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিলো। এই জড় পদার্থ থেকে ক্রমে শ্যাওলা, বৃক্ষলতা ইত্যাদির জন্ম হয় এবং তারপরে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ও ক্রমে উন্নততর প্রাণীর আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে জড় (Matter) থেকে প্রাণের (Life/the vital) বিকাশ হয়। পশুপ্রাণীর বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে মানুষের আবির্ভাব হয়। মানুষ হলো মননশীল প্রাণী, সুতরাং মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীতে প্রাণের পরে মনের (Mind) স্তর সূচিত হয়। এইভাবে বিবর্তনের ধারায় জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে মনের বিকাশ হয়। ডারউইন মানুষ পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করে নীরব হয়ে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বিবর্তনের তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তাকে দৃঢ় যুক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ডারউইনের তত্ত্বে একটি ফাঁক ছিলো। শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে, প্রচলিত বিবর্তনবাদে জড় থেকে যে প্রাণের বিকাশ এবং প্রাণ থেকে যে মনের বিকাশ হয়েছে, ডারউইন তার শুধু প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তার কারণটি ব্যাখ্যা করেন নি। জড়ের মধ্যে প্রাণ এবং প্রাণের মধ্যে মন আগে থেকেই সুপ্ত ছিলো। সেইজন্যে তা থেকে মনের বিকাশ হয়েছে। বীজের মধ্যে গাছের সম্ভাবনা আগে থেকে সুপ্ত না থাকলে তা থেকে গাছের বিকাশ হবে কি করে? তাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'The Life Divine'-এর মধ্যে বলেছেন "We speak of the evolution of Life in Matter, the evolution of Mind in Matter, but there seems to be no reason why Life should evolve out of material elements or Mind out of living form, unless we accept the Vedantic solution that Life is already involved in Matter and Mind in Life."[১৩]

অর্থাৎ "আমরা জড়ের মধ্যে প্রাণের বিবর্তনের কথা বলি, জড়ের মধ্যে মনের বিবর্তনের কথা বলি; কিন্তু জড় উপাদান থেকে প্রাণের এবং প্রাণময় আধার থেকে মনের বিবর্তন হবে কেন, তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না যদি-না আমরা বেদান্তের এই সমাধান মেনে নিই যে, প্রাণ আগে থেকেই জড়ের মধ্যে নিহিত আছে এবং মন আগে থেকেই প্রাণের মধ্যে নিহিত আছে।"[১৪]

১৩। Sri Aurobindo 'The Life Divine' New York, 1951 P 5.

১৪। শ্রীঅরবিন্দ 'দিব্য যে জীবন' (শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine গ্রন্থের রামেশ্বর শ' কৃত অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

পৃথিবীতে প্রাণ ও মনের বিকাশ হবার আগে থেকে এর সম্ভাবনা পৃথিবীতে বীজাকারে সুপ্ত ছিল। বেদান্তের সমাধানটি হলো—পরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই বহুরূপে লীলা করার জন্যে সর্বভূতরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনিই সর্বসম্ভাবনাময়। সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে এই যে তিনি নেমে এলেন, নিজেকে বহুরূপে নিক্ষিপ্ত করলেন, এর ফলেই বিশ্বের সৃষ্টি —মহাবিস্ফোরণ। তাঁর এই নেমে আসার প্রক্রিয়াকে বলে 'নিবর্তন' (Involution)। ব্রহ্ম হলেন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ — তাঁর তিনটি প্রধান দিক — সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব, চেতনা বা চিৎশক্তি ও আনন্দ (Existence, Consciousness- Force and Bliss)। পৃথিবীতে বীজাকারে নেমে আসার পরে ব্রহ্মের এই তিনটি দিক ও তাঁর অন্যান্য অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আবার ফুটে উঠতে আরম্ভ করলো। এরই ফলে পৃথিবীতে ধাপে-ধাপে দেখা দিলো—জড় (Matter), প্রাণ (Life/the Vital) ও মন (Mind)। এই ঊর্ধ্বমুখী ক্রমবিকাশকেই (upward spiral) বলা হয় 'বিবর্তন' (Evolution)। এই নিবর্তন ও বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় ঃ—



ডারউইন প্রকৃতিতে মোটামুটি জড় থেকে পশুপ্রাণী ও পশুপ্রাণী থেকে মানুষের বিবর্তন পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বললেন—বিবর্তন মানুষের অর্থাৎ মনের স্তরে এসে থেমে যাবে কেন? আমরা যদি চিরন্তন প্রগতিতে (progress) বিশ্বাস করি, তাহলে মনের পরেও প্রকৃতির বিবর্তন চলবে এবং মনের পরের এই নতুন চেতনা-স্তরটির নাম তিনি দিয়েছেন Supermind বা অতিমানস। আমাদের শাস্ত্রে এই স্তরের উল্লেখ আছে, একে বলা হয়েছে বিজ্ঞানময় কোষ। বিবর্তনের ধারায় এই নতুন স্তরটির আর্বিভাব হলে মানুষের পরে উন্নততর এক শ্রেণীর প্রাণীর আবির্ভাব হবে অথবা মানুষ থেকেই সেই উন্নততর প্রাণীর জন্ম হবে। এই নতুন উন্নততর প্রাণীর তিনি নাম

দিয়েছেন Superman বা অতিমানব। পৃথিবীতে অতিমানবের সম্ভাবনা আরো কোনো-কোনো মনীষীর মনে ধরা পড়েছিলো। জর্জ্ বার্নার্ড্ শ' তাঁর Man and Superman নাটকে অতিমানবের কথা বলেছেন। জার্মান দার্শনিক নীট্শেও (Friedrich Wilhelm Nietzsche) তাঁর Thus Spake Zarathustra গ্রন্থে Superman -এর কথা বলেছেন, যদিও বার্নার্ড্ শ ও নীট্শের অতিমানব শ্রীঅরবিন্দের অতিমানবের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর দিব্য-গুণান্বিত পরম মঙ্গলের পূর্ণরূপ নয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের যে পূর্ণ-মানবতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাও অবশ্যই বর্তমানের মানুষের চেয়ে উন্নততর মানবজাতির স্বপ্ন।

শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হলো এই যে, মন থেকে অতিমানসের দিকে চেতনার ঊর্ধ্বায়ন হলে মানুষের জীবনেরও সামগ্রিক দিব্য-রূপান্তর সাধিত হবে। সাহিত্য ও শিল্পকলা যেহেতু জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত সেহেতু সাহিত্যেও এই নতুন জীবনের প্রতিফলন হয়ে নতুন চেতনার প্রকাশ ঘটবে। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মন ও অতিমানসের মধ্যেও অনেকগুলো মধ্যবর্তী স্তর আছে। এই স্তরগুলি একটি চিত্রের সাহায্যে এইভাবে উপস্থাপিত করা যায় :—

অতিমানস	↑	Supermind
অধিমানস	↑	Overmind
বোধিমানস	↑	Intuitive Mind
জ্যোতির্মানস	↑	Illumined Mind
ঊর্ধ্বমানস	↑	Higher Mind
মন		Mind

শিল্পী ও সাহিত্যিকের চেতনার যে ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ হবে তা মন থেকে অতিমানসে এক লাফে উত্তরণ নয়। মন থেকে ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বমানস (Higher Mind), জ্যোতির্মানস (Illumined Mind), বোধিমানস (Intuitive Mind), ও অধিমানসের (Ovrmind) মধ্যে দিয়েই ক্রমিক উত্তরণ হবে। তেমনি প্রথমেই অতিমানস স্তর থেকে শিল্প-প্রেরণার অবতরণ হবে না। মানুষের মধ্যে ঊর্ধ্বতর চেতনার অবতরণ ধাপে-ধাপে হবে। শ্রীঅরবিন্দ জনৈক জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন :

" how do you expect a Supramental inspiration to come down here when the Overmind itself is so rarely within human reach? That is always the error of the impatient aspirant, to think he can get the Supermind without going through the intervening stages "[১৫]

১৫। Sri Aurobindo Letters (3rd series) (On Poetry and Literature), Bombay 1949, P 98

মানুষের চেতনার এই ক্রমিক উর্ধ্বায়ন প্রকৃতির নিয়মেই হয়ে চলেছে। যতই উর্ধ্বায়ন হবে ততই উর্ধ্বতর স্তরের প্রেরণা কবি-শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করবে। ইতিমধ্যেই কোনো-কোনো কবির মধ্যে উর্ধ্বতর চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। যেসব কবির মধ্যে এই উর্ধ্বতর চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, শ্রীঅরবিন্দের মতে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্স্ (William Butler yeats) ও আইরিশ কবি এ.ই. (A.E. আসল নাম George William Russel)। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য হলো :

"আজ পর্যন্ত মানুষের চেতনা যেখানে এসে পৌঁচেছে, যা-কিছু লাভ করেছে, সে-সকলের সূক্ষ্মতম শীর্ষে অবস্থান করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা।"[১৬]

যদিও প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই মানুষের চেতনার উর্ধ্বয়ন হয়ে চলেছে, তবু সেই উর্ধ্বায়নের গতি মন্থর। এই গতিকে মানুষ তার যৌগিক প্রয়াসের দ্বারা ত্বরান্বিত করতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার দ্বারা তাঁর নিজের চেতনার যতই ধাপে-ধাপে উর্ধ্বায়ন সাধন করেছেন, ততই বারে-বারে সেই চেতনার আলোকে তাঁর প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী'র (Savitri) পরিমার্জন ও পুনর্লিখন করে গেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন "I used 'Savitri' as a means of ascension, I began with it on a certain mental level, each time I could reach a higher level I rewrote form that level"[১৭]

শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হলো --মন থেকে অতিমানসের দিকে চেতনার উর্ধ্বায়ন হলে মানুষের জীবনে নতুন চেতনার প্রভাব পড়বে। যেমন পশুর প্রাণময় স্তর থেকে মানুষের মনোময় স্তরে উত্তরণের ফলে নতুন জীবনের সূত্রপাত হয়েছিলো, তেমনি অতিমানস চেতনায় উত্তরণের ফলে মানুষেরও জীবনের সামগ্রিক দিব্য-রূপান্তর (transformation) সাধিত হবে। সাহিত্য ও শিল্পকলা যেহেতু জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত সেহেতু সাহিত্যে এবং শিল্পকলাতেও তার প্রতিফলন হবে এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকেও নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন সংঘটিত হবে।

প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টির দুটি দিক আছে। এক : শিল্পস্রষ্টা। দুই : শিল্পের বিষয়বস্তু। শিল্পের মূল বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যেমন, শ্রীঅরবিন্দও তেমনি, জীবনকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেননি, জীবন বলতে পার্থিব জীবন বুঝেছেন, তেমনি সূক্ষ্মজীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনও বুঝেছেন। কিন্তু জীবনের প্রত্যক্ষ গভীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা শিল্পসৃষ্টির জন্যে অপরিহার্য। শ্রীঅরবিন্দও জীবনপ্রেমিক কবি। তিনিও বলেছেন "যে-কোনো মহৎ সৃষ্টির জন্যে জীবনের পটভূমিকা থাকতেই হবে — এমন একটি প্রাণ-ভাণ্ডার চাই যা সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ, এমন এক মন ও কল্পনা চাই যা জীবনের

অনেক কিছু দেখেছে এবং অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে, অথবা এমন এক অন্তরাত্মা চাই যে জীবনে অনেক সংগ্রাম করেছে এবং যে তার জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন।"[১৮] অনেকে শ্রীঅরবিন্দকে ভাববাদী জীবন-বিবিক্ত যোগী বলে ভুল করেন। কিন্তু তিনি সংসারত্যাগী আত্মসর্বস্ব সন্ন্যাসী ছিলেন না, তাঁর সাধনা জীবনেরই জন্যে। জীবন তাঁর কাছে মুক্তি-সাধনার উপায় নয়, জীবনই লক্ষ্য।[১৯] —মানুষের জীবনের জরা-ব্যাধি, দুঃখ-বেদনা, জীবনের কদর্যতা দূর করে জীবনের সর্বাঙ্গীণ সমস্যার আমূল সমাধান করে জীবনকে সুন্দরতর পূর্ণতর রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি জীবনপ্রেমিক ছিলেন। কাব্যকে যখন তিনি বিচার করেছেন তখন কাব্যরসিকের দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন। কবির সাফল্য ও উৎকর্ষ তাঁর কবিত্বশক্তি দিয়েই বিচার করতে হবে। কবি পার্থিব জীবনকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, কি আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, সেটা দিয়ে কাব্যের উৎকর্ষ বিচার হবে না। এই জন্যে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—শেক্স্পীয়রের কাব্য-প্রেরণা আধ্যাত্মিক নয়, তাঁর কাব্যপ্রেরণা এসেছে রাজসিক প্রাণময় স্তর থেকে, হোমরের প্রেরণাও আধ্যাত্মিক নয়, জড় দেহস্তরেরই প্রেরণা, যদিও সেই জড় একটু সূক্ষ্ম জড়, কিন্তু তাঁদের চেয়ে বড় কবি আর কে হতে পেরেছে।

"Shakespeare is a poet of the vital inspiration, Homer of the subtle physical, but there are no greater poets in any literature."[২০]

শ্রীঅরবিন্দ কবির চেতনার যে ঊর্ধ্বায়ন বা সম্প্রসারণের কথা বলেছেন, সেটা বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু ঊর্ধ্বের চেতনা থাকলেই কোনো কবি বড়ো কবি হবেন এমন কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেন নি। যাই হোক শিল্পস্রষ্টার চেতনা বিবর্তনের ফলে যেমন ঊর্ধ্বমুখী হবে তেমনি শিল্পের বিষয়বস্তুরও ঊর্ধ্বমুখী ক্রমবিকাশ হবে। শিল্পের বিষয়বস্তু মূলত মানুষের জীবন ও সমাজ। স্রষ্টা যে জীবন ও সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাকে তাঁর সৃষ্টিতে রূপায়িত করেন সেই জীবন ও সমাজেরও ঊর্ধ্বায়ন হবে। তার ফলে শিল্পী এবং সাহিত্যিক ঊর্ধ্বতর উপজীব্যকে নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করবেন। তাঁর উপজীব্য তো মানুষ, ঊর্ধ্বতর চেতনায় উত্তরণের ফলে মানুষ এবং তার সমাজে যে রূপান্তর হবে, সেই রূপান্তর শিল্পস্রষ্টার সৃষ্টিতে অর্থাৎ শিল্পে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, চেতনার শুধু ঊর্ধ্বমুখী উত্তরণই (vertical move-

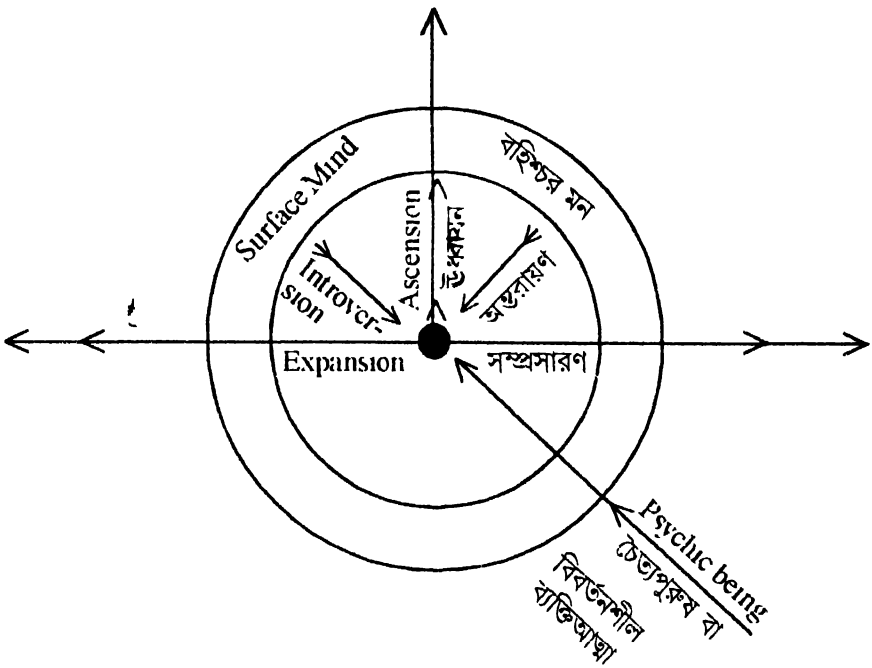
---

১৮। "For any considerable creation there must be a background of life, a vital rich and stored or a mind and an imagination that has seen much and observed much or a soul that has striven and been conscious of its strivings." Sri Aurobindo 'Letters of Sri Aurobindo' (On Poetry and Literature) 3rd series, 1949 p 51

১৯। "For us Life on earth is not a passage or a means, by transformation it must become a goal and a realisation"—The Mother 'Collected Works', Vol 12 1978, p 48.

২০। Sri Aurobindo Letters (On Poetry and Literature) 3rd series, 1949, p 95

ment or ascension) হবে না, পার্শ্বমুখী গতি বা সম্প্রসারণ (horizontal movement or expansion) এবং অন্তর্মুখী গতি বা অন্তরায়ণও (inward movement or introversion) সাধিত হবে। চেতনার এই ত্রিমুখী বিস্তার নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে —



পূর্বে চেতনার ঊর্ধ্বায়নের কথাই বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ চেতনার গভীরতামুখী অন্তরায়ণের ওপরেও বিশেষ জোর দিয়েছেন; বলেছেন—শিল্পী-সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে অন্তরতম সত্যকে আবিষ্কার করবে। এই পরিবর্তন কাব্যে সাহিত্যে ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে। কবি-সাহিত্যিকেরা জীবনের গভীরতর সত্যকে আবিষ্কার করছেন। এককালে ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদেরা সচেতন মনের উপরিতল ছেড়ে অবচেতন মনের গভীরতর রহস্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। এবং তার প্রভাব সাহিত্যেও পড়েছে। তেমনি ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, জেমস্ জয়েস্ প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসে যখন মনের চেতনাপ্রবাহের কথা তুলে ধরেছেন, তখনো বোঝা গেছে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ জীবনের উপরিতল ছেড়ে অন্তর্মুখী হচ্ছে। আবার কবিতায় যখন পরা-বাস্তবতা বা Surrealism-এর প্রতিফলন হলো, তখনো আমরা দেখতে পেলাম স্থূল বাহ্য সত্যকে ছেড়ে কবি-সাহিত্যিকেরা একটা গভীরতর সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এই সবকিছুতেই বোঝা যায় কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে চলেছে। এই অন্তর্মুখীনতা এশিয়ার কবি প্রকৃতির একটি সাধারণ প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অন্তর্মুখী গতির শেষ সিদ্ধি হলো শিল্পে সাহিত্যে মানুষের অন্তরতম সত্তা (psychic being) ও অন্তরাত্মার (soul)

সত্যের প্রকাশ যা রবীন্দ্রনাথ ও আইরিশ কবিদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্য করেছিলেন। 'আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশের গভীরতায়, আমাদের ইন্দ্রিয়, হৃদয়, মন, প্রাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি বোধিচেতন ব্যক্তিআত্মাই হল উর্ধ্ব থেকে অবতীর্ণ সেই কাব্যবাণীর বিতরণের আধার। এই বোধি-চেতন ব্যক্তি-আত্মা হল অন্তরেব কোন গোপন গুহায় লুক্কায়িত একটি উর্ধ্বায়নী শক্তি। ... গুহার .. দ্বারে যে পর্দাটি ঝুলছে তার ফাঁক দিয়ে কখনো-কখনো একটু-আধটু উপরের জিনিসটি দেখা দেয়, ... কখনো-বা তার কপাট থাকে শুধুই ভেজানো—'নিহিতং গুহায়াম্, গুহাহিতং গহ্বরেষ্টম্।' ...
সাম্প্রতিক কালের কবিতার সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবণতাটিই হল, সেই জ্যোতির্ময় গহ্বরটির দ্বার-উন্মোচনের চেষ্টা, আমাদের বুদ্ধি, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ানুভব, প্রাণশক্তি ও অনুভূতির অন্তর্নিহিত এই বোধিচেতন আত্মিক স্বরূপটির সাক্ষাৎদর্শন এবং তার উপযোগী ভাষাভঙ্গি লাভ করার সাধনা।"[২১ক]

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সেই অন্তরতম সত্তারই উপলব্ধি (শ্রীঅরবিন্দ যাকে চৈত্যপুরুষ (Psychic being) অর্থাৎ বিবর্তনশীল ব্যক্তিআত্মা বলেছেন) : 'শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইযা উঠিতেছে, তাহাব সমস্ত সুখ-দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন ......আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারেবারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলেব সহিত, বিরাটের সহিত তাহাতে যুক্ত করিয়া দিতেছেন ....এই যে কবি, যিনি আমাব সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"[২১খ]

শ্রীঅরবিন্দ চেতনার পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণের কথাও বলেছেন অর্থাৎ কবি-সাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টি নিজেকে ছাড়িয়ে, তাঁর দেশেব গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বকে এবং মহাবিশ্বকেও আলিঙ্গন করে নেবে। এতে কাব্যের উপজীব্য বিস্তৃত হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুয়ের মেলবন্ধন সাধিত হবে। এবং কবির দৃষ্টি ক্রমশ বিশ্বদৃষ্টিতে স্থানান্তরিত হবে। এই পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ অর্থাৎ বিশ্বকে কাব্যসৃষ্টিতে আলিঙ্গন করে নেওয়া, এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তো উপনিষদেই রয়েছে। আধুনিক কবিদের মধ্যেও অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হয়েছে। আমরা আধুনিককালে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের কথা বলছি, কাব্য ও সাহিত্যে আধ্যাত্মিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ বিশ্বায়নের সম্ভাবনার কথা শ্রীঅরবিন্দ বহু পূর্বেই বলেছিলেন। এবং এই বিশ্বায়ন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শের মধ্যে বহুপূর্বেই রূপায়িত হয়েছিলো যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ

২১ক শ্রী অরবিন্দ: 'ভবিষ্যতের কবিতা' (শ্রীঅরবিন্দেব The Future Poetry গ্রন্থের রামেশ্বর শ'-কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃঃ ৩৬১।

২১খ রবীন্দ্র রচনাবলী ১২৫তম জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, বিশ্বভারতী, চতুর্দশ খণ্ড, ১৩৯৮, (আত্মপরিচয়) পৃঃ ১৩৯।

দেখি 'গোরা' উপন্যাসে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার মধ্যে একটির রয়েছে বিরাট একটা আধ্যাত্মিক মন এবং এমন একটি অন্তর্মুখী দৃষ্টি যা আত্মিক স্বরূপ ও শাশ্বত সত্যের দিকে ঘোরানো; অন্যটির রয়েছে চিন্তার স্বাধীন অন্বেষণা এবং প্রাণশক্তির এমন দুর্দম সাহস যা পৃথিবী ও তার সমস্যাবলীকে ক্রমে-ক্রমে জয় করে চলেছে। এখন এই দুই মানসিকতার মধ্যে যার যে সম্পদই থাক না কেন, এই দুই এসে পরস্পরকে স্পর্শ করবে এবং দুয়ের এই পারস্পরিক তড়িৎ- স্পর্শেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এবং দুয়ের মিলন থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যতের কবিতা।"[২২]

শ্রীঅরবিন্দ চেতনার যে ত্রিমুখী সম্প্রসারণের কথা বলেছেন—চেতনার ঊর্ধ্বায়ন (ascension), চেতনার ব্যাপ্তিসাধন (widening) এবং চেতনার অন্তরায়ণ (introversion) তা প্রকৃতির বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাগিদে তা আপনা থেকেই হয়ে চলেছে। মানুষ যেহেতু প্রগতি চায়, সেহেতু প্রগতির এই ধারায় এগিয়ে চলা এবং যেহেতু মানুষ প্রকৃতির অন্য পশুপ্রাণীর চেয়ে সচেতন প্রাণী সেহেতু তার সচেতন সক্রিয় প্রয়াসের দ্বারা এই প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, তার সচেতন স্বধর্ম। আর মানুষের এই স্বধর্মকে রসোত্তীর্ণ সুন্দর রূপ দেওয়া কাব্য ও শিল্পের স্বধর্ম, সেজন্যে সুন্দর শিল্পরূপও অপরিহার্য। তাই কাব্যের ও শিল্পের আন্তর ধর্মের সঙ্গে কলাসৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধনের কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ এই দুয়ের সমন্বয় সাধন করে বলেছেন—"শিল্পেরই জন্য শিল্প নিশ্চয়; কারণ শিল্প হ'ল এক হিসাবে অনবদ্য রূপ, সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু সৌন্দর্য আবার অন্তঃপুরুষের জন্য, আত্মার জন্য— সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে তার ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরুষ, আত্মা যা গড়তে চায় সে-সকলের প্রকাশের জন্য। এই আত্মপ্রকাশের ধারায় রয়েছে স্তর-বিভাগ, ক্রমবিকাশ—সম্প্রসারণ-পরম্পরা, সোপানাবলী যারা সমুচ্চের দিকে উঠে চলেছে। শিল্পকে পরম বিস্তৃত বিস্তৃতির অভিমুখে প্রকাশিত করে চলার সাথেই তাকে ধরে আবার ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর শিখরে উঠে ঊর্ধ্বতমের দিকে চলতে হবে—এই হ'ল আমাদের শিল্প-সাধনার, আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার—উভয়েরই প্রয়াস।"[২৩]

কাব্যের ভাববস্তুতে যেমন পরিবর্তন হবে, তেমনি তার প্রকাশরীতিতে তিনটি ভবিষ্যৎ প্রবণতার কথা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ : (১) কবিদৃষ্টির তীব্রতা (২) রচনাশৈলীর তীব্রতা (৩) ছন্দঃস্পন্দনের তীব্রতা—এই তিনের সম্মিলনে ভবিষ্যতের কবিতা হয়ে উঠবে

২২। শ্রীঅরবিন্দ: 'ভবিষ্যতের কবিতা' (শ্রীঅরবিন্দের 'The Future Poetry' গ্রন্থের রামেশ্বর শ'-কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃঃ ৩৬৮।

২৩। "Art for Art's sake certainly Art as a perfect form and discovery of Beauty; but also Art for the soul's sake, the spirit's sake and the expression of all that the soul, the spirit wants to seize through the medium of beauty,-In that self-expression there are grades and hiearchies widenings and steps that lead to the summits And not only to enlarge Art towards the widest wideness but to ascend with it to the heights climbing towards the Highest is and must be part both of our æsthetic and our spiritual endeavour" Sri Aurobindo A letter on 'Art for Art's sake' in সুন্দরের সীমানা, ৬৩ কলেজস্ট্রিট কলকাতা · আর্য্য পাবলিশিং হাউস, ১৩৭১, পৃঃ ৭১।

৩. ক্রোচে ও তাঁর নন্দনতত্ত্ব

" Croce may be said to be the greatest of those critics who believe in the entire freedom of the creative spirit and its independence of dogma, of historical fact, utility and morality "[১] এ যুগের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বাঙালী সাহিত্য-সমালোচক যাঁকে আধুনিক পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নন্দনতত্ত্ববিদ্ বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি ইতালীয় নন্দনতত্ত্ববিদ্ বেনিদেত্তো ক্রোচে। ইতালীর একুইলা প্রদেশে ১৮৬৬ সালে তাঁর জন্ম। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক তিনি এবং রবীন্দ্রনাথের খানিকটা সমধর্মীও। একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো 'সব পেয়েছির দেশে' কাটেনি তাঁর শৈশব-কৈশোর। পিতা রক্ষণশীল ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন। পুত্রকে ধর্মশিক্ষা ও কৃচ্ছ্র সাধনা শিক্ষা দিতে কোনো ত্রুটি করেন নি। বরং তাঁর যান্ত্রিক ধর্মশিক্ষায় ফল হল উল্টো। ক্রোচে হয়ে উঠলেন নাস্তিক। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন—"পিতা পুত্রকে ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে যত্নের ত্রুটি কবেননি। এত বেশি যত্ন করেছিলেন যে পুত্র বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন।" (শিল্পতত্ত্ব, ১৩৭৬, পৃ: ১২) যৌবন থেকেই ক্রোচের জীবনে ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে যে বিরাট ভূমিকম্প হয়, তাতে ক্রোচে পিতামাতাকে হারালেন, একমাত্র বোনও মারা গেল। সকলকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ ক্রোচে ক্যাসামিবংকিয়োলো শহরের বসবাস ছেড়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নেপলস্-এ চলে আসেন। এরপর থেকেই ক্রোচের প্রতিষ্ঠা। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পত্রিকা 'লা ক্রিতিকা' (La Critica) প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন এবং বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মতো শৈশব-কৈশোর থেকে ক্রোচে সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। তিনি আইনের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু আইনের মতো নীরস জিনিসে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। আইনের পাঠ তিনি গ্রহণ করেন নি। ফলে আইনেব পরীক্ষাও তাঁর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি স্কুলের নীরস পড়াশুনার প্রতি বিরূপ ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন পড়াশুনা তাঁর খুবই ভালো লাগত। স্কুলের বদলে লাইব্রেরীতে তাঁর সময় কাটত বেশি, Casanatense Library-তে তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যেত সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠে। ১৯০৩ সালে তিনি তাঁর পঠিত বিদ্যাকে কাজে লাগালেন—ঐ বছর প্রকাশ করলেন নিজের সম্পাদনায় দ্বিমাসিক পত্রিকা 'লা ক্রিতিকা' (La Critica)। মানবিকী বিদ্যার তিনটি শাখা ছিল তাঁর পত্রিকার বিচরণ-ক্ষেত্র ঃ সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস। এই তিনটি শাখাই ছিল ক্রোচের সারস্বত সাধনার তিনটি প্রধান ক্ষেত্র।

ইংরেজী সাহিত্যের অনেক রোমান্টিক কবি যেমন মানবসমাজের কল্যাণসাধনের

১। Sen Gupta, Prof S C *'Towards A Theory of The Imagination'* London Oxford University Press. 1959 p 64

জন্যে রাজনীতিতে চলে এসেছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করেছেন, তেমনি ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে ১৯১০ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সিনেটার (Senator) নির্বাচিত হন। ১৯১০-২১ সালে তিনি ইতালীর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। কারণ ক্রোচে প্রথমাবধি মানবপ্রেমিক ও মানবতাবাদী ছিলেন। এই মানবপ্রেমের জন্যেই তিনি একসময় মার্ক্স্‌বাদী দর্শনে আকৃষ্ট হন। যদিও তিনি পরবর্তীকালে মার্ক্স্‌বাদী দর্শনের প্রভাব কাটিয়ে উঠেন, তবু তাঁর মানবপ্রেম অবিচলিত ছিল। মুসোলিনির (Mossolini) দোর্দণ্ড প্রতাপের দিনেও তিনি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

১৯১৪ সালে অদেলে রোসির (Adela Rossi) সঙ্গে ক্রোচের বিবাহ হয়। ১৯২০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। অক্সফোর্ড্ (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ফ্রাইবার্গ (Freiburg) নামক সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করেন।

১৯৪৭ সালে ক্রোচে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং পুরোপুরি উচ্চতর শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নেপ্‌ল্‌স্ (Naples) -এ তিনি মানবিকী-বিদ্যায় স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্যে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। সেই সংস্থার নাম Italian Institute of Historical Study। এইখানেই ৮৬ বছর বয়সে (১৯৫২) তাঁর জীবন- অবসান ঘটে। ৫০০০০ লোক তাঁর শেষকৃত্যে যোগদান করে। এ থেকে বোঝা যায় এই মানবতাবাদী মানবপ্রেমিক দার্শনিক জনসাধারণের কাছ থেবে কত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেছিলেন।

ইতালীয় নন্দনতত্ত্ববিদ বেনিদেত্তো ক্রোচে একাধারে দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। দার্শনিক বলে তাঁর আলোচনায় গভীরতা ও বিধিবদ্ধ তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটন লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসবেত্তা ছিলেন বলে তাঁর আলোচনা মানব-ইতিহাসের বিবর্তনের পর্যবেক্ষণজনিত গভীর জীবনবীক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য তিনি মার্ক্স্‌বাদী সাহিত্য-সমালোচকদের মতো জীবনের শুধু আর্থ-সামাজিক (Socio-economic) পটভূমিকার প্রতিক্রিয়ারূপে সাহিত্যকে দেখেননি; কিন্তু ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্বসন্ধানীর জীবনদৃষ্টিতে যে গভীরতা আসে ক্রোচের আলোচনায় সেই গভীরতা দেখা যায়। আর সর্বোপরি তিনি সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি দর্শন বা ইতিহাস রূপে দেখেন নি।

তিনি সৌন্দর্যের যে পূর্ণরূপ তাঁর ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা ঈশ্বরের পূর্ণ-সৌন্দর্যেরই সমতুল্য। তবু তিনি নাস্তিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নাস্তিকতা চার্চের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে; ঈশ্বরের যে সৌন্দর্যরূপ রয়েছে তাকে ঈশ্বরের নামটি বাদ দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন। এইজন্যে তাঁকে বলা হয় " a Christian outside the church"। এ বিষয়ে তিনি ইংরেজী কবি শেলীর সংগে তুলনীয়। একাধিক বিদ্যায় বিশারদ হলেও ক্রোচে মূলত নন্দনতত্ত্ববিদ রূপে খ্যাত। নন্দনতত্ত্ববিষয়ক তাঁর প্রধান রচনা হল :

(1) Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic (1901), trans. By Doughlas Ainslie 1909, 2nd. rev. ed. 1922.

(2) Aristo, Shakespeare and Corneille, trans. By Ainslie, London, 1920

(3) Breviary of Aesthetic, Rice Institute Pamphlets, II 1915 223-310

(4) The Defence of Poetry trans By Carritt, Oxford, 1933

(5) La Poesia Populare e Poesia d' Arte

(6) The Poetry of Dante, trans By Ainslie, London, 1922

(7) European Literature in the 19th Century

(8) Poesia Antica e poesia Moderna

ক্রোচের নন্দনতত্ত্বকে এক কথায় intuition-expressionism--বোধি (স্বজ্ঞা)-প্রকাশবাদ বলা যায়। ক্রোচের মতে শিল্পসৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির (intellect) কাজ নয়। শিল্পসৃষ্টি হল সহজজ্ঞান বা বোধি বা স্বজ্ঞার (intuition) প্রকাশ (expression)। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ক্রোচে জ্ঞানকে (knowledge) দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ বোধিলব্ধ জ্ঞান (intuitive knowledge) ও নৈয়ায়িক জ্ঞান (logical knowledge)। এই দ্বিবিধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম বা পদ্ধতিও আলাদা। বোধিলব্ধ জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে (through imagination') অর্জিত হয় আর নৈয়ায়িক বা তার্কিক জ্ঞান বুদ্ধির (intellect) সাহায্যে অর্জিত হয়। এই দ্বিবিধ জ্ঞান কী বিষয়ে অর্জিত হয়? বোধিলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিসত্তা (individual)-বিষয়ক, আর নৈয়ায়িক জ্ঞান হল বিশ্বসত্তা (universal) বিষয়ক। বোধিতে জ্ঞান হয় এক-একটা জিনিস সম্পর্কে পৃথক-পৃথক, নৈয়ায়িক জ্ঞান হয় একটা জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের সম্পর্ক বিষয়ে। যেমন বোধিলব্ধ জ্ঞান হবে রাম, শ্যাম, যদু প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে। নৈয়ায়িক জ্ঞান হবে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে— যে সম্পর্কের সূত্রে এরা অন্বিত অর্থাৎ মানবতা সম্পর্কে। শিল্প হল intuition বা বোধি অর্থাৎ শিল্পে যে জ্ঞান লাভ হয় তা বোধিলব্ধ। অতএব শিল্পে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা কল্পনার মাধ্যমে লাভ করি। এবং শিল্পে যে জ্ঞান লাভ করি তা ব্যক্তিসত্তা বিষয়ে জ্ঞান। অন্যদিকে দর্শন শাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা হল নৈয়ায়িক বা যুক্তিলব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান আসে intellect বা বুদ্ধির মাধ্যমে আর এতে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা সার্বজনীন সত্তা সম্পর্কে। যেমন মানবতা সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান। শিল্পের সৃষ্টি হল ব্যক্তিরূপ সৃষ্টি। রামায়ণের রামচন্দ্র, সীতা, রাবণ এরা হল ব্যক্তিরূপ, এরা প্রত্যেকে অনন্য (unique) অতুলনীয়। সাহিত্যের ও শিল্পের গভীরে অবশ্য বিশ্বসত্যের যে স্পর্শ পাই তার কারণ সমস্ত মহৎ সাহিত্যেই গভীর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ থাকে। বস্তুত ব্যক্তিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বসত্যের প্রকাশই মহৎ সাহিত্যের পরিচয়, এই বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা ও উদ্‌ঘাটনের কথা ক্রোচে বলেননি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এই বিশ্বসত্যের উদ্‌ঘাটনই মহাকবির প্রতিভার পরিচয় চিহ্ন। তাঁর মতে শুধু রূপ সৃষ্টি করে যাওয়া শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, রূপের অন্তরালে প্রকৃতি তার যে রহস্য গোপন করে রেখেছে, তা উদ্‌ঘাটন ও ব্যাখ্যা করাও শিল্পের উদ্দেশ্য। আর এই রহস্য ব্যাখ্যা করতে গেলে শিল্পীকে বিশ্বসত্যে উপনীত হতেই হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন

"যে কোনো সার্থক শিল্পের মতো কাব্যেরও লক্ষ্য হল... প্রকৃতি নিজেই তার সৃষ্টির নানা স্তরে যেসব ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে সেইগুলির সাহায্যে তারই রহস্য ব্যাখ্যা করা,—সেই রহস্য সে আমাদের কাছে গোপন করে রাখে বটে, কিন্তু ঠিক পথে তার দ্বারস্থ হলে সে তার রহস্য মেলে ধরতে প্রস্তুত।"[২]

ক্রোচের মতে intuition বা বোধি যেমন প্রথমে মানবমনের অন্তর্লোকে আপনা থেকেই ভেসে ওঠে, তেমনি তার প্রকাশরূপও প্রথমে আমাদের মনোলোকেই ফুটে ওঠে। অর্থাৎ কাব্য বা চিত্র বা ভাস্কর্য-মূর্তিটি প্রথমে আমাদের মনের মধ্যেই রূপ নিয়ে গড়ে ওঠে। ক্রোচের মতে সেইটাই শিল্পের আসল প্রকাশ। আর ভাষার সাহায্যে বা বর্ণ-রেখার সাহায্যে বা প্রস্তর-মূর্তির সাহায্যে আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পরূপ গড়ে তুলি সেটা বাহ্য ব্যাপার (externalisation)। কিন্তু ক্রোচে এই বাহ্য প্রকাশকেও বোধির অপরিহার্য অঙ্গ বলেই স্বীকার করেছেন। বোধির বাহ্যপ্রকাশ ছাড়া শিল্প সম্ভবই নয়। ক্রোচে বলেছেন বোধি খাঁটি হলে তার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী, বরং প্রকাশই বোধির অকৃত্রিমতার পরিচয়:

"There is a sure method of distinguishing true intuition, true representation, from that which is inferior to it: the spiritual fact from the mechanical, passive, natural fact. Every true intuition or representation is also expression. That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation. but sensation and more natural fact."[৩]

ক্রোচের মতে শিল্পে বা কাব্যে আবেগের উত্তেজনা প্রকাশের সুযোগ নেই। আবেগের উপরে ধ্যানের প্রশান্তি যুক্ত হলেই মহৎ শিল্পের জন্ম হয়:

" poetic idealisation is not a frivolous embellishment, but a profound prenentation, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation He who fails to accomplish this passage, but remains immersed is passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts." [৪] অথচ সেই প্রশান্তি নিরুত্তাপ নিষ্প্রাণ অনুভূতিও নয়। ক্রোচে বলেছেন: "poetic genius chooses a straight path in which passion is calmed and calm is passionate." ক্রোচের মতে প্রতিটি শিল্পসৃষ্টি হল অতুলনীয় (unique), কারণ শিল্পের যেটা মূল সেই বোধিই হল অতুলনীয় । জীবনের কোন অনুভূতি বা আবেগ একবার সংঘটিত হবার পরে তাকে পুনর্বার জাগানো যায় না। শিল্প কিন্তু বাস্তবে না হলেও ভাবলোকে সেটাকে পুনর্জাগরিত করে। এবং ভাবলোকে এই যে পুনর্জাগরণ ঘটায় এটা স্থান-কালের সীমা ত্যাগ করে শাশ্বতের ও লোকোত্তর জগতের বস্তু হয়ে যায়।

"A life lived, a feeling felt, a volition willed are certainly impossible

---

২। শ্রীঅরবিন্দ : 'ভবিষ্যতের কবিতা' (ড: রামেশ্বর শ' কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃ: ৩১-৩২।

৩। Croce, Benedetto 'Aesthetic' Rupa ed, chap 1 p. 8

৪। Croce, Benedetto· 'European Literature in the Nineteenth Century.' p. 52.

to reproduce . .but art remakes ideally, and ideally expresses any momentary situation. Its image produced by art becomes separated from time and space, and can be again and again contemplated in its ideal reality from every point of time and space It belongs not to the world, but to the super-world; not to the flying moment, but to eternity. Thus life passes, but art endures" ক্রোচেকে অনেকে কান্টেরই উত্তরসাধক বলেছেন। কিন্তু ক্রোচে কান্ট-প্রভাবিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কান্টের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। উপরের উদ্ধৃতিটিই প্রমাণ করে ক্রোচে কান্টের দুটি 'a-priori' ধারণা—স্থান (space) ও কাল (time) পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। ক্রোচের মতে বোধি স্থান-কালের উপরে নির্ভরশীল নয়। এটা একটা স্বয়ং-নির্ভর আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। কারণ ক্রোচের মতে শুধু আত্মাই বোধি বা intuition সৃষ্টি করে বা ধারণ করে. "the spirit only intuites in making, forming, expressing"[৫] শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন—কাব্যের আসল স্রষ্টা বা উপভোক্তা হল অন্তরাত্মাই, "বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা বা শ্রুতি কোনটাই কাব্যানন্দের প্রকৃত অথবা অত্যন্ত গভীরতম বা উচ্চতম গ্রহীতা নয়, এমনকি এরা কাব্যের আসল বা উচ্চতম স্রষ্টাও নয়। এরা হল কাব্যানন্দ গ্রহণের পথ ও যন্ত্র মাত্র; তার আসল স্রষ্টা ও প্রকৃত শ্রোতা হল অন্তরাত্মা।"[৬] ক্রোচে শিল্পসৃষ্টিকে যে বোধি বা স্বজ্ঞা বলেছেন সেই বোধি বা স্বজ্ঞার স্বরূপ তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বোধির সপক্ষে অনেক কথাই বলেছেন।

ক্রোচের মতে বোধিলব্ধ জ্ঞান চিত্রকল্প (image) সৃষ্টি করে আর নৈয়ায়িক বা যুক্তিলব্ধ জ্ঞান ধারণা (concept) সৃষ্টি করে। ধারণা (concept) হল সাধারণ ধারণা (general idea)। কোনো বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সংস্পর্শে এলে আমাদের প্রথমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) জাগে। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছালে আমাদের মস্তিষ্ক সেগুলির ব্যাখ্যা দেয়। ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের কাছে সেই বস্তুটির জ্ঞান দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) ও ব্যাখ্যা (interpretation) মিলিত হয়ে ঐ বিশেষ বস্তুটির জ্ঞান দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) ও ব্যাখ্যা (interpretation) মিলিত হয়ে ঐ বিশেষ বস্তুটির (individual object) যে জ্ঞান দেয় তা হল প্রতীতি (perception)। এরকম একই জাতীয় একাধিক বস্তুর প্রতীতির মধ্যে তুলনা করে শ্রেণীগত ভাবে ঐ জাতীয় বস্তু (objects as a class) সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে তা হল concept। Concept গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধির ক্রিয়া (intellectual function) দরকার। কিন্তু চিত্রকল্প গড়ে তোলার জন্যে এরকম বুদ্ধির ক্রিয়া দরকার হয় না। এই কারণে ক্রোচে বলেছেন--শিল্পসৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকা নেই। শিল্পসৃষ্টি হল বোধি (intuition)। বোধির সম্পর্কে ক্রোচে বলেছেন—আমাদের সাধারণ জীবনে আমরা নিত্য বোধির দ্বারা অর্থাৎ সহজ স্বজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হই। "In ordinary life, constant

---

৫। Croce, Benedetto 'Aesthetic' Rupa ed chap 1 p 8

৬। শ্রীঅরবিন্দ : 'ভাবষ্যতের কবিতা' (ডঃ রামেশ্বর শ'কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃ. ১৪।

appeal is made to intuitive knowledge"[৭]। দৈনন্দিন জীবনে তার্কিক পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞানের খুব বেশী ব্যবহার নেই। জিনিসের সংজ্ঞা দিয়ে, তারপরে syllogism-এর মাধ্যমে যুক্তি খাড়া করে তার উপরে নির্ভর করে সাধারণ মানুষ চলে না। যেমন—একটি syllogism হল:-

যা ছানা ও মিষ্টি দিয়ে তৈরী, তা হল স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর।

রসগোল্লা ছানা ও মিষ্টি দিয়ে তৈরী হয়।

অতএব রসগোল্লা স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর।

দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষ যখন রসগোল্লা খায় তখন অত যুক্তিতর্কের কথা ভেবে রসগোল্লা খায় না। সাধারণ সহজ জ্ঞানে যা মনে আসে তা দিয়েই সে পরিচালিত হয়। রামকৃষ্ণদেবের গল্পে আছে যে, দুটি লোক আমবাগান দেখতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন গিয়ে বাগানের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—আমবাগানটি কত বিঘে জমির উপরে আছে, এতে কতগুলি গাছ আছে, প্রত্যেক জাতের আম বছরে কত হয়, এই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণে বছরে কত খরচ হয়, বছরে কত টাকার আম হয়?—ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় মানুষটি একটার-পর-একটা পাকা আম পাড়ছে আর খাচ্ছে। এই দুই লোকের মধ্যে প্রথম মানুযটি অপেক্ষাকৃত তার্কিক মনের অধিকারী: আব দ্বিতীয় লোকটি সহজ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত। ক্রোচে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন- যে মানুষ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সহজ জ্ঞানের অধিকারী নয়, শুধু অবাস্তব যুক্তিতর্ক করে যায়—রাজনৈতিক নেতারা ঠিকই বলেন—সেই মানুষের দেশের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই। অর্থাৎ সার্থক সফল রাজনৈতিক নেতারাও বাস্তববোধ দিয়ে সহজ জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হন, শুধু তার্কিক তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হলে কেউ সফল রাজনৈতিক নেতা হতে পারে না। যাঁরা শিক্ষাবিদ তাঁরা চান শিশুর মধ্যে তার্কিক জ্ঞান গড়ে ওঠার আগে সর্বাগ্রে শিশুর মধ্যে সহজ জ্ঞান বা বোধিজাত জ্ঞানের বিকাশসাধন করতে। সাহিত্য-সমালোচকও যখন সাহিত্যের সমালোচনা করেন তখন নন্দনতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বের সূত্রগুলি পড়ে তার দ্বারা চালিত হন না, সহজ রসবোধ ও বোধিজাত জ্ঞানের দ্বারা চালিত হন। আর সাধারণ মানুষও জীবনে তার্কিক জ্ঞানের জটিল পথে না গিয়ে সহজ জ্ঞানের দ্বারাই বেশি চালিত হয়। ব্যবহারিক জীবনে বোধিলব্ধ জ্ঞান বা স্বজ্ঞার ভূমিকা খুব বেশি। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে বোধিলব্ধজ্ঞান বা স্বজ্ঞার স্বীকৃতি থাকলেও আমাদের বিদ্যা-চর্চা ও দর্শনে তার বেশি স্বীকৃতি নেই। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার জন্যে একটা সমৃদ্ধ শাস্ত্রই প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে,—তা হল ন্যায়শাস্ত্র বা Logic। কিন্তু বোধিলব্ধ জ্ঞান সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, এবং সে বিষয়ে কোনো শাস্ত্রই গড়ে ওঠেনি বলে ক্রোচে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে ক্রোচের এই দুঃখ-প্রকাশ পাশ্চাত্যের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ভারতীয় জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে নয়। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় বোধিলব্ধ জ্ঞানের গুরুত্বই বেশি। বেদকে 'অপৌরুষেয়'

৭। Croce, Benedetto 'Aesthetic' Rupa ed p 1

বলা হত। ঋষিরা বেদ রচনা করেন নি, তাঁরা বেদকে ধ্যানে দেখতে পেয়েছেন—এ কথার অর্থই হল—বেদ বোধিলব্ধ। উপনিষদের দর্শনও প্রত্যক্ষ বোধিলব্ধ মরমিয়া দর্শন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে অবশ্য যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত তার্কিক দর্শনের বিকাশ হয়েছিল। ক্রোচে দুঃখ করে বলেছেন পাশ্চাত্য দেশে তার্কিক দর্শন বোধিলব্ধ দর্শনকে বাড়ির চাক্‌রানীর (maid servant) মতো উপেক্ষিত স্থান দিয়ে রেখেছে। তার্কিক দার্শনিকরা বলেন—তার্কিক জ্ঞান হল প্রভু, আর বোধিলব্ধ জ্ঞান হল চাক্‌রাণী। প্রভু না থাকলে চাকরাণীকে চালিত করবে কে? বুদ্ধি ছাড়া বোধি হল প্রভুহীন ভৃত্য - "It is a servant without a master" কারণ "Intuition is blind, intellect lends her eyes"[৮]—এসব হল তার্কিকজ্ঞানের সমর্থকদের যুক্তি। ক্রোচে তাঁদের কথার উত্তর দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ঃ " intuitive knowledge has no need of a master, nor to lean upon any one, she does not need to borrow the eyes of others for she has excellent eyes of her own"[৯] অর্থাৎ বোধিলব্ধ জ্ঞান যে অন্ধ, ক্রোচে সেকথা স্বীকার করেন না। সুতরাং বোধিলব্ধ জ্ঞান নিজে-নিজেই ঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনেও বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ বোধিলব্ধ জ্ঞানই অব্যর্থ সত্যদ্রষ্টা।[১০] যুক্তিবুদ্ধির তার্কিক কচকচিতে হারিয়ে যায় সত্যবস্তু। সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন যুক্তির তার্কিক পথে হতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—যুক্তিতর্ক হচ্ছে উকিলের মতো, সে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে পারে। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা হয় না, বোধির সহজ পথেই হয়। একথা ঠিক যে কখনো-কখনো যুক্তিলব্ধ ধারণার (concept) সঙ্গে বোধিলব্ধ সহজজ্ঞান মিশে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে যুক্তি বোধিকে চালিত বা প্রভাবিত করতে পারে। যেমন একটা লোককে প্রথম দৃষ্টিতে সহজ জ্ঞানের দ্বারা মনে হল যে, লোকটা অসৎ, শয়তান। কিন্তু অনেক তথ্য পাওয়া গেল এবং জানা গেল যে, লোকটা দান-ধ্যান করে, অনেক টাকা দিয়ে গ্রামের লোকের জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিয়েছে, পরের খুব উপকার করে ইত্যাদি। তখন যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হল যে, লোকটা ভাল লোক। ভাল লোকের যে ধারণা তার সঙ্গে মিলে গেল। তখন লোকটাকে প্রথমে দেখে যে সহজ জ্ঞান হয়েছিল সেটাকে পরবর্তী যুক্তিসিদ্ধ ধারণাটা নিয়ন্ত্রিত করল। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান বা ধারণা স্থায়ী নয়। নতুন তথ্য পেলে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঐ লোকটা সম্পর্কে যদি পরে জানা যায় যে, সে দান-ধ্যান করে নিজের সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা গড়ে তোলবার জন্য, আসলে

৮। ibid p 2

৯। ibid p 2

১০। তুলনীয় "যদি যুক্তিই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়, তবে তাহাতে আমাদিগকে জগতে স্থির হইয়া কোথাও তিষ্ঠিতে দিবে না। ক্যান্ট (Kant) নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা যুক্তিরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাহার অতীত প্রদেশ যাইতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষে যেসব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিরই প্রথম কথা, যুক্তির পরপারে গমন করা।" —স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ', (পাতঞ্জল যোগসূত্র উপক্রমণিকা), পৃ·১৩২।

লোকটা খুনী, অন্য জায়গা থেকে এখানে এসে ভালমানুষীর মুখোশ পরে আছে, তবে এরকম তথ্য পাওয়া গেলে যুক্তিসিদ্ধ ধারণাটা আবার পাল্টে যাবে। কিন্তু খাঁটি বোধিলব্ধ জ্ঞান স্বয়ংনির্ভর বলে এরকম পরিবর্তিত হয়ে যায় না। আবার অনেক সময় বোধিলব্ধ জ্ঞান ও যুক্তিলব্ধ জ্ঞান একই রকম হয়। সে-সব ক্ষেত্রে এদুটি পরস্পরের পরিপূরক। যুক্তিলব্ধ ধারণার (concept) মধ্যে বোধিলব্ধ জ্ঞান মিশে থাকে। তবে সর্বদা এরকম যে মিশে যাবেই তা নয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বোধিলব্ধ জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে যুক্তিলব্ধ জ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই। এতে প্রমাণ হয় যে, যুক্তিসিদ্ধ ধারণা (concept) ছাড়াই বোধি সম্ভব। ক্রোচে এমন কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে বোধির মধ্যে যুক্তি মিশে নেই। যেমন—চিত্রশিল্পীর আঁকা জ্যোৎস্নার দৃশ্য, মানচিত্রকরের (cartographer) আঁকা কোন দেশের মানচিত্র,গায়ক যে কোমল অথবা উদ্দীপক ভাবের গান করেন, অথবা গীতিকবিরা যে শোকের কবিতা লেখেন সেগুলি সব সহজ জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ, তাতে যুক্তিবুদ্ধির কোন ক্রিয়া থাকে না। একথা অবশ্য ক্রোচে স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষিত সভ্যসমাজের অধিকাংশ মানুষের বোধির মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ ধারণা (concept) মিশে থাকে। মনে হয় ক্রোচে একথা স্বীকার করেছেন এইজন্যে যে, শিক্ষিত সভ্যসমাজের লোকেরা অনেকটা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে চালিত হয়, কিন্তু আদিম সমাজের লোকেরা সাধারণ সহজ জ্ঞান ও আবেগের দ্বারা চালিত হয়।

আবার আর একটা দিক ভেবে দেখবার আছে। যুক্তিসিদ্ধ ধারণার মধ্যেও অনেক সময়ে বোধিলব্ধ সহজ জ্ঞান মিশে থাকে। এমন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় যে, তখন সেটা যুক্তিসিদ্ধ ধারণাই থাকে না, তখন সহজ জ্ঞান বা বোধির উপাদান হয়ে যায়—ক্রোচের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আমরা সাহিত্য থেকে অনেক উদাহরণ দিতে পারি। যেমন শঙ্করাচার্যের উক্তি 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এতে জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে যে ধারণা হয় তা দার্শনিকের নিত্যানিত্য বস্তু বিচার থেকে জাত যুক্তিসিদ্ধ ধারণা (concept); কিন্তু এই নশ্বরতা প্রকাশ করতে গিয়ে শেক্স্‌পীয়র বলেন—"Out out brief candle,/ Life is like a walking shadow,/Full of sound and fury/ Signifying nothing " তখন এই নশ্বরতা শৈল্পিক বোধির উপাদান হয়ে যায়। তেমনি ক্রোচের মতে একটি মুখের ছবিতে যে লাল রং থাকে সেটাকে পদার্থবিজ্ঞানীব লাল রং নয়, সেটাকে ছবিটার একটা বিশিষ্ট উপাদান রূপে আমরা দেখি। এখানে ছবিটা একটা বোধি আর লাল রং তার একটা উপাদান। ঐ লাল রংটা পদার্থ বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে একটা ধারণা (concept), কিন্তু শিল্পীর কাছে সেটা একটা শিল্পের উপাদান, শিল্পে উপস্থাপিত একটা মুখচ্ছবির বৈশিষ্ট্য তাতে দ্যোতিত হচ্ছে, সেটা একটা বোধির উপাদান। সমগ্র শিল্পটি তার উপাদানের গুণকে নিয়ন্ত্রিত করে "The whole is that which determines the quality of the parts,"[১১] এই জন্যে একটা শিল্পকর্মে অনেক দার্শনিক ধারণা থাকতে পারে। সেসব দার্শনিক ধারণায় অনেক গভীরতাও থাকতে পারে। আবার

১১। Croce, Benedetto, 'Aesthetic', Rupa ed p 2

শৈল্পিক বর্ণনা ও বোধি উপচে পড়তে পারে। সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে রচনাটি রসোত্তীর্ণ হলে তা একটা নিটোল বোধিই : "A work of art may be full of philosophical concepts: it may contain them in greater abundance and they may be even more profound than in philolophical dissertatien, which in its turn may be rich to overflowing with descriptions and intuitions. But notwithstanding all these concepts the total effect of the work of art is an intuition "[১২] রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দার্শনিক তত্ত্ব আছে। যেমন -'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' কিংবা 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই' ইত্যাদি। কিন্তু সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের সেইসব রচনা দার্শনিক গ্রন্থ হয়ে ওঠেনি। আবার ক্রোচে বলেছেন শোপেনহাওয়ার (Schopenhouer) তাঁর দার্শনিক গ্রন্থে অনেক গল্প ও কাহিনী উদাহরণ-স্বরূপ ব্যবহার করে দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেইসব গল্প ও কাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনাটি সাহিত্যিক গল্প হয়ে ওঠেনি। কারণ লেখকের উদ্দেশ্য সেখানে গল্পের রস সৃষ্টি করা নয়, তত্ত্বকথা বোঝানো। তাহলে আসল বিচার্য হচ্ছে লেখকের মূল উদ্দেশ্য কী? —রসসৃষ্টি না তত্ত্বকথা বোঝানো? আর দেখতে হবে রচনাটির সামগ্রিক আবেদন কী রকম। ক্রোচে সিদ্ধান্ত করেছেন—"The difference between a scientific work and a work of art, that is, between an intellectual fact and an intuitive fact, lies in the difference of the total effect aimed at by their respective authors "[১৩] তাহলে শিল্পীর মূল লক্ষ্যই হল শিল্প বিচারের প্রথম ও চূড়ান্ত মানদণ্ড। আব আবেদন সৃষ্টির সার্থকতাই হল শিল্পের সর্বার্থসিদ্ধি।

১২। ibid pp 2-3

১৩। ibid p 3

৪. নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন

নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন বা নন্দনতত্ত্ব (aesthetics) সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, পাশ্চাত্যের অনেক নন্দনতত্ত্ববিদের মতো নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন শুধু একটা অ্যাকাডেমিক অধ্যয়ন নয়, তাঁর শিল্পদর্শন তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনের অঙ্গ। আর তাঁর জীবনদর্শনের মূল পরিচয় অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখি যে, রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনিও লীলাবাদী। নিজের শিল্প-দর্শনকে তিনি লীলাবাদের আলোকেই ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের দেশের শঙ্করপন্থী মায়াবাদী ভাববাদী (absolute idealist/solipcist) দার্শনিকরা জগৎসৃষ্টিকে মায়া বা মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, মনের বাইরে বা মনের কল্পনার বাইরে জীবন ও জগতের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন নি। কিন্তু জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করলে শিল্পের উপজীব্যকেই অস্বীকার করা হয়, এবং এতে শিল্পসৃষ্টিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যিনি শিল্পস্রষ্টা তিনি মায়াবাদীর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। ভিন্ন প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী জগৎ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন শিল্পস্রষ্টার দৃষ্টিতে সেইটিই জগৎস্বরূপের আসল ব্যাখ্যা : "জগতের রূপ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, সুতরাং তাহা মিথ্যা, জগতের বাস্তবিক সত্তার মধ্যে রূপের কোনো সদ্ভাব নাই—এ কথা য— বড়ো দার্শনিকই বলুন না কেন, ইহা সত্য নয়। কারণ, রূপ শুধু চোখে দেখিবার ও ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিবার জিনিস হইলে মানুষ কখনোই বলিত না 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' রূপের মধ্যেই যে অরূপের বাসা, সে যে ভিতরেরই বাহির, সত্তারই প্রকাশ।"[১]

শিল্পীকে জীবন ও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। নন্দলালও জীবনের লীলাবিলাসকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নন্দলালেরও শিল্পদর্শনের মূলপ্রতিষ্ঠা লীলাবাদেই ঃ 'অদ্বৈতবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে যা-কিছু ছেড়ে যেতে হবে তা অনিত্য, তা তুচ্ছ; তাই নিয়েই শিল্পসৃষ্টি করার অর্থ কী? শিল্পীর উত্তর হল এই যে, শিল্পের সৃষ্টি হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় করে। মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপমাচ্ছলে বলেছেন, সাপের বিষ সাপকে লাগে না। শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার ব্যবহার করেন ব'লেই তা হয়ে উঠে লীলা।"[২]

শিল্পী জগৎসৃষ্টিকে মায়া (illusion) রূপে দেখেন না, দেখেন এক পরম সত্যেরই প্রকাশ রূপে। তাই নন্দলাল বিশ্বাস করতেন, জগতের বিচিত্ররূপের ভিতরে অনুস্যূত একের ঐক্যটিকে নিজের অকৃত্রিম উপলব্ধিতে লাভ করে তাকে প্রকাশ করাই শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর সিদ্ধি। এই একের উপলব্ধি লাভ করলে পৃথিবীতে সমদৃষ্টি অর্জিত হয়, তখন সর্বভূতে পরম সত্যের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। নন্দলাল স্বীকার করেছেন, হিন্দু

১। চক্রবর্তী, 'অজিতকুমার : 'কাব্য পরিক্রমা', বিশ্বভারতী; পৃঃ ১১

২। বসু, নন্দলাল : 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ২০।

পরিবারে জন্ম বলে হিন্দুর সংস্কার অনুসারে তিনি প্রথমে দেবদেবীর ছবিই আঁকতেন এবং তার মধ্যেই দেবত্বের প্রকাশ দেখতে পেতেন। ক্রমে দৃষ্টি যত গভীর হল, ততই সর্বভূতে তিনি পরম সত্যের উপলব্ধি লাভ করলেন ঃ "পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে যত্ন করি—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।"[৩] জগৎকে ও জীবনকে মিথ্যা মায়া বলে অস্বীকার না করে জীবনকে পরম সত্যেরই প্রকাশরূপে দেখেছেন বলে জীবনের সঙ্গে তাঁর শিল্পসৃষ্টি নিবিড় সম্পর্কে অন্বিত। জীবন ও প্রকৃতির বাস্তবরূপ শিল্পে গ্রহণীয় মনে কবতেন বলেই নন্দনাল জগতের দেশ-কাল-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক রূপ এবং দেশ-কাল-গত সামাজিক রূপ দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন ঃ 'ছবি করতে হলে প্রকৃতির কাছে পাঠ নেওয়া একটা দিক, তাতে জগতের তাবৎরূপের গতিপ্রকৃতি গড়ন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়; আর একটা দিক হল মানসিক ছাঁদ বা ছন্দের আরোপ—এই ছাঁদ বা ছন্দ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জাতির বিশিষ্ট চরিত্র উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ক্রমিক বিকাশ লাভ করেছে।"[৪]

জীবনের বাহ্যরূপের সঙ্গে তার গভীরতর তাৎপর্য ও জীবনলীলার নিগূঢ় রহস্যকে প্রকাশ কবাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ শিল্পের সার্থকতা। তাই তাঁর মতে জীবনের শুধু বাহ্যরূপের প্রকাশে শিল্পের সার্থকতা নেই। শিল্পী যখন মানবদেহের চিত্র আঁকবেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাতে মানবমনেরও প্রকাশ হচ্ছে কিনা। তাই জীবজন্তু যখন স্বাভাবিক জীবনকর্মে নিযুক্ত তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার সঙ্গে তার মনের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে। এইজন্য নন্দলাল মনে করতেন স্বাভাবিক জীবনকর্মে নিযুক্ত মানুষ ও জীবজন্তুই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ উপজীব্য। আবিস্তত্‌ল্ যেমন বলেছেন শিল্পের উপজীব্য হল life in action, নন্দলালও তেমনি বলেছেন ফরমাস অনুযাযী সাজিয়ে বসানো মডেল দেখে বা ডামি অবলম্বন করে শিল্প সৃষ্টি কবা উচিত নয়। কারণ ফরমাস মত ঢঙে (pose) অনেকক্ষণ এক ভঙ্গীতে থাকা মডেলের পক্ষে আয়াসসাধ্য ও ক্লেশকর, তাতে মডেলের দেহেব ভঙ্গীর সঙ্গে মনের যোগটি কেটে যায়; এই অবস্থায় মডেলকে অবলম্বন করে ছবি আঁকলে সে ছবি জীবন্ত স্বাভাবিক হয না, কারণ সেটি তার দেহের ছবি মাত্র, মনের ছবি নয়।

নন্দলাল জীবনবাদী। কিন্তু জীবনের অর্থ তাঁর কাছে অনেক গভীর। ভারতীয় শিল্প-সাধনায় জীবনকে গভীরতর অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সেখানে জীবনের বাস্তবতা বলতে শুধু দেহের বাস্তবতাকে বোঝান হয়নি, ভারতীয় শিল্প-ধারার এই নিজস্বতা সম্পর্কে নন্দলাল সচেতন ছিলেন। এবং এর উত্তরাধিকার তাঁর শিল্পাদর্শে ও শিল্প-দর্শনে বর্তেছে। বলা হয়ে থাকে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যকে তাব স্বরূপ-ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট না করেই আধুনিক মনের কাছে পুনর্জীবিত কবেছেন। এবং আমরা জানি, নন্দলালও এই ধারারই উত্তরসাধক। নন্দলাল প্রাচ্য শিল্পের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং

৩। বসু, নন্দলাল ঃ 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ২১।

৪। বসু, নন্দলাল ঃ 'শিল্পচর্চা' বিশ্বভারতী; ১৩৯০, পৃঃ১৩৬।

নিজেই পাশ্চাত্য শিল্প থেকে প্রাচ্য শিল্পের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রাচ্য শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবকে প্রকাশ করা; স্থূল দেহের খুঁটিনাটি গড়ন সেখানে একান্তই গৌণ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পে স্বাভাবিক দেহের খুঁটিনাটি গড়নই মুখ্য, ভাব সেখানে উপেক্ষিত নয়, কিন্তু দেহের গঠনকে গৌণ করে ভাব সেখানে প্রাধান্য পায় নি। আমরা স্বীকার করি—নন্দলাল শিল্পকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। কিন্তু শিল্প জীবনের বাস্তবতার হুবহু অনুকরণও নয়।"[৫] সাধারণের ধারণা, জীবনের বাস্তবতার উপস্থাপনা না হলে শিল্প অবাস্তর হয়ে প্রাণহীন হয়ে যায়। কিন্তু নন্দলাল মনে করেন, শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে বরং অবাস্তবও বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। শিল্পী শুধু মূর্তি নির্মাণই করেন না, তিনি তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাও করেন। নন্দলাল একটি গল্পের সাহায্যে বিষয়টি অপূর্ব প্রাঞ্জলতার সঙ্গে বুঝিয়েছেন। নবোদ্গত যবের শিষ দেখতে কেমন?—এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেছিল—একটি প্রজাপতির ডানা ছিঁড়ে ফেললে যেমন দেখায়, নবোদ্গত যবের শিষ্ সেই রকম দেখতে। আর অন্য একজন বলেছিল—শিষ্টি দেখে মনে হচ্ছে দুখানা ডানা হলেই ও প্রজাপতির মতো উড়ে যাবে।' দ্বিতীয় জনের উক্তির মধ্যে এমন একটা যাদুকাঠির স্পর্শ আছে যে, নিষ্প্রাণ বস্তুও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর রচনা হল সৃষ্টি, কবিশিল্পী সেই সৃষ্টিতে প্রাণের স্পন্দন জাগাবার অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী। বৈদিক ঋষি তাই বলেছেন কবিমনীষীর প্রতিভার স্পর্শে মৃতও প্রাণলাভ করে—'মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তি'।

নন্দলাল জীবনকে যে স্বীকার করেছেন, তাই নন্দলাল শিল্পকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, কিন্তু সামাজিক নীতির মানদণ্ডে শিল্প বিচারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এই বিচার-পদ্ধতি একান্তই স্থূল। "সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি-দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ, সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়তো শিল্পীকে বসবোধে উদ্বোধিত ক'রে এমন-কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ডিত ধারণার উর্ধ্বে বিশুদ্ধ রসোপলব্ধিতে নিয়ে যাবে।"[৬] একথাটি নন্দলাল সামাজিক দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে বলেন নি। সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই এই প্রশ্ন তিনি নিজেই উত্থাপন করেছেন যে, দুর্নীতিপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনার ফলে সমাজের ক্ষতি হতে পাবে কিনা। এই প্রশ্নের তিনি নান্দনিক সমাধানই দিয়েছেন। সামাজিক বিচারে যা দুর্নীতিপূর্ণ তাও শিল্পের উপজীব্য হতে পারে; কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টিতে যখন তার রসোত্তীর্ণ নবরূপায়ণ ঘটে তখন তার যথার্থ আবেদন পাঠকের মনে দুর্নীতির প্রেরণা জাগায় না, তা পাঠকের মনে সুনীতি-দুর্নীতির উর্ধ্বে এক রসচেতনা জাগরিত করে। এই রসচেতনা মানুষের কোনো ক্ষতিসাধন করে না। অবশ্য একথা নন্দলাল স্বীকার করেছেন যে, এমন কিছু 'রুগ্ন মন' আছে, এমন কিছু অপরিণত মনের লোক ('বয়স্ক শিশু') আছে যাদের চেতনায় রসবোধ

৫। বসু, নন্দলাল: 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী; ১৩৭১, পৃঃ ৪০।
৬। বসু, নন্দলাল: 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী; ১৩৭১, পৃঃ১৮।

জাগে না, তারা শিল্পের উপজীব্য কোনো দুর্নীতিপূর্ণ বিষয় থেকে দুর্নীতিই শিক্ষা করে। এরা সমাজের বিকৃতির এবং অশিক্ষা কুশিক্ষার পরিণাম। এদের জন্যে শিল্পের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ না করে বরং সামাজিক দিক থেকে এদের মনের সুস্থ বিকাশের পথনির্দেশ দিয়েছেন নন্দলাল। তাই পুরী ও কোনারকের মন্দিরের আদিরসাত্মক মূর্তিগুলি যখন নষ্ট করে দেবার প্রস্তাব হয়েছিল তখন তিনি সে প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। বরং যথার্থ শিল্পদৃষ্টি নিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, রসসৃষ্টির দিক থেকে ঐ মূর্তিগুলি খুবই উচ্চশ্রেণীর।

প্রচলিত অর্থে নন্দলাল কলাকৈবল্যবাদী নন। কারণ শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে এই উপযোগিতার নিজস্ব ক্ষেত্র আছে। নীতিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি প্রত্যেকেরই সামাজিক উপযোগিতা আছে, কিন্তু প্রত্যেকের উপযোগিতার ক্ষেত্র পৃথক, অর্থাৎ জীবনে এবং সমাজে এদের প্রত্যেকের ভূমিকা স্বতন্ত্র। তেমনি নন্দলালের মতে সমাজে শিল্পেরও স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে। তাঁর মতে শিল্পের মুখ্য উপযোগিতা হল মানুষের মধ্যে রস-চৈতন্যের জাগরণ করা, মানুষের স্বভাবের শৈল্পিক ঊর্ধ্বায়ন সাধন করা, এক কথায় তাকে নান্দনিক শিক্ষা দান করা। একথা নন্দলাল নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন ঃ "মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বহির্জগতের সকল বস্তুর তত্ত্ববোধ ও রসবোধ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের চর্চার দ্বারা মানুষের তত্ত্ববোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিল্পের প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত হয়।"[৭] এই হল শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা। কিন্তু এই সামাজিক কর্তব্যপালনই শিল্পীর সৃষ্টির মূল প্রেরণা নয়। শিল্পে এই সামাজিক উৎকর্ষ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধান হতে পারে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পী শিল্পসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন না। সকল শিল্পসৃষ্টিই সামাজিক ও ব্যক্তিক উপযোগিতার চেতনা থেকে মুক্ত—এদিক থেকে খেলার সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির মিল আছে। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা নন্দলালের নিজের লেখাতেই পাওয়া যায় ঃ "খেলা করা ও শিল্পসৃষ্টি করা এ দুয়েরই প্রবৃত্তির মূল একই। খেলা করলে মন প্রফুল্ল হয়, শরীর সুস্থ হয়, কিন্তু মানসিক প্রফুল্লতা ও শারীরিক সুস্থতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কয়জন খেলায় প্রবৃত্ত হয়? শিক্ষা বড়, না খেলা বড়, এর বিচার করবে শিক্ষক। কিন্তু শিল্পী বা কলাকার খেলাই করেন।"[৮]

শিল্পের সঙ্গে খেলার এই মৌল সাদৃশ্যের তত্ত্বটি জার্মান কবি ও নাট্যকার শিলার অষ্টাদশ শতকেই ব্যাখ্যা করেছিলেন নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর জগদ্বিখ্যাত চিরায়ত রচনা 'Über die Asthetische Erziehung des Menschen' (1795) ('মানুষের নান্দনিক শিক্ষা প্রসঙ্গে') গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি একথাও বলেন যে, সেই মানুষই খেলা করতে পারে যে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যার কোনো ঘাটতি নেই, যার কোনো প্রয়োজনবোধ নেই। খেলা সমস্ত প্রয়োজনবোধের ঊর্ধ্বে। আমাদের শিল্পসৃষ্টিও সমস্ত

৭। বসু, নন্দলাল ঃ 'শিল্পকথা,' বিশ্বভারতী। ১৩৭১, পৃঃ ১০।

৮। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৩, পৃঃ ১৬)

প্রয়োজনবোধের ঊর্ধ্বে, শিল্পসৃষ্টিও এক রকমের খেলা—"Mithin tut sie auch den Ausspruch : der Mensch soll mit der Schonheit nur spielen, und er soll nur mit der Schonheit spielen Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt."[৯] নন্দলালের নান্দনিক ভাবনায় শিলারের প্রভাব প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সাদৃশ্যটি বিস্ময়কর।

নন্দলালের মতে ইতিহাসের বিবর্তন-ধারায় সমাজে যখন নানা কারণে আসে অবক্ষয়—নৈতিক ভ্রষ্টাচার, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক দৈন্য—তখন চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যেও সাহিত্য-শিল্পই মানুষের মধ্যে আশার আলো জ্বেলে রাখতে পারে, অবক্ষয়ের উজানে নবসৃষ্টির স্রোত বইয়ে দিতে পারে।

অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যেও আমরা আমাদের অন্তরে যে আলোক দেখতে পাই শিল্প হল তারই ছটা, তাতে চতুর্দিকের অন্ধকারের বিনাশ তো হয়ই, তাছাড়া দুঃখের মূল কারণও দূর হতে পারে। এক সময়ে জার্মানীর এমনি অবক্ষয়ের দিনে যে আশার আলো জ্বেলে রেখেছিল সে দেশের সাহিত্য তা কার্ল্ মার্ক্সের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণেও স্বীকৃতি লাভ করেছে ঃ "সবকিছুই জরাজীর্ণ—ধ্বংস হবে কি হচ্ছে, কল্যাণকর পরিবর্তনের এতটুকুও আলো নেই, তখন জার্মানীতে আশার আলোক জ্বালিয়ে রেখেছিল একমাত্র তার সাহিত্য।

"কবি গ্যেটে এবং শিলার—এঁদের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থেই অভিব্যক্তি পেয়েছিল তৎকালীন জার্মান সমাজের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও বিদ্রোহ।"[১০] মার্ক্সের এই কথা থেকে প্রমাণ হয় শিল্প সমাজের যান্ত্রিক প্রতিফলন মাত্র নয়। সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের হাতে শিল্পীর প্রতিভা নিষ্ক্রিয় ক্রীড়নক নয়। শিল্পীর প্রতিভা যুগ-সচেতন, কিন্তু যুগের দাস নয়। যুগের দাসত্ব থেকে মুক্ত বলেই তা সমাজে নতুন চিন্তা-চেতনার স্রোত বইয়ে দিতে পারে।

শিল্পবোধকে আচার্য নন্দলালও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সীমাবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য বা দৈন্যের উপরে শিল্পবোধ নির্ভর করে না। শিল্পবোধকে নন্দলাল সহজাত সৌন্দর্যবোধের ফলশ্রুতি মনে করেন। তাই যাঁরা মনে করেন, অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য না হলে শিল্পচর্চা করা যায় না বা যাঁদের ধারণা শিল্পচর্চায় শুধু ধনী ব্যক্তিরই অধিকার আছে, নন্দলাল তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। যে দরিদ্র সাঁওতাল নিত্য তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে রাখে, তার মাটির বাসন আর ছেঁড়া কাঁথাটি গুছিয়ে রাখে, তার সৌন্দর্যবোধ যে কলেজে-পড়া ধনীর দুলাল প্রাসাদোপম হোস্টেলে বা মেসে তার বহুমূল্য পোষাক বা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে রাখে তার চেয়ে অনেক

৯। Schiller Friedrich 'Uber die Asthetische Erziehung des Menschen', 1795, Funfzehnter Brief

১০। শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস্ লেনিন, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ; ১৯-২০।

বেশি। নন্দলাল এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, অকৃত্রিম সৌন্দর্যপ্রীতি ও সৌন্দর্যবোধ কোনো আর্থিক অবস্থার উপরে নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ শিল্পকে তিনি দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকার প্রতিফলন মাত্র মনে করেন না।

শিল্পকে নন্দলাল প্রচলিত রীতিতে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—চারুশিল্প ও কারুশিল্প। কারুশিল্পের দু'টি উপযোগিতা—শিল্পীর কাছে তা অর্থাগমের পথ করে দেয়, আর সাধারণের জীবনে "নিত্য-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমাদের জীবন-যাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে।"[১১] অন্যদিকে চারুশিল্প শিল্পীর অর্থাগমের পথ করলেও করতে পারে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা চারুশিল্পের চর্চা মানুষের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে শৈল্পিক সৌন্দর্যের আনন্দলোকে মুক্তি দেয়। দৈনন্দিন বৈষয়িকতা থেকে শিল্পের মুক্তিদানের এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। জার্মানীর অন্যতম কবি-নাট্যকার-নন্দনতত্ত্ববিদ্ শিলারও অনুরূপ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন "es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert"[১২]

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যকে নবযুগে যাঁরা পুনর্জীবন দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নন্দলালের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত। এই কারণে তাঁর শিল্পদর্শনেও ঐতিহ্যচেতনা একটি প্রধান স্থান নিয়ে আছে। অথচ একথা মনে রাখতে হবে যে, নন্দলালের ঐতিহ্যচেতনা অতীতের অচেতন অনুসৃতি নয়। অতীতকে তিনি সচেতন সশ্রদ্ধ সাধনার দ্বারা লাভ করতে চেয়েছিলেন। এদিক থেকে কাব্যে আধুনিকতার দীক্ষাগুরু এলিয়টের ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে তাঁর মিল আছে। এলিয়টের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "Tradition is a matter of much wider significance It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour It involves in the first place, the historical sense... and the historical sense involves a perception.. of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and temporal together."[১৩]

শিল্পী এবং শিল্পতত্ত্ববিদ ওকাকুরার একটি কথা শিল্পাচার্য নন্দলাল একাধিক প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন ঃ 'স্বভাব (Nature), পরম্পরা (Tradition) ও স্বকীয়তা (Originality) এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আর্ট'। বস্তুত এই উক্তির মধ্যে নন্দলালেরও শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পাদর্শের একটি মূল সূত্র নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীরই প্রাথমিক শিল্পদীক্ষা ঐতিহ্যের কাছে, ঐতিহ্যের শিক্ষাকে স্বী-কৃত করে না এগোলে শিল্পীর সৃষ্টি হয় 'কাঁচা'। অন্যদিকে শিল্পীর সৃষ্টিতে নিজস্ব দান কিছু না থাকলে শিল্প ঠিক প্রাণ পায় না'। নন্দলাল বসুর শিল্প-ভাবনায় মৌলিকতার পটভূমিকায় যে ঐতিহ্যচেতনার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল তার স্বরূপ-সন্ধান নান্দনিক জিজ্ঞাসার অন্যতম উপজীব্য। ঐতিহ্যকে নন্দলাল নীরস

১১। বসু, নন্দলাল ঃ 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ১২।

১২। Schiller, Friedrich . 'Über die Ästhetische Erziehung des Menschen', 1795 Funfzehnter Brief

১৩। Eliot, T.S 'The Sacred Wood' London, 1957, p 49.

কর্তব্য-বোধে গ্রহণ করেন নি। ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত সত্য তাঁর জীবন্ত উপলব্ধির মধ্যে ধরা পড়েছিল। একথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কেও তাঁর ধ্যানধারণা থেকে। নন্দলাল বসুর শিল্পচেতনার একটি গভীর উপলব্ধিগত প্রতিষ্ঠা ছিল। এই উপলব্ধি বিশ্বের রূপবৈচিত্র্যের অন্তরালশায়ী আত্মিক একত্বের উপলব্ধি। একের প্রকাশকে বিচিত্রের মধ্যে উপভোগ করা রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য; আর বিচিত্রের মধ্যে একের উপলব্ধি লাভ করা মিস্টিক চেতনার বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় শিল্প-সাধনার মূল প্রতিষ্ঠা বিচিত্রের মধ্যে একের এই মিস্টিক উপলব্ধিতে। এই মিস্টিক চেতনার মূল প্রস্রবণটি উৎসারিত হয়েছিল, ভারতীয় আর্য সাহিত্যের আদি উৎস বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে, আর এই জন্যে ভারতশিল্পের ভাষ্যকার হ্যাভেল্ বলেছিলেন ভারতীয় শিল্পের মূল প্রতিষ্ঠা বৈদিক চেতনার উপরে।[১৪] এই মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতশিল্পের নবজন্মদাতা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা; এবং স্বীয় শিল্প-গুরুর এই ঐতিহ্য-দীক্ষা নন্দলালের শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পতত্ত্বেও জীবন্ত উপলব্ধির রূপ লাভ করেছিল। শিল্পের লক্ষ্য অনুসন্ধানে নন্দলাল সেই ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারকেই বাণীমূর্তি দান করেছেন ঃ "সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কবিতা, মূর্তি, চিত্র, নাচ, গান, সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগ-সাধনার সঙ্গে শিল্প-সাধনার মিল আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য সন্ধান করা হয়—সেই একের সন্ধান করা হয় যাকে জানলে সব কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও ঠিক ঐ ভাবে বিরাট **একের** সন্দর্শন-মানসে চলেছে।"[১৫]

শিল্পের উদ্দেশ্য সন্ধানে নন্দলাল যেমন অধ্যাত্ম-চৈতন্যে উপনীত হয়েছেন, তেমনি শিল্পের সৃষ্টি প্রক্রিয়াতেও দেখেছেন ভারতীয় ঐতিহ্যগত ঋষি-দৃষ্টির নিরাসক্ত নির্লিপ্ততা এবং আনন্দস্বরূপ পরম চৈতন্যের সঙ্গে তাদাত্ম্যের প্রকাশ। এই কারণেই তিনি বলতে পেরেছেন— আর্টিস্ট হৃদয়-বিদারক দৃশ্য যেমন আঁকেন, তেমনি মনোমুগ্ধকর বিষয়ের ছবিও আঁকেন; কিন্তু কোন কিছুতেই লিপ্ত বা বিচলিত হন না। শিল্পী সুখকর বা দুঃখকর আবেষ্টনের উর্ধ্বে উঠে যান এবং উভয়েরই মূল সত্তায় যে আনন্দ বা রস আছে, তারই বিগ্রহ সৃষ্টি করেন।

শিল্পীর শিল্পসাধনার মূল সম্পদ হল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর অকৃত্রিম অনুভূতি। এই অনুভূতি কৃত্রিম হলে শিল্পের সমস্ত সম্ভারই ব্যর্থ। আর এই অনুভূতি খাঁটি হলে তার গভীরতা ও ব্যাপ্তির উপরে নির্ভর করবে শিল্পসৃষ্টির মহনীয়তা। শিল্পের উপজীব্য যে বিষয়বস্তু তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি গভীরতার চরমে পৌঁছে শিল্পীর মধ্যে বিষয়বস্তুর

১৪। " .. We must always seek for the origin of the great art-schools of the world, not in existing monuments and masterpieces or in the fragmentary collections of painting and sculpture in museums, but in the thoughts which created them all. The Vedic period is all-important for the historian, because, except for a brief period of its history, the Vedic impulse is behind all Indian art." –Havell, Ernest Binfield : 'The Ideals of Indian Art'. London : John Murray. Reprint 1920, p 14.

১৫। বসু, নন্দলাল ঃ 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ১৬-১৭।

সঙ্গে তন্ময়ীভবন সংঘটিত করে। এই তাদাত্ম্যের ফলশ্রুতিস্বরূপ যে জ্ঞান (knowledge by identity), তারই শীর্ষবিন্দুতে উঠে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শিল্পীর উপলব্ধি এক হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই তাদাত্ম্যের পরিণাম আমাদের পিতামহেরা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মবিদ্ নিজেই ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন। শিল্পক্ষেত্রে অনুরূপ গভীর উপলব্ধির কথা বলেছেন শিল্পাচার্য নন্দলাল—"ধানখেতের সবুজ তোমার এত ভালো লাগা চাই যে, তুমি ঐ সবুজ হয়ে গেলে। তোমার সত্তার অন্তহীন পরিচয়ে ঐ পরিচয়টুকু যুক্ত হল।[১৬] উপলব্ধি যদি এই রকম অপরোক্ষ ও গভীর হয় তবে শিল্পের প্রকাশপ্রকরণের জ্ঞান নন্দলালের মতে শিল্পীর মধ্যে আপনা থেকেই আসবে। এ যেন ইতালীয় নন্দনতত্ত্ববিদ্ ক্রোচের কথা মনে করিয়ে দেয়—শিল্পীর বোধি (intuition) যদি নিখুঁত হয় তাহলে তার প্রকাশরূপও আপনি নিখুঁত হবে। যে বিশ্বব্যাপী আত্মার কথা উপনিষদের ঋষি বারবার বলেছেন, যে আত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক আনন্দের জন্ম দেয়, নন্দলাল সেই বিশ্বব্যাপী আত্মার উপলব্ধির সঙ্গে নান্দনিক (aesthetic) আনন্দকে যুক্ত করে দিয়েছেন . "পূর্বদিকে সবুজ বনের মাথায় কাজল-কালো মেঘ—আমার এত ভালো লাগছে কেন, মনকে এমন নাড়া দিচ্ছে? কারণ আর কিছু নয়, একই সত্তার, একই চেতনার, এক প্রান্ত হল ঐ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হল এই আমি।"[১৭] দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে অর্জিত এ হল ভারতীয় ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ধারা।

শিল্পী ও শিল্পতত্ত্ববিদ্ আচার্য নন্দলাল বসুর চেতনা ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা তাঁকে ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত সত্যের জ্ঞান দান করেছে। তাই প্রাকৃতজনের চেতনা যেখানে ঐতিহ্যের উপরিতলের রূপ দেখে অশ্রদ্ধায় উপেক্ষা করেছে, নন্দলাল সেখানে গভীর জীবনসত্য ও শিল্পসত্য আবিষ্কার করেছেন। পৌরাণিক দেবদেবীদের নন্দলাল দিয়েছেন নান্দনিক ব্যাখ্যা (aesthetic interpretation)। কালীমূর্তি ও নটরাজের মূর্তি কল্পনার ব্যাখ্যাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—: "কালীমূর্তি বা নটরাজ শিবের মূর্তি যার ধ্যানে প্রথম এসেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী; সাধক হলেও সে শিল্পী; যার হাতে প্রথম আকার লাভ করেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী হলেও সাধক। কারণ, দুজনেই একটি কোনো রসের ভিতর রঙ রূপ গতি ও ছন্দের বিগ্রহ বা সমষ্টিরূপ সৃষ্টি করেছে, অথবা তা সৃষ্ট হয়েছে দুজনেরই মনে।.........."[১৮]

ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নন্দলালের শিল্পচেতনার প্রথমাবধি নিবিড় যোগ ছিল। প্রথম যে দু'টি ছবি এঁকে তিনি তাঁর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের চিত্ত জয় করেছিলেন সেই ছবিদুটির উপজীব্য ছিল পৌরাণিক প্রসঙ্গ : 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' ও 'সতীর দেহত্যাগ'।

নন্দলাল বসুর শিল্পভাবনায় উপনিষদের প্রভাব আছে। উপনিষদের আনন্দবাদী দর্শনের

১৬। বসু, নন্দলাল : 'শিল্পী কথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ৫০।

১৭। বসু, নন্দলাল : 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ৫৯।

১৮। বসু, নন্দলাল . 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ১৭-১৮।

উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনে বর্তেছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বকে আধুনিক বিশেষজ্ঞরা সকলেই একবাক্যে আনন্দবাদী দর্শন বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] নন্দলালের শিল্পদর্শনও যে মূলত আনন্দবাদী তা তাঁর উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়—"শিল্পের কারণ আদি কারণে। যে আনন্দে সৌরজগতের আর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই আনন্দেই শিল্পী ছবি আঁকে।"[২০] নন্দলাল বসুর আজীবন শিল্পসাধনার মূল প্রেরণা সৃষ্টির মূলীভূত এই আনন্দের আস্বাদ, আর তাঁর শিল্পতত্ত্বের শেষ কথা এই আনন্দবাদ।

১৯। "শিল্পকর্ম সুন্দব হয় বলে যে আমবা আনন্দ পাই সেকথা বলা চলে না। তবে আমাদেব আনন্দ দেয় কি? এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় শিল্পকর্মেব মধ্যে তাকে ব্যাপ্ত ক'বে যে অভ্যন্তবীণ সুমিতি বিবাজ কবে তাই আমাদেব আনন্দ দেয়, কুৎসিতেব বিপবীত যে সুন্দব এ সে সুন্দব নয়। সুন্দব কুৎসিত নির্বিশেষে আমাদেব আনন্দ দেয় বলেই আমবা তাকে সুন্দব বলি। এখানে অর্থ কবি যা আনন্দদানেব ক্ষমতা বাখে তাই সুন্দব। ববীন্দ্রনাথেব শিল্পতত্ত্ব চিন্তায় পবিণত মতটি হল তাই।" বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ হিবন্ময় : 'ববীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব', ববীন্দ্রভাবতী, ১৩৭৭, পৃঃ ৩৯

"যে-অনুভব যুগপৎ আত্মানুভব এবং বিশ্বানুভব, তা-ই আনন্দ। ববীন্দ্রনাথেব সাহিত্যতত্ত্বকে অনায়াসে আনন্দবাদী বলা যায়।"—বায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ : 'সাহিত্যতত্ত্বে ববীন্দ্রনাথ', কলকাতা, ১৩৭৯ প্রস্তাবনা, পৃঃ 12

"ববীন্দ্রনাথেব সাহিত্যেব পবিণাম বিচাবে প্রধানতঃ বসবাদী, এবং বসেব অর্থ যে নিষ্কাম আনন্দ, যে আনন্দেব সঙ্গে বাস্তব প্রয়োজনেব কোনো সম্পর্ক নেই, সে বিষয়ে ববীন্দ্রনাথ অসংশয়িত।"—বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অসিতকুমাব : 'সাহিত্যজিজ্ঞাসায় ববীন্দ্রনাথ', ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ১২৯।

২০। বসু, নন্দলাল : 'শিল্পকথা', বিশ্বভাবতী, ১৩৭১ পৃঃ ৪৯।

৫. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যতত্ত্ব

"অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালবাসা দুইই বেশি আছে। আমরা ইভলিউশন-পন্থী, সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠছে।"

—প্রমথ চৌধুরী।

যুগস্রষ্টা সাহিত্যিকের সাহিত্য-তত্ত্বের এই হল প্রথম কথা, অন্তত মূল প্রত্যয়। আয়তনে কিংবা সংখ্যায়, গুণে কিংবা ধর্মে, তাঁর সৃষ্টি অতীতকে ছাড়িয়ে সব সময় সব দিক দিয়ে হয়তো যেতে পারে না, কিন্তু তবু এগিয়ে যেতে চায় সর্বদাই। প্রগতির প্রতি আকর্ষণ সবদেশের সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, নতুন কিছু সৃষ্টির এষণা সব প্রতিভারই গোড়ার পরিচয়। আবার এই নবসৃষ্টির মধ্যে ঐতিহ্য ও অতীত যখন স্বী-কৃত হয়ে তার নিজস্ব মর্যাদা লাভ করে তখনই সে-সৃষ্টি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-সব মহারথী এই প্রগতির রথ চালিয়ে নিয়ে যান, তাঁদের প্রত্যেকের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনে বর্তমান গড়ে ওঠে। আবার এ মিলন শুধু যৌগিক মিলনই নয় তা রাসায়নিক সংমিশ্রণ। তার ফলে এই মহারথীর প্রতিভা নিজের স্বকীয়তাকে এই মিশ্রণের উপর ভিত্তি করে একটি সর্বাবয়ব সাহিত্যদর্শনের রূপ গড়ে তোলে। এই সাহিত্যদর্শন আবার সেই যুগের সাহিত্যগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের প্রগতি পথে গতিসঞ্চার করেছিলেন এবং তাকে একটি নতুন পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরও একটি বিশিষ্ট সাহিত্যদর্শন ছিল। তা না থাকলে তার বৈশিষ্ট্যকে জাতি ভাল করে ধরতে পারত না, তাঁর মতবাদের বলিষ্ঠতা থাকত না। অথচ তিনি aesthetics, poetics বা সাহিত্যদর্শনের বিশিষ্ট কোন বই লিখে প্রচার করেন নি বা ঠিক ঐ বিষয় নিয়ে নিরপেক্ষ-ভাবে নিজের বিশিষ্টতা দাবী করেননি। তাহলে তার সাহিত্য-জিজ্ঞাসা কি, তাঁর সাহিত্যদর্শনের স্বরূপ কি, এ প্রশ্নের জবাব পাব কোথা থেকে?

বলা হয়ে থাকে শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে সিজারকে আমরা বেশিক্ষণ সশরীরে পাই না বটে, কিন্তু তাঁর ভাবাদর্শ তাঁর 'Caeserism' সমগ্র নাটকে তার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ রেখে চলেছে এবং সেই জন্যেই নাটকের নামকরণের সার্থকতা। সবুজপত্রের সাহিত্য আন্দোলনে তেমনি আমরা প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যদর্শনের কোন সর্বাঙ্গীণ বা ধারাবাহিক সাবয়বী রূপ পাই না বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য আন্দোলনে তাঁর সাহিত্যদর্শনের প্রভাব অলক্ষ্য বা অব্যক্ত নয়। তাঁর সে-সময়কার বিভিন্ন রচনায় তাঁর সাহিত্য-জিজ্ঞাসার পরিচয় ফুটে উঠেছে। আমরা এখানে তাই থেকে সংক্ষেপে তাঁর সাহিত্য-জিজ্ঞাসার একটা মোটামুটি স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শে স্বদেশ ও বিদেশের সমন্বয় ঘটেছিল। নিজের অতীতের, নিজের ঐতিহ্যের, প্রতি যিনি সচেতন নন তাঁকে মহৎ স্রষ্টা বলা যায় না। আবার অন্ধ

অনুকরণের মধ্যেও কোন মহত্ত্ব নেই। তবে সাহিত্যিক তাঁর ঐতিহ্যকে কিভাবে গ্রহণ করবেন? এলিয়ট বলেছেন—

...the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of it presence... This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional."[১]

প্রমথ চৌধুরী অতীতকে শুধু মরা অতীতরূপে দেখেননি, তার বর্তমানতা তিনি কতটা উপলব্ধি করেছিলেন তার পরিচয় রয়েছে তাঁর 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে'। অতীতের মধ্যে যা 'timeless' তাকে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন, আবার যা 'temporal' তার প্রতিও তাঁর ছিল নির্মোহ দৃষ্টি। স্বদেশ-ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বিদেশের আলো-বাতাসকে আহ্বান করেছিলেন—

"...আমরা তাই দেশি কি বিলাতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপন করে তার মধ্যে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনো গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। আমাদের নবমন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে"...[২]

কাব্যের সংজ্ঞা বিশ্বনাথ যা দিয়েছিলেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—এ সংজ্ঞা আজও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কাব্যের এমন যথাযথ সংজ্ঞা বোধহয় আর কোন দেশ দিতে পারেনি। এ সংজ্ঞা চিরন্তন বলেই প্রমথ চৌধুরী একে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'জয়দেব' তাঁর প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি এই সংজ্ঞার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্য-চিন্তায় গৃহীত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেন তার কোন পরিবর্তন না করেই প্রবন্ধটি তিনি আবার প্রকাশ করেছিলেন। তাই সংজ্ঞাকে জয়দেব প্রবন্ধে তিনি কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা জানবার আগ্রহ আমাদের থেকে যায়। এ ব্যাখ্যাটি তাঁর সাহিত্য তত্ত্বের প্রথম কথা বলে আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি—

"বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে, প্রথমতঃ ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ শব্দ রসাত্মক হওয়া আবশ্যক, তৃতীয়তঃ এরূপভাবে প্রকাশ কর্তব্য যাহাতে রসাত্মক ভাব রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইতে পারে। যে অন্তর্নিহিত শক্তিদ্বারা কবিতায় ভাব ও ভাষায় সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা। এই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় রহস্যজড়িত।"[৩]

কাব্যের দুটি দিক আছে - আত্মা ও আর্ট। কাব্যে যেখানে আত্মা প্রধান সেখানে তা

১। T. S Eliot · 'Selected Essays', p 4

২। সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩২১।

৩। জয়দেব, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) পৃ. ৬ ৮

রোমাণ্টিক, যেখানে আর্ট প্রধান সেখানে তা ক্লাসিক। আবার কোন একটিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিলে কাব্যই হয় না। এই আত্মার অর্থাৎ কাব্যাত্মার নাম তিনি দিয়েছেন 'মানবমনের জাগ্রত স্বপ্ন'। আর্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই বলেছেন -

"আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।"[৪]

প্রমথ চৌধুরী বরাবরই অত্যন্ত শিল্পসচেতন ছিলেন। সাহিত্যের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব, তার রূপসজ্জা ও মণ্ডনকলা তাঁর সাহিত্যে ছিল। এইজন্য তিনি ফরাসী সাহিত্যের প্রতি বেশি অনুরাগী ছিলেন। ইংরেজির চেয়ে ফরাসী সাহিত্য তাঁর বেশি প্রিয় ছিল। কারণ রোমাণ্টিকতার অস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনা তাঁর মনকে নাড়া দেয়নি। ক্লাসিক সাহিত্যের সংযত সুস্পষ্ট প্রকাশ এবং তার সুষম অঙ্গসৌষ্ঠব তিনি বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল—"যে কবিতায় দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য আছে, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না।" (কবি বিহারীলালের কাব্য যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে এ মন্তব্য বিস্ময়কর বটে। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ আমাদের এখানে নেই। আমরা প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি মাত্র।)

এই বহিরঙ্গ সচেতনতার জন্যে প্রমথ চৌধুরীর নিজের রচনায়, এমনকি তাঁর কবিতায়ও, হৃদয়-বিরলতা দেখা যায়। তাঁর প্রবন্ধ, বিদগ্ধ মনের কসরত এবং তাঁর গল্পও প্রবন্ধধর্মী। সর্বত্র তিনি শাণিত যুক্তির উপাসক, তাঁর হাস্যরসও বুদ্ধিনিষ্ঠ, তাঁর কাছে হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনের হাসি। কান্নাটা হৃদয়ের নিকটবর্তী এবং হাসিটা মনের নিকটবর্তী বলে তিনি করুণরসের চেয়ে হাস্যরসের বেশি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রচনায় করুণরসের অভিব্যক্তি নেই বললেই হয়। পক্ষান্তরে হাস্যরসই তাঁর রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে।

তাঁর সাহিত্যচিন্তায় সাহিত্য ও আর্টের এই হল মোটামুটি স্বরূপ ও স্থান। এরপর আমরা সাহিত্যের গভীরতর সমস্যাগুলি প্রসঙ্গে তাঁর মতামত কি তা সংক্ষেপে একে একে আলোচনা করব।

সাহিত্যের সুন্দর ঃ সাহিত্য-দেহের নিজের সৌন্দর্য তো আছেই, যার মধ্য দিয়ে শিল্পের প্রকাশ হয়, আবার সাহিত্য যাকে প্রকাশ করে তারও সৌন্দর্যের বিশেষ রীতিতে প্রকাশের প্রয়োজন আছে, তারও মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন আছে। সাহিত্য ও শিল্প জগতের সবকিছুর খুঁটিনাটি রিপোর্ট বা ফটোগ্রাফ নয়। জগৎ ও জীবনের বিশেষ-বিশেষ অংশকে বিশেষরূপে প্রকাশেই আর্টের মহিমা। সাহিত্যের এই প্রকাশিতব্য যা, তা এ লোকের দেহ বা ভাব যাই হোক না কেন, তার মধ্যে বিশেষকেই সাহিত্যে স্থান দেওয়া যায়, যা সাধারণ তা সাহিত্যে কোন বিশেষ স্থান পেতে পারে না। এই জন্যে সাহিত্য জনতাকে নিয়ে কারবার করে না, তার কারবার মানুষকে নিয়ে। সাহিত্যের বিষয়-নির্বাচনে তাই কবির কৃতিত্বের অনেকখানি নির্ভর করে। জয়দেব Nature-কে তাঁর কাব্যে তুলে

৪। চিত্রাঙ্গদা, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) পৃ. ২২৬

ধরেছেন, তাঁর নির্বাচনে ত্রুটি ছিল বলে প্রমথ চৌধুরী যে মত প্রকাশ করেছেন তা থেকে কাব্যের বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধে আমরা তাঁর মতের পরিচয় পাই।

"জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন, প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গার রসকে কবিতার বর্ণিত বিষয় স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, সেজন্য আমরা কখনো তাঁহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না।"[৫]

শুধু এই বিষয়-নির্বাচনেই আবার সাহিত্যের সুন্দর সার্থক হয়ে ওঠে, তা নয়। নির্বাচিত বিষয় বিশেষ হয়েও যখন আর্টের সহায়তায় তা নির্বিশেষ হয়ে ওঠে তখনই সাহিত্যের সুন্দর সার্থক হয়। জয়দেবের কাব্যে nature আর্ট হয়ে ওঠেনি, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তা হয়ে উঠেছে, এইজন্য প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। সাহিত্যের বিষয় স্থূল দেহই হোক আর সূক্ষ্ম ভাবই হোক আর্ট যখন তাকে নির্বিশেষ করে প্রকাশ করে, তখন তা হয়ে ওঠে স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগ্যতার উপবের বাইরের জিনিস। হেগেল তাই বলতেন - যে আর্ট যত বেশি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা তত নিম্নস্তরের, যার মধ্যে স্থূলাতীত মানসস্পর্শ যত বেশি সেই আর্ট তত উন্নত স্তরের ললিতকলা। প্রমথ চৌধুরীর সৌন্দর্যদর্শন অনেকটা এই রকম ছিল—

"যে সৌন্দর্য চোখে দেখা যায়, তাহার কেবল মানসিক উপভোগই সম্ভব, তাহা হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ, তাহাতে দেহের কোনরূপ লাভ লোকসান নাই। কিন্তু স্পর্শ করিয়া যে সুখ তাহা চৌদ্দ আনা দৈহিক।"[৬]

বলা বাহুল্য, এর অর্থ এ রকম নয় যে সাহিত্যের আবেদন শুধু অতীন্দ্রিয় বা সম্পূর্ণ বোধিগ্রাহ্য। আমাদের বক্তব্য, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য যেন ভোক্তার স্থূল ইন্দ্রিযতৃপ্তিতেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তার আবেদন যখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয়ের কোন বিকার সাধন করে না তখনই রসসৃষ্টির সার্থকতা।

সাহিত্যে নীতি ঃ সাহিত্যে নীতির সমস্যা চিরকালের। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশের পর এ সমস্যা আর একবার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আন্দোলন তোলে। প্রমথ চৌধুরী প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদে চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে যে লেখাটি পাঠ করেন তাতে এ সম্বন্ধে 'তাঁর মতামত সুস্পষ্ট। তাঁর মত হচ্ছে সাহিত্যে নৈতিকতার প্রশ্ন এক অর্থে অবান্তর। কারণ এ সমস্যাটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা। ব্যবহারিক জীবনে আমরা যাকে অশ্লীল বলে বা অনৈতিক বলে সমালোচনা করি, আর্টে বা সাহিত্যে এসে তা যে রূপ লাভ করে তা ব্যবহারিকতার বাইরে পড়ে যায়। সেখানে তার রূপ প্রাকৃতরূপ নয়, তার তখন রসরূপ। তখন তার ভোক্তা তার অশ্লীলতা বা অনৈতিকতার দ্বারা পীড়িত নন, তখন সেখানেই তিনি তার রসসম্ভোগে আত্মভোলা, ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাই নেই। আর্টিস্ট যখন ব্যবহারিককে রসরূপ

৫। জয়দেব, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম)।
৬। 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর আর্ট আছে, অপরের আছে শুধু Nature প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) পৃ. ২২৫

দিতে পারেন তখনই তিনি সার্থক, "যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি।" সেজন্যেই erotic কাব্য বলে কোনো বস্তু নেই. কেন না যে মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য আকার ধারণ করে সেই মুহূর্তেই তা eroticism অতিক্রম করে।" তাই এ সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মত. হচ্ছে-"মর্‍্যালিটি হচ্ছে মানুষের ব্যবহারিক আত্মার জিনিস. আর কাব্য হচ্ছে অন্তরাত্মার। কাব্যের যে জীবনের উপর কোন প্রভাব নেই একথা অবশ্য আমি বলতে চাইনে, কাব্যের আবেদন মানুষের moral sense-এর কাছে নয়, Spiritual sense-এর কাছে। যা স্পিরিচুয়াল হিসাবে অমৃত তা যে মর্‍্যাল হিসাবে বিষ এ কথা শোভা পায় শুধু জড়বুদ্ধির মুখে। বরং মানুষ চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে, মনের স্পিরিচুয়াল খোরাক মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করে। এ বিশ্বাস ভ্রান্তি নয়।"

সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঃ প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে আনন্দবাদের (Art for art's sake) পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁর মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কিছু নেই, অর্থাৎ তা থেকে কোন রকম ব্যবহারিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা রাখার অর্থ তার উদ্দেশ্যকে ছোট করা। সাহিত্য তাঁর কাছে অহেতুক লেখা মাত্র। কারণ, 'মানুষের দেহমনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ, কেননা তা উদ্দেশ্যহীন, অর্থ, মান, যশ এসব তো দূরের কথা, লোকশিক্ষা, দেশোদ্ধার কিছুই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে তিনি স্বীকার করেননি। সাহিত্যসাধনায় এ সবই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসবই যদি সাহিত্যসাধনার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তা হলে সাহিত্য স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। ভারতীয় লীলাবাদের মতো তিনি সাহিত্যে লীলাবাদের সমর্থক এবং এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর চূড়ান্ত মত প্রকাশ করেছেন 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে, "স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফুল আনন্দ।"

রিয়ালিজম্ ও আইডিয়ালিজম্ ঃ রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের দ্বন্দ্ব-মীমাংসায় প্রমথ চৌধুরী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকটা জার্মান দার্শনিক কান্টের অনুগামী। কান্টের মতে জ্ঞানের দুটো দিক আছে - ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) এবং চিন্তা বা যুক্তি (reason); জ্ঞানে তাই দুটি উপাদান রয়ে গেছে a posteriori এবং a priori বাইরের জগৎ থেকে যে ইন্দ্রিয়-সংবেদন মনের কাছে আসে তা মনের কারখানার যেন কাঁচা মাল (raw materials)। এই কাঁচা মালের উপর মন space, time, substance, causality প্রভৃতি নিজের ভিতরকার ধারণা বা Categories প্রযোগ করে যা গড়ে তোলে তাকেই বলি জ্ঞান। কান্ট জ্ঞানের জন্যে বাহ্য-জগতের সংবেদনকে স্বীকার করে নিচ্ছেন আবার মনের নিজের কতকগুলি বিচারধারা বা categories-ও—যা মনের মধ্যেই থাকে, বাইরে থেকে আসে না—স্বীকার করে নিচ্ছেন। সহজ কথায় জ্ঞানের জন্যে বাহ্য ও আন্তর উভয়েরই স্বতন্ত্র মূল্য তাঁর দর্শনে স্বীকৃত। এই জন্যে বলা হয় তাঁর দর্শন in-

volves both Empiricism and Rationalism। তাঁর দর্শনে ভাববাদ ও বাস্তববাদের মিলন হলেও তাঁকে Semi-Sceptist বা Semi Agnosticist বলা যেতে পারে। কারণ তাঁর মতে বাস্তবকে আমরা তার স্ব-রূপে জানতে পারি না। আসলে আমাদের মনের categorics তাকে যেরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত করে আমরা তাকে সেরূপেই জানি। অর্থাৎ চারিদিকে আমরা যা দেখছি তা আমাদের মনেরই রচনা। কান্টের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আশ্চর্য মিল আছে বলে আমাদের মনে হয়। আমাদের এ ধারণা দুঃসাহসিক বলে অনেকে ভাবতে পারেন। তাই বাধ্য হয়ে আমরা তাঁর বক্তব্য একটু দীর্ঘ হলেও তাঁর নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়।

আমরা যাকে বস্তুজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগৎও তো মানুষের মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পলোক ও বুদ্ধির প্রাকৃতলোক দুই মানবমনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ প্রভেদ এই যে, এ দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা।

আপাত দৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে পাওয়া যায় তার অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subject - এরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।"

কান্টে যেমন Empiricism ও Rationalism - এর মিলন ঘটেছিল প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে তেমনি রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয় ঘটেছে। এ সমন্বয় আর্টের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে এ জিনিস অনেকের মধ্যেই ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে অভিনব কিছু নন। বস্তুত বাস্তবজগৎ থেকে, জীবন থেকে, যে প্রাকৃত সত্য কবি-মানসে এসে উপস্থিত হয় তার উপর কবিকল্পনা ক্রিয়া করে, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে কবি তখন প্রাকৃত সত্যকে সাহিত্যিক সত্যে রূপান্তরিত করেন। "আসল কথা, ও সকল ন্যায়ের তর্কের সাহিত্য ক্ষেত্রে সার্থকতা নেই। অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব, এ দুয়ের কোনোটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য।"

ভাব ও বস্তুর এই সমন্বয় থেকে আর একটি কথা সহজেই সিদ্ধ হয় যে, সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সাহিত্য যেমন সমাজকে পরিবর্তিত করে, সমাজও তেমনি সাহিত্যের মধ্যে নিজের ছায়া ফেলে যায়। তবে অতি আধুনিকেরা যেমন ভাবতে আরম্ভ করেছেন কবি বা সাহিত্যিকের মন হচ্ছে সামাজিক পরিবেষ্টনীরই product প্রমথ চৌধুরী তা সমর্থন করেননি। সমাজের যা পরিবেশ, যা প্রভাব তাকে কবি ছাড়িয়ে যেতে পারেন না, তার অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারেন না, একথা তিনি স্বীকার করেননি। আমাদের দেশে বলা হত 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।' কবি একাধারে কবি ও নবী, ঋষি ও সৌন্দর্যস্রষ্টা। সমাজকে তিনি নতুন কিছু দিয়ে যান, সমাজের ঊর্ধ্বে উঠে যাবার তাঁর ক্ষমতা আছে বলেই।

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

......'দারিদ্র্য তাঁহাকে (ভারতচন্দ্রকে) নিরানন্দ করতে পারেনি, করেছিল শুধু প্রমোদের প্রভু। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিনকালেও বিষয় বাসনায় আবদ্ধ নয়।"

এ থেকে প্রমথ চৌধুরীর মত সুস্পষ্ট।

সর্বশেষে তাঁর একটি আপাত অদ্ভুত মতের কথা উল্লেখ করে, আমাদের প্রবন্ধ শেষ করব। সে হচ্ছে এ যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মত। বলেছেন, এমন যুগ আসছে যখন অধিক শক্তিসম্পন্ন অল্প-সংখ্যক লেখকের বদলে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন অধিক সংখ্যক লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কারণ এটা গণতন্ত্রের যুগ। তাই মহৎ সৃষ্টির জন্যে গণতন্ত্রের চেয়ে অভিজাততন্ত্রের তিনি অধিক পরিপোষক ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই বলেছেন, শাসনব্যাপারে গণতন্ত্র যদি আসেও, সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার মনের আভিজাত্য চাই ঃ— "আমাদের মতে এ যুগের বাঙ্গালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে তা ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং অ্যারিস্টোক্রাটিক। অর্থাৎ যে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক। সেই কারণে গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোন বিচ্ছেদ নেই, বরং দুয়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধি বলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন।"

কত বছর আগে প্রমথ চৌধুরী এ কথা লিখেছিলেন, আজও তাঁর উপদেশের উপযোগিতা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু কমে নি।

৬. জার্মান নন্দনতত্ত্ববিদ শিলার

''কবির সৃষ্টি শুধু তার নিজের উপরে এবং তাঁর যুগের উপরেই নির্ভর করে না, উপরন্তু তাঁর জাতির মানসিকতার উপরে এবং সে জাতি তাঁর জন্যে যে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক এবং নান্দনিক ঐতিহ্য ও পরিবেশ সৃষ্টি করে তার উপরেও তা নির্ভরশীল। তার মানে এ নয় যে, কবি তাঁব পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন বা থাকতে বাধ্য এবং একথাও ঠিক নয় যে, তিনি নিজেকে শুধু জাতীয় চিত্তের প্রতিধ্বনি বলে বিবেচনা করবেন।''[১] কবির প্রতিভা জাতীয় চিত্তের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং অনেকটা জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি—একথা ঠিক মনে হয়, যখন দেখি ভোগ, সুখ, সমৃদ্ধি ও পূর্ণ জীবনের কবি কালিদাসের অমর সৃষ্টিগুলি রচিত হয়েছে হিন্দু-সভ্যতার সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগে। আবার বিপরীত প্রমাণও ইতিহাসে আছে। জার্মানীর জাতীয় জীবন যখন শতধা-বিচ্ছিন্ন, নানা ছোটো-ছোটো রাজ্যে খণ্ডিত জার্মানীতে যখন নামমাত্র একটা কনফেডারেশন আছে, জাতীয় সংহতি ও জাতীয় চেতনা বলতে প্রায় কিছুই নেই, যখন আভ্যন্তরীণ কলহ ও বহিরাক্রমণে জার্মানী ক্ষতবিক্ষত, তখনি ঘটে জার্মানীর চিত্তজাগরণের বিরাট বিস্ফোরণ 'ঝড় ও চাপ' আন্দোলন। 'ঝড় ও চাপ' ('Sturm und Drang')—নামে যেমন, কার্যক্ষেত্রেও তেমনি, জার্মানীর সমাজ ও সাহিত্যে এ এমন এক প্রচণ্ড আন্দোলন যা তরুণেব জয়ধ্বজা উড়িয়ে ঝড়ের বেগে এলো, পুরাতনের পচা আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে গেলো, নবীনদের উদ্দীপ্ত করে দিয়ে গেলো প্রাণোচ্ছল নতুন সৃষ্টিতে। এই আন্দোলন অংশত ইতালীর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণ আর আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে তুলনীয়। জার্মানীর এই 'ঝড ও চাপ' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—গ্যেটে, শিলার, লেসিং প্রমুখ কবিনাট্যকার ও মহামনীষীরা। আমাদের নব-জাগরণের মতো এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দীপনা যখন থিতিয়ে এলো তখন সুমহান গঠনমুখী সারস্বত সৃষ্টির সূত্রপাত হলো। যদিও এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, তবু এর সৃষ্টির স্বর্ণযুগ হলো ১৭৮০ ১৮৩০ খ্রীঃ। এর প্রথমে ছিলো রোম্যান্টিক উদ্দীপনা, এর পরিণতি হলো ক্লাসিক সমৃদ্ধিতে। জার্মান সাহিত্যের অন্যতন কবি নাট্যকার নন্দনতত্ত্ববিদ শিলাবের সৃষ্টি এই যুগেরই ফসল। একদিক থেকে জার্মান সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দনতত্ত্ববিদ শিলারকেই বলা যায়। কান্ট্-হেগেলের মতো জার্মান দার্শনিক নন্দনতত্ত্ববিদের তুলনায় শিলারের স্বতন্ত্র গুরুত্ব এই যে, জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রিদ্রিশ ফম্ শিলাব (Johann Christoph Friedrich von Schiller 1759-1805) ছিলেন একাধারে স্রষ্টা ও সাহিত্যতত্ত্ববিদ—একাধারে কবি নাট্যকার এবং নন্দনতত্ত্ববিদ।

শিলারের জন্ম হয় জার্মানীর ভ্যুর্টেম্বার্গের অন্তর্গত মার্বাক নগরে। শৈশব-কৈশোর

১। শ্রীঅরবিন্দ · 'ভবিষ্যতের কবিতা' (The Future Poetry গ্রন্থেব বামেশ্বব শ' কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃঃ ৪৮।

তাঁর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। রিলকের মতো তাঁকেও মিলিটারী স্কুলে পড়াশোনা করতে হয়। জীবিকার জন্যে কিছুকাল আইন এবং চিকিৎসা-বিদ্যাও পড়েছিলেন তিনি। কোনো কারণে ভুট্যেম্‌বার্গের বিষ নজরে পড়ে যান তিনি। তার ফলে অনেক দিন এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়ান, শেষে জার্মান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গ্যেটের আনুকূল্যে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের পদ পাওয়ার পরে তাঁর দুঃখপূর্ণ ভবঘুরে জীবনের অবসান হয়। তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো নন্দনতত্ত্ববিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা Die Horen (The Hours)-এর সম্পাদকের পদ প্রাপ্তি। এর জন্যে তিনি যে সম্মান দক্ষিণা পেতেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো শিলার এই পত্রিকায় লেখার জন্যে গ্যেটেকে অনুরোধ করে পত্র লেখেন। তাকে উপলক্ষ করেই তাঁদের মধ্যে ঘন-ঘন পত্রবিনিময় শুরু হয় এবং শেষে পত্রমিতালি থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাহিত্যের জগতে এরকম আজীবন বন্ধুত্ব বড়ো একটা দেখা যায় না, ইংরেজী সাহিত্যে শুধু দেখি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-কোলরিজের এমন বন্ধুত্ব আর রাজনীতিতে মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব। গোটে ও শিলারের এই দীর্ঘস্থায়ী নিবিড় বন্ধুত্ব শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের গর্বের বিষয় নয়, সমগ্র জার্মান জাতির সারস্বত জীবনের ও বিশ্বের নান্দনিক সমৃদ্ধির বিরল সংযোগ। এর ফলে দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের মধ্যে চলেছিলো যে পত্রবিনিময় তার সুবৃহৎ সঙ্কলনে পাই, পৃথিবীর এই দুই মহান সাহিত্যিক ও মহামনীষীর নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার সম্ভার। এই পত্রসঙ্কলন নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন :

'Der Briefwechsel Zwischen Schiller und Goethe' (Buchergilde Gutenberg, Frankfurt A M Wien Zurich)

যদিও শিলার গীতিকবিতা, প্রবন্ধ, ইতিহাস-গ্রন্থ, নাটক-–নানাবিধ রচনাই লিখেছেন তবু সাধারণের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় নাট্যকার রূপেই। এবং জার্মানির বাইরে তাঁর প্রভাব একসময় ছড়িয়েছিলো—গ্যেটের চেয়েও বেশি—তাঁর নাটকের জন্যেই। তাঁর *বিখ্যাত নাটকগুলি হলো Die Rauber, (The Robbers), 1781*, Kabale und Liebe (Intrigue and Love), 1784, Don Carlos, Ingfant von Spanien (Don Carlos, Prince of Spain) 1787, Wallenstein (Wallenstein) 1798- 1799, Maria Stuart (Maria Stuart), 1800, Die gungfrau von Orleans (The Maid of Orleans) 1801, Die Braut von Messina (The Bride of Messina) 1803, Wilhelm Tell (William Tell), 1804। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে বহুসংখ্যক নাটক লিখেছিলেন শিলার। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, গুণগত উৎকর্ষেও শিলারের নাটক সেদিন সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো।

নাটক ও গীতিকবিতায় যেমন শিলারের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, প্রবন্ধে এবং নন্দন তত্ত্ববিষয়ক রচনায় তেমনি তাঁর মনস্বিতার প্রকাশ ঘটেছে। আগেই বলেছি একাধারে স্রষ্টা ও সমালোচক, কবি ও নন্দনতত্ত্ববিদ হিসাবে যদি বিচার করি, তা হলে সমগ্র জার্মান *সাহিত্যে শিলার অদ্বিতীয়।*

নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে শিলারের বেশ কয়েকটি রচনা রয়েছে। প্রধান ক'টি হলো :

১. Philosophische Briefe, 1786-1788(Philosophical Letters),

২. Über Unmuth und Wiirde, 1793 (On Grace and Dignity),

৩. Briefe über die Ästhetische Erziehung des Menschen, 1795, (Letters on the Aesthetic Education of Man.)

৪. Über naive and sentimentalische Dichtung, 1795-96 (In Naive and Sentimental Poetry)

এছাড়া রয়েছে গ্যেটে ও শিলারের পত্রবিনিময় যার কথা আগেই বলেছি—'Der Briefwechsel Zuischen Schiller und Goethe'. শিলারের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনায় কান্টের কথা না বললেই চলে না। শিলার তাঁর নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনার শুরুতেই কান্টের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করে বলেছেন : "এ কথা আমি গোপন করবো না যে, আমার এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যটি কান্টের তত্ত্বের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।[২] আসলে কান্ট্ ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে সেকালের সবচেয়ে প্রভাবী ব্যক্তিত্ব। এতখানি প্রভাবশালী যে, অনেকে বলেন, তাঁর পরবর্তী দার্শনিকেরা কেউ তাঁকে স্বীকার করেছেন, কেউ তাঁকে খণ্ডন করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। শিলারের নন্দনতত্ত্বেও—অন্তত প্রথম দিকের রচনায়—কান্টের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট্ (Immanuel Kant 1724-1804) তিনটি রচনার জন্যে অমর হয়ে আছেন—(Kritik der pure Vernunft, 1786 (Critiqne of Pure Reason), Kritik der Praktischen Vernunft, 1788 (Critique of Practical Reason) ও Kritik der Urteilskraft, 1791 (Critique of Judgement) শেষ দুটির মধ্যে প্রথমটিতে কান্ট্ নীতিতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে আলোচনা করেছেন নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে। এই শেষ দুটি রচনারই প্রভাব পড়েছে শিলারের নান্দনিক জিজ্ঞাসায়। শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? সমাজের মঙ্গলের জন্যে নীতিশিক্ষা দেওয়া, নাকি শুধুই আনন্দ দেবার জন্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা।—এই বিতর্ক চিরকালই শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টাকে চিন্তিত করেছে। শিলার মনে করতেন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত। কিন্তু শিল্পের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক সুনিবিড়। শিল্পের নান্দনিক শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। কান্টের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা এক স্বাধীন স্বতন্ত্র তাগিদ—(Categorical Imperative)। যদিও প্রথম জীবনে 'ঝড় ও চাপ' আন্দোলনের সঙ্গে শিলার যুক্ত ছিলেন, তবু কান্টের যুক্তিবাদের প্রভাবেই ঐ আন্দোলনের উদ্দামতা ও রোমান্টিক উচ্ছ্বাস কাটিয়ে ক্লাসিক বিধিবিধানের দ্বারা নিজের সৃষ্টিরূপকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ক্লাসিক কবিদের মতোই তিনি আঙ্গিকের পারিপাট্যের বিষয়ে গুরুত্ব দেন। কান্ট্ ছিলেন পুরোপুরি ভাববাদী

২। „Zwar will ich Ihnen nicht verbergen, dass es grosstenteils, Kantische Grundästze sind, auf denen die nachfolgenden Behaup-tungen ruhen werden." -Schiller, Friedrich· 'Uber die Asthetische Erziehung des Menschern". Erster Brief

দার্শনিক। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন সৌন্দর্যের কোনো বস্তুগত ভিত্তি নেই, সৌন্দর্য নির্ভর করে শিল্পসাহিত্যের উপভোক্তার উপলব্ধির ওপরে। সুতরাং সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান শিল্পবস্তুতে নয়, শিল্পের উপভোক্তার মনে—এ তত্ত্ব ভারতীয় রসবাদীদের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। —এ বিষয়ে বিস্তৃতির মধ্যে না গিয়ে আমাদের সর্বজন পরিচিত কথাটি স্মরণ করাই যথেষ্ট : ''কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়,—সহৃদয় পাঠকের মন।''[৩] অন্যদিকে কিন্তু শিলারের চিন্তাধারার সঙ্গে এখানে কান্টের চিন্তাধারার সাদৃশ্য নেই। বরং হেগেলীয় বস্তুগত ভাববাদের (Objective Idealism) সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বেশি। কারণ শিলার মনে করতেন, সৌন্দর্য শিল্পবস্তুতেই আছে, যদিও তার উপলব্ধি ব্যক্তির অনুভব-ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করে। কান্ট্ থেকে নিজের মতের এই স্বাতন্ত্র্য শিলার তাঁর প্রথম দিকের রচনা Philosophische Briefe, 1786-88 (Philosophical Letters) গ্রন্থেই প্রতিপন্ন করেছিলেন। কান্টের মতে সৌন্দর্য শুধু উপভোক্তার মন্ময় উপলব্ধি, কিন্তু শিলারের মতে সৌন্দর্যের অস্তিত্ব বস্তুগত (objective)। কান্টের প্রভাব থেকে শিলার এই যে বেরিয়ে এসেছেন, এবং চরম ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নন্দনতত্ত্বের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন, হেগেলের (Hegel) মতে পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বে এইটাই শিলারের প্রধান অবদান : "The achievement which Hegel ascribed to Schiller is in its essence......the abandonment of reservation by which at every turn Kant ascribed subjectivity, in a sense excluding objectivity."[৪] শিলারের প্রথম দিকের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো Über Anmuth und Würde, 1793 (On Grace and Dignity)। শিলার এখানে বলতে চেয়েছেন বস্তুর শুধু বাহ্য কাঠামোর ওপরেই সৌন্দর্য নির্ভর করে না; ব্যক্তিত্বের মাধুর্য (Anmuth)-এর সঙ্গে যখন মহৎচিত্তের মহৎ ভাবের (Wiirde)সংযোগ হয় তখনই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের জন্ম হয়।

নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে শিলারের সবচেয়ে পরিণত রচনা হলো 'Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (On the Aesthetic Education of Man)। এই রচনাটি প্রথমে শিলারের Die Horen (The Hours) পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। মানুষের নান্দনিক শিক্ষা বিষয়ক এই পত্রাবলীতে শিলার কান্টের প্রভাব অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন, কান্টের কঠোর যুক্তিবাদ থেকে বেরিয়ে এসে শিলারের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা মানবিক নমনীয়তা লাভ করেছে। তবু এখানেও কান্টের প্রভাব লক্ষ্য করি, যখন দেখি শিলার শিল্পের সঙ্গে নীতির গভীর সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ শিল্পবোধ মানবসমাজের থেকে বিবিক্ত কিছু নয়, সমাজকল্যাণের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা মানুষের কল্যাণের জন্যে। শিল্পী এই সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। একেই আধুনিক কালে শিল্পীর দায়বদ্ধতা (Commitment) বলা হয়। শিক্ষা কি শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি করে আনন্দদান করবে, নাকি নীতিশিক্ষা দিয়ে সমাজের মঙ্গলবিধান করবে? নীতির মানদণ্ড অবশ্য সমাজে-সমাজে যুগে-যুগে পরিবর্তিত

৩। গুপ্ত, অতুলচন্দ্র : 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ; ১৪০৩, পৃঃ ২৫।

৪। Bosanquet, Bernard *'A History of Aesthetic*, 1956, p.287.

হতে পারে; কিন্তু শিল্পে নীতিশিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মঙ্গলবিধান কবি-শিল্পীকে করতেই হবে। এই জন্যে কান্ট্ বলেছিলেন—শিল্পের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বস্তুত সৌন্দর্য হলো নৈতিকতার প্রতীক।[৫] শিলারও এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। তবে নৈতিকতা সম্পর্কে শিলারের বক্তব্য অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। মানুষের ওপরে নৈতিকতার দায়িত্ব বর্তেছে প্রকৃতির বিবর্তনের ধারায়। শিলার এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রকৃতির চোখে মানুষ এবং তার অন্যান্য সৃষ্টি সমান—মানুষবে প্রকৃতি অন্যান্যদের তুলনায় কোনো ভালো সুযোগসুবিধা দিয়ে রেখেছে, তা নয়। মানুষের হয়ে সে তার কাজগুলি ততদিন করে দেয় যতদিন না সে স্বাধীন বুদ্ধির অধিকারী হয়ে নিজের কাজগুলি নিজে করে নিতে পারছে। কিন্তু মানুষকে যে জিনিসটা ঠিক মানুষ করে তুলেছে সেটা হলো এই—মানুষকে প্রকৃতি যতটুকু তৈরী করে দিয়েছে, মানুষ শুধু ততটুকুতে এসে থেমে যায় না; প্রকৃতি তার হয়ে যতটুকু করে দিয়েছে, সে যুক্তিবুদ্ধি খাটিয়ে তার চেয়ে বেশি এগিয়ে গেছে। যে কাজটা অন্ধ তাগিদে বাধ্য হয়ে করা হতো, সেটাকে সে স্বাধীন ভাবে স্ব-নির্বাচিত কাজ হিসাবে করে এবং যেটা ছিলো জৈব তাগিদ, সেটাকে নৈতিক তাগিদে উন্নত করেছে।"[৬] আগেই বলেছি নীতিশিক্ষা বনাম সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং পরিণামে সামাজিক মঙ্গলসাধন (আধুনিক ভাষায় 'দায়বদ্ধতা' বা Commitment) বনাম নিছক আনন্দদান (অথবা কলাকৈবল্যবাদ বা Arts for art's sake)—এই বিতর্ক চিরকালই সবদেশেরই সাহিত্যিকদের চিন্তিত করেছে। আমাদের দেশে এই সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশী ভেবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যখন 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'[৭] লিখেছেন তখন 'মঙ্গল-সাধন' ও 'সৌন্দর্য-সৃষ্টি'-কে শিল্পের বিকল্প উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন—

'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"[৮] এখানে 'অথবা' কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই শিথিলভাবে ব্যবহার করেননি।

কিন্তু যখন তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র পরিসমাপ্তিতে লিখেছেন—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে", তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, নীতিশিক্ষা ও সমাজের মঙ্গলবিধান শেষপর্যন্ত যেন বিষবৃক্ষ রচনার উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। এখানে বিষবৃক্ষ রোপণের যে বিষময় ফল তা দৃষ্টান্তের (example) মাধ্যমে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে

৫। "I say the beautiful is the symbol of morally good. By this the mind is made conscious of a certain ennoblement and elevation above the mere sensibility to plessure received strongh senses-Kant, Immanuel . The Critique of Judgement,' 1892 reprinted in the Hafner Library Claecics (New York, 1951), Trans by J.H.Bernard.

৬। 'Über die Ästhetische Ezichung des Menschen." Dritter Brief.

৭। 'প্রচার' ১২৯১, মাঘ।

৮। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ,১৪০৩, পৃঃ ২৩৭।

শিল্প নীতি শিক্ষা দান কবে এবং মানবচবিত্রকে মহৎ কবে তোলে। শিলাব মনে করতেন আদর্শ বাষ্ট্র এইভাবে মানবচবিত্রকে মহৎ কবে তোলাব মাধ্যমেই গঠিত হতে পাবে। শিলাব এই প্রক্রিযাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"বাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ববিধ উন্নতি সাধিত হবে মানবচবিত্রকে মহৎ কবে তোলাব মাধ্যমে—কিন্তু একটি বর্বব সংবিধানেব আওতায চবিত্রে মহত্ত্বসাধন কী কবে হবে? সেই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ কবাব জন্যে আমাদেব বাষ্ট্রযন্ত্র ছাডা অন্য কোনো পন্থা খুঁজে বেব কবতে হবে এবং এমন কোনো উৎস খুলে দিতে হবে যেটা শুদ্ধ ও পবিচ্ছন্ন থাকবে, বাষ্ট্রীয ক্ষেত্রে দুর্নীতি যতই থাকুক না কেন। এখন আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছি, এই সিদ্ধান্তেব দিকেই আমাব সমস্ত পূর্ববর্তী চিন্তা আমাকে নিযে গেছে। মানবচবিত্রেব মহত্ত্বসাধনেব সেই মাধ্যমটি হলো চারুশিল্প, এই বকমেব জীবন্ত উৎসটি খুলে যায তাব অমব দৃষ্টান্তগুলিব সাহায্যেই"[১] এই খানেই এসে পডে সমাজেব উপবে শিল্প সাহিত্যেব প্রভাবেব কথা। একটু ভেবে দেখলেই আমবা বুঝতে পাববো সমাজেব উপবে ম্যাক্সিম্ গোর্কীব 'মা (Mother), বঙ্কিমচন্দ্রেব 'দেবী চৌধুবাণী' ও 'বিষবৃক্ষ', ববীন্দ্রনাথেব 'গোবা', শবৎচন্দ্রেব 'গৃহদাহ', এমনকী সমবেশ মজুমদাবেব 'সাতকাহনে'ব প্রভাব যে বকম, এমিল জোলা ব 'নানা' (Nana), সমবেশ বসুব 'বিবব-প্রজাপতি' নবারুণ ভট্টাচার্যেব 'হাববার্ট' উপন্যাসেব প্রভাব সেবকম নয —প্রত্যেক স্রষ্টাব সৃষ্টিব প্রকৃতি এবং সমাজেব ওপবে তাব প্রভাব স্বতন্ত্র। আমবা প্রথম অধ্যাযে দেখিযেছি— যে স্রষ্টাব সৃষ্টিচৈতন্য (Creative Consciousness) সমাজ পবিবেশেব দাস অথবা যিনি শুধু সমাজ-চিত্র উপস্থাপনাকেই শিল্পেব লক্ষ্য মনে কবেন। সেই স্রষ্টা সমাজেব শুধু যুগগত চিত্রকেই উপস্থাপিত করেন, কিন্তু যে স্রষ্টাব চেতনা যুগেব সমাজ পবিবেশ সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাব দাসত্ব থেকে মুক্ত সেই স্রষ্টা যুগেব চিত্র উপস্থাপিত কবেও তাকে বদলে দেবাব আদর্শ স্বপ্নকে কার্যত কবেন।

অবশ্য একথাও মনে বাখা দবকাব যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদেব শিক্ষাদান বা সামাজিক মঙ্গলবিধান 'হিতোপদেশ' বা 'কথামালা'ব মতো প্রাথমিক স্কুল-শিক্ষা নয। এই শিক্ষাদানেব পদ্ধতি অনেক সূক্ষ্ম ও নান্দনিক। অনেক সময লেখক সমাজেব বিবৃতিকে হুবহু তুলে ধবেন এবং তাব সাহায্যে সমাজকে পবোক্ষভাবে সচেতন ও জাগ্রত কবাব চেষ্টা কবেন। যেমন উপবে উল্লিখিত অধিকাংশ বচনায কবা হযেছে। শেষোক্ত উপন্যাসটিব শিক্ষাদান অতিসূক্ষ্ম ও কলাসম্মত বচনাশৈলী অপূর্ব সংহত ও ব্যঞ্জনাধর্মী সাহিত্যেব শিক্ষাদান সাধিত হবে

১। Alle Verbesserung im Politischen soll von Veredlung des Charakters ausgehen aber-awie kann sich unter den Einflussen einer barbarischen Statsverfassung der Charakter Veredeln? Man Musste also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der Staat nicht hergibt und Quellen dazu eroffnen die sich bei aller politischen Verderbnis rein und lauter erhalten Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, zu welcham alle meine bisherigen Betrachtungen hingestrebt haben Dieses Werkzeuag ist die schone Kunst diese Quetlen offnen sich in ihren unsterblichen Musterrn Schiller, Friedrich Uber die Asthetische Erziehung des Menschen, 1967, Neunter Brief

নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে, আলঙ্করিকদের ভাষায় এই শিক্ষা হবে 'কান্তাসম্মত' মধুর রীতিতে। শিলারও তেমনি মনে করতেন, শিল্পও শিক্ষাদান করে, তবে সেই শিক্ষা নান্দনিক পথে। নন্দনতত্ত্ব—বিষয়ে তাঁর পরিণত রচনা 'মানুষের নান্দনিক শিক্ষা-বিষয়ক পত্রাবলী'তে (über die Ästhetische Erziehung des Menschen) এই তত্ত্বই দ্যোতিত।

শিলার প্রতিপন্ন করেছেন—মানুষের নৈতিক শিক্ষা নান্দনিক পথেই সম্ভব, এমনকী মানুষের রাজনৈতিক সমস্যারও সমাধান হবে নান্দনিক শিক্ষার মাধ্যমেই, সৌন্দর্য সৃষ্টির সাহায্যে। সৌন্দর্যের মধ্যে একটা শুদ্ধীকরণের সূক্ষ্ম শক্তি আছে।[১০]

'আমি আশাকরি, আমি তোমায় একথা বিশ্বাস করাতে পারবো যে, যে-বিষয়টা আমি বেছে নিয়েছি সেটা আমাদের যুগের চাহিদার ততটা প্রতিকূল নয়, যতটা তার রুচির প্রতিকূল, অর্থাৎ যুগের পক্ষে সেই বিষয়টার বেশি প্রয়োজন আছে। যুগের রুচি যদিও তাকে মেনে নিচ্ছে না। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো—বাস্তব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষকেযদি কখনো তার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়, তবে তাকে সেটা করতে হবে নান্দনিক পথেই, কারণ একমাত্র সৌন্দর্যের পথেই মানুষ মুক্তি লাভ করে।"[১০]

শিল্প মানুষকে প্রকৃতির নিয়মের বন্ধন থেকেও মুক্তি এনে দেয়। শিলার এই নান্দনিক মুক্তিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে বলেছেন—মানুষ যখন তার মনের নান্দনিক উপলব্ধির স্তরে পৌঁছায়, অর্থাৎ শিল্পের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে মগ্ন হয়ে যায়, তখন সে তার চারিপাশের জগৎ থেকে বিবিক্ত হয়ে যায়, জগৎকে সে তখন থেকে পৃথক করে বস্তুগত দৃষ্টিতে (objectively) দেখে, তখন সে আত্মমগ্ন সত্তা। এই অবস্থায় তার অন্তরে একটি প্রসন্নতা ও শান্তি নেমে আসে, অন্তরের আলো জ্বলে ওঠে তখন তার বাইরেও কোনো অন্ধকার থাকে না। অন্তরে প্রশান্তি নেমে এলে প্রকৃতির বাইরের বিক্ষোভও শান্ত হয়ে যায়। শিলারের এই নান্দনিক উপলব্ধির বর্ণনাটি বড়োই কবিত্বপূর্ণ :

"মানুষের অন্তরে যখন ভোরের আলো ফোটে, তখন তার বাইরে রাত্রির অন্ধকারও কেটে যায়, তার অন্তরে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাইরের বিশ্বের সমস্ত ঝড়ও শান্ত হয়ে আসে। আর প্রকৃতির যেসব শক্তি পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রমে রত, সেগুলিও তখন একটা স্থায়ী সমতার মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে।"[১১]

'মানুষের নান্দনিক শিক্ষাবিষয়ক পত্রাবলী'তে শিলার শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সুন্দর করে ধাপে-ধাপে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে তিনি মানুষের দুটি সহজাত বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বৃত্তি (Stofftrieb বা Sense Instinct) ও রূপসৃষ্টির বৃত্তি (Formtrieb বা Form Instinct)। ইন্দ্রিয়ানুভবের বৃত্তিটি মানুষের দেহসত্তার বৃত্তি, এই

১০। "Ich hoffe, Sie zu überzeugen, dass diese Materie weit weniger dem Bedürfris ats dem Geschmack ds Zeitalters freed ist, ja dass man. um jenes politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische den Weg nehmen muss, weit es die Schönheit. ist, durch, welche man zu der Freiheit wandert.--Schiller, Friedrich, 'Über die Ästhetische Enziehung des Menschen,' Zweiter Brief.

১১। "Sobald es Licht wird in dem Menschen, ist auch ausser ihem keine Nacht mehr; sobald es stille wird in ihm, legt sich auch der Sturm in dem Weltall, und die streitenden Kräfte der Natur finden Ruhe zwischen bleibenden Grenzen." Schiller, Friedrich; 'Über die Ästhetische Enziehung des Menschen,' Fünfundzwanzigster Brief.

বৃত্তি মানুষকে জগতের অনুভূতি দেয়। এই বৃত্তির সাহায্যেই মানুষ যেমন জীবনরসের আস্বাদ লাভ করে তেমনি এই বৃত্তিই মানুষকে কালগত নশ্বর জীবনে সীমায়িত করে। আর রূপসৃষ্টির বৃত্তিটি আসে মানুষের ঊর্ধ্বতর সত্তা থেকে এই বৃত্তি তার মধ্যে ইন্দ্রিয় সীমার বাইরে যুক্তিবুদ্ধি দান করেছে। শুধু ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে যে উদ্দামতা ও বিশৃঙ্খলতা আছে রূপসৃষ্টির বৃত্তিটি তাতে যুক্তির সাহায্যে সৌষম্য এনে দেয়। কিন্তু এই দুটি বৃত্তিই মানুষকে বদ্ধ করে। প্রথমটি জড়জগতের কার্যকারণের নিয়মে বদ্ধ করে আর দ্বিতীয়টি মানুষকে যুক্তির বন্ধনে বদ্ধ করে। মানুষকে কোনো-না-কোনো প্রয়োজনের এবং নিয়মের শৃঙ্খলে এই দুই বৃত্তিই বদ্ধ করে। মানুষকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র তার খেলার বৃত্তি (Play-instinct)। সমস্ত সাংসারিকতা ও বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে এই খেলার বৃত্তিই। এইজন্যে খেলার বৃত্তি থেকেই শিল্পের জন্ম। শিল্পও এক রকমের খেলাই। এই হলো শিলারের নন্দনতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য। এই খেলার মুক্তিতেই মানুষের পূর্ণতা। শিলারের মত বিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমাদেব এই সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, রূপসৃষ্টির বৃত্তিটি (Form instinct/Form-drive) যুক্তির শাসন দিয়ে মানুষের ইন্দ্রিযেব বৃত্তিব (Sense-instinct/Sense-drive) ওপরে নিয়ন্ত্রণ আনে বলে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। আবার রূপসৃষ্টির বৃত্তির পেছনে যুক্তিবুদ্ধি থাকে বলে যুক্তি নৈতিক দায়বদ্ধতায় মানুষের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়। এই নৈতিক দাযবদ্ধতা মনের ওপবে এবং তাব আত্মার ওপরে একটা শাসনের শৃঙ্খল আরোপ করে। সুতবাং যুক্তিবুদ্ধিও মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, মানুষেব আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র খেলার বৃত্তি (Spieltrieb = play-instinct / play-drive)। এই খেলার বৃত্তিটি ইন্দ্রিয়ের বন্ধন এবং যুক্তিব শাসন—দুটি থেকেই মানুষের মন ও আত্মাকে মুক্তি দেয।

একমাত্র এই খেলার বৃত্তি (Spieltrieb[১]=play-instinct/play-drive) ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ও যুক্তিব শাসন—দুটি থেকেই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু খেলার মুক্তিতে পৌঁছোতে যুক্তির বৃত্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।

শীলারেব মতে নান্দনিক সৌন্দর্যসৃষ্টি (aesthetic creation) এবং নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ (aesthetic appreciation) হলো একদিকে ইন্দ্রিযবৃত্তি (Stofftrieb=sense-instinct) ও বুদ্ধিবৃত্তি (Formtrieb=form-instinct) দুইয়ের এলাকার বাইবেব এক বৃত্তি, শিলার তার নাম দিযেছেন ক্রীড়ার বৃত্তি (Spieltrieb=Play-instinct); এতে আছে শুধু খেলার আনন্দ—অপ্রয়োজনের আনন্দ। এব সঙ্গে দেহের ইন্দ্রিয়বৃত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। একটি উদাহরণ দিলে বিষযটি বোঝা যাবে। এযুগের স্বনামধন্য সাহিত্যশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সরস্বতী সম্মান' লাভের পর সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হযেছিলো, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে
টেনে চোখ মারি
হে বীণাবাদিনী, তুমিও তো নারী...

ক্ষমা করো এই
বাক্ ব্যবহার ....”
ক্ষমা করেছিলেন?

এ তো বহু পরের ঘটনা। আগেরটা এবার। সরস্বতী পূজার পূর্বলগ্ন। “নিঃশব্দ, নিবিড় রাত্রি, আমি বসে আছি, আমার সামনে একটি মাটির মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। ... এক সময় সর্বাঙ্গে শিহরণ হল। কী অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবসনা রমণীর। আয়ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠ, ভরাট, বর্তুল দুটি স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত উরুদ্বয়।.... তছনছ হয়ে যেতে লাগল আমার কৈশোর, জেগে উঠল পুরুষার্থ, অল্প অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল শরীর। ....চোরের মতন সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি হাত রাখলাম দেবীমূর্তির বুকে। 'জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে'....সেই কুচ-যুগে আমার আঙুল, আমার শরীর আরও রোমাঞ্চিত হল, কান দুটিতে আগুনের আঁচ। আমি প্রতিমার ওষ্ঠ চুম্বন করলাম, আমার জীবনের প্রথম চুম্বন।'...আজ সেই সরস্বতীব আশীর্বাদ কেমন লাগছে? 'সরস্বতী সম্মানের খবর পেয়ে মনে হচ্ছে বাঁচা গেল। গত কয়েক বছর খুব বিরক্ত হয়েছি উড়ো খবরে। মুক্তি পাওয়া গেল এবার। কিন্তু বয়সের কাছে পুরস্কার তেমন রোমাঞ্চকর নয়।' বললেন সুনীল স্বয়ং।”[১২]

—এই বিবৃতিতে বক্তার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, হিন্দুর ঐতিহ্যাগত ধর্মবোধ খানিকটা আহত হয়েছে মনে হয়। আর এখানে যে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিবৃতি রয়েছে তাতে শিলার হলে বলতেন—সরস্বতী-প্রতিমার যে শৈল্পিক সৌন্দর্য (aesthetic beauty), তার বিশুদ্ধ নান্দনিক উপলব্ধি (aesthetic appreciation) এখানে ঘটে নি। সরস্বরতী-প্রতিমা দর্শনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির জাগবণটি নিতান্ত অল্প বয়সের ঘটনা, নয়তো 'প্রথম আলোর' মতো মহান সৃষ্টির স্রষ্টার নান্দনিক বোধ নেই, একথা আমাদের মন মানতে চায় না। আমার শুধু মনে হয় 'অন্য দেশের কবিতা'য় বিশ্বসাহিত্যেব রসক্ষেত্রে সার্থক বিচরণের নান্দনিক ক্ষমতা যাঁর আছে, এবং যে বইটি আমার মতো অনেকেরই একটি প্রিয় বই, তার স্রষ্টার (সার্থক অনুবাদও নব-সৃষ্টি, Creation থেকে transcreation) নান্দনিক চেতনা নেই, একথাই বা কি করে বলি?

এ প্রসঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবির একটি অমর শিল্পসৃষ্টি 'উর্বশী' কবিতাটির কথা মনে আসছে। নান্দনিক সৌন্দর্যের মূর্তবিগ্রহ যে উর্বশীকে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত মানবিক সম্পর্কের অতীত অপ্রয়োজনের আনন্দের উৎস রূপে কল্পনা করেছেন—

“নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী-রূপসী'
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী”!

তাকেই সম্বোধন করে যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

“মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল”,

১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে মার্চ, ২০০৫, ১৪ই চৈত্র, ১৪১১ (কলকাতার কড়চা)

কিংবা-

"তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

তখন কি বলা হবে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়-বিকারের ইঙ্গিত আছে, অতএব এটা নিখুঁত নান্দনিক সৌন্দর্য হয়নি? এই বিতর্ক নতুন নয়। শিলার অবশ্য এই বিতর্কের বহু পূর্ববর্তী লেখক। কিন্তু তিনি নিজে এজাতীয় কোনো বিতর্ক উত্থাপন করেননি বা এজাতীয় বিতর্কের কোনো বিস্তৃত উত্তর দেননি। তবে অন্নদাশঙ্কর রায় ফরাসীদের মধ্যে এক রকমের নান্দনিক চেতনা লক্ষ্য করেছেন। তাঁর নিজের কথায় তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী থেকে একটু দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করি :

"ফরাসীরা একটা আত্মপবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিস্ট, তারা দু'দল চরমপন্থীর সমন্বয়—গোঁড়া ক্যাথলিক আর গোঁড়া যুক্তিবাদী। ....

"গোঁড়া ধার্মিক হোক গোঁড়া অধার্মিক হোক রসবোধ জিনিসটা এদের জাতিগত, ও জিনিস এরা খ্রীস্টধর্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি বলে ও নিয়ে এরা ঝগড়া করে না। Venus de Milo-র নগ্ন সৌন্দর্য এরা পিতাপুত্র মিলে দেখে এবং পিতাপুত্রে মিলে আলোচনা করে। উলঙ্গতা নিয়ে তর্ক বাধে না, ওটা চোখসওয়া হয়ে গেছে, ওটা উভয় পক্ষেই আবশ্যক বলে ধরে নিয়েছে, তর্ক বাধে সৌন্দর্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বললে অবান্তর হবে না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটা তফাৎ আছে— ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক প্রভৃতি জাতিরা দেহকে প্রগাঢ় ভালোবাসে ও ভক্তি করে, সহজিয়াদের মতো দেহের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজে পায়। এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতারা সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃমূর্তি আঁকে তখন স্তনের ওপরে বস্ত্র টেনে দেয় না, যখন বালক যীশু আঁকে তখন খামোকা কৌপীন পরিয়ে দেয় না, বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতৃমূর্তির মুখে তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলে। উত্তর ইউরোপের লোক প্রোটেস্টান্ট, গোঁড়া নিরাকারবাদী, ওদের চিত্রকলা একান্ত দরিদ্র, ভাস্কর্যের বালাই ওদের নেই।"[১৩]

—ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে মুক্ত নান্দনিক চেতনা বলতে শিলার বোধ হয় ফরাসীদের এই রকমের নান্দনিক উপলব্ধিই বোঝাতে চেয়েছেন।

কারণ আমরা যখন খেলা করি তখন ইন্দ্রিয়ের তাগিদ বা যুক্তির শাসন কোনোটিই থাকে না। যখন আমাদের মন এবং আত্মা পুরোপুরি মুক্ত থাকে, তখনি আমরা শিল্পসৃষ্টি করি। সুতরাং শিল্পসৃষ্টিও এক রকমের খেলার বৃত্তি থেকে আসে। তাই শিলারের সিদ্ধান্ত হলো --

১৩। 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড) ('পথে প্রবাসে' প্রথম প্রকাশ ১৯৩১), ১৯৮৭, পৃ ৩০১-৩০২।

"খেলার বৃত্তির আওতাতেই অন্য দুটি বৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে এবং দুটি সুসমন্বিতভাবে কাজ করে। খেলার বৃত্তি সমস্ত শাসনের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে দৈহিক দিক থেকে (ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে) এবং নৈতিক দিক থেকে মুক্তি দিতে পারে।"[১৪]

খেলাতেই মানুষের মুক্তি, খেলাতেই মানুষের পূর্ণতা। মানুষ তখনি পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠে যখন সে খেলতে পারে। শিল্পসৃষ্টির পেছনেও রয়েছে খেলার বৃত্তি। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিও হলো খেলা— ভারতীয় দর্শনে বলা হয় 'লীলা'। রবীন্দ্রনাথও এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন, যখন তিনি বলেছেন, শিল্প আমাদের প্রয়োজনের সীমার বাইরের জিনিস, শিল্প অপ্রয়োজনের আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রনাথের মতো শিলারেরও সিদ্ধান্ত হলো এই খেলাতেই—এই অপ্রয়োজনের আনন্দতেই—মানুষের পূর্ণতা।[১৫]

১৪। "Der Spieltriel also, als in welchem beide verbunden wirken, wird das Gemüt zugleich moralisch und physisch nötigen;er wird also, weil er alle Zufälling keit aufhebt, auch alle Nötigung aufheben und der Menschen, sowohl physisch als moralisch, in Freiheit scetzen."--Schiller, Friedrich, 'Über die Ästhetische Erziehung des Menschen', Vierzehnter Brief.

১৫। "Mithin tut sie auch den Ausspruch : der Mensch soll mit der Söhrnnheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen. ...der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist und er ist nur da gang Mansch, wo er sprielt" Schiller, Friedrich; 'Über die Äesthetische Erzirlnung des Menschen, Fhnfzennter Buief.

ঙ. প্রসঙ্গ : সমাজ

১. চৈতন্য ধর্ম : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকাল বিস্তৃত মূলত পঞ্চদশ শতাব্দীতে। মুসলমান আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালীর সমাজজীবন, লোকাচার আর কুসংস্কারে নিষ্প্রাণ তার ধর্ম সাধনা, জাতিভেদে বর্ণভেদে ছিন্নভিন্ন তার সংহতি--এমন দুঃখের দিনে মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাঙালীকে নবজীবন দান করেছিল। ধর্মের মূল সত্য প্রেম ও ঈশ্বরভক্তির বাণী প্রচার করে এবং 'আপনি আচরি ধর্ম' মানুষকে শিখিয়ে বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ করে পুনর্জাগরিত করলেন তিনি। তাঁর আন্দোলনকে তাই বিশেষজ্ঞরা 'বাঙালীর প্রথম রেনেসাঁস বা প্রথম নবজাগরণ' বলে চিহ্নিত করেছেন। এ হল মহাপ্রভুর শিক্ষার যুগগত উপযোগিতা।

কিন্তু সে যুগের পটভূমিকায় যাকে যুগগত উপযোগিতা বলে মনে হয়, তার যুগোত্তীর্ণ বা শাশ্বত উপযোগিতাও রয়েছে, কিংবা অন্তত আমাদের বর্তমান ও সাম্প্রতিক কালেও মহাপ্রভুর শিক্ষার উপযোগিতা রয়েছে—সেকথাই বিশেষভাবে মনে আসছে নানা কারণে।

সেই নানা কারণের কথা পরে আলোচ্য। আগে ভাল করে বুঝে দেখা দরকার—মহাপ্রভু যে প্রেমের আদর্শ প্রচার করেছিলেন সেই প্রেমের স্বরূপ কী? মহাপ্রভু প্রচারিত ঈশ্বরপ্রেম ও জীবপ্রেম মূলত কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমই। কারণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে তিনি 'কাম' বলেছেন এবং শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই তাঁর মতে 'প্রেম'। জীবপ্রেমের মধ্যে যদি কোনো রকম আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে থাকে তবে তা প্রেম নয়, এমনকি জীব-কল্যাণে সেবামূলক কর্মের মধ্যেও যদি খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন থাকে, অথবা শুধুই আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভের প্রবণতাও থাকে তবে তাও মহৎ আদর্শ নয়, তা হল অহংভাবের (ego) তৃপ্তি। জীবকে জীবজ্ঞানে সেবা বা ভালোবাসা ভারতীয় প্রেমের আদর্শ নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করাই ভারতীয় আদর্শ। চণ্ডালকে মহাপ্রভু এমনিতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলেননি, চণ্ডাল তখনই দ্বিজশ্রেষ্ঠ যখন সে হরিভক্তি-পরায়ণ হয়। আমাদের ঋষিরা বলেছেন, পুত্রকলত্র প্রিয় কেন? প্রিয় পুত্র কলত্র বলে নয়, প্রিয় তাদের মধ্যে আত্মা আছে বলে আত্মার জন্যেই তারা প্রিয়। চণ্ডালকে শুধু চণ্ডালরূপেই ভালোবাসা, পুত্র কলত্রকে শুধু পুত্রকলত্র রূপে ভালোবাসা বা আরো ব্যাপকভাবে জীবকে জগৎকে শুধু জীবরূপে জগৎরূপে ভালোবাসা এবং সেবা করা—এ হল পাশ্চাত্য বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বসেবা (philanthropy) ও পাশ্চাত্য মানবতাবাদ (humanism)। এ আদর্শ মহাপ্রভুর আদর্শ নয়, এ ভারতীয় বিশ্বপ্রেম নয়। ভারতীয় বিশ্বপ্রেমের মূল প্রতিষ্ঠা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির উপরে রয়েছে, সর্বভূতস্থ ব্রহ্মের উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এবং এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে সেই বিশ্বপ্রেম কোনো আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা থাকে না, কোনো অহংভাব (ego) থাকে না। অধ্যাত্ম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বপ্রেম অকৃত্রিম এবং তা সাধনার দ্বারা লাভ করতে হয়। তা সুলভ ব্যাপার নয়, কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতার প্রচার সর্বস্ব মানবপ্রেম নয়। আধুনিক কালে ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু প্রচারিত দিব্যপ্রেম বা ভগবৎ প্রেমই আমাদের কাম্য। এই জন্যে কাম্য যে এই প্রেমে কোনো

মিথ্যাচার থাকে না এবং প্রেমের ভিত্তিটি সুদৃঢ়। ও যুগে মহাপ্রভুর শিক্ষার একটা বিশেষ দিক আমাদের বেশি করে গ্রহণ করা উচিত। তাঁর শিক্ষার সেই দিকটি হল—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। আমাদের যুগের একটা বড় অভিশাপ হল মিথ্যাচার। আমরা কথায় আর কাজে এক নই। আমরা মুখে একরকম উপদেশ দিই আর নিজের জীবনে অন্যরকম আচরণ করি। যারা নিজেরা শত শত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় তারা ভারতবর্ষে একটা আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে চিৎকার করে আকাশ ফাটায়। মহাপ্রভুর শিক্ষায় এই দ্বিচারিতা ছিল না। কাজে ও কথায় এই অখণ্ডতাই তাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রথম শিক্ষণীয় আদর্শ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—'The ultimate value of a man is not to be measured by what he says, not even by what he does, but by what he becomes.'—একটি মানুষের চরম মূল্য বিচার করতে হবে তার কথা দিয়ে নয়, তার কাজ-দিয়ে নয়, সে কী বলে বা কী করে তা দিয়ে নয়, বরং সে কী হয়ে ওঠে সেইটা দিয়ে তাঁর চরম মূল্য বিচার হবে। নিজের বাণীকে নিজের জীবনে রূপায়িত করে এই হয়ে ওঠার শিক্ষাই মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং সেইটাই আমাদের এ যুগের আদর্শ হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের আজ জাতীয় সংহতি রক্ষা করা একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে আর রাজনৈতিক নেতারা উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করছেন—এর জন্যে ধর্মই দায়ী। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা এক জিনিস নয়। সাম্প্রদায়িকতা হল ভণ্ড রাজনৈতিক নেতা ও সমাজনৈতিক নেতার সৃষ্ট ধর্মের নামে ভ্রষ্টাচার মাত্র। সেটা ধর্মের অপপ্রয়োগ। আসল হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে প্রেমের ও আধ্যাত্মিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা বলেন হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছে তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। আসল হিন্দুধর্মের আদর্শে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করছে? চৈতন্যমঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম,—শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি—এরা কোনো কালে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উসকানি দেয়নি। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি কোনো আদর্শ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আসেনি, এসেছে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা ও সমাজনেতাদের কাছ থেকে। ধর্মের এই অপব্যবহারের জন্যে যদি ধর্মকে বাদ দিতে হয় তবে আজকে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের জন্যে বিজ্ঞানকেই বাদ দেওয়া উচিত। কারণ দু-টি বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্র সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞানই। মহাপ্রভু সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত প্রেমধর্মের যে আদর্শ আমাদের দিয়েছেন তা আজকের ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতি সাধনের পক্ষে অপরিহার্য আদর্শ।

এ যুগটিকে আমরা বলি গণশক্তির যুগ। জনসাধারণই হল নাকি সমাজের মূল শক্তি। সুতরাং আজকের দিনে যে-কোনো ধর্ম বা যে-কোনো আদর্শই আমরা প্রচার করতে চাই, দেখতে হবে তা সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য কিনা, সহজ-সাধ্য কিনা। এদিক থেকে মহাপ্রভুর সহজ ভক্তিমার্গ ও প্রেমের ধর্মই গণসাধারণের উপযুক্ত আদর্শ। ভারতবর্ষে প্রথম গণধর্ম প্রচার করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ এবং তারপরেই ভগবান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এ যুগের যুগধর্ম যদি গণধর্ম হয় তবে সেই গণধর্ম হল মহাপ্রভুর ধর্ম। মহাপ্রভুর ধর্ম আমাদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমাদের এই যুগটির একটি বড় অভিশাপ হল যন্ত্রের যান্ত্রিকতা। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের সুখ সমৃদ্ধির উপকরণ অনেক দিয়েছে, কিন্তু আমাদের কোমল অনুভূতিগুলি শুকিয়ে দিয়েছে। মানবিক গুণাবলী—প্রেম প্রীতি দয়ামায়া মমতা করুণা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি মস্তিষ্কের অতিচর্চার ফলে মারা যাচ্ছে। কিন্তু সভ্যতায় যদি ভারসাম্য আনতে হয়, জীবনে যদি পূর্ণতা আনতে হয় তবে মস্তিষ্কের কর্ষণার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির বিকাশসাধনও করতে হবে। আর মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্ম তো এই হৃদয়বৃত্তির বিকাশেরই ধর্ম। The Life Divine (দিব্যজীবন) গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"All problems of existence are essentially problems of harmony"[১] অর্থাৎ জীবনের সব সমস্যার মূল হল সঙ্গতির সমস্যা, আমাদের জীবনের সঙ্গতি নষ্ট হয়ে গেছে এইটাই আমাদের আসল সমসা। মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সুসঙ্গত বিকাশ চাই। আমরা ভবিষ্যতের জন্যে যে পূর্ণ মানবতার স্বপ্ন দেখছি তাতে মানবসত্তার এই সুসঙ্গত বিকাশ দরকার। এবং বর্তমানে আমাদেব যে দিকটির ঘাটতি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়বৃত্তির আমাদের কোমল বৃত্তির বিকাশ এবং সেটা সম্ভব হবে মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্মেই।

১। Sri Aurobindo 'The Life Divine' New york, 1951, Chap I

২. বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদেশের কৃষক ও ভূমি-আইন

সাহিত্য জীবনের ফটোগ্রাফ না হলেও সাহিত্য যে জীবন থেকেই তার রস সংগ্রহ করে এ সিদ্ধান্ত আজ সংশয়াতীত। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই নিবিড় যোগের ফলে মানুষের জীবনধারা শুধু সাহিত্যের স্বরূপকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, সাহিত্যে তার ছায়াও ফেলে যায়। এই কারণেই বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করা যায়। সেকস্‌পীয়ারের নাটকে মানুষের উগ্র জীবন কামনা, তীব্র জীবনসংগ্রাম, উচ্চাকাঙ্ক্ষার রক্তাক্ত রূপ দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, হয়তো সে দেশের মানুষ জীবনের আদিম উন্মেষের লগ্নে প্রকৃতির সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করেছিল, তাদের জীবনযাত্রা ছিল প্রধানত শিকার-নির্ভর অর্থাৎ অন্যকে নিধন করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় প্রমত্ত। কিন্তু সেকস্‌পীয়রেরই সমসাময়িক বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য পাঠ করলে বোঝা যায় এখানকার জীবন এতখানি সংগ্রামী নয়; প্রকৃতির উজাড় করা সম্পদে পূর্ণ সেই জীবনে তাই জীবনের সংগ্রামের চেয়ে জীবনের ও জীবনাতীতের ধ্যানই বড়, সে জীবন প্রধানত কৃষিনির্ভর বলে অন্যকে নিধনের মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার পথটা সেখানে বাঞ্ছিত নয়, সেখানে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সংঘবদ্ধ জীবনের জন্যেই প্রার্থনা ধ্বনিত।

ভারতীয় জীবন ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল এই কৃষি-নির্ভরতা। এই কারণেই প্রাচীনতম কাল থেকে এই কৃষিভাবনা, কৃষিকেন্দ্রিক জীবন ও কৃষক-জীবন এদেশের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে নানাভাবে। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্‌সংহিতার দেবদেবীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই বোঝা যায় বৈদিক দেবতাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গে কৃষিনির্ভর জীবনধারার যোগ আছে। ইন্দ্র, যিনি ঋক্‌সংহিতার এক চতুর্থাংশ কবিতাই অধিকার করে আছেন, তিনি হলেন বজ্র-বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির দেবতা। যিনি বারিসম্পাতের অধিকর্তা তিনিই ইন্দ্র 'যঃ অপাম্ নেতা, সঃ জনাস ইন্দ্র।' বৃষ্টি ও শস্য-বৃদ্ধির দেবতা পার্জন্য, তিনি যে বীজ রোপণ করে পৃথিবীকে শস্য-সমৃদ্ধ করে তোলেন তাই থেকে সারা পৃথিবীর খাদ্য জন্মায়—

> 'ইরা বিশ্বকৈম ভুবনায় জায়তে
> যৎ পর্জন্য পৃথিবীম্ রেতসা অবতি।।"

এ ছাড়া 'অপঃ' সূক্ত-এ বরুণ বন্দনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতীয় জীবনধারা যেমন কৃষিপ্রধান ছিল, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনতম কাল থেকেই কৃষিজীবনের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ছায়াপাত হয়েছে।

বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় জীবনে যে কৃষি নির্ভরতার সূচনা হয়েছিল, সেই কৃষিনির্ভরতাই চলেছিল আদিম মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত।

"Unlike the urban civilization of the Indus Valley people the Rigvedic

civilization concerns a nomadic rural people with an agricultural economy."[১]

ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে "বাল্মীকির যুগ আরণ্য কৃষি সভ্যতার যুগ।" পশ্চিমী পণ্ডিতেরা 'সীতা' শব্দের অর্থ করেছেন 'কর্ষিত ক্ষেত্র'; তাঁদের মতে রামচন্দ্র রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন, একথার অর্থ হল আর্য নৃপতি আর্যদের কৃষিক্ষেত্রকে অনার্য অধিকার থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। Waber, Jacobi প্রভৃতি পণ্ডিতেরা রামায়ণের এই যে গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করছেন, তাতেও অনুমান করা যায় একটি রূপকের সমস্যাই এই আদি মহাকাব্যে রূপায়িত হয়েছে।

এমনি করে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় কৃষিজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের পরে ক্লাসিক্যাল পর্বে সংস্কৃত সাহিত্য প্রধানত কালিদাসের মত রাজসভার কবিদের হাতে এসে পড়ায় নাগরিক বৈদগ্ধ্যের আধার হয়ে ওঠে এবং গ্রামজীবন ও কৃষিজীবন তাতে গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গ্রাম-বাংলার চিত্র এবং কৃষি-নির্ভর জীবনের পটভূমিকাই মুখ্য। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী প্রধানত তত্ত্বপ্রধান এবং ভাবপ্রধান সাহিত্য। তবু চর্যাপদ ও শাক্ত পদাবলীতে অনুষঙ্গ ও অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্যে কোথাও কোথাও কৃষিজীবনের প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই সাহিত্যের শান্তরসাস্পদ ভাব পরিবেশ দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ সাহিত্য যন্ত্রশিল্প নির্ভর বা জাতিব সৃষ্টি হতে পারে না, এ সাহিত্য প্রকৃতির অফুরন্ত স্নেহরসসিঞ্চিত একটি কৃষি-নির্ভব জাতিরই সৃষ্টি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বাস্তবধর্মী শাখা হল মঙ্গলকাব্য, মঙ্গল কাব্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বাংলার কৃষকদের অত্যাচারিত বিপর্যস্ত রূপ প্রথম ফুটে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কবিরা যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে বাংলার অত্যাচারিত কৃষকসম্প্রদায়ের একটি জীবন্ত চিত্র পাই। মনসামঙ্গলেব কবি ক্ষেমানন্দের সময়ে তালুকের অভিভাবক প্রসাদ গুরুমশায়ের এমনি অত্যাচাব ছিল যে প্রজারা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করে— ;

"তাহার কমল বশে প্রজা নাহি রহে দেশে
সর্বনগর হইল কাথড়া।"
(কাঁথড়া = চালহীন বা ছাদহীন বাড়ি)

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুহূর্তে এদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের যে মর্মান্তিক দুরবস্থা, তার জলন্ত চিত্র পাই মুকুন্দরামের আত্মজীবনীতে। তখন পাঠান শক্তির অবসান এবং মোগল শক্তির প্রতিষ্ঠার সূচনা। এই সময় বাংলার শাসন-শৈথিল্যের সুযোগে সামন্তপতিরা কৃষকদের উপরে সর্ববিধ অত্যাচার ও অবিচার চালিয়েছেন। অথচ প্রজারা যাতে পালিয়ে না যায়, সেদিকেও তাঁদের কঠোব প্রহরা।—

১। Chopra, P.N., Puri, B.N. and Das, M.N. 'A Social Cultural and Economic History of India, 1974, p 36

"পেয়াদা সবার কাছে প্রজা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় হানা।"

অথচ প্রজাদের উপরে 'শিকদার মামুদ শরিফে'র নায়েব রায়জাদা নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে গেছেন। করদ জমির দৈর্ঘ্য কোনাকুনি মেপে বেশী খাজনা আদায়, উর্বর জমির হারেরই পতিত জমির উপরেও খাজনা আদায়, সমস্ত কার্যে উৎকোচ গ্রহণ, টাকা ভাঙাতে বাটা গ্রহণ, টাকা পিছু একপাই সুদ প্রভৃতি অবিচারের কথাও মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন। এইভাবে কৃষিপ্রধান বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের যে দুরবস্থা, তার চিত্র মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে আসছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারাকে অনুসরণ করেই তাঁর বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বাংলার কৃষকদের কথা উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের উপস্থাপনার সঙ্গে বঙ্কিমের উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রাচীন সাহিত্যে এই উপস্থাপনা ছিল একান্তই পরোক্ষ, মধ্যযুগে এই উপস্থাপনা হল প্রত্যক্ষ, প্রধানত বিকৃতিমূলক; তাতে কোন রাজনৈতিক অধিকার বোধ বা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমের প্রবন্ধের মধ্যে আছে একটা ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদের সুর এবং রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকার-বোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শনের সমসাময়িক 'প্রচার' পত্রিকাটিও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী ছিল। এই বঙ্গদর্শন ও প্রচার পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধগুলি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) সঙ্কলিত হয়। বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কাল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি এই দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত। এই প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কাজে লাগিতে পারে।" সুতরাং বোঝা যায় বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটি একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১০ আইন প্রবর্তিত হয়। এইটিই কৃষক-স্বার্থে প্রথম উল্লেখযোগ্য কার্যকর আইন। তার আগে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয। তারপর থেকেই এদেশের জমিদার কর্তৃক কৃষকদের উপরে অত্যাচার প্রবলতর হয়। সুতরাং মোটামুটি ভাবে বলা যায় ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ সাল বা তার কিছু পর পর্যন্ত বাংলার কৃষকদের দুরবস্থাই হল বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে যদিও এদেশের জলবায়ু ('প্রাকৃতিক নিয়ম') কেই আদি কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন, তবু তাঁর মতে কৃষকদের দুরবস্থার প্রত্যক্ষ কারণ জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার। আর জমিদারদের এই স্বৈরাচারকে সুযোগ করে দিয়েছে এদেশের ভূমিব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত আইনগুলি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থা ছিল অতি চমৎকার। তাঁর মতে "প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমিদার ছিল না।" রাজার সঙ্গে প্রজার দূরত্ব ছিল না। প্রজারা সোজাসুজি ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজাকে রাজস্ব দিত এবং রাজারা প্রজাদের পুত্রবৎ স্নেহে পালন করতেন। রাজারা প্রজার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতেন সে বিষয়ে

বিতর্কে যাবার প্রায়োজন দেখি না। কিন্তু হিন্দু রাজাদের আমলে রাজা ও প্রজার মধ্যে জমিদারদের মতো কোনো মধ্যস্বত্ব-ভোগী না থাকলেও জমিদারী প্রথার বীজ তখনই উপ্ত হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে জমি দখল ও ভোগের ব্যবস্থা অতি প্রাচীন কালেই ছিল—"The system of separate holdings already existed in the early Vedic times.......There is no trace in the Vedic literature of communal property......nor there is mention of communal cultivation."[২]

জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল এবং সামগ্রিক ভাবে রাজা দেশের সমস্ত জমির সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন। জমির উপর রাজার যে অধিকার (Prerogative) ছিল তার জোরে তাঁরা বিশেষ বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে জমি দান করতেন। এই প্রথার মধ্যেই যে জমিদারী প্রথার বীজ নিহিত ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন—"These land grants of the King created the land lords and the depressed position of the actual cultivation" (Indian Land System.)

অবশ্য হিন্দু আমলে প্রাচীন ভারতবর্ষে জমিদারী প্রথার বীজটি পাওয়া গেলেও, এই প্রথা যে ব্যাপক ছিল বা রাজার কৃপাপুষ্ট এই সব জমির মালিকেরা অত্যাচারী মধ্যস্বত্বভোগী ছিলেন, এমন কোনো উল্লেখ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। যথার্থ ব্যাপক জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হল মধ্যযুগে মুসলমান রাজাদের শাসনকালে। বঙ্কিমের মতে মুসলমান রাজারা অক্ষম শাসক ছিলেন। তাঁরা কর আদায়ের জন্যে প্রতি পরগণায় একজন করে সংগ্রাহক নিযুক্ত করলেন।

"তাহারা...........রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতে জমিদারীর সৃষ্টি এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত যে ইতিহাস-সম্মত তা ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী, ফিল্ড (Field) প্রভৃতি পণ্ডিতদের আলোচনা থেকেও সমর্থিত হয়। মুসলমান আমলে জমিদারী কেন্দ্রিক এই যে ভূমি ব্যবস্থার সূচনা হল, তাই ইংরাজ শাসন পর্যন্ত চলেছে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর নবাব শাহ আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দান করেন। তার বদলে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কোম্পানীর কাছ থেকে পেতে আরম্ভ করেন এবং কোম্পানী এই তিনটি প্রদেশ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। কিন্তু রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কম্পানী বুঝতে পারল যে, কোনো প্রতিনিধির (agent) মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করলে তাতে রাজা ও দরিদ্র প্রজা উভয়েরই ক্ষতি হবে। "both the interest of the state, and the property of the people must be at the mercy of the agents." রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়েই কোম্পানী দেখল যে এতে প্রজার দুঃখের অন্ত থাকে না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৬৯-১৭৭০ খ্রীঃ) জন্যে রেজা খাঁই

২। Macdonell and Keith : 'Vedic Index', I, p 211

অনেকটা দায়ী। ফলে হেষ্টিংসের আমলে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী রেজা খাঁকে সরিয়ে দেওয়ান পদ তুলে দিল। আগেকার যেসব জমিদার ব্রিটিশ আমলে প্রথমে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন তাঁদেরই আবার ৫ বছরের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া স্থির হল। ১৭৭২ সালের এই বন্দোবস্তই পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এতেও জমির উপরে স্থায়ী অধিকার না থাকায় জমিদারেরা জমির উন্নতির জন্যে কোনো ব্যবস্থা করতেন না। ইংরাজ সরকার—জমিদার বা অ-জমিদার সে যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন যে অধিকতর রাজস্ব দিতে সম্মত হত, তাকেই জমির অধিকার দিতেন বলে জমিদারেরাও প্রজাদের কাছ থেকে ক্রমশ অধিকতর খাজনা আদায় করতেন। এইসব অসুবিধার জন্যে কোর্ট অফ ডিরেক্টর জমিদারদের সঙ্গে কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দেয়। ফলে ১৭৯০ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারী দশসালা (Decemial Setlement) বন্দোবস্তের ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয়। ১৭৯৩ সালে ২২শে মার্চ-এর একটি ঘোষণায় এই দশসালা বন্দোবস্তকে পরিবর্তিত করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারেরা কোম্পানীকে তার প্রাপ্য রাজস্ব দিতে পারলে চিরকালের জন্যে জমির অধিকারী হয়ে থাকতেন। ইংরেজরা আশা করেছিলেন জমির স্থায়ী অধিকার লাভ করার ফলে জমিদাররা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও কৃষকদের মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করবেন। কিন্তু দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যত দেখা গেল জমির স্থায়ী মালিকানা লাভ করার ফলে তাঁরা আরো স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের হার খুব বেশী হওয়ার ফলে অনেক সময় জমিদারেরা ইচ্ছা থাকলেও দরিদ্র প্রজা বা রায়তের খাজনা মকুব করতে পারতেন না। জমির উপরে জমিদারের অধিকার স্থায়ী ছিল, কিন্তু জমির সঙ্গে রায়তের কোন স্থায়ী সম্পর্ক ছিল না। ফলে যে রায়ত অধিক খাজনা দিতে পারত জমিদার তাকেই জমি চাষের অধিকার দিতেন, এবং দরিদ্র প্রজাকে অনেক সময় মামুলি কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতেন। এইসব কারণে প্রজারা সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকত এবং জমিদারের অত্যাচারের কোনো প্রতিবাদ করতে পারত না। জমিদার কর্তৃক বঙ্গদেশের কৃষকদের এই নির্যাতনের পটভূমিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন।

জমির উপরে স্থায়ী অধিকার লাভ করে জমিদারেরা যে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন, তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতারা অনুমান করেছিলেন। তাই এই আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছে, It being the duty of ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor in Council as he may deem it proper, enact such regulating as he may think necessary for the Protection and Welfare of the dependent taluqdars, raiyats and other cultivators of soil......

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদের উপরে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে এই ধারার অনুসরণে লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আইন বা Rent Act পাশ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে একেই 'দশ আইন' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই আইনেব ফলে অন্যাযভাবে বাযতদেব খাজনা বৃদ্ধি বা সামান্য কাবণে জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ হল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন এই আইন প্রজাস্বার্থে প্রণীত হলেও বিচাব-ব্যবস্থাব নানান ক্রটিব জন্যে কার্যত প্রজাবা এব সুফল ভোগ কবতে পাবে নি। প্রজাস্বার্থে প্রণীত এই আইন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু এবও পবে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাস্বার্থে আব একটি আইন প্রণীত হয Tenancy Act বা প্রজাস্বত্ব আইন।

এই আইনে জমি থেকে প্রজাদেব উচ্ছেদেব ব্যাপাবে কঠোবতব বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হয। প্রমথ চৌধুবীব 'বাযতেব কথা'য এই আইনেব উল্লেখ আছে। এ আইনও যে প্রজাদেব বিশেষ উপকাবে আসেনি তাব প্রমাণ প্রমথ চৌধুবীব কথা থেকেই পাওযা যায– 'টেনান্সি অ্যাক্ট আজকেব দিনে জমিদাবেব হাতে সঙীন অস্ত্র। প্রজাকে হযবাণ কবতে চাও তো কবো উচ্ছেদেব মামলা, ঋণেব মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধিব নালিশ, ফসল ক্রোকেব দবখাস্ত মায ড্যামেজ বাকী, খাজনাব নালিশ, আব ভিটে মাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও তো কবো তাব নামে বাকী পড়া ও খাসদখলেব নালিশ।' (বাযতেব প্রোগ্রাম) বঙ্কিমেব আক্রমণেব প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংবাজ জমিদাব, বুদ্ধিজীবী ও চিবস্থাযী বন্দোবস্ত। প্রমথ চৌধুবী আক্রমণ কবেন, পার্টিশন, উকিল ও টেনান্সি অ্যাক্ট। বাযতেব কথাব 'প্রাণেব পবিচয' অংশে প্রমথ চৌধুবী বিহাবেব বাযতদেব একটি দাবী সমর্থন কবে ছিলেন যে জোত জমিদাবেব বিনা অনুমতিতেই প্রজাব হস্তান্তব কববাব অধিকাব থাকবে। ১৯২৮ সালে বাযতেব নিজস্ব স্বত্ব বিক্রযেব অধিকাব তাকে দেওযা হয। অবশ্য বিক্রযলব্ধ অর্থ থেকে এক পঞ্চমাংশ হস্তান্তব ফি স্বরূপ জমিদাবকে দেবাব ব্যবস্থা কবা হয। এব দশ বছব পবে আবাব হস্তান্তব ফি দেওযা প্রথা তুলে দেওযা হয। সবশেষে ১৯৫৩ সালে West Bengal Estates Acquisition আইন পাশ কবে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত এবং জমিদাবী প্রথাব বিলোপ সাধন কবা হয। ইতঃপূর্বে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে Floud Commission চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব বিলোপেব জন্যে প্রস্তাব কবেছিলেন। ১৯৫৪ সালেব আইনেব ফলে বাযতেবা সোজাসুজি সবকাবেব কাছ থেকে জমি নেবেন এবং সবকাবকেই খাজনা দেবেন স্থিব হয। ১৯৫৫ সালে West Bengal Land Reforms আইন পাশ হয। এই আইনেব দ্বাবা প্রজাদেব অধিকাব বক্ষাব জন্য এবং মুষ্টিমেয ব্যক্তিব হাতে যাতে মাত্রাতিবিক্ত জমি না থাকে (To prevent accumulation of lands in few hand) তাব জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয।

বাংলাব ভূমিব্যবস্থা এমনি কবে ক্রমিক সংস্কাবেব মধ্য দিযে বিবর্তিত হযেছে। এই সংস্কাবেব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কাবক ও সাহিত্যিকেব ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাজা বামমোহন বায ব্রিটিশ পার্লামেন্টেব কাছে এমন ব্যবস্থা দাবী কবেন যাতে প্রজাব জোত মৌবসী ও মোকববী হয অর্থাৎ জমিবৃদ্ধিব অধিকাব জমিদাবেব না থাকে। তাবপব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, লালবিহাবী দে, বমেশচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ শবৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুবী প্রভৃতি লেখকেবা বিভিন্নভাবে বাংলাব কৃষকদেব দুববস্থাব কথা তুলে ধবেন এবং পবোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে তাদেব অবস্থাব উন্নতি সাধনেব জন্যে ভূমিব্যবস্থাব পবিবর্তন

ও নতুনতর আইন প্রণয়নের দাবী করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' এই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ধাপে ধাপে কৃষকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'জমিদার', 'প্রাকৃতির নিয়ম' এবং 'আইন' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ আমলে দেশের বহুকথিত আপাত সমৃদ্ধির কথা আলোচনা করে এ সম্পর্কে আমাদের মোহভঙ্গ করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রগতির ফলে দেশে যে আধুনিক সভ্যতার উপযোগী সুযোগ সুবিধার সূচনা হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন হল "— কাহার এতে মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে; উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাত্তরে রাঙ্গা রাঙ্গা ভাত, নুন লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে গোয়ালের একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না।" বঙ্কিমচন্দ্র নির্মোহ দৃষ্টিতে আলোচনা করে দেখিয়েছেন দেশের ধনী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কিছু সমৃদ্ধি হয়ে থাকলেও সাধারণ শ্রমজীবী কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ এরাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাঁর যুক্তি হল ব্রিটিশের সুশাসনে দেশে প্রজাবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যবৃদ্ধি হয়েছে। এই দুই কারণে অধিকতর ভূমিতে চাষ হচ্ছে এবং সামগ্রিক ভাবে দেশের কৃষিজাত সম্পদও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত সম্পদের জন্যে অধিকতর অর্থলাভ করছে, একথাও সত্য। কিন্তু এই টাকা কার্যত কৃষকেরা পায় না। কর বৃদ্ধির ফলে এর কিছু অংশ ব্রিটিশ সরকারের ঘরে চলে যায়। কিছু অংশ আবার মহাজন ও বণিক শ্রেণী পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে। জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে জমিদারেরাও প্রজাদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান খাজনা আদায় করেন। তাই "সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই।"

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারও বর্ণনা করেছেন। এই অংশে মূল প্রতিপাদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে— "জীবের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী।" অবশ্য এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিশেষ বক্তব্য' হল : "আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমিদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন জমিদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি মিথ্যাবাদী। অনেক জমিদার সদাশয়, প্রজাবৎসল এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে প্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতগুলি জমিদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।"

সংবৎসরের চাষের খরচ কুলিয়ে এবং মহাজনদের দেনা শোধ করে শেষে কৃষকদের হাতে

যে অর্থ থাকে তার মোটা অংশ জমিদারের কর্মচারিরা খাজনা হিসাবে আদায় করে। হিসাবে জাল্লিয়াতি করে ন্যায্য খাজনার অতিরিক্ত মিথ্যা খাজনা, বকেয়া খাজনার সুদ, কর্মচারীর হিসাব ও পার্বণী বাবদ যা আদায় করে নেয় তার পরে আর কৃষকের হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। এছাড়া জমিদারের নববর্ষের পুণ্যাহের দিনে 'নজর', জমিদারের বংশধরদের বিবাহ বা অন্নপ্রাশনের 'মাঙ্গল', জমিদারের 'সেলামি' দিতে হবে। না দিতে পারলে আদালতের পেয়াদার সাহায্যে ('ক্রোক সহায়তা') জমিদার কৃষকদের সব ফসল কেটে নিজের ঘরে তোলেন। এর প্রতিবাদে যদি জমিদারের বিরুদ্ধে সে মামলা করে তবে টাকার জোরে আইনের খেলায় জমিদারই জেতেন। তখন নিঃস্ব কৃষককে মামলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তখন সে জমি বিক্রি করবে, না হয় জেলে যাবে না হয় দেশত্যাগ করবে। এমনি করে জমিদারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণে বঙ্গদেশের কৃষকেরা সর্ব শেষে সর্বস্ব হারিয়ে জমিহীন গৃহহীন হয়েছে। এই শোষণ ছাড়াও জমিদারেরা প্রজাদের উপরে দৈহিক অত্যাচারও করেছে। প্রজাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা নিত্য ব্যাপার।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, "বঙ্গদেশেব কৃষকদের দুর্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অবনতি ধাবাবাহিক।" এবং এই অবনতির মূলে আছে দেশেব জলবায়ুর প্রাকৃতিক নিয়ম। সমাজের মধ্যে একটি শ্রেণী যদি পরিশ্রম করে কিছু উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চয় করে তবে তারই দ্বারা সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রতিপালিত হয়ে জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন হতে পারে এবং তাদের জ্ঞান সাধনার দ্বাবা সভ্যতার অগ্রগতি হয়। আবার এই উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চয়ের মূলে আছে দুটি প্রাকৃতিক নিয়ম—ভূমিব উর্বরতা ও দেশেব নাতিশীতোষ্ণতা। উষ্ণদেশে উদ্ভিজ্জ খাদ্য সুলভ অথচ উষ্ণদেশেব লোকের খাদ্য চাহিদা কম। ফলে ধন সঞ্চয় হয়। ভারতবর্ষে এই দুই কারণে প্রাচীনকাল থেকে শ্রমজীবী কৃষকেরা যে উদ্বৃত্ত সম্পদ উৎপাদন কবেছে তার ফলে বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানচর্চায় আত্মনিযোগ করতে পেবেছে। কিন্তু এর ফলে ভারতে যেমন সভ্যতার বিকাশ হয়েছে তেমনি শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে—এর ফলে একশ্রেণী শ্রম করে, অন্যশ্রেণী বুদ্ধিবলে তার শ্রমের সুফল ভোগ করে। একভাগ তাদের শ্রমের ফলস্বরূপ যা পায় তাকে 'মজুরীর বেতন' এবং অন্যভাগ বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে বিনা শ্রমে যে ফল ভোগ করে তাকে 'মুনাফা' বলা যায়। ক্রমে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথচ সামগ্রিক সম্পদ তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় না, ফলে শ্রমজীবীব বেতন কমতে থাকে—এতে তারা দবিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। এদেশের উষ্ণ জলবায়ুতে পোষাকের বাহুল্য নেই এবং স্বল্প আহাবে জীবনধারণ করা যায় বলে প্রজাবৃদ্ধি নিরোধের কোনো চেষ্টাও ছিলনা।

শ্রমজীবীদের এই অবনতির ত্রিবিধ ফল দেখা গেল—

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা অর্থাৎ দারিদ্র্য। দ্বিতীয় ফল বেতনের অল্পতাকে পুষিয়ে নেবার জন্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং তার ফলে শ্রমজীবীদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার জন্যে সময়ের অভাব ও পরিণামে মূর্খতা। তৃতীয় ফল তাদের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে তাদের ওপরে বুদ্ধিজীবী ও ধনীশ্রেণীর প্রভুত্ব। এর ফল শ্রমজীবীদের মধ্যে দাসত্ব।

সুতরাং প্রাকৃতিক কারণেই ক্রমে ক্রমে শ্রমজীবীদের মধ্যে দারিদ্র্য মূর্খতা ও দাসত্ব

দেখা দিল। আর এই সকল ফল একবার দেখা দিলে ভারতবর্ষের জলবায়ুতে প্রাকৃতিক নিয়মেই স্থায়িত্ব লাভ করে। কারণ এখানকার উষ্ণ জলবায়ুর জন্যে লোকের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রমের শক্তি কম। উপরন্তু এখনকার উর্বর ভূমির আনুকূল্য পেয়ে প্রথমাবধি পার্থিব জীবনের জন্যে সংগ্রামের বদলে পরলোক-চর্চার জন্যে জীবন-বিমুখতা দেখা যায়। এই জীবন-বিমুখতা ও সহজাত বৈরাগ্য এ দেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা বদলাবার কোন প্রেরণা দেয়নি।

আবার শ্রমজীবী শূদ্রদের দুরবস্থার ফলে সমাজের নীচের তলার বুনিয়াদই দুর্বল হয়ে গেল ফলে বৈশ্যের বাণিজ্য, ক্ষত্রিয়ের তেজ, ব্রাহ্মণের বিদ্যা সবই হ্রাস পেল।

এই বিশ্লেষণের পর প্রবন্ধের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন—দেশের কৃষকদের দুরবস্থার মূলে শুধু জমিদারের অত্যাচার এবং শুধু প্রাকৃতিক নিয়মই নেই, আছে শাসক কর্তৃপক্ষেরও দুর্বলতা। শাসক কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে পারেন এবং উপযুক্ত সংস্কার প্রবর্তন করে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবও এড়াতে পারেন। কিন্তু তৎকালীন ইংরাজ শাসকেরা তা করেননি। উপরন্তু এমন আইন করেছেন যার ফলে জমিদার নামক মধ্যস্বত্বভোগীদেরই ধনবৃদ্ধি হয়েছে এবং তাদেরই স্বার্থ-সংরক্ষিত হয়েছে। আগেই বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারী প্রথার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আমলে প্রজারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ সোজাসুজি রাজাকেই করস্বরূপ দিত—কোনো মধ্যস্বত্ব ভোগীর প্রয়োজন ছিল না। মধ্যযুগে মুসলমান আমলে মুসলমান রাজাদের দ্বারাই জমিদারের সৃষ্টি হল। মুসলমান রাজারা রাজ্য শাসনে অক্ষম ছিলেন, প্রজাদের সঙ্গে সোজাসুজি সংযোগ বজায় রাখতে পারতেন না। যাঁরা রাজার রাজস্ব সংগ্রহ করে দেবেন, তার অতিরিক্ত যা সংগ্রহ করবেন, সেটা তাঁদের নিজেদের লাভ। এমনি করে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। তারপরে ইংরাজ শাসকেরা এসে মনে করলেন এই কর সংগ্রাহকের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জমির স্থায়ী সম্পর্ক নেই বলে তারা জমির উন্নতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু কর আদায়ের দিকে মন দেন। এইজন্যে তারা কর্ণওয়ালিশের আমলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারের সঙ্গে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন। এতে বঙ্গদেশের কৃষকের কোন লাভ না হয়ে ক্ষতি হল বেশি। জমির মালিকানা কৃষকদের হাত থেকে জমিদারের হাতে চলে গেল। জমিদারেরা হলেন মালিক। ফলে স্বেচ্ছাচারের আরো সুযোগ মিলল। এতে প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ বেড়ে যেতে লাগল। অথচ সরকার জমিদারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পেয়ে সন্তুষ্ট রইলেন। ফলে অবিরত শোষণের লোভ জমিদারের মধ্যে আত্মপুষ্টির সুযোগ পেল। অথচ উচ্ছেদের ভয়ে প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস পেত না। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হয়ে রইল। এইজন্যে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। প্রজাওয়ারী বন্দোবস্ত হইলে, দুই চারিজন অতিধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয়কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম।"

৩. বাংলা প্রবন্ধ ও জাতীয় সংহতি

ভারতের জাতীয় সংহতির সমস্যাটি খুবই জটিল এবং এখানকার জাতীয় ঐক্যের বন্ধনসূত্রটি খুবই অস্পষ্ট। একথা বহুকাল আগেই এদেশের বাঙালীর মনীষায় ধরা পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের ঐক্য-সূত্রটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিহ্বল হয়ে অনুভব করেছিলেন এদেশে এমন কোনো একটি মাত্র ঐক্যসূত্র নেই যার দ্বারা সর্বভারতীয় জাতীয়তাকে গ্রথিত করতে পারা যায়।

"এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি, বাঙ্গালি বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি। মৈথিল কনোজী একভাষী হইলে নিবাস ভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক, যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই।"[১]

ভারতবর্ষের এই জটিল পরিস্থিতি মনে রেখেই জাতীয় সংহতি ও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রসঙ্গটি আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে তুলনায় প্রবন্ধের শিল্পরূপের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি শিল্পকলায় লেখকের বক্তব্য অনেকসময় পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধে লেখক তার বক্তব্যকে অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষভাবে ও সোজাসুজি পেশ করতে পারেন। জাতীয় সংহতির সমস্যাটি তাই বাংলা প্রবন্ধে অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েছে। তবে এদেশে জাতীয়তা ও জাতীয় সংহতির ধারণাটি জাতীয় চিন্তানায়কদের চেতনায় প্রথমেই সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয় নি। পাশ্চাত্য ন্যাশন্যালিজমের বোধটি যত প্রভাব বিস্তার করেছে, এদেশীয় মনীষীরা ততই ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছেন। এই চেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধের ধারায় জাতীয় সংহতির বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতের জাতীয় সংহতির নানা সমস্যা—ভাষাগত বৈচিত্র্য, ধর্মগত পার্থক্য, প্রাদেশিকতা এবং আরো সূক্ষ্ম বিচারে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি। বাংলা প্রবন্ধের ধারায় আমরা দেখতে পাই এইসব সমস্যার এক একটি দিক, এক এক জন প্রাবন্ধিকের চেতনায় ধরা পড়েছে, কেউ বা একাধিক দিকও ধরতে পেরেছেন। বাংলা প্রবন্ধের ধারা অনুসরণ করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে বাংলা

১। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্কিম রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ, ২য় খণ্ড, ১৩৮০, পৃ ২৪০।

গদ্যের প্রথম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার খুব উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আচার আচরণ নিষ্ঠা থেকে আধ্যাত্মিকতাকে মুক্তি দিতে পারেন নি। ধর্মের আচার আচরণ ও বিধিবিধানের মধ্য থেকেই ধর্মোপাসনার পক্ষপাতী তিনি। কিন্তু তিনিও পর-ধর্মকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলেন নি। পরধর্ম সম্পর্কে আক্রমণাত্মক মনোভাবও প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেন—"যার যে শাস্ত্র যে শাস্ত্রেতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয় অন্যথা ইঙ্রাজেরা স্ব স্ব শাস্ত্রানুসারে জপ পূজাদি দ্বারা ও রোজা নমাজাদি দ্বারা ও গিরিজাদি দ্বারা উপাসনা করে, অন্যথা কেহ করে না, যদি করে তবে সে ঈশ্বরোপাসনা হয় না, কেবল উৎপাত হয়"[২] যে যুগের সর্বধর্মের সাধন পদ্ধতির এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আধুনিক কালে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার যথেষ্ট প্রগতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বিশেষ ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারিনি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড় শ'বছরেরও আগে রামমোহন এই সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে লিখেছিলেন, "বস্তুত পরমেশ্বরের উপাসনাতে মসজিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোনো বিশেষ নাই, যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক"[৩] এই যে মন্দির মসজিদ গির্জার গণ্ডির বাইরে তিনি ধর্মচেতনাকে মুক্তি দিলেন, এতে জাতীয় সংহতির পক্ষে প্রথম গঠনমূলক চেতনার বীজ তিনি উপ্ত করলেন। রামমোহন তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে কুসংস্কার মুক্ত যুক্তিপ্রতিষ্ঠ যে নব্যধর্মের ব্যাখ্যান করেছিলেন, তাতে ধর্মের গণ্ডি লঙ্ঘন করে বৃহত্তর পটভূমিকায় ভারতাত্মার বাণী উপলব্ধির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। যে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী তার মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি সংহতি সাধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর ধর্মের প্রসঙ্গে আসেন নি, কিন্তু সংহতির আর একটি দিক তিনি স্পর্শ করে গেছেন। ভাষাগত বিরোধ দূর করার জন্যে ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রয়োজন। একথা আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, যিনি খাঁটি বাঙালি এবং যাঁকে সংস্কৃত-পণ্ডিত বলে আমরা জানি সেই বিদ্যাসাগর গণসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে বাংলার উপযোগিতা যেমন স্বীকার করেছেন তেমনি স্বীকার করেছেন অন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার গুরুত্ব। অন্যভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধটিই লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠের উপযোগিতা আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছেন, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তাবৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।[৪]

ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ভারতের সংহতির অন্যতম প্রতিবন্ধক। সুতরাং যাঁরা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা দূর করে, সর্বধর্ম সমন্বয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং ধর্মকে যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত

২। বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয় : 'বেদান্ত চন্দ্রিকা', কলিকাতা, ১৮১৭ পৃ. ৫৩-৫৪।

৩। রায়, রাজা রামমোহন : রামমোহন গ্রন্থাবলী (ভট্টাচার্যোব সাহিত্য বিচাব বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ, পৃ ১৮১-৮১

৪। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র · সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব বাংলা প্রবন্ধ সঙ্কলন, পৃ ৫৯।

করেছিলেন, তাঁরা জাতীয় সংহতির বাধাগুলি দূরীকরণে সহায়তা করেছিলেন। এদিক থেকে প্রথমেই আমরা রামমোহনের ভূমিকা স্মরণ করেছি। তারপরে যাঁরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীকে নিজের জীবনে রূপায়িত করেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ কোনো কোনো প্রাবন্ধিকের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে যে 'নববিধান' প্রচার করেন তাতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীই ধরা পড়েছে। ১২৮০ সালে ৫ই চৈত্র 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় কেশবচন্দ্র 'ভারতবাসীদিগের একতার উপায়' প্রবন্ধে ভারতের জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধক দু'টি মূল কারণ আবিষ্কার করেছিলেন ভাষাগত বিভেদ ও ধর্মগত বিভেদ। এর সমাধান দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"ভারতবর্ষে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের উপাসনা এবং একভাষা প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষ সকলপ্রকার অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে।"

বাঙ্গালী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সচেতনভাবে জাতীয়তার চেতনা সঞ্চার ও জাতীয় ঐক্যর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমর্থক ও আচার নিষ্ঠ হিন্দু বাঙালী ছিলেন বলে ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা গণ্ডিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় তাঁর মধ্যে আবার সর্বভাবতীয় জাতীয়তার চেতনা সচেতনভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। নিজে বাঙালী হলেও তিনি সর্বভারতীয় ভাববিনিময় ও সংহতির মাধ্যম হিসাবে হিন্দীভাষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর খানিকটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। সামাজিক প্রবন্ধে (১৩০২) তিনি লিখেছিলেন—"বিদ্যাচর্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহুপরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিতভাষায় মিলিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষাসকল একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে ইহা সমস্ত মহাদেশে ব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।"[৫] 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব মুখোপাধ্যায় জাতীয় সংহতির এই কয়েকটি সূত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন—"(১) আকার এবং রূপ—সাদৃশ্য, (২) ধর্ম এবং আচার—সাদৃশ্য, (৩) ভাষা এবং উচ্চারণ—সাদৃশ্য, (৪) রাজশাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য" এবং এই প্রতিটি বিষয়ে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে আপাত পার্থক্যের অন্তরালে তিনি একটি গভীর ও ক্রমবর্ধমান সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বভারতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রও ভারতবর্ষের সংহতি ও ঐক্যের বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। কখনো কখনো ভারতবর্ষের গৌরব ও সংহতির সঙ্গে হিন্দুর গৌরব ও সংহতিকে তিনি একাকার করে ফেলেছেন—এবং ভারতীয় মহাজাতিক ঐক্যের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়কে সচেতনভাবে আনেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ যে ঐক্যের অভাব একথা তিনিও উপলব্ধি করে ছিলেন। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে

৫। মুখোপাধ্যায়, ভূদেব · 'সামাজিক প্রবন্ধ'।

বঙ্কিম লিখেছেন—"হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব।"[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র একথা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতবর্ষে ক্রমে নানা জাতি ও নানা ধর্মের সংমিশ্রণ হয়েছে 'হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?" এ অবস্থায় হিন্দুত্বের বন্ধন আর সংহতির সূত্র রূপে কাজ করতে পারে না। তখন আধুনিক নেশন্যালিজমের চেতনাই সে সংহতি সাধন করতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তাও উপলব্ধি করেছেন। আর এই চেতনা যে নবযুগের আগে আমাদের দেশে জন্মলাভ করেনি একথাও বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছেন—"স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।" আর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন—"এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন আধুনিক ভারতের নানাধর্ম নানাভাষা ও নানাজাতির মধ্যে ঐক্যের উপায় হল আধুনিক Nationalism-এব চেতনা গড়ে তোলা।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এর উপরে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় একটি সহজাত ঐক্যের অন্তর্নিহিত প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সন্ধানের স্বতঃউৎসারিত প্রবণতাতেই রবীন্দ্রনাথ ভারতইতিহাসের সার্থকতা দেখেছেন। তিনি লিখেছেন "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার সুষ্ঠু উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[৭]

ভারতবর্ষের বিচিত্র ধর্ম, জাতি ও ভাষার মধ্যে ঐক্য ও সংহতির যে প্রবণতা তা স্বতঃউৎসারিত সামাজিক--সংস্কৃতির প্রবণতা, তা শাসনযন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করে পলিটিক্যাল ইউনিটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেই। রবীন্দ্রনাথ এইখানে পাশ্চাত্য দেশের জাতীয় সংহতির সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির পার্থক্য দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। জাতীয় সংহতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন—

প্রথমত আমাদের জাতীয় সংহতি যেন আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের উগ্রতা লাভ না করে। কারণ একথা ভুললে চলবে না যে মানবতার শুভ মঙ্গল সূত্রেই যে কোনো ঐক্যের বন্ধনে স্থায়ী মিলনে পরিণত হয়। মানবতার সীমা লঙ্ঘন করে যে জাতীয়তা একদা বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছিলো তা বিশ্বেরই আমোঘবিধানে আত্মধ্বংস ডেকে আনে।

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের আরো মনে করিয়ে দিয়েছেন দেশের বিচিত্র জাতি উপজাতি ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করতে গিয়ে আমরা যেন পাশ্চাত্য দেশের মতো রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তিপ্রয়োগ করে সকলকে যান্ত্রিকভাবে জোর করে একতাবদ্ধ করতে না যাই, তা যদি করি তাহলে সেই ঐক্যের প্রাসাদ চোরাবালির উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, যে

৬। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধ' 'ভারত কলঙ্ক'।

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষ', (ভারতবর্ষের ইতিহাস) রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সং পৃ. ৩৮০।

কোনো সময় যে স্বপ্ন ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়তে বাধ্য। মহামানবের সাগরতীর্থ ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতের ঐক্যের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি তাঁর ভাষাতেই তুলে দিই—'য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায়-প্রজায়, ধনীতে-দরিদ্রে, বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে, তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল—যাহাতে কোনো পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

এইরূপে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই সকল বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনো মতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গর্ভনমেন্ট কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে।

যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না।"[৮]

রবীন্দ্রসমকালে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সংহতির আরো এক গভীর দিক উদঘাটন করেছেন। নব্যভারতের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের যে বীরবাণী "হে ভারত,.......ভুলিও না নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই"[৯] তাতেও ভারতের জাতীয় সংহতির উদাত্ত আহ্বান আছে। এই সংহতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সংহতি নয়, ভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে সংহতি নয়, এ সংহতি একই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংহতি, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংহতি। এ সংহতি অনেক বেশী সূক্ষ্ম, অনেক গভীর ও একান্ত মানবতাবাদী। এই সংহতির অভাবে জাতি বাহ্যিক ছিন্নভিন্ন নাও হতে পারে, কিন্তু এই সংহতির অভাবে জাতি দুর্বল হয়, মানবতা বিপন্ন হয়। শুধু ধর্মে ধর্মে বিরোধ, কিংবা ভাষায় ভাষায় বিরোধ জাতীর সংহতি নষ্ট করে না। একই সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ প্রচ্ছন্ন রোগের মত জাতির শক্তিকে দুর্বল করে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন আগামী দিনের ভারতে এই শ্রেণী দ্বন্দ্বও আত্মঘাতী শক্তি হয়ে উঠবে, অন্তরে অন্তরে জাতীয় সংহতি নষ্ট করবে।

পরবর্তী কালে বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা' (১৯২০), 'জাতিগঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরে' (১৯২১) প্রবন্ধে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতিবন্ধকগুলি সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা

৮। তদেব, পৃ ৩৮১-৮২

৯। স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত', ১৩০৭, পৃ ২৪৯।

করেছেন। 'জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— "জাতির গঠন ও বিকাশে এই জাতিভেদ অনেক পরিমাণে বাধা দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান নেই, তার উপর ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না— এই রব করতে করতে সকলেই এক একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।"[১০]

অন্যদিকে আবার কেউ কেউ জাতিভেদ প্রথার বৈজ্ঞানিকতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে জাতীয় সংহতির ক্ষতিসাধন করেছেন। এখানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'জাতিভেদ' (১৯১০) প্রবন্ধের কথা মনে আসে।

শরৎচন্দ্রও হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ সংহতি ও উন্নতি বিষয়ে বেশী ভাবিত ছিলেন। হিন্দুসমাজ নিজের মধ্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, আভ্যন্তরীণ কলহে দুর্বল হয়ে গেছে। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূর করে হিন্দুসমাজকে শক্তিতে, সংহতিতে প্রথমে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমান হতে হবে। তিনি তাই লিখেছিলেন— "হিন্দু-মুসলমান মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করা তাহার কাজ নহে, এবং যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র অদ্বিতীয় (কাজ) বলিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানোও তাহার কাজ নহে।" কারণ শরৎচন্দ্রের মতে—"মিলন হয় সমানে সমানে। .....হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে কি করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে কোনো ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাহাদের কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে।"[১১]

বলেন্দ্রনাথ তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ মন নিয়ে অনবদ্য চিত্রধর্মী বর্ণনারীতির মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজরীতি ও ধর্মীয় আচার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাতে হিন্দু সমাজের আচার আচরণের মাধুর্য ও মহিমা প্রকাশিত হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর চিত্তের ব্যাপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। 'মুসলমান দিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ', 'মুসলমান সমাজ' ও 'অনার্য ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি অন্যান্য ধর্মের আচার-আচরণের সঙ্গে তুলনায় হিন্দুদেব আচার-আচরণের মাধুর্য ও মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি লক্ষণীয়। 'গুজরাতেব গরবা' সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা পাওয়া যায়। তিনি ভিন্ন সমাজ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব আলোচনার পথ প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে সর্বভারতীয় সহমর্মিতা গড়ে তোলার জন্যে একটি পথের সন্ধান পেয়েছি আমরা তাঁর কাছ থেকে। প্রমথ চৌধুরী 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুমুসলমান' (১৯৫৩) প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্যের একটি দিক উদঘাটিত করেছেন। 'পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ' প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত রাজকুমার বিজুলি খাঁ যে ঐতিহাসিকতার প্রমাণ তিনি করেছেন তাতেও হিন্দু মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সামাজিক সম্মিলন সম্বন্ধে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

১০। রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : 'জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা', পৃ ১৮-১৯।

১১। চট্টোপাধ্যায়, শবৎচন্দ্র : 'বর্তমান মুসলিম সমস্যা' (১৩৩৩), 'শরৎবচনাবলী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৭৫।

বঙ্গসংস্কৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবদান এবং হিন্দুমুসলমানের সামাজিক ঐক্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আর ন্োব আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' (১৯৪০) স্মরণীয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ।'

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ এবং ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যে অধ্যয়নের একটা প্রেরণা দেখা যাচ্ছে। সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সহমর্মিতা ও সংহতির পক্ষে এই প্রবণতা খুবই আশার ইঙ্গিত বহন করে। এ বিষয়ে বাঙালীদের মধ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আধুনিক ভাষা বিভাগের সূত্রপাত করেন। তাঁর "জাতীয় সাহিত্য" (১৯৩২) গ্রন্থের 'ভাবতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আশুতোষের 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধের কিছুটা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত কবা যেতে পারে—"যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক—সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যে ক্রমে বর্দ্ধিত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই .... সুতরাং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগেরও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণ যোগ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষায় অন্তর্ভুক্ত কবিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পবে ভাবতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে—নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও একভাবে ভাবিত হইয়া ভাবত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে।"[১২]

স্যাব আশুতোষের সূত্র ধরে আমরা আলোচনার উপসংহারে বলতে পারি, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের তুলন মূলক অধ্যয়ন, ভাবতের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজীবন ও সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়নে এবং প্রাবন্ধিকদের সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। ভারতের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যগুলির মধ্যে যে কোনো দু'টি বা ততোধিক ভাষা ও সাহিত্যকে বেছে নিয়ে তাদের তুলনামূলক ইতিহাস রচনারও উপযোগিতা রয়েছে। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সমান্তরাল কীর্তির কিছু কিছু উল্লেখ করেছিলেন।

আমরা যদি পরিকল্পিত ভাবে এই ধারায় বিভিন্ন প্রদেশেব সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় ভারতের একাধিক প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যেব তুলনামূলক ইতিহাস রচনা রসোদঘাটনে এগিয়ে আসি তা হলে আমাদের আঞ্চলিকতার গণ্ডি প্রসারিত হবে সর্বভারতীয় জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের একটা উদার চেতনা ও সহমর্মিতা গড়ে উঠবে। এবং সেই চেতনাই হবে জাতীয় সংহতির আসল প্রতিষ্ঠাভূমি।

১২। মুখোপাধ্যায়, স্যাব আশুতোষ : 'জাতীয় সাহিত্য' (কলিকাতা, ১৯৪৯), পৃ ১৬।

৪. ধর্ম ও জাতীয় সংহতি

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ যাঁর অকৃত্রিম এবং আজকের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে সংহতির শক্তিতে যিনি আস্থাশীল, ভারতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মর্মপীড়িত এবং পরিণাম আত্মঘাতী ভেবে তিনি শঙ্কিতও। শক, হুন, পাঠান, মোগল ইত্যাদি নানা জাতির ধর্মের আগন্তককে প্রেমের ভিত্তিতে দেশবিভাগের প্রথম পদক্ষেপকে যেদিন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল সেদিনই আত্মহননের বিষবৃক্ষের বীজটি বোনা হয়েছিল। আজ সেই বিষবৃক্ষের বিষফল একটি একটি করে আপনা থেকেই পেকে যখন মাটিতে পড়ছে তখন সে ফলে ভারতের মাটি যে বিষিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় একটি বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছিল ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আজ ধর্মের নামে যেমন, তেমনি ভাষার নামে দেশকে নানাভাবে খণ্ডিত করার চেষ্টা চলছে, এসব আগেরই ভ্রান্ত পদক্ষেপের অপরিহার্য পরিণাম। যাঁরা ভাষা ও ধর্মের নামে অতিমাত্রিক উন্মাদনায় আত্মভ্রষ্ট তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নায়কের মতোই নিজের আসল সত্য ভুলে বাইরে থেকে আহৃত একটি ভ্রান্ত পরিচয় নিজের বলে বাড়াবাড়ি মাতামাতি করছেন। ধর্ম হল অন্তরের উপলব্ধির সাধন, পার্থিব বন্ধন থেকে দিব্যসত্যে উত্তরণের পথ। তাকে ভুল বোঝা হচ্ছে দুভাবে—প্রথমতঃ যা অন্তরের উপলব্ধির সাধন তাকে বাইরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে তাকে স্বক্ষেত্র থেকে ভ্রষ্ট করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত ধর্ম হচ্ছে পথ (means), লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান বা আত্মা বা সত্য। যা পথ, তাকে লক্ষ্যের (end) সঙ্গে এক করে ভ্রান্ত উত্তেজনার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্য দিকে ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বুঝিয়ে মানুষের মানবিক সত্যের উপরেও যেন তাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমরা ভুলে যাচ্ছি মাতৃভাষাও আমাদের জন্মসূত্রে মাতৃগর্ভ থেকে নিয়ে আমরা আসি না। মাতৃভাষা যাকে বলি তাও আমাদের জন্মের পরে পরিবেশ থেকে অর্জিত জিনিস। তাকে মানুষের মানবিক সত্যের উপরে স্থান দেওয়া যায় না। মাতৃভাষার নামে ভিন্নভাষীর প্রতি অমানবিক আচরণ করা যায় না।

যাই হোক, আমাদের ভুল বোঝার ফলে আজকের ভারতে প্রধানত ধর্ম ও ভাষাকে অবলম্বন করে জাতীয় সংহতি পরিপন্থী নানা প্রচেষ্টা দানা বেঁধে উঠেছে। এই দু'টির মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু ধর্মের প্রসঙ্গটি বিচার করবো। ধর্মের নামে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তাতে অনেকে ধর্মকেই দোষ দিচ্ছেন। কিছু কিছু জড়বাদী লোক আবার এই সুযোগে প্রচার করছেন—ধর্মই হচ্ছে নষ্টের গোড়া, অতএব ধর্মকে সমাজ থেকে বাদ দিতে হবে। ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের এই অভিযোগটি আগে আমরা বিচার করে দেখবো। আমাদের বিশ্বাস সব ধর্মেই—হিন্দু ধর্মের মতোই ইসলাম ধর্মে এবং খ্রীস্টীয় ধর্মেও—উদারতা ও মানব প্রেমের আদর্শ আছে, সর্বমানবিক আধ্যাত্মিক সত্যের ইঙ্গিত আছে। সেই বিশ্বাস মনে রেখেই আমরা আপাতত শুধু হিন্দু ধর্মকে অবলম্বন করেই বিচার করে দেখবো এই ধর্ম কতখানি উদার, কতখানি জাতীয় সংহতির সহায়ক। জড়বাদীদের যে

অভিযোগ সেই অভিযোগ, এখানে আদৌ প্রযোজ্য নয়। হিন্দুধর্মকে যদি ভুল না বোঝানো হয় এবং যদি ভুল না বোঝা হয়, উত্তেজনার জোয়ারে যদি না ভেসে শান্তচিত্তে এই ধর্মের আসল সত্যকে অধ্যয়ন ও সাধনার মাধ্যমে যদি উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রথম থেকেই এই ধর্মের সঙ্গে বাহ্য রাজনৈতিক উত্তেজনার কোনো যোগ ছিল না, ঋগ্বেদের যুগে ও ধর্ম ছিল এবং মূলত এখনো হচ্ছে একটি অন্তর্মুখীর (subjective) ও মরমিয়া (mystic) উপলব্ধির ধর্ম। বিশ্বের লীলাবিলাসে মূর্ত নানা শক্তিকে দেবদেবীরূপে উপাসনা করতে করতে সেই সব দেবদেবীর প্রতীকের মাধ্যমেই সীমা অতীত অসীম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন এবং দেখেছেন যে পরম সত্য একই, একই সত্য বহুরূপে মূর্ত। এককেই বিপণন বহুরূপে দেখেন –

'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। ১।১৬৭।৭৬

এই বহু বৈচিত্র্য প্রকাশকে একেরই প্রকাশ বলে ঘোষণা করা এখানেই উদারতার প্রথম পথনির্দেশ। কাউকে এখানে মিথ্যা বলা হচ্ছে না, সবই সত্য সবই একের প্রকাশ। হিন্দু ধর্মের আদি ধার্মিক গ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যেই এইভাবে যে বিচিত্রের অন্তরালে ঐক্যের উপলব্ধির কথা আছে তা শুধু ভারতীয় সংহতি নয় সমগ্র মানব সংহতিরই মন্ত্র। হিন্দু ধর্মের মূল সত্য জাতীয় সংহতির পরিপন্থী হতে পারে না।

ঋগ্বেদ যেমন হিন্দুধর্মের মূল উৎস গীতা তেমনি হিন্দু ধর্মের সার হিন্দুর বিচিত্র ধর্মসাধনার সমন্বিত মূর্তি। এই গীতাই এক অবরুদ্ধ উদার সমন্বয় চেতনার পথ দেখিয়েছে। সেখানে ভগবান নিজেই বলেছেন

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪।১১

যে আমাকে যেভাবে যে পথে আসতে চায় আমি তাকে সেই ভাবে সেই পথেই গ্রহণ করি। হে পার্থ সব দিক থেকে লোকে যা আমারই পথ অনুসরণ করে আসে।

প্রাচীন ভারতের পরে মধ্যযুগে বাংলার নবজাগরণ হয়েছিল যার দ্বারা সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন ছিল সমন্বয়ের ও সংহতির বাণীমূর্তি। বর্ণভেদে জাতভেদে বিচ্ছিন্ন বাঙালীর মধ্যে সংহতি সাধন করেছিলেন তিনি উদার হরিভক্তির আদর্শে। চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ --চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয় তবে সেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—এই আদর্শে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলের মধ্যে সংহতি সাধনের আদর্শ এখনো অপ্রয়োজনীয় হয় নি। যে ভারতবর্ষে এখনো হরিজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় সে ভারতবর্ষে মহাপ্রভুর সংহতির আদর্শ গৃহীত না হলে হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ সংহতি নষ্ট হবে। বর্ণভেদও জাতিকে দুর্বল করে একথা মনে রাখতে হবে। একথা মনে রেখেছিলেন বলেই মহাত্মা গান্ধী হরিজন প্রীতি ও স্বামী বিবেকানন্দ নর নারায়ণ সেবার আদর্শ প্রচার করে ছিলেন। চৈতন্যদেবের আদর্শ যেমন হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ সংহতি

স্থাপন করেছে তেমনি হিন্দুসমাজের বাইরে প্রেমের বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে। এর ফলে সেই প্রেমের বন্ধনে যবন হরিদাসও ধরা দিয়েছে।

মধ্যযুগে যেমন চৈতন্যদেব, আধুনিক যুগে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মীয় সাধনায় উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। 'যত মত তত পথ' তাঁর শুধু মুখের কথাই ছিল না। নিজের জীবনের সাধনাপথে তিনি শুধু হিন্দুদেরই বিভিন্ন প্রকার সাধন পদ্ধতিই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি, ঐস্লামিক সাধন পদ্ধতি ও খ্রীস্টীয় মিস্টিসিজমের সাধন মার্গও নিজের জীবনে অনুসরণ করে তার অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক জীবনে গান্ধীজী যেমন বলেছিলেন 'আমার জীবনই আমার বাণী', ধর্মীয় সমন্বয় সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি বলতে পারেন আমার নিজের জীবনই সাধন-সমুদ্রে মোহনার মতো, সব ধারাই সেখানে এসে মিলিত হয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষে তাঁর উদার সমন্বয়ী আদর্শের পবিত্র উত্তরাধিকার অনেকের মধ্যেই বর্তেছে। এই সমন্বয়ী ধর্মপ্রয়াস জাতীয় সংহতির পরিপন্থী তো নয়ই, জাতীয় সংহতির প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে গৃহীত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শ ও শ্রীঅরবিন্দের অতিমানবতা ও সমন্বয়ী পূর্ণযোগের আদর্শের মধ্যে উদারতা আছে, সংহতির সূত্র আছে। তাই শ্রীঅরবিন্দকেও বলতে শুনি— সব সত্যই নির্ভুল। এমনকি যেসব সত্য আমাদের মানবীয় বুদ্ধিতে পরস্পর বিরোধী মনে হয় তাও গভীরতর উপলব্ধিতে পরস্পর বিরোধী নয়। সকলকে এক বৃহত্তর সত্যে সমন্বিত করে নিতে হবে—

"All truths even those which seem to be in conflict have their validity, but they need a reconcilliation in some largest truth which takes them into itself."[১]

যে ধর্মীয় উদারতার কথা হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত বলা হল, যে কোনো ধর্মের গভীরতর মূল আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পৌঁছালে সেই ধর্মীয় উদারতা পাওয়া যাবে। যারা এই গভীর সত্যের উপলব্ধি পায় না, পেতে চায় না, তারাই তার বাইরের খোলস নিয়ে মারামারি করে, কাটাকাটি করে। ধর্মের উপলব্ধির নামে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে ধরে থাকে। ধর্মের নামে তাঁরা ধর্মের অপব্যবহার করে, ক্ষমতার লড়াই করে। যার সবচেয়ে কলঙ্কিত নিদর্শন হল মধ্যযুগের ইউরোপের ক্রুসেড বা তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ। ধর্মের নামে সেদিন যত মানুষের প্রাণনাশ হয়েছিল তত প্রাণনাশ মানবসমাজের ইতিহাসে সাধারণত চোখে পড়ে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে ধর্মের নামে ধর্মের অপব্যবহার যদি মানুষের দুষ্টু ইচ্ছা করে থাকে তবে তার জন্যে ধর্ম দায়ী নয়। আজকের দিনে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সবচেয়ে ভয়াবহ মারণাস্ত্র, কিন্তু তার জন্যে বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া যায় না, বিজ্ঞানকে আজকের দিনে জীবন থেকে বাদও দেওয়া যায় না। তেমনি ধর্মকে মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ভ্রান্ত পথে কাজে লাগালেও ধর্ম তার জন্যে দায়ী নয়। ধর্মকে জীবন থেকে বাদও দেওয়া যায় না। ধর্ম মানুষের মধ্যে মহত্তম মূল্যবোধ জাগরণ ও গভীরতম

১। Sri Aurobindo 'The Life Divine' New york, 1951, Chap I.

সূক্ষ্মতম উপলব্ধির মাধ্যম। আজকের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে ধর্মীয় সত্যের সমন্বয়ই বরং জাতীয় সংহতির ও প্রগতির সহায়ক, জাতীয় উন্নতির মানদণ্ড হবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মানুষের অশুভ বুদ্ধি যাতে বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার কাজে না লাগায় তার জন্যে মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির জাগরণ করতে হবে। তার মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধ (Value sense) ও মানবপ্রীতির উন্মেষ ঘটাতে হবে। একাজে সূক্ষ্ম শিল্প, মানবিকীবিদ্যা (Humanities) ও ধর্মের চর্চাই সহায়ক হবে। শুধু সতর্ক থাকতে হবে ধর্মের বাইরের খোলসকে ধর্মের বাহ্য সঙ্কীর্ণতাকে আমরা ধর্মের মূল কথা বলে ভুল না করি। তার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যেক ধর্মের যেসব তত্ত্বগুলি সর্বজনীন (universal), যে সাধনা সর্বমানবের প্রেমপ্রীতির উৎকর্ষ সাধন করে সেগুলিকে সঙ্কলিত করা। শ্রীঅরবিন্দ আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন ধর্মে যে নিষ্কর্ষ, তা হলো আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম (religion) থেকে তিনি আধ্যাত্মিকতাকে (spiritualism) পৃথক করে নিতে বলেছেন। ধর্মের-আচার সর্বস্ব সঙ্কীর্ণতাকে বাদ দিয়ে হিন্দু যোগ সাধনা , ইসলামের সুফিসাধনা, খ্রীস্ট ধর্মের মিস্টিসিজমের সাধনা অন্তর্মুখী সর্বমানবিক আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যাবে। একাজে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসই প্রথম কাম্য। আর শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের (Comparative Religion) পঠন-পাঠন ও গবেষণায় সরকার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব নিতে হবে। এর জন্যে উৎসাহ বর্ধক ব্যবস্থা (insentive) গ্রহণ কবতে হবে। এতে নিজের ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের পঠন-পাঠন ও চর্চার ফলে পর ধর্ম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা যত দূর হবে আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ততই প্রসারিত হবে এবং ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা দূর হবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পঠন-পাঠন ও গবেষণায় ধর্মগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের দিকটি তুলে ধরলে হবে না, সবসময় ধর্মের মধ্যে সর্বজনীন বিশ্বজনীন মূল্যবোধ ও অনুভূতি চর্চার যে সূত্র আছে, তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইভাবে ধর্ম জাতীয় সংহতির পরিপন্থী না হয়ে জাতীয় সংহতির সহায়ক হয়ে উঠবে।

৫. এ যুগের সমস্যা : একটি আত্যন্তিক সমাধান

জাতীয় জীবনের মগ্নচৈতন্যে যে একটি দুর্লক্ষ্য শক্তির ক্রিয়া চলেছে তাকে কোন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ধরবার চেষ্টা না করে যদি আমরা শুধুই তার উপরিতলের রূপ বিশ্লেষণ করি, তা হলে সহজেই মনে হবে—বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের জাতীয় জীবন এক বিস্ময়কর দ্বিধা-বিভক্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে; একদিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় জনজীবনকে এনেছে চরম বিপর্যয়ের মুখে, অন্যদিকে আগের শতাব্দীর নব জাগরণের উত্তরাধিকার উন্নতির সমুচ্চ শীর্ষ স্পর্শ করেছে। শুধুই বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে জাতির এই দ্বিমুখী পরিণামের অনেক ছবিই পরপর ভেসে উঠবে। মনে পড়বে —দীর্ঘকালের ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ফলে বিশ শতকে যখন জাতীয় জীবন প্রায় রক্তহীন হয়ে এসেছিল, তখনই আঘাত এসে লাগল দুটি বিশ্বযুদ্ধের। এই আঘাতে ক্রমিক-শোষণক্লিষ্ট জাতি যেন সামগ্রিক বিনষ্টির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। এর সঙ্গে ১৯১৮ ১৯ সাল থেকে ভারতে ক্রমে-ক্রমে শিল্পায়নের সূত্রপাত হওয়ায় জীবনে যান্ত্রিকতার প্রভাব, বস্তি-অঞ্চলের প্রসার সাধারণের অস্বাস্থ্য ও অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলে। তার উপরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও শিক্ষিত বেকারের সমস্যা বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই এতখানি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে তখনই 'সপ্রু কমিটি' গঠিত হয়। দারিদ্র্য ও অন্নাভাব ১৮৯৯-১৯০০ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। এই দুর্ভিক্ষের ভস্ম-তিলক মাথায় নিয়েই আমরা বর্তমান শতাব্দীতে পদার্পণ করি। তারপরে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, ১৯২০, ২৮ সালের দুর্ভিক্ষ এবং সকলের চেয়ে বড় ১৯৪৩ সালের কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর শুধু বৈষয়িক জীবন নয়, আমাদের সামাজিক এবং নৈতিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করে দেয়। এ ছাড়া কয়েক বছর অন্তর-অন্তরই বাংলা তথা ভারতের বুকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পৈশাচিক লীলা জনজীবনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। এইভাবে ব্রিটিশের শোষণ, দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, শিল্পায়ন ও যান্ত্রিকতা, ব্যাধি ও বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বিশ শতকের প্রথমার্ধে আমরা যেমন জর্জরিত, তেমনি অন্যদিকে এই দুর্দিনের মধ্যেই ভারতের জাতীয় আত্মা যেন মরিয়া হয়ে জেগে উঠে—১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে জাতীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে স্বদেশ আত্মার প্রাণমূর্তি শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব হয়। দেশপ্রেমের এই মহান্ সাধকের সাধনায় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে সঞ্চারিত হয় নবতর শক্তি। অগ্নিযুগের সেই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধ করে—কার সাধ্য? তারপর থেকেই বিভিন্ন পর্যায় ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত চলে এই জাতীয় আত্মারই মুক্তি-সাধনা। এ ছাড়া বিশ শতকের এই প্রথমার্ধের চরম দুর্দিনের মধ্যেও কৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিকাশ দেখা দেয়—বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র ও রমণ, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, এবং সর্বোপরি যোগে, দর্শনে, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্ব, কাব্য-সাহিত্যের নবতর দিগন্ত সন্ধানে শ্রীঅরবিন্দ এই বিকাশকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সংস্কার ও সম্প্রসারণ ছাড়াও নানা রকমের অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও লক্ষ্য করা যায়। আর এই পর্বে স্বাবলম্বনের জন্যে নারী-সমাজের জাগরণ ও আত্মসচেতনতা এবং ভারতের

বিভিন্ন স্থানে অবহেলিত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য জাগরণ-চিহ্ন বহন করে।

এইভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাসকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, এই সময় একদিকে যেমন দুঃখ-দারিদ্র্য-ভাঙনের মধ্যে আমরা কাটিয়েছি, তেমনি অন্যদিকে স্বদেশী জাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিল্পে-সাহিত্যে-বিজ্ঞানে নব-নব বিকাশও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে এও মনে হবে যে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা এক ভিন্নতর যুগে এসে পড়েছি। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে স্বদেশের সেবায় নিরহঙ্কার আত্মত্যাগের অগ্নিশিখাটি যেন নিভে যেত লাগল। এই শতকের প্রথমার্ধে স্বদেশিকতার সাধনা যাঁরা করেছিলেন, দ্বিতীয়ার্ধে এসে আমরা তাঁদের মহৎ উত্তরাধিকারকে ধারণ করার সামর্থ্য যেন হারাতে লাগলাম। শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় জীবনে যে দ্বিধাবিভক্ত ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেটিও আর রইল না। ভাঙনের পাশাপাশি সেই সাংগঠনিক প্রয়াস, শোষণের মুখোমুখি সেই মুক্তির সাধনা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে বিদেশীদের যে শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামীরা জীবন-পণ করেছিলেন, পরোক্ষভাবে আমরা আবার তারই কবলে চলে যাচ্ছি—এখন যেন শুধু এই অবক্ষয়, অপমৃত্যু, সামাজিক শৈথিল্য, রাজনৈতিক ক্ষমতাস্পৃহা, সাংস্কৃতিক অনুর্বরতা! এ জীবন যেন হয়ে উঠেছে শুধুই 'পোড়ো জমি'—'Waste Land' ! আর আমরা হয়ে উঠেছি 'ফাঁপা মানুষ'— 'Hollow Man'! আজকের দিনে সবচেয়ে ভয়াবহ অবক্ষয় দেখা দিয়েছে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। যেসব পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ (Value-sense) সুদীর্ঘকালের ভারতীয় জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে, তার আদর্শরূপ রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে দেখে রামায়ণ-মহাভারতকে ভারতের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের আদর্শ ইতিহাস বলে শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন "রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। ....ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের কতখানি, ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল, এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না; গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত।"[১] যেসব পারিবারিক-সামাজিক মূল্যবোধের চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিলো রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে, তা ভারতের পারিবারিক-সামাজিক কাঠামোকে ধরে রেখেছিলো। পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্রের চৌদ্দ বছর বনবাস গ্রহণ, লক্ষ্মণ ও ভরতের অগ্রজভক্তি, সীতা-সাবিত্রীর পাতিব্রাত্য, ভীষ্মের ত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি আদর্শগুলি আমাদের পারিবারিক সামাজিক জীবনের মধ্যে থেকে আজ ক্রমশ বিদায় গ্রহণ করছে। অন্ধ পিতামাতাকে কাঁধে বহন করে নিয়ে বেড়াত যে বালক শ্রবণকুমার (বা সিন্ধু) তার যে

১। 'রবীন্দ্র বচনাবলী', ৫ম খণ্ড, মূল বিশ্বভারতী সং, ১৩৬২, পৃ ৫০৫।

পিতৃভক্তির কাহিনী মহাত্মা গান্ধীর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলো, বিদ্যাসাগরের যে মাতৃভক্তি বাল্যকৈশোর থেকে আমাদের মূল্যবোধ গড়ে তুলতো, নানা কারণে তা আজ প্রায় কোনো আবেদনই সৃষ্টি করে না। বরং সন্তান কর্তৃক বৃদ্ধ পিতা-মাতার ওপরে চরম অত্যাচার-অবিচারের ঘটনাও যেন নিত্যকার ব্যাপার হয়ে উঠছে। আজ নিজের এই পত্র-কন্যার হাতে নিগৃহীত হয়ে নিজেরই তৈরী-করা বাড়ি থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন বৃদ্ধ পিতামাতারা! এরকম ঘটনার বিবরণ প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে। এখানে শুধু দু-একটা নিদর্শন একটি সংবাদপত্র থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি, শুধু ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম ইত্যাদির বদলে 'অ', 'আ', 'ক', 'খ' ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করেছি:

"বাড়ি লিখিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ বাবা ও মাকে সিঁড়ির নীচে নির্বাসন"

"**নিজস্ব সংবাদদাতা** : বৃদ্ধ বাবা-মাকে ভুল বুঝিয়ে ছেলে বসতবাড়ির দানপত্র লিখিয়ে নেয়। তারপরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে বাবা-মাকে সিঁড়ির নীচে থাকার হুকুম দেয় সে। সেই থেকে বাবা মা সিঁড়ির নীচে অন্ধকারেই বাস করছেন। মায়ের অভিযোগ, ছেলে আর ছেলের স্ত্রী বলেছে, এ-সব কথা অন্য কাউকে বললে মেরে ফেলবে। গোটা বাড়ি, বাবার টেলিফোন, গ্যাস-সিলিণ্ডার সহ সবই এখন তাদের দখলে। মা জানিয়েছেন, পুলিশকে জানিয়েও কিছু কাজ হয় নি। কাজ হয়নি বিধায়ক 'গ'-কে জানিয়েও। বিধায়ব বলেছিলেন থানায় অভিযোগ করুন। বৃদ্ধা মা-এব অভিযোগ শুনে ক্ষুব্ধ বিচারপতি 'ঘ' 'অমুক তারিখে' 'অমুক' থানার ও. সি. এবং 'ঙ' নামে ঐ ব্যক্তিকে 'অমুক আদালতে' সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

'অন্য একটি ঘটনায় এক বৃদ্ধ বাবার 'অমুক-সংখ্যক' ছেলে, 'অমুক-সংখ্যক' কন্যা ও 'অমুক-সংখ্যক' পুত্রবধূ। 'অমুক-স্থানে' বাবা 'অ' সকলকে নিয়ে একসঙ্গে থাকেন। এক রাতে বাড়ির সকলে বৃদ্ধের ঘরে চড়াও হয়। তাদের দাবি, তোমার কাছে যে টাকা আর গয়না আছে, তা আমাদের দিয়ে দাও। বাবা বলেন, আমার মৃত্যুর পরে আমার বাড়ি-জমি সবই তো তোরা পাবি। বড় ছেলে 'আ' বলে, তুমি মরলে কেন পাব? ওসব আমরা পেয়ে গিয়েছি, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি।

'অ' বাবু পরের দিন কোর্টে খোঁজ নিয়ে দেখেন, পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি জমা দিয়ে তাঁর সব সম্পত্তি ছেলেরা নিজেদের নামে করে নিয়েছে। পুলিশে ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন বাবা। গ্রেফতারি এড়াতে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ সকলেই 'আদালতে' আগাম জামিনের আবেদন করেন। আইনজীবী 'ই' জানান, বিচারপতি 'ঈ' ও বিচারপতি 'উ'-এর ডিভিশন বেঞ্চ বড় ছেলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। অন্যদেব শর্তাধীনে জামিন মঞ্জুর করেছে।

" 'ক' ও 'খ' হিন্দ মোটরের বাসিন্দা। নিজেদের বাড়ি। একমাত্র ছেলে 'ঙ'। ছেলে মা-বাবাকে বলে, তোমাদের আমি সারাজীবন দেখভাল করব। প্রতিমাসে ১০০০ টাকা হাতখরচ দেব। বলা যায় না, পরে কী হবে। তাই 'অমুক' কোর্টে তোমাদের নিয়ে গিয়ে আমি লিখিতভাবে এই কথা জানিয়ে দেব। ছেলের কথামতো তা-ই হয়। কোর্ট থেকে ফেরার পরেই ছেলে আর বৌমার হাবভাব বদলে যায়, ঘর থেকে বার করে দিয়ে বাবা-মাকে

সিঁড়ির নীচে থাকতে বলা হয়। কেটে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ। বাবার টেলিফোন নিয়ে নেয় ছেলে। বৌমা নিয়ে নেয় গ্যাস সিলিণ্ডার। মা কোনও প্রকারে একটি মামলার আবেদন করে নিজের হাতে লিখে পুলিশকে এইসব জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।"

ঘটনাগুলি পুরোপুরি সত্যি, কি পুরোপুরি মিথ্যে, কি আংশিক সত্যি, কি ভুল-বোঝা মাত্র—সেটা বিচার করবেন আদালত। আমাদের বক্তব্য —এ ঘটনা সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, এরকম ঘটনা নিত্য ঘটছে। কারণ নানা আর্থ-সামাজিক কারণে ও শিক্ষার দোষে আমাদের প্রথাগত আদর্শ ও মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আধুনিক সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই মানুষের হৃদয়বৃত্তি ক্রমশ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের অতিচর্চার ফলে। মানবিক অনুভূতি এবং পরিণামে মানবতাই ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—একথা বহুকাল পূর্বেই পাশ্চাত্যের মনীষীরাও উপলব্ধি করেছিলেন। জার্মান কবি ও নাট্যকার শিলার প্রায় দু'শ' বছর আগেই লিখেছিলেন—

"অতি পরিশীলিত উন্নত সামাজিক জীবনের একেবারে বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে মানুষের অহমিকা; আর সেখান থেকে সত্যিকারের সামাজিক অনুভূতিসম্পন্ন একটিও হৃদয়ের সন্ধান না পেয়ে আমরা আজ সব রকম সামাজিক ব্যাধি আর যন্ত্রণায় ভুগছি। আধুনিক সভ্যতার গর্বিত মানুষের নিজস্ব প্রাচুর্য পৃথিবীর মানুষের হৃদয়টাকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে। অথচ স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের মধ্যে এই হৃদয়টা এখনো যেন স্পন্দিত হয় । নগরে আগুন লাগলে লোকে যেমন তার যৎসামান্য সঞ্চয়টুকু নিয়ে পালায়, তেমনি সাধারণ মানুষ হৃদয়বৃত্তিটাকে বুকে করে আগলে রেখেছে। ....সভ্যতা আমাদের মুক্তি দিতে পারে নি, মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা, কার্যত আমাদের মধ্যে সে যত নতুন-নতুন শক্তি বিকশিত করে দিচ্ছে, ততই আমাদের মধ্যে নতুন-নতুন চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে। একটা জড়ের শৃঙ্খলে আমাদের এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিচ্ছে যে, তা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। তার ফলে আমাদের যা-কিছু আছে তাকে হারাবার ভয়ই আমাদের গ্রাস করে ফেলছে। সেটা আমাদের মধ্যে আমাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্যে যে জ্বলন্ত প্রেরণা রয়েছে তার শ্বাসরোধ করে আনছে। আর বিনা প্রতিবাদে অন্যায়কে মেনে নেবার বুলিই আজ পরম প্রজ্ঞার পরিচয় বলে গৃহীত হচ্ছে।"[২] আজকে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। আজকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওপরে অত্যাচার-অবহেলার ফলে বৃদ্ধাশ্রমের চাহিদা যেভাবে দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে তাতে রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন, ভারত

২। „Mitten im Schosse der raffiniertesten Geselligkeit hat der Egoism sein System gegründet, und ohne ein geselliges Herz mit heraus zu bringen, erfahren wir alle Ansteckungen und alle Drangsale der Gesellschaft. . Stolze Selbstgenügsamkeit zieht das Herz des Weltmanns zusammen, das in dem rohen Naturmenschen noch oft sympathetisch schlägt, und wie aus einer brennenden Stadt sucht jeder nur sein elendes Eigentum aus der Verwustung zu fluchten... Die Kultur, weit entfernt, uns in Freiheit zu setzen, entwickelt mit jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues Bedürfnis; die Bande des Physischen schnuren sich immer beängstigender zu, so dass die Furcht, zu verlieren, selbst den feurigen Trieb nach Verbesserung erstickt und die Maxime des leidenden Gehorsams für die hochste Weisheit des Lebens gilt. " Schiller, Friedrich . Über die Ästhetische Erziehung des Menschen' Fünfter Brief.

সেবাশ্রম সংঘ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি এবং শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন কেন্দ্র ও শাখা, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সম্মানিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO), যদি তাঁদের আদর্শের অনুকূল হয়, তবে অন্তত তাঁদের অনুরাগী ও ভক্ত-শিষ্যদের জন্যে বৃদ্ধাশ্রমের ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা করতে পারেন; যদি করেন তাহলে সেটা খুবই যুগোপযোগী কাজ হবে বলে অনেকে মনে করেন। তেমনি পিয়ারলেস, এল. আই. সি. প্রভৃতি বড়ো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে যদি এগিয়ে আসেন তা হলে একাধারে লাভজনক ব্যবসা ও সমাজসেবার কাজ হবে আশা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন, ভোলানন্দ গিরি ও স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির শিষ্যবৃন্দ ও বিড়লা-গোষ্ঠী কিছু প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আরো কোনো কোনো উৎসাহী ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে আরও এমন কিছু বৃদ্ধাবাস নির্মাণ করেছেন। আসল কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে পুরোনো পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে, মূল্যবোধহীন, মানবিকতাহীন যান্ত্রিক প্রগতিমূলক শিক্ষার প্রসার ও অন্যান্য কারণে পুরোনো মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাভক্তি, ভালোবাসা, স্নেহপ্রীতি হারিয়ে মানুষ ক্রমশ রোবোটে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু আজ যে নানাবিধ সামাজিক ও নৈতিক ভ্রষ্টাচার ও অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে তাতে দু'একটা ধর্মসভা করে বা ধর্ম প্রচার করে এর সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সাধারণ মানুষ শুধু বাহ্যদৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে যখন দেখে, তখন সে আজকের যুগ-সমস্যায় আতঙ্কিত, এর জটিলতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। আজ তার মনে হয়, দেশের এই নিদারুণ দুরবস্থায় চারিদিকে অন্ধকার, শুধুই নৈরাশ্য। জলাশয়ের জল যখন দূষিত হয়ে যায়, তখন সেই জলাশয়ের যে-ঘাট থেকেই জল তুলি না কেন, সে জল দূষিতই। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি—সমাজের যে-ঘাট থেকেই আজ ব্যাকুল আগ্রহে অঞ্জলি ভরে তৃষ্ণার জল তুলছি, দেখছি সর্বক্ষেত্রেই এই আত্মঘাতী বিষ-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তাই যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রাকৃত জন শ্রীঅরবিন্দকে এখনো শুধু বিপ্লবী 'অরবিন্দ ঘোষ' বলে জানেন, কিংবা বড় জোর তাঁকে 'ঋষি অরবিন্দ' বলে তাঁর সঙ্গে সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে চলেন, অথচ তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার কথা অল্প-স্বল্প জানেন বা শুনেছেন, বর্তমান যুগসমস্যায় তাঁদের মনে বিরাট প্রশ্ন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই আজকের দিনে অনেককেই প্রশ্ন করতে শুনি : আমাদের এই সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের যুগে শ্রীঅরবিন্দের সুমহান আশাবাদী জীবন-দর্শনের তাৎপর্য কতটুকু? তিনি যে বলেছিলেন বিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে 'মনে'রও উপরের একটি চেতনা 'অতিমানসে'র বিকাশ হবে, আজকের এই চরম অধোগতির মধ্যেও কি তার কোন সম্ভাবনা আছে? আজকের দেশে দেশে যুদ্ধ, রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সা ও দলাদলি, আদর্শহীন নেতৃত্ব, আদর্শহীন আপোস, ক্ষণভঙ্গুর চুক্তি, খুন, শোষণ, ধর্ষণ, মিথ্যাচার, অরাজকতা, ভণ্ডামি দিনদিন যেন বেড়েই চলেছে। নানা দিকে পোড়-খাওয়া এই জীবনে তাঁর পূর্ণযোগ-সাধনা আমাদের মধ্যে কৈ? অতিমানস চেতনার আবির্ভাবের ফলে মানুষের মধ্যে থেকে পাশব বৃত্তি সব খসে যাবে, অথবা মানবজাতি রূপান্তরিত হয়ে দেবজাতিতে পরিণত হবে, তার কোন আভাস পাচ্ছি কি? সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পাশবিক বৃত্তিই বরং আরো বেশি তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।—এমন দিনে শ্রীঅরবিন্দের আশাবাদ

মানব-নিয়তির সামনে যেন নির্মম ব্যঙ্গের মতো শোনায়! শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি যদি নির্ভুল হয়, তবে আজকের এই যে বিকৃতি ও বিপর্যয়, শুধু পাশবিক কেন, পৈশাচিক বৃত্তিরও এই যে মাতামাতি দাপাদাপি, এর অর্থ কি? উপযোগিতা কি? যুগের এই সমস্যার কি সমাধান তিনি দিয়েছেন?

শুধু বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে নয়, যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের জীবন ও জগতের বিবর্তনের ধারাটি একটু তলিয়ে দেখি, তা হলেই বুঝতে পারব, প্রকৃতির রাজ্যে নবসৃষ্টির অর্থই হল তার অন্তবের যা অবিনশ্বর উপাদান তাকে বজায় রেখে সাপের খোলস ছাড়ার মতোই তার দেহ থেকে পুরাতনের খোলসটি ছেড়ে ফেলা, নতুনকে বরণ করা এবং নিজের ভিতর থেকে নতুনতর সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু সাপের খোলসটি ছাড়ার আগে সেটি পুরু হওয়া চাই, পাকা হওয়া চাই। প্রকৃতিও যে খোলসটি ছাড়ে তাকে সে আগে পুরু করে নেয়, পুষ্ট করে নেয়। তাই যেসব বৃত্তিকে সে চিরকালের মতো ঝেড়ে ফেলতে চায়, তাদের বিদায়ের আগে তাদের সে পুষ্ট করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ এর মধ্যে দেখেছেন এক নবজন্মের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত; প্রকৃতির এই ক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন :

"ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ পর্ব যখন শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা যায় তাহার ভিতর হইতে যে-সব জিনিস চলিয়া যাইবেই, ঠিক সেইগুলিই নূতন বল সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কোন গভীর সংস্কার বা তীব্র প্রেরণাকে তাড়াইতে হইলে, আগে সে জিনিসটি ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করিয়া আনিতে হয়, এবং শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়।"[৩]

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনন্যসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, মানুষের জীবনের যত বিকৃতি, যত স্খলন, তার মূলে প্রধানত তিনটি বৃত্তি ক্রিয়াশীল—ক্ষমতাস্পৃহা, অর্থলোভ আর যৌনকামনা : "....... Power, wealth, sex have the strongest attraction for the human ego and the Asura and are most generally mished and misused by those who retain them "[৪] সুতরাং মানুষের পূর্ণ দেবায়ন সাধন করার জন্যে এই তিনটি বৃত্তির মূলে সর্বাগ্রে কুঠারাঘাত করা দরকার। এই জন্যে প্রথমে এদের 'ভোগের দ্বারা নিস্তেজ' করে 'শেষে সংযমেব দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা' প্রকৃতি এদের ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে এদের আর কোন স্থান নেই, তাই চলে যাবার আগে এরা 'নতুন বল সঞ্চয়' করে ফিরে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে আজ সারা পৃথিবীতেই দেখছি এই তিনটি বৃত্তির প্রচণ্ড আস্ফালন। যুগের জীবনকে এরা প্রধানত তিন দিক থেকে বিপর্যস্ত কবে তুলেছে। রাজনীতিতে ক্ষমতার লড়াই, অর্থনীতিতে অর্থকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবিস্তার আর—সমাজনীতিতে যৌনবৃত্তির কুলপ্লাবন—সাহিত্যে যার ঘটেছে ব্যাপক প্রতিফলন। অবশ্য এই তিন বৃত্তি প্রাচীন কালে ছিল না, আজই হঠাৎ দেখা দিয়েছে, এমন নয়। 'কামিনী-কাঞ্চনের কথা ভেবে পিতামহেরা কম শঙ্কিত ছিলেন না; আর রাজায়-রাজায় ক্ষমতার লড়াই কোন্ কালে ছিল না? কিন্তু

৩। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ, 'কালি-কলম', ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪। Sri Aurobindo 'The Mother', Chap IV

এত কাল জীবনও ছিল, এসব বৃত্তিও ছিল তার অঙ্গীভূত হয়ে। আজ জীবন যখন এদের ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, তখন এরাও সম্মুখ সমবে অবতীর্ণ। এর কারণই হল এদের শেষ বিদায়ের দিন আসন্ন, চলে যাবার আগে এই যুদ্ধং দেহি হুংকার। এবং এই চরম মুহূর্তে আমাদেরও রুখে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য পন্থা নেই। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমাদের দিব্যসারথি যে নির্দেশটি দিয়েছেন সেটি হল :

"যুদ্ধ যতই কঠোব হোক, একমাত্র উপায় এখনই ও এইখানেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গ করা।"—শ্রীঅরবিন্দ। অবশ্য মনে রাখতে হবে—এই যুদ্ধ বাইরের নয়, ভেতরের, আমাদের অন্তরের—দিব্য-শক্তির সহায়তায় নিজেরই ভেতরের অশুভ বৃত্তির বিরুদ্ধে নিজেরই যুদ্ধ।

সুতরাং আমাদের সমাজজীবনের চারদিকে এই যে সামগ্রিক ভাঙন ও বিনষ্টির কালো ছায়া দেখা দিয়েছে, হয় তো এটা প্রকৃতিরই নির্মম বিধান। এই নির্মম বিধানটি যদি এড়াতে চাই, তা হলে একমাত্র উপায় হল—প্রকৃতির অন্তবেব নির্দেশটি কান পেতে শোনা, স্রষ্টাব হাতে তাঁর নতুন সৃষ্টিব জন্যে নরম নমনীয় উপাদান হয়ে থাকা যাতে তিনি যে ছাঁচে ইচ্ছা সেই ছাঁচেই আমাদের ঢালতে পারেন। সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁরই শরণাগত হতে হবে যাতে আমাদের পুবানো ধর্ম সমাজ-নীতি-আদর্শের কোন ছাঁচ তাঁর কাজে বাধা না দেয়। এ ছাড়া প্রকৃতির সেই নির্মম বিধান, সেই ভাঙন ও বিনষ্টি এড়াবার অন্য কোনো পথ নেই—নান্যঃ পন্থা......

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে আমরা দেখেছি শুধু মানুষের মনেব জোব দিয়ে, নীতি, শিক্ষা দিযে, ধর্ম দীক্ষা দিযে, সমাজের শাসন দিয়ে, সরকারের ক্রিমিন্যাল পেনাল কোড রচনা প্রযোগ করে, এমনকী ফাঁসির দাঁড় গলায় পরিযেও মানুষের কাম-জনিত অপবাধ প্রবণতা কমেনি, মানুষেব উৎকোচ-গ্রহণ, শোষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদির মধ্যে ব্যক্ত তার অর্থলোভ কমেনি, বড়-বড় যুদ্ধ দেশের-পব দেশ ধ্বংস কবে জয করেও মানুষের ক্ষমতাস্পৃহা নির্মূল হযনি। আসলে মানুষের অশুভ বৃত্তিগুলির শুধু সংযম এবং শাসনই নয়, চাই সেগুলিকে শুভ বৃত্তিতে রূপান্তর, তবেই হবে সমস্যাব আত্যন্তিক সমাধান : "Mental control can only be a control, not a cure, a mental teaching, rule, standard can only impose an artificial groove in which our action revolves mechanically or with difficulty and which imposes a curbed and limited formation on the course of our nature A total change of consciousness, a radical change of nature is the one remedy and the sole issue"[৫]

৫। Sri Aurobindo The Life Divine', New York 1956, p 558

৬. যুদ্ধের সমস্যা : চূড়ান্ত সমাধান কোন্ পথে?

আমরা বলছি—'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। আজ আমাদের শ্লোগানই হয়েছে—'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। শান্তি তো আমরা চিরকালই চেয়েছি, সবাই চাই। আমাদের মন্ত্রই হলো—'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।' কিন্তু শান্তি কোথায়? 'অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে'। এ যুগের রাষ্ট্রদর্শনের একজন বড়ো প্রবক্তার মূল প্রতিপাদ্যই হলো—দ্বন্দ্বই (Dialectics) সব প্রগতির মূল। আর আমরা যারা বলছি 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই', তারাই আবার বলছি—'লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই।' অন্য ফ্রন্টে আবার যাঁকে এ যুগের অহিংসার বাণীবহ বলা হয়, সেই মহাত্মা গান্ধীও বলেছেন—অহিংসা কাপুরুষের ধর্ম নয়, অহিংসার মধ্যে যদি ভীরুতা লুকিয়ে থাকে, তাহলে সেই অহিংসার চেয়ে বরং সংগ্রাম ভালো। আর যাঁকে আমরা ঋষি বলি, সেই অরবিন্দও বলেছেন—জীবনের যুদ্ধ জীবনেই লড়তে হবে : "যুদ্ধ যতই কঠোর হোক, একমাত্র উপায় এখনই ও এইখানেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গ করা।"[১]

এসব এ যুগেরই কথা। এসব এ যুগে অপ্রচলিত বা আউট্-ডেটেড্ উপদেশমালা নয়। আর যাঁরা প্রাচীনপন্থী, অতীতের দিকে যাঁরা তাকিয়ে আছেন পথ-নির্দেশের জন্যে, তাঁদের জন্যে কি 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে পিতামহেরা বলেন নি?—"হে অর্জুন, ক্লৈব্য আশ্রয় করো না, এরকম কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে যুদ্ধের জন্যে উঠে দাঁড়াও।"[২]

সর্বদা যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে শান্তি নেই। তথাকথিত প্রেমের বশে বাঘ কিংবা সিংহকে আলিঙ্গন করতে গেলে তার কী পরিণাম হয়, সেটা তো আমাদের জানা। সেটা বাতুলতা, সেটা মানসিক বিকৃতি মাত্র।

'সর্বজীবে প্রেম'-এর সে এক আত্মঘাতী ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। অতএব আবার স্মরণে রাখতেই হবে—'যুদ্ধ যতই কঠোর হোক, একমাত্র উপায় এখনই এবং এইখানেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গ করা।"

কিন্তু প্রশ্ন হলো—যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে কার? কার সঙ্গে কার? এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধ যদি অপরিহার্যই হয় তাহলেও তার আত্যন্তিক সমাধান কী? চিরস্থায়ী শান্তি তবে কোন্ পথে? যুদ্ধ এবং শান্তির (War and Peace) সমস্যা পৃথিবীর অনেক মনীষীকেই চিন্তিত করেছে এবং কেউ কেউ নিজস্ব পথে এর সমাধানও দিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দ এই সমস্যার কী সমাধান দিয়েছেন।

একসময় আমরা মনে করেছি—নারীর যে অসম্মান করেছে, তার বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। যে রাবণ সীতাকে চরম কথা বলেছে—"বিপথগামী অশ্বকে সমর্থ সারথি যেমন

১। শ্রীঅরবিন্দ 'যোগসাধনার ভিত্তি' ১৩৫৭, পৃ ৫৫

২। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।—গীতা ২/৩

সংযত করে রাখে, সেই রকম তোমার প্রতি সমুত্থিত আমার কাম আমার ক্রোধকে সংযত করেছে। .... হে বরবর্ণিনি, তোমার জন্যে আমি যে সময়সীমা স্থির করে দিয়েছিলাম, তার অবশিষ্ট দু'মাস অপেক্ষা করবো। তারপর তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে। দু'মাস অতীত হলেও যদি তুমি আমাকে স্বামীরূপে বরণ করতে অনিচ্ছুক হও, তাহলে আমার পাচকেরা আমার প্রাতরাশের জন্যে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করবে,"[৩] সেই রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের যুদ্ধ। বস্তুত এ রাবণ শুধু রামায়ণের রাবণ নয়, এ চিরকালের রাবণ; এর বিরুদ্ধে আমাদের চিরকালের যুদ্ধ।

আবার আমরা বলছি—যে কৌরবেরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের যুদ্ধ। যে নারীর অসম্মান করেছে, ক্ষমতার মোহে যে অন্ধ, মানুষের বিবেকের যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে হোমারের মহাকাব্য 'ওদিসি'তে ওদিসিউসের স্ত্রী পেনিলোপকে বিভিন্ন পাণিপ্রার্থী যখন বল পূর্বক বিবাহ করার চেষ্টা করেছে, তখনো বেঁধে গিয়েছে বিরাট যুদ্ধ। আর 'ইলিয়াদে'ও নারীর অসম্মানকে কেন্দ্র করে বেঁধে উঠেছে সংঘাত। সেখানে অত্রেউসের পুত্র আগামেম্নন্ এক বৃদ্ধ পুরোহিতের কন্যাকে অপহরণ করে বলেছে—"তাকে আমি ছাড়বো না; তার মাতৃভূমি থেকে দূরে আর্গসো আমাদের বাড়ীতে গিয়ে সে তাঁত চালাবে আর আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে, তারপরে যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই তাকে আমি ছেড়ে দেব।"[৪]

যুদ্ধ এমনি করে চলছে এদেশে এবং ওদেশে। এরপরে পৌরাণিক যুগ আর আদি মহাকাব্যের যুগ থেকে মধ্যযুগে প্রবেশ করি একবার। যুদ্ধের পরে যুদ্ধ—ছোট যুদ্ধ বড়ো যুদ্ধ। ইতালীতে যে নবজাগরণ হয়েছিলো তার আগে পর্যন্ত যদি মধ্যযুগ ধরি, তো যে বড় যুদ্ধ চোখে পড়ে তা হলো ক্রুসেড (Crusade) বা ধর্মযুদ্ধ। ১০৯৫ থেকে ১২৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছরের মধ্যে বারবার ঘটেছে খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যুদ্ধ। কী ভয়ানক, কী মর্মান্তিক!—১৯১৪ থেকে ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

৩। "সন্নিযচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বয়িং কামঃ সমুত্থিতঃ।
দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ

দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি।।
দ্বাভ্যামূর্ধ্বং তু মাসাভ্যাং ভর্তারং মামনিচ্ছতীম্।
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ।।

—বাল্মীকি-রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড (দ্বাবিংশ সর্গ)—৩, ৮, ৯।

৪। "তেন্ দে গো ওউ লুসো প্রিন্ মিন্ কাই গেরাস্ এপেইসিন্ হেমেতেরয় এনি অয় কয এন্ আর্গেই তেলোথি পাৎরেস্ হিস্তোন্ এপোইখোমেনেন্ কাই এমোন্ লেখোস্ আন্তিযোওসান্।"— হোমার ঃ ইলিয়াদ, ১/২৫—৩১।

এবার নারীর অসম্মানের জন্যে যুদ্ধ নয়, এবার খোলাখুলি ক্ষমতার লড়াই—প্রতিপত্তি লাভের জন্যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে। হিট্‌লারের বিরাট নরমেধ যজ্ঞ। মিত্রশক্তি তার বিরুদ্ধে লড়েছিলো। কিন্তু অন্যদিকে হিরোশিমা—নাগাসাকির শ্মশানদৃশ্যও কম বেদনাদায়ক নয়। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের উপরে বিশ্বাস হারান নি ঠিকই, কিন্তু সভ্যতার সঙ্কট দেখে কী রকম মর্মপীড়িত হয়েছিলেন সে আমরা জানি। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক রূপ দেখে মানুষ শিউরে উঠলো। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, রাষ্ট্রসংঘ ইত্যাদি গঠন করে সে কী চুক্তি! সে কী মিলন-মন্ত্র পাঠ! কিন্তু স্থায়ী ফল বিশেষ কিছুই হলো না। যুদ্ধের সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান কিছুই হলো না। শুধু ভিয়েতনামে নয়, পৃথিবীর নানা দেশে নানা শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। আজকে আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র আর পেন্টাগনে একদিনে বিপুল সংখ্যায় সাধারণ নির্দোষ মানুষের প্রাণনাশ হয়েছে। তখন কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দিয়েছে শ্লোগান আর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কুশ পুত্তলিকা দাহ করেছে। কেউ-কেউ মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। তারা মৌলবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যতান ধরেছে। তারা এদিকে ওদিকে বলে বেড়িয়েছে মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের যিনি নায়ক তাঁর কুশপুত্তলিকাও দাহ করা উচিত ছিলো। কেউ কেউ আবার এসব ঘটনার আগে থেকেই এদেশে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নিরাপদ ক্ষেত্র—দেখছিল কোন্ ধর্মকে আক্রমণে কোনো ঝুঁকি নেই। দেখা গেলো সেই ধর্ম এখানেই আছে। এই ধর্মকে আক্রমণ করাই নিরাপদ। কারণ এ ধর্ম সবচেয়ে সহিষ্ণু। এই ধর্মের যিনি যুগাবতার তিনি বলেছেন—'যত মত তত পথ'। তিনি ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে এমনি করে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন যে, আইনের চোখে তাঁকে এই ধর্মের গণ্ডিব বহির্ভূত বলে সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যায়। তাঁর উত্তরসাধক যিনি, তিনি বিদেশী বিধর্মীদেরও সম্বোধন করে বলেছিলেন—''আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ।............ যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।''[৫] এই ধর্মের সংস্কারবর্জিত ঔপনিষদিক প্রাণরসে পুষ্ট কবি বলেছেন 'বিশ্বমানবতা'র কথা, 'মানুষের ধর্মে'র কথা। আর একজন মহাসাধক মহামনীষী সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে দেখেছেন 'দিব্যজীবনে'র (The Life Divine) স্বপ্ন; তাঁর আদর্শ রূপায়ণের জন্যে গড়ে উঠেছে যে শিক্ষাকেন্দ্র সেটি একটি 'আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র'। সবজাতির যে মিলন-তীর্থ গড়া হলো, তা হলো আন্তর্জাতিক নগরী 'অরোভিল'। এই হলো এই ধর্মের আসল পরিচয়। স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ আচরণ-সর্বস্বতার মধ্যে এই ধর্মের আসল পরিচয় নেই বস্তুত কোনো ধর্মেরই বহিরঙ্গের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আসল পরিচয় নেই আর হিন্দুধর্ম—এ ধর্ম 'religion' অর্থে ধর্ম নয়, এ ধর্মের তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর। শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন—''ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাহার

৫। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', কলকাতা : উদ্বোধন, ১ম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ ৭।

অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে।.......হিন্দুধর্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে—আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।"[৬]

শ্রীঅরবিন্দ যোগ এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে ধর্মকে (religion) পৃথক করে দেখেছিলেন ঠিকই; কিন্তু হিন্দুধর্মের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা ও ব্যবহারিক যৌগিক সত্য আছে তার উপযোগিতা স্বীকার করেছিলেন, সে কথা মৃণালিনী দেবীকে লেখা এই চিঠি থেকে বোঝা যায়। এই শাশ্বত সত্যের জন্যেই তিনি উত্তরপাড়া অভিভাষণে হিন্দুধর্মকে 'সনাতন ধর্ম' বলে অভিহিত করেছিলেন।—এই হলো হিন্দুধর্মের অন্তরের পরিচয়। এই ধর্মের যা মূল সত্য, তা অন্তর্মুখী (Subjective) সাধনায় প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকদের সাধনায় পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। হিন্দুধর্মের এই মূল সত্য যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা বুঝবেন যেমন এই ধর্মকে সাম্প্রদায়িক বলে আক্রমণ করা যায় না, তেমনি এই ধর্মকে অস্ত্র করে অন্য ধর্মকেও আক্রমণ করা যায় না। অথচ এদেশে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধুয়ো ধরেছেন, তাঁরা মূলত এই ধর্মকেই টার্গেট করেছেন, কারণ সেটাই নিরাপদ।

আর যাঁরা এই ধর্মের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান দিচ্ছেন না, তাঁদের মধ্যে কোনো-কোনো তথাকথিত হিন্দুধর্ম প্রেমিক এই ধর্মের ধ্বজা ধরেছেন। তাঁরা এই ধর্মের প্রাণদায়ী ওষধি বিশল্যীকরণটি চেনেন না বা চিনেও না চেনার ভান করেন। তাঁরা পর্বতের জঞ্জাল সহ গোটা গন্ধমাদনই তুলে ধরেছেন। এই ধর্মের মহৎ আদর্শের কথা না বুঝে, না বলে, তাঁরা এই ধর্মকে ছোটই করে চলেছেন। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই ধর্মকে আক্রমণের সুযোগ তো তাঁরাই করে দিয়েছেন। আর প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িকতার নামে এই একটি মাত্র ধর্মকে বাণবিদ্ধ করার লক্ষ্যবিন্দু করে রেখেছেন। এই ধর্মের ধ্বজাধারীদের অতি-উৎসাহের ফলে সংস্কৃত ভাষাতেও গৈরিকীকরণের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। "সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবে ধর্মের গন্ধ, হিন্দুত্বের গন্ধ অবশ্যই পাওয়া যায়।"[৭] আর এই অত্যুৎসাহের ফলেই আমরাও অনেক সময় ভুলে যেতে বাধ্য হচ্ছি যে, ধর্ম ছাড়া সংস্কৃত ভাষার বহুমুখী সমৃদ্ধি ছিলো এবং আজকের দিনে তার বাস্তব এবং ব্যবহারিক উপযোগিতাও আছে।

যাই হোক আক্রমণ এমনি করে চলছে--কোথাও কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে, কোথাও কোনো ভাষার বিরুদ্ধে। আক্রমণ চলছে একজাতির অন্যজাতির বিরুদ্ধে, এক রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। যুদ্ধও চলছে সবলের বিরুদ্ধে সবলের, দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের। যুদ্ধ চলেছে, চলবে ততদিন, যতদিন না তার আত্যন্তিক সমাধান হয়। মনে হচ্ছে আচার্য

৬। 'শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা' পণ্ডিচেরি, ১৯৯৪, পৃ ৩২১।

৭। সম্পাদকীয়, 'দেশ', ২১ শে বৈশাখ, ১৪০৮, পৃ. ৫।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথাটি কত সত্যি: তিনি বলেছিলেন—রামায়ণ-মহাভারত কিংবা ইলিয়াদ-ওদিসিতে যে ধরনের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, সেই ধরনের যুদ্ধ আর সংঘটিত হবে না; কিন্তু যুদ্ধ এখনো হচ্ছে, শুধু যুদ্ধের উপকরণের পরিবর্তন হয়েছে। আমরাও দেখছি গদা কিংবা তীর ধনুকের যুদ্ধের বদলে এসেছে আণবিক যুদ্ধ, আসছে জৈব রাসায়নিক যুদ্ধ। কিন্তু অমানবিক নিষ্ঠুরতা এখনো রয়েছে, বরং আরো তীব্র হয়েছে।

মহাভারতে ভাই ভাইয়ের বুকের রক্ত পান করেছিলো। কিন্তু আজ ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের নিষ্ঠুরতা মহাভারতের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা 'বিশ্বভ্রাতৃত্বে'র কথা বলছি। অথচ হিন্দু হিন্দুকেই নিধন করছে, মুসলমান মুসলমানকেই নিধন করছে রাজনীতির রণক্ষেত্রে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িকতা, কিন্তু রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা কি আরো ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতা নয়? ধর্মে ধর্মে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, পার্টিতে পার্টিতে যুদ্ধ, এই যে ঘরে-বাইরে যুদ্ধ—এর মূলে রয়েছে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি—নিষ্ঠুরতা। আজ আদিম অসভ্যতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণ হয়েছে সভ্যতারও হয়েছে কত রূপান্তর; কিন্তু সেই আদিম বৃত্তিটা একই রকম রয়ে গেছে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের অপূর্ব বিশ্লেষণ তাঁর নিজের ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি:

"সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্বরতা, পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনই বর্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া, তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে।.... বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচিত্র অধিক বদলায় নাই।"[৮] সুতরাং সমস্ত যুদ্ধ প্রবৃত্তির মূল রয়েছে মানুষের স্বভাবের মধ্যে। এইসব অশুভ বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়ে অপূর্ণ যে মানুষ, তাকে নিয়ে যুদ্ধহীন দ্বন্দ্বহীন মানব-সমাজ সাম্য-শান্তি-মৈত্রী-প্রেমের বিশ্বপরিবার গঠন করা কি সম্ভব? যে মানুষ নিজেই অপূর্ণ তাকে নিয়ে একটা পূর্ণ ত্রুটিহীন মানবসমাজ গড়া যাবে না। এমন কী আমাদের সমস্ত আচার-আচরণ, সমস্ত কর্মধারাকে যদি বাইরে থেকে শিক্ষা দিয়ে, আইনের শাসন দিয়ে, সমাজনীতি রাজনীতির যান্ত্রিক বিধি-বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহলে একটা নিখুঁত যন্ত্রমানবের সমাজ নির্মাণ করা যাবে মাত্র, কিন্তু পূর্ণবিকশিত জীবন্ত মানুষের সমাজ সৃষ্টি করা যাবে না। এটাই শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্ত : "A perfected human world cannot be created by men or composed of men who are themselves inperfect Even if all our actions are scrupulously regulaed by education or law or social or political machinery, what will be achieved is a regulated pattern of minds, a fabricated pattern of lives a cultivated pattern of conduct; but a conformity of this kind cannot change, cannot re-create the man within, it cannot carve or cut out a perfect soul or a perfect thinking man or a perfect of growing

৮। 'রামেন্দ্র রচনা-সঞ্চয়ন', ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ১৫০।

living being."[৯] দেখা যাচ্ছে মানবসমাজে যুদ্ধের সমস্যা মানুষের জীবনের মূল সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। মানবজীবনের মৌল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন, এসব সমস্যার কারণ তলিয়ে দেখেছেন পৃথিবীর যে সব মনীষী, তাঁদের মধ্যে মহান ভারতীয় দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ অন্যতম। শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন—যে তিনটি মূল আকর্ষণ মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তি—আসুরিক শক্তি—জেগে ওঠে সেই তিনটি হলো অর্থ, কাম ও প্রতিপত্তি (Money,Sex and Power): "যে তিনটি শক্তি মানুষের অহঙ্কারের পক্ষে এবং অসুরের পক্ষে পরম আকর্ষণের জিনিস তাদেরই অন্যতম হলো অর্থ—আর দুটি, কাম ও আধিপত্য।"[১০]
এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও রামায়ণের যুদ্ধের মূলে ছিলো প্রতিহিংসা ও কাম, মহাভারতের যুদ্ধের মূলে ছিলো প্রতিপত্তি আর সাম্রাজ্যের লোভ। আর আধুনিক যুগে যুদ্ধবাজরা মুখে যাই বলুন না কেন, আজকের অধিকাংশ যুদ্ধই ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু এই যে যুদ্ধবাজি এর সমাধান কী? শ্রীঅরবিন্দের মতো এই সমস্যার সমাধানের জন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সেটা শুধু সৌহার্দ্যের সম্পর্ক নয়, সেটা গভীরতর আত্মিক ঐক্যের সম্পর্ক। সেটা নৈতিক শিক্ষা দিয়ে সকলকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করা নয়, সেটা হলো সকলকে নিজের সত্তার অংশ রূপে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির পরে আমরা আর নিজেদের ব্যক্তিগত অথবা ব্যাপক বিশ্বগত চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। এই বিশ্বগত চেতনা যখন মানবজীবনে স্থায়ী স্থিতিলাভ করবে, একমাত্র তখনি যুদ্ধ মানুষের সমাজ থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিতে পারে, যুদ্ধের সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান হতে পারে: "Only when man has developed not merely a fellow-feeling with all men, but a dominant sense of Unity, commonalty only when he is aware of them not merely as brothers,—that is a fragile bond, —but as parts of himself, only when he has learned to live, not in his separate personal and communal ego-sense, but in a large universal consciousness, can the phenomenon of war, with whatever weapons, pass out of his life without the possibility of return."[১১]
একজন রাবণকে বা দুর্যোধনকে বা হিট্‌লারকে মেরে কি এ সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান হয়েছে? যুদ্ধবাজি কি মনুষ্যসমাজ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে? একটা কোনো অসুরকে নিধন করলেই মানুষের ভেতর থেকে আসুরিকতার বিনাশ হয় না। বরং একজনকে নিধন করলে বহু অসুরের জন্ম হয়। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত হলেও এর প্রণেতা মানবসভ্যতার এই সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং এর একটা সমাধানও রূপকের মাধ্যমে দিয়েছেন। মহাশক্তি যখন দেখলেন যে, একটা অসুরের গলা কেটে ফেলার পরে তার দেহ-নির্গত রক্তবিন্দু থেকে শত শত অসুরের জন্ম হয়ে চলেছে, তখন সেই ছিন্নমস্তক অসুরের গলা থেকে যে রক্ত বেরিয়ে আসছিলো সেই রক্ত সোজাসুজি

৯। 'The Life Divine', New York, 1951, p 906
১০। 'The Mother' ((নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ : মা')
১১। Sri Aurobindo Birth Centenary Library, vol 15, p 587.

পান করে নিলেন। "তখন সেই মহা-অসুর রক্তবীজ শস্ত্র সমূহ দ্বারা আহত ও রক্তশূন্য হয়ে ভূতলে পতিত হলো।"[১২] একথার অর্থ হলো কোনো একজন অসুরকে নিধনের মধ্যে সমস্যার সমাধান নেই, আসুরিক শক্তিকেই দৈবী শক্তির মধ্যে আত্মীকৃত (assimilate) করে দৈবী শক্তিতে পরিণত করে নিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে আসুরিক শক্তির দৈবীশক্তিতে আমূল রূপান্তরের (transformation) কথাই বলা হয়েছে। বাইরের যুদ্ধ কোথাও-কোথাও অপরিহার্য; কিন্তু মানব সভ্যতাকে যুদ্ধবাজি থেকে বাঁচাতে হলে অন্তরের যুদ্ধও অপরিহার্য। মানুষের মধ্যে যে অশুভ প্রবৃত্তি রয়েছে তার বিরুদ্ধে, অন্তর্মুখী (subjective) সংগ্রামই প্রথম প্রয়োজন। তাই শ্রীমা আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছেন অন্তরের দিকে—আন্তর যুদ্ধের দিকে—"This courage, this heroism which the Divine wants of us, why not use it to fight against one's own difficulties, one's own imperfections, one's own obscurities? Why not heroically face the furnace of inner purification so that it does not become necessary to pass once more through one of those terrible, gigantic destructions which plunge an entire civilisation into darkness?"[১৩] এর সঙ্গে ওপরের শুভ শক্তির সাহায্যে, দিব্যশক্তির সাহায্যে আসুরিকতার আমূল রূপান্তরই এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান। এক ধরনের পরিবর্তনের কথা আগেও কেউ কেউ ভেবেছেন। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড অশুভ বৃত্তিকে শুভবৃত্তিকে ঊর্ধ্বায়নের (sublimation) কথা বলেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ধর্মীয় নৈতিক (religio-ethical) শিক্ষার সাহায্যে রাজনীতির শুদ্ধিকরণের শিক্ষা নিজের জীবনে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। ধর্মকে যাঁরা মানেন না, তাঁরাও এখন একরকমের আত্মশুদ্ধিকরণের উপযোগিতা স্বীকার করছেন। রবীন্দ্রনাথের পথ এ থেকে স্বতন্ত্র, সেপথ নান্দনিক আধ্যাত্মিক (aesthetic—spiritual)। শ্রীঅরবিন্দের পথ হলো অন্তর্মুখী, সে পথ যৌগিক আধ্যাত্মিক (Yogic—spiritual)। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে মানুষের অন্তর্নিহিত দু'টি অশুভ প্রবৃত্তি—কাম ও অর্থলোভ— যে নির্মূল করা যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব একাধিকবার দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই দুটি বৃত্তিকে ঠিক নির্মূল করার কথা বলেননি, যৌগিক-আধ্যাত্মিক পথে আমূল রূপান্তরিত করার কথা বলেছেন। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও একটা বিজ্ঞান, তা যে ভৌতবিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ও উপরে প্রতিষ্ঠিত তা নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। কেউ-কেউ বলবেন—এই প্রমাণ তো সর্বসাধারণের (mass) কাছে পৌঁছোয় নি। আমি বলবো—আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বই কি সর্বসাধারণ বুঝতে পেরেছে?

শ্রীঅরবিন্দের যৌগিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানও একটা বিজ্ঞান : 'Yoga is nothing but practical psychology'[১৪] শ্রীঅরবিন্দ এক পূর্ণযোগের সাধনবিধি অনুসরণ করেছেন,

১২। "স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ।।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ।
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।।"—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৮/৬১-৬২।

১৩। 'All India Magazine', December, 2001, p.1

১৪। Sri Aurobindo (Vide 'Psychology, Mental Health and yoga' by A.S Dadal 1991, p 2.

এই যোগের সাহায্যে অখণ্ড মানবসত্তারই আমূল রূপান্তর সাধন করা যাবে। তাই এই যোগ-পদ্ধতিকে বলা হয় 'রূপান্তর-যোগ' (Yoga of transformation)। মানুষের মধ্যে যে কাম, অর্থলোভ ও প্রতিপত্তি বিস্তারের কামনা—যা সমস্ত যুদ্ধের মূল, তাকে রূপান্তরিত করা যাবে শুভ প্রবণতায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে জীবনকে ত্যাগ করে যোগী হওয়া বা তপস্বী বা সন্ন্যাসী হওয়া তাঁর যোগের লক্ষ্য নয়, জীবনকে গ্রহণ করেই জীবনকে 'দিব্যজীবনে' (The Life Divine) রূপান্তরিত করা তাঁর সাধনার লক্ষ্য : "To be a yogi, a Sannyasi, a Tapaswi is not the object here The object is transformation"[১৫] আধ্যাত্মিক পদ্ধতিতে মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তির আমূল রূপান্তর ছাড়া যুদ্ধ সমস্যার কোনো আত্যন্তিক সমাধান নেই। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে যে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা, সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে যে ছিনি-মিনি খেলা, তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও রাষ্ট্রসংঘ গড়ে, নানা চুক্তি করে, শান্তি-বচন উচ্চারণ করে যে চিরকালের মতো সমাপ্ত করা যাবে না, সেটা ইতিহাসই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথ মানুষের শুভবুদ্ধির ওপরে বিশ্বাস হারাতে চান নি। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনে মানুষের যে শুভ বুদ্ধি কাজ করেছিলো, শ্রীঅরবিন্দ তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন; এর মধ্যে মানুষের ঐক্যবদ্ধ হবার একটা মহতী ব্যাকুলতা কাজ করেছে, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও অন্তত সেই ব্যাকুলতার মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার তিনি ইঙ্গিত পেয়েছেন :

" There are dangers and difficulties, there can be an apprehension of conflicts, even of colossal conflicts that might jeopardise the future, but total failure need not be envisaged unless we are disposed to predict the failure of the races The thysis we have undertaken to establish of the drive of Nature towards large agglomeration and the final establishment of the largest of all and the ultimate union of the world's peoples still remains unaltered : this is evidently the line which the future of the human race demands and which conflicts and perturbations, however immense, may delay, even as they may modify greatly the forms it now promises to take, but are not likely to prevent for a general destruction would be the only alternative destiny of mankind. But such a destruction whatever the catastrophic possibilities balancing the almost certain beneficial results, hardly limitable in their extent, of the recent discoveries and incremations of Science, has every chance of being as chimerical as any earlkky expectation of final face and felicity or a perfected society of the human people. We may only, if on nothing else, or the evolution any urge and, if on no other greater hidden power, on the manifest working and drift or intention in the world-energy we call. Nature to carry, mankind at least as for as necessary next step to be taken, a self-presuring next step........." এই জন্যে মনোময় মানুষ তার মন বুদ্ধি খাটিয়ে কতকগুলি নীতি আদর্শ তৈরী করে মানুষের অশুভ প্রবণতাকে শাসনে রাখার

১৫। Sri Aurobindo : 'Bases of Yoga', Pondicherry, 1989, pp. 50-51.

অনেক চেষ্টা করেছে; কিন্তু সেটা মানুষের সহজাত পাশবিক প্রবণতার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া একটা বাইরের শাসন মাত্র। সে সব নীতির শাসন বিধি বারবার তৈরী হচ্ছে যেন বারবার ভাঙার জন্যেই। তাতে মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির আমূল সংশোধন হচ্ছে না। শ্রীঅরবিন্দ এই ভুল প্রচেষ্টা সংশোধন করতে বলেছেন : "A mental control can only be a control. not a cure ; a mental teaching, rule, standard can only impose an artificial groove in which our action revolves mechanically or with difficulty and which imposes a curbed and limited formation on the course or our nature. A total change of conciousness, a radical change of nature is the one remedy and the sole issue."[১৬] মানুষের চেতনার এই সামগ্রিক পরিবর্তন, স্বভাবের এই আমূল রূপান্তরেই হবে মানবজাতির সমস্ত অশুভের ইতি, যুদ্ধের সমস্যার চিরন্তন সমাধান। এমনি করে মানুষের নিয়তি পরিবর্তিত হবে এক দৃঢ় অটল শুভ ইচ্ছার জোরে : "Fate shall be changed by an unchanging will"[১৭]।

১৬। Sri Aurobinda 'The Life Divine' New York, 1951 p 558

১৭। Sri Aurobinda 'SAVITRI', book III canto IV

৭. নারী-স্বাধীনতা, নারীবাদ এবং তারপর

বাল্যে কৈশোরে নারী পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ঃ নারী যেন পুরুষের সম্পত্তি—নারীর এই চিরদাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একদা কোনো কোনো অতিপ্রগতিবাদী উচ্চারণ করেছিলেন নারী-জাতীয়করণের কথা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে—এই শ্লোগান আরো আপত্তিকর। এর মধ্যেও এই বোধটি প্রচ্ছন্ন আছে যে, নারী হলো সম্পত্তি, যদিও সেই সম্পত্তি ব্যক্তির নয়, জাতির আবার এর মধ্যে অশালীনতার ইঙ্গিত পেয়ে প্রাচীনেরা বললেন—

এই 'সীতা-সাবিত্রীর দেশে'—যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে'—সেখানে ঐসব অশাস্ত্রীয় কথা পাড়ায় পাপ আছে। সমাজ যতই অধঃপাতে যাক্, ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাঙবে কে? ভারতের মেয়েরা মার্কিনী ঢঙে যতই পোষাক পরুক, সিনেমা-থিয়েটার-মডেলিং করুক, তাদের অন্তরের প্রকৃতি—ধর্মকে মুছে দেবে কে? তারা অন্তঃপুরচারিনী তাদের প্রকৃতি-ধর্ম তাদের গৃহধর্মে সুপটু করে গড়েছে। পুরুষকে বাইরে রেখে অন্দরমহলের সমস্ত বোঝা বইবার সামর্থ্য তাদের বিধিদত্ত। কোন্ দেশের মেয়েরা এমন সহনশীলা, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী? কোথায় দেখি নারীর এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ—একাধারে জননী ও রমণী—মা ও প্রেয়সী? এদেশের ধর্মপ্রেমিক সদাচার-নিষ্ঠ সমাজনেতারা বলছেন, পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ আমাদের দৃষ্টি, তাই এই সকল মহৎ গুণ আমরা দেখতে পারি নি। তাই নানা ম্লেচ্ছাচার, নানা ব্যভিচার এদেশে আনতে আমাদের দ্বিধা হয় না। —এর উত্তরে নবীনেরা বলছেন—হোক পাপ, প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাদের আপত্তি নেই। পাপকে বরণ করার দুঃসাহস না থাকলে এগিয়ে যাবার অধিকার পাওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্তকে ভয় করলে প্রাণকে প্রকাশ করা যায় না। বস্তুত, যা যত বড় পাপ, তাতে কি তত বড় সত্য নেই? আর সত্য কথা বলতে কি, বাইরে যেখানে সত্যের যত জয় ঘোষণা সেখানেই অন্তরে মিথ্যার তত তমসাচ্ছন্ন গুহা। দর্পণের একপিঠে যেমন দীপ্তির দীপ্ত প্রতিফলন, তার অপর পিঠে তেমনি নিবিড় তমিস্রা। কিন্তু যেখানে দর্পণ দর্পণ নয়, বিশুদ্ধ সহজ কাঁচ সেখানে বাইরের প্রতিফলন কম, কিন্তু ও পিঠেও আলো। সনাতন সমাজে একদিকে যেমন মন্ত্র পেলাম—

> ন তপস্তাপ ইত্যাহুব্রহ্মচর্য্যম্ তপোত্তমম্।
> উদ্বরেতা ভাবেদ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।। শিবসংহিতা

তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও শুনলাম—

> জৈসী পুতলী কাঠকী, পুতলী মাসময় নারী।
> অস্থি নাড়ী মলমূত্রময়, যন্ত্রিতা নিন্দিতা ভারী।।—তুলসীদাস

অথবা — দিনকো মোহিনী রাতকো বাঘিনী পলক পলক লহু চুতৈ।
দুনিয়া সব বৌরা হোকর ঘর ঘর বাঘিনী পুতৈ।।

তখন নিতান্ত সহজ দৃষ্টিতে যাকে দেখছিলাম, সে হল নরকের[১] দ্বার। যে ছিল সহজ

১। ibid

বাস্তব স্ফুট, সে এল প্রহেলিকা-কুহেলিকার আবরণ পরে। তার সহজ রূপ অসহজ হয়ে দাঁড়াল আমাদের চোখে, ভয়ার্ত দৃষ্টি বুঝল না—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।' নিজের বরে 'বৃকাসুর' সৃষ্টি! সে যখন তাড়া করল, তখন আমরা ছুটলাম গুরুর কাছে। গুরু উপদেশ দিলেন—হয় তাকে মা বলে প্রণাম কর, নয় তাকে নরকের কীট বলে খেদিয়ে দাও।

এর ফল কি হল? যাকে পেতাম জীবনসঙ্গিনীরূপে, সহকর্মিনীরূপে, সে হয়ে এল একটা জটিল কুটিল, একটা কিম্ভুত কিমাকার! শাস্ত্রকাব কী ছোট করে দেখালেন নারীকে

কৌটিল্যদম্ভসংযুক্তা সত্যশৌচবিবর্জ্জিতা।
কেনাপিনির্ম্মিতানারী বন্ধনং সর্ব্বদেহিনম্।।—অবধূত গীতা ৮।১৪।

গৃহের অভ্যন্তরে নারী অনেক মণিরত্ন সঞ্চয় করেছে; কিন্তু তা কতদিন স্থায়ী? সে যে অমৃতকুম্ভ ভরেছে তাতে যে গতি নেই। যেখানে গতি নেই, প্রসারতা নেই, তা যে পচে 'দুর্গন্ধ আবার' হয়ে ওঠে, একথা মানুষকে বোঝাতে হবে না।

নারীকে তাই আনতে হবে বাইরে, পুরুষেব পাশে, দিতে হবে মুক্তি। সে নারী, শুধু 'নারী' নয়, এ সত্য তাকে বোঝাতে হবে না, বোঝবার স্বাধীনতা দিতে হবে। মানুষ হিসাবে সে বুঝুক তার অধিকার কী, চাহিদা কী, দাবী কী। সে যে বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্তার এবং বার্ধক্যে পুত্রের সম্পত্তি নয়, সে যে নিজেরও একজন এ সত্য সে বুঝুক। উপলব্ধি করুক। *

একসময় বলা হয়েছিল—স্বাধীনতা রক্ষার শিক্ষা যার নেই, তাকে স্বাধীনতা দেবার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে শিক্ষা কতটা ফলবতী হতে পারে? ভয়, দাসমনোবৃত্তি, আর দুর্বলতাই তখন মহৎ গুণের মুখোশ পরে আত্মগোপন করে। Brutus রোম-জনতাকে অনেক বোঝালো—সিজারের অত্যাচার থেকে তাদের মুক্তি পেতে হবে। তারা হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন-চেতা স্বাধীন মানুষ।' তারা বলল— 'Brutus' বড় ভাল লোক—এবার আমরা তার অধীনে থাকবো। লোহার শিকল ছেড়ে সোনার শিকল! তাই বলছিলাম স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা, তাই জীবন্ত শিক্ষা। তার স্পর্শে মৃতও জীবন লাভ করে—'মৃতং কঞ্চম বোধয়ন্তী'।

প্রাচীনপন্থীদের মতে নারীর চেতনা নাকি জাগ্রত নয়। তার ভালোবাসায় কাম আছে। সে নিজে যেমন মোহান্ধ পুরুষকেও তেমনি সহজেই মোহান্ধ করতে পারে। স্বাধীনভাবে ভালোবাসার, স্বীয়শক্তিতে চলবার শক্তি বা চেতনা তার নেই। তাই চাই তার উপর সমাজের বাঁধন। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে নাকি সেকথা সত্য নয়! পুরুষের কথা আপাতত স্থগিত থাকবে। কিন্তু নারী, নারীর মত প্রাণ দিয়ে, বিশুদ্ধ প্রাণ দিয়ে কে ভালোবাসতে পেরেছে? প্রেমোপাসনায় রাধার মত সার্থক হয়েছে ক'জন পুরুষ? বস্তুত প্রেমধর্ম-কোষে। নারীর অন্তরাত্মার প্রেমকে বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থরূপে প্রকাশিত হতে দেখেই পুরুষ

* তুলনা করুন —"কিমত্র হেয়ং?—নারী। কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাংহি?—নারী। দ্বাবং কিমহো নবকস্য?—নারী। সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা?—নারী। বিজ্ঞাম্মাবিজ্ঞতামোহন্তি কোবা?—নার্য্যা পিশাচা ন চ বঞ্চিতো য়ঃ।।" অথবা—"নরকার্নবম্"—অবধূত— গীত ৮/১৭।

বিস্মিত হয়ে বলে উঠেছে—'না জানি রাধার প্রেমে কোন গুণ আছে'। আজকের যোগী শ্রীঅরবিন্দও নারীর প্রেমকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি—"There is a number of women who can love with the mind, the psychic, the vital (heart), but they shrink from a touch on the body and even when that goes, the physical act remains abhorrent to them. Women know this, but men seem to find it hard to believe; but it is perfectly true."[২] পুরুষসিংহ বিবেকানন্দকে কোন কুসংস্কার আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাই মানুষের হয়ে—পুরুষ ও নারীর হয়ে—উভয়ের সমান অধিকার তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। "এদেশে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এত ভেদ সৃষ্টি কেন করা হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। অথচ এই দেশেরই বেদান্ত প্রচার করে যে, একই আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজমান।" স্মৃতিগ্রন্থাদি লিখিয়া কঠিন অনুশাসনের ও বিধিনিষেধের নানা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া পুরুষগণ স্ত্রীলোকদের কেবল প্রজননযন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। দেশের অধঃপতিত যুগে যাজক সম্প্রদায় যখন অন্যান্য সম্প্রদায়কে বেদপাঠে অনধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সেই সময় নারীকেও তাঁহারা নারীত্বের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করলেন।"[৩] নারীর ক্রিয়া পুরুষের সেবাই নয়, তার ভোগোপকরণ সাজিয়ে ধরাতেই তার চরম সার্থকতা নেই। সে স্বাধীনভাবে তার মনোধর্মের বিকাশেও সহায়তা করে। দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন –

"Woman's function in life is not really confined to the physical plane. she is indispensable to man's mental creation as men is to her physical It is only because on the mental plane she works from behind the screen that we do not visualie her contribution . ."[৪] হুইটম্যানের (sexless love) সত্য কি মিথ্যা সে কথা হচ্ছে না, নারীর চেতনা কতখানি স্বাধীন, বিচার কতটা স্বচ্ছ, ক্রিয়া কতটা স্বয়ংপ্রকাশ নারী স্বাধীনতায় তা কতখানি সহায়ক তারই কথা বলছি। নারী একক পুরুষের সম্পত্তি নয়, সমাজেরও সম্পত্তি নয় সমাজের সেবায় স্বেচ্ছায় যে আত্মদান করবে, তার মাহাত্ম্য তাকে বুঝতে দিতে হবে। এতকাল সমাজের সেবা সে করেছে, তার অনেক সুফল হতে পারে, কিন্তু তা নিতান্ত পক্ষে সমাজেরই। তাতে সে নিজে কতটুকু প্রসারতা লাভ করেছে? করে নি, তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকে আসে নি। নিজের যে মহিমা ও সুপ্ত গুপ্ত প্রতিভা ও শক্তি

২। Letters of Sri Aurobindo, 2nd series, p 287

৩। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।।"— শ্বেতাশ্বতরউপনিষদ
"অতএব হি যোগীন্দ্র স্ত্রী পুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ।। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতি
কেবলং শাস্ত্র শংমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো নির্বির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।।— যোগবাশিষ্ঠ

৪। Roy, Dilipkumar 'Among the great', Americaned, p 219-220

(potentialities) তাকে সে ফুটিয়ে ফলিয়ে তুলতে পারে নি। পারে নি বলেই সমাজের অংশ হয়েও সে দুর্বলই রয়ে গেছে, 'নারী'ই রয়ে গেছে। নারীকে পুরুষ হতে হবে এমন কথা বলছি না। নারীকে সার্থক নারী হতে হবে, তার প্রসারতা, তার স্বাধীনতা, তার শক্তিকে ফুটিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে। এইখানেই এদেশের নারীর সার্থকতা।

নারী স্বাধীনতায় প্রথম অন্তরায় যান্ত্রিক ধর্ম্মের বন্ধন, সমাজের বন্ধন। মানুষের স্বাধীন চেতনা ও কল্যাণবোধকে ক্ষুণ্ণ করবার, আচ্ছন্ন করবার এর চেয়ে বড় শক্তি আর নেই। বিবেকানন্দ যে পৃথিবীটাকে "কুকুরের কোঁকড়ানো লেজ" বলেছিলেন, তার কারণ তার গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, আধ্যাত্মিকতা নয়। তাই নারীর স্বাধীনতার কথা যখন প্রথম উচ্চারণ করা হলো, তখন 'যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি শিহরি কানে দেয় হাত।' কিন্তু নতুন কথা নতুন আদর্শ যখনই আসে তখনি এবকম হয়।

ভারতীয় শাস্ত্রে আমরা আট রকম বিবাহবিধি দেখতে পাই—ব্রাহ্ম্য, দৈব্য, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ্য। এগুলোর মধ্যে এক একটি মানব চেতনার এক এক স্তরে সাধিত হয়। শুধু বাহ্য অনুষ্ঠান করলে বিবাহ ব্রাহ্ম বা দৈব হয় না। অথবা প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয় ঘটিত হলেই তা গান্ধর্ব হয় না।

স্বাধীন বিবাহের সার্থকতা কি? আমার অন্তরাত্মা যাকে বরণ করলে পূর্ণ হতে পারে, তাকে বরণ করায় যত 'পাপই থাকুক, আমার বিবর্তনের , আমার উর্ধ্বমুখী ক্রমবিকাশের (ascending evolution) পথে সে অন্তরায় হবে না। তাই তাকে বরণ করায় আছে সার্থকতা, নিগূঢ় সিদ্ধির স্বীকৃতি। ভারতের বিবাহবন্ধন নাকি আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ভিত্তির স্বরূপ বর্তমানে কি? সার্থকতা কতটুকু? তাও আলোচনা করা দরকার। বয়স্ক প্রবীণ যাঁরা তাঁরা দেখে শুনে বিবাহের মিল ঠিক করে দেন। সত্য কথা, মানুষের বৃত্তি—প্রবৃত্তি বিচার করে দুইটি জীবকে মিলিয়ে এদেশের বিবাহপ্রথা অনেকখানি সার্থকতা এনেছে। কিন্তু তা নিতান্ত পক্ষে জ্যোতিষ ও কর্মফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে মানুষের অন্তরের সন্ধান, অন্তরাত্মার সন্ধান নেবার দরকার আছে বলে মনে করা হয় না। তাই সার্থকতার চেয়ে ব্যর্থতাই বেশী করে ট্র্যাজিডি ঘনিয়ে তুলেছে। এই বাহ্যবিধির অনুশাসনে পড়ে কত জীবন শোষিত হয়েছে, কত 'বিনোদিনী', 'ছোটবউ', 'অন্নদা', 'রাজলক্ষ্মী'র জীবন সার্থকতাকে সমাজের বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে, তা আজ নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই।

যে বলে কর্মফল ভোগ ছাড়া পার্থিব জীবনের আর সার্থকতা নেই সে অধ্যাত্মতত্ত্বের, জীবনতত্ত্বের, বাইরের রূপটাই দেখছে, কিন্তু শব্দজালে তো জীবনের মধুসঞ্চয়কে পাওয়া যায় না, তাতে চিত্তবিভ্রমই ঘটে—'শব্দ জাল মহারণ্যম্ চিত্তভ্রম কারণম্।' মানুষের অন্তরের সত্য, গুহায়িত অন্তর পুরুষের সান্নিধ্য যে লাভ করে নি, সত্যের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। অন্তরাত্মারও একটি নিগূঢ় ইচ্ছা নিজেকে ফুটিয়ে ফলিয়ে প্রকাশিত করে তোলার ইচ্ছা, এই তো সেই শাশ্বত, এষণা—'অহং বহু স্যাম্।' এক তুরীয় ব্রহ্মের বহুরূপে রূপায়নের মধ্যে একটি মহৎ সত্য রয়েছে , তা জীবনকে ভোগ করা, জীবনকে

পাওয়া ও তার মধ্য দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করা। তাই সে কখনো কর্ম করে, কর্মফল ভোগ করে, কখনো অন্য লীলা ছন্দে মেতে ওঠে, কখনো বা সব ভেঙ্গে চুরে গুযে পিষে নির্বিকল্পে গিয়ে বিশ্রাম করে— সে যে নির্বিকার।[৫] তাই তারই ইচ্ছার প্রয়োজনে সে কখনো নারীকে স্ত্রীরূপে, কখনো মাতারূপে, কখনো কন্যারূপে এবং আরো বহুবিচিত্র রূপে বরণ করে। বিবর্তনের পথে চলতে চলতে সে যখন যাকে যেভাবে ইচ্ছা, গ্রহণ বর্জন করে। সমাজের বন্ধন তার উপর সাময়িক নিয়ন্ত্রণ চালাতে চায়। কিন্তু সে-শক্তির কাছে কোন বাহ্যবন্ধন শিশুর বাহুপ্রসারিত করে পথ আটকে ধরার মত। পাপপুণ্য পুরস্কার-তিরস্কারের বিধানকে সে উপহাস করে— এ যে পরম জ্ঞানীকে অ-আ-ক-খ পড়াবার চেষ্টা। "কিন্তু আসলে এগুলো কিনা আমাদের নিতান্ত ছেলেমানুষী বুদ্ধির কথা। ভগবানের বুদ্ধি ভাগ্যিস এর চেয়ে অনেক বেশী, তাই এমনটা হতে পারি নি।.......বস্তুত আধ্যাত্মিকতাকে আর পাপপুণ্যকে এমনিভাবে একত্রে জড়িয়ে মানুষকে যে একদিক থেকে স্বর্গের লোভ দেখানো হতো, আর একদিক থেকে নরকের বিভীষিকার চিত্র দেখানো হতো.....এ হলো সেই মান্ধাতা আমলের—ঈশ্বরবাদের একটু হেরফের। ভগবান যেন আমাদের "বাবা", তিনি যেন সেই পাঠশালার গুরুমশাই— ভাল ছেলেদের নাড়ু খেতে দিয়ে আর দুষ্ট ছেলেদের বেত পিটিয়ে দুনিয়া শাসন করছেন!" (Problem of Re-birth 1st--Sri Aurobindo পশুপতি ভট্টাচার্যের অনুবাদ) এই জন্যেই তন্ত্রে দেখি অন্তরাত্মার পূর্তির জন্যে তার ইচ্ছার বৈচিত্র্যে পঞ্চমকারের সাধনা, নানা ব্যভিচার। তান্ত্রিক চেয়েছেন মানবজীবনের পূর্ণতা। পরিপূর্ণ আত্মসম্ভোগ আত্মতৃপ্তি। এই অন্তরাত্মা তার ইচ্ছায় একই জীবনে এক বা একাধিক পতি-পত্নী গ্রহণ করতে পারে, বা সবকিছু বর্জনও করতে পারে। তার সুপ্ত গুপ্ত প্রতিভা বহুজনের বিচিত্র স্পর্শে স্বপথে বিকশিত করে—বিচিত্রশক্তি সংযোগে বিচিত্র হতেই সে চায়— একং বীজং বহু শক্তি যোগাৎ। একটিমাত্র সত্তা তার বিচিত্র বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কতকক্ষেত্রে সে চেষ্টা করে তার বিচিত্র বৃত্তিকে একদিকে ঘুরিয়ে তার প্রকাশ সাধন করতে। কিন্তু তাতে তার মহত্তম প্রকাশ হয় না। বাইরের রঙ মাখিয়ে অথবা সমাজ শাসনের চাবুক মেরে সার্কাস পার্টির বন্যপশু বশ করার মতই তার ব্যর্থতা। তাই প্রত্যেকে তার বিচিত্রধর্মকে প্রয়োজন বোধে বিচিত্র স্পর্শে সার্থক করুক—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। তা যদি না হয় মানুষকে একই কর্মসাধনের জন্যে ঘুরে ফিরে বহুজন্ম পাক খেতে হবে। কিন্তু আজকের (Progressive) মানুষ তা স্বীকার করবে কেন?

এর মধ্যে কথা উঠেছে—পুরুষকে বা নারীকে বহুধা বিক্ষিপ্ত করলে তার শক্তি জমাট সংযত হতে পারে না। যেখানে একমুখী একাগ্রতা নেই সেখানে গভীরতাও নেই। কিন্তু যেখানে প্রসারতা নেই সেখানে গভীরতা কদিন টিকে থাকে? একমুখী হতে পারে সেই, যে বিরাট বিপুল বিচিত্র। যে দুর্বল যে শীর্ণ যে সঙ্কীর্ণ, সে ই একটি খুঁটিকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে থাকে; তার ভয় ওটি ছেড়ে অন্যটি ধরতে গিয়ে যদি পড়ে যায়।

৫। একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপ বিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্যাতদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে।।—'পঞ্চদশী' (শঙ্করাচার্য্য)

গভীরতায় ডুব দিলে বহুবিচিত্র মূল্যবান রত্ন পাওয়া যায়। সহজ করে বললে একটি পুরুষ ও একটিমাত্র নারীর যে মিলন, যে মিলিত সাধনা, তা-ই সৃষ্টি করতে পারে মহত্তম কিছু, পেতে পারে বিরাট উঁচু কোন শিখরের সন্ধান। কারণ তাতে বাইরের বিক্ষোভ নেই, চাঞ্চল্য নেই, শক্রশক্তির প্রলোভন কম। আছে গভীর সংহত প্রগাঢ় আত্মনিমগ্নতা এবং tenacity এসব কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের সমাজে এই একনিষ্ঠদের স্বরূপ কি? স্রষ্টা কে? এর মূল প্রেরণা কোথা থেকে? তার ফলই বা কি হয়েছে?

শাস্ত্রকথা আব ভাবালুতা ছেড়ে দিলে, এসবের অন্তরালে কি দেখতে পাবো? একনিষ্ঠতার খোলস পরে কে দাঁড়িয়ে আছে? একটি জীবকে সমাজ যখন নির্জীব করে ফেলল তখন সে আশ্রয় চাইছে (অন্নবস্ত্র চাইছে—খোলাখুলি বলব কি?)। 'তুমিই পরমগুরু', 'পরম দেবতা'— এ সব কথার connotation আজ কি দাঁড়িয়েছে? নির্জীব এসে সজীবের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এ কি নিষ্ঠা, না নিষ্ঠার নামে প্রবঞ্চনা এবং আত্মপ্রবঞ্চনা? নিষ্ঠা তখনই সার্থক যখন সজীবে সজীবে মিলন, বীরের সঙ্গে বীরের কোলাকুলি। এই নিষ্ঠাই নিজেকে পূর্ণ করতে পারে। অথবা না করুক, তাতে আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, যে সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা আছে তা যত বড়ই হোক, সেই সাধনাবৃক্ষে যত ফলই ফলুক, তাতে ঘুন ধরতে কদিন? সে যে নিজেই নিজের শত্রু— আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

বস্তুত ভালমন্দ সবকিছুতেই আছে। আজকের সমাজে যে দুই একটি সার্থক জীবনযোগ নেই একথা কে বলবে? আর প্রাচীন সমাজ যে কোন কুফল প্রসব করেনি তাও নিশ্চয় করে কেউ বলে না। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, প্রভৃতি কার দান? নারী স্বাধীনতার এই হলো objective পথ। অর্থাৎ বাইরেব বাঁধন, সমাজ ও ধর্মেব বাঁধন ভেঙ্গে মানুষকে স্বাধীন পথে চলার স্বাধীনতা দেওয়া। তাঁর বহুতর সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে দেওয়া, পুষ্পিত বিকাশসাধনে সহায়তা করা। কিন্তু এই বাহ্য (objective) স্বাধীনতা দিলেই, সমাজের বাধন ভাঙলেই তার অন্তরাত্মা মুক্ত হলো না। চাই Subjective সাধনাও। তার জন্যে দরকার অন্তরাত্মার স্বচ্ছন্দগতির যা অন্তরায়, তাকে অপসারিত করা, আধ্যাত্মিক মুক্তি। ধর্মের বাঁধন ভেঙে আধ্যাত্মের মুক্তি। শুধু সমাজের যান্ত্রিক বিধান থেকে নয়। নিজের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা। বাইরের বন্ধন ভাঙ্গা হলো— অন্তরের বন্ধন, অহংবোধ, স্বার্থ, লোভ, আসক্তি আর নিম্নতর বৃত্তি রয়ে গেল—এই অবস্থায় নারীর শুধু বাহ্য মুক্তি এলে নারীপুরুষের মিলন শুভ সুন্দর মঙ্গলময় হবে না। নারীর এই আন্তর মুক্তি না হলে বাহ্য মুক্তি আনবে কেবল বন্ধনহীন ব্যভিচার। সাম্প্রতিককালে এই ভয়াবহ প্রবণতাই দেখা দিয়েছে। নারীর স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠার সুস্থ স্বপ্ন নিয়ে যে নারীবাদীরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এই বিপথগামিতা যে আত্মঘাতী!

আরো একটি কথা ভেবে দেখবার আছে। নারীবাদী আন্দোলন খানিকটা সফল হয়েছে সন্দেহ নেই। শিক্ষায় দীক্ষায়, কর্মে ও পেশায়, রাজনীতিতে ও প্রশাসনে নারীর

প্রতিষ্ঠা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুরুষই বরং ক্রমে ক্রমে পিছনে সরে দাঁড়াচ্ছে। দূর ভবিষ্যতে নারী-পুরুষের ক্ষেত্র-বিনিময়ও হতে পারে— আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালা-বদল ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু যদি কোনো দিন এই পালা বদল সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত হয় তখন কি আমরা পুরুষের মুক্তি চাই প্রতিষ্ঠা চাই বলে পুরুষবাদের ধুয়ো ধরবো? কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নারীওতো পুরুষের ওপরে অত্যাচার করে। এ প্রসঙ্গে স্বামী-বিবেকানন্দের উক্তি স্মরণে আসছে—

"তোষামোদ করা আমার কার্য্য নহে, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে সকল অবাধ্য রমণীগণের মন হইতে সহ্যগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকে যে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুষ্টির ভিতর রাখিবে, আর যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলিয়া থাকে তখনই চীৎকার করিতে থাকে—এরূপ রমণীগণ জগতের মহা অকল্যাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্দ্ধেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই রমণীগণ তাহাদের অর্দ্ধাশন-পীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে, আর তাহারাও বলিতেছে, "মহিলাগণ, আপনারাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত জীব।" তখন আবার ঐ রমণীগণ এই প্রচারকগণ সম্বন্ধে বলিতে থাকে—'ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক'; আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। কিন্তু জীবনটা ত এরূপ একটা তামাসা নহে, উহার মধ্যে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচনা করিবার বিষয় অনেক আছে।" — স্বামী বিবেকানন্দ

'কর্ম্মযোগ' ১৩৫৭, পৃ: ১০২-০৩

আসল কথা, আমাদের আন্দোলনের গোড়ায় গলদ ছিল। আমাদের আন্দোলন হবে নারীবাদী নয়, পুরুষবাদীও নয়, হবে মানবতাবাদী।

আর অবশেষে এও ভেবে দেখতে হবে যে, মানবতাবাদেরও সীমা আছে। একটু হেঁয়ালির মতো শোনালেও বলতেই হবে—মানবতাবাদের সীমা হলো মানবতাই। মানুষকে রক্তমাংসের মানুষের দোষ ও গুণ দুই নিয়েই ভালোবাসা ভালো; কিন্তু তার মানবতার গণ্ডির মধ্যে তাকে চির-সীমায়িত করে রাখা যে বিবর্তনের আর প্রগতির উজানে চলা। কিন্তু আমরা যদি চির-প্রগতিতে বিশ্বাস করি, আমরা যদি চূড়ান্ত প্রগতিবাদী হই, তবে আমাদের মানতেই হবে যে, মানুষের বর্তমান মানবতার সীমাকে অতিক্রম করে যেতেই হবে আরো সামনে, আরো ওপরে। নারীবাদ নয়, পুরুষবাদ নয়, মানবতাবাদও আমাদের শেষ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য আমাদের আরো অন্য কিছু। পথ আমাদের অনন্ত। সুতরাং চরৈবতি।

৮. যুক্তিবাদের সীমা

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, তিনি চলে গেছেন—এমন যখন ঘটে কোনো বড়ো মানুষ বা বড়ো মনীষীর ক্ষেত্রে, তখন অনেক রাজনৈতিক নেতা শোকবার্তা পাঠান, আর অনেক সামাজিক অভিনেতা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন, তখন আত্মীয়রা জরিপের ফিতে দিয়ে মাপতে বসেন—তিনি আমাদের কী ছিলেন, কতখানি ছিলেন! আমিও তাঁর আত্মীয়। কিন্তু আমি যখন জরিপের ফিতে দিয়ে মাপতে যাচ্ছি, তখন দেখতে পাচ্ছি জরিপের ফিতের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি উন্নতশীর্ষ ঋজু পুরুষমূর্তি—সেই মূর্তি আমার জনৈক যুক্তিবাদী পরমাত্মীয়ের মূর্তি। আমার সেই শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের নাম অধ্যাপক ধীরানন্দ রায়; ফিতের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে তাতে মাঝখানে আর কাউকে দেখা যায় না, শুধু বিপরীত প্রান্তে রয়েছে এক দেবীমূর্তি। তিনি আমার পরমাত্মীয়া পূজনীয়া তৃপ্তি রায়। তাঁকেই আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধরতে পারছি—স্বচ্ছ নির্মলচিত্ত কোমলহৃদয় শুভ্র মূর্তি—সে মূর্তি আমাদের মাসিমার। আমার পক্ষে তাঁর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়—কেবল একটি তুলনার সাহায্যে সেই মূর্তির অন্তর-বাহির খানিকটা ফুটিয়ে তোলা যায়; অথচ সেই তুলনাটা রয়েছে সাহিত্যে—সেটি হল *গোরা* উপন্যাসের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া জননীর মূর্তি *আনন্দময়ী*। তিনি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা দিয়ে গড়া। কিন্তু আমার মাসিমা যেন সেই ভাবমূর্তির বাস্তব রূপায়ণ। তাঁর কথা অনেকের কাছে এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তিনিই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। তাঁর স্নেহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে আমরা শান্তিপুরের শান্তিকুঞ্জে যেতাম বলেই সেই দূরপ্রান্তবর্তী ঋজু পুরুষকে দেখার সুযোগ হত।

আমাদের সাংসারিক জীবনে একটা সংকটের সুদীর্ঘ পর্ব গেছে। তখন আমরা বিপন্ন বিপর্যস্ত। যে মানব-জমিনকে চাষ করেছিলাম, আবাদ করলে সোনা ফলবে আশা করে, তার মধ্যপর্বটা অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে ঊষর পোড়ো জমি হয়ে গেল। এলিয়টের Waste Land-এর সঙ্গেও তার তুলনা চলে না, আমাদের দেশীয় তুলনাই বরং বেশি সার্থক—জীবনটা তখন হয়ে গেল ভয়াবহ মহা-শ্মশানভূমি। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে তখন সেখান থেকে পালাবারও কোনো পথ পাচ্ছি না। প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক দৈব-অদৈব সব রকমের পন্থা ও প্রচেষ্টা তখন ব্যর্থতামুখী। জীবনের এমন সংকটের উল্লেখ শ্রীঅরবিন্দের প্রতীককাব্য 'সাবিত্রী'তে পাই—

> "An absolute super-natural darkness falls
> On man sometimes when he draws near to God.
> An hour comes when fail all Nature's means."
>
> —*Savitri*, Book I, Canto II

এই কারনেই বোধ হয় আমার অন্তর্জীবনে তখন পথটা মোড় নিয়েছে জীবনের দেবতার দিকে; তাই সেখানে আলোর উদ্ভাস, অথচ বাইরের সাংসারিক জীবনটা তখনো পুরোপুরি সেই আলোকে প্লাবিত হয় নি—তখন অন্তরে আলো, বাইরে অন্ধকার;

অন্তরে একটা পরম প্রাপ্তির আশ্বাস, বাইরে সব হারানোর বেদনা। জীবনের এই দ্বৈত-রূপের চিত্রটা ফুটিয়ে তোলা যায় ডিকেন্সের 'এ টেল্ অব্ টু সিটিজ্' থেকে একটু ভাষা ঋণ নিয়ে :

> "It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us".....
>
> —*Charles Dickens : 'A TALE OF TWO CITIES', University of London Press Ltd., 1961, p. 43.*

—ডিকেন্স্ এ বর্ণনা দিয়েছেন বিশেষ একটা স্থানকালের সমাজজীবনের জটিল দ্বৈত-রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যে; আমি একে এখানে প্রয়োগ করছি আমার ব্যক্তিজীবনেব দ্বৈতরূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্যে। যদিও আমি জানি এই প্রয়োগটা অপপ্রয়োগ মাত্র, তবু ডিকেন্সের ভাষাশিল্পের সৌন্দর্যকে একটু ভিন্ন অর্থে হলেও কাজে না লাগিয়ে পারলাম না। যাইহোক, আমার সাংসারিক জীবনে যখন মনে হচ্ছে আমার সবই হারিয়েছি, আমার সামনে আশার আর কিছুই নেই, আমার বিপর্যস্ত জীবনে তখন 'শান্তির ললিতবাণী শুনাইছে ব্যর্থ পরিহাস', তখন একটু স্নেহের কোমল স্পর্শ, একটু পথনির্দেশের রশ্মিরেখা পাবার জন্যে আমরা মাসিমার কাছে ছুটে যেতাম, তখন মাঝে-মাঝে দুরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করে যেতাম চির-উন্নতশির সেই যুক্তিবাদী ঋজুপুরুষের কাছে। তখন তাঁকে কিন্তু প্রথাগত আত্মীয় বা গুরুজন রূপে পাইনি। কখনো কাছে ডেকে আমাদের বিবাহোত্তর জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, বাড়ি করা, গাড়ি কেনা বা অন্যবিধ বিষয়সম্পত্তির কথা জিজ্ঞেস করতেন না। তিনি 'নিত্যকার দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'-র মধ্যে কখনো নেমে আসতেন না, আমাকেও নামিয়ে আনতেন না। সেই ক্ষেত্রটিতে তাঁকে আমি পাইনি কোনোদিন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্যে মাত্র দু'দিন দু'টি উপদেশ তিনি আমায় দিয়েছিলেন। একটি দৈনন্দিন জীবনে প্রযোজ্য, অন্যটি উচ্চস্তরীয়। আমি ভোজন-রসিক ছিলাম বলে তিনি আমায় বলেছিলেন—'বেশি যদি খেতে চাও, কম খাও তবে।' আর বলেছিলেন—'Try to live with honour and die with dignity'। আজ জীবন-সায়াহ্নেও তাঁর উপদেশ দু'টি ভুলিনি আমি।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন অধ্যাপক। সেখানেও পেশার নাগপাশে আবদ্ধ দেখিনি তাঁকে কোনোদিন, অনেক তথাকথিত অধ্যাপককে যেমন দেখেছি স্কেল-রিভিশন, পে-প্রোটেক্শন, ডি এ, ইন্ক্রিমেন্ট, প্রোমোশানের বাঁধা বৃত্তে আবর্তিত হতে, তাঁকে কোনোদিন সে পথে দেখিনি। আধুনিক কেরিয়ারিজ্মের (careerism) শিকারও হননি তিনি। তাই উত্তর-উত্তর ডিগ্রির মোহ ছিল না তাঁর কোনোদিন। কেরিয়ারের সঙ্গে ডিগ্রিকে যুক্ত করে দেওয়ার ফলে একালে পি-এইচ. ডি, ডি. লিট. প্রভৃতি ডিগ্রি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সস্তা ও সুলভ হয়ে গেছে এবং এই ডিগ্রির মোহ্ সত্যকার পাণ্ডিত্যকে, বিশেষ করে মৌলিক

চিন্তাকে, নির্বাসন দিয়েছে—এই ছিল তাঁর নির্ভুল সিদ্ধান্ত। নীচে নেমে টিউশানির টাকা মেলাতেও তাঁকে আমি দেখিনি। টিউশানি তিনি করতেন না। কারণ তিনি একটুও লোভী ছিলেন না। তাঁর জীবনটাই ছিল একটা শিল্প; তাঁর বাড়ি, বাগান, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সবই ছিল ছবির মতো সাজানো, ছিমছাম। তেমনি মনন ও মানসিকতায় তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী। এই পরিচ্ছন্ন মনন ও বৈদগ্ধ্যের রাজ্যেই পেয়েছি তাঁকে সর্বক্ষণ। কোনো ব্যাপারে এখানে অস্পষ্ট জ্ঞান বা ধোঁয়াটে ধারণা নিয়ে কোনোদিন তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে দেখিনি।

নানা বিষয়ে তাঁর ছিল বিশ্বতোমুখী জ্ঞানতৃষ্ণা। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব'-ও আমাকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। যখনি যেতাম তাঁর কাছে, জিজ্ঞেস করতেন—কী বিষয়ে কাজ করছি এখন, কী বিষয়ে পড়াশোনা করছি। আমাব নিজের আগ্রহের দুটি বিষয়ের কথা বারবার বলেছি—ভাষাবিজ্ঞান আর শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব। একবার বললেন—'তোমার নতুন কথা কী বলেছ তোমার বইতে?' দু-একটা বিষয়ে এমন তলিয়ে প্রশ্ন করতেন যে, ভাষাবিজ্ঞানে আমাকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। কেবল একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি বললাম—'কোনো ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন—যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখগহ্বরে শ্বাসবায়ু কোথাও বাধা পায় তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে; কিন্তু আমি বলেছি—শুধু মুখগহ্বর কেন, কণ্ঠে বা ওষ্ঠেও শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।' তিনি বললেন—'পূর্বোক্ত ভাষাবিজ্ঞানী যে মুখগহ্বরের কথা বলেছেন সেই মুখগহ্বরের মধ্যেই কণ্ঠ এবং ওষ্ঠও ধরা হয়েছে'। এমনি করে যে-কোনো বিষয়ই শেষ পর্যন্ত পরিষ্কাব না করে ছাড়তেন না। তাই বলছিলাম—একান্ত যুক্তিবাদী এবং জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী ছিলেন তিনি।

সত্যি কথা বললে হয়তো একটু বড়ো কথা হয়ে যাবে। তবু অন্তত তাঁর মননধর্মের গোত্র নির্ণয় করতে হলে বলতেই হবে--তিনি ইংরেজদেব মধ্যে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল ও বাঙালীদের মধ্যে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো নির্মোহ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানসিকতার পথে চলেছেন। একান্ত জড়বাদী ও যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলে তিনি ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, পরলোক প্রভৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আমাব সঙ্গে আলোচনায় যখন এসবের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন, তখন তাঁর প্রখর যুক্তির সামনে আমি টিকতে পারতাম না। মনে-মনে ভাবতাম আমার আদর্শ পৃথক। যুক্তির মানদণ্ডে সবকিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না; অনেক কিছুরই অস্তিত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব কবতে হয়। আমার সেই আত্মীয় যুক্তিবাদী ছিলেন এবং নাস্তিক ছিলেন। এ যুগে অনেকেই এরকম নিজেকে যুক্তিবাদী ও নাস্তিক বলে থাকেন। এই আত্মকথনের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বা মহিমা আমি প্রতিষ্ঠিত করছি না। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং মহিমা এই যে এ বিষয়ে তিনি কোনোদিন ভণ্ডামির আশ্রয় নেননি; বরং তাঁর বিশ্বাস তাঁর ব্যক্তিত্বে রূপায়িত হয়েছিলো, তাঁর জীবনদর্শন তাঁর জীবনচর্যায় বাস্তবায়িত হয়েছিলো এবং সেটা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এবং শেষদিনের পরেও কার্যান্বিত হয়েছে। এ যুগে অনেক যুক্তিবাদীকে দেখি মিটিং-এ নাস্তিকতার বুলি আওড়াতে অথচ বাড়ির উঠোনে দেখি লুকিয়ে শনিপূজা

করতে! ব্যক্তিত্বের এই দ্বিধাবিভক্তি তাঁর ছিলো না, তাঁর যুক্তিবাদে ছিলো না কোনো ভণ্ডামি। সেটা তিনি শেষ পর্যন্ত প্রমাণও করে দিয়ে গেছেন। আত্মায় বা পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে নিজের সব-রকম পারলৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠান পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে গিয়েছিলেন। সমাজবাদী ছিলেন বলে নিজের মরণোত্তর দেহটি পর্যন্ত সমাজকল্যাণে দান করে গিয়েছিলেন। নিজের আদর্শ অনুযায়ী এই যে নিজেকে ঢেলে সাজানো, এই যে নিজেই নিজের আদর্শ হয়ে ওঠা, এইটাতেই তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা। আগেকার ধনী জমিদারদের মতো ধর্মশালা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বা পুষ্করিণী খনন, কিংবা আজকের রাজনৈতিক নেতার মতো স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, ব্রিজ বা ফ্লাইওভার উদ্বোধন ইত্যাদির মতো বড়ো-বড়ো কীর্তিস্তম্ভ তিনি গড়ে যাননি, কিংবা জীবনানন্দের গবেষক-অধ্যাপক বা ইয়েট্‌সের Scholar-এর মতো দুষ্কর গবেষণা করে 'মৃত সব কবিদের মাংস ক্রিমি' ঘেঁটে দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করে যাননি। তাই বলছিলাম, তাঁর বৈশিষ্ট্য বা মহিমার মূল্যায়ন তাঁর বাণী দিয়ে হবে না, তাঁর কাজ দিয়েও হবে না, তাঁর এই 'হয়ে-ওঠা' (becoming) দিয়েই বিচার হবে তাঁকে।

এদিক দিয়ে বিচার করে তাঁকে বারবার শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলি—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' নিজের জীবনদর্শন অনুযায়ী নিজেকে গড়ে নিয়েছিলেন বলে তাঁর বিশ্বাসে তিনি অবিচল ছিলেন।

বারবার বলছি তিনি কট্টর জড়বাদী যুক্তিবাদী ছিলেন, তাঁর প্রত্যয়ে, তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় অবিচল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণা মানুষকে আজ নিত্য-পরিবর্তনশীল নব-নব আবিষ্ক্রিয়া ও নব-নব সিদ্ধান্তে নিয়ে চলেছে, তাই আমার মনে হয় বৈজ্ঞানিকের জড়বাদই একদিন তাঁর আজকের সিদ্ধান্তের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে পারে—এই কথাটি আমি তাঁর কাছে বারবার তুলে ধরতাম। বিজ্ঞানীরা যে-রকম জড়পদার্থ (matter) সম্পর্কে অতি দ্রুত নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কার করে চলেছেন, তাতে মনে হচ্ছে জড়বাদ (materialism) একদিন নিজেই নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে তাঁকে পড়েও শুনিয়েছি :

> 'If modern Materialism were simply an unintelligent acquiescence in the material life, the advance might be indefinitely delayed. But since its very soul is the search for Knowledge, it will be unable to cry a halt; as it reaches the barriers of sense-knowledge and of the reasoning from sense-knowledge, its very rush will carry it beyond and the rapidity and sureness with which it has embraced the visible universe is only an earnest of the energy and success which we may hope to see repeated in the conquest of what lies beyond, once the stride is taken that crosses the barrier. We see already that advance in its obscure beginnings.'
>
> —*The life Divive, New York 1951, Ch II.* pp. 14-15

কিন্তু তবু তাঁর সঙ্গে আমি তর্কে পারিনি কোনোদিন। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তিতে যতই আমি তাঁর কাছে বারবার হেরে গেছি ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। এবং আমি শেষে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর তলায় আশ্রয় নিয়েছি—

"...সর্বপ্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-সব পরিত্যাগ কর। শুষ্ক তর্কে কি ফল? উহা কেবল সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে। সূক্ষ্মস্তরের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। কথায় কি তাহা হইবে? অতএব সর্বপ্রকার বৃথা বাক্য ত্যাগ কর।... যুক্তিবিচারকে অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে।

"...জীবনের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা চিরকাল এই চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন? কোন্ যুক্তি দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্যা করা যায়? যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করিবার না থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা হইয়া থাকিবে। ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বলা হয়।

'ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাঁহাকেই যথার্থ অজ্ঞেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সর্বস্ব হয়, তবে শূন্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমবা কোথাও দাঁড়াইতে পারি না। কেবল অর্থ, যশ, নামের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অপব সব বিষয়ে যদি কেহ নাস্তিক হয়, তবে সে একটি জুয়াচোর মাত্র। ক্যান্ট (Kant) নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিযাছেন যে, আমরা যুক্তিরূপ বিরাট পাষাণ-প্রাচীন ভেদ করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথা : আমরা যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারি।... যাহা যুক্তির ঊর্ধ্বে সেখানেই আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।...

"...নানা প্রকার লোকের সঙ্গ চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। .. বেশী কথা বলা উচিত নয়, কারণ বেশী কথা বলিলে মন বিক্ষিপ্ত হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ২১০, ২৩০-৩১, ২০৯।

শ্রদ্ধেয় যুক্তিবাদীর কাছে আমার নিজের পরাজয়ের মধ্যেই আমি সান্ত্বনা খুঁজেছি। মনে মনে বলেছি—'আমার এপথ তোমার পথের থেকে গেছে বেঁকে।'

৯. শক্তিসাধনা : সেকাল ও একাল

বাঙালীর শক্তি সাধনা ও তার ফলশ্রুতি : ভারতের সাধক সৃষ্টির মূলে দুটি সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন—ঈশ্বর ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি। বলেছেন—দুটিকেই আদি ও অনন্ত বলে জেনো—প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যনাদি উভাবপি। বিশ্বলীলার রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা এই দুইরূপের কথা বলেছেন, কিন্তু দুইরূপকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, দেখেছেন একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ রূপে। শ্রীঅরবিন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

The answer most approved by ancient Indian mind was that Force is inherent in Existence. Shiva and Kali, Brahman and Shakti are one and not two who are separable. –The life Divine, Vol. I, ch X.

শক্তির এই ধারণা খ্রীস্টীয় ও ঐস্‌লামিক ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মকে পৃথক করেছে। আবার শক্তিসাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে মূলত বাঙালীর মধ্যে। শক্তিসাধক বলে বাঙালীর খ্যাতি আছে। অবশ্য চিন্ময়ী শুদ্ধা আদ্যাশক্তির উপলব্ধি বৈদিক ঋষিদেরও ছিল—

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।

ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো তামুন্দ্যাং বর্ম্মণোপস্পৃশামি।—ঋগ্বেদ; দেবীসুক্ত।

এই দেবীসুক্তের মধ্যে কেউ-কেউ ভারতীয় শক্তিবাদের উৎস খুঁজেছেন। তথাপি পিতৃপ্রধান আর্যজাতির মধ্যে পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য ছিলো। তাই শক্তিবাদ ঋগ্বেদীয় উৎস থেকে এসেছে কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।[১] কিন্তু বাঙালী মিশ্রজাতি, আর্যেতর মাতৃপ্রধান জাতির প্রভাব রয়েছে তার বিশেষ মানস-গঠনে, তার শক্তিসাধনার প্রেরণায়। বাঙালীর মাতৃশক্তির উপাসনা, তার তন্ত্রসাধনা, তারই বিশিষ্ট সম্পদ। এদেশে এসে বৌদ্ধ ধর্মও তাই বিশুদ্ধ অহিংস ধর্মরূপে টিকতে পারেনি, বাংলার তান্ত্রিক প্রভাব তার ওপরেও ক্রিয়া করেছে। ক্রমে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ও শক্তিতান্ত্রিক সাধনপন্থা বৌদ্ধ সাধনপন্থার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।[২] তার পরিচয় পাই সহজযান সম্প্রদায়ের সাধনায়, চর্যাপদাবলীতে। এমন কি যে রাধাবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সেই রাধাবাদও পণ্ডিতদের মতে এসেছে ভারতীয় শক্তিবাদ থেকেই।[৩] বাঙালীর লোকসাহিত্যে এবং লৌকিক সাধনাব কথা বলাই বাহুল্য। তার লৌকিক ধর্ম সাধনায় নারী-দেবতারই

---

১. দ্রষ্টাব্য : ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : শ্রীরাধাব ক্রমবিকাশ, পৃ ৬।

২। "বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহ্যসাধন-পন্থার সঙ্গে শক্তি ও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্যসাধন-পন্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু বহিল না, দুয়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পাল পর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পবিণতি লাভ করিল।"—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস।

৩।" .. ..রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে। সেই সাধারণ শক্তিবাদই বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সহিত বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেই ক্রম-পরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তিই বাধাবাদে।"

—ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ: ৩।

প্রাধান্য ছিল। মনসা-মঙ্গল আর চণ্ডীমঙ্গলের সুদীর্ঘ সাহিত্য-ইতিহাসে তার পরিচয় পরিস্ফুট। শক্তিভক্ত বাঙালীর কবি কৃত্তিবাস বৈষ্ণব-প্রকৃতি রামকে দিয়েও শক্তিপূজা করিয়েছেন। আসলে সংস্কৃতের ভাব-বস্তুর ('matter of Sanskrit world') সঙ্গে বাংলার ভাব-বস্তুর ('matter of Bengal') মিলন-মিশ্রণ যতই হোক না কেন শক্তিসাধনাকে বাঙালী চিরকাল আপনারই করে রেখেছে।

তার এই শক্তিসাধনার ফলশ্রুতি হয়েছে মহৎ, তার মনোজীবনে. তার অন্তঃসত্তায় এই সাধনাই এনে দিয়েছে বাঙালীর বাঙালীত্ব। সে কথা শ্রীঅরবিন্দ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছেন—জ্ঞানের প্রতি শিশুসুলভ অসীম কৌতূহল, কল্পনার ঐশ্বর্য ও মহত্তর চিন্তায় ভারতীয় জাতিসমূহে সে অগ্রণী হয়েছে। যুক্তিতে সে অগ্রসর হয়েছে 'নব্যন্যায়ে'র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তার্কিক বিশ্লেষণে, আবার সব যুক্তির অতীত অতীন্দ্রিয় দিব্যলোকের রহস্য ব্যাখ্যা করেছে অবলীলাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যার প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেখি। এছাড়া বাঙালীর রয়েছে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যার জোরে সে সমগ্র ভারতবাসীকে চরমপন্থার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। এসবই তার দীর্ঘকালের শক্তিসাধনার ফল।[8] কারণ মহাশক্তির হাতে সে নিজেকে তুলে দিয়েছে শিশুসুলভ সারল্যে। ফলে সে হয়ে উঠেছে মহাশক্তির যোগ্য আধার, তাঁর দিব্যইচ্ছা ও দিব্যশক্তির যোগ্য বাহন। এই বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে তার শক্তিসাধানার। এই সুদীর্ঘ সাধনার সুফলও সে পেয়েছে অনেক। অথচ এই ঐতিহ্যের পুনরাবর্তনও আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে এর কারণ কী? এর উত্তরও পেয়েছি আমরা। বিবর্তনের গতি এসে জীবন ও যুগকে পরিবর্তিত করেছে। সেইজন্যে আগে এই পরিবর্তিত যুগ ও জীবনের স্বরূপটা বুঝে নিয়ে তারপরে দেখতে চেষ্টা করব এযুগের শক্তি-সাধক শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনের মধ্যে নতুন যুগের শক্তিসাধনার কী নির্দেশ পাই।

যুগ-বিচার ও নিরীক্ষা : কথা প্রচলিত আছে—সাহিত্যে যুগের সমাজের ও জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য যুগকে ধারণ করে। দেখা যাক আমাদের আধুনিক সাহিত্যে আধুনিক সমাজের বর্তমান যুগের কোন্ রূপটি ফুটে উঠেছে।

আধুনিক সাহিত্যিকরা বলছেন, দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের জীবনের বুনিয়াদ ভেঙে গেছে, তার জীবনশ্রী আর নিরাময় হয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্যে বলিষ্ঠ বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না। অভাব অনটন অশান্তি যুদ্ধের হিড়িক এবং তার ফলে জীবনের বিপুল অবক্ষয়ের মুহূর্তে চিরন্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথায়—

> "মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
> সংক্রমিত মড়কের কীট;
> শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।"
>
> —নরক : ক্রন্দসী।

এই বুঝি সৃষ্টির বিনাশ হল—মানুষ হাল ছেড়ে হাহাকার করতে বসেছে—

8. Sri Aurobindo Brain of India, Ch I

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

–T.S. Eliot : 'The Hollow Man'.

দ্বিতীয়ত, আমাদের সভ্যতায় এসেছে জটিলতা—বহুতর সমস্যা এবং বিভিন্নমুখী বিকাশ। দেখছি আমরা বহু জিনিষ, চিন্তা করছি আমরা নানা বিষয়ে, কারণ ঠিক যেন ধ্যানস্থ হতে পারছি না কোন একটি জীবন-প্রত্যয় নিয়ে। কবি সমালোচক যুগটিকে চিনতে পেরে বলছেন—

Our civilization comprehends great variety and complexity playing upon a refined sensibility, must produce vorious and complex results.[৫]

নিরাশ হযে কবি যেন যন্ত্রনাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন—

অতএব পরিত্রাণ নাই।/ যন্ত্রনাই জীবনে একান্ত সত্য;/ তারই নিরুদ্দেশে আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয়/ প্রত্যক্ষ নিমেষে। —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'নরক'

অবক্ষয়ের সার্থকতা : সভ্যতার এই উৎক্রান্তিমুখীনতায় এই হল যুগের অপরিহার্য সত্য। এর একটি আধ্যাত্মিক অর্থ ও সার্থকতাও আছে। পুরাতনের সহজ অনুসরণে বিপদ নেই, নতুনকে গ্রহণের মধ্যে ঝুঁকি অনেক। জীবনে সহজ সুবিধার সন্ধানী মানুষ, তার পুরোনো সংস্কারকে, তার অন্ধবিশ্বাসকে, সঙ্কীর্ণ জীবনবোধকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায় সে। বৃহত্তর মুক্তি, উদারতর সত্য আজ যখন একটি নতুন পথে তাকে নিয়ে যেতে চাইছে, তখন তাব অস্বীকৃতি, তার অনিচ্ছা। এই প্রবলতব শক্তির আঘাতেই তার এই বিপর্যয়। এমনি এক-একটি ভাঙনের পরে আসে এক-একটি নতুন সৃষ্টি। এই আঘাতে সংঘাতে মানুষ তার জীবনের সীমাবোধকে ছাড়ছে। চিরাভ্যস্ত সংস্কারকে ত্যাগ করে মৃত্যুভয়কেও উপেক্ষা করছে—

আসন্ন প্রলয়। মৃত্যুভয
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে। (সুধীন্দ্রনাথ : নরক, 'সংবর্ত')।

এই অবক্ষয়ের আরো একটি সার্থকতা রয়েছে। মানুষ যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে অধস্তলে, তার চেতনা যে নেমে পড়েছে 'নরকে', তা হয়েছে তার চরম উর্ধ্বগতির জন্যেই। জীবন যেন আরো প্রবল বেগে এগিয়ে যাবার জন্যেই খানিকটা পেছনে সরে এসেছে নিজের ইচ্ছাতেই, নিজের প্রয়োজন বুঝেই। অবিদ্যার দ্বারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হবে সে—অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতং অশ্রুতে। আধুনিক কবির চেতনায়ও যুগের এই সার্থকতাটি ধরা পড়েছে—

"তৃপ্তিহীন বিরহে জ্বলছো তুমি—জ্বলতে দাও, পুড়ে যাক যা-কিছু তোমার পুরানো, ডিমের খোলসের মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক অন্য এক জগৎ, এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আবো, আরো অন্ধকারে, যখন সব হারাবে,

---

৫ T S Eliot Selected Essays', p 289

কোনো চিহ্ন আর থাকবে না, তখনই তোমাকে ধরে ফেলবে অতীত, এগিয়ে আসবে তোমার দিকে ভবিষ্যৎ সব নতুন-নতুন হয়ে।"—বুদ্ধদেব বসু : শীতরাত্রির প্রার্থনা

এ যুগের শক্তিসাধনার স্বরূপ :—বর্তমান যুগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি, এর লক্ষণ হচ্ছে কর্মব্যস্ততা, বিজ্ঞান-সাধনা, আন্তর্জাতিকতা, আর সকলের উপরে সেই এক চিরন্তন সংকল্প—দুঃখ ও মৃত্যুকে জয় করে জীবন ও জীবন-রসের সীমাকে ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়ার সংগ্রাম। যুগের এই স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করেই আধুনিক কালের শক্তি-সাধনার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। এ যুগের এই বিপুল অবক্ষয় ও তার সার্থকতাও তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তাই এ যুগের উপযোগীই শক্তি-সাধনার পথ দেখিয়েছেন তিনি। কারণ, জগৎ ও জীবনকে তিনি স্বীকাব করেই নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে যুগকেও তিনি বরণ করেছিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন সবকিছুর অন্তরের সত্যটিকে খুঁজে বের করতে, তার সার্থকতাকে এক সত্যতর গভীরতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর দৃষ্টির আলোকে আমরা যুগের স্বরূপ ও তার সার্থকতা বিচার করতে চেষ্টা করেছি। এখন এই যুগের উপযোগী তাঁর শক্তিসাধনার পথ-নির্দেশ কী তা দেখতে চেষ্টা করব।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন ঔপনিষদিক যুগের পর থেকে আমরা ক্রমশ এ জীবন থেকে মুখ ফেরাতে থাকি এবং শঙ্কর ও বুদ্ধেব যথাক্রমে নেতিবাদ ও নাস্তিবাদ এবং পরবর্তী কালের নানা পবলোকবাদী ধর্মমতের প্রভাবে জীবনকে ত্যাগ করার মধ্যেই পরম পুরুষার্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। এর ফলে ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ চতুর্বগেব সাধনায় ভারসাম্য নষ্ট হযে গেল। বলাও হয়ে থাকে আমরা পরকালের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলাম বলেই ইহকালের ইতিহাস লিখলাম না। বলা-বাহুল্য এ যুগে আমরা যখন জীবনকে পূর্ণ করে স্বীকার করতে চলেছি তখন বাস্তবের কোন খুঁটিনাটিকেই আমবা বাদ দিতে পারি না।

এখন আবার এই বাস্তবমুখীনতার জন্যে আমরা অতিমাত্র কর্মব্যস্তও হয়ে উঠেছি। জীবনের ছন্দ থেকে কর্মকে আর যে কেটে বাদ দিতে পারব না একথা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। এ যুগের শক্তিসাধনায় তাই শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। বলেছেন, তোমার নিজের সত্তার প্রয়োজন বুঝে অন্য যোগপথগুলি বাদ দিলেও দিতে পাবো, কিন্তু কর্মযোগ ছাড়া পূর্ণযোগের সাধনায় পূর্ণতম সংসিদ্ধিকে পাবে না। তবে তোমার প্রতিটি কর্মের পেছনে থাকবে যজ্ঞবোধ—দিব্য জননীর পায়ে উৎসর্গীকৃত সাধকের নিরাসক্তি। ভগবতী মায়ের কাছে সর্বাঙ্গীণ সমর্পণই হচ্ছে এই শক্তিসাধনার প্রথম এবং শেষ কথা—"Surrender is the first word of this yoga and surrender is the last word of this yoga'—All India Magazine (What is yoga) বলা বাহুল্য এখানে দিব্য-কর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় কর্ম বোঝায় না, জীবনের শুদ্ধতর অথচ পূর্ণতব রূপায়ণের জন্যে প্রতিটি কর্মই দিব্যকর্ম। এই কর্মযোগের সাধনায় বিভিন্ন স্তর আর তার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মও আছে। এর উচ্চতম স্তরেও সাধক প্রারব্ধ ক্ষয় করে ব্রহ্মনির্বাণে বিলীন হয়ে যান না, জীবন্মুক্ত হয়ে প্রকৃতিব সমস্ত কর্মের মধ্যে মহাশক্তিরই এক গূঢ় বিধানকে প্রত্যক্ষ করেন।

এ যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতিও শক্তিসাধকের কোন ক্ষোভ নেই। সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল এক অসীম শক্তিকে দেখে বৈজ্ঞানিকরা যেমন কেউ-কেউ বিস্মিত হয়েছেন, শক্তিসাধনকও তেমনি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করছেন না। বিজ্ঞানও পরোক্ষে শক্তিসাধনাই করে চলেছে, শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে বলেছেন—

Physical analysis of Matter by modern Science has come to the same general conclusion, even if a few last doubts still linger. Intuition and experience conform this concord of Science and Philosophy. Pure reason finds in it the satisfaction of its own essential conception. For even in the view of the world as essentially an act of consciousness, an act is implied and in the act movement of Force, play of Energy.[৬]

এ ছাড়া শক্তিসাধক যোগের মধ্য দিয়ে এই শক্তির উৎসে গিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন এবং প্রত্যক্ষ বোধির মধ্য দিয়ে যা পাচ্ছেন তারই আলোকে তিনি একটি সামগ্রিক জীবনদর্শনের প্রেক্ষাপটে জগৎকে দেখছেন—সুতরাং বিজ্ঞানকেও দেখছেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁর কোনো মিথ্যাচার নেই তেমনি প্রচলিত আচারনিষ্ঠার প্রাণহীন কাঠিন্যও নেই।

আমাদের কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতার দিকে। অতি-আধুনিক কালের ধুয়ো হচ্ছে—বিশ্বায়ন (Globalisation)! ধর্মের ও দেশের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে আমরা চাইছি একটা বৃহত্তর পরিধির মধ্যে নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করতে। অন্ধ সঙ্কীর্ণ সংস্কার আর অর্থহীন দেশাচার প্রাকৃতিক নিয়মেই উঠে যাচ্ছে। কিন্তু সংস্কার এবং দেশাচারকে অনেক দিন থেকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একার্থক বলে ধরে আসছি বলে পশ্চিমের প্রথম ভাব-তরঙ্গের ধাক্কায় আমরা কুসংস্কারের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকেও বর্জন করতে বসেছিলাম। বিবেকানন্দ এই ভ্রান্তি থেকে জাতিকে রক্ষা করেন। তারপরে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার উপরে শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর অতিমানস রূপান্তরের শক্তিসাধনা—পূর্ণযোগ। শ্রীঅরবিন্দ যে শক্তিসাধনার পথ নির্দেশ দিয়েছেন তাতে আধ্যাত্মিকতার শুদ্ধরূপটি রক্ষিত হয়েছে, ধর্মের যা বাইরের ঠাট তা-ই বর্জিত হয়েছে বস্তুত শক্তি-সাধনায় মানুষের অন্তঃসত্তার শাশ্বত ও সার্বিক সত্যের ওপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। প্রেম, ভক্তি, আস্পৃহা, অনাসক্তি, আন্তরিকতা, আত্ম- সমর্পণ—তাঁর সাধনার এই পথগুলি সর্বধর্মের সার নিয়ে গড়ে উঠেছে; এ ধর্ম তাই সর্বমানবের আন্তর্জাতিক সাধনার পথনির্দেশ দেয়। আমাদের প্রাচীন তন্ত্র-সাধনার মহত্ত্বও অনেকখানি। কিন্তু ঠিক এই কারণেই তারও বাইরের আনুষ্ঠানিক দিকটুকু ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তার ভাবমূল্যটুকু গ্রহণ করেছেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে, একই লোকের মধ্যে যেমন একাধিক যু' গ্রথিত থাকতে পারে তেমনি একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক ধর্মের ও ব্যক্তিত্বের প্রভা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করতে থাকে। সে-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ সাধকের স্বধ স্বভাব ও রুচিকে অস্বীকার করেন নি। এই পথের শক্তি-সাধক নিজের প্রয়োজন অনুসা

৬. The Life Divine, Vol I, Ch X

নিজের অন্তর্যামীর কাছেই পাবেন সাধনার ইঙ্গিত। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন ছক-কাটা শিক্ষা সাধক-মাত্রের পক্ষেই ফলপ্রসু হবে এমন নির্দেশ তিনি দেন নি। শ্রীঅরবিন্দের শক্তি-সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় সাধক যে-কোনো দেবদেবীর আশ্রয়ে সাধনা করতে পারেন, শুধু মূল দিব্য সত্যের ঐক্যবোধটুকু সজাগ রাখলেই হল।

এই শক্তি-সাধনার পথ যেমন সর্বদেশের সর্বজনের জন্যে, তেমনি সর্বকালের মানবাত্মার যে দাবী, নচিকেতার যা শাশ্বত অভীপ্সা—অজর অমরত্ব—শ্রীঅরবিন্দ এর সিদ্ধিতে তা-ই চেয়েছিলেন। পৃথিবীর দুঃখকে মৃত্যুকে জয় করার প্রযাস মানুষের চিরকালের। কেউ তাতে ব্যর্থ হয়ে নির্বাণে কিংবা 'গোলোকে' সরে পড়বার পরামর্শ দিয়েছেন, কেউ বা পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশাকে জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন—এতেই পূর্ণতা—দুঃখ ও সুখ জীবনেরই দুটি অপরিহার্য দিক। শ্রীঅরবিন্দ এই দুই রকম জীবন-প্রবঞ্চনার কোনটিকেই সমর্থন করেন নি। বলেছেন, সত্য যদি থাকে তবে লোকান্তরে নয়, এখানেই তাকে লাভ করতে হবে, মর্ত-পৃথিবীতেই দৈহিক অমরত্ব, জীবনের পূর্ণতা স্থাপনের দিন এসেছে। এর অর্থ হল—

"The evolution not only of an untramelled consciousness, a mind and sense not shut up in the walls of the physical ego or limited to the poor basis of knowledge given by the physical organ of sense, but a life-power liberated more and more foim its mental limitations, a physical life fit for a divine inhabitant and,—in the sense not of attachment or of restriction to our present corporial frame but an exceding of the law of the physical body,-the conquest of death, an earthly immortality."[৭]

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সাধনা সর্বমানবের আন্তর্জাতিক সাধনা বলেই কি এতে অধিকারবাদ বলে কিছু নেই! আছে, কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। নিয়ম, যম, স্বাধ্যায়, চরিত্রবল-—এ সবই তোমার থাকতে পাবে। তবু তুমি এই সাধনায় অনধিকারীই হয়ে থাকতে পাবো। এ সাধনায় প্রথমেই চাই তোমার অন্তরকে জানা—তোমার অন্তরতম অভীপ্সা কিসের জন্যে? তোমার অন্তরের গভীরে এই দিব্য-জীবনের প্রতি একটি সহজ সরল ডাক শুনতে পাচ্ছো কি? তা যদি পেয়ে থাকো, তোমার সাধনার পথে তুমি এগিয়ে যাও। তোমার অন্তরের আহ্বানে মহাশক্তি তোমার হৃদয়ে আসন পেতে বসবেন, তোমার জীবনের রথটি চালাবার দাযিত্ব তিনিই নেবেন। তাঁর কৃপা যে মূককেও বাচাল করে, পঙ্গুকেও এনে দেয় গিরিলঙ্ঘনের শক্তি। তুমি তাঁরই হাতে তুলে দাও তোমার জীবন-সাধনার দায়িত্ব। শিশুর মতো সহজ সারল্যে অচল বিশ্বাসে লেগে থাকো অবিচলিত নিষ্ঠায়। এসাধনায় তিনিই সাধ্য, তিনিই সাধক। সাধকের আধারকে তিনিই রূপান্তরিত করে নেবেন তাঁর দিব্যলীলার শ্রীক্ষেত্ররূপে। আবার একদিকে শিশুর সারল্যে মহাশক্তির হাতে নিজেকে তুলে দিতে হবে, অন্যদিকে তেমনি বিরোধী শক্তির মন্ত্রণা, নিম্নপ্রকৃতির

৭. The Life Divine, Vol I, Ch XXVI

প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই সাধনায় আত্মসমর্পণের শেষস্তরে এসে সাধকের ক্ষুদ্র অহং-সীমা ভেঙ্গে যায়। সাধক ভগবতী জননীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বুঝতে পারেন, তাঁর কর্মে যেমন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি আবার সবকিছুর পেছনে মহাশক্তিই ক্রিয়া করে চলেছেন।

সাধক যতই মহাশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে থাকেন মহাশক্তিও তাঁর বহুরূপ ও বহু ব্যক্তিত্ব ক্রমশ সাধকের কাছে প্রকাশ করে ধরেন। মহাশক্তির চারিটি প্রধান ব্যক্তিত্বের কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন। মায়ের এই চারিটি মহারূপ হচ্ছে—মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এক বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে মহেশ্বরীর অবস্থান, তিনি জ্ঞান ও বিস্তৃতিরই জননী। মহাকালীর প্রকৃতি অন্যরকম। জ্ঞান নয়, শক্তি; বিস্তৃতি নয়, উচ্চতার অধিষ্ঠাত্রী তিনি। জ্ঞান ও বিস্তৃতি, শক্তি ও উচ্চতা ছাড়াও মহাশক্তির রয়েছে আর এক দিক। সেখানে আছে তাঁর শাশ্বত সৌন্দর্যের রহস্য, সুসঙ্গতি ও পারিপাট্য, লাস্য ও লাবণ্য, দিব্যানন্দের স্ফূর্তি। এ হল মহালক্ষ্মীর ক্ষেত্র। মা মহাসরস্বতী হলেন মায়ের কনিষ্ঠা শক্তি। জ্ঞান শক্তি সৌন্দর্য—সবকিছুর মধ্যে তিনি এনে দেন শিল্পসৌষ্ঠব, নিখুঁত সংসিদ্ধি। এই হল মায়ের চার মহারূপের প্রকাশ যাদের সাহায্যে তিনি তাঁর অতিমানস সিদ্ধির জন্যে ক্রিয়া করে চলেন। শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন মা শুধু উপর থেকেই ক্রিয়া করেন না, নেমে আসেন মর্ত্যপ্রকৃতিব কাছাকাছি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে এক রূপকের আশ্রয়ে ঘোষণা করেছেন মহাশক্তি তাঁর সৃষ্টির অতিমানস রূপান্তর সাধনের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছেন মর্ত্যপ্রকৃতির মধ্যে। অশ্বপতির তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আলোক-দুহিতা দেবী সাবিত্রি নেমে এসেছেন আমাদের মধ্যে। এ যুগের শক্তি-সাধনায় তাঁর করুণায় আসবে সিদ্ধি। এই সিদ্ধির স্বপ্নময় রূপটি শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে :

> All here shall be her sweetness's home,
> All contraries prepare her harmony;
> Towards her our knowledge climbs, our passion gropes,
> In her miraculous rapture we shall dwell,
> Her clasp will turm to ecstasy our pain.
>
> –SAVITRI. Book III, Canto II.

আবার বাস্তব জগতের আর এক জিজ্ঞাসা—আজ একশ' বছরেব বেশী হল আমাদের সাহিত্যসম্রাট দুঃখ করে বলেছিলেন—মা কী ছিলেন, মা কী হয়েছেন! তিনি কিন্তু দেশজননীব কথা বলে ছিলেন।

কিন্তু তাঁর পরবর্তী মায়ের রূপ তিনি আর দেখে যেতে পারেন নি। যদি আজকের দেশজননীর রূপ তিনি দেখতেন তা হলে তাঁব অন্তরের দুঃখ হয়ত আরো মর্মান্তিক হত। মা শুধু ছিন্ন মস্তা নন, তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন, ক্রমশ আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। মায়ের এক-এক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক-এক অঞ্চলে পড়ছে। এ চিত্র কল্পনা করা যায় না, এর ভাবীরূপ অতি ভয়াবহ! এই মা আমাদের দেশজননী!

কিন্তু কেন? সাহিত্যসম্রাটের পরে আমরা যদি আরো একটু তলিয়ে দেখি তা হলে বুঝতে পারবো আমাদের দুঃখ এ নয় যে, মা কী ছিলেন এবং কী হয়েছেন, আমাদের দুঃখ আরো গভীর, আরো মূলীভূত—'আমরা কী ছিলাম, আমরা কী হয়েছি!' আমরা যা হয়েছি আমাদের মা তারই মতো হয়ে উঠছেন। দেশজননী রূপে যে মায়ের আমরা পূজা করি, তিনি আমাদের ভাব-ভাবনারই মূর্তরূপ। আজ যদি তিনি খণ্ডিতা হয়ে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে আমাদের ভাব-ভাবনার মধ্যেই খণ্ডতা এসেছে, বিচ্ছিন্নতা দানা বেঁধেছে। সুতরাং মাকে অখণ্ড পূর্ণ মূর্তিতে দেখতে হলে আমাদের চিত্তের জগতে অখণ্ডতা পূর্ণতা আনতে হবে।

আর আমাদের অন্তরের শুদ্ধীকরণ ও অখণ্ডতা বিধান যদি না করতে পারি, তবে যে মাকে ভগবতী জননী রূপে আমরা আবাহন করবো তাঁকেও আমরা ধরে রাখতে পারবো না। মায়েরই একটি রূপ সম্পর্কে মনে পড়ছে আমাদের একালেরই শক্তিসাধক ঋষি অরবিন্দের সাবধান বাণী "নিগূঢ় বিশ্ব-আনন্দের সাথে আছে যেখানে ছন্দ-সাম্য, সর্ব-সৌন্দর্যময়ের আহ্বানে সাড়া পাওয়া যায় যেখানে, যেখানে রয়েছে মিলন ঐক্য, যেখানে বহু প্রাণের আনন্দপ্রবাহ হয়েছে ভগবৎ-অভিমুখী, এমন আবেষ্টনেই তিনি বাস করতে সম্মত। কিন্তু... এমন মানব-হৃদয়ে যদি তাঁর অবস্থান হয় যাকে তিনি দেখেন স্বার্থপরতা দ্বেষ ঈর্ষা হিংসা অসূয়া দ্বন্দ্ব ঘিরে রয়েছে, দেবোদ্দিষ্ট আধারে যদি মিশে থাকে বিশ্বাসঘাতকতা বুভুক্ষা অকৃতজ্ঞতা, ভক্তিকে যদি প্রাণাবেগের স্থূলতা বা কামনার রূঢ়তা অশুদ্ধ করে থাকে --তবে এমন হৃদয়ে এই সৌম্যা শ্রীময়ী দেবী তিষ্ঠাবেন না।"—(শ্রীঅরবিন্দ : 'মা') ঋষির এই সাবধান-বাণী মনে রেখে একালে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদের দুর্গাপূজাও মহাশক্তির পূজা। এ পূজার জন্যে অধিকারী হতে হয়, যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। আমাদের পিতামহেরা বলতেন, কাঁচা মাটির পাত্রে সোমরস ঢেলো না, পাত্রটি গলে যাবে। শক্তি নামিয়ে আনতে হলে, তাকে ধারণ করতে হলে, আধারটি তৈরী করতে হয় তপস্যার আগুনে পুড়িয়ে তাকে পাকিয়ে নিতে হয়। এ আধার যেমন ব্যষ্টির তেমনি সমষ্টির, যেমন ব্যক্তির তেমনি দেশের। অথচ আজ ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিক্ষেত্রে আত্মপ্রস্তুতির সাধনার অভাব বরং বেড়ে যাচ্ছে, মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যভিচারও। এ অবস্থায় মহাশক্তিকে নামিয়ে এনে ধারণ করতে পারবো আমরা কী করে? আর মহাশক্তিই বা আমাদের এই আত্মপ্রতারণা, দুর্বলতা, অবক্ষয়, অবিশ্বাস সহ্য করবেন কেন? তিনি স্নেহময়ী মা ঠিকই, কিন্তু তিনি ভয়ংকরী রণরঙ্গিণীও। একালের শক্তিসাধক শ্রীঅরবিন্দ মায়ের এই রূপটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছেন—"অসুরের প্রতি ভয়ংকর তাঁর মুখমণ্ডল, ভগবদ্‌বিদ্বেষীর উপর নির্মম নিদারুণ তাঁর চিত্ত। বিশ্বলোকের রণরঙ্গিণী তিনি---সংগ্রামে কখনো পশ্চাৎপদ নন। সামান্য ত্রুটিও তাঁর অসহনীয়।..." (তদেব) এই শক্তি অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তি নাও হতে পারেন। যদি বলি বিশ্বশক্তি প্রকৃতিরই বাস্তব শক্তি, তা হলেও শক্তির এই বিধানও সমানই প্রযোজ্য। জীবনের শক্তি, সমাজের শক্তি অর্জনের ও বর্ধনের ও ধারণের যে বিধান প্রকৃতিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে; সেই বিধান লঙ্ঘন করলে প্রকৃতির রাজ্যেও কোন ক্ষমা

নেই। প্রকৃতির বিধান আরো দুর্লঙ্ঘ্য। প্রকৃতি মাতা হলেও তিনিও প্রতিশোধ নেন।

তিনি মা; কিন্তু আমাদের ঘরের মা নন। তবে তিনি কি দেশজননী—দেশমাতা? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা রূপে কল্পনা করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দও দেশকে মাতৃরূপে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তার যুগগত উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। কিন্তু মা দুর্গা যিনি, তিনি দেশের সীমাকে অতিক্রম করে রয়েছেন, তিনি শুধু দেশজননী নন, তিনি বিশ্বজননী। আজকে বিশ্বায়নেব পটভূমিকায় মা দুর্গার উপাসনার তাৎপর্য অন্য রকম। Globalisation-এর যুগে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ঋষির কল্পনার তাৎপর্য আরো অনেক বেশি। যে শ্রীঅরবিন্দ একটা বিশেষ যুগে দেশের ইতিহাসের সঙ্কট-কালে বলেছিলেন—"অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি", সেই শ্রীঅরবিন্দ মা দুর্গার যুগোত্তীর্ণ সর্বকালীন সর্বদেশিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"দুর্গা হলেন মায়ের নিরাপত্তা ও রক্ষাকারী শক্তি।" বর্তমান পৃথিবীতে মায়ের এই রক্ষাকারী শক্তিকে চাই আমরা। তিনি দুর্গতি থেকে রক্ষা কবেন, তাই তিনি দুর্গা। দুর্গতির সম্ভাবনা আজ সারা বিশ্বে। অশুভ শক্তির জাগরণে সারা বিশ্ব কম্পিত। আর্থিক শক্তিতে, রাজনৈতিক শক্তিতে, আণবিক শক্তিতে যে দেশ সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ, সে দেশে এই অশুভ শক্তির অভ্যুত্থান সবচেয়ে বেশি। তার শক্তির কাছে, তার কূটবুদ্ধির কাছে আজ কত দেশ পরাজিত, বিপন্ন, ছিন্নভিন্ন; পুড়ে ছারখার হয়ে গেল কত দেশ। কিন্তু এহ বাহ্য। আসল কথা—মানুষের মধ্যেই রয়েছে এই অশুভ শক্তির প্রবণতা। সে-ই হচ্ছে অসুর। আবার মানুষের মধ্যেই রয়েছে শুভ ইচ্ছা, শুভ শক্তিও। বিভিন্ন ধরনের শুভ প্রবণতা—বিভিন্ন ধরনের শুভ শক্তির প্রতীক হলেন বিভিন্ন দেবতারা। দেবতারা প্রত্যেকে তাঁদের বিশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দিলেন মাকে—সকলের অস্ত্রের আর সকলের তেজঃশক্তি দিয়ে তৈরি হল ঘনীভূত একটি মহাশক্তি—এই কথার অর্থ একতাবদ্ধ শুভশক্তি হলেন মা দুর্গা। তিনি এগিয়ে এলেন দেবতাদের রক্ষা করতে, অর্থাৎ পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বাঁচাতে। যে তিনটি মূল প্রবণতা পৃথিবীর সমস্ত অশুভ শক্তির মূল উৎস সেই তিনটি হল—অর্থ, আধিপত্য আর কাম (Money, power and sex)—"যে তিনটি শক্তি মানুষের অহঙ্কারের পক্ষে এবং অসুবের পক্ষে পরম আকর্ষণের জিনিস তাদেরই অন্যতম হল অর্থ, আর দুটি কাম ও আধিপত্য।" (—শ্রীঅরবিন্দ : 'মা')। তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারব রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ, ইলিয়দ-ওদিসির যুদ্ধ. আজকের পৃথিবীর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, এবং আমাদের দেশের নানা অশান্তি, এত হানাহানি ও খুনোখুনির পেছনে রয়েছে এই তিনটি অশুভ প্রবণতা—এক বা একাধিক। এর বিরুদ্ধে সমস্ত দেবশক্তিকে অর্থাৎ সমস্ত শুভশক্তিকে একত্রে জাগ্রত করতে হবে আমাদের। সেই জাগ্রত শুভ শক্তিকে বলতে হবে—যারা আজকে এত হানাহানি কবছে, এত রক্ত নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলছে, দেশের, দশেব, পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ে ছিনি-মিনি খেলছে, তাদের কি তুমি ক্ষমা করেছো? 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো"?

চ. প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ,
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী,
শেক্‌স্‌পীয়র

১. রবীন্দ্রনাথ : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে

বিপ্লবী কিংবা যোগী কিংবা দার্শনিক বলেই শ্রীঅরবিন্দকে আমরা জানি। কিন্তু এছাড়াও রয়েছে তাঁর আর এক পরিচয়—সেটাও তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। সেখানে তিনি কবি এবং কাব্যরসিক। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'দার্শনিক হবার আগে থেকেই আমি কবি'। বাস্তবিক বিলেতে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত। ইংরেজী ছাড়াও গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় কবিতা লিখে সেখানকার বিদগ্ধ অধ্যাপরদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তিনি। তার চেয়ে বড়ো কথা, কবিতার রসজ্ঞ পাঠকও ছিলেন তিনি। স্কুল-কলেজের পড়ার বাইরে কবিতা-উপন্যাসের রসাস্বাদনে এমন মগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি যে, বিলেতে তাঁর শিক্ষক-অধ্যাপকরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, গল্প-কবিতা উপন্যাস পড়ে অরবিন্দ নিজের পড়ার বিষয় উপেক্ষা করছেন।

বিলেতের শিক্ষা শেস করে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় এসে সেখানকার মহারাজার রাজস্ব বিভাগে ও প্রশাসনিক বিভাগে অল্প কিছুদিন কাজ করার পর নিজের প্রতিভা ও মানসিকতার অনুকূল চাকরি পেয়ে যান—প্রথমে বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষার অংশকালীন অধ্যাপকের পদ, তারপরে ক্রমান্বয়ে ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের পূর্ণসময়ের অধ্যাপকের পদ, উপাধ্যক্ষের পদ এবং শেষে কার্যকরী অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। এই সময়ে বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-তপস্বীর জীবন যাপন করতেন তিনি। তখন তাঁর পাঠ্যবিষয় ছিল বিশ্বসাহিত্যের গ্রন্থাবলী। আবাল্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বিলেতেই নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখেছিলেন তিনি। বরোদায় অবস্থান-কালে সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বাংলার শিক্ষক নিযুক্ত করে তাঁর কাছে কথ্য বাংলাও শিখেছিলেন। এই সময় প্রায় দু বছর দীনেন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের শুধু শিক্ষক ছিলেন না, তাঁর অন্তরঙ্গ নিত্যসঙ্গীও ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের যে স্মৃতিকথা ('অরবিন্দ-প্রসঙ্গ') লিখেছিলেন, তা থেকে জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রীঅরবিন্দ পড়েছিলেন এবং রবীন্দ্রকবিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন :

"অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের এই কোকিল-কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন.....।"[১]

অন্তরের অন্তস্থলে যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন কবি ও কাব্যরসিক তার প্রকাশ এক দিকে ঘটেছে তাঁর প্রতীক-কাব্য 'Savitri'-তে, অন্যদিকে তাঁর নন্দতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক রচনা 'The Future Poetry' (ভবিষ্যতের কবিতা) ও Letters of Sri Aurobindo, 3rd series-এ। সাহিত্য-সমালোচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছিলেন তা আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে।

---

১ রায়, দীনেন্দ্রকুমার 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ', কলকাতা দ্বিতীয় সং, ১৩৭৯, পৃ ৪৭।

রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দের মতো 'কবিমনীষী'র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সত্য হলো—তাঁদের কাব্যসাধনা তাঁদের জীবনসাধনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত: তাই তাঁদের কাব্য-সাহিত্য তাঁদের জীবনদর্শনেরই প্রকাশ। অবশ্য তাঁদের জীবনদর্শনও শুধু তাত্ত্বিক সূত্ররচনা নয়, প্রত্যক্ষ জীবনসাধনার অপরোক্ষ উপলব্ধির রসসিক্ত নির্যাস। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ যে সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, তার কারণ হলো শ্রীঅরবিন্দ নিজেও কবি ছিলেন বলে তাঁর রসবোধ দিয়ে রবীন্দ্র-কবিতার রসগ্রহণ করেছিলেন, তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কিছু মূলীভূত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। একথার অর্থ এরকম কিছুতেই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিংবা শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসল কথা দু-জনেই ভারত-সংস্কৃতির মাটিতে বেড়ে-ওঠা একই বৃক্ষের দুটি পুষ্প, বিশ্বসংস্কৃতির আকাশ থেকে নিয়েছেন মুক্ত আলো-বাতাস, ঊর্ধ্বের সূর্য তাঁদের আকৃষ্ট করেছে সমানভাবে। জীবনের ভবিষ্যৎ পূর্ণতার স্বপ্নদ্রষ্টা দুই মহান কবি-দার্শনিক। লক্ষ্য তাঁদের এক, পথ তাঁদের স্বতন্ত্র। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উক্তি :

"Tagore has been a wayfarer towards the same goal as ours in his own way."[২]

শ্রীঅরবিন্দের পথ যৌগিক-আধ্যাত্মিক, রবীন্দ্রনাথের পথ নান্দনিক-আধ্যাত্মিক। কিন্তু লক্ষ্য তাঁদের এক। দুজনেই জীবনে অহং-সীমার বাইরে পূর্ণতার সন্ধানী।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের শ্রদ্ধাবোধ পরে আরো গভীর হয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি মানবজাতির এখনো-পর্যন্ত-বিকশিত সর্বোচ্চ চেতনার কবি বলে অভিহিত করেছেন :

"আজ পর্যন্ত মানুষের চেতনা যেখানে পৌঁচেছে, যা-কিছু লাভ করেছে, সে-সকলের সূক্ষ্মতম শীর্ষে অবস্থান করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা....।[৩]

একথার তাৎপর্য একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বের বিবর্তন হয়েছে জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের স্তরে। এখনো পর্যন্ত বিবর্তনের শেষ ধাপে মনের বিকাশ হয়েছে, তার ফলে পৃথিবীতে হয়েছে মনোময় মানুষের আবির্ভাব। তিনি বলেছেন—আমরা যদি প্রগতিবাদী হই, তা হলে আমরা মানতে বাধ্য যে, বিশ্বের বিবর্তন এই মনের স্তরে এসেই থেমে যেতে পারে না, মানুষের মনোময় চেতনার পরে আরো এক ধাপ ঊর্ধ্বতর চেতনার বিকাশ হবে। এই ঊর্ধ্বতর চেতনার নাম তিনি দিয়েছেন—অতিমানস (Supermind)। উপনিষদের 'বিজ্ঞানময়' কোষের মধ্যে এই অতিমানসের ইঙ্গিত আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—মন থেকে অতিমানসের দিকে এই যে উত্তরণ, এই উত্তরণের পথে মানবচেতনাকে মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তর অতিক্রম

২. Sri Aurobindo 'Birth Centenary Library', Vol 26 (On Himself), p 346

৩. শ্রীঅরবিন্দ 'ভবিষ্যতের কবিতা' ('The Future Poetry' গ্রন্থের বামেশ্বর শ'-কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃ. ৩৬৭।

করে যেতে হবে। এই স্তরগুলি হলো—ঊর্ধ্বমানস বা Higher Mind, জ্যোতির্মানস বা Illumined Mind, বোধিমানস বা Intuitive Mind ও অধিমানস বা Overmind।[৪] প্রাণের পরে মনের স্তরের বিকাশের ফলে পৃথিবীতে যেমন নতুন প্রাণী মানুষের জন্ম হয়েছে, তেমনি মনের পরে অতিমানসের বিকাশের ফলে নতুনতর অতিমানব জাতির আবির্ভাব হবে এবং তার ফলে জীবন হবে পূর্ণতর, সুন্দরতর দিব্যজীবন। আমরা বলি—সাহিত্য ও শিল্প জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যে-শিল্পে জীবনের প্রতিফলন হয়। একথা নিয়ে আজ আর তর্ক ওঠে না। একথা মেনে নিয়েই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঊর্ধ্বতর চেতনাসম্পন্ন উন্নততর জাতির পূর্ণতর সুন্দরতর জীবনেরও তাই প্রতিফলন হবে সাহিত্যে শিল্পে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—বিশ্বের সাহিত্যে ক্রমশ ঊর্ধ্বতর চেতনার বিকাশ আভাসিত হচ্ছে। যে ক'জন কবির মধ্যে এর আভাস লক্ষ্য করা যায় তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন আইরিশ কবি এ.ই. (জর্জ উইলিয়াম রাসেল), ইংরেজ কবি ইয়েট্স্ এবং বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ। এই ব্যাখ্যার আলোকেই তা হলে বোঝা যাবে শ্রীঅরবিন্দ কোন অর্থে বলেছেন—'আজ পর্যন্ত মানুষের চেতনা যেখানে পৌঁচেছে, যা-কিছু লাভ করেছে, সে-সকলের সূক্ষ্মতম শীর্ষে অবস্থান করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা।' শ্রীঅরবিন্দ আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "মানুষের জীবনধারায় এক মহত্তর যুগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে,.........কিন্তু তার আগে মধ্যবর্তী পর্বে প্রথমে আসবে এমন একটা কাব্য যা তার বর্তমানের ক্ষীণ সূচনা থেকে সেই মহান যুগের দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে; তাকে সাহায্য করবে নতুনতর সব দার্শনিক মতবাদ, পরিবর্তিত প্রসারিত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে—সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মধ্যে—নতুনতর সত্যের অভিব্যক্তি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নিত্য-নতুন মহান আদর্শ, এবং ধর্মীয় মানসিকতার এক অভিনব সঞ্জীবনী শক্তি, কিন্তু সেই ধর্মীয় মানসিকতা আর কোনো সঙ্কীর্ণতা বা গুহ্য সাধনায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। কাব্যে এই পরিবর্তনের একটা চকিত রশ্মি ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এই রকমের একটা মহত্তর দিগ্‌দর্শনের সূচনা হয়ে গিয়েছে। হুইটম্যানের সচেতন প্রয়াস, কার্পেন্টারের বিশিষ্ট সুর, এ.ই (জর্জ উইলিয়াম র‍্যাসেল)-র কাব্যের বিশিষ্ট গূঢ় তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের দ্রুত তাৎক্ষণিক খ্যাতি— এসবের মধ্যে তারই প্রথম চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।"[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞান ও ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান—এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয়ের আদর্শের রূপায়ণ হতে থাকে। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে ১৮৯৩ সালটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই বছর সমন্বয়ী অধ্যাত্মচেতনার বাণীমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পাড়ি দিলেন শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে ভারতের সমন্বয়ী ধর্মের বাণী তুলে ধরার জন্যে, অন্য দিকে ঐ বছরই ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষায় অভিষিক্ত হয়ে ভারতের মাটিতে পা দিলেন শ্রীঅরবিন্দ। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের লেন-

৪ দ্র বর্তমান গ্রন্থের 'শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা'।

৫ শ্রীঅরবিন্দ "ভবিষ্যতের কবিতা", ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৬৬।

দেনের ইঙ্গিতবহ এই ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের পূর্ণজীবন। এবং সেই জীবনই হবে ভবিষ্যতের কবির মুখ্য উপজীব্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করে ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনার কথা লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দ : "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার মধ্যে একটির রয়েছে বিরাট একটা আধ্যাত্মিক মন এবং এমন একটি অন্তর্মুখী দৃষ্টি যা আত্মিক স্বরূপ ও শাশ্বত সত্যের দিকে ঘোরানো; অন্যটির রয়েছে চিন্তার স্বাধীন অন্বেষণা এবং প্রাণশক্তির এমন দুর্দম সাহস যা পৃথিবী ও তার সমস্যাবলীকে ক্রমে ক্রমে জয় করে চলেছে। এখন এই দুই মানসিকতার মধ্যে যার যে সম্পদই থাক না কেন, এই দু-ই এসে পরস্পরকে স্পর্শ করবে এবং দুয়ের এই পারস্পরিক তড়িৎস্পর্শেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এবং দুয়ের মিলন থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যতের কবিতা।"[৬]

—এই সমন্বয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে যেসব কবির প্রসারিত চেতনায় নতুন অন্বেষণা জেগেছিলো তাঁদের সকলের মধ্যে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথকেই শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন :

"যেসব কবির মধ্যে একদিকে মানুষ এবং বস্তুবাজির অন্তরের শাশ্বত স্বরূপ এবং আত্মার সত্য এবং আত্মার বাস্তবতা, অন্যদিকে জীবনের প্রতি নিষ্ঠা—এই দ্বিবিধ শক্তির জন্যে দ্বিমুখী অন্বেষণা মিলিত হয়েছে, সেই কবিদের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের যথেষ্ট কারণ হল যুগের এই প্রয়োজন, এই চাহিদা।.. ...এই অন্বেষণাই হুইট্‌ম্যানের কাব্যের প্রধান সুর। যিনি অনেক খুঁজেছেন, অনেক দেখেছেন, কিন্তু পুরোপুরি লাভ করতে পারেননি, এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, হুইট্‌ম্যানে তা-ই হয়েছে,—এই অন্বেষণা একটা মহৎ অগ্রণী কাব্যসৃষ্টির দিগন্ত সম্প্রসারিত করেছে; এখানে একটা নতুন জীবনদৃষ্টির পরিণত পরিপূর্ণতার মধ্যে বাস করার পরিচয় নেই বটে; কিন্তু এখানে সেই নতুন জীবনদৃষ্টির দ্বার-উন্মোচন হয়েছে। মেরিডিথের মধ্যে এই অন্বেষণা মর্ত্যের দিক থেকে বারে বারে দেখা দিয়েছে, এ.ই.-র সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এটি আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে আবির্ভূত হয়েছে, ইয়েট্‌সের সূক্ষ্মদর্শন ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ছন্দিত বাণীকে আশ্রয় করে এটি পৃথিবী এবং নেপথ্যলোকের জীবনের মধ্যে যাতায়াত করেছে, আর কার্পেন্টারের মধ্যে এটা একটা বৃহৎ পরিপূর্ণতার সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার আকস্মিক এবং বিশ্বব্যাপী সাফল্যের পক্ষে একটা বিশেষ সুযোগ এই ছিল যে, যে আবিষ্কার ও যে সমন্বয়-সংমিশ্রণের সন্ধানে আমাদের যুগচিত্ত নিমগ্ন, সেইটাই তিনি একালের অন্য যেকোন সৃজনধর্মী লেখকের চেয়ে বেশি এনে দিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি হল সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার চির-অনাহত সঙ্গীত, সুরের মুর্ছনায় ভরা সে এক জগৎ যার মধ্যে আত্মার সত্যের সূক্ষ্ম ধ্বনি এবং আলোক জীবনের সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতাকে একটা নতুনতর তাৎপর্য দান করে। অভিযোগ করা হয়েছে, এই কাব্য অতিমাত্র সূক্ষ্ম, সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইবে, পার্থিব জীবনের বিস্তৃত, প্রত্যক্ষ, বর্তমান এবং জীবন্ত বাস্তবতা

৬ শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যতের কবিতা", ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৬৮।

থেকে দূরবর্তী। ইয়েট্স্‌কে তো কেউ কেউ কেল্টীয় কল্পনাবিলাসের কবি ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের দেশেই অবাস্তব কাব্যিক দার্শনিকতার জন্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে—তাঁর কাব্যে নাকি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষতা নেই, স্পর্শে তার বাস্তবতা নেই, প্রাণের প্রতি নিষ্ঠায় তেমন জোর নেই! কিন্তু এটা হল এই কাব্যসৃষ্টিকে ভুল বোঝা এবং জীবনের অর্থকেও অনেকখানি ভুল বোঝা।"[৭]

সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা থেকে জেনেছি—বরোদার চাকরিতে থাকার সময় থেকেই শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কবিতার আগ্রহী পাঠক ছিলেন। বরোদা থেকে বাংলায় ফিরে আসার পরে চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন, জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা, 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক পত্রিকার লেখা ও পরিচালনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি পরে ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরী চলে যাবার পর যোগ-সাধনায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৪ সাল থেকে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'আর্য' প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার তিনি শুধু সম্পাদক ছিলেন না, প্রায় একক লেখক ছিলেন। এই পত্রিকাতেই তাঁর সহস্র পৃষ্ঠায় দার্শনিক গ্রন্থ 'The Life Divine'-এর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর The Symthsis of Yoga, The Ideal of Human Unity, The Human Cycle (The Psychology of Social Development), The Essays on the Gita, The Secret of the Veda, The Future Poetry, The Foundations of Indian Culture. প্রত্যেকটি সুবিশাল গ্রন্থ। ফাঁকে ফাঁকে পাশাপাশি চলতে থাকে প্রতীক কাব্য Savitri-র রচনা ও পুনর্লিখন। এই লেখালিখির পর্ব যতই শেষ হয়ে আসে ততই তিনি ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়েন এবং ১৯২৬-এর পর থেকে লোকসঙ্গ প্রায় ত্যাগ করে মহাপ্রভুর 'গম্ভীরা লীলা'র মতো নিঃসঙ্গ বাস ও একক সাধনায় নিমগ্ন হন। শিষ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো তখন শুধু পত্র-পত্রোত্তরের মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর এই নিঃসঙ্গ বাসের দিনগুলিতেও তিনি নিত্য বহির্বিশ্বের খবর রাখতেন, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের দৈনন্দিন অগ্রগতির কথা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে চাইতেন (তখনকার বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তাঁকে পড়ে শোনানো হতো)। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক খ্যাতির খোঁজ-খবরই শুধু রাখতেন না, 'ভবিষ্যতের কবিতা'য় বহু স্থানে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখও করেছেন: 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ পড়েছিলেন এবং সেই অনুবাদ থেকে তাঁর 'ভবিষ্যতের কবিতা'য় অংশ-বিশেষ উদ্ধৃতও করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ যে অনবদ্য গদ্যকাব্যে করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—সেইটাই ছিলো তার যোগ্যতম প্রকাশ-মাধ্যম। মূল বাংলা 'গীতাঞ্জলি' পদ্য-ছন্দে রচিত বলে তাকে ইংরেজী পদ্য-ছন্দে অনুবাদ করলে হয় গীতাঞ্জলির মহিমময় সমুন্নতির পায়ে ভিন্ন-ভাষার বেড়ি পরানো হতো, নয় তো ইংরেজী ভাষার ছন্দোবন্ধে পাঠকের অলক্ষ্যে সেই ভাষার আত্মাই এসে আসন অধিকার করতো। তাই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলির কাব্যধর্মী গদ্যের যোগ্যতম মাধ্যম শ্রীঅরবিন্দকে মুগ্ধ করেছিলো। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই গদ্যানুবাদ অনবদ্য হলেও এটা ইংরেজ পাঠকের

৭. শ্রীঅরবিন্দ . ভবিষ্যতের কবিতা', ১৯৯৫, পৃ: ২৯৮-৯৯।

পক্ষেই অপরিহার্য; সেই অনুবাদ বাঙালী পাঠকের কাছে কখনো মূল বাংলা গীতাঞ্জলির স্থান গ্রহণ করতে পারে না, মূল গীতাঞ্জলির মহিমাই আলাদা। শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্লেষণ অতুলনীয় বলে তা অতি দীর্ঘ হলেও এখানে উদ্ধৃত না করে উপায় নেই। এর কারণ শ্রীঅরবিন্দের সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলির শুধু কাব্যসৌন্দর্যই উদ্‌ঘাটিত হয়নি, এতে শ্রীঅরবিন্দ নিজে যে কত বড় রসজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন, তাও বোঝা যায় :

"মহত্তর ভাবকে যদি প্রকাশ করতে হয়, তাহলে অতীতের মহাকবিরা যে ছন্দঃ-স্পন্দন ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, তার চেয়েও আরো গভীর, আরো ব্যাপক, আরো নমনীয়, অথবা বলা যেতে পারে, বর্দ্ধিকে প্রকাশক্ষম এক ছন্দঃস্পন্দন কাব্যকে খুঁজে বের করতেই হবে।... সেই জন্যে আমরা দেখতে পাই, ছন্দের ঐতিহ্যাগত যেসব ছাঁদ ছিল, সেগুলিকে ভেঙে ফেলার বা সম্প্রসারিত করার, গভীর বা সূক্ষ্ম করে তোলার চেষ্টা চলেছে। কখনো-বা সেগুলিকে একেবারে বাদ দিয়ে তাদের স্থানে আরো কোমল প্রকৃতির আরো বিচিত্র ও নমনীয় আদর্শের ছন্দ আনবার চেষ্টা হয়েছে।... সেই জন্যেই আমরা দেখতেও পাচ্ছি কাব্য-ছন্দের সমগ্র মূল পদ্ধতিতেই একটা প্রচণ্ড এবং অভূতপূর্ব বিপ্লব সূচিত করার চেষ্টা চলেছে।...

"কবিতার ছন্দঃস্পন্দনের এই নতুন এবং স্বাধীন রূপেব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি যাঁরা, তাঁরা হলেন ইংরেজ এবং মার্কিন—যথাক্রমে কার্পেন্টার ও হুইট্‌ম্যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকবিতাগুলিব যেসব ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন সেগুলি এ ধারায় আকস্মিক পরিপুষ্টি দান করেছে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সেগুলি ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ এ অনুবাদগুলি ছন্দঃস্পন্দিত কাব্যধর্মী গদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের যে লেখা, এই যে ধ্বনি হিল্লোলিত গদ্যকবিতা এও একরকমের স্বীকৃত রূপবন্ধ, একটা স্বতন্ত্র জিনিস। প্রতিষ্ঠিত ছন্দঃপরিমিতির বিধি-বিধানের সঙ্গে এর তো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এহল কবি-প্রতিভার একরকমের বৈচিত্র্যবিলাস, ছোটখাট ইতরবিশেষ সাধন করা। এরও একটা বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, এব দ্বারা এমন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যা অন্য কোনো ভাবে সার্থকতার সঙ্গে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ করতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যের এমন একটা কাব্যিক অনুবাদ, যা মূলের ভাব ভাবনা এবং আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়কে একেবারে যথাযথ উপস্থাপিত করতে পারে। এবং তাঁর এই কাজের জন্যে এইটিই ছিল একমাত্র উপযুক্ত পদ্ধতি, কারণ অন্যভাষাব সুনির্দিষ্ট ছন্দঃপরিমিতিব কাঠামোকে আশ্রয় করে যে ভাষান্তর সাধন করা হয় সেটা মূলের নিজস্ব গতি-ছন্দের স্থানে শুধু ভিন্ন একটা ছাঁদই যে এনে দেয় তা নয়, উপরন্তু এই বিজাতীয় কাঠামোটিকে আনার ফলে তাতে প্রায় পৃথক্ একটি আত্মাও এসে আসন অধিকার করে। কবিতার ছন্দ হল এতখানি শক্তিশালী, সুস্পষ্ট এবং সৃষ্টিশীল জিনিস। কিন্তু কাব্যধর্মী গদ্যের নমনীযতা বেশি, তাতে পরিমিত পর্ব-পর্বাঙ্গ অনুসারে ধ্বনি-হিল্লোল সৃষ্টির বাঁধাধরা নিয়ম তেমন কিছু নেই। তাই কাব্যধর্মী গদ্য মূলের গতি-ছন্দের যে আত্মিক স্বরূপ তাকে কুক্ষিগত করে না, তাকে ঢেলেও সাজায় না। এমনকি এটা

মূলের একটা ক্ষীণতম সুদূর ছায়া, প্রতিধ্বনি বা বিভ্রমও সৃষ্টি করতে পারে, যদি একই বা অনুরূপ আত্মা সক্রিয় হয়ে থাকে। তবে তার মধ্যে মূলের সেই একই পরিমাণ শক্তি কখনো থাকতে পারে না; কিন্তু অনুরূপ ব্যঞ্জনার একটা প্রতিধ্বনি তাতে শোনা যেতে পারে।...

"মুক্ত-ছন্দের কোন কোন ফরাসী রচয়িতার সঙ্গে বরং রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য আছে; কিন্তু তিনি হুইট্‌ম্যান্ বা কর্পেন্টার নন। তিনি হলেন একজন সূক্ষ্ম ও সুচারু কলাকুশলী, এবং তিনি তাঁর শিল্প সৃষ্টি করেছেন পরিপূর্ণ প্রসাদগুণ ও আধ্যাত্মিক চারুতার সঙ্গেই। কিন্তু যেটুকু তাঁর করণীয় ছিল তার বেশি এতটুকু কিছু তিনি করতে যাননি, যে পুরানো কাব্যরীতিতে তিনি নিজের মাতৃভাষার এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছেন, সেই কাব্যরীতিকে কাব্যিক গতিপ্রবাহের একটি অভিনব বিধান দিয়ে সরিয়ে দেবার কোন অভিপ্রায়ই এখানে তাঁর মধ্যে নেই। সে রকমের কোন উদ্দেশ্য যদি আদৌ এখানে থাকত, তাহলে তাকে চরম ব্যর্থতাই বলতে হত। অতি-রমণীয় এই ইংরেজী গদ্য; কিন্তু তাই বলে কেউ যদি একে মূল কবিতাগুলির সঙ্গে তুলনা করতে যায়, তাহলে সে দেখতে পাবে, এই ভাষান্তরের ফলে মূলের সম্পদ কতখানি হারিয়ে গেছে, তার বদলে কবি সাফল্যের সঙ্গেই অন্য একটা কিছু এনেছেন যেটা ইংরেজী পাঠককে পরিতৃপ্তি দিতে পারে; কিন্তু যে কান, যে মন একবার কবির মাতৃভাষায় তার সহজাত এবং অলৌকিক গীতিমাধুর্যটি শুনেছে তাকে কখনই তা পরিতৃপ্তি দিতে পারে না।"[৮]

২. শ্রীঅরবিন্দ : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

"I positively know that he (e.i. Sri Aurobindo) is a great man, one of the greatest we have and therefore liable to be misunderstood even by his friends. What I myself feel for him is not mere admiration, but reverence for his depth of spirituality, his largeness of vision and his literary gifts, extraordinary in imaginative insight and expression. He is a true Rishi and a Poet combined, and I still repeat my Namaskar"....

—Rabindranth Tagore (letter written on November 30, 1919, from Santiniketan in connection with a review of his novl 'The Home and the World' in the November 1919 issue of the 'Modern Review')[১]

শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে এই হলো রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশোর্ধ। এই পরিণত বয়সে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তা নিশ্চয়ই একদিনের উচ্ছ্বাস নয়। শ্রীঅরবিন্দের শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানতেন। শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার ছিলেন। তিনি ছিলেন ষোলো-আনা বিলিতি ভাবাপন্ন। দেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-আচরণে তাঁর আস্থা ছিলো না। তাই শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন মাত্র ৭ বছর তখনি তিন পুত্র ও এক কন্যাকে তাদের মায়ের সঙ্গে বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন বিলিতি শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহেবী জীবন-ধারায় মানুষ করার জন্যে। উত্তরবঙ্গে কৃষ্ণধন ঘোষের ডাক্তার হিসেবে পসার ছিলো ঈর্ষণীয়। কিন্তু তিনি ছিলেন সদাশয়, অকৃপণ, পরোপকারী; দান-ধ্যানে অর্থ ব্যয় করতেন প্রচুর। ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষের এইজন্যে মাঝে-মাঝে আর্থিক অনটন হতো। তখন বিলেতে পুত্রকন্যাদের শিক্ষা ও ভরণ-পোষণের টাকা নিয়মিত পাঠাতে পারতেন না। কখনো-কখনো অন্নকষ্টও ভোগ করতে হয়েছে তাদের। কিংস কলেজে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও তাঁর মা ও ভাইদের ভরণ পোষণ কিছুকাল চলেছিলো শ্রীঅরবিন্দ নিজে সেন্ট পল্স্ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্যে যে বৃত্তি পেতেন, তাইতে। বিলেতে শ্রীঅরবিন্দের সেই অভাবক্লিষ্ট দিনের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন স্বয়ং *রবীন্দ্রনাথ। উত্তরকালে সেই দিনের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—*

> "মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাঁদের মা যখন ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশু বয়সেই আমি তাঁদের দেখেছি। ইংল্যাণ্ডে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করেছেন।"[২]

বোঝা যায়, শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তিনি বাল্য অবস্থা থেকেই অবহিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

---

১. Vide : 'Sri Aurobindo on English Poets', Part I, compiled and edited by Bhattacharya, Supriya

২. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ* 'মনোমোহন ঘোষ' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ. ৫)

জন্ম ১৮৬১ সালে, শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ১৮৭২ সালে। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ এগারো বছর বড়ো ছিলেন। বয়সে প্রায় এক-যুগ বড়ো হলেও প্রথমাবধি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর মনে একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিলো।

ইংল্যাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দেব সেই প্রত্যক্ষ দর্শনের পরে অনেকগুলি বছর কেটে গেলো। শেষবার দেশে ফেরাব আগেই বরোদা কলেজে কাজ করার সময় থেকে বাংলায় তাঁর অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পরিচালনায় যে চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিলো তার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ হয়। ক্রমে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় থাকার সময় থেকেই বাংলার চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এদিকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে স্বদেশী আদর্শে শিক্ষা-দানের জন্যে ১৯০৫ সালের ১৬ই নভেম্বর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজকিশোর রায়চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ স্বদেশী নেতৃবৃন্দেব প্রচেষ্টায় 'জাতীয় শিক্ষা পবিষদ' (National Council of Education) গঠিত হয়। এই শিক্ষা পরিষদেব উদ্যোগে কোলকাতায় বৌবাজারে ১৯০৬ সালে আগষ্ট মাসে 'বেঙ্গল নেশন্যাল কলেজ ও স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র কবেই পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বরোদার চাকরিতে পুরোপুবি ইস্তফা দিয়ে শ্রীঅববিন্দ এই বেঙ্গল নেশন্যাল কলেজেব প্রথম অধ্যক্ষের কার্যভাব গ্রহণ কবেন। বরোদায় তাঁব শেষ বেতন ছিলো মাসিক ৭১০ টাকা। বেঙ্গল নেশন্যাল কলেজে তাঁব বেতন হলো মাত্র ৭৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু জাতীয় শিক্ষা পবিষদেব অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং বেঙ্গল নেশন্যাল কলেজ এই শিক্ষা পরিষদেব উদ্যোগেই গঠিত হয়েছিলো, সেহেতু রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের এই আত্মত্যাগের কথা নিশ্চয়ই জানতেন।

অন্যদিকে শ্রীঅববিন্দ ববোদার চাকবিতে থাকাব সময়েই ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে বাংলায় আসতেন এবং বাংলাব চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। এই যোগাযোগ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে এবং শ্রীঅববিন্দ বাংলার চরমপন্থী আন্দোলনেব মূল তাত্ত্বিক নেতা হয়ে ওঠেন। শেষে স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরোপুবি আত্মনিয়োগ করাব জন্যে শ্রীঅরবিন্দ বেঙ্গল নেশনাল কলেজে অধ্যক্ষেব পদও ত্যাগ করেন। ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন সবকার লিখেছেন- 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম বছর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, তিনি পদত্যাগ করেন (১৯০৭) সক্রিয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে।''[৩] ১৯০৭ সালেব মার্চ মাসে বিপিনচন্দ্র পালেব সম্পাদনায় ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'বন্দেমাতবম্' প্রকাশিত হলে শ্রীঅববিন্দ তার প্রধান লেখক ও পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল ১৯০৭ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' (Passive Resistances)

৩ সবকার, অধ্যাপক সুশোভন . 'ইতিহাসেব দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ', বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পবিষদ, ১৯৭৯, পৃ. ১৪

নামে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এই পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও বিপ্লবের বাণী প্রচার করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ১৯০৭ সালের ৩০শে জুলাই পত্রিকার অফিস খানাতল্লাসী করেন; ১৬ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়; কিন্তু স্বল্পকাল পরেই তিনি জামিনে ছাড়া পান। ২৯শে আগষ্ট তাঁর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি শুরু হয়ে। ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি প্রমাণের অভাবে নির্দোষ সাব্যস্ত হন এবং মুক্তি পান। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'নমস্কার' কবিতাটি লিখে শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানান। এখানে কবিতাটির মূল অংশ উদ্ধৃত করছি—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
.... বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।

* * * *

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে!"[৪]

বাস্তবিকই ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে শাস্তি দিতে পারেন নি। এই কবিতায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরো ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও দর্শন পুরোপুরি রূপলাভ করেনি তখনই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আছ জাগি পরিপূর্ণতার তরে"....

—এই যে 'পরিপূর্ণতা'র জন্যে শ্রীঅরবিন্দের তপস্যার কথা তিনি লিখেছেন তা আপাতদৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে বোঝায়, কিন্তু এতে তাঁর ভবিষ্যতের যোগ ও দর্শনের মূলতত্ত্বের পূর্বাভাস আমরা খুঁজে পাই। শ্রীঅরবিন্দ যে যোগসাধনার পদ্ধতি তুলে ধরেন তাকে বলা হয় 'পূর্ণযোগ', যে দিব্যজীবনের দর্শন ব্যাখ্যা করেন তা হলো 'পূর্ণ জীবনদর্শন'। এককথায় তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনই হলো পূর্ণ জীবনদর্শন

৪. শান্তিনিকেতন, ৭ই ভাদ্র, ১৩১৪, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, ১৪০৪, পৃ ৪৮৪-৮৫

(Integral Philosophy)। রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র কথায় হয়তো তাঁর অজ্ঞাতেই যেন সেই তত্ত্বের ইঙ্গিত উচ্চারিত হয়েছে—'আছ জাগি পরিপূর্ণতার তরে।'

এরপরে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয় ১৯২৮ সালে। রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিবার্ট লেক্‌চার' দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হযে রেলযোগে মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন। পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হয়ে মাদ্রাজ থেকে কলোম্বো জলপথে যাবার সময় জাহাজ পণ্ডিচেরীতে (স্থানীয় নাম পুডুচেরী) থামে স্বল্পক্ষণের জন্যে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"জাহাজ দু'দিন পরে পণ্ডিচেরীর ঘাটে আসিয়া থামে। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এই পথে যাইতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার অনুরোধ জানাইয়া তিনি লোক পাঠাইলেন। বৎসর দুই হইল শ্রীঅরবিন্দর সাধারণ লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বৎসরে নির্দিষ্ট দিনে ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের দর্শন দেন ও প্রয়োজন মতো পত্র লিখিয়া তাঁহার বক্তব্য ও উপদেশ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল।..."[৫] তার কিছুদিন আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) হয়ে গিয়েছিলো। তার ভয়াবহ বিধ্বংসী তাণ্ডবে তখনো পৃথিবী জুড়ে আতঙ্ক। এই বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্যের দিনে একমাত্র বলিষ্ঠ আশাবাদী দর্শন শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের তত্ত্ব বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক মহলকে আকৃষ্ট করেছিলো। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীঅরবিন্দের 'আর্য' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন বলে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের কথা জেনে বলেছিলেন—"Sri Aurobindo is my spiritual Guru." যদিও রবীন্দ্রনাথ 'আর্য' পত্রিকা পড়তেন কিনা তা জানা যায় না, কিন্তু বিশ্ব-সচেতন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শ্রীঅরবিন্দের যোগজীবনের কথা শুনে থাকবেন। তাই রবীন্দ্রনাথেরও মনে শ্রীঅরবিন্দকে দেখার আকাঙ্খা অনেকদিন থেকেই দানা বেঁধেছিলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "অনেকদিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব।[৬] শ্রীঅরবিন্দের আহ্বানে সেই সুযোগ এসে গেলো, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হলো ২৯শে মে ১৯২৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"কবির সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইল বহু বৎসর পরে। প্রায় এক ঘণ্টা কাল উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়—কী কথা হয়, তাহা প্রকাশিত হয় নাই, কারণ বোধহয় মাদার ছাড়া সেখানে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকঘণ্টা পরে জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া কবি বলেন যে, অরবিন্দকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য লাগিয়াছে। এই সাক্ষাৎ কবির মনে এমন নাড়া দিয়াছিল যে, সমস্তদিন কাহারও সহিত বেশি কথাবার্তা বলেন নাই। সেইদিন (২৯শে মে ১৯২৮) অরবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কবি 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিলেন।"[৭]

৫. এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ও তৎসম্পর্কিত পত্রাবলী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্রজীবনী' থেকে গৃহীত।

৬ তদেব

৭ তদেব

ইংল্যাণ্ড যাবার পথে 'শান্তিলি' জাহাজে বসেই কবি এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধের মূল অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

..."প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালাবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিলো না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত।... তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি-পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, 'যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।' পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম—আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদেব মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। এই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে— 'শৃন্বন্তু বিশ্বে।'[৮]

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার রবীন্দ্রজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলো। শ্রীঅরবিন্দের মুখশ্রীতে রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা' দেখতে পেয়েছিলেন, 'প্রথম দৃষ্টিতেই' বুঝেছিলেন 'ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে' ' পেয়েছেন', তার কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যে প্রথমাবধি আধ্যাত্মিক উপলবদ্ধির একটা প্রচ্ছন্ন পূর্ব-প্রস্তুতি দেখা যায়। কৈশোরেই তাঁর গায়ত্রী মন্ত্রে যে দীক্ষা হয়েছিলো, তাতেই তাঁর মধ্যে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিলো। এই গায়ত্রী মন্ত্রটি হলো—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।" —ঋগ্বেদ ৩/৬২/১০ (অর্থঃ ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও স্বর্লোকে যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমবা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।) (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ— এটি মহাব্যাহৃতি, গায়ত্রী জপের আগে প্রযুক্ত হয়। মূল বৈদিক মন্ত্র হলো—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।—ঋগ্বেদ ৩/৬২/১০)

প্রায় অনুরূপ উপলব্ধির স্পর্শ পাই শ্রীঅরবিন্দের গায়ত্রী মন্ত্রে—

"তৎ সবিতুর্বরং রূপং জ্যোতিঃ পরস্য ধীমহি। যন্নঃ সত্যেন দীপয়েৎ।।"

"Let us meditate on the most auspicious form of Sabitr, on the Light of the Supreme which shall illumine us with the Truth"

—Sri Aurobindo

বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার সময় রবীন্দ্রনাথের যে উপলব্ধি হয়েছিলো তা যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুদ্ধির অতীত মরমিয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—"গায়ত্রী-মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না

৮. 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৩৫।

বুঝিলেও যাহা চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।...আসল কথা, অন্তরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"[৯] প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ এই রকম বুদ্ধির অতীত কোনো উপলব্ধির অধিকারী ছিলেন বলে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দর্শনেই তাঁর আত্মিক উপলব্ধিকে যুক্তিবুদ্ধির প্রমাণ ছাড়াই নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার রবীন্দ্রজীবনে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিলো তা সাক্ষাতের পরের দিন ইউরোপ প্রবাসী প্রতিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকেও জানা যায়—

> "পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে আমার মনে এল আমারো কিছুদিন এই রকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরের আলো ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। প্রতিদিন যা-তা কাজ করে, যা-তা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় চাপা পড়ে যায়, নিজেকে যেন দেখতে পাইনে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ একই দিনে কন্যা মীরাদেবীকেও লেখেন—"অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল— বেশ বুঝতে পারলাম নিজেকে ঠিকমত পাবার এই উপায়।"[১১]

আরো দুটি উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস উক্তি পাওয়া যায়। এই দুটি উক্তি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন দিলীপকুমার রায়ের 'অনামী' গ্রন্থ থেকে। প্রথমটির উপলক্ষ হলো দিলীপকুমার রায় পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যখন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে পাঠান ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২৮। এই কবিতায় রূপকের মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পাওয়া যায় :

> "নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে;
> ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শান্তিহীন সাধনার বলে
> তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
> অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল 'আশীর্বাদ মাগি,
> হে প্রাচীন সরোবর'। সরোবর কহিল হাসিয়া
> 'আশিস্ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া,
> প্রভাত-সূর্যের করে; ধ্যানময় গিরি তপস্বীর
> নিরন্তর করুণায় বিগলিত আশীর্বাদ-নীর
> তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনছায়া হতে

---

৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী, মূল বিশ্বভারতী সং, ১৭শ খণ্ড, ১৩৬১ ('জীবনস্মৃতি'), পৃ ৩০৯।

১০. 'চিঠিপত্র' ৩, পত্র ২৬, ৩০শে মে, ১৯২৮

১১. চিঠিপত্র ৪, পত্র ৬০, ৩০শে মে, ১৯২৮

নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্বারিত স্রোতে,
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রাব প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগায় উৎসাহে।"[১২]

—২৮শে ডিসেম্বর ১৯২৮।

পরে ৫ই বৈশাখ ১৩৩৮ সালে দিলীপকুমার রায়কে লেখা আর একটা চিঠি পাওয়া যায়। তাতেও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পাওয়া যায়।

"শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে—সব সৃষ্টিকর্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইখানেই যেখানে জমেছে সকলের সঙ্গ,—তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন?— যে জন্যে মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জম্‌তে—শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে, তৃষার জন্যে।"

দ্রঃ দিলীপকুমার রায় : 'অনামী', পৃ. ৩৪৯

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। আজকের নানা সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই এনেছিলেন অমৃত-বারি।

— o —

১২. দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ : 'পরিশেষ'।

৩. শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী

"...in the life of Ramakrishna Paramahansa, we see a colossal spiritual capacity, first driving straight to the divine realisation, taking, as it were, the kingdom of heaven by violence, and then seizing upon one yogic method after another and extracting the substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of an intuitive knowledge".

Vivekananda was a soul of puissance if ever there was one, a very lion among men.... We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitive, upheaving that has entered the soul of India and we say, 'Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of her children' ".–Sri Aurobindo : 'Birth Centenary Library' Vol. 20, p. 36 and Vol. 17, p. 332.

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেই শুধু নয়, একজন আদর্শবান আদর্শস্থানীয় পুরুষ হিসাবেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে সর্বভারতীয় স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়েছেন, তা বোধহয় খুব কম নেতাই পেয়েছেন ভারতের ইতিহাসে। এর কারণ বোধহয় এই যে, নেতাজীর কর্মযজ্ঞের মূলে কোনো রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি ছিল না, ছিল একটা আপোষহীন ঋজু আদর্শের প্রেরণা। আর এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় কর্মবীরের জীবনের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল নিজের অনুসরণীয় আদর্শের সন্ধান; অথচ সেই সন্ধান ছিল স্থবির নয়, ডায়নামিক্। দেশের মঙ্গলের জন্যে নিজের জীবনের পথ সন্ধান করতে গিয়ে তিনি আদর্শের সন্ধান করে গেছেন জীবনের পর্বে-পর্বে। যা শাশ্বত চিরায়ত তাকে অন্তরে গ্রহণ করেও জীবনে যুগের উপযোগী দেশের উপযোগী আদর্শ বারবার খুঁজে গেছেন তিনি।

বাংলায় চরমপন্থী স্বাধীনতা-আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। প্রথম জীবনের এই মহাবিপ্লবীর চরিত্র ও কর্মসাধনার যেটা মূল বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য নেতাজীর নিজের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ভারতের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের সেই বৈশিষ্ট্যটি নেতাজী নিজেই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে আমাদের দেশে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়' প্রথম সাধিত হয়েছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে এবং সবার উপরে তিনি ছিলেন 'মানবপ্রেমিক'। আর মানবপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে যে আদর্শ ফুটে উঠেছিল তাই শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) ও তাঁর যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ

করেন, কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। অরবিন্দ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি, বরং এর গভীরে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন, এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্তরে রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটেছিল। (—নেতাজীর অসমাপ্ত আত্মজীবনীব অনুবাদ : 'ভারতপথিক' সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ৯)। নেতাজী শ্রীঅরবিন্দকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন তা আমরা এখান থেকেই জানতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছে শুনেছি—শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃতি ছিল মূলত আত্মপ্রচারবিমুখ ও অন্তর্মুখী। তাঁর সমগ্র কর্মপ্রয়াস ও জীবনসাধনার এ হল একটি লক্ষণীয় মূল বৈশিষ্ট্য। নেতাজীর জীবনেও আমরা লক্ষ্য করি প্রথমে ছিল একটি সহজাত অন্তর্মুখীনতা। আত্মজীবনী রচনার সময়ও তিনি লিখেছেন : "আমি বোধ হয় অন্তর্মুখী ছিলাম এবং এখনও তাই আছি" (—'ভারত পথিক', সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩)। পরে সমাজ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এবং আত্মজীবনীতেই পরবর্তী অংশে লিখেছেন "খুব ধীরে ধীরে আমি আমার অন্তর্মুখীনতা ঝেড়ে ফেলেছিলাম।" (পৃ. ৩৫)। তাঁর অন্তর্মুখীনতা তিনি কাটিয়ে উঠলেও এই অন্তর্মুখীনতা তাঁর বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যেও একান্ত বহির্মুখী বিক্ষিপ্ততা থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে, একটা অবিচলিত আত্মস্থতা তিনি কখনো ত্যাগ করেননি। যদিও ব্যক্তিগত স্বার্থে যোগসাধনা তিনি করেননি, তবু এই আত্মস্থতায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ পথনির্দেশ ও শক্তিলাভের জন্যে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যেও বারে বারে নিবিষ্ট হয়েছেন ধ্যানের তন্ময়তায়। যখনই তিনি ভারতের জন্যে গঠনমুখী পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছেন তখনই বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দের মতো কর্ম ও ভোগের মধ্যেও ত্যাগ ও ধ্যান-ধারণার উপরে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন : "নব জাগরণেব জন্য এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে: ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম, ত্যাগ, ভোগ— এই সবের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে—যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।" (—'তরুণের স্বপ্ন', ১৯৯৭, পৃ. ১২)।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রথম আদর্শেব প্রেরণা জাগিয়েছিলেন তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশ। এবং তাঁব আদর্শ-উন্মুখ বয়ঃসন্ধি-লগ্নে প্রথম ধ্রুবতাবার মতো দেখা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্র যখন 'সবে পনেরয়' পড়েছেন, তখন 'একদিন হঠাৎই দৈবক্রমে' একজন প্রতিবেশী আত্মীয়ের বাড়ীতে "তাঁব বইগুলির উপর চোখ বোলাতে বোলাতে নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী"। নেতাজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "কযেকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বুঝলাম, এতে এমন কিছু আছে যা আমি খুঁজে মরছি। বইগুলি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বাড়ীতে এসে সাগ্রহে পড়তে আরম্ভ করলাম। মজ্জাবধি আমার শিহরন খেলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করেছিলেন, আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করিনি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ আমাকে

তাই এনে দিলেন।" (—'ভারতপথিক', সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০)

স্বামী বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন নেতাজী। উপলব্ধি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মধ্যে "সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান হল সাধারণভাবে চরিত্র-গঠন ও বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব নির্দেশ। তিনি অবিরতই একথা বলতেন যে, ত্যাগের দ্বারাই শুধু সিদ্ধিলাভ সম্ভব...।" একথা বলাই বাহুল্য যে, আত্মস্বার্থ ত্যাগের যে জ্বলন্ত আদর্শ নেতাজী তাঁর সমগ্র জীবনে রূপায়িত করে গেছেন, তাব দীক্ষা এখানেই হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ-শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ও প্রেরণা নেতাজীর সমগ্র জীবনে ফল্গু-স্রোতের মতো চির-প্রবাহিত ছিল।

স্কুল-জীবন থেকে আদর্শের এই মূল প্রতিষ্ঠা নিয়ে নেতাজী পরবর্তী ছাত্রজীবনে ও সংগ্রামী জীবনে যত এগিয়ে গেছেন তত বিভিন্ন পর্বে তিনি শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দ-শ্রীবামকৃষ্ণ ও শ্রীঅববিন্দ তাঁর কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন ও পৃথক আদর্শ রূপে উপস্থিত হননি, এঁরা ছিলেন একই ভাবতীয় ঐতিহ্যের তথা একই ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি বিভিন্ন যুগে যুগোপযোগী বিবর্তনের ধারায় নবরূপে রূপায়িত। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে শ্রীঅরবিন্দের দিকে সঞ্চরণ তাঁব কাছে ছিল একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। স্কুল-জীবনের পরে কলেজ জীবন থেকেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। তাঁর আত্মজীবনীর পৃষ্ঠায় দেখি : "কলেজের ছাত্ররূপে যা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তা অরবিন্দের নামকে ঘিবে দুর্জ্ঞেযতা নয়, বরং তাঁব রচনা ও পত্রগুলি। অরবিন্দ তখন 'আর্য' নামে একটি.. পত্রিকা সম্পাদন কবছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর দর্শন ব্যাখ্যা করতেন।... যা আমাকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত কবেছিল তা....তাঁর চমকপ্রদ উক্তিগুলো নয। তাঁব গভীরতর দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছিল।" (—'ভাবতপথিক', সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪)। কলেজ জীবনে নেতাজী বিশেষভাবে দর্শনের ছাত্র ছিলেন; সাম্মানিক শ্রেণীতে দর্শনশাস্ত্র পড়েছিলেন এবং অনুমান কবা যায় 'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের মূল দার্শনিক গ্রন্থ 'দিব্যজীবন' (The Life Divine) পড়েই নেতাজী লিখেছিলেন "তাঁর গভীরতর দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"

নেতাজী কলেজ-জীবনের পরে—এমন কি আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবারও পরে—যখন ক্রমে-ক্রমে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে এগিয়ে আসতে চান, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের গুরু ও পথনির্দেশক হয়ে উঠেন, একথা আমরা জানি। নেতাজী তাঁর এই আরাধ্য গুরু সম্পর্কে লিখেছেন : "আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণে দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহাব পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহাব অবর্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার মহিমময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে

জীবনের পথে চলিব; এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে পোষণ করি।" (—'তরুণের স্বপ্ন', ১৯৯৭, পৃ. ৬৪)।

১৯২০ সাল থেকে নেতাজী তাঁর সেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে চিঠি লিখতে থাকেন। ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি যে চিঠি লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দের পথই তাঁর গ্রহণীয় পথ বলে উল্লেখ করছেন : "আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়েই জীবন আরম্ভ করতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ-চিন্তা এবং দেশেব কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তা ছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে কাজ করা অতি ঘৃণিত মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার কাছে মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ।" (—'ভারতপথিক', সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১)। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁর আদর্শ, দেশবন্ধু ছিলেন তাঁর পরবর্তী বাস্তব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথ-নির্দেশক ও গুরু।

একথা আমাদের সকলেরই জানা যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজীর পথ ছিল অহিংস আন্দোলনের পথ নয়, সহিংস সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। আর বাংলায় পূর্ণ স্বাধীনতা ও সশস্ত্র বিপ্লবের দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই বাজনৈতিক আদর্শ নেতাজী শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব-প্রয়াস থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

নেতাজীর জীবনদৃষ্টির দুটি দিক—একদিকে আধ্যাত্মিক দার্শনিক প্রবণতা, অন্যদিকে আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা—এই উভয় দিকেই শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁর আদর্শস্থানীয় পুরুষ। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সালে কেম্ব্রিজ থেকে নেতাজী তাঁর সেজদাদাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন : "অরবিন্দ ঘোষ আমার আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর কাছে এবং তাঁব উদ্দেশ্যের কাছে আমি আমার জীবন ও সত্তা সমর্পণ করেছি।" (—সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১)।

গ্রীসের মনীষী প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাজ্যের জন্যে যে আদর্শ নৃপতির কথা ভেবেছিলেন সেই নৃপতি হবেন 'দার্শনিক রাজা' (Philosopher King)। অর্থাৎ তাঁর মতে, রাজার মধ্যে দার্শনিক প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক শাসনক্ষমতার সমন্বয় হওয়া চাই। আমাদের দেশের আজকের আদর্শহীন নিত্য-পরিবর্তনশীল আপোষ-চপল রাজনীতিতে কাটাকুটি খেলার দিনে ভাবুকের দেখা এই স্বপ্ন বাস্তবে সম্ভব কিনা জানি না; কিন্তু আমাদের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতাজীব মধ্যে এই দুয়ের সার্থক সমন্বয় হয়েছিল। ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক ও ক্ষত্রিয়ের তেজঃ বীর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। তাঁব দার্শনিক প্রজ্ঞা তাঁর আপোষহীন সংগ্রামী প্রয়াসকে চালিত কবেছিল। এবং তাঁর দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘকাল ছিলেন তাঁর অনুসরণীয় আদর্শ।

৪. শেক্‌স্‌পীয়র : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে

নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় কালোত্তীর্ণ সাহিত্য-সমালোচকের পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।' সমালোচকের মননের সঙ্গে কবির সৃজনের শক্তি যদি সম্মিলিত না হয় তো সৃষ্টির রহস্যভেদ সমীক্ষকের পক্ষে আংশিক ব্যর্থতার রূপ পেতে বাধ্য। অন্যদিকে স্রষ্টার হৃদয় যেখানে হাত মিলিয়েছে সমালোচকের মনীষার সঙ্গে সমালোচক সেখানেই 'সরস্বতীর সন্তান', সারস্বতের মর্মব্যাখ্যায় সফল, কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির অধিকারী। ওদেশের ম্যাথু আনল্ড্, টি. এস. এলিয়ট এবং এদেশের রবীন্দ্রনাথের মতোই শ্রীঅরবিন্দও এমনি একজন কবি ও সমালোচক একাধারে। তাঁর যোগজীবনের জ্যোতির্মণ্ডল, দার্শনিকতার উত্তুঙ্গ বিহার তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়কে সাধারণের কাছে অনেকখানি আচ্ছন্ন করলেও কবি ও সমালোচক হিসাবে তাঁর অবদান অমরত্বের দাবি রাখে। এই বিশ শতকে যখন মহাকাব্য রচনা প্রায় অসম্ভব বলে ঘোষিত হয়েছে তখনই শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী ভাষায় রচনা করলেন তাঁর অপূর্ব প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী' (Savitri)। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌লগ্নে তাঁর মনীষার সপ্তাশ্ব রথ 'আর্য' পত্রিকায় তাঁর যে সাতটি প্রধান রচনা আত্মপ্রকাশ করে—দ্য লাইফ ডিভাইন (দর্শন), দি সিন্থিসিস অফ যোগ (যোগ), দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি (রাজনীতি), দি হিউম্যান সাইক্‌ল্ (সমাজনীতি), দি এসেজ অন দ্য গীতা (ভাষ্য), দ্য সিক্রেটস্ অফ দ্য বেদ (ভাষ্য) এবং দ্য ফিউচার পোয়েট্রি (নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা)—লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য-জিজ্ঞাসাও তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ছিল। আশৈশব কবিমনের অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ 'আর্যে' যখন 'ফিউচার পোয়েট্রি'র মাধ্যমে সাহিত্য-সমালোচক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন বোঝা গেল তাঁর বিরাট মনীষায় তাঁর সাহিত্য যেমন সাধনার মর্যাদা পেয়েছে, তাঁর সমালোচনাও তেমনি সৃষ্টির সৌন্দর্য-মণ্ডিত। স্বয়ং কবি ছিলেন বলে শ্রীঅরবিন্দ এখানে ইংরেজি কাব্যধারার মূলমন্ত্র আবিষ্কার করেছেন অপূর্ব সমপ্রাণতার সঙ্গে। স্রষ্টার প্রতিভা যেমন বিশ্বরহস্যের সঙ্গে অন্তত একবারের জন্যে একপ্রাণ হয়ে যায়, সমালোচকের প্রতিভাও তেমনি শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। অনবদ্য সৃজনী প্রতিভার অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ এই একাত্মতার গুণে সাহিত্যসৃষ্টির মূলতত্ত্ব যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, কাব্যসৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের প্রধান প্রধান স্রষ্টাদের সম্পর্কে সুষম বিচক্ষণ আলোকপাতও করেছেন। তাঁর ফিউচার পোয়েট্রি ও পত্রাবলীতে ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার শেক্‌সপীয়র সম্পর্কে তাঁর আলোচনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

সাহিত্য যে জীবনেরই রসরূপ—এ সূত্র শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করেননি। তাই শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টির ব্যাখ্যা ও সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর জীবন-চেতনার কথাই উল্লেখ

করেছেন প্রধানভাবে। জীবনরস-রসিক শেক্‌স্‌পীয়র জীবনের মধ্যে প্রাণের বিপুল প্রবাহ ও বিচিত্র প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সেই জীবননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির মূলে তাঁর সমাজ ও পরিবেশের পটভূমিকাটি অনেকখানি ক্রিয়াশীল ছিল। ইউরোপীয় নবজাগরণের পরিণততম ফলশ্রুতি শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনদৃষ্টি গঠনে যথেষ্ট কাজ করেছিল। সৃষ্টির সঙ্গে সমাজজীবনের এই যোগ আবিষ্কার যে ঐতিহাসিক সমালোচনার আধুনিকতম রীতি শ্রীঅরবিন্দের সমালোচনায় তার পরিচয় সুস্পষ্ট—যদিও সৃজনী প্রতিভাকে তিনি শুধু সামাজিক বাতাবরণের উৎপাদন-ফল বলে স্বীকার করেননি। দেখা যাবে শেক্‌স্‌পীয়রের কবিস্বরূপ নির্ণয়ের আগে শ্রীঅরবিন্দ ইউরোপের তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষ করে নবজাগরণের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনা ছিল মূলত ধীরপ্রবাহিত প্রথাবদ্ধ, এবং একদিকে রাজভয় অন্যদিকে ধর্মভয়ে সদাসঙ্কুচিত সীমাবদ্ধ। নবজাগরণে এই সীমা-সঙ্কোচ বিচূর্ণ হল, জীবনের প্রতি মমতা বৃদ্ধি পেল। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,

"The Middle Ages had lived strongly and with a sort of deep and sombre force, but, as it were, always under the shadow of death and under the burden of an obligation to aspire through suffering to a beyond; their life is bordered on one side by the cross and on the other by the sword The Renaissance brings in the sense of a liberation form the burden and obligation, it looks at life and loves it in excess. "[১]

মনে হয় অভ্রান্ত শ্রীঅরবিন্দেব সমাজ-বীক্ষা, অন্তর্ভেদী তাঁর দৃষ্টি, যখন দেখি তিনি বলছেন, রেনেসাঁসের রূপ বিভিন্ন দেশে খানিকটা স্বতন্ত্র', কিন্তু সর্বদেশে তার স্বরূপগত পরিচয় একই,—সে হল এই জীবন-প্রেম—জীবনের প্রতিটি লীলা-বিকাশে সৌন্দর্য ও আনন্দের আবিষ্কার—'discovery of beauty and joy in every energy of life'। নবজাগ্রত ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক অভিযান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, চিন্তাগত সমৃদ্ধি ইত্যাদি জীবনের সর্বমুখী নবতম বিকাশের চরম রূপ দেখা গেল এলিজাবেথের শাসনকালে, আর এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চিত্র পেলাম এলিজাবেথের যুগের কাব্যে ও নাটকে। এযুগের শ্রেষ্ঠতম কবি-নাট্যকাব শেক্‌স্‌পীয়রের জীবন-চেতনায় তাই জীবনের এত বিচিত্র রূপ ও অবাধ লীলা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের এই উদ্দামতা ও প্রচণ্ডতা বোধ হয় ভাগীরথীর প্রথম অবতরণের ধারাটির মতোই দুর্বার এবং শেক্‌স্‌পীয়রের মতো প্রচণ্ড শক্তিধরের পক্ষেই তার প্রথম বেগটি ধারণ করে পরে তাকে শিল্পের সুবিন্যস্ত খাতে নবমুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর যুগে অন্য নাট্যকার যাঁরা ছিলেন, জীবনের এই প্রথম প্রচণ্ড বেগটি তাঁরা ধারণ করতে পারেননি। জীবন তাঁদের প্রতিভার শৈল্পিক পথ বেয়ে প্রকাশিত না হয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে নিজের পথ নিজে করে নিয়েছে। সেখানে জীবনের সঙ্গে শিল্পের, প্রকৃতির সঙ্গে আর্টের কোন পার্থক্য দেখি না।

১ Sri Aurobindo 'The Future Poetry' (1953) p 88

কিন্তু জীবনের ফটোগ্রাফিক উপস্থাপনাতেই শিল্প-সাধনার সিদ্ধি নেই। জীবনের প্রতি মমতা, প্রাণের উদ্দামতা ও প্রবেগ, কর্মময় জীবনের সংঘর্ষ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা— উচ্চাঙ্গের নাট্যসৃষ্টির জন্যে এসবই প্রয়োজন, কিন্তু এটুকুতেই শিল্পের পূর্ণাঙ্গ সফলতা নেই। জীবনের এসমস্ত উপাদানকে সংগ্রহ করে একটি অখণ্ড শিল্পরূপ গড়ে তোলার জন্যে শিল্পীর মধ্যে চাই ব্যাখ্যাতার ঋষিদৃষ্টি। জীবনের প্রতিটি লগ্ন প্রত্যেকটি ক্রিয়া ও আবেগ পবস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, জীবনের বাহ্যক্রিয়াবলীর অন্তরালশায়ী একটি গভীরতর জীবনসত্যের অবিচ্ছেদ্য সূত্রে সবই একত্র-গ্রথিত। এই গ্রন্থন আবিষ্কারের জন্যেই প্রয়োজন ব্যাখ্যাতার সেই অন্তর্দৃষ্টি। এরই উপস্থিতিতে জীবনের কথা অখণ্ড শিল্পরূপ ধারণ করে, এরই অনুপস্থিতিতে জীবনেব উপস্থাপনা হযে দাঁড়ায় বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীব অর্থহীন রিপোর্ট। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই ব্যাখ্যাতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই শেক্‌স্‌পীয়র কালোত্তীর্ণ স্রষ্টা, এরই অভাবে তাঁর সমসাময়িকেরা সীমাবদ্ধ রয়ে গেলেন কালের গণ্ডিতে।

জীবনের আহৃত বিচ্ছিন্ন উপাদান যে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টিতে শিল্প-মাল্য বচিত হয়েছে নিঃসন্দেহে তা হল এই ব্যাখ্যাতাব অন্তর্দৃষ্টি ('interpretative vision')। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে জীবনব্যাখ্যা কখনো দার্শনিকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। চিন্তার উপরে অতিমাত্র গুরুত্ব আরোপ করে জীবনকে সূত্ররূপে উপস্থাপিত করেননি শেক্‌সপীয়র, জীবনের রসরূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কাছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

"He (Shakespeare) is not primarily an artist, a poetical thinker or anything else of the kind, but a great vital creator and intensely, though within marked limits, a seer of life"[২]

শেক্‌স্‌পীয়রের আলোচনা প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়টও অনেকটা একই কথা বলেছেন—

"If Shakespeare had written according to a better philosophy, he would have written a worse poetry: it was his business to express the greatest emotional intensity of his time. .."[৩]

এখানেই শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক নাট্যকারদের সঙ্গে শেক্‌সপীয়রের পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। জীবনভাবনা-জীবনব্যাখ্যা শেক্‌স্‌পীয়র ও গ্রীক নাট্যকারদের ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র প্রতিভা-রীতিতে সাধিত হয়েছে। শেক্‌স্‌পীয়র জীবন-প্রকাশে স্বতঃউৎসারিত সৃষ্টির (spontaneous creation) তাগিদ বক্ষা করেছেন। জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ এত নিবিড় ছিল যে, জীবন তাঁর সৃষ্টিতে যেন আপনা থেকেই শিল্পিত নবজীবনরূপে গঠিত হয়ে চলেছে। কিন্তু গ্রীক নাট্যকারেরা জীবনকে যেন গ্রহণ করেছেন অনেকটা দার্শনিকের দৃষ্টিতে, এজন্যে যেন একটা ধ্যানলব্ধ শিল্পবোধ জীবনের উপবে সচেতন নিয়ন্ত্রণ চালিয়েছে (compulsion of an intuitive artistic will)। প্রথম ক্ষেত্রে তাই নিরপেক্ষ ভোক্তার

২ Ibid, p 99

৩ Shakespeare and The Stoicism of Seneca

জীবনরস যতটা ছাপিয়ে উঠেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ততটাই যেন সাধকের জীবন-নীতির অনুশাসন প্রধান। একজন গ্রীকনাট্যবিশেষজ্ঞ যথার্থই বলেছেন—

"This ethical elevation of tone and purpose is perhaps the most salient feature in ancient drama..."[৪]

শেক্‌স্‌পীয়রের শিল্প-চেতনায় প্রতিভাধর স্বতঃউৎসারণ যতখানি আছে, বুদ্ধির সচেতন নিয়ন্ত্রণ ততটা নেই। জাত প্রতিভার বলে জীবনের যে ব্যাপক বৃহৎ চেতনা তাঁর নাট্যসাহিত্যে পাওয়া যায়, তা-ই তাঁর অমরত্বের প্রধানতম কারণ। তাঁর শিল্পকলা আজ প্রশ্নাধীন হতে পারে, কিন্তু তাঁর জীবন-চেতনা শাশ্বত।

শেক্‌স্‌পীয়রের এই জীবন-চেতনাকেই শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই শ্রীঅরবিন্দের আলোচনা মূলত আস্বাদনপন্থী (appreciative), অ্যারিস্টটল বা ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মত বিশ্লেষণপন্থী (analytic) নয়। কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি স্রষ্টার মতোই একদিকে যেমন সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে তেমনি অন্যদিকে আবার তাঁকে দ্রষ্টার নিরপেক্ষ নিরাসক্তিও বজায় রাখতে হয়। সমালোচকের এই অপরিহার্য দুর্লভ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ। তিনি একদিকে তাই শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টির প্রাণরহস্য আবিষ্কার করেছেন, অন্যদিকে তেমনি এই নিরাসক্তির জন্যেই সমালোচনায় সংযম ও ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। তাই শেক্‌স্‌পীয়রের জীবন-চেতনার ব্যাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে তার সীমা-নির্দেশও করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের কবিমানসে জীবনের বিচিত্র ব্যাপ্ত রূপ যেমন বিধৃত হয়েছে, তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে, জীবনের সামগ্রিক রূপ শেক্‌স্‌পীয়র ধারণ করতে পারেননি। তাঁর চেতনা জীবনের নিম্নতম কোটি যেমন স্পর্শ করেছে, উচ্চতম শীর্ষে তেমন আরোহণ কবতে পারেনি। একই মানবাধারে যেমন প্রেত, পিশাচ, পশু, পাশবিকতার প্রচণ্ডতম প্রবেগ পরিলক্ষিত হয় তেমনি দিব্যজীবনের জ্যোতির্লেখাও উদ্ভাসিত হতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়র প্রাণময় কোষের কামনা বাসনা সংঘর্ষ সংগ্রাম—এবং এই স্তরেরই কিছু হৃদয়ের মহত্ত্ব—রূপায়িত করেছেন, কিন্তু উচ্চতর মনের গভীরতর দিব্যসত্তার যাদু তাঁর প্রতিভাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। শ্রীঅরবিনেদের ভাষায় তাঁর মতামত উদ্‌ধৃত করি—

> "His development of human character has a sovereign force within its bounds, but it is the soul of the human being as seen through outward character, passion, action, the life-soul and not either the thought-soul or the deeper phychic being or the profounder truth of the human spirit."[৫]

ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন জীবনের উচ্চতম ও নিম্নতম, মহত্তম ও নীচতম প্রেরণা ও এষণা এঁরা যতদূর কল্পনা করতে পেরেছেন, শেক্‌স্‌পীয়র ততদূর পারেননি।[৬] শ্রীঅরবিন্দের মতে তবু শেক্‌স্‌পীয়রের জগৎ শুধু

---

৪. A.E. Haigh . 'The Tragic Drama of the Greeks'.

৫. 'The Future Poetry', p. 100

৬. 'Letters of Sri Aurobindo', 3 rd series 1949, pp. 301-6

বহির্জগৎ বা স্থূল জগৎ নয়, স্থূলের একটু উপরের স্তরে শেক্স্পীয়রের হিরণ্যগর্ভ প্রতিভা তার নিজস্ব সৃষ্টির একটি জীবননিষ্ঠ শিল্প-লোক রচনা করেছে। এবং তাঁর এই নিজস্ব ভূমিতে শেক্স্পীয়রের সৃষ্টিশক্তি নিখুঁৎ ও অনন্য। তাঁর সীমা এবং তাঁর ক্রটি বিস্মৃত হয়ে যাই যখন তাঁর কল্পনার মৌলিকতা, জীবনীশক্তির অফুরন্ত উৎসার, প্রকাশের অপ্রমেয় শক্তির কথা ভাবি; শ্রীঅরবিন্দ বলতে ভোলেননি ব্যাস-বাল্মীকিকেও এখানে শেক্স্পীয়র অতিক্রম করে গেছেন। বাস্তবিক শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য-দৃষ্টি কোন অন্ধ জাতীয়তাবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। সমালোচক হিসাবে তিনি সর্বদেশের, সর্বজাতির। এখানেও তিনি কলোত্তীর্ণ স্রষ্টা।

ছ. প্রসঙ্গ : গ্রন্থ-সমালোচনা

১. ভাষাবিজ্ঞানে পূর্ণায়ত দৃষ্টিভঙ্গি

১। **পৃথিবীর ভাষা · ইন্দো-ইউরোপীয় প্রসঙ্গ**
পরেশচন্দ্র মজুমদার
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি/কল-২০/৫৫ ০০

২। **'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব'**
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
নয়া উদ্যোগ/কল-৬/১৫০ ০০

ঐতিহাসিক আর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান কিংবা কালক্রমিক (diachronic) ও এককালিক (synchronic) ভাষাবিজ্ঞান—যে অভিধায়ই চিহ্নিত করি না কেন, এক সময় এই দুই ধারা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা, মনে হত যেন দুটি প্রায় সমান্তরাল রেখা এগিয়ে চলেছে পরস্পরকে না ছুঁয়ে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বুনেছিলেন সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure)। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা (১৯০৭-১১) দিতে গিয়ে এই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বকে তার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে গ্রহণ করলেও একেবারে আপোসহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– বর্ণনামূলক (এককালিক) ও ঐতিহাসিক (কালক্রমিক) দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা হল চরম বিরোধিতা এই দুয়ের মধ্যে আপোসের কোনও পথই খোলা নেই "The opposition between the viewpoints, the synchronic and the diachronic is absolute and allows no compromise' –de Saussure, Ferdinand *Course in General Linguistics BR 1966, p 83*। তারপর এলেন তাঁর ভাবশিষ্য উত্তরসাধকেরা। ভাষার এককালিক রূপবর্ণনাকে চরমে নিয়ে গিয়ে ভাষার শুধু অবয়বের বহিরঙ্গের বর্ণনা ও বিশ্লেষণকে ভাষাবিজ্ঞানের উপজীব্য করে তুললেন। লিওনার্দ্ ব্লুমফিল্ড (Leonard Bloomfield *Language*, 1933), জেলিগ্ এস. হ্যারিস্ (Zellig S Harris *Methods in Structural Linguistics*, 1951) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর হাতে অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞানের (Structural Linguistics) প্রতিষ্ঠা হল। অন্য দিকে পাশ্চাত্যে ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণচর্চার ধারা স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হয়ে চলল ক্রমশ অধিকতর উপেক্ষার সঙ্গে। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বচর্চার জগতে অদ্বিতীয় মনীষী ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্যে যখন বর্ণনামূলক-অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা হয়ে গেছে। ১৯২৬ এ ভাষাচার্যের 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল চলল ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের রমরমা। ভাষাবিজ্ঞানে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারই আমাদের দীক্ষাগুরু। তাঁর আগে এদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার বিক্ষিপ্ত কিছু সূচনা হয়ে থাকলেও তিনিই আধুনিক ভাবতে ভাষাবিজ্ঞানের জন্মদাতা—Father of Modern Indian Linguistics। তাঁর পথ ধরে এলেন বাংলায় আচার্য সুকুমার সেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অধ্যয়নে এগিয়ে এলেন ডঃ বাণীকান্ত কাকতী

(Assamese, its Formation and Development'), ডঃ উদয়নারায়ণ তেওয়ারী ('The Origin and Development of Bhojpuri'), ডঃ বাবুরাম সক্সেনা, ('Evolution of Awadhi'), ডঃ সুভদ্র ঝা ('Formation of Maithili') এবং আরও অনেকে। কিন্তু পরে বাংলায় শুরু হল সেই ঐতিহাসিক আর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব—সোস্যুর যেটাকে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বলেছিলেন সেটা হয়ে উঠল গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা; শেষে তা রূপ নিল আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণের। অনেক দিন পরে আজ সেই দ্বন্দ্ব-মুখর পর্বের অবসান হয়েছে, আজ ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় আমরা হয়তো থিসিস্-অ্যান্টিথিসিসের স্তর পেরিয়ে সিন্থেসিসের স্তরে উঠে এসেছি। বিদেশে এবং আমাদের দেশেও পুরনো বিরোধ ও বিরোধিতার অবসান হয়েছে, ভাষাবিজ্ঞানীরা এখন উপলব্ধি করছেন পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে পেন্ডুলামটির দোদুল্যমান অবস্থা এখন থেমে গেছে সমন্বয়ের বিন্দুতে এসে—চমৎকার এই তুলনাটি আজকের ভাষাবিজ্ঞানী পল কিপার্স্কির: "Today this pendulum may finally have come to a position of rest" —Kiparsky, Paul 'Historical Linguistics' in *New Horizons in Linguistics*, ed. by Lyons, John 1980, p 315

কেমন করে এলেন ভাষাবিজ্ঞানীরা দোদুল্যমান অবস্থা থেকে প্রজ্ঞার স্থৈর্যে? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দৌলতে। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব—যা ছিল ভাষার ইতিহাস আর ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, তাও—প্রতিষ্ঠা পেল বৈজ্ঞানিক নীতিপদ্ধতির ওপর। যে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বকে কট্টর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন ভাষাবিজ্ঞান থেকে, হকেট্ (Charles F Hockett) তাকে তুলে আনলেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গনে। এ প্রচেষ্টা আগেও কেউ কেউ করেছিলেন। হকেট্ নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও তার নীতিপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন বিস্তৃতভাবে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পাশে সমান মর্যাদায় তাঁর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে। এত কথা স্মরণ করছি এই জন্যে যে, আলোচ্য দুজন বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখা যায় দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা, উদারতা এবং সমন্বয়ী পূর্ণতা। অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ তো স্বীকারই করেছেন— তাঁর গ্রন্থে 'ঐতিহাসিক তুলনামূলক, গঠনমূলক ও রূপান্তরমূলক পদ্ধতির সাহায্যে মূল বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে।' আর অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার তার 'পৃথিবীর ভাষা: ইন্দো-ইউরোপীয় প্রসঙ্গ' গ্রন্থে তাঁর নির্বাচিত ভাষাগুলি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে ভাষাগুলির ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে বর্ণনামূলক গঠন-বিশ্লেষণও স্থান পেয়েছে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের শরিক দুই-ভূখণ্ড পশ্চিম বাংলা ও পূর্ববাংলা ('বাংলাদেশ')—বাংলার ভাষাবিজ্ঞান চর্চার এই দুই দিগন্তের দুই জ্যোতিষ্ক ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার—দুজনেরই আলোচনার প্রধান আকর্ষণ যা চোখে পড়ে তা হল পূর্ণায়ত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দুজনের অ্যাপ্রোচে। অধ্যাপক মজুমদারের উদ্দেশ্য ইউরোপের কয়েকটি নির্বাচিত ভাষার বংশ-পরিচয়, ইতিহাস এবং তারই সঙ্গে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ। এই ইতিহাস ও বর্ণনার সূত্রে এসেছে তত্ত্বের উল্লেখ। আর অধ্যাপক মোরশেদের উদ্দেশ্য ভাষার তত্ত্ব

ব্যাখ্যা ও তার নানা নীতিপদ্ধতির বিধিবদ্ধ উদ্‌ঘাটন; তার উদাহরণের সূত্র ধরে এসেছে বাংলা ভাষা সহ অন্যান্য ভাষার আলোচনা।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার যে ধারা প্রবর্তন করেন তাকে পরিপুষ্টি দান করেছিলেন, সাম্প্রতিককালে সেই ধারাটি যাঁর হাতে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে তিনি আত্মপ্রচার-বিমুখ নিবিষ্ট অন্বেষু অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার। 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ'-এ যাঁকে প্রাচ্যের সমৃদ্ধতম প্রাচীন ভাষার ক্ষেত্রে একালের অদ্বিতীয় গবেষক রূপে দেখেছিলাম, তাকে এবার দেখা গেল অন্য মেরুতে সঞ্চরণ করতে অনুরূপ গাম্ভীর্যে, অনুরূপ গভীরতায়। এবারে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র পাশ্চাত্যের ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান কয়েকটি আধুনিক আর্যভাষা। এবং এবারে শুধু ঐতিহাসিক বিচার নয়, বর্ণনামূলক বিশ্লেষণেও এগিয়ে এসেছেন তিনি। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের বাইরেও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের কোনও কোনও ধারা এর মধ্যেই তাঁর দক্ষ স্পর্শে এদেশে আলোকোজ্জ্বল অবয়বে মাঝে মাঝে ধরা পড়তে আরম্ভ করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থে তারও কিছু-কিছু পরিচয় পাই।

আলোচ্য গ্রন্থে অধ্যাপক মজুমদার নির্বাচিত ভাষাগুলির বংশ-পরিচয় ও অতীত ইতিহাস বিবৃত করে চলে এসেছেন তাদের বর্তমান ভাষিক গঠনের সংক্ষিপ্ত সংহত বিশ্লেষণে। এই বিশ্লেষণে মূলত তাদের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যদ্যোতক পরিচয় চিহ্ন তুলে ধরেছেন। এর আগে ঠিক একই পদ্ধতিতে তিনি ভারত-উপমহাদেশের প্রধান ভাষাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন তাঁর 'আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে' (১৯৮৭) গ্রন্থে। তিনি ঠিকই বলেছেন তাঁর বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থের পরিপূরক। সুতরাং দুটি গ্রন্থ মিলিয়ে পৃথিবীর প্রধান ভাষাচিত্র প্রায় পূর্ণাঙ্গ হল।

আরও আনন্দের কথা, লেখক নির্বাচিত ভাষাগুলির শুধু ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনে নিজের অন্বেষাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ভাষার মহিমা তার সাহিত্যিক সমৃদ্ধিতে, তার ভাবসম্পদের ভাণ্ডারে। একথা মনে রেখে লেখক নির্বাচিত ভাষাগুলির প্রধান সাহিত্যিক সম্পদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। ফলে একই সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের দ্বৈত ক্ষেত্রে প্রায় বিশ্বপরিক্রমার সুযোগ পেলাম আমরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে। তবে একথা হয় তো বলে দিতে হবে না যে, মাত্র ২৪৪ পৃষ্ঠার একটি বইতে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের সব ভাষা ও সব সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং লেখককে বেছে নিতে হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রধান চারটি শাখা এবং এই প্রধান কয়েকটি ভাষা। যেমন-ইতালিক শাখা >রোমান্স ভাষাবর্গ: স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফরাসি; টিউটনিক শাখা >জার্মানিক ভাষাবর্গ: জার্মান, ইংরেজি, বাল্টো-শ্লাবিক শাখা >শ্লাবোনিক উপশাখা: রুশ ভাষা; ইন্দো-ইরানীয় শাখা >পারসিক উপশাখা: ফারসি ভাষা। গ্রন্থটি যখন ভাষার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নয়, ভাষার বিশ্লেষণ, তখন এরকম কয়েকটি প্রধান ভাষা বেছে নেওয়া ছাড়া গবেষকের গত্যন্তর থাকে না। তবু এই প্রসঙ্গে একটি ঘাটতি চোখ এড়িয়ে যায় না। ইতালিক বা লাতিন শাখা থেকে জাত রোমান্স ভাষাগুলির মধ্যে ফরাসির

মতো ইতালীয়ও একটি প্রধান ভাষা। সমগ্র ইউরোপে এক সময় নবজাগরণের উৎস ও কেন্দ্র ছিল ইতালি। তার ভাবসম্পদ, চিন্তাস্ফুরণ ও সাহিত্যসমৃদ্ধির আধার ইতালীয় ভাষার কথা মনে রাখলে পর্তুগিজের চেয়ে ইতালীয় ভাষাকে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। সুতরাং আমরা আশা করব পরবর্তী সংস্করণে ইতালীয়ও স্থান পাবে লেখকের আলোচনা ও বিশ্লেষণের তালিকায়।

অধ্যাপক মজুমদারের ভাষা দৃষ্টির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ম্যাথু আর্নল্ডের অন্য প্রসঙ্গে প্রযুক্ত একটি পদগুচ্ছ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সেই পদগুচ্ছটি হল high seriousness। ফলে আলোচ্য কোনও বিষয়কেই তিনি হালকাভাবে নেন না। প্রত্যেকটি বিষয়কেই ধরে তাকে তলিয়ে দেখা এবং তার সম্পর্কে আরও তথ্য দিয়ে গভীরতর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা—এই হল তাঁর গবেষণার মূল নীতিগত প্রতিষ্ঠা। একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যাক। ভারতীয়দের মধ্যে বহু পূর্ববর্তী পণ্ডিত তারাপুরওয়ালা (*Irach Jehangir Sorabji Taraporewala) তাঁর বহুপঠিত গ্রন্থে (Elements of the Science of Language) পৃথিবীর ভাষাগুলির রূপতাত্ত্বিক (morphological) বর্গীকরণে সেগুলিকে প্রথমেই দুটি বর্গে বিন্যস্ত করেছিলেন—জৈববন্ধনহীন (Inorganic) এবং জৈববন্ধনযুক্ত (Organic) বর্গ এবং প্রথম বর্গের প্রসঙ্গে চিনা ভাষার উল্লেখমাত্র করে নীরব ছিলেন; অধ্যাপক মজুমদার সেখানে চিনা ভাষার এই গঠনগত স্বরূপ আরও তলিয়ে দেখেছেন এবং মূল ভাষা থেকে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এই পদ্ধতি তিনি সমগ্র গ্রন্থেই অনুসরণ করেছেন। কি স্প্যানিশ ভাষা, কি ফরাসি ভাষা, কি জার্মান, যে ভাষাই তিনি ধরুন না কেন, তার স্বরূপ বিশ্লেষণে আছে অনুপুঙ্খ পূর্ণতা। আলোচিত ভাষাগুলির সব দিক—তাদের উৎস ও ইতিহাস, মানচিত্রসহ প্রচলনক্ষেত্র ও চতুঃসীমা, উপভাষা ও মান্যভাষা, ভাষাভাষীর সংখ্যা, সাহিত্যসম্পদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক-রূপতাত্ত্বিক-বাক্যতাত্ত্বিক সংগঠন ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে ভাষাজিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে বইটি একটি পরিতৃপ্তির আমেজ দিয়ে দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সমাপ্তিতে পৌঁছায়। কেবল যে দু-একটি জায়গায় প্রশ্ন থেকে যায় তার মধ্যে একটির কথা আগেই বলেছি: ইতালীয় ভাষার অনুল্লেখ প্রথমেই চোখে পড়ে। আরও দু-একটা জিজ্ঞাসা আছে। ফরাসি ও ইতালীয় দুটি ভাষা একই উৎস থেকে এসেছে, অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ইতালিক শাখার আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ফরাসি ভাষার উচ্চারণ খুব কম বানান-ভিত্তিক এবং ইতালীয় ভাষার উচ্চারণ খুব বেশি বানান-ভিত্তিক অথবা অন্যভাবে বলা যায়: ফরাসি ভাষার লিপি-পদ্ধতি খুবই কম উচ্চারণভিত্তিক এবং ইতালীয় ভাষার লিপিপদ্ধতি খুব বেশি উচ্চারণভিত্তিক। এর কারণের একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন অধ্যাপক মজুমদার (পৃঃ ৯১-৯২)। আবার ফারসি ভাষা উৎসের বিচারে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তার শব্দভাণ্ডারে সেমেটিক বংশের আরবি শব্দের সংখ্যা এত বেশি যে আজ আরবি-ফারসি সমগোত্রীয় বলে ভুল হয়। এই ঘটনাটির ঐতিহাসিক কারণ অধ্যাপক মজুমদার চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (পৃঃ ২২২)। কিন্তু ইংরেজি ও জার্মান

ভাষা একই উৎস থেকে এসেছে, অথচ রূপতাত্ত্বিক গঠনে জার্মান ভাষা অনেকটা সংশ্লেষণমূলক ভাষা, ইংরেজি অনেকটা বিশ্লেষণমূলক। ইংরেজি ও জার্মানের এই পার্থক্যের কোনও ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক কারণ আছে কি? অধ্যাপক মজুমদার বিশেষজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ বলেই মনে করি এ বিষয়ে তিনি যদি সবিস্তারে আলোকপাত করতেন তা হলে ভাষাজিজ্ঞাসুরা লাভবান হতেন।

অধ্যাপক মোরশেদের বইটি যথার্থত আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বই কোন্ দিক দিয়ে বলি। 'আধুনিক কাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' বইটিতে এক জায়গায় বলেছিলেন, 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।' একথা আমরা জানি। বুঝতে পারি আধুনিকতাটা বিষয়বস্তুর ওপরে ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে এই দেখার ওপরে, দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে। নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। অধ্যাপক মোরশেদের বইটিতে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়েছে সমস্ত প্রসঙ্গে। তাই দেখি ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, ভাষার বংশানুক্রমিক বর্গীকরণ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি তথাকথিত পুরনো প্রসঙ্গও তিনি তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এসব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার প্রয়োগ। এসব প্রসঙ্গ ছাড়া যাকে আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিষযবস্তু বলি তা তো তাঁর আলোচনায় এসেছেই, এবং ঐ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই ব্যাখ্যাত হয়েছে অতি প্রাঞ্জলভাবে। মূলধ্বনি বা স্বনিমের (phoneme) তত্ত্ব, রূপমূল বা রূপিম (Morpheme) বিশ্লেষণ, বাক্যতত্ত্ব (Syntax), অবয়ববাদী বা গঠনমূলক ব্যাকরণ (Structural Grammar), এমন কি রূপান্তরমূলক সৃজনধর্মী ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar) ইত্যাদি প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হওয়ায় অধ্যাপক মোরশেদের গ্রন্থখানি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। এত প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও আয়তনে মাত্রাতিরিক্ত বিস্তার লেখক পছন্দ করেন নি। ফলে এসেছে অবয়বে সংহতি ও প্রকাশরীতিতে সংযম— বৈজ্ঞানিক আলোচনার দুটি অপরিহার্য গুণ। বাংলা ভাষায় রচিত আর কোনও গ্রন্থে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের এত দিক এত সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হয় নি। ভাষাতত্ত্বে প্রতীকধর্মিতা, সেমিওটিক্স, গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব, সংযোগতত্ত্বের মতো আধুনিক ধারাগুলির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এক কথায় বাংলার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অতিসমৃদ্ধ জগতে প্রবেশের পক্ষে এ বইটি একটি নিত্যসহায়িকা বা Compendium।

অথচ পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মোরশেদ স্বদেশের ভাষার কথা ভুলে যান নি, দেশের মাটির নাড়ীর টান ছিঁড়ে ফেলেন নি তিনি। তাই কক্‌নি ইংরেজি, পিজিন, ক্রেওল-এর পাশে চট্টগ্রামের উপভাষা, সিলেটি উপভাষা, নোয়াখালির উপভাষারও রূপ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

অধ্যাপক মোরশেদের গ্রন্থখানি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রায় সর্বাঙ্গীণ পাঠ্যগ্রন্থ হলেও দু-একটি কথা বলবার আছে। সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্যে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান (Socio-linguistics) একটি অতি সমৃদ্ধ ধারা। অথচ অধ্যাপক পবিত্র সরকারের একটি প্রবন্ধ ('ভাষা দেশ কাল') ও ডঃ মৃণাল নাথের একটি গ্রন্থ ('সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা') ছাড়া সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় লেখা বেশি চোখে পড়ে না। অধ্যাপক মোরশেদ যদি তাঁর গ্রন্থে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের নীতিপদ্ধতি বিষয়ে একটি আলোচনা যোগ করে দেন তো একটি বড় ঘাটতি অংশত পূরণ হয়।

আরও একটি কথা। বাংলায় ভাষাবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলির সর্বজনস্বীকৃত প্রতিশব্দ গড়ে ওঠে নি। ফলে একই ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এক-একজন ভাষাবিজ্ঞানী ব্যবহার করেছেন এক-এক রকম। 'ফোনিম' (Phoneme)-এর বাংলা করেছেন কেউ 'ধ্বনিতা', কেউ 'মূলধ্বনি', আবার Standing Commission for scientific and Technical Terminology এই শব্দের প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন 'স্বনিম'। এই পরিস্থিতিতে অধ্যাপক মোরশেদ যদি তাঁর গ্রন্থে সর্বত্র বাংলা পারিভাষিক শব্দের পাশে পাশে মূল ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি দিয়ে দিতেন তা হলে সাধারণ পাঠকের অনেক বিভ্রান্তির অবসান হত।

বইটির মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন হলেও মুদ্রণগত কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। শ,য, ণ, ড-এর জন্যে যে ধ্বনিগত চিহ্ন ব্যবহাব করা হয়েছে তাব বদলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (IPA) চিহ্ন ব্যবহার করলে বইটির মুদ্রণ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে আরও নিখুঁত হতে পারত।

'সাহায্যকারী গ্রন্থের তালিকা'টি ইংরেজি গ্রন্থেব দিক থেকে নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু বাংলা গ্রন্থের তালিকাটি আরও একটু বিস্তৃত হলে ভাল হত। Irach Jehangir Sorabjee Taraporewala-র Elements of the Science of Language যেমন বহু পুরনো বই হওয়া সত্ত্বেও ভাষাবিজ্ঞানের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য প্রাথমিক পাঠ্যগ্রন্থ, তেমনই বাঙালি পাঠকের কাছে আচার্য সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' ঠিক আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বই না হলেও চিরায়ত সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে স্মরণীয় মনে হয়। কিন্তু এহ বাহ্য। এসব ছোটোখাটো ঘাটতির কথা ছেড়ে দিলে অধ্যাপক মোরশেদের গ্রন্থটি বাংলায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় সংযোগ, সন্দেহ নেই।

—'দেশ',
৭/২/১৯৯৮

২. বাংলা বানান-সংস্কার

'বাঙলা বানানবিধি'—ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার

সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, দাম-১০টাকা

বাংলা বানান সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা হবার পর থেকে এ সম্পর্কে অধিকারী অনাধিকারী কেউই নিজস্ব মত প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। আবার অতি সাম্প্রতিককালে যাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন তাঁদের অধিকাংশেরই আলোচনা আংশিক ও পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু অধ্যাপক ডঃ মজুমদারের আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটি সংক্ষিপ্ত হলেও একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অর্থাৎ বানান-সংস্কারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা এবং বানান সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার বিধিবদ্ধ বিন্যাস। এছাড়া, লেখকের একটি লক্ষণীয় গুণ হল দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও ব্যাপ্তি। তিনি তাঁর আলোচনায় বাংলা বানান-বিতর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তো দিয়েছেনই, তাছাড়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পূর্ব-জিজ্ঞাসুদের মত উদ্ধৃত করেছেন, সে সম্পর্কে বিচার বিতর্ক করে অগ্রণীদের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তার আলোচনার আর একটি বড় দিক হল বানান-সংস্কার সম্পর্কিত তাঁর প্রস্তাবের ব্যবহারিক উপযোগিতা।

সাম্প্রতিককালের ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে অধ্যাপক মজুমদারের স্বীকৃতি অবিসম্বাদিত। তার এই স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা রয়েছে তাঁর আত্মপ্রচার-বিমুখ সনিষ্ঠ সাধনলব্ধ পাণ্ডিত্যে। অথচ অতি পাণ্ডিত্যের (Pedantry) ফলে দৃষ্টিভঙ্গি যে অধিকাংশ সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, লেখকের তত্ত্বলোলুপতা (theory-mongering) বাস্তবতা ও প্রয়োগ-সম্ভাব্যতাকে যে ভুলে যায়, ড. মজুমদারের আলোচনায় সেটা আদৌ চোখে পড়ে না। ফলে তিনি বানান সংস্কারের এমন কতকগুলি সূত্র দিয়েছেন যা কোনো ক্রমেই চরমপন্থী নয়, যা সহজ স্বাভাবিক ও প্রয়োগসম্ভব (practicable) অথচ যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল। বানান সমস্যার যে সমাধান তিনি দিয়েছেন তা বাস্তব উপযোগিতা ও ব্যবহারিকতা সম্পর্কে কত সচেতন তা বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল ব্যাখ্যানে : "উদ্দেশ্য মুখ্যত বানান-সংস্কার হলেও মনে রাখা দরকার, উচ্চারণ-মুখী বানান পদ্ধতি চালু করার অতিরিক্ত আগ্রহে যেন অযথা টাইপের সংখ্যাবৃদ্ধি না ঘটে। বানান সংস্কার এমনভাবে করতে হবে যাতে টাইপের সংখ্যা কমে অথবা সহজভঙ্গীর টাইপের বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। এর ফলে বানানরীতি যথেষ্ট সহজ ও লঘু হবে।" (পৃঃ ৮) । সম্পূর্ণ উচ্চারণ-অনুসারী বানান (Phonetic orthography) প্রবর্তন তিনি সমর্থন করেন না, তার কারণ অতি প্রগতিশীলতার লোভে এতে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বিভ্রাট ঘটবে এবং স্বাভাবিকতা নষ্ট হবে। যেমন—জন-জোন, মন-মোন, যদি-জোদি, অভ্যাস-ওব্‌বেশ ইত্যাদি দেখা দেবে। "এমন কি প্রকৃত বাঙলা শব্দেও এক ধরনের স্বৈরাচার দেখা দেবে (নরম/নরোম গরম/গরোম, ঘুমান/ঘুমানো/ঘুমনো/ঘুমুনো ইত্যাদি।" (পৃঃ ৯)। স্বাভাবিকতার কথা বিচার করেই তিনি বলেছেন বাংলা বানান জার্মান ভাষার মতো উচ্চারণ-অনুসারী করা সম্ভব নয়, উচ্চারণে ও বানানে পার্থক্য থাকবেই। তেমনি বাংলা বানানের সরলীকরণের নামে কেউ

কেউ যে স্বৈরাচার শুরু করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। ফরাসী ভাষায় বানানে ও উচ্চারণে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কিন্তু বানান থেকে উচ্চারণ সঞ্চরণে নৈরাজ্য নেই। বানান ও উচ্চারণে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও একটি অন্তর্নিহিত বিধিবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাতেও এরকম অন্তর্নিহিত বিধিবদ্ধতা প্রয়োজন। জার্মান ভাষার বানানও পুরোপুরি উচ্চারণ-অনুগ নয়। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে সঙ্গতি লক্ষ্য করা গেলেও ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে জার্মানভাষাতেও বানান ও উচ্চারণে অসঙ্গতি বেশ চোখে পড়ে। আপাতত একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে—Tag শব্দে এবং tagen শব্দে 'g'-এর উচ্চারণ এক নয়। প্রথম শব্দে এর উচ্চারণ হল 'ক্' কিন্তু দ্বিতীয় শব্দে 'গ'। কিন্তু এই অসঙ্গতিও নিয়মবদ্ধ। জার্মান ভাষায় শব্দান্তিক ঘোষধ্বনি (final voiced consonant) অঘোষ হয়ে যায়। ফলে শব্দের শেষে ঘোষ বনাম অঘোষ ব্যঞ্জনের স্বনিমীয় পার্থক্য (phonemic contrast) নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। একেই বলে neutralisation, তা ভাষা-বিজ্ঞানীরা জানেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো আধুনিক ভাষাতেই বানান পুরোপুরি উচ্চারণ-অনুগ নয়; তা সত্ত্বেও সব ভাষাতেই একটা গভীর নিয়মবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে বাধা নেই যে, বাংলা বানানকেও "নিয়মতন্ত্রে আনা বোধ হয় একেবারে অসম্ভব হবে না।"

বানান সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের আগে ডঃ মজুমদার বানান-বিপর্যয়ের যে কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন তা যথাযথ ও ইতিহাস-সিদ্ধ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বানান সরলীকরণের যে পৃথক-পৃথক আদর্শ অনুসরণ করছে তাতে কোনো আদর্শ মানদণ্ড তো গড়ে উঠছেই না, উপরন্তু জনসাধারণের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। আর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক-সামাজিক কারণগুলির ভূমিকাও কম নয়। যেমন ঃ "একদিকে হিন্দী অপরদিকে বাঙলাদেশী বাঙলা—এই উভয়ের চাপে পশ্চিমী বাঙলার অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই হিন্দীর প্রভাবে জন্‌তা, বন্‌ধ্‌, দুধ প্রভৃতি অজস্র বানান ও উচ্চারণ বাঙলা ঘাঁটি গাড়ছে; অপরদিকে সংস্কৃত ঐতিহ্য থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার ফলে বাঙলাদেশী বানান ও শব্দগঠনের নৈবাজ্য এদেশে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে (যেমন বাঙলাদেশী উচিৎ, উৎকর্ষতা, স্বাধীনতাত্তোর, শারীরিক শিক্ষক ইত্যাদি।" (পৃঃ২)। এর সঙ্গে 'র' ও 'ড়'-এর ব্যাপক বিপর্যয়ের দৃষ্টান্তগুলিও স্মরণীয়। অবশ্য এটাও মনে হয় যে, এসব বিপর্যয় শুধু বাংলাদেশী উপভাষার প্রভাব নয়, শিক্ষার দোষও আছে।

নানা সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলা বানানে এক রকম নৈরাজ্য ও স্বৈরাচার উপস্থিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গঠিত বাংলা বানান সংস্কার সমিতি (১৯৩৬) যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তার ভূমিকায় তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "বাংলা বানানের একটি বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।" বহুকাল পূর্বে উচ্চারিত এই উক্তি আজকের পরিস্থিতি সম্পর্কে অব্যর্থ ভবিষ্যৎ-বাণীর মতো শোনায়। ভাষার ক্ষেত্রে এরকম স্বৈরাচার ও নৈরাজ্য যখন সূচিত হয় তখন একটি সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ রূপ (standard form) গড়ে তোলার উপযোগিতা ইতিহাসে অনেকবারই

অনুভূত হয়েছে। ভাষা নৈসর্গিক বিধানে আপনা থেকেই বিবর্তিত হয় ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় সচেতন পরিকল্পিত পদক্ষেপের প্রয়োজনও দেখা যায়। জার্মানীতে যখন আঞ্চলিক উপভাষাগুলির স্ব-স্ব প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সর্বজন গ্রাহ্য আদর্শ ভাষারূপের আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছিল তখন Theodore Siebs-এর উদ্যোগে অনুরূপ পরিকল্পিত সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি হল—'Deutsche Hochspache' German Standard Speech বা আদর্শ চলিত জার্মান ভাষা। আজকের দিনে বাংলার বানান সম্পর্কেও অনুরূপ সুপরিকল্পিত প্রয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে যাঁরা পরিকল্পিত আদর্শের সন্ধান করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র মজুমদারের আলোচনা নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়। বাংলা বানান সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দ্বিবিধ (১) আজকের নৈবাজ্যের মধ্যে একটি সর্বজনীন বানানপদ্ধতির পরিকল্পনা (২) বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বানান সংস্কারের কার্যকর প্রস্তাব প্রণয়ন। ডঃ মজুমদার বাংলার বানান-সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। বাংলার সহোদব স্থানীয় ভাষাগুলির বানানের সঙ্গে তুলনা করে তাদেব সঙ্গে যথাসাধ্য সঙ্গতি রেখে বাংলা বানানের মান নির্ণয় করেছেন। তাঁর আলোচনায় এবম্বিধ ব্যাপ্তি যেমন আছে, তেমনি আছে বিশ্লেষণেব গভীরতা। স্বয়ং ভাষাবিজ্ঞানী বলে তিনি বানান- সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তলিয়ে দেখেছেন এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনেব প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন।

বাংলা বানান-সংস্কারের সঙ্গে লিপি-সংস্কারের সমস্যা জড়িত। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বাংলাব 'অ্যা' ধ্বনিটি আধুনিক বাংলায় স্বতন্ত্র মূলধ্বনি ব' স্বনিমের (phoneme) মর্যাদা লাভ করেছে, 'এ' থেকে 'অ্যা' এখন পৃথক হয়েছে বলেই 'বেলা' ও 'ব্যালা'র মধ্যে অর্থ পার্থক্য ঘটে। অথচ 'অ্যা' ধ্বনিব জন্যে বাংলায় কোনো বর্ণ (letter) নেই। যুক্তিশীল মানুষ মাত্রই স্বীকার কববেন 'অ্যা'ব জন্যে বাংলায় স্বতন্ত্র বর্ণ প্রয়োজন। এই সমস্যাটির কথা লেখক উত্থাপন করেছেন। বর্ণমালায় 'অ্যা' ধ্বনির স্থান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। মোট কথা, বাংলা বানান-সমস্যাকে যতদিক থেকে দেখা সম্ভব এবং যত অংশে বিশ্লেষণ করে বিচার করা সম্ভব তা সবই তিনি করেছেন। দুঃখের বিষয় এবব.. একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। যেমন—ধরণ (পৃঃ ৫,৯) বস্ (পৃঃ ৬), সংস্কৃতানুগতো (পৃঃ ৬) ইত্যাদি। এই সঙ্গে গ্রন্থের একটি ঘাটতির কথাও উল্লেখ করা যায়। লেখক নিজেই স্বীকার কবেছেন 'ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ধ্বনির বাঙলা প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কে কিছু বলা গেলো না।' লেখক প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিজ্ঞানী বলে এ বিষয়টি সম্পর্কেও তাঁর আলোক-সম্পাত প্রত্যাশিত ছিল। অন্যান্য ভাষায় প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। এ সম্পর্কে একটি অগ্রণী গ্রন্থের কথাও মনে পড়ছে—'ভারতীয় ভাষাওঁ মেঁ লিপ্যন্তরণ' (Transliteration in Indian Languages-Dr R P. Saxena, Nagpur University Publication, 1979)। ডঃ মজুমদার যদি বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে বা তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন তবে আমাদের বানান-সমস্যার আরো একটি উপেক্ষিত দিক উদ্‌ঘাটিত হবে।

—'সারস্বত',
মাঘ-চৈত্র, ১৩৯০।

৩. ভাষা প্রসঙ্গ : একটি প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক আলোচনা

'ভাষা ও মস্তিষ্ক' ঃ ডাঃ নৃপেন ভৌমিক, দীপ প্রকাশন

"Ihre Sprache ist ihr Geist
und ihr Geist ihre Sprache"[১]

Wilhelm Von Humboldt

'তাদের (মানুষের) ভাষাই হলো তাদের আত্মা।' আর 'তাদের আত্মাই হলো তাদের ভাষা'। আত্মার অস্তিত্বের বিতর্কিত প্রশ্নে না গিয়েও ভিলহেল্ম ফন্ হুমবোল্টের কথার মূল তাৎপর্যটুকু আমরা সবাই স্বীকার করে নিই — মানুষের অন্তরের সঙ্গে রয়েছে ভাষার নিবিড় সম্পর্ক। তাই ভাষা সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার আর গবেষণার অন্ত নেই। বেদের 'পদপাঠ' থেকে এদেশে ভাষা বিশ্লেষণের সূচনা। তারপরে কত তত্ত্বকথা, পাণিনি পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, ভট্টোজি দীক্ষিত হয়ে ব্যাকরণের কত ধারা কত সম্প্রদায়—ঐন্দ্র, চান্দ্র, জৈনেন্দ্র, শাকটায়ন, হেমচন্দ্র, কাতন্ত্র(কলাপ), সারস্বত, মুগ্ধবোধ, জৌমর, সৌপদ্ম, নব্যন্যায় ইত্যাদি। পাশ্চাত্যে কত স্তর কত ধারা---ব্যাকরণ (Grammar), তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical or Diachronic Linguistics), বর্ণনামূলক বা এককালিক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive or Synchronic Linguistics), অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান (Structural Linguistics), সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (transformational Generative Grammar) সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Socio-Linguistics) মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycho Linguistics) ইত্যাদি। নিত্য নতুন তত্ত্ব ও মতবাদের জন্ম ও বিকাশ এখনো হয়েই চলেছে। তবু ভাষাজিজ্ঞাসায় মানুষের তৃপ্তি নেই, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মতো মানুষ বলতে পারে না— তাঁকে আমি জেনেছি, তাকে আমার জানা হয়ে গেছে। বরং অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে বৈদিক কবির মতো মানুষকে এখনো বলতে হবে---"বাক্ চার প্রকার। এর মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। শুধু চতুর্থ প্রকার বাক্ মানুষেরা বলে থাকে।"[২] অর্থাৎ ভাষার রহস্য কেবল চার ভাগের এক ভাগই মানুষ জানতে পেরেছে। ভাষাজিজ্ঞাসায় এই অতৃপ্তি রয়েছে বলেই ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা ও অন্বেষণা এখনো এগিয়েই চলেছে। ভাষাবিজ্ঞান তাই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই একটা জীবন্ত বিজ্ঞান (living science)। এই বিজ্ঞানে বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা হলো ডাঃ নৃপেন ভৌমিকের 'ভাষা ও মস্তিষ্ক' (২০০২)।

ভাষা সম্পর্কিত, সব জিজ্ঞাসার আদি জিজ্ঞাসা হলো—ভাষার উৎস কী? কেমন

১। 'Uber die Verschiedenheit des Menschlichen Sprachbaues', Darmstadt, 1949, p 41

২। চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।। —ঋগ্বেদ সংহিতা ১/১৬৪/৪৫।

করে ভাষার জন্ম হলো? সেই আদ্যিকালে মানুষ মনে করতো জগতের অন্য সবকিছুর মতোই ভাষাও ঈশ্বরের অলৌকিক নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছিলো—ঈশ্বর একটি মাত্র মানব-দম্পতি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদের একটি মাত্র ভাষা ছিলো। পরে আবার ঈশ্বরেব নির্দেশেই এক ভাষা থেকে অনেক ভাষার সৃষ্টি হলো—সেগুলি এতই পৃথক যে এক-ভাষাভাষী লোক অন্য-ভাষাভাষীর কথা কিছু বুঝতেই পারবে না।

"And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language.

Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech So the Lord scattered them... upon the face of all the earth. . the Lord did there confound the language of all the earth "৩

এমনি কত অলৌকিক কল্পনা করেছে আদিকালের মানুষ ভাষার সৃষ্টি সম্পর্কে। অনেক পরে যখন সভ্যতার আরো বিকাশ হয়েছে, যুক্তিবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন মনীষীরা জীবনের ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ করে ভাষার সৃষ্টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে মহামনীষী ম্যাক্সমুলার (Maxmüller) চারটি তত্ত্ব বা মতবাদ উল্লেখ করেছেন : (ক) বাউ-ওয়াউ মতবাদ বা ধ্বন্যাত্মক মতবাদ (Bow-wow theory or onomatopaetic theory) : এই মতবাদের বক্তব্য হলো— জীবজন্তু বা পশুপক্ষীরা যে ধ্বনি সৃষ্টি করে সেই ধ্বনির অনুকরণ করে অর্থাৎ অনেকটা যেন তারই প্রতিধ্বনি করে আমরা সেই সেই পশুপ্রাণীর নামকরণ করে থাকি। যেমন-- 'ঝিঁ ঝিঁ পোকা'র নাম যেন তার পাখার সাহায্যে সৃষ্ট কল্পিত ধ্বনির অনুকরণে করা হয়েছে।

(খ) পুহ-পুহ বা টাট্ টাট মতবাদ বা আবেগমূলক মতবাদ (pooh-pooh theory or Interjectional theory) : জীবনের এক একটি ঘটনা ও অনুভূতি আমাদের মধ্যে এক-এক রকমের আবেগ জাগিয়ে দেয় এবং সেই আবেগটি জাগার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখ দিয়ে যেন আপনা থেকেই আবেগ উল্লাস ক্রোধ-ঘৃণা বিস্ময়-উত্তেজনাসূচক কোনো ধ্বনি বেরিয়ে আসে। ঐ ধ্বনির সাহায্যে আমরা ঐ আবেগের কারণ-স্বরূপ বস্তু বা ভাবের নামকরণ করি। এই তত্ত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী তারাপুরওয়ালা বলেছেন— আদিম মানুষ প্রিয় বা বাঞ্ছিত জিনিস পেলে আনন্দের ধ্বনি করতো পর্র্ (purr)। সংস্কৃতে 'প্রিয়' শব্দ এবং ইংরেজি 'friend' শব্দে ('প্র এর স্থানে 'ফ্র') এই পর্র্ (purr) ধ্বনির যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

(গ) ডিং-ডং মতবাদ অথবা দৈহিক প্রতিক্রিয়ামূলক মতবাদ (Ding-dong theory or Pathogenic theory) : এই মতবাদের বক্তব্য হল বাহ্যজগতের বিশেষ বস্তু বা ঘটনা মানুষের ইন্দ্রিয়ের আবেগ উত্তেজনা ছাড়াও এমন সব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে,

৩। The first Book of Moses ch II (The Holy Bible London Oxford University Press, P 14)

সেই দৈহিক প্রতিক্রিয়ার বশে তার মুখ দিয়ে বিশেষ-বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি বেরিয়ে আসে। ইংরেজী zig-zag শব্দটি আঁকা-বাঁকা পথ দেখে মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো। বাংলা 'হৈ-চৈ', 'হিজিবিজি', 'হুলুস্থূল' প্রভৃতি শব্দ এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো।

(ঘ) য়ো-হো-হো মতবাদ (Yo-ho-ho theory) : এই মতবাদ অনুসারে ভাষার ধ্বনি মানুষের শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। দৈহিক শ্রম লাঘব করার জন্যে ভারি কাজের সময় মানুষ মুখ দিয়ে কতকগুলি ধ্বনি সৃষ্টি করে। যেমন—মজুরেরা কোনো ভারি জিনিস টানবার সময় বলে 'হেঁইয়া-হো' কিংবা পাল্‌কি-বাহক লোকেরা বলে 'হুঁ-হুঁ-না'। ইংরেজীতে নাবিকেরা জাহাজের দাঁড় টানার সময় সমবেত কণ্ঠে বলে 'য়ো-হো-হো'। এই থেকে ইংরেজী 'hear' শব্দটি এসেছে। অন্যান্য মতবাদের মতো এই মতবাদের দ্বারাও খুব কম সংখ্যক শব্দের ব্যাখ্যা করা যায়।

ওপরে যে চারটি মতবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কোনোটিই সন্তোষজনক নয়। এইসব মতবাদের দ্বারা ভাষায় ব্যবহৃত কিছু-সংখ্যক শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় বটে; কিন্তু এসব শব্দ ছাড়া ভাষায় আরো বহুসংখ্যক শব্দ ব্যবহৃত হয় যাদের উৎপত্তির কোনো ব্যাখ্যা এইসব মতবাদে নেই। বলা বাহুল্য এসব তত্ত্বে মাত্র কয়েকটি শব্দের উৎস ছাড়া ভাষাসৃষ্টির খুব বেশি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো না। প্রায় সব ব্যাপারে অলৌকিক সৃষ্টি তত্ত্বের বদলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিকে পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দিলো অন্য একটি যুগান্তকারী রচনা। সেটি হলো চার্লস্ ডারউইনের (Charles Darwin) 'দি অরিজিন অব্ স্পেসিস্ (The Origin of Species) বইটি (১৮৫৯)। এই গ্রন্থে মানুষের সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ভাষাসৃষ্টির তত্ত্ব। ডারউইনের সেই তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে মোটা রেখায় সেটা এইভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি : ঘূর্ণ্যমান গ্যাসীয় পিণ্ড থেকে জাত পৃথিবীতে প্রথমে জড় পদার্থের (matter) সৃষ্টি হয়েছিলো, তারপরে বিবর্তনের (evolution) ফলে জড় থেকে ক্রমশ শ্যাওলা-বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী ইত্যাদির জন্ম হলো। অর্থাৎ জড়ের বুকে প্রাণের life আবির্ভাব হলো। তারপর মানুষের আবির্ভাব হলো— পৃথিবীর বুকে মননশীল প্রাণীর আবির্ভাব হলো অর্থাৎ প্রাণের (life) পরে এলো মন (mind)। এখন এটুকু মানতে বাধা নেই যে, জড়ের চেয়ে যেমন প্রাণ ছিলো সূক্ষ্মতর ও উন্নততর ক্রিয়া, প্রাণের চেয়ে তেমনি মন হলো সূক্ষ্মতর উন্নততর ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার ক্রমকে বিবর্তনের তিনটি স্তর বলতে পারি এবং এটাও এখন অনুভব করি যে, 'মন' (mind) হলো আজ পর্যন্ত বিবর্তনের শেষ ধাপ। মানুষ হলো এই মনের অধিকারী। 'মানব' কথাটিও এসেছে মন্ ধাতু থেকে। এই মনই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। মন হলো মানুষের স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্ন (differentia)।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন মনের তিনটি দিক (aspects) বা মনের ত্রিবিধ বৃত্তি (faculty) হলো : চিন্তন (thinking), সঙ্কল্প (willing) ও অনুভব (feeling)। ত্রিবিধ বৃত্তির যে ক্রিয়া, তাকে মনের অধিকারী মানুষ প্রকাশ করতে চায়, অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে

চায়। এই প্রকাশ (Expression) ও সঞ্চার (Communication)-এর তাগিদেই মানুষ নানারকম মাধ্যম আবিষ্কার করেছে। এইসব মাধ্যমের মধ্যে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত মাধ্যম হলো ভাষা (language)। সুতরাং মনের বিকাশের সঙ্গে ভাষার বিকাশ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। মনহীন প্রাণীর ভাষা নেই, আর মন আছে বলেই মানুষের ভাষা আছে। ডাঃ ভৌমিক ঠিকই বলেছেন ঃ "মানুষ ভাব বিনিময় করে কথা দিয়ে, ভাষার মাধ্যমে। শুধু ভাব বিনিময় কেন, মানুষ চিন্তা করে ভাষার সাহায্যে।" (পৃঃ ১) এই উক্তির দ্বিতীয় অংশটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই গভীর সত্য প্রথম ধরা পড়েছিলো প্রতীচ্যের আদি দর্শনাচার্য প্লেটোর উক্তিতে ঃ "চিন্তা ও ভাষা মূলত একই। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, চিন্তা হলো আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন, আর যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তা-ই হলো ভাষা।"[৪]

যদিও মন থাকলেই ভাষা থাকবে—এটা অপরিহার্য ভাবে সত্য নয় (যেমন মূক মানুষের মন আছে কিন্তু ভাষা নেই) তবু অন্য প্রাণী থেকে মানুষের একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো ভাষা। লেখক এই মূল সত্যটাই বলেছেন সহজ করে—ভাষা মানুষকে মানুষ করেছে। ভাষাই "পশুদের তুলনায় আমাদের বাড়তি জিনিস, মানুষের নিজস্ব বিশেষত্ব। কথাই আমাদের মানুষ করেছে। ভাষা ও লিপির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।" (পৃঃ-১) মনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

এই মন কী, সে বিতর্কের শেষ নেই। মন কোনো বিমূর্ত বিদেহী ভাবসত্তা, নাকি মন হলো মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র—সেই বিতর্কে আমরা যাবো না। লেখকও সেই বিতর্কে না গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মনকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া ধরে নিয়ে মস্তিষ্কেরই সঙ্গে ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। অবশ্য এতকাল ভাষার সঙ্গে মনের সম্পর্ক ভাষাবিজ্ঞানীদের যে দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তা নয়। বরং এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে এত বেশি বিধিবদ্ধ আলোচনা হয়েছে যে, ভাষাবিজ্ঞানে 'মনো ভাষা বিজ্ঞান' (psycholinguistics) নামে একটি স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ ধারাই গড়ে উঠেছে, এমন কী ভারতীয় ভাষাতেও এ বিষয়ে দু'একটা বিধিবদ্ধ আলোচনা চোখে পড়ে। যেমন—ডঃ সূর্যদেব শাস্ত্রীর হিন্দীতে লেখা 'মনোভাষিকী' (১৯৪৩)। এটি উৎকৃষ্ট রচনা; কিন্তু বাংলায় মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে লেখা বই বড়ো একটা চোখে পড়ে না। অথচ সমাজভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics), উপভাষাতত্ত্ব (Dialectology) ও উপভাষা বিষয়ে ক্ষেত্র-গবেষণা পশ্চিম বাংলায় ও বাংলা দেশে যথেষ্টই হয়েছে। মনোবিজ্ঞানে ডঃ নৃপেন ভৌমিকের বইটি এই অনুর্বর মরুক্ষেত্রে ওয়েসিসের মতো। বিশেষত মস্তিষ্কের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক এমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাঞ্জল বাংলায় আগে আলোচিত হয় নি, একথা জোর দিয়েই

৪। "Thought (dianonia) is the same as language, with this exception that thought is the conversation of the soul with herself which takes place without voices, while the stream which, accompanied by sound, flows from thought through the lips, is called language (logos)" Plato : Dialogues (sophist)

বলা যায়। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসু যখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চায় সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, তখন অনেকেই তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ডাঃ ভৌমিক তাঁর একাধিক রচনায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিরল। আজকে যখন বিজ্ঞানকে গণচেতনায় ছড়িয়ে দেবার কথা উঠেছে, তখন তাঁর লেখাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আগেই বলেছি, মন কোনো বিমূর্ত সত্তা নাকি মন শুধু মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া সেই কূট দার্শনিক বিতর্কে লেখক ডাঃ ভৌমিকও যান নি। এতে গণচেতনায় বিজ্ঞানকে সঞ্চারিত করা এবং বক্তব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করে তোলা সহজই হয়েছে।

ডাঃ ভৌমিকের 'ভাষা ও মস্তিষ্ক' গ্রন্থের প্রথম তিনটি বিভাগ—'কথাই আমাদের মানুষ করেছে', 'ভাষা শেখায় মস্তিষ্কের ভূমিকা' এবং 'ভাষা শেখার কলা কৌশল' ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরবর্তী বিভাগগুলি অনেকটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গ, যদিও এই বিভাগগুলিও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং সাধারণ শিক্ষিত পাঠকেরও আকর্ষণের বিষয়। প্রথমোক্ত বিভাগের অধ্যায়গুলিতে ভাষাবিজ্ঞানের অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানী হলেও অনেক ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। ভাষার একেবারে গোড়ার কথাই তিনি ঠিক ধরেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী যেখানে বলেন -"A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group cooperate and interact,"[৫] গ্রন্থকার ডাঃ ভৌমিক সেখানে বলেন—"ভাষা তো আসলে বহু শব্দের সমাহার। আর শব্দগুলি হলো প্রতীক যার প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা অর্থ আছে। শুধু শব্দগুলো মনে রাখলে তো চলে না, মনে রাখতে হয় প্রতীকার্থও"। (পৃঃ-২৭)। দুজনেই ভাষার প্রতীকধর্মিতার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। আসলে ভাষার ধ্বনি তো আর তার বহিরঙ্গের গঠন, ভাষার প্রতীকার্থই তার প্রাণ, এখানেই ভাষার উপযোগিতা। সাধারণ ভাষার তত্ত্বকথা বিশেষ বিশেষ ভাষার মূল গঠন প্রকৃতি সম্পর্কেও লেখকের বক্তব্য ভাষাবিজ্ঞান সম্মত। লেখক যখন বলেন বাংলা ভাষায় আছে প্রায় ষাট হাজার শব্দ, ইংরেজিতে আড়াই লক্ষ। পৃথিবীর প্রাচীন সনাতনী ভাষাগুলির একটা সুবিধা ছিল—কয়েক শত শব্দমূল বা ধাতু জানলেই কাজ চলতো। প্রত্যয়বিভক্তি জুড়ে তৈরী করা যেত হাজার-হাজার শব্দ। আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভাবন করেছিলেন আট শত ধাতু বা শব্দমূল। তাঁর উপর ভিত্তি করেই এক বিশাল শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল সংস্কৃত ভাষা। আধুনিক ভাষাগুলি অতটা ধাতুনির্ভর নয়—ব্যাকরণের অনুশাসনও অনেক শিথিল। ফলে ভাষাকে শিখতে হয় প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা ভাবে", (পৃঃ-২৭) তখন তাঁর উক্তি পাণিনির ধাতুবিষয়ক মতবাদ (root theory)-এর সঙ্গে একালের ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য সুকুমার সেনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। ডঃ সেন অনেকটা একই রকম কথা বলেছিলেন

৫। Sturtevant, Edgar H, An Introduction to Linguistic Science, New Haven yale University Press, 1947, ch. 1

বহুকাল আগে। তিনি বলেছিলেন—ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করে বহুল শব্দ-সৃষ্টিতে প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের ক্ষমতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর অন্য ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (Loan word) বেশি নিয়েছে আধুনিক ভাষা। এ পথে ইংরেজি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি।

'ভাষা কি মুদ্রিত স্মৃতি?' এবং 'ভাষা শেখায় স্মৃতির ভূমিকা' অধ্যায় দুটি আমাদের বহুকালের জিজ্ঞাসার বৈজ্ঞানিক উত্তর দেয়। স্মৃতিকে লেখক তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন--"সহজাত, মুদ্রিত এবং অর্জিত। সহজাত স্মৃতি নিয়ে প্রাণী জন্মায়, মুদ্রিত স্মৃতি তৈরি হয় জন্মের ঠিক পরপরই, আর অর্জিত স্মৃতি হল তার সারাজীবনের সচেতন প্রয়াস" (পৃঃ ২৪)। এই তিনপ্রকার স্মৃতির মধ্যে মুদ্রিত স্মৃতিই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। "পরীক্ষা ও দৃষ্টান্ত থেকে এটাই মনে হয় যে, মানুষের ভাষা শেখার ক্ষমতাও মুদ্রিত স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। মুদ্রণ প্রক্রিয়াটি ঘটে যায় জীবনের প্রথম ছয় বছরের মধ্যে। ছয় বছর বয়সের মধ্যে শিশুকে যে কোন একটি ভাষা শিখে নিতেই হবে। স্বভাবতই শিশু প্রথম ভাষাটি শেখে মায়ের কথা শুনে। সেটাই হয় তার মাতৃভাষা। . . . ছয় বছর বয়সের পর ভাষা শিক্ষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা ধীরে ধীরে আসে। এই শিশুকে কোন বিদেশি ভাষা শেখাতে হলে তা শুরু করা উচিত তার শৈশবে। সম্ভব হলে ছয় বছরের ভেতর" (পৃঃ-২৬)। লেখকের এ নির্দেশ মনোবিজ্ঞানের গ্রহণীয় বিষয়। এটি প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) নিয়মে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের মূলনীতি এবং সমাজ (Socio-linguistics) ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে আমাদের দেশের ভাষাপরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় আদর্শ। অল্প বয়সে, ভারতীয় শিশুর ইংরেজী শিক্ষার বিতর্কিত বিষয়ে এই উক্তিটি একটি আলোকবর্তিকা। সুতরাং নীচু ক্লাশে ইংরেজী শিক্ষা তুলে দেওয়া মোটেই বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ হয়নি।

যে কোনো জাতির ভাষায় মূল সম্পদ হলো মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমন্বয়ে গঠিত অর্থপূর্ণ শব্দভাণ্ডার। ব্যক্তিমানুষেরও ভাষার মূল সম্পদ হলো তার শেখা শব্দভাণ্ডার। এই সব শব্দ শিশু শেখে সমাজ-পরিবার-পরিবেশ থেকে। এবং এই শেখা শব্দগুলিকে সে তার স্মৃতিভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। এইখানেই শিশুর ভাষাশিক্ষায় স্মৃতির ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে শব্দ মানুষ শেখে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখে, সেই শব্দকেই সে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে তুলে এনে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রয়োগ করে। এই প্রক্রিয়াটি লেখক চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই প্রক্রিয়াটি একটু যান্ত্রিক। কিন্তু ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনের একটি সৃষ্টিশীল ভূমিকাও আছে। ভাষার শব্দগুলির বিন্যাস এবং তার মধ্যে সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অর্থব্যঞ্জনাটি ভাষার সৃষ্টিশীল দিকের অন্তর্গত। চমস্কি এই দিকটির ওপরে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানে অবয়ববাদী (structural) যান্ত্রিক মতবাদে মানুষের সৃজনশীল চিত্ত যখন হাঁপিয়ে উঠেছিল, তখনই চমস্কি নিয়ে এলেন তাঁর রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক বা সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের (Transformational Generative Grammar) তত্ত্ব যার প্রথম মূল

কথাই হল, ভাষা শুধু যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, তা একটা সৃজনমূলক ব্যাপার, মানুষের সৃজনী চেতনার (creative consciousness) সঙ্গে যুক্ত। ভাষার সৃজনমূলক দিকের উপরে গুরুত্ব আরোপ চমস্কিব ভাষাতত্ত্বের প্রথম প্রতিপাদ্য সূত্র :

"One of the qualities that all languages have in common is their 'creative' aspect' "[৬] ভাষাব এই সৃষ্টিশীল দিকটি মস্তিষ্কের কোন্ অংশের সঙ্গে যুক্ত এবং কীভাবে ক্রিয়াশীল লেখক যদি গ্রন্থেব পরবর্তী সংস্করণে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে দেন তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসার সার্থক নিবৃত্তি ঘটে। কারণ এবিষয়ে আলোচনায় তিনিই যোগ্য ব্যক্তি।

বঙ্গদর্শন

(অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুবী সম্পাদিত)

সংখ্যা ৮, ৯।

৬। Chomsky, Noam Aspects of the theory of syntax, Massachuse the M I T Press, 1976, p 6

৪. বাংলা ছোটগল্পে সমাজচেতনা

কালচেতনার গল্প ঃ তপোবিজয় ঘোষ

নবসাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা-৯। দাম : কুড়ি টাকা

বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন—"টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের, রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃতি ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।" আজ থেকে এক শ' বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন, আজ তা বাংলা সাহিত্যের বাজারে মর্মান্তিক ভাবে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। কাউন্টারের দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু সংখ্যক লেখক আজ 'লোকরঞ্জন' প্রবৃত্তির বশে লিখতে গিয়ে যে বিকৃত রচনার জন্ম দিয়ে চলেছেন, দেশের সঙ্কীর্ণ বিবর থেকে ভয়াবহ সরীসৃপগুলি টেনে বের করে তাদের বিষনিঃশ্বাসে আকাশ-বাতাস দূষিত করে দেশের সার্মগ্রিক জীবন বিপন্ন করেছেন, অথচ বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থেকেও সমাজচিত্র উপস্থাপনার দোহাই পাড়ছেন, তাতে দেশের শুধু সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ই সূচিত হচ্ছে না, আমরা এই অপসংস্কৃতির দূষিত বাতাবরণে অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যদি মানি তবে দেশের এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে সারস্বত সম্প্রদায়ের একটি দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থেকে যাঁরা দেশের বৃহত্তর জনসমাজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গল্প লেখাকে বৃত্তি হিসাবে নয়, ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তপোবিজয় ঘোষ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক। সাধারণভাবে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও এই দায়িত্বশীলতারই পক্ষে। দূর অতীতের কথা বাদ দিলে কথাসাহিত্যে আমাদের দেশে যাঁরা স্তম্ভস্বরূপ—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁদের কেউই দায়িত্বহীন ফরাসী ন্যাচারালিস্টদের ধারার পরিপোষক নন, সামাজিক সমস্যা সমাধানে এঁদের পৃথক পৃথক জীবনদর্শন যা ই হোক এঁরা কেউই সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করেন নি। কেউই ন্যাচারালিস্টদের ধারায় পরিপোষক নন, সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করেন নি। কেউই সমাজকে ভাঙার পক্ষপাতী ছিলেন না। তপোবিজয় ঘোষ প্রমুখ আজকের উদীয়মান লেখক গোষ্ঠীও—যাঁরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে লেখা শুরু করেছেন তাঁরা যদি তাঁদের আদর্শে অবিচলিত থাকেন তবে ভাবীকালের কাছে তাঁদের একটা স্বতন্ত্র স্বীকৃতি অবশ্যই প্রাপ্য হবে।

ব্যাপক অর্থে লেখকের এই বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বকেই বলতে পারি লেখকের 'কমিট্‌মেন্ট্', দায়বদ্ধতা। তপোবিজয় এই অর্থে একজন কমিটেড্ লেখক। কিন্তু তাঁর কমিট্‌মেন্ট কোনো রাজনৈতিক এস্টাব্লিশ্‌মেন্টের কাছে নয়, মানবতার খাতিরে একটি আদর্শের কাছে, সুতরাং বৃহত্তর অর্থে সমাজের কাছে, মানুষের কাছে; এবং গভীরতর

অর্থে নিজের বিবেকের কাছে। এই বিবেকের কাছে তিনি খাঁটি বলে চরম আতঙ্কের দিনেও কোনো ভয়ে তিনি তাঁর আদর্শ ছাড়েন নি, এবং এই বিবেকের কাছে তিনি দায়বদ্ধ বলে ভবিষ্যতে কোনো লোভ তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট করবে না।

এই মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলেই তাঁর কোনো কোনো ছোটগল্প রাজনৈতিক আদর্শের পোষক হলেও প্রচারপত্র মাত্র না হয়ে সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর গল্পগুলি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে এগুলি শিল্পরূপের বিচারে 'ছোট ছোট দুঃখ কথা' কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে একটি বৃহৎ যুগজীবনের ভাষ্যরূপে মহাকাব্যিক সম্ভাবনা পূর্ণ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি গল্প এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনের 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা'র কাহিনী কিন্তু সেই ব্যক্তিজীবনগুলি একটি যুগের সামাজিক জীবনের ও সামাজিক সমস্যার প্রতীক। এই যুগটি নবজাগরণ-যুগের মতো কোনো সংগঠনাত্মক আদর্শে উৎসব মুখরিত নয়, এক ব্যাপক বিনষ্টি ও সর্বাত্মক অবক্ষয়ের শ্মশান-শূন্যতার অট্টহাস্যে ভীত কম্পিত। তবু গল্পগুলি এই মহাশ্মশানের চিতাভস্ম মাত্র নয়, চিতাভস্মে লুক্কায়িত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নির্ভীকের পক্ষে আশাপ্রদ।

তপোবিজয় ঘোষের 'কালচেতনার গল্প' সঙ্কলনের প্রথম গল্প 'ক্ষুৎকাতর', এক নায়কের অনির্বাণ অস্বাভাবিক ক্ষুধা ব্যক্তি-শচীকান্তের ক্ষুধা নয়, বর্তমান শতাব্দীর অন্নাভাব ক্লিষ্ট গণজীবনের জঠরজ্বালার প্রতীক। অনাহার ও দুর্ভিক্ষের ভস্মতিলক মাথায় পরেই আমরা বর্তমান শতাব্দীতে পদার্পণ করেছিলাম। এই গল্পগুলি বর্তমান শতাব্দীর জাতির দীর্ঘকালের নিরন্ন জীবনজ্বালার চরম পরিণতির পটভূমিকায় রচিত। গল্পগুলি কতখানি কাল-সচেতন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক ব্যাপক অন্নকষ্ট অনাহার দুর্ভিক্ষের বৃহত্তর যুগগত তাৎপর্য বহন করে এই গল্পটি। এটি ছোটগল্প হলেও বৃহৎ ব্যঞ্জনায় মহাকাব্যিক তাৎপর্য বহন করে এই গল্পটি শুধু ব্যক্তিগত নয়, পরিবারগত, এর মধ্যে চেপে রাখা ঘুম-পাড়িয়ে রাখা যুগগত সমাজগত ক্ষুধার ব্যঞ্জনা আছে—"শচীকান্তর মনে হল সে যদি এখন এ বাড়ীর সবাইকে, তার মা বউ এমনকি ইতুকে পর্যন্ত ঘুম থেকে টেনে তোলে, জাগিয়ে দেয়, তাহলে সবাই কিছু খাবার জন্য ছটফট করবে। কেন না সবাই অস্পষ্ট আচ্ছন্ন একটা ক্ষুধাবোধ, সামান্য কিছু রুটিতে যার তৃপ্তি হবার কথা না, পেটের মধ্যে ভাঁজ করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন ওরা জেগে উঠলে খিদেটা কি আর ঘুমিয়ে থাকবে।" বলছিলাম গল্পগুলি শ্মশান ক্ষেত্রে সব-নিঃশেষ-হয়ে-যাওয়া ভস্ম নয়, ভস্মে প্রচ্ছন্ন স্ফুলিঙ্গ। ছাইচাপা এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি গল্পের মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে। যেমন 'এখন ওরা জেগে উঠলে খিদেটা কি আর ঘুমিয়ে থাকবে?"

কালচেতনার গল্পগুলি একটি কালের বৃহত্তর সমস্যা ও বেদনার গল্প। 'মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার' গল্পটিকে সমকালের দুটি জটিল সমস্যা—শিক্ষার পরিবেশদূষণ ও খাদ্য সমস্যা—লেখক যেন ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষত থেকে বের করে রক্তাক্ত অবস্থায় অকম্পিত হস্তে তুলে ধরেছেন। শিক্ষার পরিবেশ আজ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ভয়াবহ। যে ছাত্ররা অধ্যাপককে পরীক্ষাগৃহ থেকে বের করে নকল করে, অধ্যক্ষমশাই তাদের

নামে গোপন রিপোর্ট পাঠাতেও ভয় পান। অধ্যাপকেরা আর পরীক্ষার ঘরে ঢোকেন না। টোকাটুকি করে পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। আমরা আত্মপ্রতারণাতেই তৃপ্তিলাভ করি—'পরীক্ষা অতিশয় নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে সম্পূর্ণ হয়েছিল।' শিক্ষা ব্যবস্থার দূষিত বাতাবরণের ওপর একটা করুণ চিত্র উপস্থাপিত করেই লেখক নিরস্ত হন না। লেখকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় পাই অধ্যাপকদের কাছে অধ্যক্ষের সমঝোতা-প্রস্তাবে—"গোপন রিপোর্ট গোপন থাকবে না। এখন সব সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকে আছে। জানাজানি হলে আপনারা বিপদে পড়বেন। তার চেয়ে নিজেরাই একটু সামলে সুমলে চলুন।" বস্তুত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়—"সর্বাঙ্গে ঘুণ ধরেছে। পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করেছে সব কিছু। এখন এডুকেশন মানেই চমৎকার একটা প্রহসন।" এর চেয়ে মর্মান্তিক চিত্র দেশের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও অনাহারের। গ্রাম থেকে লেখকের দিদির লেখা চিঠি—"গ্রামে একেবারে চাল পাওয়া যাইতেছে না, এক ছটাক গমও না। আমার ছেলেমেয়েরা তিনদিন একরকম না খাইয়া আছে। ঘোষপাড়ার অনাদি ঘোষ না খাইয়া মারা গিয়াছে। যদুর বউ পাগলের মত হইয়া বাচ্চাকাচ্চা সমেত নিজের খড়ের চালায় আগুন লাগাইতে গিয়াছিল—তাহাকে ধরিয়া হাত পা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।" এই সমস্যারও কারণ বিশ্লেষণে লেখক তলিয়ে দেখেছেন সমস্যার স্বরূপ। আমাদের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারে 'উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, মজুতদারি বন্ধ করিতে হইবে, চোরা বাজারিদের শাস্তি দিতে হইবে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে হইবে, বণ্টন ব্যবস্থায় সাম্য আনিতে হইবে'. এখন তিনি জানেন, বিশ্বাস করেন, স্থায়ী প্রতিকারের পথ এসব নয়! এ সব গৌণ ব্যাপার। আসলে আমূল গভীর সর্বব্যাপী একটা পরিবর্তন চাই। পুরনো গাছ শিকড় সমেত উপরে ফেলে নতুন চারার রোপন চাই, যেমন চাই পচাগলা ঘুণ ধরা শিক্ষা ব্যবস্থায়, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। সব ভেঙে চুরে তছনছ করে একটা নতুন রাষ্ট্র নতুন সমাজ চাই।"

বলা যেতে পারে এই radicalist প্রত্যয় লেখকের মূল জীবন দর্শন। জীবনে ও সৃষ্টিতে তাই তিনি কোনো আপোষে বিশ্বাসী নন।

তীক্ষ্ণভাবে কালসচেতন আরও একটি গল্প হল 'কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ'। বর্তমান যুগের শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমিকায় রচিত এই গল্পটিও যুগের বৃহত্তর ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। সমাজের দুই শ্রেণী—শোষণ ও শোষিতশ্রেণীর প্রতিনিধি যথাক্রমে ধনীবাড়ির দামী কুকুর 'টাইগার' আর মফস্বলের স্কুলের এক দরিদ্র মাস্টার। টাইগারের সঙ্গে মাস্টারের চলে 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ'। "কেননা শ্রীযুক্ত টাইগার কুণ্ডুবাড়ির সম্পত্তি রক্ষক এবং খাঁটি আমেরিকান বংশ সম্ভূত, আর আমি অখ্যাত গ্রাম বাংলার এক কনিষ্ঠ করণিকের সন্তান এবং কুণ্ডুবাবুর স্কুলের জুনিয়র পোস্টের মাস্টার। আসলে সূক্ষ্ম বিচারে টাইগারের সঙ্গে আমার তো অনেকটা প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক। সে হিসেবে আমি ওকে মান্য করব এবং ও আমাকে করুণাপূর্বক অবজ্ঞা করবে, এইরকম হওয়াই উচিত ছিল।"

"কিন্তু টাইগার আমাকে সহ্য করতে রাজী হ'ল না। আর আমিও ওকে তেমন মান্য করতে পারলাম না।" এই না পারার পেছনে আছে লেখকের ইতিহাস-চেতনা—অবহেলিত

দরিদ্র শ্রেণীর ক্রমিক আত্মজাগরণের ইতিহাস। যে Class-Consicousness বিশ শতকের গোড়া থেকে দানা বাঁধতে থাকে, তারই চরম প্রকাশ ঘটেছে 'কুণ্ডুবাবুর কুকুর আমি এবং ভূতনাথ' গল্পে। ইতিহাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে লেখকের কালচেতনা তীক্ষ্ণভাবে সতর্ক বলে গল্পটি ব্যক্তিসমস্যার গল্প না হয়ে ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। অথচ লেখকের এই শ্রেণী দ্বন্দ্ব-এর চেতনা কফি হাউসের সৌখিন সাম্যবাদীদের তত্ত্ববিলাসিতা (theory mongering) থেকে আসে নি। গল্পের পাঠক মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করে লেখকের এই শ্রেণী চেতনা রূঢ় জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। পাশাপাশি দুই দৃশ্যে নায়কের মর্মান্তিক উপলব্ধি ঃ ধনী গৃহের কুকুর টাইগারকে সযত্নে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে ঃ "একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখলাম মস্ত গামলায় সাদা ঘন টলটলে দুধ। সঙ্গে ক'টা রুটি, কার্তিক ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে টাইগার যথারীতি ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করল। জোরে চেঁচাল না। বোধ হয় সম্মুখে খাদ্য ও কার্তিক উপস্থিত বলে। এক গামলা দুধ দেখে অবাক হয়ে বলে ফেললাম 'বাবাঃ, এত দুধ!'

"কার্তিক মুখ তুলে বলল, 'এত কুথায় গো মাস্টারবাবু! ই-শালা আরো খেতে পারে।' তখন "আমার ছোট ভাইবোনগুলোর কথা মনে পড়ল। আমার বুড়ী ঠাকুমার মুখটা চোখে ভাসল। ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় বেশীক্ষণ বই খুলে রাখলে আমার মাথা ধরত বলে একজন অধ্যাপক আমাকে একগ্লাস দুধ কি হরলিক্স্ খেতে বলেছিলেন। আমি লজ্জায় বাবাকে বলতে পারি নি।—সে কথা মনে পড়ল। দু'বেলা চায়ের জন্য আধসের দুধ নিয়েছিল মা। বাবা শুনে বলল, 'এই মাসে পনেরো টাকা প্রিমিয়ম দিতে হবে, আর তুমি কিনা রাজ্যের বাড়তি খরচ জুটিয়ে বসে আছ! কবে যে বুদ্ধি হবে তোমার।' আমি সেদিন দেখেছি, আমার রোগা মায়ের হলুদ চোখে জল টলটল করছিল।" 'মাতার এ অশ্রু' থেকে যে মর্মান্তিক বেদনা সঞ্চারিত তা নিঃসন্দেহে খাঁটি সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে, এ গল্পেও তা সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে উঠেছে অনুভূতির গভীরতার জন্যে।

কাল চেতনার গল্পগুলি সমাজের এক একটি সমস্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের চাপা বারুদ। বিস্ফোরণের সম্ভাবনায় রাজনীতিবেত্তার কাছে ভয়াবহ, কিন্তু রসিকের কাছে আকর্ষণীয়। 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা' এইরকম আমাদের অসুস্থ অব্যবস্থিত সমাজের উপজাত সৃষ্টি মস্তানদের নিয়ে লেখা। এদের কথা ভাবলে অন্য প্রসঙ্গে প্রযুক্ত মহাকবির সাবধান বাণী বারবার মনে পড়ে 'পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' রাজনীতিবিদরা এদের দ্বারা নিজেদের কার্যোদ্ধার করছে! এখন এই মস্তানরা সমাজের সমস্যা নয়, উপরতলা সমাজের ভিত্তি। এখন সমাজ-নেতাদের কাছে সমস্যা হচ্ছে এই ভিত্তিতে যদি ভূমিকম্প হয় তবে উপর-তলার প্রাসাদরক্ষা নিয়ে। এদের নিয়ে গল্প লেখা—"হালের বাংলা সাহিত্যে এর খুব চল্ দেখছি। ছোট-বড়ো সবাই যে যার ক্ষমতা মতো এ তল্লাটে ঢুঁ মারছে আর রাতারাতি রামায়ণতুল্য বই নামিয়ে দু'হাতে পয়সা লুটছে।" এদের নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে লেখক আবিষ্কার করেছেন, আমাদের বর্তমান

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অসুস্থ সমাজের শিকার এই মস্তানেরাও মূলত মানব সন্তান, মানবিক হৃদয় ও মানবিক মহত্ত্বের স্পর্শে এরা নিজেদের জীবনকেও উৎসর্গ করতে পারে। শুধু গল্প লেখার উপাদান সংগ্রহের জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে গিয়ে লেখক যখন বিনা দোষে পুলিশের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েন, তখন তাঁকে বাঁচাবার জন্যে এই মস্তানেরাই এগিয়ে আসে। লেখক বিস্মিত হলেন—"জেনে শুনেও শুধু আমারই জন্য সারেণ্ডার করবে থানায়? আশ্চর্য! কাল রাত্রেই না আমি ওদের আমার অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ভেবেছিলাম?" বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার শিকার আমাদেরই ঘরের সন্তান আমাদেরই রক্তে তৈয়ারী এই মস্তানদের মধ্যে যে আমাদের মতোই হৃদয়স্পন্দন চলছে, তাতে মানবিক অনুভূতি, মানবিক মহত্ত্ব ও ত্যাগের সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে, লেখকের এই আবিষ্কার সাহিত্যিকের বড় প্রাপ্তি, পাঠকের রসতৃষ্ণারও উপরের স্তরের তৃষ্ণার উপাদান। এই মানবতার আবিষ্ক্রিয়াতেই গল্পগুলি কালচেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও আজ এবং অনাগতকালের মানুষের রসতৃষ্ণার খোরাক হয়ে থাকবে। লেখক হিসাবে এখানেই তপোবিজয়ের সর্বার্থ সিদ্ধি। লেখকের কালচেতনা তাঁকে সমকালের ঘটনাপঞ্জীর ঐতিহাসিক মাত্র করে তোলেনি।

তপোবিজয় ঘোষের গল্পের পাঠকের কাছে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল, তাঁর গল্পের প্রসঙ্গ বা প্রযুক্তিগত প্রেরণার জন্যে তিনি বিদেশের নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে চাতকদৃষ্টি নিয়ে উপর দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন নি। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু দেশের মানুষ ও মাটি থেকে আহৃত এবং তার আঙ্গিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে আপনা থেকেই উৎসারিত নৈসর্গিক আঙ্গিক। ফলে চেতনাপ্রবাহ, অবচেতন মন প্রভৃতি বিষয়গুলি তিনি কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করে তাঁর গল্পে আমদানি করেন নি। করেন নি বলেই তাঁর গল্পের আঙ্গিকেও কোনো কৃত্রিমতা নেই। বিষয়বস্তু, ভাষা, ভঙ্গি সবই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ এবং জীবন-স্পন্দিত।

তপোবিজয় ঘোষের গল্পগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু অনুসারে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। 'ক্ষুৎকাতর' গল্পে অনেকটা চেতনা প্রবাহধর্মী আত্মকথার আঙ্গিক রয়েছে। শচীকান্তের এক রজনীর বিনিদ্র চেতনার আরশিতে তার জীবনের প্রবহমান চলচ্চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি ও ভূতনাথ' গল্পের আঙ্গিক আত্মকথামূলক, কিন্তু সূচনা নাটকীয়—'ওই কুকুরটাকে আমি একদিন খুন করব' এই সংক্ষিপ্ত স্বগত উক্তিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে গল্পের বিষয়বস্তু ও নাটকীয় সংঘর্ষ, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ—সমাজের দুই শ্রেণী; তাদের শ্রেণী দ্বন্দ্বের বৃহৎ ব্যঞ্জনার উপযুক্ত আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন গল্পকার।

'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা'-তে ছোটগল্পের আঙ্গিকের একঘেয়েমি ভাঙা হয়েছে। লেখক পটাশের সঙ্গে গণেশের মতো আর একজন মস্তান পেয়ে ভাবছেন "নায়কের সঙ্গে সহনায়ক করা যাবে ওকে। কিংবা প্রতিনায়ক। আর মাঝখানে ওই ড্যাবড্যাবে-চোখ মেয়েটা।—চমৎকার ত্রিভুজ হবে!" তার পরেই বিষয়বস্তুর তাগিদে বাঁধা ছক আপনি ভেঙে যায়। তীক্ষ্ণ বাস্তবের নির্মম অভিঘাতে যখন 'পরগত অভিজ্ঞতা আত্মগত উপলব্ধিতে'

পৌঁছায়, তখন লেখক উপলব্ধি করেন—নায়ক-প্রতিনায়ক-নায়িকা "বোমা পিস্তল মদ মাগী নাচগান সহ দিব্যি বাঁধা একটা ছক আছে, সঙ্গে কিছু রাজনীতি, কিছু সমাজনীতি, কিছু হা-হুতাশ, চোখের জল" নিয়ে সৌখিন গল্প বাজারের ভাড়াটে লেখক'দের জন্যে। জীবনের তাগিদে তার প্রয়োজনীয় আঙ্গিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে আপনি আসে; যেমন হিমালয় থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে জলের স্রোত যখন প্রথম নেমে এসেছিল, তখন নিজের পথ নিজেই করে এগিয়ে গিয়েছিল। তপোবিজয় ঘোষের গল্পে আঙ্গিকের এই নৈসর্গিক স্বচ্ছন্দতা আছে, তাতে কৃত্রিম ভাবে কাটা ক্যানেলের নিয়ন্ত্রিত বিন্যাস নেই, প্রকৃতির নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের বলিষ্ঠতা আছে। এক কৃত্রিম জলপ্রবাহকে নদীর মতো সাজাবার জন্যে চেষ্টা করে বাইরে থেকে কচুরিপানা এনে ভাসিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় নি, বরং লেখকের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে জীবনপ্রবাহ এসব গল্পে ভেসে গেছে, লেখক তার পাশে বসে দেখেছেন, নোংরা উপাদানগুলি। তাদের মুখের জীবন্ত ভাষা—

মস্তানের মুখে—

(১) 'আগে জবান্ দিন স্যার।'

(২) শ্লা (শালা) এক নম্বর হারামি। ভোটে গাড্ডু মেরে আমাদের আর পাত্তা দেয় না!'

(৩) 'শালা বেইমানের পয়সায় আমি পেচ্ছাপ করি!'

(৪) 'পটাশদা তাই মাঝরাতে 'বড় খোকা' ঝেড়ে দিয়েছে দ'খানা—' বড় খোকা কি?' 'জানেন না? ছ্ছোও! এই যে সাইজ—"

কিংবা পুলিশের মুখে--

(১) 'শালা কুত্তার বাচ্চা! চলো থানায়। এই ভকৎ সিং...

(২) 'এখন তোমরা শালা তিলে খচ্চর বনে গেছ! কলেজগুলোতে বোমা তৈরির কারখানা বানাচ্ছ! পেঁদিয়ে সব লাশ করে দেব।'

কিংবা বড়লোকের বাড়িতে নিযুক্ত ভৃত্যের মুখে আঞ্চলিক ভাষা—

(১) 'এই শালো! চুপ যা, চুপ যা! এত চিচাইছিস কেনে! ঘরে কি ডাকাত ঢুইকল, এ্যা?

...'ভিতরে আসবেন বাবু! তবে টুকছি অপিখ্যে করুন। ইয়াকে বেঁধে আসি। ভারি হারামি কুকুর বাবু—'

(২) 'এত কুথায় গো মাস্টারবাবু! ই-শালা আরো খেতে পারে।'

গল্পকারের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রকাশক্ষম ভঙ্গিতে বলিষ্ঠ : 'সমস্ত ব্যাপারটা একটু যেন পিচ্ছিল অপমানকর মনে হতে লাগল। সহকর্মীদের চোখে ঈর্ষার ফুলকি, ঠোঁটে চাপাহাসির বিদ্রূপ। ছুটির মুখে সীতেশ রায় তো বলেই ফেলল, 'এসেই সেক্রেটারির গুড় লুকে উঠে গেলেন! আপনাদেরই কপাল মশাই—।' লজ্জিত আহত ভঙ্গিতে আমি চুপ করে রইলাম। আমার হয়ে কালিদাসবাবু বললেন, 'হবে না কেমিস্ট্রির লোক যে। শক্ত করে না বাঁধলে দড়ি ছিঁড়তে কতক্ষণ--" এই বর্ণনার দুটি বাক্যাংশ, 'পিচ্ছিল

অপমানকর' আর 'ঈর্ষার ফুলকি'র বদলে অন্য শব্দ কল্পনা করতে পারি না। তেমনি 'কেমিষ্ট্রির লোক যে। শক্ত করে না বাঁধলে দড়ি ছিঁড়তে কতক্ষণ—" একটি বিশেষ সময়ে মফস্বল স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়ার যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা ফুটিয়ে তুলেছে। লেখকের সমাজচেতনা যেমন সতর্ক, তাব ভাষাশিল্প তেমনি তীক্ষ্ণ। বর্শাফলক শাণিত হতে-হতে যেমন তার অগ্রভাগটি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে লেখক ভাষাকে শানিয়ে-শানিয়ে তীক্ষ্ণ কবে এনেছেন। এর এক-একটি phrase যেন ভাষাকে এক এক দমকে ঘষে ধারালো ও ঝকঝকে করে তুলেছে : "যেই আমি রাস্তার ধারে বাগানের ছোট গ্রীলের দরজায় হাত রাখলাম, অমনি দেখ, শালা যেন বণমূর্তি! চকিতে দাঁড়িয়ে গেল উঠে, পাকিয়ে তুলল চোখ, সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল থাবা, বর্শা ফলকের মতো ঝলকে উঠল দাঁত, আব সমানে ঘেঁও—ঘেঁও—ঘাঁক্— " গল্পকারের ভাষাশিল্প এই রকমই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী।

- 'সাবস্বত' মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৯

৫. মেঘ স্নিগ্ধ, নদী স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ হৃদয়ের ছায়া

নদীতে মেঘের ছায়া (কাব্যগ্রন্থ)
—মনিরুজ্জামান
প্রকাশক : নিজাম উদ্দিন জামি,
শব্দশিল্প, ৪০ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
মূল্য : পঁচাত্তর টাকা।

যুক্তিবাদী যুগে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ তলোয়ারে যখন ক্ষত-বিক্ষত আমরা, তখন চারিদিকে তাকাই—হৃদয়ের কোমল স্পর্শ কে বুলিয়ে দেবে আমাদের রক্তাক্ত অঙ্গে? হৃদয় যে হারিয়েছি আমরা, হৃদয়বৃত্তি শুকিয়ে এসেছে আমাদের। সেই কবে দু' শ' বছর আগে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের কবি ফ্রিদ্রিশ শিলার আধুনিক সভ্যতার এই অভিশাপের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন :

"আজকের সভ্যতার গর্বিত প্রাচুর্য পৃথিবীর মানুষের হৃদয়টাকে সঙ্কুচিত করে আনছে। সাধারণ মানুষ—যারা এই সভ্যতার শিকার হয় নি—তাদের মধ্যে কিন্তু এই হৃদয় এখনো সহানুভূতিতে স্পন্দিত হয়। শহরে যখন আগুন লাগে, তখন যেমন ভয়ার্ত মানুষ তার সামান্য সঞ্চয়টুকু নিয়ে পালায়, এই সাধারণ মানুষেরা তেমনি তাদের হৃদয়টাকে বুকে করে আগলে নিয়ে সভ্যতার অগ্নিদাহ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।...সভ্যতা তো আমাদের মুক্তি দিতে পারে নি, মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা, সভ্যতা যত নতুন শক্তি এনে দিচ্ছে আমাদের হাতের মুঠোয়, ততই নতুন-নতুন চাহিদা জাগিয়ে দিচ্ছে আমাদের মধ্যে। পার্থিব চাহিদার শৃঙ্খল আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে ভয়াবহভাবে—এতই ভয়াবহভাবে যে, যা আমরা পেয়েছি, তাকে হারাবার ভয়ই আমাদের আরো গ্রাস করে ফেলছে, মানুষের উন্নততর বিকাশের জ্বলন্ত প্রেরণাটাও নিভে যাচ্ছে; আর বন্ধনের কাছে নিষ্ক্রিয় দাসত্বের বুলি আজ পরম প্রজ্ঞার বাণী রূপে প্রচারিত হচ্ছে।

"Stolze Selbstgenugs amkeit zicht das Herz des Mel tmanna zusammen, das in dem rohen Naturmenchen noch off sympathetisch schlagt, und wle aus einer brennenden stadt sucht jeder nursein elendes Eigentum aus der Verwustung zu fluchten ... Die Kultur, weit entfernt, uns in Freiheit zu setzen, entwickelt mit jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues Bedurfnis : die Bande des physischen schnuren sich immer eangstigender zu, so dass die Furcht, zu verlieren, seldst den feurigen Triebnach Verbesserung erstickt und die Maxime des leldenden Gehorsams fur die hocpste weisheit des lebeng gilt." _ _ Schiller, Friedrich: 'Uder die As that ische Erziehung des Menschen in einer Reithe von Briefen'. (Funfter Brief). ed. by Wllkinson. Flizabeth M. and willough by, L.A. London: Oxford University Press. 1967, p. 26-28.

—কথাটি বলেছিলেন জার্মান কবি নাট্যকার নন্দনতত্ত্ববিদ ফ্রিদ্রিশ শিলার তাঁর ক্লাসিক রচনা 'মানুষের নান্দনিক শিক্ষা বিষয়ক পত্রাবলী'তে। তাঁর দু'শ বছর আগের কথা আজ

আরো মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রগতি মানবতাহীন শিক্ষা আর অনুভূতিহীন আভিজাত্যে আজ মানবজীবন প্রস্তরীভূত হয়ে আসছে। আর এই পাথুরে জীবন-জমিতে এখানে ওখানে যে দু'একটি রক্তকরবী এখনো ফুটে আছে তাদের মধ্যে একটি হলো আলোচ্য কবির হৃদয়। এদিক থেকেতিনি বিভূতিভূষণ-জীবনানন্দের সমগোত্রীয় কবি প্রাণতার অধিকারী। তাই কবি যখন তাঁর হারানো প্রেয়সীকে খোঁজেন ব্যাকুল আগ্রহে তখন স্পষ্ট অনুভব করি—তিনি নিজে হৃদয়বান, আজকের মানুষের হয়ে তিনি মানুষের হরানো হৃদয়টাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন—দর্পিত সভ্যতায় সব আছে, শুধু তাকেই হারিয়েছি আমরা—

"সব আছে, আগের মতন করে। সব কিছু থেকে যায় কেমন।
তোমারও তো থাকার কথাই ছিল, তাই জানতাম সরল বিশ্বাসে,
তুমি থাকবে বলে কিছুই বদলাবে না।
আজ সবই আছে,
তুমি তো কোথাও নেই, না দালানে, না বাগানে, না সিঁড়ির পাশে,
কিংবা জলাধারের ট্যাপে হাত রেখে—কোথাও তুমি নেই, তোমাকে
কোথায় খুঁজবো।
ক্লান্ত আমি ঘুরে ঘুরে দালানের সব কটি ঘর"।
—'কোথায় খুঁজবো।'

—এই অন্বেষণা দিয়েই কবি মনিরুজ্জমান শুরু করেছেন তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'নদীতে মেঘের ছায়া'। এ নদী স্নিগ্ধ, এ মেঘ স্নিগ্ধ—নদীর বুকে মেঘের ছায়ায় দু'দণ্ড বিশ্রাম করি আমরা। যন্ত্রসভ্যতায় তাপদগ্ধ আমরা অনেক পথ হেঁটেছি, এবার একটু জুড়িয়ে নিই আমরা এই কাব্য ছায়ায় বসে যখন ভাবি আধুনিকা প্রেয়সীর প্রেমের চাঁদ ডুবে গেছে 'খল-জ্যোৎস্নায়', তখন তার নির্মম প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যভেদী বর্শার ফলকে প্রতিফলিত হয় রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ রূপ—

"হয়ে গেছে ভুল—
তুমি যে গাং নও, নিমজল গাঙুরের পাঁক,
তোমার জলজ ঝোপ আর বাদাড়ের জলপাখি ঝাঁক
পানকৌড়ি, সাদা বক, জল টুপি, মাছরাঙি দল
দেখে তখন বুঝি নি আসলে তোমার সম্বল।"
—'নিসর্গ ফেলে'।

কবি কোমল হৃদয়ের প্রেম-প্রত্যাশী এবং তাঁর প্রত্যাশার নিত্য-অনুষঙ্গ হলো নিসর্গ

'শিশির হয়ে ভোরের সরু অর্করেখাগুলি
বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে থাক,
কোকিল এলে পঞ্চমে তার কুহুতানে
প্রলয়কেও ভুলে থাকা যায়!
সোনাবউ ও সোনাবউ, ও নরোম দেহে
এ তো হাতের কাছেই গরম ঝুমকো হার,

ও সব থেকে তোমার বুকে কখন বল
ফুটবে প্রেম আমার জন্যে একটু ভালবাসা?"
—'তোমার প্রেম'।

প্রেমের প্রসঙ্গে কবি হৃদয়ে দূর থেকে ভেসে আসা একটা বেদনার সুর যেন বেহালার করুণ রাগিনীতে শোনা যায়। তবু কবি নৈরাশ্যবাদী নন। প্রকৃতিকে দেখে তাঁর মনে হয়—এ জীবন মধুময়।

"পৃথিবী আপন করে সাজায়ে দিয়েছে তার রঙ
তাই এত মনে হয় মধুময় ক্ষুদ্র জীবন।"
---'সুন্দর প্রতিদিন'।

এবং যখন মনে পড়ে 'পিতামহ-পিতামহী জনক জননীদের পৃথিবীর পাপে'র কথা, তখনো ক্ষমাসুন্দর তাঁর দৃষ্টিতে মনে হয় এ-সবেরও গভীর তাৎপর্য আছে। কবি এক দার্শনিক উপলব্ধিতে উপনীত হন--

"অগভীর জীর্ণ আর পুরাতন হাটে
তুলে দেই ঝাঁপ
পিতামহ পিতামহী জনক জননীদের পৃথিবীর পাপ
মনে হয় আজ যেন তারও এক অর্থবহ নিবস্তর রূপ
আমার জানালা ধরে ঘুম ভাঙা রাতে আনে জ্যোছনার ধূপ"।
-—'সুন্দর প্রতিদিন'।

রোমান্টিক কবি শিশুময় আধুনিকতার স্যাম্পেন ছেড়ে চলে যেতে চান প্রাচীনা জননীর কোলে। কবির মনে হয় এখানেই বুঝি শান্তি। এই শান্তির বারিবিন্দুর আশায় আমিও চেয়ে আছি আকাশের শতভিষা নক্ষত্রের মতো—

"আমি কোনও তৃপ্তির সন্ধান জেনে
কবে যে আতর নিয়ে জামায় মাখাবো খুশি হয়ে
কিস্তি টুপিটার পাট খুলে শেষে পরবো মাথায় সোজা করে
আহ্লাদে সেমাই আর রুটি নিয়ে মার কাছে বসবো খেতে
কবে সেই গোলাপের কাছে যাবো
ঘাট থেকে
সাম্পান ছেড়ে!
আজও তাই জেগে আছি আকাশের শতভিশা নক্ষত্রের মতো।"
- -'কোজাগরী প্রতীক্ষা'।

ডক্টর মনিরুজ্জামানকে জানতাম ভাষাতত্ত্বের নীরস গবেষক অধ্যাপক রূপে। 'নদীতে মেঘের ছায়া' পড়ে আনন্দিত বিস্ময়ে দেখলাম তার হৃদয়ে একটি কবিপ্রাণ আছে যা স্নিগ্ধ কোমল।

—'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'।
শারদীয়া সংখ্যা- ১৪১২

জ. প্রসঙ্গ : পত্র/পত্রোত্তর

স্বপ্ন থেকে সত্যে : নীরবতার দিকে

এক

আজ সকালে কি সুন্দর রোদ উঠেছে। সোনার মতো ঝকঝকে রোদকে দেখে মনে হচ্ছে পুজোর আর দেরি নেই। সত্যি আমার কী যে একটা আনন্দ হচ্ছে, একটা কীরকম যেন অনুভূতি--- মনে হচ্ছে এই রোদ সমস্ত শরীরে মেখে নিয়ে সারা বাগান "আজি শরৎতপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়" গানটি গেয়ে ছুটে বেড়াই। আরও মনে হচ্ছে আর বছরেও এমনি শরৎ দিনে এমনি মন ব্যাকুল করা রোদই তো উঠেছিলো---আর এমনি আনন্দ দিয়েই তো বিদায় নিয়েছিলো। অথচ আজকের রোদকে দেখে মনে হচ্ছে এ যেন সম্পূর্ণ নতুন-- -সবে মাত্র আজই উঠেছে---তাই একে বরণ করছি ---'ওহে সুন্দর মরি মরি তোমায় কী দিয়ে বরণ করি।'

প্রকৃতির যিনি দেবতা তিনি আমার কাছে এই রোদের মতো চিরনবীন। তাঁকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যদি দেখি, তবু আমার দেখা ফুরবে না---তাঁকে এমনি করেই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আবিষ্কার করে যাব। আজ মনে হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলীর সেই পদটি ---

"সখী কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।"

দুই

শরৎ এলো আর গেল। মনে হচ্ছিল এই সুন্দর দিনগুলিতে অন্তরের দেবতাকে পেয়েছি আবার পাই নি। পেয়েছি একটু মনে মনে, দেখেছি অন্তরে চোখ মেলে। কিন্তু মনে পেলেই আমার চাওয়া মেটে না, চোখের সামনে রাখতে ইচ্ছে করে সবসময়। জানি সে ইচ্ছে হয় না সকলের। কিন্তু আমার ইচ্ছে আমার কাছে মস্ত বড় সত্য।

তুমি অনেক বদলেছো। জীবনে রূপান্তরের সাধনা যখন নিয়েছ তখন এই সাধনাই তোমাকে রূপান্তরিত করবে। কিন্তু তবু মনে হয়, এখনো তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়ো। জীবনে যেসব পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ, বলতে গেলে তার তুলনায় আমার জীবনে কোনো পরীক্ষাই আসে নি।

'ক'-এর জীবনে যা হয়েছে, দশজনের মতো আমি তা বিস্ময়ের চোখে দেখি না, নিন্দার চোখে তো নয়ই। সেদিন ওপারে বেড়াতে গিয়ে আমার সঙ্গে একদিনের পরিচয়ে ও আমার সম্পর্কে অনেক মত প্রকাশ করেছিলো, আমি তেমন করতে পারিনা। একদিন কেন, অনেক বছরের পরিচয়েও কারো জীবনের, বিশেষ করে অন্তরের সবটুকু জেনেছি বলে মত প্রকাশ করা অসম্ভব। জীবনের স্রোতে এমন সব বিচিত্র বাঁক, এমন সব ঘূর্ণি আছে যে বাইরে থেকে কিছুতেই অপরে তা বুঝতে পারেনা।

তবে এটুকু বলতে চাই তার জীবন সৌন্দর্যসম্ভারে ভরে উঠলে আমাদের তা কম আনন্দের নয়।

তিন

এখন শীত---কুয়াশার ভীড় তবু মনটা বিশীর্ণ পাহাড়ী নদীর মত করুণ নয়--- কেননা

আমাদের মন শীতের বন্দরেই তো নঙর ফেলবে। কত ভালোলাগা রঙ নিয়ে শীতকে আঁকবো আমরা বসন্তের থেকেও নবীন করে শরতের থেকেও শুভ্র করে। বেশ মনে হচ্ছে জানালার ধারে দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাসের সারি তারই ফাঁক দিয়ে শব্দহীন হালকা কুয়াশা আর আমার নীল ঘাটের ওপর 'লিপিকা'র পাতাগুলো খোলা—শিরশিরে হাওয়ায় কাঁপছে আমার শরীরের মেরুন র‍্যাপার।

রাতের রেডিওতে সানায়ের সুরে ইমনকল্যাণের আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের একটু শীতকরা অন্ধকাবে—সুরের মায়াজাল কোনো বিরহিনীর হৃদয় থেকে দূর দিগন্তের আকাশ পর্যন্ত ঢেউ তুলেছে। বালিশে মাথা রেখে সে তার স্বপ্নের রাজকুমারেব কথা ভাবছে। সেই কবে রাজকুমার গেছে সোনার হরিণ খুঁজতে। এখনো ফেরে নি। কতক্ষণ সে ভেবে চলেছে তাব ঠিকানা নেই—চোখের জলগুলো টুপটুপ করে রাতের শিশিরের মতো ঝরে পড়েছে বালিশের গায়ে। তার চেতনার স্তরে আজ আর কেউ নেই শুধু সেই এক স্বপ্নের রাজকুমার—হীরের মত জ্বলছে—আর তার জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে তাব সমস্ত বিন্দুতে-বিন্দুতে। কর্মহীন দীর্ঘরাত-সঘন কল্পনাভারে পীড়িত হৃদয় ছুটে চলেছে। গ্রামের সমস্ত লোক গেছে গঙ্গাস্নানে--নিদ্রিত নির্জন গ্রাম। তারও যাবার কথা ছিলো সখীদেব সঙ্গে। সে যায় নি—বন্ধুরা গেছে ফিরে। তারপর দুরু দুরু বুকে, দোর খুলে যে চুপেচুপে গেল রাজকুমারের প্রাসাদে—বাইরে তখন রাত্রির ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। রাজকুমার তখন কি করছে? অবগুণ্ঠনে ঢাকা মূর্তি তবু সে দেখতে পাচ্ছে সারাদিন শিকাবে ঘুরে ক্লান্ত দেহ নরম ঘাসের বিছানায এলিয়ে দিয়েছে রাজকুমাব। তাব কাছে কেউ নেই শুধু চিরচেনা এক অপরিচিতার ছায়া—শিথিল সে বাহুদুটো তুষারের নদী সুঠাম ভঙ্গি চিরকালের যাত্রাপথ চেয়ে আছে নির্বিকার নিশ্চুপ। আজ সারাদিন রাজপুত্র বনে বনে ঘুরছে, সজনেতলায ছায়ায় ছায়ায়, সোনাডাঙার মাঠ পেরিয়ে ইচ্ছামতী পার হয়ে আরও দূবে, বহুদূবে, অনেক দূরে বাতাবীলেবুর গন্ধে ভরা পথে। গামছাড়া এক রাঙা মাটির পথে, রৌদ্রদীপ্ত রাঙাদিন এসেছে, গাছের হলুদ ফুলে এসেছে মুখব মৌমাছি। সবুজ ঘাসকে মাড়িয়ে রাজপুত্র চলছে নিদ্রিত দেবদারু বনে, নিদ্রালয় পাখী ডাকছে। আসছে বাত দীর্ঘছায়া ফেলে, জোনাকির মৃদু পাখনায় অপরূপ রাত আসে, আরও রাত গভীব হয়, জামরুল গাছের ফাঁক দিয়ে কাস্তে চাঁদটা উঁকি দেয়। রাজপ্রাসাদ টানে না তাকে। জীবনে সে না চাইতেই অনেক পেয়েছে তবু পৃথিবীর সব বেদনা কেন ছায়া ফেলে তার বুকে যেন কোনো নিঃসঙ্গ দ্বীপে সে বসে আছে একা অসহায় সেই চিরচেনা মুখটির জন্যে। মানুষের ভিড়ে খোঁজে সেই মুখ। প্রতিরাতে আসে সেই মুখ কিন্তু ধরা দেয় না। চুলেব কস্তুরী গন্ধ তার কথা বলে, দু চোখের তলে তার জীবনের অগাধ ইশারা, অতীতের বসন্ত বাহার, সুন্দব কপালে আঁকা বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে চোখ রেখে সে ডাকে যেন নিশিডাক, করুণ মিনতি মাখা সুরে সে ডাকে-এসো এসো পেরিয়ে এসো জীবনের প্রান্তসীমা। সেই ডাকে নেই কোনো কামনা বাসনা, শুধু হৃদয়ের সুগভীব আর্তি, যেন নিস্তরঙ্গ নদীর ওপর নিঝুম রাত্রির বিশাল নীরবতা। মন্ত্র চালিতের মত হঠাৎ রাজপুত্র উঠে বসে ধরতে যায় অধরা অবগুণ্ঠিতাকে। তখন চাঁদ ডুবে যায়। পূর্বদিকেব অলস নয়নে তখনও জড়ান ঘুম। দূরে বহুদূরে মন্দিরেব ঘণ্টা বাজে ঢঙ্, ঢঙ্,

ঢঙ্। ত্রস্ত পায়ে উঠে দাঁড়ায় অবগুণ্ঠিতা বলে সময় হল—আমি যাই। তারপর নিমেষ ফেলতে না ফেলতে সে মেঠো পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে কোথায় চলে যায়। মন্দিরের ঘণ্টা তখন বেজেই চলে ঢঙ্, ঢঙ্, ঢঙ্।

চার

বর্ষা আবার ঘুরে এলো প্রতিবছরের মতো। আজ বর্ষণমুখরিত দিন। রবীন্দ্রনাথের গানটি বারবার মনে পড়ছে—

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়। ......
দুজনে মুখোমুখি
গভীর দুখে দুখি
আকাশে জল ঝরে অনিবার
জগতে কেহ যেন নাহি আর।।"

জানিনা তুমি তোমার নির্জন ঘরে কার ধ্যানে আজ মগ্ন? কোন্ সুদূর আকাশের ধ্রুবতারা তুমি? তুমি কি আজ পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে উড়ে যাবে তাঁর কাছে তোমার সব কাজ ফেলে? তোমার জানালায় আজ ভিজে সবুজের মেলা, তুমি বৃষ্টির গান শুনছ।

আমার মনে হচ্ছে আমি এই ঘন বর্ষার দিনে কোন সুদূর দ্বীপে গিয়ে তপস্যায় বসি। মাথার ওপর দিয়ে চলে যাক সমস্ত বর্ষা। নিঃসঙ্গ সেই দ্বীপে অফুরন্ত বর্ষা ধারায় আমার সব ধুয়ে মুছে যাক। আমি যেন তপশ্চরণে বর্ষার কুমুদের মতো সুন্দর শুভ্র পবিত্র হয়ে উঠি। আমার রাশি গৌরী নাম যেন সার্থক হয়। শত বর্ষায় আমাদের প্রেম যেন হয় জন্ম জন্মান্তরের! যুগ যুগান্তরেও তা যেন থাকে অক্ষয়, অব্যয়, নিত্য শাশ্বত, পবিত্র।

পাঁচ

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, জোর বৃষ্টি। এই মাত্র খেয়ে এসেছি। দ্বারের বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছি না। কারণ দরজা বন্ধ। তবু মনে হচ্ছে দরজা খোলার অপেক্ষায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, খুললেই ঘরে ঢুকবে। আমারও ঘুম হচ্ছে না। হয়তো আরো পড়া উচিত ছিলো, রাত এখনো বেশি হয় নি। তবু নানারকম চিন্তা কেবলি মনের মধ্যে আসছে। এ অবস্থায় পড়াও হয় না, ঘুমও হয় না. মনে হচ্ছে উঠে দরজা খুলে দিই, কিন্তু উঠব কেন? লোকটাই ভারি বোকা। আমি খিল দিই নি, দরজাটা ইচ্ছে করলেই খুলতে পারে সে। তবু আসবে না বাইরে দাঁড়িয়ে কেবলই ডাকছে।

এমনি দিন বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়া। ঘরে কিছুই নেই। তবু ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে। জানো 'সাহারা'র মধ্যে ঝড় উঠলে কী ভয়ানক হয়। হাজার চেষ্টা করেও থামাতে পারছি না। সাহারার ঝড় থামানো যায় না। কিন্তু বৃষ্টি কই—এক ফোঁটা জল নেই—অত বড় সাহারার বুকে। সাহারার বুকের ভেতরে এই যে ঝড় বইছে তা তো কেউ বোঝে না, তারা তাকে বাইরে থেকে দেখেই সরে দাঁড়ায়। কিন্তু জানো সাহারা মস্ত বড় কবি। তার ভেতরের এই অসীম অনুভূতি কত যুগের এই সীমাহীন আর্তি তাকে মস্ত বড় কবি করে দিয়েছে। তার অন্তরের আবেগ বয়ে বয়ে গলে চলছে তলে তলে—বালী তো কেউ খুঁড়ে

দেখেনা, সে সাহস তো কারো নেই, সেখানে তো কী তীব্র জলস্রোত সাধারণের দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কিছুই না। সাহারাকে আমি মহাকবি বলে মনে করি। সে যদি কোনো কাব্য লেখে তো সে হবে চিরকালের মানুষের কাব্য। তবে সে লিখবে না কোনো কালে, কারণ সে মৌন কবি।

ছয়

দুপুরে বারান্দায় চেয়ারটা নিয়ে বসলাম। একটু বেরোবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কুড়েমি এমনি পেয়ে বসলো যে এক গ্লাস জল কেউ গড়িয়ে দিলে ভালো হতো, উঠে জলটা নেবার ইচ্ছে করলো না। উঠি উঠি করেও উঠলাম না, জল কে দেবে? শেষে তৃষ্ণা মিলিয়ে গেল বেচারি।

বিকেলের পিছু পিছু সন্ধ্যে এলো। মাঠে এবারের টুর্নামেন্টের খেলা হচ্ছিল। খেলাটা শেষ হতেই ছেলেরা চলে গেলো মাঠ ছেড়ে। তারপর কি যে হলো। আস্তে আস্তে অন্ধকারেব সঙ্গে সঙ্গে একটা গাঢ় নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এলো। প্রান্তরের ঐ কোনটাতে একটা কাঁঠাল আর গোটাকয়েক ছোট ছোট কিসের যেন গাছ আছে। সেগুলোর ঝোপে অন্ধকারটা এমনি জট পাকিয়ে গেল, আর ক্রমশ এমনি ফুলে উঠতে লাগলো যে মনে হলো চোখের সামনে ভারী একটা মজার কথা শুনে একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণী হেসে গড়িয়ে পড়লো আর তার মাথার এক রাশ ঘন কালো চুল ঐ অন্ধকারের মতো তার চোখ মুখ সব ঢেকে ফেললো। সে হেসেই খুন। খোলাচুলে তাকে কি মানিয়েছে।

সাত

আমাদের বাড়ির নীচের তলার ভাড়াটের খুব কচি একটি আদুরে ছেলে আছে। তার মুখে আবদারের ভাবটি ভারি মিষ্টি। তার সবুজ ছেলেমানুষী দেখতে অপরূপ লাগে। সে ছোট্ট একটি পাখী পুষেছিলো। সোনার খাঁচায়, সন্ধ্যের ছায়ায়, বাড়ির উঠোনে কামিনী গাছের ডালে সে পাখীকে রোজ টাঙিয়ে রাখতো। পাখী নিজের ভাষায় কত কথা বলতো। পাখীর কথা তো মানুষ বুঝতে পারে না। সেও পাখীর কথা বুঝতে পারতো না। তবু কান পেতে শুনতো পাখীর গান, তার মানে বুঝতে চাইতো। এক দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতো পাখীর ঘন নীল রঙ।

আজ ছেলেটির ভারি মন খারাপ। দেখে বুঝেছি সারাদিন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। আমাদের বাড়ির সামনের বারান্দায় সে গালে হাত দিয়ে বসেছিলো—এটুকু ছেলে। আমি বললাম—'কি হয়েছে তোমার?'

আমার সঙ্গে সে কখনো কোনো কথা বলতে সাহস পেত না। আমাকে বোধহয় ভাবতো দার্শনিক ধরনের লোক। সারাদিন মোটা মোটা বই পড়ি—মানুষের হাসিকান্নার মানে বুঝতে পারি না। আমার সম্পর্কে তার এসব ধারণা আজ কোথায় গেল জানি না। তার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার হাত ধরে সে টেনে নিয়ে গেল তার বাড়ির উঠোনে।

দেখলাম সন্ধ্যের ছায়ায় কামিনী গাছে লজ্জা জড়িয়েছে। ডালে পাখীর খাঁচাটা ঝুলছে, তার দুয়ার খোলা। ছেলেটি কেঁদে বলে উঠলো। 'আমার নীল পাখী চলে গেছে। দু'বছর

পরে ফিরবে বলে কোথায় উড়ে গেছে। আমি এতদিন কি করে বাঁচবো? বলতে বলতে সে মাটিতে পড়ে গেলো। সন্ধ্যার বাতাস আরো জোরে বইতে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীল পাখীর শূন্য খাঁচার বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের করুণ হাহাকার শুনতে লাগলাম।

আট

আমার আদর্শের কথা বুঝতে পারো না বলে দুঃখ করো না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো বলেই বুঝতে পারো না। কোনো রকম চেষ্টা না করে ছেড়ে দাও দেখি, তোমার মনটাকে খুলে রেখো ওপর দিকে সহজভাবে। ক্রমে সব তোমার মনেই ভেসে উঠবে।

আর আমার আদর্শের কথা, দেখো তোমাকে বলি, এখন হয়তো বুঝবে না, পরে বুঝবে— আদর্শ সব মানুষেরই থাকে, কেউ সেটা বোঝে, কেউ বোঝে না। আর আমার আদর্শ তো আমার ব্যক্তিগত আবিষ্কার নয়। এ আদর্শের পেছনে একজন বিরাট মনীষীর অবদান আছে, এ পথের পথিকও তাই আমি একা নই যে আমার কোন অহঙ্কার থাকবে। তবে পথটা যে ভয়ানক শক্ত তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীতে অতিমানব সৃষ্টি—এটা বিদেশের দার্শনিকরা অনেকে স্বীকার করলেও অধিকাংশেই তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার আংশিক প্রমাণ তো আমরা ১৯৫০ সালেই চোখের সামনে দেখলাম। সেই মনীষীর দেহত্যাগ পর সংশয়ীরা বিস্মিত হলো—বৈজ্ঞানিকেরা হতভম্ব হলেন।

আমি বলছি আদর্শ সকলেরই একটা না-একটা থাকে। তোমার কোনো আদর্শ নেই বলেছ, অথচ তোমারও আদর্শ আছে, সে আদর্শে যখনি আমি হস্তক্ষেপ করেছি তখনি তুমি সরে পড়েছ, আদর্শে আক্রমণ হলে প্রত্যেক মানুষই সরে দাড়ায় বা সংঘর্ষ বাধে। এর প্রমাণ আমি তোমার জীবন থেকেই দিতে পারি। তফাৎ এই যে, কারো আদর্শের পেছনে থাকে প্রচণ্ড শক্তি, কারো আদর্শ শক্তিহীন, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য সকলেরই অল্প বিস্তর আছে।

নয়

কবিতা লেখা একটা চিঠি পেলাম। ভারি ভালো লাগলো। আর সকলের জীবন থেকে আমাদের জীবনের তফাৎ বিরাট—কথাটা তুমি ঠিকই বুঝেছ। বুঝেছ যখন, তখন আমাকে বলতে বলছ কেন? উত্তর তো তুমি নিজেই দিয়েছ। আর দশজনের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের যে বিরাট তফাৎ রয়েছে। আমাদের জীবনটা জীবনই শুধু নয়,—জীবনযোগ। গুরুদেবের ভারি সুন্দর একটি কথা আছে—All life is Yoga। আর এর পেছনে মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বড়ো একটি শক্তি কাজ করছে।

মানুষের নিশ্চেষ্ট হওয়াটা সাধনার অঙ্গ নয়, কিন্তু কোনো পার্থিব ফলের জন্যে অতিমাত্রায় ব্যাকুল হওয়া একদমই ঠিক নয়। সে জন্য নিরাসক্ত হয়ে আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি। কোনো পার্থিব জিনিসের জন্যে আর আমি গুরুদেবের কাছে জিদ করে দাবী করবো না আমি তো শপথ করেছি তাঁর কাছে।

দশ

তুমি নিজেই লিখেছো—সাধারণের জীবন থেকে তোমার জীবনটা আলাদা ধরনের। তাই আমিও বলছি তুমি অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে নিজেকে কিছুতেই ছোট করতে পারবে না। সবসময় মনে রাখবে -সেই তোমার জীবনকে জীবনকেন্দ্রের দিশারী মহাপুরুষ

শ্রীঅরবিন্দকে—যাঁর কঠিন কাজ করবার জন্যে তোমার জন্ম। আমি তো সবসময় তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—"হে ভগবান তুমি তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেও।" জানি তিনি আমায় ভীষণ ভালবাসেন—আমার কথা না শুনে তিনি থাকতেই পারবেন না। তাই আমি গভীর শান্তিতে আছি।

এগারো

আমি যে লিখেছিলাম পথের কথা, যে পথের শেষ নেই। Idea টা কি তোমার পছন্দ? ওটা আমার নেশা। কবির কথায়—

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।'

শিল্পীর জীবনে বন্ধন সাধারণ বন্ধনের মত নয়। তার পথে পথেই আনন্দ। তা পুরানো হয় না। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' আমাদের থাকবে না অতীতের কান্না, থাকবে না সামনের জীবনের স্বপ্ন, আমরা শুধু এক মুহূর্তের ফুটে ওঠা ফুল—সন্ধ্যেই ঝরে যাব।

বুঝতে পারছ না আমাদের বহু দূরের পথ চলা। দীর্ঘ সারি পাইনগাছের নীচে আমাদের দুপুরটা কাটবে, কখনও ঝর্ণার ধারে গান গাইবো. তুমি ক্লান্ত গাছে মাথা দিয়ে চুপ করে আছ। আবার সন্ধ্যেতে কোনো পান্থশালায়। এমনি করেই জীবনের বসন্ত শেষ। আর বিদায়ের বেলায় দুজনে সমুদ্রের মাঝে ছোট নৌকায় ভাসিয়ে দেবো নিজেদের। উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়বে নৌকায়—দুজনে হয়ে যাব শেষ।

বারো

সাধারণ দশজনের মতো পারিবারিক জীবন আমারও কাছে চিরকালই ঘৃণ্য। তবে অসাধারণ হওয়ার অর্থ যাযাবর হওয়া, একথা আমার মনে হয় না। যাযাবর হলো লক্ষ্যহীন ঘরছাড়া। আমার মতে ঘর যদি ছাড়তে হয় তবে কাপুরুষের মতো লক্ষ্যহীন জীবনের জন্যে কেন? কোনো মহৎ লক্ষ্যের জন্যে ঘরছাড়া ভালো। সেটাতে বীরের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আছে—শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দের জীবন। একেই বলে সাধারণের ওপরের জীবন। কিন্তু এই জীবনের জন্যে সংগ্রাম করার যে শক্তির প্রয়োজন তা যাদের নেই তারাই একটা লক্ষ্যহীন দায়িত্বহীন যাযাবরের পথ বেছে নেয়—সাধারণ জীবনের কর্তব্য এবং মহৎজীবনের সাধনা দুটোকেই ভয় করে পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সরে যায়। আমি ভীরু নই। এর যে কোনো পথে বীরের মতো চলতে পারি। কিন্তু তুমি পারবে কি? তুমি পারবে না। কারণ তোমার প্রকৃতি আমি জানি। তুমি অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ দুর্বল escapist.

সাধারণ traditional নরনারীর জীবন পরিণতি তোমার কাম্য নয়। তবে এসো দেখা যাক, কে কতখানি সাধারণের ওপরের জীবনের জন্যে সাধনা করতে পারে—আমি না তুমি? দুজনেরই শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক বীরত্বের পথে। পথ ছেড়ে প্রান্তরে যাযাবর হওয়ার মধ্যে ভীরুতা আছে গৌরব কোথায়? রামকৃষ্ণদেব বলতেন—যুদ্ধ যদি করতেই হয় তবে কেল্লায় থেকে করাই ভালো। আর যে সাধারণ জীবনকে ত্যাগ করতে চাইছো তার মধ্যেই বীরত্বের এবং শক্তির অনেক অগ্নিপরীক্ষা আছে। যারা এ পথে চলে তারা

কোনো মতেই হেয় নয়। অন্তত তারা escapist নয়। জীবনকে তারা বদলে না ফেলুক তার মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস তাদের আছে। চাওতো এসো তোমাকে এপথে আমি challenge করছি। দেখা যাক কার কতখানি শক্তি।

তেরো

'শেষের কবিতা'র কথা আমারও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। লাবণ্যের ভয় ছিলো, অমিত তার কবিমনে লাবণ্যের যে কল্পরূপ গড়ে তুলেছে, বিয়ের পর প্রাত্যহিকতার, বাস্তবের আঘাতে তা ভেঙ্গে যাবে। তাই তাদের প্রেমকে তারা আকাশের নীলের মতো, পৃথিবী থেকে আলাদা করে রাখতে চেয়েছে, বাস্তবে সে নীলের স্পর্শ পাওয়া যায় না, কিন্তু তার মোহ আছে রূপ আছে। কবিগুরুর এই তত্ত্বটাকে প্রতিবাদ করার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমার নিজের উপলব্ধি বা বিশ্বাসকে আমি অশ্রদ্ধা করি না। আমি যদি অহংকারী হতাম তবে এ প্রশ্ন জোর গলায় করতাম লাবণ্য-অমিতের প্রেম রোমান্টিক প্রেম, কিন্তু এই প্রেমই কি একমাত্র সত্য? এই প্রেমের পরেব একটা স্তব আছে। সেটা লাবণ্য অমিত কারো উপলব্ধিতে জোটে নি। না জোটারই কথা, রোমান্টিক প্রেম যখন দুটি জীবনকে যুক্ত করে দেয়, তখন সে দুটি জীবনের রূপ অন্য। সে প্রেম যদি সত্যকারের প্রেম হয় তবে রোমান্টিকতাব ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনেব নতুনতর সত্য আবিষ্কারে ব্রতী হয়। জানো, আমি যে মহৎ উপলব্ধি পেয়েছি, তা হলো এই যে, জীবনটা একটা আর্ট। তাকে নতুন করে গড়ার সাধনা তো কখনো পুরোনো হয় না চিরকালের জন্যে। রোমান্টিক ভাব বিহ্বলতায একটা অবসাদ আসে, আসেই। কিন্তু প্রেম রোমান্টিকতা নয়; প্রেম সাধনা। জীবন ও প্রেম যখন সাধনার অঙ্গীভূত হয় তখন তা কখনো পুরোনো হতে পারে না। অমিত ছিলো স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্নবিলাসী হওয়াটা খারাপ নয়। কিন্তু স্বপ্নে অবসাদ আসবে এই ভয়ে আগে থেকে বিদায় নেওয়ার মধ্যে ঘৃণ্যরকমের কাপুরুষতা আছে। বরং স্বপ্নটা কাটিয়ে তাই থেকে আত্মিক সত্যের শিল্পরূপ বের করার মধ্যেই কবির এবং প্রেমিকের গৌরব আছে।

রোমান্টিকতার পরবর্তী স্তরেব এই যে প্রেম, এর রূপটা কবিগুরু ধরতে পারেন নি। নিজের কৈফিয়ৎ অবশ্য কবি নিজেই দিয়েছেন—কবিগুরু যা পেরেছেন, তাই পেরেছেন, তার বেশি তিনি পারেন নি। সেটা পেরেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাব 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে।

তোমাকে বলি সত্যিকারের প্রেম যখন রোমান্টিকতার স্তর অতিক্রম করে দুটি জীবনকে যোগ করে দিয়ে যায়, তখন সে জীবন যেমন ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ে না, তেমনি ব্যক্তি—অহঙ্কারের খোলসও তার মধ্যে থাকে না। তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ (prestige consciousness) এসব কত তরল তুচ্ছ উপলব্ধি বলে মনে হয়। শ্রীরাধার কথা ভাবো। সবটা দিয়েও তাঁর দেওয়ার শেষ হয় না। তাঁর মান, সম্মান, লজ্জা সবই তাঁর প্রেমিক হরণ করে নিলেন—বস্ত্রহরণের তাৎপর্যই এই। এই উপলব্ধির মধ্যে একটা প্রচণ্ড লোকোত্তর আনন্দ আছে। তার কাছে অন্য মূল্যবোধ, আমিত্ববোধ, সবই তুচ্ছ। অবশ্য 'কেটি মিটার'রা (শেষের কবিতা) এসব জিনিস প্রথমে বোঝে না।

তুমি এসব কথা অনেকটা বোঝ। সে জন্য আমার আনন্দেরও অন্ত নেই। তুমি যে

ক্রমে-ক্রমে সবছেড়ে মহত্তর প্রেম ও সাধনার পথে এগিয়ে আসছ এটা আমার কাছে আনন্দেরই কথা।

চোদ্দো

দু একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। জীবন সম্পর্কে আমার যা আদর্শ। কোনো সামাজিক মানুষের পক্ষে হয়তো তা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তো সমাজের আদর্শের কথা বলছি না। এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমারই একান্ত নিজের আদর্শ। এই আদর্শ আমি আমার জীবনস্বপ্নে লালন করেছি। জীবনে রূপ দিতে চেয়েছি। এটা যেহেতু সাধারণ সামাজিক মানুষের আদর্শ নয়, আমারই ব্যক্তিগত পাগলামী, সেইজন্যে অন্য এক ব্যক্তির পক্ষে এই আদর্শকে গ্রহণ করা বা না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ আদর্শ যদি তার পক্ষে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে বুঝবো আমার আদর্শ আমারই পাগলামী। এবং একান্তই ব্যক্তিগত। তাই বলি 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে'। আমার আদর্শের পথে আমি একান্তই একা। তবু আমার আদর্শকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না, এবং আদর্শের সঙ্গে কোন রকমের আপোষ করতে পারব না। একা অন্তত এর জন্যে মরতে পারবো এই মৃত্যুই আমার পক্ষে গৌরবময়।

একটা কথা আমি স্বীকার করতে অন্যান্য দশজনের মতো দ্বিধা করিনা যে, এ আদর্শ অনেক দুরূহ এবং একে মনে প্রাণে ভাবে স্বপ্নে চেতনে অবচেতনে পূর্ণ রূপ দেওয়া এখনো সম্ভব হয়ে ওঠে নি আমারি পক্ষে। তবু আমার আদর্শকে আমি যতদিন শ্রদ্ধা করবো, ততদিন তার বিপরীত কোনো আদর্শের পক্ষ থেকে ওকালতি করবো না। আমার নিজেরই আদর্শকে—তা যত দুরূহই হোক—ক্রমে ক্রমে রূপায়িত করার সাধনা করবো। এই সত্যকে আমি পূর্ণ রূপ দিতে পেরেছি—এ অহঙ্কার আমার একদম নেই। তবে এর জন্যে আমি নিজের সঙ্গে ও পরের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। গুরুদেবের কথা তো তুমিই আমায় বলতে—স্বামীর আদর্শকে অনুসরণ করাই স্ত্রীর সাধনা। আবার তুমিই নিজের অজান্তে আমার আদর্শের মতো কত গড়ে উঠছ তা জান [illegible] আনন্দ আমার। তোমার মধ্যে দেখেছি আমারই মহৎ স্বপ্নের বাস্তব মূর্তি। কত শ্রদ্ধার আসনে বসেছ, দশটা বাজারের বড় বড় মহিলার চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র হয়ে। তুমি যতই আমার অবাস্তব আদর্শকে রূপ দিয়ে দাঁড় করাবে ততই আমার আদর্শের জোর বাড়বে।

পনেরো

সব মানব-মানবীর ভালবাসার মধ্যেই তীব্রতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব ছাড়াও থাকা উচিত একটা সৃজনশীল মন। যদি এই সৃজনশীল মন বাস্তবের সবরকম দাপট অতিক্রম করে নিজের বাঞ্ছিতকে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলে তবে বাঞ্ছিতের পূর্ণতা তার কাছে চিরকালই রইলো, সে নিত্যই নতুন 'হোয়'। এবং এইখানে অসাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব, এইখানেই তাঁর মহত্ত্বের পরীক্ষা। এইখানেই তিনি চণ্ডিদাস হয়ে প্রেমের মধ্যে নিত্য নতুনের রসাস্বাদ করেন।

অসাধারণ মানুষের চাওয়া সাধারণ মানুষের চাওয়া থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ

রূপগুণ বিদ্যা ঐশ্বর্য সম্পন্ন একজনকে কামনা করে। কিন্তু পাওয়ার পর রূপগুণ বিদ্যা ঐশ্বর্যবান সেই পরমবাঞ্ছিতকেও তার কাছে একদিন পুরোনো অবাঞ্ছিত মনে হয়। কারণ যে সব জিনিসের জন্যে তার এই চাওয়া সেসব জিনিস পেলেই তাদের স্বাদ ফুরিয়ে যায়, আর যেহেতু এসব জিনিসই সীমাবদ্ধ সেহেতু এতে আর নতুন আবিষ্কারের কিছুই থাকে না। দেহের চাওয়ার স্তরে এ সত্যটা খুব সহজে ধরা পড়ে। সুতরাং যদি কারো পাওয়ার অবসাদ আসে বুঝতে হবে তার চাওয়াব এমন কোনো জিনিসের কামনা ছিলো যার স্বাদ ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ যে চেয়েছিলো সে সাধারণ মানুষ, সাধাবণ চাওয়াই চেয়েছিলো— সাধারণের যে পরিণতি তাই তাকে ভোগ করতে হবে। আর অসাধাবণ যিনি তিনি সাধারণ উপকরণের জন্যে কাউকে চান না। তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। তিনি মানুষের অন্তরকে চান, আত্মাকে চান। এর স্বাদ কোনো দিন ফুরায় না। সুতরাং এ কোনোদিন পুরোনো হয় না। শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে তাঁর শিষ্যদের চেয়েছিলেন, তাই তাঁব শিষ্যরা তাঁর কাছে অনেক অপূর্ণ, অনেক তুচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে কোনদিন পুরানো হয় নি।

আর আমি মনে করি, মানুষের মধ্যে যারা একান্তই সাধারণ তাদের যে কোনো গতি নেই তা নয়। অসাধারণ মানুষের মন, আব শ্রীঅরবিন্দের মতো প্রেম সকলে নিয়ে জন্মায না, শ্রীঅরবিন্দের চাওয়া অসাধারণ মানুষের মতো হতে পাবে না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সাধারণত্বের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ও শক্তি সর্বমানুষেব অন্তরে থাকে। তা সময়সাপেক্ষ এবং তার জন্যে অবশ্যই সাধনা দবকার। আমার তো মনে হয়, মহৎ জীবন যারা চায় তাদের জীবনে প্রেম কখনো নির্বাচনমূলক না হয়ে সর্বদা সংগঠন মূলক হওযা উচিত। সাধারণ জীবনের পথিক যারা নিজের প্রেমাস্পদ বা নিজের জীবনসঙ্গীকে বহুর মধ্য থেকে বারবার নির্বাচন করে বেড়ায, betterকে পাবার জন্যে goodকে প্রত্যাখ্যান করে এবং bestকে ধরাব জন্যে better কে ছেড়ে যায়। একে আমি বলি নির্বাচনমূলক প্রেম। সংগঠনমূলক প্রেম হল সেই যার আদর্শ স্ত্রীর কাছে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীতে পাই। সেখানে প্রেমাস্পদকে অবাঞ্ছিত মনে হবার কথা নেই, তাকে অন্য দশজনের তুলনায় ভাল বা মন্দ করার কথাও নেই। সর্ব ঊর্ধ্বে কেবল একটি কথা, আমি যাকে গ্রহণ করেছি— তাকে গড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমার। তাকে দিয়েই আমার সাধনা চলবে, তাকেই আমি গড়ে তুলবো। একে সংগঠন মূলক প্রেম বলতে চাই। এই প্রেমই কল্যাণমূলক এবং শান্তিমূলক। নিজে সৃষ্টি করার মধ্যে, নিজে গড়ে নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা সর্ব শ্রেষ্ঠ আনন্দ, তা bestকে নির্বাচন করে নিলেও পাওয়া যায় না, একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। আর সৃষ্টির যে আনন্দ তাই তো মহাকবির আনন্দ! যারা অসাধারণ তারাই এর রস বোঝে।

ভগবানও মানুষকে যে গড়ে নেবেন তার জন্যে চাই মানুষের নমনীয়তা এবং ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। আধুনিক তার্কিক মনের কঠোরতা এবং তথাকথিত ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতা এব জন্যে সহায়ক নয়। ব্যক্তিত্বেব এই তেজস্বিতা বা কঠোরতা বর্তমান এ পৃথিবীতে শ্রদ্ধা অনেক পাবে, কিন্তু দিব্যরূপান্তরের সাধনাকে তা সফল করতে পারবে কিনা জানি না। কারণ দুটি জিনিসই সর্বদা মানুষকে ভগবান থেকে বিচ্ছেদমুখী করে। অথচ সাধনার জন্যে ঠিক ত্যাগ নয়, গভীর সহনশীলতা দরকার। ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার নিয়ে কত ভক্তশিষ্য

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথ থেকে সরে এলেন। কিন্তু যে মহত্ত্বের সাধনায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্যদের গড়ে তুলেছিল্লেন তার তো অংশীদার হলেন না। আমরা অসাধারণ মানুষ নই। আমাদের চাওয়ায় পাওয়ায় অনেক সাধারণ উপকরণ আছে তা আমি স্বীকার করতে লজ্জা পাই না। তবে আমার গর্ব যে আমি অসাধারণ অমৃতরসের পিযাসী। এবং এপথের সাধনায় তোমাকে সঙ্গীরূপে পেয়েছি—যোগ্য সঙ্গীরূপে। আমাদের সাধারণ জীবনকে মহত্বের মহিমায় ভূষিত করবোই—এই আমার জীবনপণ। এপথে তোমাকে আমি যতটা বদলাতে পেরেছি এমন দৃষ্টান্ত বিরল। আমার চেষ্টা যে সংগঠনশীল, নির্বাচনশীল নয়— একথা তুমিও বুঝেছ।

ষোলো

তোমার কাছ থেকে ফিরে চাকরিতে গিয়ে মনটা এমন ভরাট লাগছিলো যে কারুর সঙ্গে যে আমার ঝগড়া বা মতানৈক্য হতে পারে এ ধারণাই মিথ্যে বলে মনে হচ্ছিল। র-এর সঙ্গে তখুনি ভাব করলাম। ছাত্রীদের খুব আনন্দের সঙ্গে পড়ালাম। বাড়িতে ফিরে নিজে কিছু পড়াশুনা করলাম।

অনেক রাতে একটা সমাধান মনে এলো। সাধনার পথে তোমার সঙ্গী হতে হলে আমাকে কঠিন তপস্যা করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে গুরু রূপে বরণ করেছি। তাই তপস্যায় তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। ভোর ৩ $\frac{১}{২}$ টায় উঠে পড়লাম। বোনেদের সঙ্গে পড়াশুনো করলাম ৫টা পর্যন্ত। তারপর স্নান সেরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করলাম অনেকক্ষণ। সেই আবছা আলোতে ফুল দিয়ে সাজানো ঠাকুরকে কি সুন্দর লাগছিলো। সঙ্কল্প করলাম আজ সারাদিনটা উপবাস আর মৌনতা অবলম্বন করে কাটাবো। সারাদিন তাই করেই কাটলো। দুপুরে একবার ধূপধুনা দিয়ে পুজো করলাম। সুর দিয়ে মন্ত্র পড়লে বেশ একটা শিহরণ লাগে। এখন সন্ধ্যেবেলা উপবাস ভেঙেছি। খুব আনন্দ লাগছে। সাফল্যের বোধ হয় এই একটাই পথ। আমি শান্তিতে আছি।

সতেরো

ওয়েসিসে দাঁড়িয়ে আছি আমি সাহারার একক অভিযাত্রী। কোথা থেকে ওয়েসিসের অধিষ্ঠাত্রী তরুণী দেবী এলো। বললো অনেক কথা আমার হাত ধরে নিয়ে গেল তার পূজার মন্দিরে। সে নিজে দেবী, তবু মাথা নত করে দিল আমার পায়ে।

আজকের তোমার দুটি পংক্তিতে আরো গভীরভাবে সেইদিনেব কথাই অনুরণিত করে তোলে, "আজো কিন্তু আমার আগের মতোই মনে হয়, কী করে ভক্তিনত দৃষ্টিতে তোমার পায়ের কাছেই মাথা দিয়ে থাকি, মুখ তুলে ওপরে তাকাতে সাহস হয় না, তুমি যে অনেক মহৎ, অনেক বড়, তুমি যে দেবতা।"

আমার কথা শোনার জন্যে এই যে ব্যাকুলতা, তৎপরতা, আমার ইঙ্গিত বোঝার জন্যে অপূর্ব সচেতনতা, এবং সকলের ওপরে অপূর্ব শ্রদ্ধা—সব মিলিয়ে তোমাকে বেছে নিয়েছিলাম সেদিন আমার সাধনার সঙ্গীরূপে। আজও সেই তুমিই আছো জানি। তাই অনেক আঘাত পেলেও শেষ পর্যন্ত স্থির থাকি, শুধু কর্তব্যের খাতিরে নয়, অন্তরের প্রত্যয়ে।

তুমি লিখেছ 'আমি চোখের ওপরে দেখছি একসঙ্গে তুমি কি খাটুনি খেটেছ। আসলে আমি আমার প্রচেষ্টার সত্যিই কোনো ত্রুটি করি না। তুমি অন্তত এটা বুঝবে, এইটাই আমায় জোর দেবে আমি কর্তব্যের পথে এগিয়ে যাবো। কর্তব্য থেকে কোনদিন আমি বিচলিত হবো না, একথা ঠিক কারণ আমি আদর্শবাদী। কঠোর পরিশ্রম করি আমি। লক্ষ্য যদি আমার ব্যর্থ হয়, তবু এগিয়েই যাবো, লক্ষ্য হবে কর্তব্যের জন্যে কর্তব্য। কোনো পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করা চলবে না। এভাবে চলা অবশ্য খুবই শক্ত। কিন্তু আদর্শবাদীর পক্ষে তো কোনো ক্লান্তির স্থান নেই, ক্ষমা নেই। জীবন তার কাছে একটি কঠোর ব্রতমাত্র।

তুমি আমার সমস্ত প্রচেষ্টার সমস্ত খাটুনির কথা বুঝে যা লিখেছ, তাতে আমি অনেক জোর পেয়েছি।

আঠারো

আকাশটা আজ কি যে আনমনা উদাস, মেঘলা হয়ে আমার মনের অনুভূতিকে আরও গভীর করেছে।

জান, তোমাকে একটা কথা বলি। শ্রীমার বাণীতেও তো আছে যে সাধনাপথের কোনো সাফল্যের কথা কাউকে নাকি বলতে নেই একমাত্র গুরু ছাড়া। আমি তাই কাউকে বলিনি। কিন্তু আজ আর থাকতে পারছি না।

কাল রাতে ফিরে এসে হঠাৎ শুনলাম ক কে মামু পুজোতে একটা দামী শাড়ী কিনে দিয়েছে। সাধারণত আমাকে বঞ্চিত করে মামু তাকে ওরকম কিছু দেয় না। তাই মনটা তখুনিই খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই নিজের ওপর একটা ঘৃণা এলো। ভাবলাম তোমার সঙ্গী হয়ে একটা তুচ্ছ জিনিসের ওপর এরকম আসক্তি— তখুনি প্রশান্ত মনে ধ্যানে বসলাম। ঘণ্টাখানেক ধ্যানে ছিলাম। খুব অন্তর দিয়ে শ্রীমাকে ডাকতে লাগলাম। মাগো এত যে তোমাকে ডাকি সে ডাক তোমার শ্রীচরণে পৌঁছায় কিনা আমি বুঝবো কি করে? অন্ধকারের বুক চিরে একটি আলোর রেখা—স্পষ্ট দেখতে পেলাম মায়ের দুটি শ্রীচরণ কি যে আনন্দ হলো। তাই তোমাকে না জানিয়ে পারলাম না। তুমি বড় সাধক। এর একটা উত্তর দিও। সবটাই আমার কল্পনা প্রসূত নয়তো?

উনিশ

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে দাঁড়িয়ে আছি। চারিদিকে কত যে মনোযোগী প্রতিভা ডুবে আছে বইএর সমুদ্রে প্রবাল সংগ্রহ করতে। দূরে দেখতে পেলাম তুমিও এক পাশে বসে কী যেন নোট করছো। অন্য পাশে একা বই-এর পাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে আমি চেয়ে আছি ওপরের দিকে, সমুদ্রের মুক্তো কত ওপরে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, নীলতারাকে তবু ছুঁতে পারছে না। আমার উর্ধ্বচারী মনের চিরসঙ্গী সেই নীলপাখি আজ কাছে নেই, গতি তাই আমার মন্থর হয়ে আসছে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না।

এবারে তাই যেদিন পাখীকে পাব, সেদিন আর সকল পাওয়াকে ছাড়িয়ে যাবে উর্ধ্বতর আলোকের সন্ধানে অভিযান। এবারে আমাদের নানা কাজকর্মের ওপরে থাকবে দিব্যজীবনের অভীপ্সা নিয়ে ওপরের দিকে চলে যাওয়ার সবরকম আয়োজন। প্রার্থনা,

ধ্যান, শ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে পাঠ আর সবশেষে তোমার আবৃত্তির অমৃতপান। সৌন্দর্যাচার, রুচি ও বিদগ্ধ মানসিকতার আদান প্রদান।

বিশ

আমাদের বাড়ির বিরাট খোলা-ছাদটা আজ একেবারে ফাঁকা। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এখন সন্ধ্যে-নির্জন, নীরব, শান্ত চারধার। চারপাশের বিস্তৃত ঝোপ জঙ্গলে অন্ধকার নেমেছে শান্ত চরণে। পড়তে বসার আগে, আমি ধ্যান সেরে নিলাম। ওদিককার গাছপাতার মধ্যে, আকাশের গায়ে কার চরণচিহ্ন? আমি ডুবে গেলাম, খুঁজতে গেলাম আমার আমিকে জন্ম-জন্মান্তরের আমিকে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহাস্থ্রম ছেড়ে প্রব্রজ্যা নেবেন—ভগবানের ডাক শুনতে পেয়েছেন তিনি। সংসারের ভোগৈশ্বর্য ছেড়ে তাই অরূপরতনের সন্ধানে চলেছেন। প্রিয়তমা স্ত্রী মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে চলে যাওয়াতে মনে বড় বেদনা বাজছে ... তবু যেতে হবে। সংসারের বিত্ত-সম্পত্তি স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে প্রসন্ন মুখে বিদায় নিতে চাইলেন ঋষি। কিন্তু স্বামীর আদর্শই যাঁর আদর্শ, অমৃতের আস্পৃহা যার মনে, তাঁকে কি বিত্ত দিয়ে ভোলানো যায়? মৈত্রেয়ী বললেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"— নিলেন মৈত্রেয়ী স্বামীর সঙ্গ—ঘর-ছাড়ার কষ্ট, দুঃখের তপস্যা, অমৃতের অস্পৃহায় তুচ্ছ হয়ে গেলো।

আমারও এবার তোমার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। যে ঘর বেঁধেছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে, সে ঘর ভগবান নিজেই ভাঙলেন। হয়তো ঘরের মায়া কাটিয়ে দিলেন ভগবান নিজের হাতে। এবার বানপ্রস্থ— পান্থশালায়, বৃদ্ধাশ্রমে, যোগাশ্রমে—শুধু অমৃতের সন্ধানে অন্তরের অনন্তের সাগরে ডুব দিতে হবে।

আর কথা নয়, তাই চিঠিও নয়— কারণ চিঠিও তো কথাই—লিপিবদ্ধ কথা। আর চিন্তাও নয়—কারণ চিন্তাও নিজের মধ্যে নিজে-নিজে কথা। তাই এবার সব কথা ছেড়ে, চিঠি ছেড়ে, চিন্তা ছেড়ে পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে ডুব দেবার পালা। জানো, যতই অন্তরেব এই নীরবতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে কবির কথা কত সত্যি—

পরাৎপর যিনি,
তাঁর ক্রিয়া চলে মনের নীরবতায়।
অনুচ্চারিত যে বাণী,
তা শুনতে পাই হৃদয়ের নিস্তব্ধতায়।

In the mind's silence the Transcendent acts
And the hushed heart hears the unuttered word
—SAVITRI, Book III, Canto II

ঝ. পরিশিষ্ট—১ : মতামত

রামেশ্বর শ'কৃত

১. 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' সম্পর্কে

দেশ (২০/১০/৯০) ঃ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের The Origin and Development of the Bengali Language প্রকাশের পর বাংলা ভাষায় এধরনের সুবিস্তৃত কোনো মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।.......একালে নব্য ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মৌলিক গবেষণা-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে না।........কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গেছে।........বর্তমান লেখক বিশেষ পরিশ্রম করে সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করেছেন।।...... বাংলা ভাষায় এধরনের গভীর ও ব্যাপক আলোচনা দুর্লভ।

—**ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**, অবসরপ্রাপ্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ওভারল্যাণ্ড (১২/৭/৯২) ঃ ডঃ শ'র এই বইখানি ভাষা সম্পর্কে প্রায় একটি কোষগ্রন্থে পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য হয়েছে। এই বইয়ের তুলনীয় আর কোনও বই বাংলায় আছে বলে মনে হয় না।.... বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত জার্মান লেখকের আয়ত্তে। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এরকম একটি বই লেখার অধিকার যে তাঁর আছে তাঁর মেধা, অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যেই তার প্রমাণ অবিসংবাদিত।

—**ড: ভবতোষ দত্ত**, অবসরপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, প্রাক্তন ডিরেক্টর ঃ রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতী

ডঃ রমেশ্বর শ'র 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' ভাষাবিজ্ঞানের বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ পাঠ্যগ্রন্থ। প্রাচীন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ডঃ শ' তার বিভিন্ন ধারণা ও তত্ত্বের, সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার ইতিহাস ও সংগঠনের, বিস্তারিত ও প্রশংসনীয় আলোচনা করেছেন।

—**ড: পবিত্র সরকার**, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/১২/৯১) ঃ বাংলা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার অনুর্বর যুগে রামেশ্বর শ'র আবির্ভাব নতুন আশার আলো দেখায়। বস্তুত, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থটি বাঙালির কাছে এক অসামান্য উপহার। যে অপরিসীম ধৈর্য এবং তদ্‌গত নিষ্ঠায় এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, যে ঈর্ষণীয় ঋজু প্রকাশভঙ্গিতে রচনাটি সুখপাঠ্য করে পরিবেশিত হয়েছে, তার জন্য বাঙালিমাত্রই লেখকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।......ভাষাবিজ্ঞানীর রাজ্যে লেখক লঘু পদক্ষেপে বিচরণ করেন নি। যথার্থ

ভাষাবিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির অধিকার বলেই লেখক সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞানের বিচিত্র দিকগুলি এত সহজে উদ্‌ঘটিত করতে পেরেছেন।.....ভাষাতত্ত্বের যে দিক্-দিগন্ত এতে উন্মোচিত হয়েছে তা প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ এবং আধুনিক।

—**ড: পরেশচন্দ্র মজুমদার** (রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত ভাষাবিজ্ঞানী), রীডার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতীচ্যের দেশগুলিতে ভাষাবিজ্ঞানের বহুমুখী অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবিষয়ে মৌলিক ও সহায়ক বইয়ের প্রকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের শরিক হিসেবে এইসব জরুরি প্রকাশনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ খুবই সংকুচিত।....সেদিক থেকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর রামেশ্বর শ'-এর এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। কারণ এই বইতে তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সহজ ভাষায় ধরিয়ে দিয়েছেন।

—**ড. নির্মল দাশ,** প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার বই আগেই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আপনি যে অশেষ শ্রম স্বীকার করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন সে ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

—**ড: আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ,** প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ একটি অমূল্য সংযোজন। প্রশংসনীয় উদ্যম।

—**ড: মৃণাল নাথ,** প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয

গণশক্তি (২৮/৮/৯৪) একক পরিশ্রমে বাংলা ভাষার অধ্যয়নের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণে এই বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

—**ড: আশিসকুমার** দে, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

রামেশ্বর শ'কৃত অনুবাদ
২. 'ভবিষ্যতের কবিতা' সম্পর্কে

অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য : রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্য : তিরুপতি সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
(সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়)

সাহিত্যতত্ত্ব মীমাংসার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর অবশ্য পাঠ্য 'ভবিষ্যতেব কবিতা'

শ্রীঅরবিন্দের রচনা প্রধানত: ইংরাজীতে। যাঁরা তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন, তাঁর বাক্য কতখানি দীর্ঘ, তাঁর রচনাভঙ্গী কি রকম দৃঢ়পনদ্ধ এবং প্রায় সমস্ত বাক্যের অন্বয় কত দুরূহ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সৃষ্টিকে হয়তো ইচ্ছা করেই এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন সেখানে প্রবেশ করতে গেলে 'বোধি'র সাহায্য নিতে হয়। বেদের ঋষিরাও তো এমনটিই করেছিলেন। 'বোধি'র আলোকে যে সত্যকে তাঁরা দর্শন করেছিলেন, বেদের মধ্যে সেই সত্যকেই উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। আর তাই 'বোধি'র সাহায্যেই তাতে প্রবেশ করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের 'Future Poetry' এর ব্যতিক্রম নয়।

শ্রীঅরবিন্দের 'The Future Poetry' রচনার পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। James Cousins-এর 'The New Ways in English Literature' বইটি যখন তাঁর হাতে আসে, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে এ এমন একটা সৃষ্টি যার মধ্যে তাঁর রচনাশৈলীর সৌন্দর্যের জন্যে, তাঁর নিখুঁত মাত্রা বসানোর জন্য, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং তাঁর যথাযথ রস-বোধের জন্যে আমাদের অন্তরাত্মা আনন্দ লাভ করতে পারে। যে আইরিশ সাহিত্য আন্দোলন সমসাময়িক ইংরাজী সাহিত্যের কাছে উচ্চস্তরের কবিকে উপহার দিয়েছে, শ্রীযুক্ত কাজিনস্ সেই সাহিত্য আন্দোলনেরই নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন। শ্রীঅরবিন্দের মনে হয়েছিল যে, কাজিন্সের বইটি এমন একটা আন্দোলনের অঙ্গ যে আন্দোলনের লক্ষ্য হল সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা সুস্থ পরিবর্তন ঘটানো এবং একটা প্রাণপূর্ণ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বাতাস ও আলো এনে দেওয়া। 'The New Ways in English Literature' গ্রন্থে James Cousins সমসাময়িক এবং সাম্প্রতিক ইংরাজী কবিদের সম্পর্কে এমন অনেক আলোচনা করেছেন, যাতে আছে প্রশংসনীয় সহমর্মিতা, ভাষার আলোক-বিস্তারী শক্তি এবং শিল্পের এক অব্যর্থ সুচারু স্পর্শ। কাজিন্সের বইটি শ্রীঅরবিন্দকে অনুপ্রাণিত করলেও তত্ত্বের উপস্থাপনে এবং মননে 'The Future Poetry' বইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে যে তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্বের উপস্থাপনে এর আরম্ভ, কবির সূক্ষ্ম দর্শন ও রচনাশৈলীর মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠানে বিশ্লেষণে এর বিস্তৃতি

এবং মানুষের দিব্য-সম্ভাবনার উপলব্ধি ও প্রকাশে এর পরিসমাপ্তি। সংস্কৃত সাহিত্য-তত্ত্বমীমাংসকেরা যখন রসকে কাব্যের আত্মা বলে উল্লেখ করেন এবং ব্যঞ্জনাকে রস পরিবেশন সমর্থ শক্তি বলে বলেন, তখন তাঁরা একটি নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ ঘটান ঠিকই, কিন্তু এ সত্যও চরম সত্য নয়। 'রস' হচ্ছে এমন একটি সৌন্দর্য যাকে খণ্ড খণ্ডভাবে ভাগ করা যায় না, যা অখণ্ড ও পরিপূর্ণ, যা আপনার আলোকে আপনি ভাস্বর, তাই হচ্ছে 'রস'। ঈশ্বরই তো হচ্ছেন এই পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্যের স্বরূপ। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে এই অসীমের প্রাপ্তি, যে অনন্ত ও অসীম ও সমস্ত আপাতসুন্দর বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করে তাকে সুন্দর বলে প্রতিভাত করাচ্ছে। সংস্কৃত সাহিত্য মীমাংসকেরা বলেন, এই রসের উপলব্ধি করতে গেলে কাব্যকে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী হতেই হয়। যে কাব্য ব্যঞ্জনার উপরে নির্ভর করে না, তা শব্দবৈচিত্র্য ও বাচ্যার্থ সৌকুমার্য্যের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এ গণ্ডিকে লঙ্ঘন করে উত্থিত হতে পারে না। তাই মহাকাব্য 'সাবিত্রী' প্রসঙ্গে রচিত পত্রাবলীতে শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট করে বলেছেন, কেবল সহৃদয়তা দিয়ে কোন কাব্যেরই মর্ম্মমূলে প্রবেশ করা যায় না। এর জন্য চাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, যে দৃষ্টি খণ্ডের মধ্যেও অখণ্ডকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে। সীমার মাঝে সৌম্যের যে সুর প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত হচ্ছে, তাকে দেখিয়ে দেবে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন 'সাবিত্রী'র মর্ম্মমূলে প্রবেশ করতে গেলে এই আধ্যাত্মিক চেতনাকেই আশ্রয় করতে হয়। কারণ এই তো অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতা, যা নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে দেয়।

ইংরাজী কাব্য-সাধনার আদি পর্ব থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু ইংরাজী কাব্য বিশ্লেষণ করে শ্রীঅরবিন্দ যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হচ্ছে এই ইংরাজী কাব্যের বিবর্তন কি নবজন্মকেই সূচনা করছে নাকি অবক্ষয়ের বার্তা বহন করে নিয়ে আসছে। ইংরাজী কাব্য যতই অন্তরাত্মার নান্দনিক অভিব্যক্তির পরিচয় দিক না কেন, তার মধ্যে বুদ্ধিবাদের চরম বিকাশের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা আছে। এটাই হচ্ছে তার অবক্ষয়ের দিক। বুদ্ধিবাদ যদি তার সীমার বাইরে এগিয়ে যেতে না-ই পারে, তাহলে তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে, —তার অবদান যাই থাক না কেন—একটা কাব্যিক অবক্ষয়ের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি হতে বাধ্য। বুদ্ধি যতই আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য বৃত্তিকে অবদমিত করে রাখবে, ততই এই অবক্ষয় ঘনিয়ে আসবে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে এই অবক্ষয়ের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আগে থেকেই পাওয়া গিয়েছে। একটা শৈল্পিক অবক্ষয় যে আসন্ন এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য যে কলা ও কাব্যের দিক্-পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, এ রকম একটি নিরবচ্ছিন্ন ভয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র শেষ ভাগ জুড়েই চোখে পড়ে। একসময় তো এমন একটা ধারণা জন্মেছিল যে, যেভাবে আধুনিক মন ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছে এবং দিন দিন তার কাব্যিক ও সৌন্দর্য-রসিক কল্পনা হ্রাস পাচ্ছে, তাতে অপরিহার্য নিয়মে কাব্যের পতন হতে বাধ্য; বিজ্ঞানের জন্য তাকে আসন ছেড়ে দিতেই হবে। আধুনিক মন যে নতুন পথ বেছে নিয়েছে তার লক্ষ্য হল একটা ঊর্ধ্বতর মহত্তর মনন ও জীবন। মানব-মনীষা আর প্রত্যক্ষ বাস্তবতার জগৎকেই সব কিছু বলে মেনে নিয়ে খুশী নয়; সে অনুভব করতে শুরু করেছে যে, আধ্যাত্মিক মন বলেও একটা

কিছু আছে এবং সেই মনই একটা মহত্তর ও ব্যাপকতর দিব্যদর্শনের দ্বারে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম উন্মোচনই হুইট্‌ম্যান, কার্পেন্টার এবং কয়েকজন সাম্প্রতিক ফরাসী কবি, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স্ এবং মেরিডিথ ও অন্যান্য কয়েকজন ইংরাজী কবির কাব্য-সৃষ্টির মূল তাৎপর্য।

শ্রীঅরবিন্দের ধারণা যে, ভবিষ্যতের কাব্যকে আরো সার্থকভাবে বোধিলব্ধ হতে হবে। এ কাব্য বর্তমানের ভ্রূণাবস্থা থেকে সাধারণের সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে আত্ম-সচেতন হয়ে উঠবে এবং নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার মধ্যে প্রথমটির মধ্যে রয়েছে বিরাট আধ্যাত্মিক মন, —এমন একটি অন্তর্মুখী দৃষ্টি যা আত্মার স্বরূপ ও শাশ্বত সত্যের দিকে ঘোরানো, দ্বিতীয়টির রয়েছে চিন্তার স্বাধীন অন্বেষণা এবং প্রাণশক্তির এমন দুর্দম্য সাহস যা পৃথিবী এবং তার সমস্যাবলীকে ক্রমে ক্রমে জয় করে চলেছে। এখন এই দুটি মানসিকতার মধ্যে যার যা সম্পদ থাক না কেন, সব কিছু নিয়ে এই দুটি এসে পরস্পরকে স্পর্শ করবে এবং দুয়ের পারস্পরিক তড়িৎস্পর্শেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এবং দুইয়ের মিলন থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যতের কবিতা। জীবন জগৎ এবং প্রকৃতির সবটাই আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে, তলিয়ে দেখতে হবে মানুষের ব্যক্তিআত্মা এবং বিরাট বিশ্বআত্মার সাহায্যে, আর গ্রহণ করতে হবে শুধু তাদের অপেক্ষাকৃত বাহ্য সত্যের জন্য নয়, তাদের অন্তরতম সত্যের জন্য। জগতের অন্তরে দিব্য সত্যকে ও মানুষের নিজস্ব দিব্য সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে হবে। এই দিব্যদৃষ্টিই মুক্তি এনে দেবে। আমাদের মন আজ এই দৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই দিব্য দর্শনেরই উপযোগী একটি প্রেরণাদায়ক রস-রূপ এবং দিব্য-দর্শনেরই সত্যপ্রকাশক ভাষা ভবিষ্যতের কবিতাকে খুঁজে বের করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, একটা ব্যাপকতর বিশ্বদৃষ্টি অর্জন না করলে, মানুষের মধ্যে এবং ইহজগতের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি না ঘটালে যেমন এ কাব্য সৃষ্টি করা যাবে না, তেমনি এর মর্মমূলেও প্রবেশ করা যাবে না। মানবজাতির কাছে বিশ্ববিধাতার দাবি হচ্ছে এই, —সত্যতর গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটাও। আরও দিব্য সম্ভাবনাকে, আরো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে জীবনের বর্তমান অভিপ্রায় ও বর্তমান সৌধের মধ্যে আবাহন কর। মানব সভ্যতার ঊষা-লগ্নে মানুষ বিশ্ব-বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিল 'আবিরাবির্ম এধিঃ'। আর বিংশ শতাব্দীতে শ্রীঅরবিন্দ এখান থেকে অনেকটা উঠে এসে মানুষের কাছে বিশ্ব-বিধাতার প্রার্থনাকে তুলে ধরেছেন যা সম্ভবতঃ উপনিষদের 'চরৈবেতি'র পূর্ণতম রূপ। যেসব জাতি বিশ্ববিধাতার এই দাবিকে পূর্ণ করবে এবং বাস্তব রূপ দান করবে, তারাই হবে আগামী ঊষা-লগ্নের নতুন জাতি। আর সে সব কবি—তারা যে কোন ভাষার এবং যে কোন জাতিরই হোক না কেন,—সম্পূর্ণরূপে এই দিব্য দৃষ্টি নিয়েই দেখতে পারবেন এবং তারই অভিব্যক্তির প্রেরণার কথা বলবেন, তাঁরাই হবেন ভবিষ্যতের কবিতার স্রষ্টা।

শ্রীঅরবিন্দের দৃঢ়পিনদ্ধ প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রবেশ করে তার মর্মার্থ উদ্ধার করে, তার

ভাষান্তর করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে সাহিত্য সৃষ্টির অনুবাদ আরো দুষ্কর। কারণ, সাহিত্য-সৃষ্টিতে কবির স্বচ্ছন্দ পদসঞ্চরণের অবকাশ আছে। কল্পনার পক্ষ বিস্তার করে তিনি আকাশের যে কোন স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারেন, পরিদৃষ্ট সত্যকে যে কোনভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন। তাঁর বিচরণের কোন গণ্ডি নেই। অনুবাদককে কিন্তু এমনটি করলে চলবে না, তাঁকে মূল গ্রন্থের লেখকের কেটে-দেওয়া গণ্ডির মধ্যেই বিচরণ করতে হবে। এমন সব শব্দ খুঁজে নিয়ে আসতে হবে, যে শব্দসম্ভার মূল লেখকের ভাবের অতিরিক্ত বা নতুন কোন ভাব রচনার মধ্যে পরিবেশিত না হয়। পূর্বেই বলেছি শ্রীঅরবিন্দের ভাষা প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়ে দুরূহ এবং ভাবের দিক দিয়ে দুর্বোধ্য। তাঁর রচনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক সময় চলে যায়। বহুবার পাঠের পরে ভাবকে ধরতে পারা যায়। তাও তার যথার্থ প্রতীতির জন্য আরো অনেক সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দের বাক্যগুলি সাধারণত এত দীর্ঘ এবং তাতে এমন সমস্ত শব্দ বিন্যস্ত করা হয়, যাতে বাক্যের শেষে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রথম অংশে পরিবেশিত ভাব স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই শ্রীঅরবিন্দের রচনা অনুবাদ করার কথা সাধারণ সংস্কৃতিবান মানুষ চিন্তাও করতে পারেন না। এক্ষেত্রে অনুবাদক শ্রীরামেশ্বর শ' The Future Poetry-র অনুবাদ করে একটি বিস্ময়কর প্রতিভার সঞ্চরণ ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে অনুবাদকের গভীর প্রবেশ, শ্রীঅরবিন্দের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও পরিবেশিত সত্যের গভীর মনন, বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডারের উপর অসাধারণ অধিকার---এ সমস্তের জন্যই শ্রীরামেশ্বর শ'র পক্ষে The Future Poetry-র অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীরামেশ্বর শ'র 'ভবিষ্যতের কবিতা' দেখে বিস্ময় বোধ উদ্রিক্ত হয়েছে। তবে আমরা তো মনে করি যে, পঙ্গুও যে দুর্লঙ্ঘ্যগিরি লঙ্ঘন করতে পারে, তা সম্ভব হয় ঈশ্বরেরই অনুগ্রহে। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রীরামেশ্বর শ'র গভীর শ্রদ্ধা তাঁর উপর ঐ দিব্যপুরুষের আশীর্বাণীকে টেনে এনেছে। তাই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলতে পারি.....

> "আপনি করিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি
> কিসের আশে
> লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
> আমার রজনী, আমার প্রভাত,
> আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে।"

মূল গ্রন্থের তাৎপর্যটিকে যে অনুবাদ যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারে, সেই অনুবাদকেই আমরা সার্থক অনুবাদ বলে মনে করি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে না পড়লে অনুবাদটির অর্থের যথার্থ উপলব্ধি হয় না। এ ধরনের অনুবাদ কার্যকে সার্থক বলা চলে না। রবীন্দ্রকাব্যের অনেক ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে এই দুর্বলতা ধরা পড়ে। রামেশ্বর শ'র অনুবাদ সম্পর্কে কিন্তু এমনটি বলা চলে না। তাঁর অনূদিত 'ভবিষ্যতের কবিতা' আদ্যন্ত পাঠ করার সময় কখনও The Future Poetry-র সাহায্য

গ্রহণ করতে হয় না.... মনে হয় যেন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং রামেশ্বর শ'র মুখে বক্তা হয়ে উঠেছেন। যেমনটি আমরা পেয়েছি 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বৃন্দাবন দাস সম্পর্কিত মন্তব্যে ঃ—

"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছেন গ্রন্থ ধন্য
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।"

'ভবিষ্যতের কবিতা' গ্রন্থটি আগামীকালের কবিতার স্বরূপটিকেই শুধু জানিয়ে দেবে না, নন্দনতত্ত্বের সামগ্রিক তথ্যের সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে সৌন্দর্য রস পিপাসু মানুষের অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠবে, এরকম আশা সহজেই করা যেতে পারে।

—'শৃন্বন্তু' ফাল্গুন, ১৪০৬।

Professar Rabindra Kumar Das Gupta, Formarly Rabindranath Tagore Professar of Bengali and Head of the Dept of Modern Indian Languages, University of Delhi—

Dear Prof Shaw

Thank you for your very kindly sending me copy of your Bengali translation of Sri Aurobindo's **The Future Poetry** It is certainly an outstanding contribution to Bengali literary criticism I have read Sri Aurobindo's **The Future Poetry** only in the 30 volume centenary edition of his works I have never seen the revised edition of 1985 Your Bengali edition of this classic of literary criticism is therefore extremely valuable You have done a good deal of serious textual work and I have read your editorial notes with great interest and profit I congratulate you on the high quality of this work

Thanking you,

with best wishes
Yours sincerely
(R K Das Gupta)

Prof Rameswar Shaw
B2/41, "The Quest"
P . O . Kalyani 741235
Dt . Nadia . W . Bengal.

অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্ত, প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ও ডিরেক্টর, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, প্রাক্তন ন্যাশানাল লেকচারার, প্রাক্তন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, এশিয়াটিক সোসাইটি —

প্রীতিভাজন রামেশ্বর,

আজ পনেরোই আগস্টে তোমার করা শ্রীঅরবিন্দের The Future Poetry র অনুবাদ বইটির পাতা উলটে দেখছি। যতই দেখছি বিস্ময় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তুমি এই বইয়ের অনুবাদ করেছ, এ তোমার গৌরব নয় শুধু, এ গৌরব বাংলা সাহিত্যের।

শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ ইংরেজির এমন অনুবাদ আমি ভাবতে পারি নি। তাঁর মনীষা তাঁর ভাষায় প্রতিফলিত। সে ভাষার বাংলা অনুবাদ কী যে দুরূহ সবাই উপলব্ধি করতে পারবো যদি একবার তাঁর বইতে চোখ বোলানো যায়। কবিতা সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা আমাদের কাছে অভিনব। ইংরেজি ভাষাটা আমাদের পরভাষা। সেই ভাষাতে নিবন্ধ কঠিন চিন্তা আমাদের কাছে দূরের মনে হলেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাংলায় যখন দেখি অনায়াসে সাহিত্যশ্রীমণ্ডিত হয়ে সেই চিন্তা দেখা দিয়েছে, তখন যেন মনে হয় 'পর্বতের চূড়া য়েন সহসা প্রকাশ'।

তোমার এই বই বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে বেঁচে থাকবে এই ভবিষ্যদবাণী করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু ত্রিকালদ্রষ্টা নই বলে ইচ্ছা সংযত করে তোমাকে আমার একান্ত শুভকামনা জানাই। সেই শুভ কামনার মধ্যে ফাঁকি নেই, এটুকু জোর করে বলতে পারি। সবাই সাহিত্যের সৌখীন আলোচনা করে আশা করে অমর হবে। তুমি সৌখীনতার পথ পরিত্যাগ করে কঠিন পথ বেছে নিয়েছ।

আমার গর্ব ও আনন্দ তোমাকে জানাই কী করে। সবটা পড়ি নি। ধীরে ধীরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করতে হবে। তাতে শ্রম আছে। তার চেয়ে বেশি আছে আনন্দ।

কল্যাণমস্তু। ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৬

ভবতোষ দত্ত

বুদ্ধিবৃত্তি সাহায্যে নয়, বরং বোধির প্রেরণায়

শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি রচিত দর্শন ও যোগ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই বইটিও অসামান্য চিন্তাগর্ভ ভাবগভীর গ্রন্থ। এই বই থেকেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যবিষয়ক নিজস্ব মৌলিক ভাবনার পরিচয় পাই। এটি সাহিত্যবিষয়ক হলেও প্রচলিত সমালোচনারীতিতে এটি রচিত নয়। সাহিত্যকে শ্রীঅরবিন্দ আপনার উপলব্ধির বস্তু করে নিয়েছিলেন। এতে পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ নামে দুটি ভাগ আছে, পরিশিষ্ট আছে তিনটি। সম্পাদকের বিবৃতি, উদ্ধৃতির সারণি পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ, নামপরিচয় ও বিষয়-নির্দেশিকাসহ সমগ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৩০।

ভবিষ্যতের কবিতার বিষয় বিশ্বসাহিত্য। এর প্রথমার্ধে কাব্যের আত্মা, ধর্ম এবং কয়েকটি অধ্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধ-লব্ধ সিদ্ধান্ত থেকে 'কবিতার আদর্শ ভাব', 'কাব্য সত্যের সূর্য'। 'মহত্তর জীবনের স্পন্দন', 'কাব্যিক আনন্দ ও কাব্যিক সৌন্দর্যের আত্মা' 'আত্মার শক্তি', 'কাব্যের আত্মা ও রূপবন্ধ', 'বাণী ও আত্মা' ইত্যাদি শিরোনামে কবিতার ভবিষ্যৎ প্রকৃতি এবং ক্রম—মহত্তর রূপলাভের ইঙ্গিত দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যৎ কাব্যের প্রকৃতি কী হবে, তাই বুঝিয়েছেন। তিনি যখন এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেন, তখন ইউরোপে যুদ্ধ চলছে, তারপরে বিশ্বব্যাপী সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের পালা এসেছে। কাব্যসাহিত্যে তার ছায়াপাত হয়েছে এবং

আধুনিক কবিতার যুগ এসে যাচ্ছে। এর মধ্যে থেকেও শ্রীঅরবিন্দ কবিতার ভাবী স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখছেন।

যে কালে আমরা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী সাহিত্যেরই জয়জয়কার দেখি, সাহিত্য যে কালে বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে, সে কালে শ্রীঅরবিন্দ যাকে বোধিসঞ্জাত কবিতা বলেন বৈদিক ঋষির মন্ত্র রচনার আদর্শ মনে রেখে, তেমন সাহিত্য কেমন করে কবে রচিত হবে জানি না। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যমীমাংসা যোগদৃষ্টিজাত। তাঁর মতে সত্য সৌন্দর্য আনন্দ জীবন ও আত্মা—এই পাঁচটি শাশ্বত শক্তির মধ্যে মানস সৌন্দর্যকে ধ্বনিত করাই আদর্শ কাব্য। আর এই সবই আসে বোধি থেকে। মানুষের প্রাচীনতম কাব্য থেকে সাম্প্রতিক কাব্য পর্যন্ত এই বিশেষতত্ত্বগুলিরই উত্থানপতন দেখেছেন শ্রীঅরবিন্দ। ভবিষ্যতের কবিতা হবে এরই সম্মিলিত অভিপ্রকাশ। এই লক্ষণগুলি এখনকার যে সব কবির কাব্যে ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সত্য সৌন্দর্য ও আনন্দের রূপরচনা। কবিতার রূপ বদলে যেতে পারে, কিন্তু কবিতার আত্মা শাশ্বত।

শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি রচনা যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত। তাঁর চিন্তা তত্ত্বগভীর মৌলিক মনন ঋদ্ধ। অনেক সময়েই তাঁর জটিল চিন্তা, ভাবময় সূক্ষ্ম উপলব্ধির বিশিষ্ট বাক্যরচনা অনুবাদ করে বলা খুবই কঠিন। প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের চেয়েও আমাদের দেশের সাহিত্যতত্ত্বের প্রকৃতিগত মিল থাকতে পাবে। যাঁরা বলেছিলেন কাব্যরস ব্রহ্মাস্বাদ তুল্য কিংবা বলেছিলেন রস আনন্দস্বরূপ এবং অলৌকিক, তাঁবা সাহিত্যের মূলে আর্থ-সামাজিক জীবনতত্ত্বের কথা ভাবেন নি।

এই দিকে অবহিত থেকে অনুবাদককে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। মূলের গাম্ভীর্য বজায় রেখে কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। মূলের গাম্ভীর্য ও গভীরতা বক্ষা করে পাঠককে নতুন একটা উপলব্ধির জগতে নিয়ে যেতে পেরেছেন। ভাষায রক্ষা করেছেন পরিচ্ছন্নতা শুচিতা ও ধ্বনিসৌন্দর্য।

—ভবতোষ দত্ত

আনন্দবাজার পত্রিকা ৩/১/৯৮

শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ চাকী, মনস্বী সমালোচক ও স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক :

শাশ্বতের বাণীবহ হবে আগামীকালের কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ ক্রান্তদর্শী কবি, তাই ভবিষ্যতের কবিতা সম্বন্ধে তিনি কী বলেছেন তা শোনবার জন্য আমরা যে উৎকর্ণ হব তা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর The Future Poetry গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ রামেশ্বর শ'। শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরেজি গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে এবং তার পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণটি

প্রকাশিত হয়েছিল বত্রিশ বছর পরে। ড. শ'র বঙ্গানুবাদে এই সংশোধিত সংস্করণটিই অনুসৃত।

শ্রীঅরবিন্দের The Future Poetry রচনার পিছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। James Cousins-এর The New Way in English Literature বইটি 'আর্য' পত্রিকায় সমালোচনার জন্য তাঁর কাছে আসে, তিনি সমালোচনা লেখা শুরু করেও তা অসমাপ্ত রাখেন, কারণ তিনি নিজে এমন একটি বড় বই লিখতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনি শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে নিজের ধ্যানধারণাগুলি প্রকাশ করতে পারেন। James Cousins-এর ছোট্ট বইটি এ বিষয়ে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭-তে দ্বিতীয় সংস্করণটিতে (১৯১৯ এ প্রকাশিত) দেখছি রবীন্দ্রনাথের উপর Cousins নিজে একটি কবিতা লিখেছেন। বইটি মূলত আইরিশ ও ইংরেজদের নিয়ে লেখা হলেও রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এবং শ্রীঅরবিন্দের কবিতা নিয়ে দুটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন এবং অনেকদিন পর-পর লেখা (Cousins-এর ভাষায় : The Book has not been with a purpose Its chapters are separated by years), তবু শ্রীঅরবিন্দ বইটিকে মূল্যবান মনে করেছিলেন : 'এটি এমন এক চিন্তার জন্ম দেয় যা লেখকের নির্দিষ্ট বিষয়-সীমাকেও অতিক্রম করে যায় এবং আমাদের জীবনে যে নতুন যুগটি আসছে তার কাব্যের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত সামগ্রিক সমস্যাটিরই ইঙ্গিত দেয়।' (অনুবাদ : ড. শ. পৃষ্ঠা ৩)

Cousins-এর বইটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করলেও উপস্থাপনে ও মননে এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহুক্ষেত্রে তিনি Cousins-এর মতের বিরোধিতা করেছেন, সেই সঙ্গে দৃষ্টি রেখেছেন সম্ভাব্য কাব্য সাধনার দিকে। কবিতার অন্তরঙ্গের আলোচনায় বহিরঙ্গকে তিনি বাদ দেন নি। কাব্যের রূপবন্ধ যে তার অন্তরাত্মার স্বতঃ-উৎসারণ অনবদ্য বিশ্লেষণ তা আলোচনা করেছেন। ভাষা তাঁর কাছে যেন 'অসীমের মধ্যে ঝাঁপ দেবার জন্য একটা আশ্রয়স্থান'। কাব্যের সূক্ষ্ম দার্শনিকতাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি, চেয়েছেন 'ঊর্ধ্বগামী বা অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতায় নতুন দিগন্ত'। জাতির চিন্তাবিবর্তনের সঙ্গে কাব্যসম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার স্বরূপটিকেও তিনি তুলে ধরেছেন।

ইংরেজি কাব্যসাধনায় আদিপর্ব থেকে বিংশশতকের পর্বান্তর পর্যন্ত বিবর্তনেব যাবার মধ্যেই তিনি Cousins-আলোচিত এ. ই. (AE) অর্থাৎ জর্জ উইলিয়াম রাসেল, জে এম. সিঞ্জ প্রমুখ আইরিশ কবি এবং জর্জ মেরিডিথ, এডোয়ার্ড কার্পেন্টার, স্টিফেন ফিলিপ্স্ প্রমুখ ইংরেজ কবিদের স্থাপন করেছেন। 'ভবিষ্যতের কবিতা'য় চসার থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগগুলির প্রধান কবিরা সকলেই আলোচিত হয়েছেন। তবে তাঁরা সময় অনুযায়ী সব সময় আসেন নি, এসেছেন প্রসঙ্গক্রমে এবং তুলনাত্মক আলোচনার প্রয়োজনে। কবিরা পূর্বাপর বিশেষ যুগের লক্ষণাক্রান্ত হয়েও যে কোনও জায়গায় পরস্পর মিলতে পারেন তা তিনি দেখিয়েছেন। কিট্‌স্-এর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যে শেক্সপিয়রেও পাওয়া যায় তা তিনি উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। আসলে যুগচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও

তার অঙ্গুলিনির্দেশই তাঁর উদ্দেশ্য, গ্রন্থের নামটিতেই উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট। হুইটম্যান (১৮১৯-৯২) সম্পর্কে বলেছেন, একজন কবি তাঁর দৃষ্টি কেমন হবে, সে সম্পর্কে এমন ব্যাপক, এমন সুস্পষ্ট বোধ হুইটম্যান ছাড়া একালের অন্য কোনও লেখকের মধ্যে নেই। (পৃ ২৩৫, অধ্যায় ২৩) হুইটম্যানের 'প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'কে তিনি মানবাত্মার যাত্রায় এক অধ্যাত্ম রূপান্তর হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এটা নব জন্ম, না অবক্ষয়— new birth or decadence। এ বিষয়টির আলোচনায় (চতুর্বিংশ অধ্যায়) শ্রীঅরবিন্দ আশ্চর্য প্রজ্ঞায় হুইটম্যান, কার্পেন্টার, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস, মেরিডিথ এবং কয়েকজন ফরাসি কবির সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে ডুব দিয়েছেন। এঁদের কাব্যে যে একটি বিষণ্ণ আলো দেখা যায়, তা কি অবক্ষয়ের চিহ্ন? পুঁথিগত এবং তথাকথিত নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় এর সমাধান হবে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর মনে হয় সত্যান্বেষণে যা বোধের সঙ্গে যুক্ত তারই ধর্মের আলোকে এই সংশয়, বিচার্য এই যে—আপাত ম্লানতা বা ক্ষীণতা তা হয়তো দূর থেকে সমুদ্রতট দেখার মতো।

গ্রন্থটি পূর্বার্ধের দীর্ঘ আলোচনার শেষে এই যে সংশয় ও অনুধাবন, উত্তরার্ধে গিয়ে তা যেন এক স্থির প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হয়। ভবিষ্যতের কবিতা হবে আত্মার শক্তি থেকে উৎসারিত। তা হবে শাশ্বতের বাণীবহ, নশ্বর জীবন ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ও হবে নূতন তাৎপর্যে উদ্‌ভাসিত। আর কাব্যের আত্মার যে বিবর্তন তা রূপবন্ধের পরিবর্তনকেও অনিবার্য করে তুলবে। ভবিষ্যতের কবিরা হবেন এই রূপ থেকে অরূপের অভিযাত্রী, হিরন্ময় পাত্র তাঁরাই উন্মোচন করবেন।

ভবিষ্যতের কবিতা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের এই উপলব্ধি তাঁর দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যার মর্মমূলে আছে ভারতের ঋষিদের চিন্তা— আবিরাবির্ম এধি।

সমস্ত কবিচিত্তই সেই 'আবিঃ' বা দিব্যপ্রকাশের প্রার্থী।

এবারে আসি এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে। এই গ্রন্থটিকে অনুবাদ সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলতে আমার দ্বিধা নেই। শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি গদ্য যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন তাঁর প্রকাশ নিয়ে ভাবা যায়, নিবিষ্ট হওয়া যায়, বিস্মিত হওয়া যায় কিন্তু অনুবাদ করতে গেলেই এক একটি বজ্রাঘাত হয়। মূল গ্রন্থটিতে অনেক ক্ষেত্রেই এক একটি বাক্য শত শব্দের যাতে clause, parenthesis, case-in-apposition যুগপৎ বর্তমান। তাছাড়া সর্বত্র পরিভাষা বা পরিভাষাস্থানীয় শব্দের প্রাচুর্য। ফলে অধিকাংশ জায়গাতেই অনুবাদ করাই বেশ দুরূহ। তবে অনুবাদক একাজ সুসম্পন্ন করেছেন। অনুবাদকের মনীষার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা যুক্ত না হলে এমনটা সম্ভব হত না। তবে, প্রায়ঃ সাকল্যবিধৌ হি গুণানাং পরাঙ্‌মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ। ৩০ পৃষ্ঠায় 'বরং'-এর প্রয়োগটি ইংরেজিগন্ধী, ৮৫ পৃষ্ঠায় 'জীবনের তার এত প্রাণোচ্ছল উপস্থাপনা' পদ বন্ধন, ১২৮ পৃষ্ঠার 'পৃথকীকরণ' এবং বর্জিত 'ফলশ্রুতি'র বহুল প্রয়োগ (১৮৩, ১৯৮ এবং অন্যত্র) কেমন যেন বেমানান। তবে গুণান্বিত অনুবাদের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এ-সব নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কর।

গ্রন্থটি শুধু ভবিষ্যতের কবিতার স্বরূপ নির্ণয় হিসেবেই নয়, নন্দনতত্ত্বের বহু উপলব্ধির জন্যও অবশ্য পাঠ্য।

—'দেশ' (গ্রন্থলোক)
৮/১/২০০০

Professor Dr. Basudeb Barman, Ex-Vice Chancellor, Kalyani University :—

Prof. Rameswar Shaw, a polyglot Linguist and a well-known scholar of the Department, received the prestigious literary award from Sahitya Academi the National Academy of Letters, New Delhi, for his meritorious Translation work. He was also honoured with the award 'Sri Aurovinda Purasker' by Sri Aurovinda Bhavan, Calcutta, for his work 'Bhavishyater Kabita' (A Bengali Translation of Sri Aurovinda's monumental work 'The Future Poetry')

—The Thirteenth Convocation Address, University of Kalyani,
28/7/1998.

অধ্যাপক ডঃ সীতাংশু মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনংজিমার আওয়ারনেস :

প্রিয় মহাশয় :

সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক আপনি পুরস্কৃত হয়েছেন সংবাদপত্রে পড়লাম। এ সম্মান আপনার প্রাপ্য ছিল—আপনার এই কৃতিত্বে আমি গর্ব বোধ করছি। হয়তো মনে আছে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় আমি কর্মরত ছিলাম—আপনাদের সাহায্যে বেশ কয়েক বছর ভালো ভাবেই কাটিয়েছিলাম।

শ্রীমতী শোভা মুখোপাধ্যায়ও আমার সঙ্গে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

গভীর জটিল মননকে অনুবাদে জীবন্ত করার ভাষা ওঁর মুঠোয়

শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যতের কবিতা রামেশ্বর শ'য়ের অনুবাদে বাংলা সাহিত্যের সীমানায় চলে এল। শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব গতানুগতিকের অনুক্রমণ নয়। এতে এমন মৌলিক অনুধ্যান আছে, নলিনীকান্ত গুপ্তর রচনাবলীর ব্যাখ্যানে যার পরিচয় বাঙালি পাঠক আগেই পেয়েছেন। ইংরেজি-জানা পড়ুয়ারা শ্রীঅরবিন্দের মননের এই বিশিষ্ট দিকটির

সঙ্গে সোজাসুজি পরিচিত হতেই পারেন। কিন্তু তাতে এর বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন কমে না। একালের অনেক মেধাবী মানুষও ইংরেজিতে এই দুরূহ বিষয়ে প্রবেশে দ্বিধা করতে পারেন। বিশেষ করে বাংলা মনন সাহিত্যের প্রসারে এই বইটির অনুবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ড. অধ্যাপক রামেশ্বর শ' বইটির অনুবাদ করে বাংলা নন্দনতাত্ত্বিক মননকে সমৃদ্ধ করলেন, শুধু এটুকু হলে আমি এতটা উৎসাহী হতাম না। কিন্তু যখন দেখলাম এই প্রয়োজন সাধন করতে গিয়ে তিনি দুটি বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমত, বাংলা ভাষার নিজস্ব স্টাইল, বুনটের বৈশিষ্ট্য আদ্যন্ত সুরক্ষিত রেখেছেন। অত্যন্ত যত্নে এই কাজটি করেছেন, যাতে কোথাও একে অনুবাদ বলে পাঠক-মন কুণ্ঠিত হয় না। দ্বিতীয়ত, যে মননশীল প্রজ্ঞা এই আলোচনার মূলে সক্রিয় তার একটা দ্যুতি—গম্ভীর মহিমা ভাষান্তরেও সঞ্চারিত রেখেছেন।

রামেশ্বর বাবু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বড় উপকার করলেন।

অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক (বাংলা), নব্য ভারতীয় ভাষাবিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রীতিভাজনেষু,

আজ তোমার রেজিস্টার্ড প্যাকেট পেলাম। শ্রীঅরবিন্দের The Future Poetry আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ। সেই বইটির বাংলা অনুবাদ করে তুমি সমস্ত বাঙালী পাঠক-পাঠিকা সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হলে। আর আমাকে এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি পাঠিয়েছ বলে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি ভালো আছ। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

—১৭ই জুলাই, ৯৬

অধ্যাপক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এবং ডীন, কলা অনুষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভবিষ্যতের কবিতা : একটি উজ্জ্বল উপহার

অনুবাদ কি নিছকই ভাষান্তর? ভাষিক রূপান্তরণ যদি অনুবাদকের লক্ষ্য তাহলে রূপান্তরিত শব্দের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কে যুক্ত যে অর্থ তা সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়—মহামতি Steiver-এর এই আশঙ্কা অর্থহীন নয় একেবারে। মহৎ কবিতার অনুবাদ যে একটি অসম্ভব এবং অনুচিত কর্ম এ ব্যাপারে শেলি এবং রবীন্দ্রনাথ সহমত পোষণ করতেন। কিন্তু সে তো কবিতার ক্ষেত্রে যেখানে পাঠক-চৈতন্যের উদ্বোধনই কবির লক্ষ্য। আর যে-ক্ষেত্রে জ্ঞাপন মুখ্য ক্রিয়া? মনে হয় Barbana Godard-এর ব্যাখ্যাই সেখানে সহায়ক,

যাঁর মতে, অনুবাদ হ'ল দুটি প্রক্রিয়ার সম্পর্ক : রচয়িতা-রচনা-গ্রাহক এবং অনুবাদক-রচনা-গ্রাহক। গদার্দ-এর মতে অনুবাদে দ্বিবিধ সঞ্চারকর্মের আদর্শ অনুসৃত হয়—অনুবাদক একই সঙ্গে গ্রাহক এবং প্রেরক; অনুবাদকের ভিতর সঞ্চারিত হয় প্রেরকের বার্তা এবং অনুবাদক সেই বার্তা সঞ্চারিত করে দেন নতুন এক গ্রাহকের মধ্যে। এই তত্ত্বের নিরিখে E. T Bannet তাঁর 'Post-Cultural Theory' বই-এ (১৯৯৩) অনুবাদককে বললেন, 'relay-station' এই relay station-এর একদিকে Source-Text, Source-Language, এবং Source-Writer এবং অন্যদিকে গ্রাহক তথা অনুবাদকের নিজের দেশ, এইভাবে যে-পাঠকৃতি গড়ে ওঠে নবীনতাই তার মূল আকর্ষণ। তখন পরিণত হয় ভিন্নতর সৃষ্টিকর্মে।

অধ্যাপক রামেশ্বর শ' 'ভবিষ্যতের কবিতা' নামে শ্রীঅরবিন্দের 'The Future Poetry' -র যে-অনুবাদ করেছেন তা যেমন নবীন সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর, তেমনি Source-Text, Source-Language এবং Source-Writer-এর কাছে পরম নিষ্ঠাবান। একে সাহিত্য সমালোচনার বই, তার ওপর Source-Writer স্বয়ং অরবিন্দ। অসাধারণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অভিনিবেশ না থাকলে এই অনুবাদ নিছকই ভাষান্তর হতে বাধ্য। প্রথমেই বলতে আমি দ্বিধাহীন যে, রামেশ্বর শ' অক্লেশে পার হয়েছেন দুরূহ দীর্ঘপথ এবং অমৃতময় বাণীকে ভাষান্তরিত করার মুহূর্তে তিনি এক পরম রসিক সুজন।

নতুন জীবনধারায় স্নাত অরবিন্দ ধ্যানগম্ভীর রসিকের ভূমিকায় ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের পাঠ নিয়েছেন বিশ্লেষকের মন নিয়ে, চিন্তা করেছেন 'ফর্ম' ও 'কন্টেন্ট'-এর সম্পর্ক নিয়ে, স্বয়ম্প্রভ মননকে করে দিয়েছেন সুদূরতম সত্যের অভিসারী। যে-অরবিন্দ কাব্য-সাহিত্যকে 'মন্ত্র' সদৃশ মনে করেছেন, সন্ধান করেছেন 'নির্মাণ'-এর মুহূর্তে 'Inspired rhythm' এবং 'Significant image'-এর; সেই তিনি পাঁচটি অংশে বিভক্ত ক'রে আলোচনা করেছেন ইংরেজী কাব্যের নিরিখে, সবিস্তার আলোচনা করেছেন রোমান্টিকতা ও ভিক্টোরীয় কবিবৃন্দ'কে নিয়ে, স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে এবং অনেকখানি জায়গা রেখেছেন ওয়াল্ট হুইটম্যানের জন্যে। এ এক পরমবিস্ময়।

কাব্য ও দর্শনের দিগন্ত দুটি পৃথক—আমাদের সিদ্ধান্ত এরকমই। কিন্তু কবির অনুভব বস্তুর নির্যাসকে দিতে পারে অনন্য এক মর্যাদা, যদি সেই অনুভবে লাগে দর্শনের স্পর্শ। 'সাবিত্রী'র কবি শ্রীঅরবিন্দ তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতের কাছেও যে দুর্বোধ্য তার কারণ 'সাবিত্রী'র কবি যে অধরা মাধুরীকে ছন্দের বন্ধনে ধরতে চেয়েছিলেন তা ছিল Transcendentalism-এর সুনীল মায়া রহস্যময়। অরবিন্দ-দর্শনকে বাদ দিয়ে অরবিন্দের কাব্য নয়। এমনকি 'The Life Divine' তাঁর অবশ্যপাঠ্য যিনি অরবিন্দের কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কিত চিঠিপত্রগুলি পড়বেন অথবা আকৃষ্ট হবেন 'The Future Poetry'-র দিকে। অনায়াস প্রযত্নে কি বুঝতে পারব এই উক্তির নিহিতার্থ —'Delight is the soul of existence, beauty the intense impression. The concentrated form of delight'? কিন্তু যা আমাদের চমকে দিয়েছে তা হল রামেশ্বরবাবু-র অনুবাদ : 'আনন্দই হল সৃষ্টির আত্মা, সৌন্দর্য হল তার তীব্র ভাবচ্ছবি, আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ।' অনুবাদকের

ভূমিকায় অন্য কেউ থাকলে 'soul of existence'-এর ভাষান্তর করতেন 'অস্তিত্বের আত্মা', কিন্তু এই শব্দবন্ধ কিছুরই 'সৃষ্টির আত্মা'-কে ধরতে পারত না। তেমনি অনবদ্য হয়েছে 'concentrated form of delight'-এর বাঙলা 'আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ'। 'form' -এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'রূপ' ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সেটাই সচল। কিন্তু 'ঘনীভূত' র পর 'বিগ্রহ' শব্দের প্রয়োগ চমৎকার একটা 'ব্যালান্স' রক্ষা করেছে। আসলে একটি বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ এককে (word unit) যদি সমতা বজায় না থাকে, তাহলে বাক্যটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন অনুবাদ হয়ে যায় 'ভাষান্তর' মাত্র।

'The Future Poetry'-র অনুবাদক রামেশ্বর শ' তাঁর 'ভবিষ্যতের কবিতা'র জন্য সরকারী ও বেসরকারী পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু পাঠক হয়ত বলবেন 'এহ বাহ্য। আগে কহ আর।' উত্তরে বর্তমান প্রতিবেদক বলবেন, 'অনুবাদক রসিক হলে সৃষ্টি চমৎকার।' রামেশ্বরবাবু অবশ্যই 'রসিক' এবং ফলত 'ভবিষ্যতের কবিতা' স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সৃষ্টির গভীরে স্রষ্টার যে আত্মোৎসর্জনের রহস্য লুকিয়ে থাকে তার সন্ধান মেলে শব্দ ব্যবহারে এবং বাক্যগঠনে। একটু উদাহরণ নেওয়া যাক। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন :

The poet has in him a double personality, a double instrument of his response to life and existence. There is in him the normal man absorbed in mere living who and feels and acts like other, and there is the seer of things. The supernormal man, the super-soul or delight-soul in touch with the impersonal man, with the impersonal and eternal fountains of joy and beauty who creates from that source transmutes by its alchemy all experience into a form of all spirits Ananda'. (P N 231)

রামেশ্বরবাবু এই অংশের যে বঙ্গানুবাদ করলেন, হয়ত, না হয়ত নয়, তাতে অবশ্যই তাঁর ভাষান্তরিত গ্রন্থখানি যে নিছক অনুবাদ নয়, Barbara Godard-এর চাহিদা (আগেই বলা হয়েছে) পূরণ করে এমন জায়গায় উপস্থিত হয়েছে যা অনায়াসে 'source-writer'-এর রচনার প্রতিস্পর্ধী তা মানতে হবে, একটিমাত্র দৃষ্টান্তই (অনুবাদ) সুনিশ্চিতভাবে চিনিয়ে দেবে রামেশ্বর শ' নামক সৎ-অনুবাদককে যিনি স্রষ্টার সহোদর :

"কবি হলেন দ্বৈতব্যক্তিত্বের অধিকারী; জীবন ও জগতের স্পর্শে বেজে ওঠবার জন্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের বীণায় আছে দুটি তার। তাঁর মধ্যে সেই সাধারণ মানুষটি আছে যে শুধু 'দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'তে নিমগ্ন, যার চিন্তা, অনুভব এবং কর্ম সংসারের আরো দশজনের মতোই। আবার তার মধ্যেই আছে বস্তুর সত্যদ্রষ্টা ঋষি, সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরের এক অতিমানব, এক অনন্যসাধারণ আনন্দময় আত্মা—সেই আত্মা আনন্দের ও সৌন্দর্যের নৈর্ব্যক্তিক ও চিরন্তন প্রস্রবণের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেই উৎস থেকেই সৃষ্টি থেকেই সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং তার অপূর্ব রসায়নে মিশ্রিত করে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে আত্মার আনন্দে নব-রূপায়িত করছে।"

এ কি অনুবাদ? না, নতুন সৃষ্টি? 'দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি একেবারে প্রয়োজন মাফিক ঠিক বসিয়ে দিলেন মূলের দাসত্ব-শৃঙ্খল অস্বীকার

করে। শুধু শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়, ছেদ ও যতিচিহ্ন ব্যবহারে স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক। সেমিকোলন চিহ্ন দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন 'The passions can only change into poetic matter when they have been spiritualised in the same bright sources and have undergone the purification, the katharsis, spoken of by the Greek critic : the life values are only poetic when they have come out heightened and changed into soul values.' রামেশ্বরবাবু পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে তারপর লিখেছেন, 'প্রবৃত্তি-প্রবেগও কেবল তখনই কাব্যের উপাদান হয়ে উঠতে পারে, যখন তাকে সেই একই উজ্জ্বল উৎসে এসে আত্মায় সামগ্রী করে তোলা হয়, তাকে পরিশুদ্ধ পরিস্রুত করে নেওয়া হয়।' ইংরেজিতে এখানে 'কমা' চিহ্ন ছিল, কিন্তু অনুবাদে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করে তারপর লেখা হয়েছে, 'একেই গ্রীক সমালোচকরা বলেছেন 'ক্যাথারসিস্'। এরপর পাচ্ছি ড্যাশ্-চিহ্ন দিয়ে—'আবেগের খাদ ছেঁকে চিত্তমোক্ষণ ঘটান।' ইংরেজিতে 'সেমিকোলন' চিহ্ন দিয়ে 'the life values ...' ইত্যাদি লেখা হয়েছে; কিন্তু অনুবাদে পাচ্ছি 'পূর্ণচ্ছেদ' দিয়ে তারপর 'জীবনের যে সব মূল্যবোধ...' ইত্যাদি। ভাষান্তরিত করার মুহূর্তে এই যে স্বাধীনতা তা ত্রুটি নয়, অন্তত এই কারণে যে, দুটি পৃথক ভাষার বাক্যগঠনরীতিই আলাদা। বাক্যগঠনই শুধু নয়, শব্দমাত্রই যে পৃথক পৃথক অর্থদ্যোতনা বহন করে এবং প্রত্যেকটি শব্দই যে এক একটি চিত্ররূপ রচনা করে তা স্পষ্ট বুঝলে ধরতে অসুবিধে হয় না কেন 'The poeys of the Dawn'-এর ভাষান্তর হয় 'ভোরের পাখি'। অধ্যাপক শ' হয়ত বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে রবীন্দ্র-প্রদত্ত অভিধাটি মাথায় রেখেছিলেন; কিন্তু এখানে তার প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। এইভাবেই 'The Breath of Greater life'—অনুবাদ হিসেবে 'মহত্তর জীবনের স্পন্দন' ভালো লাগে। কিন্তু 'The Soul of Poetic delight and Beauty-র অনুবাদ কেন করলেন : 'কাব্যিক আনন্দ এবং কাব্যিক সৌন্দর্যের আত্মা'? দ্বিতীয় 'কাব্যিক' শব্দটা হয়ত বাদ দিলেও চলত। আবার অধ্যাপক শ' 'highest speech'-এর যখন অনুবাদ করেন 'পরাৎপরা বাক্' তখন সুশিক্ষিতজনকেও প্রকৃত অর্থসন্ধানে ব্যাকুল হতে হয়। জানি আমরা অবশ্যই যে, যে-অরবিন্দের ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই অন্তঃপ্রেরণা-জাত তাকে প্রচলিত সহজবোধ্য শব্দের সীমিত আয়তনে বদ্ধ করা অত্যন্ত কষ্টকর তবু 'শাশ্বত নাদশক্তি', 'পরাৎপর', 'বিশ্বচ্ছন্দ', 'বিশ্ব-আত্মা', 'শুদ্ধতম অধ্যাত্ম' যেন শুধু বোধির জগতেই বাঁধা পড়ে যায়। কিন্তু অধ্যাপক শ' সহজ এবং স্বচ্ছন্দ না হলে আমরা জানতে পারতাম না যে, শ্রীঅরবিন্দ কত অসাধারণ নৈপুণ্যে কল্পনাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন : বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা, ভাবনিষ্ঠ কল্পনা, খেয়ালী কল্পনা, নান্দনিক কল্পনা এবং কাব্যকে বিভক্ত করেছেন অজ্ঞাতপূর্ব তিন স্তরে : প্রাণস্তরের বলিষ্ঠ কবিতা, দুর্বার আবেগের কবিতা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির কবিতা। আমাদের জানা ছিল না যে রচনাশৈলীকে এভাবে ভাগ করা যায় : প্রাণময় শৈলী, আবেগময় শৈলী এবং বুদ্ধিনিষ্ঠ শৈলী। অধ্যাপক শ'-র অনুবাদ পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে; 'Savitri', 'The Life Divine' এবং 'The Future Poetry'—এই তিনখানি চিরায়ত রচনা একত্রে গাঁথা তিনটি মণিখণ্ড

এবং শেষোক্ত গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যাপক রামেশ্বর শ'-র সারস্বত জীবনকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধির গভীরতা থেকে উঠে আসা 'The Future Poetry'-র ভাষান্তরিত এই বিগ্রহ যে-মানুষটির এক দশকের কঠিন শ্রমের ফসল হিসেবে উঠে এলো, মনে করি, কোনো পুরস্কারই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিরবধিকালের বাংলাভাষাভাষী পাঠকের কাছে এই বই (ভবিষ্যতের কবিতা) একটি উজ্জ্বল উপহার।

—'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শারদসংখ্যা,
বৈশাখ-আষাঢ় ও শ্রাবণ-আশ্বিন
যুগ্মসংখ্যা, ১৪০৭।

ড্ঃ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, কবি ও প্রাক্তন অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় :—

শ্রীঅরবিন্দ: কবিতার ভবিষ্যৎ

শ্রীঅরবিন্দ ❑ ভবিষ্যতের কবিতা ❑ অনুবাদ: রামেশ্বর শ' ❑ অরবিন্দ আশ্রম ❑ ১১০ টাকা

শ্রীঅরবিন্দের মত একজন সাধক কবির কাব্যদর্শন যে তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনেরই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিযুক্ত হবে, তা বলাই বাহুল্য। স্বকীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির যোগেই তার যে-দার্শনিক সত্তার আগে কবিসত্তার প্রকাশ। এদিক থেকে দেখতে গেলে, অরবিন্দ জীবনের প্রথমার্ধে, যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রে অগ্নিযুগের চরমপন্থী বিপ্লবী, সেই তিনিই তো জীবনের অপরার্ধে সাধক। তাঁর এই দুই পর্বের সন্ধিস্থল বলেও কি ভাবা চলে তাঁর 'The Life Divine' (1939) আর Savitri-কে (1950)? যথাক্রমে জীবনদর্শন ও কাব্যের একটি থেকে আরেকটি রচনাকাল/প্রকাশকালের দূরত্ব দুটি প্রান্তের হলেও—তারা যেন এই এক মহৎ কবিসত্তারই সন্ধিস্থলরূপে আরোপিত। যেন সাধকের ভাববিগ্রহ।

কী জানি, কাব্য হিসেবে 'সাবিত্রী'ই শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যতের কবিতার দিকে পৌঁছানোর প্রথম দরজা কিনা। ১৯১৭-২০ সালে তিনি 'Arya' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর The Future Poetry লেখেন। সেটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩-য় এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। বর্তমান বঙ্গানুবাদটি সেই সংশোধিত সংস্করণ অনুসরণেই সম্পন্ন হয়েছে। আইরিশ কবি-সমালোচক জেমস কাজিন্সের new ways in English Literature গ্রন্থটির একটি সমালোচনা লিখতে গিয়ে, তাঁর ভবিষ্যতের কবিতা বিষয়ে লেখার পরিকল্পনা জাগে। আসলে কাজিন্সের উক্ত গ্রন্থেই এই কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে: ইংরেজি কাব্যের তথা সমগ্র বিশ্বের কাব্যসাহিত্যর ভবিষ্যৎ কী? এবং সে বিষয়ে ইংরেজি সাহিত্য, ভারতীয় মন ও অন্যদিকে ভারতবাসীর নিজস্ব ধাত

কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করবে? অতএব, কাজিন্সের বইটিই এক অর্থে শ্রীঅরবিন্দের 'The Future Poerty' লেখার প্রেরণা উৎস। এবং সেই উন্নতমানের বইটির রূপরেখা সামনে রেখেই, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খতায়, ভবিষ্যতের কবিতাবিষয়ক প্রস্তাবগুলি একে একে তুলে ধরেন।

বিষয়ক্রম অনুসারে, সে-রচনাধারার প্রধানত দুটি দিক। এক, তার কাব্যতত্ত্ব ও দর্শনের দিক এবং দুই, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ইংরেজি কবিতার চসারের (চতুর্দশ শতাব্দী) যুগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন আধুনিক যুগের (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত) বিশ্লেষণ। নির্বিশেষ রূপে কবিতার তত্ত্ব শিল্প ও দর্শন প্রসঙ্গে, তিনি 'মন্ত্র' 'কাব্যের আত্মা', 'ছন্দ স্পন্দন ও গতিপ্রবাহ', 'রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু', 'কবির সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র', 'কাব্যের জাতীয় বিবর্তন', 'কবিতাব আর্দশ ভাব', 'কাব্যসত্যের সূর্য', 'মহত্তর জীবনের স্পন্দন', 'কাব্যিক আনন্দ ও কাব্যিক সৌন্দর্যের আত্মা', 'আত্মার শক্তি', 'কাব্যের আত্মা ও রূপবন্ধ', 'বাণী ও আত্মা' ইত্যাদি বিষয়গুলি গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভবিষ্যতের কবিতাভাবনায় এই তত্ত্বদর্শনের উপস্থাপনার প্রবণতাই বুঝতে সাহায্য করে তিনি ঠিক কী ধরনের কবিতার আধ্যাত্মিকতার কথা বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ যে প্রধানত ইংরেজি কাব্যের রূপরেখা অবলম্বনেই তাঁর ভবিষ্যতের কবিতার সন্ধান করেন, তা হয়ত এ-ক্ষেত্রে একটা নিমিত্ত-কারণ। আসলে বিশ্বসাহিত্যের তুলনামূলক প্রেক্ষাপটেই তাঁর এই অন্বেষা একটা নতুন মাত্রা পায়। সেখানে বৈদিক সাহিত্য থেকে গ্রীক লাতিন সংস্কৃত কাব্যপ্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে ফরাসি জার্মান রুশ ও অন্যান্য সাহিত্যপ্রসঙ্গও। আছে ভারতীয় চিত্তের ক্লাসিক অবদান থেকে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ও সুফি সাধনার কথা এবং আধুনিক পর্বে রবীন্দ্রসৃষ্টি পর্যন্ত প্রসঙ্গের (অবশ্যই গীতাঞ্জলি পর্ব পর্যন্ত) বিশেষ উল্লেখ।

বৈদিক 'সত্য' বলা যাক 'কাব্যসত্য', ইনট্যুইটিভ। শ্রীঅরবিন্দও সেই বৈদিক ঐতিহ্যেই কবিকে 'দ্রষ্টা' বলে মেনেছেন। যেমন গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যের কাব্যময় প্রকাশকে তিনি ঐতিহ্যবাদীর মতই 'মন্ত্র' রূপে গ্রহণ করেন। আর এই মন্ত্রেরই মতন হবে তাঁর প্রস্তাবিত ভবিষ্যতের কবিতা। এজন্য চাই একযোগে তিনটি উপাদানের তীব্রতা: 'ছন্দোময় গতিপ্রবাহের তীব্রতা', 'বাণীরূপ ও চিন্তাবস্তুর-অর্থাৎ রচনাশৈলীর সর্বাধিক তীব্রতা' এবং অন্তরাত্মার সত্যদর্শনের সর্বাধিক তীব্রতা।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক যুগের ছন্দোমুক্তির সাধনাকে এক অর্থে স্বাগত জানান। কবিতায় এই মুক্তবন্ধ স্বাধীন রূপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে তিনি হুইটম্যান ও কার্পেন্টারের কথা বলেন। বলেন: রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকবিতাগুলির যে-সব ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন (অর্থাৎ ইংরেজি গীতাঞ্জলি), সেগুলি vers libre-গোত্রীয় কবিতার অবদান। আর কাব্যের গোটা কাঠামোটাকে একেবারে না ভেঙে কাব্যকলাকে শুধু নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহার করেই যে এটা করা সম্ভব, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল মাতৃভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতাগুলিই। তিনি

স্পষ্টভাবে বলেছেন: প্রথানুগত ছন্দোবন্ধন কোনও 'সীমার বন্ধন' মাত্র নয়, বরং তা প্রকৃত মুক্তবন্ধে পৌঁছানোর যথার্থ সোপান। এই তাৎপর্যে, তাঁর 'কাব্যের ছন্দোস্পন্দের' সঙ্গে 'বিশ্বছন্দের' তুলনা; এবং সেটিও বৈদিক ঐতিহ্যেই। মুক্তছন্দের সঙ্গে তিনি যে গ্রীক কোরাসের তুলনা করেন তা থেকে আমরা একটা নতুন পথের হদিস পাই।

শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থটি আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের পক্ষে একটি নবপ্রস্থানের নির্দেশক। সমালোচক যদি কবি হন এবং সেই মহৎ কবির বোধের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিসীমা যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা এই বই না পড়লে বোঝা যাবে না। ইংরেজি কবিতার রূপরেখার সমালোচনায় তিনি প্রায় বিশ্বপরিক্রমণের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিত্ব ও মনীষা, একই সঙ্গে তাঁর ভাবুকতা ও যুক্তিপরম্পরার অব্যর্থ উদাহরণে, এই সমালোচনার ধারাকেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই জিনিস বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পর্ব, শ্রীঅরবিন্দের দূরবর্তী সাহিত্যসাধনাতেই—তখনকার মত একটা তুলনামূলক সমালোচনারীতির বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছে। হ্যাঁ, দূরবর্তী, কেননা তাঁর ইংরেজি কবিতা আলোচনার সমান্তরে, বাংলা কবিতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ, এ-ক্ষেত্রে ন্যূনতম। মাতৃভাষা-অভিমানী পাঠক, যাহোক অনূদিত এই 'ভবিষ্যতের কবিতা'কে, অতঃপর, তার একান্তই নিজের মনে করে যথাসম্ভব নিশ্চিত হবেন। কারণ 'The Future Poetry'-র এই বঙ্গানুবাদ প্রায় মূলের আস্বাদযুক্ত। এই দুঃসাধ্য অনুবাদকর্মে বামেশ্বর শ' একপ্রকার অসামান্য ও বিস্ময়কর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। অধিকন্তু, তিনি অতি যত্নভরে ও পরিশ্রমে 'পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ, নাম-পরিচয় ও বিষয় নির্দেশিকা'র একটি বর্ণনামূলক দীর্ঘ তালিকা যুক্ত করে সাধারণ পাঠকের যথেষ্ট সুবিধা করে দিয়েছেন। এমন একটি অমূল্য গ্রন্থের পক্ষে প্রচ্ছদপটের দীনতা ও শক্ত মলাটের অভাব কিন্তু দুঃখজনক।

—'আজকাল,' ২৫/৭/১৯৯৭

ডঃ সত্যনারায়ণ দাশ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

'ভবিষ্যতের কবিতা' — নন্দনতত্ত্বের নতুন দিগন্ত

'ভবিষ্যতের কবিতা' শ্রীঅরবিন্দের The Future Poetry-র অনুবাদ। দি ফিউচার পোয়েট্রি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত 'আর্য' ইংরাজী মাসিক পত্রিকায়। ডিসেম্বর ১৯১৭ থেকে জুলাই ১৯২০ পর্যন্ত বত্রিশটি কিস্তিতে। আয়ার্ল্যান্ডের সাহিত্যিক আন্দোলনের পুরোধা এবং কবি জেমস কাজিন্সের New Ways in English Literature বইটির সমালোচনাকে উপলক্ষ করে দি ফিউচার পোয়েট্রির সূত্রপাত। কিন্তু সম্পাদক সমালোচক অচিরেই সে উদ্দেশ্য ত্যাগ করেন। সমালোচ্য বইখানি তাঁর ভাবনাকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করে যে তিনি একখানি পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করার পরিকল্পনা করেন যেখানে জীবন ও শিল্প সম্পর্কিত নিজের সমস্ত ধ্যান-ধারণা সবিস্তারে এবং সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ

করতে পারবেন। দি ফিউচার পোয়েট্রি গ্রন্থ সমালোচনার উপলক্ষকে ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা। দার্শনিক কবির কাব্য চিন্তার ফসল।

দি ফিউচার পোয়েট্রি দু ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে চব্বিশটি এবং শেষভাগে আটটি প্রবন্ধ। প্রথমভাগের কিছু প্রবন্ধ ইংরাজী সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের প্রতিভাবান কবিদের কবিকর্ম ও কবি ধর্মের বিশ্লেষণ। এই ভাগের বাকি কয়েকটিতে এবং শেষ ভাগের সব লেখাগুলির উপজীব্য নন্দনতত্ত্ব। প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যাদর্শ বিষয়ে কেন্দ্রিক হয়েছে তাঁর আলোচনা।

এলিজাবেথীয়, রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় পর্বের ইংরেজ সাহিত্যিকদের কবিস্বভাব, কাব্য ভাষা ও ছন্দ নিয়ে আলোচনার সহায়তায় ইংরাজী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে যুগের ভাবনাকেও ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সমকালের কবিতার অর্থাৎ উদয়মান আধুনিক কবিতার প্রবণতা এবং প্রকরণ, তার উৎকর্ষ ও ব্যর্থতা তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছে। আধুনিকদের সঙ্গে সব ব্যাপারে তিনি একমত নন, কিন্তু তাঁদের কাব্য প্রকরণে তিনি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। আধুনিক কবিতার দেহ ও আত্মার পরিবর্তনের মধ্যে তিনি যুগের বাণীকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমকালীন কবিতার গদ্যছন্দ বিচারে তাঁর কবিদৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট। হুইটম্যানের কবিতার ভাষা এবং তার ছন্দস্পন্দ সম্পর্কিত আলোচনা লেখকের বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, অনুবাদে প্রযুক্ত গদ্যছন্দের উপযোগিতা, বিশিষ্টতা এবং গুরুত্ব প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই প্রথম ভাগে কবিদের বিশিষ্টতা স্বতন্ত্র ও সূক্ষ্মভাবে যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি যুগের প্রতিনিধিরূপে তাঁদের কণ্ঠস্বর তিনি চিনে নিতে পেরেছেন। তিনি দেখেছেন কোনো কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর মধ্যে আকস্মিকতার স্থান নেই। যুগ-পারম্পর্যের ভাবনার সুতোয় তাঁরা প্রত্যেকে গাঁথা। দ্বিতীয় ভাগের লেখাগুলি নান্দনিক চেতনায় উজ্জ্বল। সাহিত্যের উদ্দেশ্য, কাব্যের সত্য, কাব্যাত্মা ও রূপবন্ধের সমৃদ্ধ কাব্যাত্মা ও বাণীর সম্পর্ক, কাব্যিক আনন্দ ও সৌন্দর্য ইত্যাকার জটিল বিষয় এই অংশের আলোচনার পরিধিভুক্ত। সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁর কিছু কিছু ধারণা গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত। ক্রোচের মতে তিনিও মনে করেন শিল্প সৃষ্টি হলো বোধিসঞ্জাত ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের মতোই কাব্য নিছক নিরাবরণ বাস্তব প্রতিফলনের পক্ষপাতী নন তিনি। তাঁর চিন্তায় কাব্যে কল্পনার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন শিল্প বাস্তবকে একটু উর্ধ্বায়িত না করে পারে না, শুধুই হুবহু পুনরাবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।' (পৃঃ ১৭৫)। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেন না আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। (সাহিত্যের পথে)। তবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ একটি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন মনে হয়। সাহিত্যের নিরপেক্ষ ছাত্র হিসাবে তিনি মানেন সৌন্দর্য এবং আনন্দই হলো কাব্য ও শিল্পের আত্মা

এবং উৎস। মানুষকে বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিদান করাতে এবং তার জীবনে সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই কাব্য ও শিল্পে পরম তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি উচ্চারণ করেন: 'কাব্যের কাজ হলো কোন বিশেষ ধরনের সত্যের শিক্ষাদান নয়, আদৌ কোন শিক্ষাদানই নয়, জ্ঞানের তপস্যাও নয়, কিংবা কোন ধর্মীয় বা নৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিও নয়, বরং সৌন্দর্যকে বাণীমূর্তি দান করা এবং আনন্দবিধান করা।' তবে রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি একটু স্বতন্ত্র— বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁর মানস-সান্নিধ্য। সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও এ রকম সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আর্টের দাবি এবং সমাজ-কর্তব্যের মধ্যে তাঁকেও একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা করতে হয়েছিল। তাঁকে বলতে হয়েছিল, নীতিশিক্ষা কাব্যের উদ্দেশ্য নয় সত্য, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যা উদ্দেশ্য কাব্যেরও তাই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি ঘটানো। কবিরা 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতে চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।' এ ব্যাপারে শেলীর ভাবনাব সঙ্গে দুজনের চিন্তার মিল দেখতে পাই। শেলী মনে করতেন, সাহিত্যের প্রাথমিক ধর্ম তার কল্পনাকার্য, কিন্তু তার পরিণাম শিক্ষাদান। সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেয় না কিন্তু সাহিত্য থেকে মানুষের যে নৈতিক উন্নতি ঘটে এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। পূর্বসূরীদের মতো শ্রীঅরবিন্দও সাহিত্যের দুটি উদ্দেশ্যের তত্ত্ব প্রচার করেছেন : একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। এই কারণেই সমকালীন ইংরাজী কবিতার সমস্ত কিছুকে তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করতে পারেন নি। আধুনিক মন সাহিত্যে জীবনের উপরে, মানবতার উপরে, আমাদের কর্ম ও পরিশ্রমের উপরে জোর দেয়। তিনি একে অযৌক্তিক মনে করেন না। কিন্তু এখানেই তিনি থামতে চান না। তিনি বলেন : 'কাব্য তখনই একান্ত করে নিজেকে আবিষ্কার করবে সে যখন তার ঐতিহ্যের নিজস্ব ধারায় পুরোপুরি ফিরে আসবে, যখন সে এই পাঁচটি জিনিসের (সত্য, সৌন্দর্য, আনন্দ, জীবন ইত্যাদিব) মধ্যে সমৃদ্ধতম সামঞ্জস্যে এসে উপনীত হবে এবং সেই সামঞ্জস্যে থাকবে তাদের পর্যাপ্ত মাধুর্য জ্যোতি ও শক্তি। কিন্তু সেটা কেবল তখনই পুরোপুরি সম্ভব, যখন কাব্য সূক্ষ্ম-দর্শনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে গান ধরবে এবং আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপকতম বিস্তৃতির মধ্যে পক্ষ বিস্তার করবে। (পৃঃ ২৭০)

তিনি জানেন ভবিষ্যতের কবিতা এই মহান লক্ষ্যের দিকে এগোবে। ইংরাজী কাব্যের বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে দি ফিউচার পোয়েট্রি সমালোচনামূলক কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন মাত্র বলে মনে করলে ভুল করা হবে। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রতিটি প্রবন্ধ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। গ্রন্থ-সমালোচনার উদ্দেশ্য লেখক ত্যাগ করেছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যের পরিচয়দানও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরাজী সাহিত্যের আলোকে তিনি সাহিত্যের আরও এক গভীরতম তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই তাঁর সেই জিজ্ঞাসার পরিচয় পাই। তিনি উত্তর খোঁজেন এই প্রশ্নের : কোন্ মহত্তর করণীয় রয়েছে ভবিষ্যতের কবিতার সামনে যা এখনো পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন হয়েছে অত্যল্পই, —এবং সেই নতুন প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে একদিকে ইংরাজী সাহিত্য, অন্যদিকে

ভারতীয় মন ও ভারতবাসীর নিজস্ব ধাত? ইংরাজী সাহিত্যের বিভিন্ন কালপর্বের সাহিত্যিকদের রচনার পরিচয় দিতে দিতে তিনি মানবচিন্তার অগ্রগতির ধারাটি খুঁজে নেন এবং সেই আলোকে ভবিষ্যতের কবিতার স্বরূপটিকে চেনার চেষ্টা করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন সাহিত্যাদর্শ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেও একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াস। পূর্বাপর সাহিত্য ধারার অনুসৃতিতেই নতুন কাব্যাদর্শ ও কবিতা উঠে আসবে এই প্রত্যয়ে তিনি স্থির : 'নতুন যুগের এই কাব্যের সামনে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই তার বিষয়বস্তু রূপে উন্মোচিত হবে— প্রকৃতি, মানুষ এবং সমস্ত লোক লোকান্তর, সীমা এবং অসীমের রাজ্য,— সবই তার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। কোন পরিসমাপ্তি নয়, এমনকি কোন মহান পরিসমাপ্তিও নয়, কোন একটি মাত্র ক্ষেত্রে এসে ফুরিয়ে যাওয়া নয় — ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে যা তুলে ধরে তা হলো বরং একটা নতুনতর উর্ধ্বতর অনন্ত ক্রমবিকাশ, মানুষের শক্তি সত্তার, তার কর্ম ও সৃষ্টির এক দ্বিতীয় জন্ম, এক মহত্তর জন্মান্তর।' (পৃঃ ২৫৭)

লেখকের সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে পাঠকের কোনো কোনো বিষয়ে পার্থক্য ঘটতে পারে। সাহিত্য তত্ত্ব বিষয়ক তাঁর কিছু অভিমত পাঠক স্বীকার না-ও করতে পারেন, কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁর সমালোচনা কবিতার ব্যবচ্ছেদ নয়। কবির প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ন। যুগের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে কবিকে তিনি বিচার করেছেন এবং তার মারফত যুগের ভাবনাকে অনুধাবন করেছেন। যুগপরম্পরার সাহিত্য পাঠের শেষে জীবন ভাবনার ক্রমিক পরিবর্তন ধারা অনুসরণ করে আগামীকালের কবিতা সম্পর্কে নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রজ্ঞা, মনস্বিতা, কবি দৃষ্টি এবং জীবনবোধ সাহিত্য সমালোচনায় একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

মূল্যবান এই বইখানির বাংলা অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কৃতী অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ' বইখানির অনুবাদ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। শ্রীঅরবিন্দকে সাহিত্য সমালোচকরূপে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত করানোর জন্যই তিনি ধন্যবাদার্হ তা নয়, বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় লিখিত বিশিষ্টতাপূর্ণ একটি অসাধারণ সমালোচনা গ্রন্থের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এজন্যই তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। শুধু তাই নয় অনুবাদের কাজে অধ্যাপক শ' ঈর্ষণীয় দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ মূল লেখকের মেজাজ ও মানসিকতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে। তাঁর ভাষা, কাব্যরস ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সিঞ্চিত; কিন্তু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। বইখানি পড়ার সময় মনেই হয় না যে এটি অনুবাদ গ্রন্থ। মৌলিক সমালোচনা গ্রন্থ পাঠের আনন্দ পাওয়া যায় এতে। অনুবাদক বাংলার সহজ বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ করে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। বাংলার কবিতার অতিপরিচিত ছত্র ও ছত্রাংশের যথাযথ ব্যবহারও তাঁর অনুবাদে সামান্যতম ইংরাজী গন্ধ মুছে দিতে সাহায্য করেছে। ইংরাজী সমালোচনাগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন কাজ, বিশেষত সে

লেখা যদি আবার কোনো কবি-দার্শনিকের হয়। ড. শ' সেই দুরূহ কাজ প্রশংসনীয়ভাবে সম্পাদন করেছেন কঠোর শ্রম, গভীর নিষ্ঠা-অধ্যবসায় এবং গভীরতর কাব্যবোধ দিয়ে। সফল অনুবাদকের কুশলীপনা এবং রসজ্ঞতা বইখানিকে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তুলেছে। বর্তমান আলোচনায় উদ্ধৃত অংশগুলি তাঁর অনুবাদগ্রন্থ থেকে নেওয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা তাঁরই বইয়ের।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভবিষ্যতের কবিতা 'দি ফিউচাব পোয়েট্রি'র দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৮৫) অনুবাদ। মূলের টীকা টিপ্পনী পরিশিষ্টের অনুবাদও সংযোজন করে অনুবাদক এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। বইখানির আরও একটি গুণ, মুদ্রণপ্রমাদ এতে একেবারেই নেই। তবে প্রচ্ছদটি একটু ব্যঞ্জনাময় হলে ভালো হতো। অনুবাদ গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার জন্য ড. শ'-কে আবার কৃতজ্ঞতা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশককেও।

— গণশক্তি, ১০/৮/১৯৯৭

ডঃ শতঞ্জীব রাহা, রীডার ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অন্বেষা বিদ্যা বিনয় ব্যক্তিত্ব

এ বছর বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক রামেশ্বর শ'। শ্রীঅরবিন্দের ধ্রুপদী গ্রন্থ 'দি ফিউচার পোয়েট্রি'র বাংলা অনুবাদ 'ভবিষ্যতের কবিতা' তাঁকে এই সম্মান এনে দিল। তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তিতে নিঃসংশয়ে আমরা সবাই আনন্দিত। এই গ্রন্থের জন্য অধ্যাপক শ' আরও একটি সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন— 'শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার'। পুরস্কারটি দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি। দু'টি পুরস্কারেরই অর্থমূল্য দশ হাজার টাকা।

অথচ বঙ্গভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয় ......

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁর জন্মগত অধিকার।

জন্মেছিলেন ১৯৩৬ সালে হালিশহরে। পিতামহর আমলে বিহার থেকে এসে বসতি করেছিলেন হালিশহরের গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে শ' পরিবার। সেই থেকে তাঁরা বঙ্গেই আছেন। তবু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য হিন্দীভাষী পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘপথ, কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে।

মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় মা মারা যান। বাবা বাইরে চাকরি করতেন। একান্নবর্তী পরিবারের আয় মূলত ছিল ব্যবসা থেকে। কাকা দেখাশোনা করতেন বাচ্চাদের। আর পরিবারে আশ্রিত ছিলেন বাবার এক মামিমা। তাঁর কাছ থেকে শৈশবে যে মাতৃস্নেহ পেয়েছেন, সেকথা বলতে গিয়ে আজও ড. শ'-র স্মৃতিময় কণ্ঠ মেদুর হয়ে ওঠে।

হালিশহর হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি চলে আসেন নবম

শ্রেণীতে 'গরিফা হাইস্কুলে'। পরিবারে 'উচ্চ শিক্ষিত কেউ ছিলেন না। প্রায় প্রথম প্রজন্মে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা। ফলে বাড়িতে পড়াশোনায় সাহায্য করার কেউ ছিলেন না। পরিবারের আর্থিক অবস্থায় প্রাচুর্য ছিল না, সাচ্ছল্য ছিল মোটামুটি। হালিশহর স্কুলের শিক্ষক শ্যামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে এসে যত্ন করে পড়াতেন শ'-পরিবারের ছেলেদের। অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলার ভিত তাঁর হাতেই মজবুত হয়েছিল মেধাবী বালকের।

কিন্তু শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা পড়ার বই নয় হালিশহরের তৎকালীন পরিবেশের মধ্যেই ছিল মানুষ হওয়ার উপাদান। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের মতো হালিশহরও পুরোনো জায়গা, গঙ্গাতীরবর্তী বলে সমৃদ্ধ, বর্ধিষ্ণু এবং বনেদীও বটে, অন্তত মানসিকতার দিক দিয়ে। এই শহরের, সেই পাঁচের দশকে, ঐ অঞ্চল ছিল শান্ত, গাছগাছালিতে ভরা, কাছেই ছিল কবি রামপ্রসাদের ভিটে — প্রায় তীর্থস্থান। ছেলেবেলাতেই শ'-পরিবারের ছেলেরা স্থানীয় খেয়ালি সংঘের সদস্য হয়েছিলেন। সেখানে পূর্বতন অনুশীলন সমিতির আদর্শ অনুসৃত হতো, হতো লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ব্যায়াম। খেয়ালি সংঘের পরে মিলনী সংঘ। সব মিলিয়ে আদর্শবাদী পরিবেশ। মানুষ হওয়ার ভিত ভালোভাবেই স্থাপিত হয়েছিল।

হালিশহর থেকে গরিফা হাইস্কুলে গিয়ে অন্য পরিবেশ। সেখানে পড়াশোনার ব্যাপারটি জমজমাট। প্রতিযোগিতাও যথেষ্ট—ভালোভাবে পড়তে হবে, ভালো ফল করতে হবে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগ পেয়ে রামেশ্বর পড়তে গেলেন নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে আই. এ.। তখনই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ পড়াশোনার লক্ষ্য—বাংলা পড়তে হবে। মূলত সেই কারণেই পড়তে গেলেন বঙ্কিম কলেজে।

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ—আজকের অন্যতম পরিচিত অন্যধারার গল্পকার তিনি তখনই বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল বা আর. এস. পি.র ছাত্রফ্রন্ট প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন বা পি. এস. ইউ.-র নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সাহিত্য বিষয়েও তিনি তখন পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর বাড়িতে সাহিত্যের আড্ডায় হাজির হয়ে রামেশ্বর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তরুণ অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাহিত্যের প্রতি টান আর এই পরিবেশ তাঁব ভবিষ্যৎ পড়াশোনার লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছিল। সরোজবাবুর পরামর্শে আই. এ. তে স্পেশাল বেঙ্গলি নিলেন রামেশ্বর। পরীক্ষায় এবারও পেলেন প্রথম বিভাগ।

বাংলা সাম্মানিক বিষয়সহ ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক, আলোচক ও প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখকে। সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজি বিভাগে তারকনাথ সেনের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজি বিভাগে ক্লাস করা ছিল রামেশ্বরের এক নেশা। জানার আগ্রহ ছিল অন্তহীন, ফলে খ্যাতনামা অধ্যাপকদের কাছে ইউরোপীয় সাহিত্যের জ্ঞান ও রস পাবার আশায় লুকিয়ে লুকিয়ে ক্লাস করতেন তিনি।

প্রেসিডেন্সি থেকে সাম্মানিক বাংলা পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখান থেকে বাংলায় এম.এ পাশ করেন রামেশ্বর। তাঁব ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার চমকপ্রদ কাহিনীর

প্রকৃত সূচনা তখনও হয় নি। এম.এ. পাশ করে কাঁথি পি.কে. কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে গেলেন তিনি। এদিকে গবেষণার কাজ করছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ও আলোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে। বিষয়? বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — মহাগ্রন্থটির লেখক ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে উপন্যাস নিয়েই কাজ। দুটি অধ্যায় কাজ হতে হতেই ড. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন। কাজ থেমে গেল স্বভাবতই। পরে অবশ্য 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস' নামে তাঁর যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তা তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজেরই পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ। হ্যাঁ, তখন পর্যন্ত কথাসাহিত্য তথা উপন্যাসই ছিল তাঁর প্রথম পছন্দের বিষয়।

১৯৬৮ সাল নাগাদ সরকারি কলেজে এলেন—কৃষ্ণনগর কলেজ। নতুন করে পড়লেন ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ও. ডি.বি. এল। নতুন করে এই পড়া তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল বলা যায়। ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি অনুভব করলেন তীব্র আকর্ষণ।

কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনাকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পরীক্ষা দেবেন বলে স্থির করলেন। কাজটা সহজ ছিল না। তবু তারই মধ্যে চার বছর অক্লান্ত শ্রম করেছেন তিনি। একদিকে কলেজ, অন্যদিকে সুযোগ পেলেই কলকাতায় গিয়ে রেগুলারদের সঙ্গে ক্লাস করা।

গ্রীক্, পার্সিয়ান, গথিক, ল্যাটিন—এসব সাহিত্যের মূল, তাব অনুবাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা-টিপ্পনী—নিয়মিত ক্লাস ছাড়া এসব পাওয়া সম্ভব ছিল না। বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক সত্যস্বরূপ মিশ্র তখন এসব পড়াতেন। রামেশ্বর এসব ক্লাস করার জন্য কৃষ্ণনগর-হালিশহর-কলকাতা ছুটোছুটি করতেন। ১৯৭২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হলেও ৭৩ শতাংশ নম্বরসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক ও খেন্তমনি নগেন্দ্রলাল রৌপ্য পদক।

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার শুরুটা এমন ভাবে হলেও তা চলল ধারাবাহিকভাবে। অল্পদিনের মধ্যেই জার্মান ভাষায় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা পরীক্ষায় যথাক্রমে ৮৫ ও ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেলেন। তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত প্রণবেশ সিংহরায়ের অধীনে জার্মান ও বাংলা ভাষায় তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব (এ কম্‌প্যারেটিভ স্টাডি ইন দি ফোনোলজিক্যাল সিস্টেমস্ অব বেঙ্গলি অ্যান্ড জার্মান) বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী. পেলেন ড. রামেশ্বর শ'।

ইতিমধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র বদল হয়েছে। তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে চলে এসেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপনার মূল বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাষাতত্ত্ব তথা ভাষাবিজ্ঞান। নিজের চেষ্টায় ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ভেবেছেন ও চর্চা করেছেন বহুদূর পর্যন্ত (গ্রন্থও রচনা করেছেন: 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য

সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন')। দেশীয় ও ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বও হয়ে উঠেছে তাঁর আগ্রহ ও গভীর চর্চার বিষয়।

অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ'র জীবনের আর একটি বড়ো দিক তাঁর আকৈশোর শ্রীঅরবিন্দ অনুধ্যান। ১৯৫৬ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে প্রায় হঠাৎই গিয়েছিলেন পণ্ডিচেরীতে। ফিরে আসার পর, বিশেষ করে কলকাতার ছাত্রজীবনে যেমন হস্টেলের আড্ডায় তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আদান-প্রদান ঘটেছিল, তেমন কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির ও শৃন্বন্তুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল—সে যোগাযোগ আর কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি।

অধ্যাপক শ'র অন্বেষা অধ্যবসায় পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থটির প্রস্তুতিপর্বের দিকে তাকালে। ১৯৫৬-এ প্রথমবার পণ্ডিচেরী গিয়ে সঙ্গে করে এনেছিলেন সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের পর্বতায়তনিক কাজ 'দি ফিউচার পোয়েট্রি' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি পাঠ করে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি, সাহিত্য ও নন্দন-তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দর গভীর জ্ঞান, মনীষা ও অধ্যয়নের সমুদ্র-বিস্তৃত জগৎটির পরিচয় পেয়ে। তখনই গ্রন্থটির অনুবাদের ইচ্ছা জাগে তাঁর মধ্যে। ১৯৬৫ সালে ড. শ' দিল্লী যান সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় সচিব পদের জন্য সাক্ষাৎকারে আহূত হয়ে। সেখানে সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা হলো গ্রন্থটির অসাধারণত্ব নিয়ে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ড. শ'কেই অনুবাদে উৎসাহিত করলেন।

শুরু হলো অনুবাদের কাজ।

নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে অতি জটিল, বিশ্বসাহিত্য মন্থন করা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার ধ্রুপদী সাহিত্যের বহুল উদাহরণ সমন্বিত 'দি ফিউচার পোয়েট্রি'র অনুবাদ সহজ ছিল না। একটু একটু করে পাঁচ-ছয় বছর ধরে চলল কঠোর শ্রমে অনুবাদের কাজ। ধারাবাহিকভাবে অনুবাদটি প্রকাশিত হলো পত্রিকায়। কথা ছিল শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবর্ষে প্রকাশিতব্য বাংলা রচনাবলীতে অনুবাদটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু মধ্যপথে প্রকাশনার জন্য পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন ড. শ'। কিন্তু বিষয়টি যথেষ্ট অকাদেমিক নয় বলে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পেয়েছিলেন তিনি। পরে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে গ্রন্থাকারে 'ভবিষ্যতের কবিতা' প্রকাশিত হবে ঠিক হলো! কিন্তু পণ্ডিচেরী থেকে ড. শ'-কে জানানো হলো যে, ইতিমধ্যে 'দি ফিউচার পোয়েট্রি'র শ্রীঅরবিন্দকৃত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। অধ্যাপক শ' তৎক্ষণাৎ সেই পাণ্ডুলিপির কপি আনিয়ে নতুন করে অনুবাদের কাজ শুরু করলেন। এবার লাগলো দুবছর সময়।

তাঁর অনূদিত 'ভবিষ্যতের কবিতা'কে এক ধ্রুপদী গ্রন্থের ধ্রুপদী অনুবাদ বলা যায়, যা আদৌ আক্ষরিক অনুবাদ নয়, শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতাত্ত্বিক বোধ ও অভিপ্রায়কে বাঙালি পাঠকের জন্য অতি সরসভাবে পরিবেশন। বস্তুত অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক এর সঙ্গে মিশিয়েছেন নিজের বোধি ও মননকে, নিজের চিন্তা ও হৃদয়ের উত্তাপকে। সম্ভবত

এই কারণেই গ্রন্থটি প্রায় সমস্ত পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছে, প্রশংসা করেছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ প্রমুখ বিদ্বদ্জন।

এর আগেও অধ্যাপক শ' বহুমুখী মনীষার পরিচয় দিয়ে একদিকে শ্রীঅরবিন্দর দর্শন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ রচনার জন্য আমেরিকার সানফ্রানসিস্কো থেকে কালচারাল ইন্টিগ্রেশন ফেলোশিপ এবং শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে ভারত সরকারের শিক্ষা তথা মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস্ আয়োজিত ইন্টারন্যাশানাল ইনস্টিটিউট ইন্ ফোনেটিকস্-এ অংশগ্রহণ করে ধ্বনিতরঙ্গ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

সমস্ত জীবন জ্ঞানান্বেষণে কাটালেও এরই মধ্যে অধ্যাপক শ' কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, আর্টস্ ও কমার্স ফ্যাকাল্টির ডিনের মতো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। একদা এশিয়াটিক সোসাইটি, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান'—প্রকল্পের বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর সদস্য। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পাঠদান করে চলেছেন বিরল ও অনন্য শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর রামেশ্বর শ'।

অতিমাত্রায় মৃদুভাষী অধ্যাপক শ'-র ক্ষেত্রে 'বিদ্যা বিনয় দান করে'—বাক্যটি আদৌ আপ্ত বাক্য হয়ে যে থাকে না তা যাঁরা তাঁকে চেনেন তাঁরা নিঃসংশয়ে জানেন। ঈর্ষাতাড়িত মধ্যবিত্ত সমাজে যারা তাঁর দিকে বাঁকাচোখে তাকিয়েছে, তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের বর্মে দিতে চেয়েছে অক্ষম খোঁচা—তাদের ক্ষেত্রেও তাঁর ভদ্রতা ও সৌজন্য কখনও চিড় খায় নি। অসামান্য গুণগ্রাহী তিনি। ছাত্রদের মধ্যে সামান্যতম গুণের প্রকাশ তাঁকে কী পরিমাণে আনন্দিত করে স্নেহভাজনরা তা উপলব্ধি করেছেন। আব প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাঁর নিজের উপলব্ধি—'আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়।' প্রথাগত কর্মজীবন থেকে অবসরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও তাঁর অন্বেষণ শেষ হয় নি। নানান বিদেশী ভাষার অনুশীলন করছেন তিনি, ইচ্ছা বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, জার্মান, ইটালি ইত্যাদি ভাষার তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনার, শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনাও তাঁর আর এক পরিকল্পনা। 'সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' নামে ভাষাবিজ্ঞানের মতো নীরস বিষয়ে রম্য ও উপন্যাসোপম গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক রামেশ্বর শ'-র কাছ থেকে বিবিধ কর্মের পূর্ণ পরিণতি নিশ্চয়ই আমাদের সকলেরই কাছেই অপেক্ষিত।

— 'তিয়াস', নববর্ষ সংখ্যা, ১৪০৫

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক ও স্বনামধন্য সমালোচক

সবিনয় নিবেদন,

নানা অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালী পাঠক শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও দর্শন চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প। সুষ্ঠু অনুবাদের অভাবই এর কারণ। আপনি সেই কাজে হাত দিয়েছিলেন জেনেই খুসি হয়েছিলাম। আপনার অনুবাদ পুরস্কৃত হয়েছে জেনে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছি। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করবেন।

আপনার বাড়িতে আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু একটি বই ছাপার ব্যাপারে আটকে পড়ায় তখন আসতে পারি নি। ইতি—

—২৬/২/১৯৯৮

ডঃ জীনাত ইমতিয়াজ আলী, প্রভাষক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) সাধারণ্যে রাজনীতিবিদ ও অধ্যাত্মতত্ত্ব চেতনায় নিমগ্ন কোনো সাত্ত্বিক ব্যক্তিরূপেই পরিচিত। বলা যায়, দ্বিতীয় পরিচয়েই তিনি কালান্তরে সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ পরিচয় তাঁর আকৈশোর অন্বিষ্ট ছিল না। উত্তাল যৌবনে তিনি নিজেকে সংলগ্ন করতে চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে। তাদেরই শোষণবাদী শাসনযন্ত্রের সহযোগী হওয়ার জন্যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন আই সি এস পরীক্ষায়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস-এ এই কৃতী তরুণ সাফল্য লাভ করেছিলেন সহজেই। কিন্তু চূড়ান্ত অভিষেকের উত্তরীয় তিনি স্পর্শ করেননি। বলা যায়, তা তিনি চাননি। অশ্বচালনা পরীক্ষা গ্রহণকালে তাঁর স্বনির্বাচিত অনুপস্থিতিই তাঁকে করেছে উৎকেন্দ্রিক (অঞ্জলি বসু, ১৯৮৮ : ৩৪)। অতঃপর প্রবাস-জীবনের পরিসমাপ্তি ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং সেই সঙ্গে সূচনা হয় কর্মজীবনের; তাঁর আত্ম-আবিষ্কার, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশ অন্বেষার।

অরবিন্দের দ্বিতীয় পর্বের জীবন বর্ণবহুল, কর্মসফল, বৈচিত্র্যময় এবং বিপৎসংকুল। বরদা কলেজের অধ্যাপনার আপাত নিরাপদ ও মধ্যবিত্তের গৃহনিষ্ঠ জীবন যাপনের পরিচিত ও পুনরাবৃত্ত মডেল ত্যাগ করে তিনি দীক্ষিত হয়েছেন বিপ্লবী চেতনায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী 'ঠাকুর সাহেব'-ই ছিলেন অরবিন্দের নতুন জীবনাদর্শের ও জীবনার্থের তটভূমি পুনর্বাসিত হওয়ার নেপথ্য নায়ক; অন্য কথায়, অরবিন্দের মানস-নির্মিতির শুশ্রূষাকারী প্রতিভা।

অরবিন্দের জীবনে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। সহোদর বারীন্দ্রকুমারকে স্বাদেশিক বোধে পরিস্নাত ও বিপ্লবী সংগঠন সৃষ্টিতে সাহায্যের লক্ষ্যে অরবিন্দ ফিরে আসেন তাঁর জন্মস্থান কলকাতায়। ১৯০৫ সনে বাংলাদেশ হয় বিভাজিত। ভারতীয় কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে অরবিন্দও পূর্ববঙ্গের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাননি।

এ-ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্টতই প্রতিপক্ষের।

১৯০৮ সন থেকে অরবিন্দের জীবন পূর্বের তুলনায় আরো বিস্তৃত ও বৃহৎ পরিসরে সংস্থাপিত হতে থাকে। বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পাশাপাশি কখনো পত্রিকা সম্পাদক, কখনো লেখক হিসেবে তিনি জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে ঐকান্তিক ও সনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত রাজনীতি তিনি পরিত্যাগ করেন ও অভিনিবিষ্ট হন অধ্যাত্ম-সাধনায় এবং এই অন্তর্লীন প্রেরণাই তাঁকে উৎসাহিত করেছিল পণ্ডিচেরির আশ্রম প্রতিষ্ঠায়।

লেখক ও সম্পাদক হিসেবে অরবিন্দ বন্দেমাতরম্, কর্মযোগিন, ধর্ম, আর্য, সন্ধ্যা, যুগান্তর, মাদার ইন্ডিয়া প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এ-সূত্রেই রচিত হয়েছে তাঁর আটত্রিশটি গ্রন্থ: বাংলা ছয়টি ও ইংরেজি বত্রিশটি। এ ছাড়াও তাঁর পত্রের দুটি সংকলনগ্রন্থ রয়েছে।

আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম 'দি ফিউচার পোয়েট্রি'। ডিসেম্বর ১৯১৭ থেকে জুলাই ১৯২০ কাল-পরিসরে ধারাবাহিকভাবে মোট বত্রিশটি সংখ্যায় রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। দি ফিউচার পোয়েট্রি রচনার একটি পুরোভূমি বর্তমান (দ্র. রামেশ্বর শ'; ১৯৯৫ : ৩৭৯) :

... অধ্যায়গুলি লেখা শুরু হয় জেম্‌স্ এইচ্ কাজিন্সের (James H Cousins) লেখা একটি বই 'New Ways of English Literature'-কে ... উপলক্ষ করে। এই বইটির এক কপি শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠানো হয়েছিল 'আর্য' পত্রিকার প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই তাতে সমালোচনার জন্যে। তিনি এর একটি সমালোচনা শুরুও করেছিলেন ...; কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি এই সমালোচনা লেখার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। কারণ তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনি শিল্প ও জীবন সম্পর্কে নিজের ধ্যানধারণা ও ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা নিজের মতামতগুলি সুপরিণতভাবে প্রকাশ করবেন।

সে-অর্থে অরবিন্দের জীবন-জিজ্ঞাসা, তাঁর তত্ত্বভাবনা ও ধর্মচেতনার স্বাক্ষর দি ফিউচার পোয়েট্রি। কিন্তু তার জীবদ্দশায় এ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৩ সনে তাঁর মৃত্যুর (১৯৫০) তিন বছর পর পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। অতঃপর ১৯৭১ সনে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ বার্থ সেন্টিনারি লাইব্রেরির নবম খণ্ডে প্রকাশিত অরবিন্দ রচনাবলীর রাজসংস্করণের শেষ খণ্ডে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৫ সনে প্রকাশ পায় দি ফিউচার পোয়েট্রি-র দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণেরই বাংলা অনুবাদ (ভবিষ্যতের কবিতা) করেছেন রামেশ্বর শ'।

২

অনুবাদককে দুটি বিষয়ের প্রতি সব সময়ই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে এ দুইয়ের একটি উৎস-ভাষা অর্থাৎ, মূল পাঠ যে-ভাষায় রচিত সেই বিশেষ ও সুনির্ধারিত ভাষা; এবং অন্যটি অন্বিষ্ট-ভাষা অর্থাৎ, কোন ভাষায় অনুবাদের জন্যে অনুবাদক

প্রতিজ্ঞাদীপ্ত সেই ভাষা (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

অনুবাদ

উৎস ভাষা ← → অন্বিষ্ট ভাষা

মনে হতে পারে, দ্বিভাষী-জ্ঞানী কিংবা বহুভাষী কোনো প্রতিভাই অনুবাদের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু সে-বোধ একবারে সরল সত্য। কেননা অনুবাদকের কেবল উৎস ভাষা-জ্ঞান থাকলে চলে না; সেই ভাষিক পাঠ সে-বোধ, নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মানবিক আবেগ বয়ে আনে, যে-সব সম্পর্কেও তাঁর স্বচ্ছ ও গভীর ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্বিষ্ট ভাষা সম্পর্কেও অনুবাদকের সমান সচেতনতা আবশ্যক। মাতৃভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্মরণে রাখতে হয় যে, তাঁর আরাধ্য কর্ম যেন যান্ত্রিক না হয়; সহজে উচ্চার্য ও সবার বোধগম্য অনুবাদই অভিপ্রেত সুফল বয়ে আনে। বিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ এ ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। কেননা ভাষিক সংগঠনের তুলনায় পাঠের যথার্থ রক্ষাই এখানে অনুবাদকের মৌল দায়িত্ব। কিন্তু উৎস ভাষা বিষয়ক তাঁর আত্যন্তিক বোধই এ প্রতিকূলতা সহজেই দূর করতে পারে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবল ভাষান্তরের মধ্যে তা সীমায়িত নয়। সে-পরিধি বহুধাবিভক্ত ও স্তরপরম্পরা-আশ্রয়ী। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৌদ্ধিক স্তরও ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত (দ্র. Crystal: 1987 : 344)। যেমন;

[এক] আক্ষরিক অনুবাদ। উৎস ভাষার প্রতিটি সিলেব্‌ল ও ধ্বনিমূলক অন্বিষ্ট ভাষায় স্থানান্তর করার ধারণা থেকে অনুবাদ-সম্পর্কিত ও-বোধের সৃষ্টি। এ জাতীয় অনুবাদ কখনোই অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তাছাড়া উৎস ভাষার বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন অন্বিষ্ট ভাষায় সংস্থাপন করার কোনো উপায় এতে থাকে না। আক্ষরিক অনুবাদ তাই শেষপর্যন্ত পরিণত হয় পণ্ডশ্রমে।

[দুই] প্রতিশাব্দিক অনুবাদ। উৎস ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক সংগঠনগুচ্ছের মাধ্যমে নিষ্কাসিত পাঠ এ অনুবাদ-চিন্তনে সবিশেষ প্রাধান্য পায়। অনুবাদক অতঃপর অন্বিষ্ট ভাষা এবং সেই ভাষা সংগঠন-সূত্রের অনুসরণে শব্দ-সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন পাঠ পুনর্নির্মাণ করেন। সৃষ্টিকর্ম হিসেবে এ অনুবাদ পূর্বাপেক্ষা সফল হলেও উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয় না।

[তিন] স্বাধীন অনুবাদ। এ জাতীয় অনুবাদে উৎস ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ততো গুরুত্ব পায় না। অনুবাদক অনেকটাই তাঁর বৌদ্ধিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্বিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ ধরনের অনুবাদ প্রায়শই স্বাধীন অনুসৃতি বলে গণ্য হয়।

অনুবাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য উৎস ও অন্বিষ্ট ভাষার মধ্যে আর্থ সমতা রক্ষা করা বলা যায়, এই মৌল প্রবণতার কারণেই অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক কর্মে (যেমন, সারাংশ লিখন,

পত্র-রচনা ইত্যাদিতে) নিয়োজিত ব্যক্তি থেকে অনুবাদক স্বতন্ত্র। আর্থ সমতা রক্ষাও সহজসাধ্য কোনো বিষয় নয়, বরং তা সম্পূর্ণ বিপরীত, বহু সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম সমস্যায় আকীর্ণ। কেননা কী পরিমাণ আর্থ সমতা বাঞ্ছনীয় ও গ্রহণীয় সে-সম্পর্কিত কোনো প্রত্যমান সুনির্ধারিত নেই। উৎস ও অন্বিষ্টের মধ্যে এক : এক (১ : ১) আর্থ সমতা রক্ষাও সম্ভবপর নয়: এমন কি ইন্টার লিংগুয়াল বা একই ভাষার মধ্যে অনুবাদেও তা দুঃসাধ্য (দ্র Jacobson: 1966 : 232-34)। অনুবাদ তাই সব সময়ই এক কুহেলীকলুষ অভিধা। অনুবাদকের সাফল্য তাঁর উদ্দেশ্য ও পাঠক সাধারণ্যে অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতার উপরই নির্ভরশীল।

৩

রামেশ্বর শ' অনূদিত ভবিষ্যতের কবিতা পরিশিষ্ট বাদে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত: পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ। এ বিভাজন একান্তই বিষয়াশ্রয়ী ও সুচিন্তিত। পূর্বার্ধ গ্রন্থ পরিকল্পনার ভূমিকা বা পরিপ্রেক্ষিত রূপেই গ্রহণীয়। অরবিন্দ এ অংশে তাঁর কাব্যচিন্তন ও কাব্যাদর্শের পরিচয় উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মতে, কবিতা মানসিক বিষয় হলেও তাতে শ্রুত হয় দূরাগতের আহ্বান। কবিতাকে তাই তিনি মন্ত্র-রূপে গ্রহণ করতে চান। তাঁর বিবেচনায়, কাব্য রচনা মূলত 'কাব্যের একটি ক্রমবর্ধমান সান্নিধ্যের আবিষ্কার'। এ উৎসার ভারতীয় ঐতিহ্যেরই পুনঃকথন।

"বেদ বলেন, মন্ত্র অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্ উত্থিত হয় যুগপৎ ঋষির অন্তঃকরণ থেকে এবং সত্যের দূরতম পীঠস্থান থেকে। কাব্য আবিষ্কার করবে সেই বাক্-কে, সেই দিব্যগতিকে, সত্যের সেই চিন্তারূপকে।"

কাজিন্সের সমালোচনার মধ্যে অরবিন্দ তাঁর আচরিত আদর্শেরই প্রতিফলন দেখেছেন। ফলে কাজিন্সের নিউ ওয়েজ ইন ইংলিশ লিটারেচার তাঁর মনঃসংযোগ কেড়েছে। কিন্তু কাজিন্সের সব মন্তব্য অরবিন্দের সমর্থন পায়নি। শেক্সপিয়রকে কাজিন্স মহৎ কবি হিসেবেই বিবেচনা করতে চান। সে-ক্ষেত্রে অরবিন্দ সমগ্রতা বোধে আস্থাশীল। তিনি নাটকের পাশাপাশি শেক্সপিয়রের কাব্যসাহিত্য'কও সমান বিবেচনায় আগ্রহী :

"শ্রীযুক্ত কাজিন্স যখন আমাদের বলেন যে, শেক্সপীয়রের দৃষ্টিতে "তার নাট্যাংশ নয়, তার কাব্য জীবনের সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে", তখন আমার মনে হয় তার নাট্যাংশ ও কাব্যাংশের মধ্যে পার্থক্যরচনাটা সর্বত্র নির্ভুল নয়; তাব মধ্যে একটা সত্য আছে ঠিকই, কিন্তু তাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

এ পর্বের দ্বিতীয় রচনা 'কাব্যের আত্মা'-য় অরবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসায় বহু উচ্চারিত প্রশ্ন : কাব্যের আত্মা কোথায়-এর মুখোমুখি হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্য-মূল্যায়নে দুটি পরম্পরা বিকশিত হয়েছিল—দেহবাদী ও আত্মাবাদী সম্প্রদায়। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী মনে করতেন যে, কাব্যের আত্মা ব্যবচ্ছেদ করে পাওয়া যায় না; তা অনুসন্ধান করতে হয় দেহের অতীত কোনো ভুবনে। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তরা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও প্রথমোক্তদের বিপরীত। তাঁরা মনে করতেন, মহৎ কাব্যমাত্রেরই একটি দেহসুষমা

রয়েছে এবং সেই কায়াসৌন্দর্য তার অপূর্বত্ব, কাব্যের আত্মা। অর্থ, ধ্বনি, অলংকার প্রভৃতি উপাচারে সজ্জিত কাব্যই কালাতিক্রমী অভিধা পায়। অরবিন্দ এই দ্বৈরথ ঐতিহ্যে লগ্ন হয়েও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল। তাঁর মতে, কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এর শিল্পরূপের আত্মিক মূল্যে, আর কাব্যের শরীরী আয়োজন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় ও উপকরণমাত্র। প্রসঙ্গত তিনি গদ্যরীতিকেও তাঁর বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট: 'গদ্য....প্রকরণের ক্ষেত্রে আরো আকর্ষণীয় ছন্দঃসুষমার দিকে এগিয়ে' গেলে 'গদ্যশিল্পীরা তার নিজের স্বাভাবিক এলাকা ছাড়িয়ে কাব্য পরিধির দিকে পা বাড়ায়।

'ছন্দঃস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ'-এর আলোচ্য বিষয় শিল্পকর্মের সাম্য। অরবিন্দ এ জন্যে তিন ধরনের তীব্রতা: ছন্দোময় গতিপ্রবাহ, রচনাশৈলী ও অন্তরাত্মার সত্যানুসন্ধানের তীব্রতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এই ত্রয়ী তীব্রতার অধিষ্ঠানই কবিকে পৌঁছে দেয় স্রষ্টার সমীপবর্তী আসনে; আর এর অন্যথা ঘটলে কাব্য হয় ক্ষতদষ্ট, এমনকি অনেক কালজয়ী কাব্যও এই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। অরবিন্দর বিবেচনায়, কবি হিসেবে মিল্টনের প্রবাদপ্রতিম সাফল্য সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টিজগতে অপূর্ণতা লক্ষণীয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে মিল্টন তাঁর অন্তরাত্মার সত্যদর্শনের তীব্রতা সৃষ্টি করতে পারেননি। হুইটম্যান ও কার্পেন্টিরের সীমাবদ্ধতার মূলে আছে ছন্দোময় গতিপ্রবাহের তীব্রতার অভাব এবং একই অসাম্য লক্ষ করা যায় ভিক্টোরীয কবিদের ক্ষেত্রেও।

'রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু' শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছেন মূলত কবিভাষার উপর। তাঁর মতে, কাব্যভাষা ও কাব্যবিষয় অভিন্ন। কবির মুখ্য দায়িত্ব রঙে-রূপে-বৈচিত্র্যে প্রকাশিত প্রকৃতির মতোই নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করাও। ফলে অনুভূতি শিখরস্পর্শী, আত্ম-উপলব্ধি পূর্ণ ও সমগ্র না হলে কবিতার শৈলীও পরিপক্বতা পায় না।

'কবির সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র'-এ আলোচিত হয়েছে কবির জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য। অরবিন্দ সূক্ষ্মদর্শনকেই কবির নিজস্ব ও বিশিষ্ট শক্তি বলেছেন। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির পার্থক্যও এই সূক্ষ্মদর্শনজাত উপলব্ধির। দার্শনিক জগৎ ও জীবনকে বিচার করেন প্রকৃতিদত্ত স্বরূপ-ধর্ম-এর আলোকে, আর বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করেন তাঁর বিশ্লেষণী চেতনার সাহায্যে। কিন্তু কবির সূক্ষ্মদর্শনে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি সমীকৃত হয়ে অবস্থান করে বলে প্রতিভা হিসেবে কবিই শ্রেষ্ঠ এবং সব মহৎ কবিই যুগপৎ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।

জাতীয় কাব্য রচনার জন্যে একটি বিশেষ সময় ও আয়োজনের প্রয়োজন হয়। সাল-তারিখ গণনার মাধ্যমে জাতির অভ্যুদয়-পর্ব নির্দেশ করা যায় ঠিকই; কিন্তু এই বিশেষ শর্ত পূরণ হওয়ার পরও অনেক সময় জাতীয় কাব্য রচিত হয় না। বস্তুত, এ কাজ তখনই সম্ভবপর হয়, যখন জাতির সব লোক না-হলেও অন্তত কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে অতীত অধ্যাত্ম-চেতনা ও আত্যন্তিক আত্মদর্শন জাগ্রত, শিকড়ায়িত ও বিকশিত হয়। এই বিরল সংখ্যক ব্যক্তিই জাতির আবির্ভাব মুহূর্ত পালাবদলের ইংগিত তাঁদের সৃষ্টিতে আভাসিত ও ব্যঞ্জিত করেন। কাব্যের জাতীয় বিবর্তন অংশে অরবিন্দ প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছেন।

আধুনিক ইংরেজ জাতির আবির্ভাব খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক বিচারে সে-পর্বের সূচনা ১০৬৬ খ্রিষ্টাব্দে হেষ্টিংসের যুদ্ধে নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ামের জয়লাভের মধ্য দিয়ে। তিনিই অ্যাংলো-স্যাকসন রাজা হ্যাকল্ডকে পরাজিত এবং অতঃপর স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ড বাদে সমগ্র ইংল্যাণ্ড অধিকার করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর হলেও সত্যি যে, শোণিত ও চেতনা—কোনো দিক থেকেই ইংল্যাণ্ডের প্রতি উইলিয়মের আত্মিক নৈকট্য ছিল না। ফরাসি সংস্কৃতি-পরিস্নাত উইলিয়াম ছিলেন এ চেতনারই উত্তরাধিকারী। ফলে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি পূর্বের তুলনায় হয় অধিক প্রতিষ্ঠিত। উইলিয়ম রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োজিত অ্যাংলো-স্যাক্সনদের অপসারিত এবং ফরাসি ঐতিহ্যে প্রবুদ্ধ নরম্যানদের পুনর্বাসিত করেন। তাঁর এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ইংল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত ও বিভাজিত করে (Wynne-Davies; 1990-02)। ইংল্যাণ্ড দৃশ্যত ফরাসি, ইংরেজ ও কেল্টিক—এই ত্রিভাষী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই তিন ভাষা ব্যবহারকারীদের শ্রেণীচরিত্রগত ব্যবধানও ছিল প্রবল। অভিজাত ও রাজকর্মে নিয়োজিতরা ব্যবহার করতেন ফরাসি। অপেক্ষাকৃত অধস্তন ও নিম্নবিত্তের জনসাধারণের ভাষা ছিল ইংরেজি; আর কেল্টিক-এর প্রচলন ছিল স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ডে। এছাড়া করণিক সম্প্রদায়ের কর্মে ও গির্জায় ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের মতোই ব্যবহৃত হতো লাতিন।

উল্লেখযোগ্য যে, শাসন-ক্ষমতায় ও প্রশাসনিক কর্মে নরম্যান-ফরাসিদের পৌনঃপুনিক প্রাধান্য থাকার ফলে মূল ফরাসি দেশ ও সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ছিল ব্যাপক সংযোগ। কিন্তু সেই সখ্য ফরাসি রাজ-পরিবারের সঙ্গে ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত এভাবে অতিবাহিত হলেও ইংল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের আত্মপরিচয় সন্ধান অতঃপর অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাজা চতুর্থ হেনরি (১৩৯৯-১৪১৩) সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। তিনি ফরাসি-র পরিবর্তে ইংরেজি-কে ইংল্যাণ্ডের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরই আনুকূল্য লাভ করেছিলেন কবি-ঔপন্যাসিক জিয়োফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০)। ইংরেজদের জাতীয় সাহিত্য রচনার সেই ঐতিহাসিক সূচনা। অতঃপর পাঁচ-শ বছরের উত্থান-পতন, ঐতিহাসিক ও সামাজিক-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ড হয়ে উঠেছে গ্রেট ব্রিটেন। এই দীর্ঘ সময় বহু প্রতিভা কখনো উপাখ্যান রচনা করে, কখনো কবিতা ও নাটক-প্রবন্ধের সাহায্যে, আবার কখনো উপন্যাস-গল্পের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ জাতির সামগ্রিক চৈতন্যপ্রবাহ উপস্থাপন করেছেন। ভবিষ্যতের কবিতা-র অবশিষ্ট রচনাগুচ্ছে অরবিন্দ ইংরেজ জাতির এই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই সযত্নে তুলে ধরেছেন। সে-অর্থে তাঁর দৃষ্টি প্রতীচ্যের দিকেই নিবদ্ধ। কিন্তু এই পাশ্চাত্যমুখিতা কখনো বহিরাশ্রয়ী নয়। এ চেতনার গভীরে শিলীভূত রয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন। ফলে আমরা পরিচিত হই ইংরেজ ভাবাদর্শের পাশাপাশি কখনো ভারতবাসীর আবার কখনো সমগ্র ইয়োরোপের মানবজাতির অগ্রযাত্রার ইতিবৃত্তের সঙ্গে। এমন তুলনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক ও অধ্যাত্মচেতনা-পরিস্রুত মূল্যায়ন সাধারণ কোনো প্রতিভার পক্ষে সম্ভব

ছিল না। এ জন্যে অরবিন্দের মতো সৃষ্টিশীল সত্তাই উপযুক্ত। ভবিষ্যতের কবিতা সে-অর্থে এক দুর্লভ সৃষ্টি।

৪

অনুবাদমাত্রই শ্রমসাধ্য কাজ। এক্ষেত্রে অনুবাদককে বেশ কিছু কৃত্যসূচি নির্ধারণ করতে হয়। অন্বিষ্ট ভাষা-র পরিভাষা নির্মাণ, প্রকারসমূহ চিহ্নিত করা সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রামেশ্বর'শ-র অভিনিবেশ এ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবশ্যই। বাংলা পরিভাষার অপর্যাপ্ততা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে তাঁকে ইতোমধ্যে প্রচলিত পরিভাষার বাইরে বেশ কিছু নতুন পরিভাষা তৈরী করতে হয়েছে। তাঁর এ প্রচেষ্টার নির্বাচিত কিছু উদাহরণ নিচে দেখানো হলো :

chaos	নৈর্ঋতি
heightening	ভাবসমুন্নতি
ideal perfection	সব পেয়েছির দেশ
individuality	ব্যষ্টিচেতনা
inspiration	দিব্যপ্রেরণা
intuition	সংবোধি
long spacea	প্রলম্বিত যতি
penetrating intuitive spirit	অন্তর্ভেদী বোধিচেতনা
period of transition	উৎক্রান্তির পর্ব
psychic intuition	চৈত্যগত বোধিচেতনা
spirit within	অন্তর্বাসী আত্মা
temperament	মনোভাব
umanimist poet	অপ্রাণতাবাদী

অনুবাদে পরিভাষা তৈরী ও প্রকারসমূহ অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া দুরূহ কর্ম হলেও দুঃসাধ্য কোনো বিষয় নয়! উৎস ও অন্বিষ্ট ভাষার রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও রীতিগত গভীর বোধসম্পন্ন অনুবাদক এ কাজ সহজেই সম্পাদন করতে পারেন। রামেশ্বর শ'-র জন্যে সুবিধা এই যে, তিনি ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক। উৎস ভাষা ছাড়াও অন্বিষ্ট, এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা-সম্পর্কেও তাঁর বিবেচনা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। ফলে তাঁর সৃষ্ট পরিভাষা ও নির্দেশিত প্রকারসমূহের মধ্যে কোনো দুরন্বয় দোষ নেই, রয়েছে সহজ সম্পর্ক। অন্বিষ্ট ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি তা অনায়াসে নিষ্পন্ন করেছেন।

অনুবাদ-প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়, অনুবাদকের প্রেরণা-প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা কর্মমাত্রই প্রেষণা-সঞ্জাত। translator (T) বা অনুবাদক এই প্রেষণা-উদ্দীপিত হয়েই তাঁর উদ্দিষ্ট অনুবাদ কর্মটিকে প্রথমে code (C) বা সংহিতা-র বর্মে আবৃত্ত করেন। অতঃপর নিষ্পন্ন করতে হয় অন্যান্য কর্ম অর্থাৎ, author (A) বা লেখক

কিংবা পাঠ নির্বাচন, অনুবাদক উৎস ভাষার যে message (M) বা বক্তব্য অন্বিষ্ট ভাষায় পৌঁছে দিতে চান তা নির্বাচন। এ ক্ষেত্রে অনুবাদকের ভূমিকা দ্বৈত, তিনি উভয় ভাষারই receptor (R) বা গ্রাহক এবং প্রেরক। পুরো প্রক্রিয়া সূত্রের সাহায্যে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় (দ্র. Costa, 1989 : 308) :

$$\begin{array}{c} \quad C_1 \qquad\qquad C_2 \\ A \rightarrow M_1 \rightarrow R_1/T/A_2 \rightarrow M_1 \rightarrow R_2 \end{array}$$

রামেশ্বর শ'-র ক্ষেত্রে আবেগগত প্রেরণাই সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনি নিজের মধ্যে যে অধ্যাত্ম চেতনাকে লালন করেছেন-অরবিন্দের রচনার মাধ্যমে তাঁর সে-অনুভূতি আরো প্রতিপোষণ পেয়েছে। হতে পারে তিনি অরবিন্দের আদর্শে পরিস্নাত। কিন্তু মানস-নৈকট্যই সব সময় উৎকৃষ্ট অনুবাদের জনয়িত্রী হয় না। অনুবাদকের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ, তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রকাশ ক্ষমতার মৌলিকত্বই এ দুই সহধর্মী চৈতন্যের মধ্যে গ্রন্থি রচনা করে। অন্যভাবে, প্রচলিত প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলা যায়, শিষ্যের যোগ্যতাই গুরু নির্বাচন করে। অরবিন্দের রচনার অনুবাদের জন্যে এ মন্তব্য সুপ্রযুক্ত। তিনি আন্তরিকভাবেই তাঁর প্রেষণাকে রূপবদ্ধ করেছেন। মূল পাঠের মতোই তাঁর অনূদিত পাঠ গম্ভীর ও বিষয়াশ্রয়ী। বক্তব্যের অনুগামী শব্দবন্ধের যে-রূপলেখ্য তিনি তৈরী করেছেন তা দ্বিতীয় পাঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে। আমরা অনুবাদকের নিষ্ঠার প্রশংসা করছি, গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

পরিশিষ্ট

১. আশ্রিত পরিভাষা

code	সংহৃতি
communication	সংজ্ঞাপন
free translation	স্বাধীন অনুবাদ
idiom	বাগ্‌ধারা
intellectual	বৌদ্ধিক
level	স্তর
literal translation	আক্ষরিক অনুবাদ
loss of information	তথ্য প্রক্ষেপণ
motif	প্রেষণা
phoneme	ধ্বনিমূলক
register	প্রকার
semantic equivalence	আর্থ সমতা
source language	উৎস ভাষা
structure	সংগঠন

target language	অন্বিষ্ট ভাষা
terminology	পরিভাষা
text	পাঠ
word	শব্দ
word-for-word translation	প্রতিশাব্দিক অনুবাদ

২। সহায়ক গ্রন্থ/প্রবন্ধ

বাংলা

অঞ্জলি বসু (সম্পাদক)। ১৯৮৮। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ

রামেশ্বর শ' (অনুদিত)। ১৯৯৫। ভবিষ্যতের কবিতা, পণ্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

ইংরেজি

Costa, B.A... Silva Becher. 1989. Adding Variety of Translation: *Selected Articles from the English Teaching Forum (1984-1988)*, Washington DC: US Information Agency

Crystal, David. 1987. *The Cambridge Encyclopaedia of Language*, Cambridge: Cambridge University Press

Jacobson, Roman, 1966. *On Linguistic Aspects of Translation : On Translation*, New York : Oxford University Press

Verma. S.K and Krishnaswamy N. 1997. *Modern Linguistics* : An Introduction. New Delhi : Oxford University Press

Wynne-Davies, Marion. 1990. *Introduction : Guide to English Literature*, New York : Prentice Hall

—সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চল্লিশবর্ষ, ৩য় সংখ্যা,
ফাল্গুন, ১৪০৩।

ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক :

ডঃ রামেশ্বর শ'

শ্রদ্ধাস্পদেষু

The Future Poetry কাব্যালোচনার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথা মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ হিসেবে প্রথম থেকেই স্বীকৃত। এতে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে পাশাপাশি শিল্পসাহিত্যের কিছু মৌলিক সমস্যা এবং সাহিত্য সমালোচনার ধারা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যা এর আগে এমন গভীর ভাবে আর কেউ আলোচনা করতে এগিয়ে আসেননি। 'ভবিষ্যতের কবিতা' নানা কারণেই কবিতা বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে চিরকালের কবিতা বিষয়ক অনুভূতির নির্যাস হিসেবে

তাই চিহ্নিত হয়ে আছে। এর অনেকগুলি সিদ্ধান্ত কালের প্রহারেও জীর্ণ হবার নয়। বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি কাব্যের ধারা নিয়ে যে আলোচনা এই গ্রন্থে করেছেন তা আজও সত্য। কাব্য বিষয়ক এমন একটি আকর-গ্রন্থের অনুবাদ করা প্রায় দুঃসাধ্যের কাজ। সেই কাজ আপনি সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে গিয়ে যে সাফল্যলাভ করেছেন তা দেশবাসীর পক্ষে গৌরবের ব্যাপার। সেই সাফল্যের স্বীকৃতিও আপনি সাহিত্য আকাদেমি প্রদত্ত পুরস্কারের মাধ্যমে লাভ করেছেন। আমরা সাহিত্যের ছাত্র ও অনুরাগী হিসেবে এজন্যে গর্বিত। আপনি আমার প্রতিবেশী। একদা এই এলাকায় বসবাস ও শিক্ষালাভ করে গেছেন। আপনার এই বিপুল পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে অলক্ষ্যে কোথায় তাই যেন আমাদের যোগাযোগ থেকে যায়। সাফল্যের পুরস্কারের ফলে অলক্ষ্যে উষ্ণতার ভাগ প্রত্যাশা করি।

আপনি পরিশ্রমী। আপনার হাত দিয়ে আরও এমন ভালো কাজ বেরোবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। উত্তরোত্তর আপনার সাহিত্যচর্চা ব্যাপ্ত হোক এই প্রার্থনা করি। নমস্করান্তে—

—৮ই জুন ২০০০

ডঃ সৌমিত্র শেখর, লেক্‌চারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :

প্রফেসর
ডক্টর রামেশ্বর শ'

.....'পুস্তক বিপণি' থেকে 'ভাষাবিজ্ঞান' ও 'ভবিষ্যতের কবিতা' বই দু'টো সংগ্রহ করেছি। ......চমৎকার অনুবাদ আপনার। ভাষা যে টেনে নিয়ে যায় এক মায়াবি আবেশ দিয়ে। এতো তত্ত্ব কথা, পড়তে কিন্তু ভার লাগে না। এ আপনার অনুবাদেরই গুণ; অনুমান করি। অনুমান এজন্যে, মূল বইটি পড়ে মেলাই নি। অবশ্য তার আর দরকারও অনুভূত হয় নি পাঠক হিসেবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেখানে পাওয়া যায়, বিশেষ করে আমার চেয়ে বেশি.......।

—১৪/১/৯৮

শ্রীযুক্ত সুদেব রায়চৌধুরী, লেখক ও প্রাক্তন সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রিয়বরেষু
রামেশ্বরবাবু,

'ভবিষ্যতের কবিতা'র রূপান্তর পড়ে ভালই লাগল। মনকে নাড়া দেয়। যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আপনি কাজটা করেছেন তা বইয়ের প্রতিটি লাইনে ফুটে উঠেছে। নিজেকে আড়ালে রেখে শ্রীঅরবিন্দের লেখাকে সুন্দর, সহজ, সরলভাবে ব্যক্ত করতে

আপনি একশোর মধ্যে একশো পেয়েছেন। অন্ততপক্ষে আমার মত সাধারণ পাঠকের তাই মনে হয়েছে।

—১৪ নভেম্বর, '৯৯

'সানন্দা' :

দুর্দান্ত ছাত্র বলতে যা বোঝায় ড. **রামেশ্বর শ'** বরাবরই তাই ছিলেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক রামেশ্বরবাবু পরে রপ্ত করেন জার্মান ভাষা এবং তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় হয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। এর পাশাপাশি তিনি চর্চা করে যান শ্রীঅরবিন্দের দর্শন এবং লেখেনও একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তবে তাঁর সর্বশেষ কীর্তিটি সাড়া জাগিয়েছে—তাঁর নিটোল, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদে শ্রীঅরবিন্দের 'দ্য ফিউচার পোয়েট্রি' বইটি প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার, পরে সাহিত্য অকাদেমির স্বীকৃতি পেল। সমালোচকদের মতে এ এক অপূর্ব অনুবাদকর্ম।

—'সানন্দা' ৩০/১/৯৮

'সাপ্তাহিক বর্তমান' :

শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার

ঋষি অরবিন্দ'র ১২৫ তম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অরবিন্দ ভবনে অনুষ্ঠিত হল শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী। তিন দিনের এই সমারোহপূর্ণ জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় রাজপাল কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি। শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কলকাতার মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, অধ্যাপক অমলেন্দু দে প্রমুখ। বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় রচিত শ্রীঅরবিন্দের 'দি ফিউচার পোয়েট্রি'র প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ 'ভবিষ্যতের কবিতা'র জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার পেলেন **প্রফেসর রামেশ্বর শ'**। উল্লেখ্য, শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার এবার থেকেই প্রথম চালু হল। পুরস্কারের অর্থমূল্য দশ হাজার টাকা এবং একটি মানপত্র।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ রচনার জন্য এর আগেও রামেশ্বর শ' আমেরিকার সানফ্রানসিসকো এবং শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বহু ভাষাবিদ প্রোফেসর শ' এই পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়ে জানালেন, "মনীষী শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে যে কোনও কাজ করা আমার কাছে ঈশ্বরপ্রাপ্তি। আমি চিরদিন শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গবেষণা করতে চাই।"

সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭
নিজস্ব প্রতিনিধি

SABDA NEWS-LETTER, Sri Aurobindo Ashram, April, 1999 :—

Dr. Rameswar Shaw, professor in Bengali, University of Kalyani, is a well known scholar and author. He is also a devotee of Sri Aurobindo and the Mother. Dr. Shaw has translated Sri Aurobindo's 'The Future Poetry' into Bengali titled 'Bhavishyater Kabita' which was published by the publication Department of the Sri Aurobindo Ashram.

As is known to the readers, 'The Future Poetry' is Sri Aurobindo's monumental work on literary criticism and aesthetics. Dr. Shaw's excellent translation of this epoch-making work has been highly appreciated by all critics and scholars.

'Bhavishyater Kabita' was selected for the most coveted award in the literary field, the Sahitya Akademi Award for Translation, 1997. The book also received 'Sri Aurobindo Puraskar', constituted by a commitee at the Sri Aurobindo Bhavan, Calcutta.

Currently, Dr. Shaw is engaged in translating other important works of Sri Aurobindo.

জাগরী

অসাধারণ গ্রন্থ 'ভবিষ্যতের কবিতা'

পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'আর্য' পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বব, ১৯১৭ থেকে ১৫ জুলাই ১৯২০ পর্যন্ত ভবিষ্যতের কবিতার উপর আলোচনা করে ধারাবাহিক যে নিবন্ধ লেখেন শ্রীঅরবিন্দ, গ্রন্থাকারে ১৯৫৩ সালে আগস্ট মাসে তা 'The Future Poctry' নামাঙ্কনে প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ দুটি মহাগ্রন্থ লিখেছিলেন দু'তিনজন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবির নিবন্ধ পড়ে, প্রতিবাদে এবং সমর্থনে : Foundation of Indian Culture (ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি) এবং বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি। James Cousins-এর New Ways in English Literature গ্রন্থের অনুসরণে।

ডঃ রামেশ্বর শ' অনূদিত এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বঙ্গের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। দীর্ঘদিন ধরে রামেশ্বর শ' অনুবাদের দুরূহতম কাজটি সম্পন্ন করেছেন, এজন্য তাঁকে বিদ্বৎসমাজ ধন্যবাদ জানাবে।

প্রসঙ্গত এখানে ডঃ শ'-এর বক্তব্যের কিছু উদ্ধৃত করি ঃ "যদি ইতিহাসের ধারাকে মেনে নিই তবে আমরা মানতে বাধ্য যে, বিবর্তনের ধারায় মানবজাতির ক্রমিক উর্ধ্বায়ন হয়ে চলেছে। এই উর্ধ্বমুখী বিবর্তন জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। আর সাহিত্য যেহেতু জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত সেহেতু সাহিত্যেরও অনুরূপ পরিবর্তন ও উর্ধ্বায়ন ঘটবে। তার ফলে ভবিষ্যতের কাব্য তথা সাহিত্য কি রূপ নেবে সেই মৌল জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'ভবিষ্যতের কবিতা'" (The Future Poctry) গ্রন্থে।

প্রায় সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে অধ্যাপক ও দিব্যজীবন-সন্ধানী ডঃ রামেশ্বর পরম যত্নে ও অধ্যবসায়ে এক অসাধ্য সাধন করেছেন। গ্রন্থটি মোট দুই ভাগে ঃ পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধে বিভক্ত। পূর্বার্ধে আছে ২৪টি ও উত্তরার্ধে ৮টি সুঅনূদিত অধ্যায়।

জীবনের সার্বিক বিকাশ এবং রূপান্তরের জন্য শিল্প-সাহিত্যের নব পরিমণ্ডল দরকার। অস্তিত্বের প্রাথমিক প্রয়োজন যদি অস্তিমেও বড় করে দেখা হয়, তার পক্ষে সরবে প্রচার করা হয়, তাহলে প্রগতির গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই জীবন যা চায় তা প্রাথমিক প্রয়োজনে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না। শিল্প ও সাহিত্যের প্রয়োজন এই প্রাথমিক প্রয়োজনের স্তুতিগানে সীমিত হলে সত্যি দুঃখের কথা। শিল্প সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "...নিখাদ সৌন্দর্যানুভূতি শিল্পের প্রথম ও সর্বনিম্নমানের ব্যবহার, দ্বিতীয় প্রয়োগ বুদ্ধিগত অথবা শিক্ষামূলক এবং শেষ ও সর্বোত্তম প্রয়োগ হলো আধ্যাত্মিকতায়। নিম্নমানের ব্যবহার বলতে অবশ্য আমি একে হেয় করতে চাইনি, শিল্পের সর্বোচ্চমানে প্রয়োগের ক্ষেত্রের তুলনায় এর কি স্থান তাই বোঝাতে বলেছি মাত্র। সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের বিবর্তনে গভীরভাবে কাজ করে এবং এ বোধ ছাড়া মানুষ তার বিবর্তনের ধারায় অগ্রবর্তী চেতনায় উন্নীত হতেই পারে না।" কলা ও কাব্যের আবেদন মানুষের মনে

আদিম স্পন্দন সৃষ্টির সঙ্গে ভবিষ্যতের রূপাভাস আবাহন করে। সুদূর অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত কবিতা তাই আমাদের এত একান্ত আনন্দের যোগান দিয়ে চলেছে। আধ্যাত্মিক ভাব সর্বোচ্চ কাব্যের রীতি, সে ভাবে বৈদিক ঋষিরা সার্থক কাব্য রচনা করে গেছেন। আর সে কাব্যের রস আজও অফুরান। আধুনিক কালে ইংরাজী ভাষাতে সার্থক কাব্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জীবনের অস্তিত্ব এবং যে অস্তিত্বে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় চেতনার পর্যায় ক্রমিক অবস্থিতিতে উন্নততর জীবন চেতনার দিকে ফিরবার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়, তার জন্য দেহ-প্রাণ-মনের প্রস্তুতি ও শিক্ষার জন্য আধুনিক কবির প্রয়োজনীয় ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিন্তু এই শেষ নয়, সব নয়। বিকাশমান জীবনের গভীর কথা কবিতা করুণা শিল্পকলায় প্রকাশ হওয়াও আকাঙ্ক্ষিত। জীবন যখন শুকিয়ে যায় তখন করুণা ধারার মত কবিতার মন্দাকিনী ধারা। অন্ন প্রাণের মানব সত্তা যখন আর্ত তখন তার কাছে নবতম সত্তা অমোঘ নিয়তির মত আবির্ভূত এবং সে সূত্রেই কবিরা আলোকের দূতের ভূমিকা নেন। সুফী কবি, বৈষ্ণব কবি এবং ক্যাথলিক ধর্মের কবিরা অনেক সময় তাঁদের জীবনের আর্তনাদে মরমী সুর তুলেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য, চাই আরও আগে।

বুদ্ধিবাদে প্রদীপ্ত কিংবা প্রকৃতি মায়ায় আবদ্ধ অথবা রোমাণ্টিকতায় স্তব্ধ বা ভাবমত্ত হয়ে মানুষ পূর্ণ তৃপ্তি পায় নি। ভবিষ্যতের কবিতা হবে এই অতৃপ্তি দূর করার ব্রতে উজ্জীবিত। নবযুগের ভোরের কবিতায় সুচি-মুখ আমরা দেখেছি, তবে তার বিকাশ-কলার রূপ ধরতে পারিনি। নবযুগের কবিদের তাই নবতম কাব্য সৃষ্টিতে চেতনার মৌল ধাঁচকে সন্তর্পণে পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হচ্ছেও; শুধু বুদ্ধিতে হবে না, প্রকৃতির শুশ্রূষায়ও নয়, রোমাণ্টিক আবহে আতপ্ত হয়েও না। কবিতা হবে অনাগত জীবনের অন্তর্ভেদী এষণার কথা। আর তার জন্য রূপান্তরিত কবি-সত্তা বচনে ও শব্দ চয়নে নূতন আঙ্গিকের আশ্রয় নিতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে যে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব করেছেন কিংবা শেলী বা কীটস রূপকের কাঠামোতে আধুনিক মনের যে আর্তনাদ উচ্চকিত করেছেন, এ সবের মধ্যেও আধুনিকতম জীবন-জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয়েছে কি? ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিম্বা উইলিয়াম ব্লেকের প্রকৃতির প্রাকৃত পরশ পাবার পরও আমরা কি শান্ত হতে পেরেছি? বায়রনের বুদ্ধিদীপ্ত মন-বিকলনে এবং রোমাণ্টিক ভাষ্যে আমরা কি অরূপ-রতনের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত?

তবু নবযুগের বোধনে কবিমনীষী হুইটম্যান, ক্যার্পেন্টার, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স্ হাউসম্যান, ফিলিপস এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। দান্তে, হোমার, ভার্জিল কিংম্বা সেক্সপীয়র মানুষের প্রাণধর্মের মর্ম উদঘাটন করেছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলা যায় : "On the surge of the life-spirit and its forms of character and passion and its waves of self interpretings thought and reflection, or on the play of the detached or half-detached seeing intellect or the inspired reason, or on the strainings of the desire-soul of man striving to find the delight of

things in thousand-coloured threads of double wed of our existence."

(The Future poetry. p—226)

ভবিষ্যতে কবিতার ভাষা পাল্টাবে, অবয়ব পরিবর্তন প্রাসঙ্গিকভাবে ঘটবে, আসবে কাব্যাত্মায় নূতনতম জীবনবোধ। ছন্দের বাঁধনে অতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতা রচনা করেছেন জীবন-সায়াহ্নে এবং 'শবদে শবদে বিয়া' দেওয়া যে কবিতা নয় তা ঘোষণা করেছিলেন শ্রীমধুসূদন, যিনি মিল্টনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ গ্রীসীয় ভাব মাধুর্যে প্রকাশ করেছেন জীবনের অন্ন-প্রাণের ট্র্যাজেডিতে। তবু সেই গ্রীক কাব্য কিম্বা মিল্টন আধুনিকতম জীবন জিজ্ঞাসার সামনে ধোঁয়াশা।

কবিতা হলো মানবাত্মার প্রত্যক্ষ ও গভীর সত্য উপলব্ধির বার্তা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়..."A poetry born direct from and full of the power of the spirit and therefore a largest and deepest self-expression of the soul and mind of the race is that for which we are seeking and of which the more profound tendencies of the creative mind seem to be in travail."

(The Future Poetry p—351.)

জীবন এগিয়ে চলেছে 'নিয়তি নির্দিষ্ট অতিমানসের' দিকে। জীবনের একমাত্র সার্থকতম উদ্দেশ্য হলো, 'হয়ে ওঠা'; যা আছি এটাই শেষ নয়, সব মনের গ্রন্থি খুলতে খুলতে আমাদের অগ্রগমন। 'চরৈবেতি' মন্ত্র হৃদয়-তন্ত্রে ঝঙ্কৃত এবং এই চলার আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। এই মৃত্তিকা, এই মৃত্যু, এই ক্লেদাকীর্ণ জীবন যাপন, এই সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা—এসবের মধ্যে এসবকে নিয়ে অন্ন-প্রাণ-মনের তরঙ্গ-ভঙ্গে কালনাগিনীর মাথার মণির মত কবিতার মণি তুলে ধরা যায় বা তা হয়েছে কিন্তু ঐ কালিমালিপ্ত সার্থক উন্মোচনে গভীরতর জীবন-প্রয়াসের সুর আজও অস্ফুট। ভবিষ্যতের কবিতার আত্মায় ঐ অস্ফুটতর সত্য স্ফুটতম হবে একটি স্থিরপ্রজ্ঞ জীবন-এষণায় বাঙ্ময় হবে জীবনের অন্তিম আকৃতি। এই প্রয়াসে কবিতা হবে মন্ত্ররূপী সত্যের আগুন, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়,....."by the divine Agni (অগ্নি). the sacred fire in the heart of man. The mantra, in other words, is a direct and most heightened, an intensest and most divinely burdened rhythmic word...."

সৌন্দর্য ও আনন্দ কলা ও কাব্যের আত্মা এবং 'শুরুর সরণি'। সৌন্দর্যানুভূতি বুদ্ধি-বিকলন প্রয়াসে শুরু হলেও আধ্যাত্মিক প্রতীতিই শিল্প এ কবিতার চরম বিকাশাবস্থা এবং সে সূত্রে যাত্রাপথের পুণ্যাহ-লগ্নে বৈদিক অগ্নির ধ্যান। এ অগ্নির ধ্যানেই শব্দ-ব্রহ্মের অতুল বৈভব। সৌন্দর্য ও আনন্দের পথ হেঁটে, পথ পিছনে ফেলে আত্মার জয়গান......ব্রহ্ম-সহোদরার অনুভূতি.....'যুবা কবিঃ, প্রিয়ো অতিথি অমর্তো মন্দ্রোজীব ঋচিৎ ঋতাবা...'।

জীবনানুভূতির স্পন্দিত সুর ছন্দিত অবয়বে তুলে ধরেন যে কবি নিঃসন্দেহে তিনি পণ্ডিত বা মননশীল (তাই বলে পণ্ডিত মাত্রেই কিন্তু কবি নন!)। মনের মুকুরে সুন্দর মুখ দেখেই যিনি তৃপ্ত হন, সেই কবি যিনি আপাততের গভীরে আলোকদীপ্ত অমোঘ সত্যকে প্রকাশ করেন শান্ত আনন্দের মধ্যে অনাদি অনন্ত আলোক প্রবাহকে আবাহন

করেন। মহাকবি কালিদাসে সৌন্দর্য ও সত্য, ব্যাস বা বাল্মীকিতে যে জীবন দর্শন তারও উপরে বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রের সূক্ত যুক্ত যা ভাবীকালের কাব্যের স্বরলিপি। রস, মধু, অমৃত এই হলো কাব্যের সেই পবিত্র প্রতীকী সুরা, সোমরস; রসোঃ বৈ সঃ......কিম্বা লীলা. রূপে অরূপে গহন গভীরে যা শাশ্বত.......এবং তাই হলো ভবিষ্যতের কবিতা।

কাব্য হীরকখণ্ডের মত কঠিন আলোকদীপ্ত আবার মন্দাকিনী ধারার মত স্বচ্ছ পবিত্রও। দর্শনের ভাবের ভাবে কিম্বা বিজ্ঞানের বিভাগীয় জ্ঞানে আচ্ছন্ন নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "Truth of poetry is not truth of philosophy or truth of science or truth of religion only, because it is another way of self-expression of infinite Truth"....

বর্তমান এবং অতীত ভবিষ্যৎকবির পাদপীঠ বটে তিনি সে-সব অতিক্রম করে মহাদ্যুতির দূতরূপে আবির্ভূত। শ্রীঅরবিন্দ অনুপমভাবে বলেন, "The poet will continue though in a new way and with a new eye to transfigure the past for us; but will not feel that need to live in an imaginative pre-occupation with the past....His vision will search all the ways of the present and interpret deeply to man the sense of that which is making him and which he is making. .."

বিকাশমান জীবসত্তার বৈজয়ন্তী ঘোষণা করবেন ভবিষ্যতের কবিরা—"–in his struggle and victory and failure and even in his sin and offence and littleness, but the spirit is the master of the future, its past and present in time. .." (Future Poetry–Sri Aurobindo)। ভবিষ্যতের কবিতা হবে আত্মোপলব্ধির স্মরণিকা, এ কবিতার অবয়ব ও আত্মার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "A Development of the kind of which we are speaking must affect not only the frames of poetry, but initiate also a subtle change of its word and rhythmic movement. The poetic word is a vehicle of the spirit, the chosen medium of the soul's self-expression...The old habits of speech cannot contain the new spirit and must either enlarge and deepen themselves and undergo a transformation or else be broken up and make way for another figure...."

ভবিষ্যতের কবিদের কাব্যসৃষ্টিতে বুদ্ধি-মনের ভূমিকা গৌণ। কারণ সে কবিতা চেতনার উর্ধ্বতরস্তর থেকে আসে, সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে থাকতে হবে নিঃসন্দেহে। কবিতা আসে, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "poetry comes from a region above us, a plane of our being above and beyond our personal intelligence, a supermind which sees things in their innermost and largest truth by a spiritual identity....packed with these glory of this ecstasy and lustre...." (The Future Poetry P–392)

আমরা প্রতিমুহূর্তে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। পিছনে অতীত, পায়ের নিচে বর্তমান,- -যা প্রতিক্ষণে অতীতে লীন হচ্ছে,—ভবিযাতই আমাদের একমাত্র অবলম্বন,

একমাত্র আশা। আমাদের অস্তিত্বের অবস্থিতিই ভবিষ্যতে। সুতরাং ভবিষ্যতের কাব্য, শিল্পকলা নিয়ে ভাবনা আমাদের সার্থক ভাবনা। মহাকবি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্য 'সাবিত্রী'তে এবং অজস্র ছোট বড় কবিতায় ভবিষ্যৎ কবিতার রূপরেখা এঁকে গেছেন। ইংরেজী কাব্যাঙ্গনে আইরিশ কবিরা এবং হুইটম্যানের মধ্যে 'মহান আত্মা'র সন্ধান পাওয়া যায়, সাক্ষাৎ মেলে মানবতার বিরাট আত্মার। বর্তমান যুগ-মানসের কবি প্রতিভূরূপে রবীন্দ্রনাথের সার্থক আবির্ভাব। এইসব মহান কবিদের আবির্ভাবের পরে বিশ্ব হয়েছে এখন একটি সংসার। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব এক বিন্দুতে এসে মিশেছে যেখানে মহাচেতনার সিন্ধু উদ্বেলিত—রূপান্তরের অনন্ত সম্ভাবনা কাঙ্ক্ষিত। শ্রীঅরবিন্দ 'The Future Poetry'-এর শেষ স্তবকে বলেছেন ঃ It is in effet a larger cosmic vision, a realising of the godhead in the world and in man, of his divine possibilities as well of the greatness of the power that manifests in what he is, a spiritualised uplifting of his thought and feeling and sense and action, a more developed psychic mind and heart, a truer and a deeper insight into his nature and the meaning of the world, a calling of diviner potentialites and more spiritual values into the intention and structure of his life that is the call upon humanity, the prospect offered to it by the slowy unfolding and now more clearly disclosed self of the universe. The nations that most include and make real these things in their life and culture are the nations of the coming dawn and the poets of whatever tongue and race who most completely see with this vision and speak with the inspiration of its utterance are those who shall be the creators of the poetry of the future."

সার্থক অনুবাদে এই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য পেয়ে পাঠকেরা আনন্দিত হবেন। আধুনিককালের সর্বনাশা ভোগ-রস সম্পৃক্ত সাহিত্য দেখে ভয় হয়। এ প্রসঙ্গে "ভবিষ্যতের কবিতা" থেকে ইঙ্গিত ধর্মী কিছু বাক্য উদ্ধৃত করি—"প্রাচীন বৈদিক সূক্তের মধ্যে দিব্যশক্তি ইন্দ্র যখন অনাদি জননী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে জন্ম নিতে যাচ্ছেন তখন ইন্দ্রকে ডেকে অদিতি বলেছেন—"এই হলো সেই নব আবিষ্কৃত পুরাতন পন্থা যেটি ধরে সমস্ত দেবতাই জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার গর্ভে তুমি যখন পরিপুষ্টি লাভ করবে, তখন তোমারও জন্ম হবে সেই উর্ধ্বমুখী পথেই। কিন্তু অন্য পথে গিয়ে তোমার জননীর তুমি অপমৃত্যু ঘটিও না।" (পৃঃ ২৬৮)

ভবিষ্যতের কবিতার সারাৎসার—"দর্শন নিজেকে অমূর্ত ভাবনার মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারে, ধর্ম একটা অসহিষ্ণু পরলোক সর্বস্বতা ও সন্ন্যাসের দিকে মোড় নিতে পারে। কিন্তু কাব্য ও শিল্প তাদের জন্ম থেকেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষর মধ্যে, জীবন ও আত্মার মধ্যে মধ্যস্থতা করে আসছে। আত্মার সত্য ও জীবনের সত্যের মধ্যে এই মধ্যস্থতাই হবে ভবিষ্যতের কবিতার অন্যতম প্রধান কাজ।"

"ঈশ্বরের দুটি প্রদীপ, পরম পুরুষের আরো দুটি রঙ্গিন সূর্য হল—সৌন্দর্য ও আনন্দ।

এরা যেন পরস্পর সহোদর। এরা হল কাব্য ও শিল্পের আত্মা এবং উৎস। মানুষকে বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিদান করা এবং তার জীবনে সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই রয়েছে কাব্য ও শিল্পের পরম তাৎপর্য এবং এটাই হল তাদের আত্মিক কর্তব্য।"

গ্রন্থটির 'পরিশিষ্টও' একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

সুন্দর কাগজ ছাপা। কিন্তু প্রচ্ছদ সাদামাঠা—এখানে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত থাকলে ভাল হতো। —জাগরী, ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

প্রগতি বার্তা :

শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার : শ্রীঅরবিন্দের ১২৫ তম জন্মোৎসব কমিটি, কলিকাতা, দশ হাজার টাকা অর্থমূল্যের 'শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কারে'ব জন্য এবার মনোনয়ন করেছেন অধ্যাপক রামেশ্বর শ'কে। বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় লিখিত শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ "The Future Poetry" র বাংলা অনুবাদ—'ভবিষ্যতের কবিতা' গ্রন্থের জন্য ডঃ শ' এই পুরস্কার পাচ্ছেন। তিনি ১৯৭২ সাল থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডীন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট লেকচারার ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ শ' বাংলা সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের একাধিক বইয়ের লেখক। — প্রগতিবার্তা ১/১২/৯৭

রামেশ্বর শ' অনুবাদে সাহিত্য অকাদেমী পেলেন

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক রামেশ্বর শ' এবাব 'অনুবাদ-সাহিত্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমী' পুরস্কার পাওয়ায় কল্যাণাবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত এবং পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ "The Future Poetry"ব অনুবাদ 'ভবিষ্যতের কবিতা'র জন্য তিনি দশ হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কার পেয়েছেন। —প্রগতিবার্তা, ১৬/২/৯৮

জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য ঋষি অরবিন্দের প্রতি। সম্বর্ধিত অধ্যাপক রামেশ্বর শ'

১৫ আগস্ট ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে (বি-১০) গাম্ভীর্যপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে ১১নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন পালিত হয়েছে। এদিন ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পৌরপ্রধান ডঃ শান্তনু ঝা, বিশিষ্ট অধ্যাপক রামেশ্বর শ, শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষিকা গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, ওয়ার্ড সম্পাদক সুধাংশুশেখর রায়, সমাজকর্মী সিক্তা জোয়ারদার, অধ্যাপক শঙ্কর আচার্য প্রমুখ। ঋষি অরবিন্দের জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এদিন শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার এবং অনুবাদে অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক রামেশ্বর শ'কে ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।... পৌরপ্রধান ডঃ শান্তনু ঝা অধ্যাপক রামেশ্বর শ'কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বলেন, ভাষা কৃষ্টি নন্দনতত্ত্বের চর্চা ও গবেষণার প্রসারিত ক্ষেত্রে অধ্যাপক শ'য়েব অবদান আমাদের গর্বিত করে; অধ্যাপক শ' কর্তৃক শ্রী অরবিন্দের 'দ্য ফিউচার পোয়েট্রি' অনূদিত হয়েছে 'ভবিষ্যতের কবিতা'য়—তাঁর কলমে সতত ঘটেছে এক অমৃতময় সালোকসংশ্লেষ।.. —কল্যাণী পুরকথা শারদ ১৪১৪

ঞ. পরিশিষ্ট—২ : কয়েকটি উদ্ধৃতি

"১ রুকু।। ... ৬. 'নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে, তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর, তাদের পক্ষে সবই সমান, তারা বিশ্বাস করবে না। ৭. আল্লাহ্ তাদের অন্তর ও কর্ণ (যেন) মোহর (সীল) করে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর উপরও আবরণ আছে এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি আছে।

২. রুকু।। ...৮. মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যারা বলে—আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী, অথচ তারা বিশ্বাসী নয়। ৯. তারা (মনে করছে) আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদের প্রতারণা করছে, অথচ তারা নিজেদের ব্যতীত কাউকে প্রতারণা করছে না, কিন্তু এটা তারা বোঝে না।"...

—**কোরআন শরীফ**

(ডঃ ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট্-কৃত
অনুবাদ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১) সূরা বাকারাহ্।

"Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock and it shall be opened unto you."

—The Holy Bible, K.J.V.,

New Testament, St. Matthew, 7/7

অনুবাদ : "চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; অনুসন্ধান কর, খুঁজে পাবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।'

—'পবিত্র বাইবেল'

নিউ টেষ্টামেন্ট, সেন্ট্ ম্যাথু, ৭/৭

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।" --২/৫

*　*　*　*

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।"—৩/৮

*　*　*　*

"ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে
দুঃখমেবাপিযন্তি।।"—৩/১০

— শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

—অমৃতের পুত্রগণ, যাঁরা দিব্যধামে আছেন, তাঁরা সকলে শ্রবণ করুন—

*　*　*　*

তমসার পরপারের আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে আমি জেনেছি। একমাত্র তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

*　*　*　*

যিনি পরাৎপর—যাঁর পরে আর কোনো সত্য নেই—তিনি অরূপ ও অনামী (অর্থাৎ তিনি নিরাকার ও নামহীন)—যাঁরা এ কথা জানেন, তাঁরা অমরত্বকে লাভ করেন; আর যাঁরা তা জানেন না, তাঁরা দুঃখেই অভিভূত হয়ে থাকেন।

'অনেক প্রকারের মানুষ দেখিতে পাইবে'

"প্রথমতঃ, দেবপ্রকৃতি মানব—ইঁহারা পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া পরের উপকার করেন। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি কোন দেশে এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। তারপর আছেন সৎ বা সাধু ব্যক্তিগণ—যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইঁহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক—ইহারা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায়, সাধু-মহাত্মারা ভালোর জন্যই ভালো করিয়া থাকেন, তেমনি সর্বনিম্ন প্রান্তে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ অনিষ্ট করাই তাহাদের স্বভাব।"

—**'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'**, উদ্বোধন সং, ১ম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৮৮।

'স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ'

"হস্তী হস্ত-সহস্রেণ শতহস্তেন ঘোটকঃ।
শৃঙ্গী চ দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ।।"

—চাণক্য শ্লোক, ১০৪।

ঝ. পরিশিষ্ট—২

কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ*

'তপ্ত লোহা'

"স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা
আর তপ্ত লোহায় হাত
বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে
যাওয়াও তাই......"

—রবীন্দ্রনাথ : 'চার অধ্যায়' (ভূমিকা : নরেশ দাসগুপ্তের উক্তি)

——— o ———

'MOST DIFFICULT'

" The vital of some people calls always for disharmony, petty quarrels and confusion, they generally have also a kind of mania of persecution and believe that everybody is against them. To cure that is most difficult and requires a radical transformation of the nature.

"The best, when dealing with them, is not to mind the reactions and to go on doing what one has to do with simplicity and sincerity" p-40

"After saying all that, my conclusion is "Let them do as they like".

After all everybody must learn his lesson" p-32

—The Mother : 'Guidance in Work', Sri Aurobindo Ashram, 1988

---

* উদ্ধৃতিগুলি থেকেই শব্দ চয়ন করে উদ্ধৃতিগুলির শিরোনাম বর্তমান গ্রন্থকারের দেওয়া।

'মহা বিভীষিকাস্বরূপ'

"কর্ম্ম-যোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—কর্ত্তব্য কেবল নিম্নভূমিতেই করণীয়; তথাপি আমাদিগের প্রত্যেককেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই কর্ত্তব্য আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। উহা আমাদের পক্ষে রোগবিশেষ হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। উহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমুদয় জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে। ইহা মনুষ্য-জীবনেব মহা বিভীষিকাস্বরূপ। "এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্য্য; উহা মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া থাকে।" এই সব কর্ত্তব্যের ক্রীতদাসের দিকে চাহিয়া দেখ। কর্ত্তব্য—বেচারাদের কিছু ভাবিবার অবকাশ দেয় না, কর্ত্তব্য—তাহাদিগকে স্নানাহ্নিকের পর্য্যন্ত সময় দেয় না। কর্ত্তব্য সর্ব্বদাই যেন তাহাদের পিছনে লাগিয়া আছে। তাহার বাটীর বাহিরে যায়, গিযা কার্য্য কবে, কর্ত্তব্য তাহাদের পিছনে লাগিয়াই আছে। তাহাবা বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া আবাব তৎপর দিনের কর্ত্তব্য চিন্তা কবে, সেখানেও কর্ত্তব্যের হাত হইতে ছাড়ান নাই। এ ত ক্রীতদাসের জীবন—অবশেষে অশ্বের ন্যায় লাগামে যোতা অবস্থায় মৃত্যু! লোকে কর্ত্তব্য এইরূপই বুঝিয়া থাকে। বাস্তবিক একমাত্র কর্ত্তব্য—অনাসক্ত হওয়া এবং স্বাধীন পুরুষের ন্যায় কার্য্য করা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ : 'কর্ম্মযোগ' ১৩৫৭, পৃঃ ১৪৩-১৪৪

'বাঁচা যায়'

"এবারকার ডায়ারিটাতে ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়—মন-নামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কী রকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব, পরব, বেঁচে থাকব, এইরকম কথা ছিল—আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছাপূর্বক খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা দরকার মনে করি, আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে 'সাধনা' বের করি, এর কী আবশ্যকতা ছিল! ওদিকে নারায়ণ সিং দেখো, ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পূর্বক, দু-এক ছিলিম তামাক টেনে, দুপুরবেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে.... সামান্য দু-চারটে কাজ করে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে। জীবনটা যে ব্যর্থ হল, বিফল হল, এমন কখনও তার স্বপ্নেও মনে হয় না; পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনও দায়িক করে না। ....আর, যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন-নামক একটা প্রাণী গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে, তার আর বিশ্রাম নেই; তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়; তার চতুর্দিক্‌বর্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে—সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার 'অসীম আকাঙ্খা'র উদ্রেক হয়। এই দুরন্ত অসন্তুষ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ শান্তির মধ্যে বিসর্জন করে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়, কথাটা হচ্ছে এই।"

—রবীন্দ্রনাথ : 'ছিন্নপত্র', ১৪০৯, পৃঃ ১৭১-৭২, পত্রসংখ্যা ৮৫।

'বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে'

"বিদ্যা তৃপ্তিদায়নী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না।"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :

'কমলাকান্তের দপ্তর' (আমার মন)

"... SO CAN HE BE NATURE'S KING"

"All here can change if the Magician choose,
If human will could be made one with God's,
If human thought could echo the thoughts of God,
Man might be all-knowing and omnipotent;
But now he walks in Nature's doubtful ray.
Yet can the mind of man receive God's light,
The force of man can be driven by God's force,
Then is he a miracle doing miracles.
For only so can he be Nature's king."

Sir Aurobindo : 'SAVITRI', 1994, BK VI, Canto II

THE DESTINED

......"though a dress of blind and devious chance
Is laid upon the work of all-wise Fate,
Our acts interpret an omniscient Force
That dwells in the compelling stuff of things,
And nothing happens in the cosmic play
But at its time and in its foreseen place."

—Sri Aurobindo : 'Savitri', 1994, Book-V, Canto-I, p. 389.

OUR FATE .... BUILT BY OUR OWN WILLS

"Our fate and our temperament have been built by our own wills and our wills can alter them."

—Sri Aurobindo : 'Birth Centenary Library', 1972, Vol. 17, p. 258.

'ABOVE BLIND FATE'

"Let not the impatient Titan drive thy heart,
Ask not the imperfect fruit, the partial prize.
Only one boon, to greaten thy spirit, demand;
Only one joy, to raise thy kind, desire.
Above blind fate and the antagonist powers
Moveless there stands a high unchanging will;
To its omnipotence leave thy work's result
All things shall change in God's transfiguring hour."

—Sri Aurobindo : 'Savitri', 1994, Book-III, Canto-IV
P. 341.

'THIS IS ALL THAT IS ASKED FROM YOU'

"Be simple,

Be happy,

Remain quiet,

Do your work as well as you can,

Keep yourself always open towards me

—This is all that is asked from you."

* * * *

"Whether I see you or not makes no difference to the help. It will always be there."

* * * *

...."It is a great mistake to think that physical nearness is the one thing indispensable for the progress. It will do nothing for you if you do not establish the inner contact, for without that you could remain from morning to night with me and yet you will never truly meet me. It is only by the inner opening and contact that you can realise my presence."

—'Collected Works Of The Mother',

Centenary ed. De luxe Vol.13,

Sri Aurobindo Ashram, 1980, pp. 79, 80.

WHO HAVE TURNED TO THE TEACHING OF SRI AUROBINDO AND THE MOTHER

"There is a special personal tie between you and me, between all who have turned to the teaching of Sri Aurobindo and myself, —and, it is well understood, distance does not count here, you may be in France, you may be at the other end of the world or in Pondicherry, this tie is always true and living."—The Mother

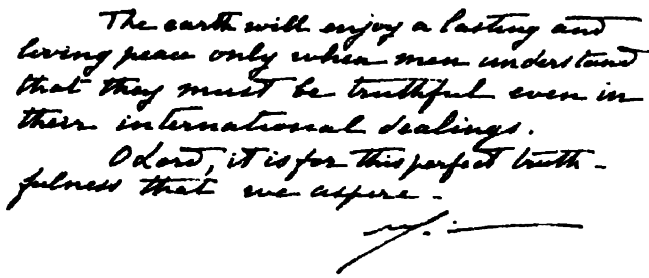
(Written by the Mother earlier and distributed by Sri Aurobindo Ashram among devotees as the message on the occasion of the birth-day celebration of the Mother on 21.2.2005).

'NEVER FORGET'

"Never forget that you are not alone. The Divine is with you helping and guiding you. He is the companion who never fails, the friend whose love comforts and strengthens. Have faith and He will do everything for you." —The Mother, Sri Aurobindo Ashram.

"If you call for the Truth and yet something in you chooses what is false, ignorant and undivine or even simply is unwilling to reject it altogether, then always you will be open to attack and the Grace will recede from you. Detect first what is false or obscure in you and persistently reject it.....

"Reject the false notion that the divine Power will do *and is bound to do everything for you at your demand and even though you do not satisfy the conditions laid down* by the Supreme."—Sri Aurobindo : 'The Mother' 1987, Ch. I



The earth will enjoy a lasting and living peace only when men understand that they must be truthful even in their international dealings.
O Lord, it is for this perfect truthfulness that we aspire.

'EVEN IN INTERNATIONAL DEALINGS'

"The earth will enjoy a lasting and living peace only when men understand that they must be truthful even in their inter-national dealings.

"O Lord, it is for this perfect truthfulness that we aspire."— 'Collected Works of the Mother,' Centenary ed., De luxe Vol. 15, Sri Aurobindo Ashram, 1980, p. 181.

The quotation was distributed in the Ashram as the New Year's message, at first in 1945 and then in 2007. The facsimile has been printed here with the kind permission of Sri Aurobindo Ashram.

'আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রেও'

অনুবাদ : "পৃথিবী স্থায়ী ও প্রাণবন্ত শান্তি উপভোগ করবে কেবল তখনি, যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, তাকে আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রেও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে।

"হে প্রভু, এই পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠার জন্যেই আমরা আস্পৃহা পোষণ করি।" —শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।

"ভুবনেশ্বর হে,

মোচন কর' বন্ধন সব, মোচন কর' হে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

বিষয়-পরিচিতি

প্রথম পর্ব : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি (পূর্ববর্তী আধুনিক বাংলা উপন্যাসের [illegible] দ্বিতীয় সং.) : [illegible] [illegible] অনুসারে : আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নির্ণয়, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি: শিল্পায়ন ও নগরায়ন, বিশ্বযুদ্ধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, অবাধ্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, সামাজিক ভাঙন, মূল্যবোধের বিপর্যয়, জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রাম, নব-নব চিন্তাধারা ও আশাবাদী দর্শন, [illegible], শিক্ষাক্ষেত্রে নব-নব পরীক্ষা ও সংস্কার, নারীপ্রগতি, অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণ, [illegible]। বাংলা উপন্যাসের পটভূমি রূপে বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা : 'কল্লোলে'র বিশ্বসাহিত্য-সচেতনতা, পুরাতনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, সমাজচেতনা, বাস্তবতা ও ন্যাচারালিজম্, পটভূমির অভিনবত্ব, বিষয়-বৈচিত্র্য সাধন, উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা ও দার্শনিকতা, যৌনচিত্র ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, চেতনাপ্রবাহ ও অন্তর্মুখীনতা, প্রতীকবাদ, সুর্-রিয়েলিজম্, অস্তিত্ববাদ, মার্কসীয় দর্শন ও বৈকল্পিক চিন্তাধারা, আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক।

দ্বিতীয় পর্ব: বিবিধ প্রসঙ্গ : (ক) বাংলা সাহিত্য : বাংলার নবজাগরণে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি, বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর, পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, দেশবন্ধুর কবিতা, আধুনিক বাংলা কবিতা : একটি প্রশ্ন, নলিনীকান্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিত্যিক। (খ) ভাষা : উইলিয়ম কেরীর সাধু-গদ্য : ভাষাতাত্ত্বিক বিচার, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-ভাবনা, 'পায়ানলীর মাবি' : ভাষা ও শৈলীবিচার, ভাষা-সমস্যা প্রসঙ্গে, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের মূল স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার [illegible]। (গ) ভারতীয় প্রাদেশিক ও বিদেশী সাহিত্য : কবি মৈথিলীশরণ, শেক্‌সপীয়র : জীবন-চেতনার ত্রয়ী উপাদান, শেক্‌সপীয়রীয় ও গ্রীক ট্র্যাজিডি, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিয়ট, জার্মান কথাসাহিত্যিক ফ্রানৎস কাফ্‌কা, জার্মান কবি রিল্‌কে। (ঘ) নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা, শ্রী[illegible] নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ক্রোচে ও তাঁর [illegible], [illegible] বসুর [illegible] প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যতত্ত্ব, জার্মান নন্দনতত্ত্ববিদ শিলার। (ঙ) সমাজ : [illegible] : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা, বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্গদেশের কৃষক ও ভূমি-আইন, বাংলা প্রবন্ধ ও জাতীয় সংহতি, ধর্ম ও জ

নারী-[illegible] নারীবাদ এবং [illegible], শক্তিসাধনা : সেকাল

(চ) স্মরণ : [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী

[illegible] ইত্যাদি। (ছ) গ্রন্থ-সমালোচনা, (জ) প

(ঝ) পরিশিষ্ট-১ : [illegible]। (ঞ) পরিশিষ্ট-২ : কয়েকটি উক্তি।

প্রচ্ছদ : [illegible]

মুদ্রক : [illegible] ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা